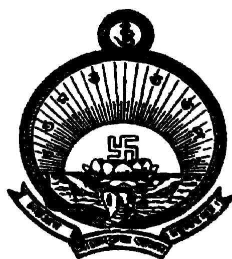
নবযুগের মহাপুরুষ

দ্বিতীয় ভাগ

ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও যুগাচার্য্য স্বামী বিবেকানন্দের
কতিপয় শিষ্য এবং অন্যান্য কয়েকটী আধুনিক
মহাপুরুষের সংক্ষিপ্ত জীবনী

বেলুড় মঠের
স্বামী জগদীশ্বরানন্দ প্রণীত



শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম
রঘুনাথপুর, পোঃ দেশবন্ধু নগর
চব্বিশ পরগণা

প্রকাশক
শ্রীগৌরমোহন দালাল
শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম
রঘুনাথপুর গ্রাম, দেশবন্ধুনগর পোঃ
জেলা চব্বিশ পরগণা
পশ্চিম বঙ্গ

প্রথম সংস্করণ—১৩৫৮

মুদ্রাকর :—শ্রীবামাচরণ মণ্ডল
রাণীশ্রী প্রেস
১১বি, বিদ্যাসাগর ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

নিবেদন

এই পুস্তকে নবযুগের যে পনেরটী মহাপুরুষের জীবনী প্রদত্ত হইল তন্মধ্যে স্বামী ত্রিগুণাতীত ও অধরলাল সেন এই দুইজন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিষ্য এবং স্বামী বোধানন্দ, আত্মানন্দ, শুভানন্দ, কল্যাণানন্দ, নিশ্চয়ানন্দ, নির্মলানন্দ ও বিরজানন্দ এই সাতজন স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য। উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব, শ্রীরমণ মহর্ষি, স্বামী রামতীর্থ, কেশবচন্দ্র সেন, অরবিন্দ ঘোষ ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব বা স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য না হইলেও নবযুগের সুযোগ্য প্রতিনিধি। শ্রীরমণ মহর্ষি অদ্বৈত বেদান্তের জীবন্ত বিগ্রহ ও আধুনিক যুগের বেদমূর্তি। স্বামী রামতীর্থ স্বামী বিবেকানন্দের পূত স্পর্শ পাইয়া তৎপদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে স্বামী বিবেকানন্দের ভাবশিষ্য বলিলেও চলে। কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্ম সমাজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং শ্রীরামকৃষ্ণের সমবয়স্ক সমসাময়িক। শ্রীরামকৃষ্ণ ও কেশবচন্দ্রের মধ্যে যে উচ্চাঙ্গ ধর্মপ্রসঙ্গ হইত তাহার অধিকাংশই এই গ্রন্থে কেশবের জীবনীতে সংগৃহীত। শ্রীঅরবিন্দকে স্বামী বিবেকানন্দের উত্তর সাধক বলিলে অত্যুক্তি হয় না। শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে অরবিন্দের সারগর্ভ উক্তিগুলি তাঁহার জীবনীতে প্রদত্ত। বাংলায় নবযুগ প্রবর্তনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবদান অসামান্য। পরিশিষ্টত্রয়ে নবযুগের কয়েকজন মহাপুরুষের তুলনামূলক আলোচনা করা হইয়াছে। এই পুস্তকের কয়েকটী অধ্যায় স্বামী শিবশরণ পুরী কর্তৃক লিখিত।

এই পুস্তকের অধিকাংশই বহু বৎসর পূর্বে রচিত এবং বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত। ইহাতে প্রকাশিত উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবের জীবনীর কিয়দংশ "দৈনিক বসুমতী"তে ১০ই কার্তিক রবিবার, ১৩৫৮ (২৮শে অক্টোবর, ১৯৫১) "ইংলণ্ডে উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব" শীর্ষক প্রবন্ধরূপে বাহির হয়। কোন্ প্রবন্ধ কোন্ পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল তাহা যথাস্থানে

উল্লিখিত। অধ্যায়গুলির উপাদান যে স্থান বা ব্যক্তি হইতে সংগৃহীত তাহাও যথাস্থলে উল্লিখিত হইয়াছে। স্বামী ত্রিগুণাতীত ও স্বামী আত্মানন্দের সংক্ষিপ্ত জীবনী এই পুস্তকের প্রথম ভাগে প্রদত্ত হইলেও বর্তমান ভাগে সম্পূর্ণ আকারে লিখিত। উভয় ভাগে নবযুগের মোট তেতাল্লিশটী মহাপুরুষের জীবনী দেওয়া হইল। এই সকল জীবনীতে শুধু ব্যক্তিগত কাহিনী বিবৃত হয় নাই, নবযুগের ভাবধারার ও ধর্মান্দোলনের যুগান্তরকারী ইতিবৃত্ত আলোচিত। সুতরাং আধুনিক ধর্মভাবের সহিত পরিচিত হইতে হইলে এই পুস্তক অধ্যয়ন ও অনুধ্যান অত্যাবশ্যক। নবযুগের প্রতিনিধিস্থানীয় এতগুলি মহাপুরুষের জীবনী অন্য কোন পুস্তকে একত্রে পাওয়া যাইবে না। মৎপ্রণীত "সাধিকামালা" এবং "দেশবিদেশের মহামানব" পুস্তকদ্বয়েও নবযুগের অনেকগুলি মহাপুরুষের জীবনী প্রকাশিত হইয়াছে।

এই পুস্তক প্রণয়নে ও প্রকাশনে আমার দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিল পুত্রপ্রতিম স্নেহভাজন শ্রীমান্ বীরেন্দ্রনাথ প্রতিহার বি. এ. এবং শ্রীরবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাহাদের অকুণ্ঠিত সহযোগিতা ব্যতীত আমার পক্ষে এই বৃহৎ গ্রন্থ রচনা বা মুদ্রণ বর্তমান ভগ্ন স্বাস্থ্য ও ক্ষীণ দৃষ্টি লইয়া কিছুতেই সম্ভব হইত না। শ্রীমান্ রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বহু শ্রম স্বীকারপূর্বক সমগ্র পুস্তকের একটী প্রুফ দেখিয়া দিয়াছে এবং সেই সময় ভাষার যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়াছে। কলিকাতার শ্রীঅমৃতলাল চক্রবর্তী, বোম্বাইয়ের শ্রীএন. সি. চেট্টি এবং সম্বলপুরের শ্রীসুশীলকুমার সরকার প্রভৃতি যাঁহাদের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক প্রকাশিত তাঁহাদের সকলকেই আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। এই পুস্তক পাঠে নবযুগের মহাপুরুষদের প্রাতঃস্মরণীয় জীবনী বর্তমান সমাজে কিঞ্চিৎ প্রচারিত হইলেই আমার শ্রম সার্থক ও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। অলমিতি।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড় মঠ
কৃষ্ণা সপ্তমী, পৌষ, ১৩৫৬

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

বিষয়-সূচী

পরিশিষ্ট

চিত্র-সূচী

নবযুগের মহাপুরুষ

একত্রিশ

আমেরিকায় স্বামী ত্রিগুণাতীত*

ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একমাত্র সন্ন্যাসীশিষ্য স্বামী ত্রিগুণাতীত আমেরিকায় প্রায় পনের বৎসর বেদান্ত প্রচারান্তে তথায় দেহরক্ষা করেন। এই পুস্তকের প্রথম ভাগে তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু উক্ত জীবনীতে আমেরিকায় তাঁহার প্রচারকার্যের সামান্য বিবরণী পাওয়া যায়। সেইজন্য এখানে উহার বিস্তৃত বর্ণনা দেওয়া হইল।

১৯০২ খ্রীস্টাব্দের প্রথমার্ধে স্বামী তুরীয়ানন্দ প্রাণপ্রিয় গুরুভ্রাতা স্বামী বিবেকানন্দের সন্দর্শনার্থ সানফ্রান্সিস্কো হইতে ভারতে আসিতে মনস্থ করেন। সানফ্রান্সিস্কো বেদান্ত সমিতির তদানীন্তন সভাপতি ডাঃ এম. এইচ. লোগান বেলুড় মঠে স্বামী বিবেকানন্দকে পত্র লিখেন আর একজন সন্ন্যাসীকে তথায় পাঠাইবার জন্য। স্বামিজী ত্রিগুণাতীত মহারাজকে সানফ্রান্সিস্কোতে যাইবার জন্য মনোনীত করিয়া ডাঃ লোগানকে পত্র দেন। কিন্তু ৪ঠা জুলাই স্বামিজী দেহরক্ষা করায় স্বামী ত্রিগুণাতীতের আমেরিকাযাত্রা বিলম্বিত হয়। নভেম্বর মাসের প্রথমেই কলিকাতা হইতে যাত্রা করিয়া স্বামী ত্রিগুণাতীত অল্পকাল পরে কলম্বো সহরে যান। তথায় কয়েকদিন থাকিয়া তিনি ১৫ই নভেম্বর বায়েরু জাহাজে চড়িয়া ৪ঠা ডিসেম্বর জাপানে উপনীত হন। জাপান হইতে ১৭ই ডিসেম্বর 'আমেরিকান মারু' নামক জাহাজে উঠিয়া প্রশান্ত মহাসাগর দিয়া তিনি সানফ্রান্সিস্কোতে ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে ৩রা জানুয়ারী উপস্থিত হন। সমুদ্রযাত্রায় প্রাচ্য পোষাক ও নিরামিষ আহার তাঁহার সম্বল ছিল। আমেরিকায়

---

* ১৯২৮ খ্রীঃ 'প্রবুদ্ধ ভারত' নামক ইংরাজি মাসিকে প্রকাশিত 'পাশ্চাত্যে স্বামী ত্রিগুণাতীত' শীর্ষক প্রবন্ধাবলী অবলম্বনে রচিত।

আবশ্যকীয় ফলমূল ও শাকসব্জী না পাইলে শুধু রুটি ও জল খাইয়া তথায় জীবন ধারণ করিবেন, এইরূপ সুদৃঢ় সংকল্প লইয়াই তিনি ভারত ত্যাগ করেন।

সানফ্রান্সিস্কোতে উপস্থিত হইলে বেদান্তের একজন অনুরক্ত বন্ধু ও ভক্ত আন্তরিক সম্বর্ধনান্তে তাঁহাকে বেদান্ত সমিতির সভাপতি ডাঃ এম. এইচ. লোগানের বাড়ীতে লইয়া যান। তথায় কয়েক সপ্তাহ থাকিবার পর স্বামী ত্রিগুণাতীত মিঃ সি. এফ. পেটারসনের বাড়ীতে যাইয়া অবস্থান করেন। উক্ত গৃহই সানফ্রান্সিস্কোতে তাঁহার প্রথম প্রচারকেন্দ্র হইল। অচিরে নূতন ও পুরাতন বেদান্তানুরাগিগণ নানা স্থান হইতে আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের একজন সাক্ষাৎ সন্ন্যাসী শিষ্যের আগমনবার্তা অবিলম্বে চারিদিকে প্রচারিত হইল। ভক্ত-বন্ধুগণ তাঁহার প্রচারকার্যের যথোচিত সুব্যবস্থা করিলেন। শহরের নিম্নভাগে একটি হল পাওয়া গেল। তথায় স্বামী ত্রিগুণাতীত প্রতি রবিবার বৈকালে বক্তৃতা দিতেন। ক্লাসে লোকসমাগম বাড়িয়া যাওয়ায় পেটারসন দম্পতীর গৃহে স্থান সংকুলান হইল না। সেইজন্য ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে মার্চ মাসে ৪০ সংখ্যক স্টাইনার স্ট্রীটে কয়েকটি কক্ষ ভাড়া করা হইল। স্বামী ত্রিগুণাতীত পেটারসন দম্পতী সমভিব্যাহারে তথায় যাইয়া নিবাস ও প্রচার আরম্ভ করিলেন।

তথায় সোমবার ও বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সমিতির সভ্যগণের জন্য নিয়মিত শাস্ত্রব্যাখ্যা চলিতে লাগিল। সোমবার সন্ধ্যায় গীতা এবং বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় উপনিষদ্ ব্যাখ্যাত হইত। স্বামী ত্রিগুণাতীত রবিবার প্রাতে ও সন্ধ্যায় বক্তৃতা দিতেন। প্রত্যেক বক্তৃতায় ও শাস্ত্রব্যাখ্যায় মহিলা সদস্যগণ যন্ত্রসঙ্গীত ও কণ্ঠসঙ্গীত করিতেন। তন্মধ্যে অনেকেই সঙ্গীতবিজ্ঞানে সুনিপুণা ছিলেন। কেবলমাত্র রবিবাসরীয় সান্ধ্য ভাষণে তরুণ সদস্যগণ গান গাহিতেন। প্রায় সাত বৎসর যাবৎ স্বামী ত্রিগুণাতীতের ধর্মপ্রসঙ্গসমূহে সঙ্গীত অঙ্গীভূত ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব এবং অন্যান্য প্রধান অনুষ্ঠানের সঙ্গীত-সূচী নারী সভ্যগণ কর্তৃক প্রস্তুত হইত। তাঁহাদের আন্তরিক অনুরাগে সঙ্গীত উৎসবাদির আনন্দবর্ধন করিত।

দক্ষিণ কালিফোর্ণিয়ায় সানফ্রান্সিস্কো সহর হইতে চার শত পঁচিশ মাইল দূরে লস্ এঞ্জেলিস্ শহরে স্থানীয় ভক্তগণের আহ্বানে স্বামী ত্রিগুণাতীত ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের মে ও জুন মাসে একটি উর্বর প্রচারকেন্দ্র স্থাপন করেন। তথায় নিয়মিত ধর্মালোচনা আরম্ভ করিয়া তিনি প্রভূত পরিমাণে কৃতকার্য্য হন। তথায় তাঁহার বক্তৃতাসমূহে আশাতীত লোকসমাগম হইত, সভাস্থলে দাঁড়াইবারও জায়গা থাকিত না। লস এঞ্জেলিসে অবস্থানকালে তিনি কিছুদিন দিনরাতে মাত্র দেড় সের দুধ খাইয়া থাকিতেন, অন্য কিছু খাইতেন না। কিন্তু সানফ্রান্সিস্কো হইতে এত দূরে একটি শাখাকেন্দ্র পরিচালনা তাঁহার পক্ষে কষ্টকর হইয়া উঠিল। উক্ত বৎসর তিনি বেলুড় মঠে একজন সহকারী সন্ন্যাসী প্রেরণার্থ লিখিলেন। তদনুযায়ী স্বামী সচ্চিদানন্দ তাঁহার সহকারীরূপে প্রেরিত হইলেন। সচ্চিদানন্দজী সানফ্রান্সিস্কোতে যাইয়া কিছুদিন অবস্থানের পর লস এঞ্জেলিস শহরে নূতন শাখাকেন্দ্রের ভার গ্রহণ করেন। কিন্তু প্রথম বৎসরের শেষে তিনি স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য ভারতে ফিরিতে বাধ্য হন।

১৯০৪ খৃষ্টাব্দে সানফ্রান্সিস্কো বেদান্ত সমিতির কার্য্য এত অধিক প্রসারলাভ করিল যে, স্বামী ত্রিগুণাতীত সমিতির কার্য্য পরিচালনার জন্য উপযুক্ত স্থায়ী গৃহের অভাব অনুভব করিলেন। তাঁহার পক্ষে যেমন চিন্তা, তেমন কাজ। সহরের মধ্যে উপযুক্ত ভূমি নির্বাচনের জন্য অবিলম্বে একটি কমিটি গঠিত হইল। স্বামিজীর নায়কত্বে কমিটি সহরের প্রত্যেক পল্লী খুঁজিয়া সর্বশেষে যে স্থানটি নির্বাচিত করেন তাহার উপরই হিন্দু মন্দির নির্মিত হইয়াছে। শীঘ্রই স্বামীজি সমিতির সকল সভ্যের একটি সভা আহ্বান করিলেন। ইহাতে ভূমি-সংগ্রহ কমিটির নির্বাচন সমর্থিত হইল। সভ্যগণের প্রচেষ্টায় অচিরে আবশ্যকীয় অর্থ সংগৃহীত এবং নির্বাচিত ভূমি সানফ্রান্সিস্কো বেদান্ত সমিতির নামে ক্রীত হইল। স্বামীজীর তত্ত্বাবধানে সমিতিগৃহের যে নক্সা অঙ্কিত হয় তদনুসারে উক্ত মন্দির নির্মিত হইয়াছে। ইহাই সমগ্র পাশ্চাত্য জগতে প্রথম হিন্দু মন্দির। অর্থ-সংগ্রহের জন্য যে আবেদন সহরের ভিতরে ও বাহিরে প্রেরিত হয় তাহাতে সমিতির প্রত্যেক সভ্য ও সুহৃৎ অর্থদান করেন। ধনী ও নির্ধন, বৃদ্ধ ও তরুণ

সকলেই স্ব স্ব সামর্থ্যানুসারে যে অর্থদান করেন তাহা দ্বারা মন্দিরের নির্মাণ-কার্য্য আরম্ভ হয়। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে আগস্ট যথাযোগ্য অনুষ্ঠানের দ্বারা মন্দিরের ভিত্তি স্থাপিত হয়। পরিকল্পিত শুভকর্ম যাহাতে অক্ষয় শক্তিতে এবং ক্রমবর্ধমান উপকারিতায় সমৃদ্ধ হয় সেইজন্য ভিত্তির মধ্যে স্বামিজী একটি ধাতুময় পেটিকায় শ্রীরামকৃষ্ণ, সারদাদেবী এবং অন্যান্য দেবদেবীর ছবি প্রোথিত করেন। অবশেষে সানফ্রান্সিস্কো সহরের গোল্ডেন গেটের সমীপে বেদান্ত প্রচারের একটি স্থায়ী কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইল। সহস্র সহস্র সংসার-সন্তপ্ত মার্কিণ নরনারীর প্রাণ-মরুতে বেদান্তের শান্তিবারি সিঞ্চন করিয়া হিন্দুমন্দির অদ্যাপি সগৌরবে বিদ্যমান। মন্দিরের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে স্বামী ত্রিগুণাতীত বলিতেন, "আমি মন্দিরের ভবিষ্যৎ উন্নতি দেখিতে পাইব না, ততদিন আমি বাঁচিব না। পরে অন্যান্য সাধুরা আসিয়া উহা ভোগ করিবে।" মন্দির নির্মাণে ভগবদিচ্ছা এবং স্বীয় অকর্তৃত্ব সম্বন্ধে তিনি সাহসভরে বলিয়াছিলেন, "বিশ্বাস কর, যদি এই মন্দির নির্মাণে আমার বিন্দুমাত্র কর্তৃত্ব বা স্বার্থ থাকে তবে ইহা ভূমিসাৎ হইবে। কিন্তু যদি ইহা ঠাকুরের ইচ্ছায় হইয়া থাকে তাহা হইলে ইহা তাঁহার কাজের জন্য সগর্বে দীর্ঘকাল দণ্ডায়মান থাকিবে।" সানফ্রান্সিস্কো সহরে ওয়েবস্টার স্ট্রীট এবং ফিলবার্ট স্ট্রীটের মোড়ে হিন্দু মন্দির অদ্যাপি সগৌরবে বিরাজমান থাকিয়া উপরোক্ত ঘোষণার সম্পূর্ণ সত্যতা প্রতিপন্ন করিতেছে।

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে ৭ই জানুয়ারী মন্দিরের উৎসর্গ কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়। সহরের বাহিরে স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী তুরীয়ানন্দের যে সকল শিষ্য-শিষ্যা ছিলেন তাঁহাদের অনেকেই উক্ত উৎসবে যোগদান করেন। ১৫ই জানুয়ারী রবিবার নূতন মন্দিরে প্রথম প্রচার-কার্য্য আরম্ভ হয়।

মন্দির নির্মাণ সমাপ্ত হইতে না হইতে একটি মহান্ সংকল্প তাঁহার মনে উদিত হয়। তিনি সানফ্রান্সিস্কো সহরে রামকৃষ্ণ মিশনের একটি শাখা-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিলেন। ইহাই আমেরিকায় বেদান্ত প্রচারের মূলকেন্দ্র হইবে। তদানীন্তন সংঘ-গুরু স্বামী ব্রহ্মানন্দকে আমেরিকায় লইয়া যাইবার জন্য তিনি আগ্রহান্বিত হইলেন। তথায় তাঁহার নিবাসের জন্য গৃহটিকে ত্রিতল করা হইল।

উহার ছাদ ও শিখরাদি প্রস্তুত হইলে তিনি সমগ্র মন্দিরের পুনরায় উৎসর্গ অনুষ্ঠান করেন ১৯০৮ খ্রীঃ ৫ই এপ্রিল। উক্ত দিবস সন্ধ্যার জন্য বিশেষ কার্য্যসূচী প্রস্তুত হইল। সঙ্গীত, বাদ্য, আবৃত্তি ও প্রসাদ বিতরণ প্রভৃতির আয়োজন ছিল। নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্বে সভাগৃহ পরিপূর্ণ হইল এবং শত শত শ্রোতা তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারিয়া ফিরিয়া গেলেন। অনুষ্ঠানান্তে তিনি শ্রোতৃবর্গকে তৃতীয় তলে যাইয়া আরাত্রিক দেখিতে অনুরোধ করিলেন। তিনি নিজেই ঠাকুরের ছবির সম্মুখে ভক্তিভরে আরাত্রিক করিলেন। ইহা দেখিয়া শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ে আনুষ্ঠানিক হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে সুন্দর ধারণা জন্মিল।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ ভারতের কাজ ছাড়িয়া আমেরিকায় যাইতে সম্মত হইলেন না। তখন স্বামী ত্রিগুণাতীত পেটার্সন দম্পতীর আগ্রহে হিন্দু মন্দিরের ত্রিতলে স্বামী ব্রহ্মানন্দের জন্য নির্দিষ্ট কক্ষে বাস করিতে লাগিলেন। তথায় দুইমাস থাকিবার পর সমগ্র ত্রিতলকে মঠে পরিণত করিবার সংকল্প তাঁহার মনে জাগিল। কয়েকটি যুবক নিয়মিতভাবে সমিতির সকল অধিবেশনে ও বক্তৃতাদিতে যোগদান করিতেছিলেন। তন্মধ্যে একজন মন্দিরের একতলস্থ কক্ষে ছয়মাস ধরিয়া আশ্রয় লইয়াছিলেন। স্বামিজী মঠবাসী হইবার জন্য যাঁহাকে যাঁহাকে মনোনীত করিলেন তাঁহারা মঠবাস করিতে সম্মত হইলেন। এইরূপ দশজন নবমঠে যোগদান করিলেন। তৎপরেও কেহ কেহ আসিলেন, কিন্তু দীর্ঘকাল থাকিলেন না। তথাপি মঠবাসীর সংখ্যা গড়ে দশজনই রহিল। মঠবাসী তরুণগণ পূর্ববৎ স্ব স্ব জীবিকা অর্জন করিতেন এবং তাঁহাদের আহারাদির জন্য খরচ দিতেন। কিন্তু ভারতে মঠবাসী ব্রহ্মচারীদের ন্যায় তাঁহাদের জীবন স্বামী ত্রিগুণাতীতের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইল। তাঁহারা ভোর চারটার সময় উঠিয়া এক ঘণ্টা জপ ধ্যানে কাটাইতেন। পাঁচটায় প্রাতঃস্নানান্তে ঘর ঝাঁট দেওয়া ও পরিষ্কার করা এবং ফুল গাছে জল দেওয়া প্রভৃতি কার্য্য হইত। প্রত্যেকে নিজ নিজ বাসন-কোসন ও পোষাক-পরিচ্ছদ ধুইতেন এবং স্ব স্ব কক্ষ পরিষ্কার রাখিতেন। আবার প্রত্যেককে মন্দিরের সাধারণ কার্য্যও কিছু-কিছু করিতে হইত। স্বামিজী মঠবাসীদিগকে বুঝাইলেন যে, মন্দির-সংক্রান্ত সকল কর্মই শুভ ও পবিত্র।

ঈশ্বর-সেবার ভাবে সে সকল কার্য্য করিলে চিত্ত শুদ্ধ ও ধ্যান গভীর হইবে। তাঁহার প্রেরণায় ও নির্দেশে প্রত্যেকে ভারতীয় ব্রহ্মচারীর মত জীবন যাপন করিবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিলেন। অচিরে মঠটি ভিতরে ও বাহিরে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার অনুকরণীয় নিদর্শন হইয়া উঠিল।

মঠবাসিগণের দিবারাত্রিতে দুইবার প্রধান আহার হইত। স্বামী ত্রিগুণাতীত আহার দুইটিকে প্রাতঃ ও সান্ধ্য সেবা বলিতেন। আহারের প্রারম্ভে একটি আবৃত্তি হইত এবং পরে কয়েক মিনিট নীরব ধ্যান চলিত। প্রত্যেক মঠবাসী পালা করিয়া পৃথিবীর অন্যতম ধর্মশাস্ত্র আহার-কালে পাঠ করিতেন। পাঠের পরে তিনি যে সকল প্রশ্ন তুলিতেন স্বামী ত্রিগুণাতীত সেগুলির যথাযথ উত্তর সংক্ষেপে দিতেন। সৎপ্রসঙ্গের প্রভাবে আহারও ধর্ম-সাধনায় পরিণত হইত এবং ছাত্রগণ তখন অমৃতত্বপ্রদ আহার্য্য ও পানীয় গ্রহণ করিতেন। আহার-কালে তাঁহারা স্বামী ত্রিগুণাতীতের মুখে ঠাকুরের জীবনের ঘটনাবলী এবং তাঁহার শিষ্যশিক্ষা পদ্ধতি প্রভৃতি বিষয় শুনিবার সুযোগ পাইতেন। স্বামী ত্রিগুণাতীত পুনঃপুনঃ তাঁহাদিগকে বলিতেন যে, আহারও একটি পুণ্য কার্য্য এবং উপাসনার অঙ্গীভূত হইবার যোগ্য। উক্ত ভাবে আহার করিলে কায়িক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সহজে হয়। উক্ত মঠে সর্বপ্রকার আমিষ আহার নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু বিভিন্ন নিরামিষ তরকারী হিন্দু এবং মার্কিণ প্রথায় প্রস্তুত ও পরিবেশিত হইত।

স্বামী ত্রিগুণাতীত প্রেরণাদায়ক নীতিবাক্যসমূহ খুব ভালবাসিতেন। যখন কেহ আহারকালে মার্কিণ গণতন্ত্রের এই মহান্ নীতিবাক্যটি আবৃত্তি করিতেন, "নিরবচ্ছিন্ন সতর্কতাই স্বাধীনতার মূল্য" তখন তিনি তাঁহাকে উক্ত বাক্য তিনবার আবৃত্তি করাইয়া বলিতেন, "শ্রীমা সর্বদা এই সকল বাক্যের অজস্র প্রশংসা করিতেন। কারণ, এইগুলি প্রত্যেক দেশের মহাপুরুষের বাণী এবং স্বভাবতঃই গভীর ভাবপূর্ণ।" সভাগৃহের বিজ্ঞপ্তি ফলকে (sign board) যে সকল সাপ্তাহিক বিজ্ঞপ্তি লাগান হইত সেগুলি ছাপিবার জন্য বেদান্ত সমিতির একটি রবার-নির্মিত ক্ষুদ্র মুদ্রণযন্ত্র ছিল। স্বামী ত্রিগুণাতীতের একটি

ছাত্র মুদ্রাকর ছিলেন। তিনি উক্ত ছাত্রকে উপরোক্ত এবং অন্যান্য নীতি-বাক্যগুলি স্বহস্তে ছাপাইয়া মঠের প্রত্যেক কক্ষে টাঙ্গাইতে আদেশ দিলেন। যে সকল নীতিবাক্য তাঁহার খুব প্রিয় ছিল তন্মধ্যে কয়েকটি এখানে উদ্ধৃত হইল।—(১) সাধুর মত জীবন যাপন করবে, কিন্তু ঘোড়ার মত কাজ করবে। (২) এই কাজটি এখনি কর। (৩) সদা সজাগ থাক ও প্রার্থনা কর। যে শিষ্যের মন সন্দেহ-দোলায় আন্দোলিত হইত তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া তিনি এই নীতিবাক্যটি পুনঃপুনঃ বলিতেন, (৪) "কর বা মর, কিন্তু করলে তুমি মরবে না।"

স্বামী ত্রিগুণাতীত মঠবাসীদিগকে প্রচুর পুষ্টিকর আহার্য্য সরবরাহ করিতেন। প্রত্যেক মঠবাসীর স্বাস্থ্যের দিকে তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। তিনি প্রত্যেককে পেট ভরিয়া খাইতে এবং যথেষ্ট ব্যায়াম করিতে উৎসাহ দিতেন।

স্বামী ত্রিগুণাতীত পূর্ণভাবে বিশ্বাস করিতেন যে, সঙ্গীত ধর্মসাধনার একটি উত্তম অঙ্গ। প্রায়ই তিনি মঠবাসী তরুণগণকে মন্দিরের ছাদে অতি প্রত্যুষে লইয়া যাইতেন ভক্তিমূলক সঙ্গীত গাহিতে এবং স্তোত্রাদি আবৃত্তি করিতে। মন্দির হইতে মাত্র আধ মাইল দূরে সানফ্রান্সিস্কো উপসাগর অবস্থিত। কখনো কখনো তিনি তথায় যুবকদিগকে লইয়া যাইতেন প্রাতঃকালীন ধ্যান ও ভজনাদির নিমিত্ত। এত ভোরে সমুদ্রতীরে বা উপসাগরে কাহাকেও দেখা যাইত না; কেবলমাত্র মাছ ধরিতে মোটর বোটে চড়িয়া মৎস্যজীবীরা যাইত এবং কদাচিৎ দুই একটা জাহাজ নঙ্গর তুলিয়া চলিত। স্বভাবতঃই বায়ুমণ্ডল তখন নীরব ও নিস্তব্ধ থাকিত। মঠবাসীদের সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর বিস্তীর্ণ উপসাগরের ধীর স্থির জলরাশির উপর দিয়া তরঙ্গায়িত হইত এবং নিশ্চয়ই শ্রবণকারী নাবিকগণ ও মৎস্যজীবীদের কর্ণে আশ্চর্য্যজনকরূপে স্পন্দিত হইত। রবিবারের সান্ধ্য উপাসনাতেও কয়েকটি তরুণ গীত ও বাদ্য করিতেন।

নিয়মানুগত্য ও সময়ানুবর্ত্তিতার অসামান্য দৃষ্টান্ত ছিলেন স্বামী ত্রিগুণাতীত। রাত্রিতে সকলের শেষে তিনি শয্যায় যাইতেন, কিন্তু সর্বাগ্রে শয্যাত্যাগ করিতেন। মঠবাসীগণ তাঁহার চারিত্রিক কঠোরতা ও মানসিক দৃঢ়তা দর্শনে বিস্মিত হইতেন। প্রত্যেকের চরিত্র গঠনে তিনি অতিশয় মনোযোগী

ছিলেন। কাহারো চরিত্রে কোন ক্রটী দেখিলে কঠোর শাসনে তাহা দূরীভূত করিবার জন্য তিনি চেষ্টিত হইতেন। স্বামী বিবেকানন্দের মত তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, উৎকৃষ্ট চরিত্রই ধর্মজীবনের প্রকৃত ভিত্তি। তাঁহার নির্ভীকতা ছিল অসাধারণ। তিনি যখন যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিতেন তাহা করিবার জন্য কাহারো মুখাপেক্ষী হইতেন না, বা ফলাফলের কথা ভাবিতেন না। কখনো কখনো উক্তরূপ প্রচেষ্টার ফল অপ্রীতিকর হইত। কিন্তু ইহাতে তিনি আদৌ পশ্চাৎপদ হইতেন না। যথার্থ শিষ্যকে তিনি বলিতেন, "আমি তোমার দেহের প্রত্যেক অস্থি ভাঙ্গিয়া ফেলিতে আদৌ ইতস্ততঃ করিব না, যদি তাহার দ্বারা আমি তোমাকে অমৃত সাগরের তীরে টানিয়া লইয়া যাইতে পারি এবং তন্মধ্যে নিক্ষেপ করি। কারণ তাহা হইলেই আমার কর্ত্তব্য শেষ হইবে।"

কেহ কেহ সাধুদের জীবনী পড়িয়া সাধু জীবন যাপনার্থ তাঁহার শরণাগত হইতেন। স্বামী ত্রিগুণাতীত তাঁহাদিগকে কিছুকাল মঠবাস করিতে উপদেশ দিতেন। যাঁহারা মঠবাসে সম্মত হইতেন তাঁহাদিগকে নির্জন বাসের প্রস্তুতি স্বরূপ একই কক্ষে অন্যের সহিত বাস করিতে দেওয়া হইত। কিন্তু একই কক্ষে থাকিলেও কেহ অন্যের সঙ্গে কথা বলিতে পারিতেন না। সুতরাং অনেকের সঙ্গে থাকিয়াও প্রত্যেকে একক বাসের নির্জনতা অনুভব করিতেন। স্বামী ত্রিগুণাতীতের মতে বাক্-সংযম ও নির্জন বাস ধর্মজীবনের প্রথম সোপান। কিন্তু অনেকেই বাক্-সংযম সাধনে অসমর্থ হইয়া মঠ ত্যাগ করিতেন।

স্বামী ত্রিগুণাতীতের জীবন আত্মত্যাগ ও সংযম সাধনার নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহবৎ ছিল। যাঁহারা তাঁহার পূত সঙ্গলাভের সুযোগ পাইয়াছিলেন তাঁহাদের সংশয় ও অশান্তি সূর্য্যোদয়ে তুষারতুল্য দ্রবীভূত হইয়া যাইত। তিনি সর্বদা জগন্মাতার সভক্তি স্মরণ-মননে নিমগ্ন থাকিতেন এবং দিব্যভাবালোক তাঁহার জীবন হইতে নিরন্তর বিকীর্ণ হইত। তিনি আত্মসংযমের অদ্ভুত উদাহরণ ছিলেন। প্রাতঃকাল হইতে গভীর রাত্রিতে নিদ্রাগমন পর্য্যন্ত তাঁহার জাগ্রত কাল নিরবচ্ছিন্ন কর্মসংকুল থাকিত। সন্ন্যাসীর আদর্শ তিনি স্বীয় জীবনে সদা অক্ষুণ্ণ রাখিতেন। নানা অসুখ সত্ত্বেও তিনি মন্দির অফিসের মেজেতে পাতলা তোষক পাতিয়া

শুইতেন। রান্নাঘরের বিপরীত দিকে যে কক্ষ ছিল উহার দেওয়ালে কয়েক খানা দড়ি টাঙ্গান ছিল। এই সকল দড়ি হইতে বিভিন্ন আকার ও প্রকারের অনেকগুলি কৃত্রিম মাকড়সা ঝুলান থাকিত। সেগুলি জীবন্ত মাকড়সার মত দেখাইত। মঠবাসী তরুণগণ ভাবিত, কক্ষের শোভাবৃদ্ধির জন্য এইগুলি রক্ষিত আছে। দুই একজন এই ব্যাপারটী অন্যভাবেও বুঝিতেন। জিজ্ঞাসিত হইয়া স্বামী ত্রিগুণাতীত কৃত্রিম মাকড়সা রাখার কারণ এইরূপে বলিয়াছিলেন। শৈশব হইতে মাকড়সার প্রতি তাঁহার অব্যক্ত ভীতি ছিল। শিশুকালে একবার গঙ্গায় স্নান করিবার কালে তিনি জলীয় মাকড়সার জালে আবদ্ধ হন। উক্ত জালে লক্ষ লক্ষ মাকড়সা ছিল। সেই জাল হইতে মুক্ত হইবার জন্য তাঁহাকে প্রাণপণ সংগ্রাম করিতে হয়। তখন হইতে মাকড়সা-ভীতি তাঁহার মনে বদ্ধমূল হইয়া যায়। এই ভীতি নিবারণের জন্যই তিনি কৃত্রিম মাকড়সা উপরোক্ত কক্ষে রাখিয়াছিলেন। রোজ বহু বার যাহা দেখা যায় তাহার প্রতি আর ভয় থাকে না। স্বামী ত্রিগুণাতীতের দৈনিক জীবন কর্মময় ছিল। তদুপরি তিনি মঠবাসীদের জন্য সকল আহার স্বহস্তে প্রস্তুত করিতেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, বিশুদ্ধ আহার গ্রহণ করিলে দেহমন শুদ্ধ হয় এবং দেহমন শুদ্ধ না হইলে ধর্মজীবনের ভিত্তি সুদৃঢ় হয় না।

১৯০৬ খ্রীঃ মার্চ মাসে হিন্দু মন্দিরে এই শুভ সংবাদ আসিল যে, স্বামী প্রকাশানন্দ স্বামী ত্রিগুণাতীতের সহকারীরূপে ভারত হইতে সানফ্রান্সিস্কোতে আসিবেন। উক্ত বৎসর ২রা আগষ্ট বৃহস্পতিবার স্বামী প্রকাশানন্দ হিন্দু মন্দিরে উপস্থিত হইলেন, এবং একতলায় স্বামী ত্রিগুণাতীতের অফিস-কক্ষের পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষে বাস করিতে লাগিলেন। তিনি প্রথমতঃ মঠবাসী তরুণদের সঙ্গে বসিয়া সকালে ও বিকালে আহার করিতেন। ক্রমে আহার প্রস্তুতি ও পরিবেশনের ভার তিনি লইলেন। তবে স্বামী ত্রিগুণাতীত স্বয়ং রবিবারসমূহে একটি বিশেষ খাদ্য প্রস্তুত করিতেন। রবিবারে হিন্দু মন্দিরে যে তিনটি বক্তৃতা প্রদত্ত হইত তন্মধ্যে একাধিক বক্তৃতা স্বামী প্রকাশানন্দ দিতে আরম্ভ করিলেন। স্বামী প্রকাশানন্দের অম্লান প্রফুল্লতা ও গভীর প্রীতিশীলতা

সকলকে মুগ্ধ করিল। তাঁহার অকুণ্ঠিত সহকারিতায় স্বামী ত্রিগুণাতীতের প্রাণপাতী পরিশ্রম কিঞ্চিৎ লাঘব হইল। ১৯১৩ খ্রীঃ হইতে মঠবাসীদের সংখ্যা হ্রাস পাইল এবং স্বামী ত্রিগুণাতীতের মহাসমাধির পরই মঠ বন্ধ হইয়া গেল।

জনৈক মঠবাসীর নাম ছিল জোসেফ হরভাথ। তিনি হাঙ্গেরীয় এবং আমেরিকাপ্রবাসী ছিলেন। তিনি মুদ্রাকররূপে কোন ছাপাখানায় কাজ করিতেন। তাঁহাকে অবৈতনিক কর্মীরূপে পাইয়া হিন্দুমন্দিরের একতলায় একটী ছাপাখানা খুলিবার ইচ্ছা হইল স্বামী ত্রিগুণাতীতের। ছাপাখানার আবশ্যকীয় জিনিষপত্র সংগৃহীত এবং মুদ্রণ-কার্য্য আরম্ভ হইল। রবিবাসরীয় বক্তৃতাদির বিজ্ঞাপন এবং অন্যান্য সামান্য ছাপার কাজ তখন আবশ্যক হইত। রবিবারের বক্তৃতাসমূহকে ক্রমশঃ পুস্তিকাকারে প্রকাশের ব্যবস্থা হইল। যাঁহারা হিন্দু মন্দিরের বক্তৃতাদিতে যোগদানে অক্ষম সেই সকল দূরস্থ ও কর্মব্যস্ত বন্ধুদিগের নিকট বেদান্ত-বাণী প্রেরণার্থ স্বামী ত্রিগুণাতীত একটী পত্রিকা প্রকাশের সংকল্প করিলেন। পত্রিকার জন্য একাধিক নাম প্রস্তাবিত হইল। কিন্তু স্বামী ত্রিগুণাতীত উহার নাম রাখিলেন "ভয়েস অব ফ্রিডাম" (মুক্তির বাণী)। উহার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৯০৯ খ্রীঃ এপ্রিল মাসে এবং শেষ সংখ্যা ১৯১৬ খ্রীঃ মার্চ মাসে। পত্রিকাখানি ক্রমাগত প্রায় সাত বৎসর চলিয়াছিল।

উক্ত পত্রিকায় বেদান্তদর্শন এবং হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে সারগর্ভ প্রবন্ধাবলী প্রকাশিত হইত। ইহার ফলে তিন বৎসরের মধ্যে পত্রিকার গ্রাহক-সংখ্যা বাড়িল এবং উহা স্বাবলম্বী হইল। কথামৃতকার মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের অনুমোদন লইয়া স্বামী ত্রিগুণাতীত কথামৃতের একটি আমেরিকান সংস্করণ প্রকাশ করেন। উহা আমেরিকার ধর্মপিপাসুগণের প্রভূত সমাদর লাভ করিল। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য অনেক পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছিল। মিঃ হরভাথ ১৯১৪ খ্রীঃ পিতামাতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য হাঙ্গেরীতে গেলেন। তাঁহার স্থলে উপযুক্ত অভিজ্ঞ কর্মী পাওয়া গেল না। বেদান্ত সমিতির জনৈক সদস্য মিঃ

সি. এই. ফ্রেঞ্চের একটি ছাপাখানা ছিল। স্বামী ত্রিগুণাতীত হিন্দুমন্দিরের মুদ্রাযন্ত্রটি তাঁহাকে এই সর্তে দিলেন যে, তিনি উহার মূল্যরূপে 'ভয়েস অব ফ্রিডাম'খানি ছাপাইয়া দিবেন। মিঃ ফ্রেঞ্চ তদনুযায়ী বিশ্বস্তভাবে ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাস পর্যন্ত পত্রিকাখানি ছাপাইয়া দিলেন। তৎপরে পত্রিকা আর প্রকাশিত হয় নাই।

একদল স্ত্রীভক্তের আন্তরিক আগ্রহে একটি নারীমঠ প্রতিষ্ঠিত হয়। হিন্দু-মন্দিরের অদূরে এই উদ্দেশ্যে একটি বাড়ী ভাড়া করা হইল। কয়েকটি স্ত্রীভক্ত স্বামী ত্রিগুণাতীতের তত্ত্বাবধানে সন্ন্যাসিনীর জীবন যাপনার্থ মঠবাস করিতে লাগিলেন। পুরুষ-মঠের ন্যায় নারী-মঠেরও নিয়মাবলী রচিত হইল। স্বামী ত্রিগুণাতীতের প্রেরণা, উপদেশ ও পরিচালনায় অধিবাসিনীগণ সাধ্যমত সন্ন্যাসিনীর জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। রন্ধনাদি গৃহকর্ম তাঁহারা সাধনার ভাবে করিতেন এবং একনিষ্ঠভাবে নিয়মাবলী মানিয়া চলিতেন। তাঁহারা দিনের বেলা অন্যান্য কাজ করিয়া স্ব স্ব জীবিকা অর্জন করিতেন এবং সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী ও পরম সুখী ছিলেন। মার্কিণ মহিলাদের মধ্যে হিন্দু সন্ন্যাসিনীর আদর্শ প্রচারার্থ উক্ত নারী-মঠ কিঞ্চিৎ কৃতকার্য্য হইয়াছিল। কিন্তু অসংখ্য অনিবার্য্য কারণে ১৯১২ খ্রীঃ উহা উঠিয়া যায়।

স্বামী বিবেকানন্দ যখন দ্বিতীয় বার আমেরিকায় গিয়াছিলেন তখন তাঁহার অন্যতমা শিষ্যা কুমারী মিনি সি. বুক তাঁহাকে ১৬০ একর পার্বত্য ভূমি আশ্রম স্থাপনার্থ প্রদান করেন। আমেরিকার বিশ্ববিখ্যাত লিক মানমন্দির কালিফোর্নিয়া প্রদেশের হ্যামিল্টন পাহাড়ে অবস্থিত। উল্লিখিত পাহাড়ের দক্ষিণপূর্ব কোণে আঠার মাইল দূরে সান আন্তোন উপত্যকায় উক্ত বিশাল ভূমিখণ্ড বিদ্যমান। তথায় স্বামিজীর নির্দেশে স্বামী তুরীয়ানন্দ শান্তি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ ১৯০২ খ্রীঃ জুন মাসে ভারতে প্রত্যাগত হইলে স্বামী অতুলানন্দ উক্ত আশ্রম পরিচালনা করেন। সানফ্রান্সিস্কোস্থিত হিন্দু মন্দিরের শাখাকেন্দ্র-রূপে শান্তি আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে ত্রিগুণাতীত কয়েকটি ছাত্রছাত্রী লইয়া শান্তি আশ্রমে যাত্রা করেন। তাঁহারা সানজোস নামক

স্থানে রাত্রিযাপনান্তে পর দিন পল গার্বারের দুইখানি বড় গাড়ীতে উঠিলেন। শান্তি আশ্রমের পাঁচ মাইল দূরে পল গার্বার বাস করিতেন। তিনি পূর্বেও এইরূপে ছাত্রছাত্রীগণকে শান্তি আশ্রমে লইয়া গিয়াছিলেন। তিনি স্বামী তুরীয়ানন্দকে যেমন শ্রদ্ধা করিতেন তেমনি স্বামী ত্রিগুণাতীতকেও গভীর শ্রদ্ধা করিতে লাগিলেন এবং শান্তি আশ্রমের জন্য কিছু করিতে পারিলে আনন্দিত হইতেন। সানজোস সহর হইতে লিক মানমন্দির বাইশ মাইল দূরে। পথে সান্তা ক্লারা উপত্যকার মনোরম আঙ্গুরাদি ফলের বাগান। তথা হইতে তুষারমণ্ডিত সিরা পর্বত দৃষ্টিগোচর হয়। লিক মানমন্দিরের বহু কর্মী ও গবেষক স্বামী ত্রিগুণাতীতের বন্ধু ও ভক্ত হইয়াছিলেন। শান্তি আশ্রমে উপস্থিত হইয়া তিনি ছাত্রছাত্রীগণের সহিত দুইদিন বিশ্রাম করিলেন। তৃতীয় দিবস হইতে আশ্রমের দৈনন্দিন কার্য্যসূচী অনুসৃত হইল।

ভোর ৩-৪৫ মিনিটে গুরুদাস মহারাজ মধুর স্বরে ওঁ উচ্চারণ করিতে করিতে এক কেবিন হইতে অন্য কেবিনে যাইয়া ছাত্রছাত্রীগণকে জাগাইতেন। চারটা হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত ছাত্রছাত্রীগণ নিদ্রা ত্যাগ করিয়া শয্যায় বসিয়া ধ্যানাভ্যাস করিতেন। পাঁচটা হইতে আটটা পর্য্যন্ত প্রত্যেকে প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে স্ব স্ব কর্তব্যপালনে অগ্রসর হইতেন। ব্যক্তিগত সামর্থ্য অনুসারে প্রত্যেকে আশ্রমের কাজ কর্ম করিতেন। ছাত্রীরা রন্ধনাদিতে এবং ছাত্রগণ কূপ হইতে আবশ্যকীয় জল তোলা, জ্বালানি কাঠ কাটা এবং অন্যান্য কাজে নিযুক্ত হইতেন। আটটা হইতে নয়টা প্রাতরাশ এবং নয়টা হইতে দশটা পর্য্যন্ত এক ঘণ্টা ব্যক্তিগত বিশ্রাম ও কার্য্য চলিত। দশটা হইতে ধ্যান ঘরে সকলে স্বামী ত্রিগুণাতীতকে ঘিরিয়া ধ্যান করিতেন। এগারটা হইতে বারটা স্বামী ত্রিগুণাতীত কর্তৃক যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ পাঠ ও ব্যাখ্যা। বারটা হইতে দুইটা বিশ্রাম। দুইটা হইতে তিনটা বৈকালিক ধ্যান। তিনটা হইতে চারটা বিশ্রাম। চারটা হইতে পাঁচটা আহার এবং স্বামী ত্রিগুণাতীত কর্তৃক গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা। পাঁচটা হইতে সাতটা বিভিন্ন কার্য্য ও বিশ্রাম। সাতটা হইতে আটটা ধ্যানঘরে মিলিত ধ্যান। আটটা হইতে নয়টা 'শ্রীরামকৃষ্ণ

কথামৃত' বা স্বামী বিবেকানন্দ রচিত 'সন্ন্যাসীর গীতি' পাঠ ও আলোচনা। অবশেষে রাত্রি দশটায় আলো নিবাইয়া সকলে নিদ্রা যাইতেন।

চতুর্থ দিবস হইতে তিন দিন স্বামী ত্রিগুণাতীত উপবাসে ও ধ্যানজপে কাটাইলেন। মাঝে মাঝে তাঁহার সিংহোপম আকৃতিকে প্রাঙ্গনের বৃক্ষতলে দেখা যাইত। ঐ সময় কেহ তাঁহার কাছে যাইতেন না, বা কথা বলিতে পারিতেন না এবং তিনি শাস্ত্র-ব্যাখ্যাদি বা আশ্রমের কোন কাজও করিতেন না। আহারের পূর্বে গীতার 'ওঁ ব্রহ্মার্পণম্' শ্লোকটি সকলে সমস্বরে আবৃত্তি করিতেন। আহারান্তেও সংস্কৃত শান্তিপাঠ করা হইত। স্বামী ত্রিগুণাতীতের মতে আহার আধ্যাত্মিক জীবনের একটি প্রধান অঙ্গ।

একদা সান্ধ্য আহারকালে ভগবদ্ গীতার ব্যাখ্যা আরম্ভ হইবার পূর্বেই ছাত্রছাত্রীগণের গল্প-গুঞ্জন সুরু হইল। স্বামী ত্রিগুণাতীত কয়েক মিনিট অপেক্ষা করিলেন, কিন্তু গল্প-গুজব থামিল না। তখন তিনি সকলকে তিরস্কারের সুরে বলিলেন, "পশুরা কৃতজ্ঞতার সহিত তাহাদের ক্ষুধানিবৃত্তির জন্য আহার করে। কিন্তু আমরা পশুতুল্যও আহার করিতেছি না! আহারকালে ভগবানের নাম কর, যাহাতে এই সময়ে সর্বমঙ্গলের আকর ঈশ্বরকে আমরা বিস্মৃত না হই।" মঠবাসী তরুণগণকে এই ভাবে অভ্যস্ত করিবার জন্য স্বামী ত্রিগুণাতীত তাঁহাদের আহারকালে ধর্মগ্রন্থ পাঠ, স্তোত্রাদি আবৃত্তি ও সৎপ্রসঙ্গ করিতেন এবং পরে নিজে পৃথক্ স্থানে খাইতে বসিতেন। ব্যক্তিগত মৌন ভাব, উপবাস ও স্বেচ্ছাকৃত কঠোরতা অভ্যাসের জন্য একটী দিন নির্দিষ্ট থাকিত। যাঁহারা এই ব্রত উদ্‌যাপনে সম্মত হইতেন তাঁহারা সমগ্র চব্বিশ ঘণ্টা ধ্যানজপ ও ধর্মগ্রন্থ পাঠ ও সচ্চিন্তায় কাটাইতেন। কিন্তু ব্রতী উক্ত দিন নিদ্রিত বা শায়িত থাকিতে পারিত না। কোন ব্রতী কি ভাবে দিবারাত্রি অতিবাহিত করিবেন তাহার কর্মসূচী স্বামী ত্রিগুণাতীতই প্রস্তুত করিয়া দিতেন ব্যক্তিগত শারীরিক ও মানসিক সামর্থ্য অনুসারে। যাঁহারা আন্তরিকতার সহিত উক্ত ব্রত পালন করিতেন তাঁহাদের কেহ কেহ চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই

অলৌকিক অনুভূতি ও দর্শনাদি লাভ করিতেন। ইহার ফলে তাঁহাদের সন্দেহ দূরীভূত, আগ্রহ চরিতার্থ এবং উৎসাহ সম্বর্ধিত হইত।

নিদ্রা-বাক্যাহারের সংযমহেতু দেহমনের যে ক্লান্তি হইত তাহা অপনোদনের জন্য বুধবার ও শনিবার বৈকালদ্বয় ছুটী থাকিত। অপরাহ্ণদ্বয়ে আশ্রমে নির্দোষ হাস্যকৌতুকের স্রোত বহিত। স্বামী ত্রিগুণাতীতই হাস্যকৌতুকের প্রধান নায়ক ছিলেন। সকলের দেহমন সুস্থ রাখিবার জন্য তিনি প্রত্যেকের উপর সস্নেহ দৃষ্টি রাখিতেন; এবং কাহাকেও অতিশয় কঠোরতার প্রশ্রয় দিতে বলিতেন না। পূর্ণিমার রাত্রিতে আশ্রম প্রাঙ্গনে ধূনি প্রজ্বলিত হইত। হুতাশনের চারিদিকে বসিয়া সকলে স্বামী ত্রিগুণাতীতের আলোচনা ও আবৃত্তি শুনিতেন এবং জপ ধ্যান করিতেন। তীব্র শীত সত্ত্বেও সকলে একটী মাস শান্তি আশ্রমে মহানন্দে কাটাইলেন। এক মাস সাধুসঙ্গ, তপস্যা ও নির্জন বাসের ফলে প্রত্যেকের জীবন ধর্মভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিল। কাহারো কাহারো জীবনে এত আধ্যাত্মিক প্রেরণা আসিল যে, তাঁহারা আশ্রম ছাড়িয়া গৃহাভিমুখে যাইতে অনিচ্ছুক হইলেন।

ইহার পরে প্রত্যেক বৎসর স্বামী ত্রিগুণাতীত একদল ছাত্রছাত্রীকে যোগাভ্যাসের জন্য শান্তি আশ্রমে লইয়া যাইতেন। ১৯০৬ খ্রীঃ স্বামী ত্রিগুণাতীত ও স্বামী প্রকাশানন্দ উভয়েই ছাত্রছাত্রীদের সহিত শান্তি আশ্রমে গিয়াছিলেন। বহু সংস্কৃত স্তব স্বামী প্রকাশানন্দের কণ্ঠস্থ ছিল। আহার কালে প্রায়ই তাঁহার সুমধুর আবৃত্তি শোনা যাইত। তিনি কয়েকটি ক্লাশও লইতেন। দ্বিতীয় সপ্তাহে অমাবস্যা রাত্রিটী সেই বৎসর প্রথম ধূনি-রাত্রিরূপে স্বামী ত্রিগুণাতীত কর্তৃক নির্দিষ্ট হইল। কোনও পূর্ব বারে স্বামী ত্রিগুণাতীত শান্তি আশ্রমে গিয়াছিলেন ধূনির জন্য একটী পর্বতশিখর নির্বাচন করিতে। সর্বোচ্চ শিখর নির্বাচিত হইলে তিনি স্বহস্তে একটী ক্ষুদ্র কুঠার দিয়া আশ্রম হইতে সুদূর শিখর পর্যন্ত সরু পথ প্রস্তুত করেন। এইবার তিনি কোন ছাত্রকে নির্দেশ দিলেন, তৎকৃত সরু পথকে বিস্তৃততর ও সমতল করিতে। শৃঙ্গদেশে ধূনি জ্বলিবার ও ছাত্রছাত্রীদের বসিবার স্থানও পরিষ্কৃত হইল। মধ্যে উন্নত সুবৃহৎ মৃণ্ময়

ত্রিকোণ এবং তাহার চতুর্দিকে বৃত্তাকার গর্ত। ত্রিকোণ মৃৎপিণ্ডের উপর সারা রাত্রি ধূনি জ্বলিত। ত্রিকোণের চারি পার্শ্বে গভীর গর্ত থাকায় আগুন বাহিরে যাইতে পারিত না।

কেবিনসমূহ হইতে পর্বত শিখর পর্যন্ত আধ মাইল পথ। ছাত্রছাত্রীগণ একে একে একটী লণ্ঠন হাতে লইয়া স্বামী ত্রিগুণাতীতের পশ্চাদ্‌গমন করিলেন। লণ্ঠনসমূহের দীর্ঘশ্রেণী যখন বক্রপথে ঝোপ জঙ্গলের আড়ালে 'ধূনি গিরি'তে উঠিতে ছিল তখন পর্বতটী অপূর্ব শোভা ধারণ করিল। সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে প্রচুর ধূনিকাষ্ঠ শিখরদেশে বাহিত হয়। ছাত্রছাত্রীগণ আসন গ্রহণ করিবার পর অগ্নি প্রজ্বালিত হইল। অগ্নির দক্ষিণ দিকে দুই স্বামী, উত্তর দিকে ভক্তবৃন্দ এবং অন্য দুই দিকে স্ত্রীভক্তগণ বসিলেন। মন্ত্রোচ্চারণান্তে স্বামী ত্রিগুণাতীত ধূনির মহিমা কীর্তন করিলেন। তৎপরে গ্রন্থপাঠ-আবৃত্তি ও আলোচনায় পুরা তিন ঘণ্টা অতিবাহিত হইল। ইহার পর অগ্নি-ক্রিয়া। স্বামীদ্বয় ছাত্রছাত্রীগণকে সাতবার প্রদক্ষিণ করিলেন 'হরিবোল' বলিতে বলিতে। ছাত্রছাত্রীগণ অগ্নিকে বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। স্বামী ত্রিগুণাতীত প্রথমে মন্ত্রোচ্চারণ করিলেন, পরে ছাত্রছাত্রীগণ কর্তৃক উহার পুনরাবৃত্তি হইল। কিছু তৈল বা ঘৃত, এবং কিছু বন্য ফুল বা পত্র আনিবার জন্য প্রত্যেকে আদিষ্ট হইয়াছিলেন। প্রত্যেক মন্ত্রোচ্চারণের পর প্রত্যেকে কিছু তেল বা ফুল অগ্নিতে আহুতি দিলেন। প্রত্যেক আহুতির দ্বারা পরমার্থ জ্ঞানের পরিপন্থী অজ্ঞান ও আসক্তি ক্রমশঃ বিনষ্ট হইয়া গেল।

সারারাত্রিতে স্বামী প্রকাশানন্দ বহু সংস্কৃত স্তোত্র আবৃত্তি এবং উহাদের ইংরাজি অনুবাদ করিয়া শুনাইলেন। পাশ্চাত্য শ্রোতাদের কর্ণে সেগুলি স্বর্গীয় ঝঙ্কার সৃষ্টি করিল। হোমের পর স্বামী ত্রিগুণাতীতের নির্দেশে সকলে দীর্ঘ ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। ধ্যানান্তে সূর্যোদয় পর্যন্ত স্বামী ত্রিগুণাতীত ভারতীয় উপাখ্যান এবং শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনবৃত্তান্ত বলিলেন। গল্প বলিবার সময় মাঝে মাঝে তিনি কিছুক্ষণ করিয়া তূষ্ণী থাকিতেন। যখন দিবাকরের প্রথম রশ্মিজাল দেখিবার জন্য ছাত্রছাত্রীগণ সানন্দে দাঁড়াইয়া উঠিলেন তখন

তাঁহাদের নিম্ন দেশস্থ উপত্যকা ম্লান জ্যোৎস্নার অবর্ণনীয় সুষমায় উদ্ভাসিত হইয়াছিল। মধ্যরাত্রে দূর হইতে হোমাগ্নি দেখিয়া পার্বত্য সিংহ পুমা ভয়ে একবার চীৎকার করিয়াছিল। ভ্রাম্যমাণ বন্য কুকুর কোয়োটগুলির দীর্ঘ ডাক গভীর রাত্রে বহুবার শোনা গিয়াছিল উপত্যকা হইতে। সূর্য্যদেবের সোণালী কিরণে পূর্ব দিক আলোকিত হইলে সকলে দিবাকরকে প্রণাম করিলেন এবং আশ্রমের অভিমুখে নামিতে লাগিলেন। প্রাতরাশ গ্রহণান্তে সেই দিন বিশ্রামের জন্য নির্ধারিত হইল। এইরূপে স্বামী ত্রিগুণাতীত বহু বার হিন্দু মন্দির হইতে ছাত্রছাত্রীগণকে শান্তি আশ্রমে লইয়া যাইয়া ধর্মসাধনে নিযুক্ত করিতেন।

পঞ্চম বৎসরে গুরুদাস মহারাজ দীর্ঘকালবাঞ্ছিত ভারত-যাত্রার জন্য শান্তি আশ্রম হইতে বিদায় লইলেন। শান্তি আশ্রমে তাঁহার অপূরণীয় অভাব সকলেই অনুভব করিলেন। হিন্দু মন্দির হইতে আর একজন যুবক যাইয়া তাঁহার স্থানে কাজ করিতে লাগিলেন। শান্তি আশ্রমে আদি গৃহগুলি কাষ্ঠনির্মিত ছিল। সেগুলি কালক্রমে বাসের অযোগ্য হইয়া উঠিল, বাৎসরিক যাত্রীর সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। স্বামী ত্রিগুণাতীত নব গৃহ নির্মাণের সুব্যবস্থা করিলেন। জগদম্বার কৃপায় তাঁহার শুভ সংকল্প অচিরে সিদ্ধ হইল। উক্ত কার্য্যের জন্য আবশ্যকীয় অর্থ ও কর্মী পাওয়া গেল। ১৯০৯ খ্রীঃ জনৈক অভিজ্ঞ সূত্রধর স্বামী ত্রিগুণাতীতের শিষ্যত্ব বরণ করিলেন। তিনি শান্তি আশ্রমে থাকিয়া স্বীয় অভিজ্ঞতা কাজে লাগাইতে চাহিলেন। স্বামী ত্রিগুণাতীত ইহাতে সানন্দে স্বীকৃত হইলেন এবং তাঁহার সঙ্গে মঠবাসী অন্য দুইজনকে লইয়া সানফ্রান্সিস্কো হইতে শান্তি আশ্রমের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। আশ্রমের স্থায়ী উন্নতিকল্পে যে শুভ সংকল্প ত্রিগুণাতীতজীর মনে দীর্ঘস্থায়ী ছিল তাহা এতদিন পরে কার্য্যে পরিণত হইতে লাগিল।

আবশ্যকীয় জিনিষপত্র ও খাদ্যদ্রব্য জাহাজে পাঠান হইল। লিভারপুল পর্য্যন্ত। লিভারপুল হইতে পশ্চিম দিক দিয়া শান্তি আশ্রমে যাইবার পথ অপেক্ষাকৃত সুগম। সান জোস হইতে ইসাবেল রোড ধরিয়া হ্যামিল্টন পাহাড় অতিক্রমপূর্বক শান্তি আশ্রমে যাইবার পথ অতিশয় দুর্গম।

লিভারপুর হইতে পার্বত্য পথে জিনিষপত্র ৩৭ মাইল ওয়াগনে বাহিত হইত। ইহার প্রথম পনের মাইল পথ মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্যে পরিশোভিত। প্রাচীন কালিফোর্নিয়ার অন্যতম বিখ্যাত দস্যু জোয়াকিন মিউরিয়েটার বাসভূমি ও কর্মকেন্দ্র ছিল এই সুরম্য উপত্যকা। ইহার শেষ দশ মাইল পথ অতীব বন্ধুর ও বিপজ্জনক। অশ্বচালিত ওয়াগনগুলি এই স্থানে অনেক সময় উল্‌টাইয়া যাইত। মানুষ ও ঘোড়া উভয়ের পরিশ্রমে জিনিষপত্র আশ্রমে পৌঁছিল এবং জিনিষপত্র লইবার জন্য ওয়াগনগুলিকে কয়েকবার যাতায়াত করিতে হইল। আশ্রম-ভূমির এক এক অংশ অন্যান্য অংশ হইতে জঙ্গল ও গভীর নালা দ্বারা পৃথক্ ছিল। পুরুষগণ ও মহিলাদের জন্য পৃথক্ পৃথক্ কুটিরশ্রেণী নির্মিত হইল। পরবর্তী বৎসর ১৯১০ খ্রীঃ হিন্দু মন্দিরের সাধক-সাধিকাগণ আশ্রমে আসিয়া দেখিলেন, তাঁহাদের জন্য বাসোপযোগী ও স্বাস্থ্যকর কুটীরসমূহ প্রস্তুত হইয়াছে। প্রত্যেক কুটিরে স্বামী ত্রিগুণাতীতের অক্লান্ত নিঃস্বার্থ পরিশ্রমের নিদর্শন দেখা গেল।

বৃহৎ রান্নাঘর, ভোজনশালা, দুইটি ভাণ্ডার ঘর, গোশালা, অশ্বশালাদি নির্মিত হইল। শীতকালের জন্য খাদ্যদ্রব্য এবং শাক্‌সব্‌জীর বাগান করিবার জন্য যন্ত্রপাতি এবং ঘোড়া-গাড়ী প্রভৃতিও সংগৃহীত হইল। বিশ বৎসর পরে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে ঘোড়া-গাড়ীর পরিবর্তে মোটর ট্রাক করা হইয়াছে। পূর্বে দূরস্থ কূপ হইতে জল আনিতে হইত। তৎপরিবর্তে এখন নলকূপ, জলের চৌবাচ্চা, বায়ুচালিত শস্যপেষণ-যন্ত্র এবং রান্নাঘরে জলের কল প্রভৃতি দেখা যায়। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামীর জন্য একটি দ্বিকক্ষ কুটীর প্রস্তুত এবং তৎসহিত অধ্যয়নাগার ও শয়নকক্ষ নির্মিত হয়। আশ্রমের একদিকে ছাত্রদের জন্য বাসস্থান এবং অন্যদিকে ছাত্রীদের জন্য কুটীর-শ্রেণী বিদ্যমান। উভয় কুটীর-শ্রেণীর মধ্যে আশ্রমাধ্যক্ষের বাসকক্ষ। ধ্যানকক্ষের শীর্ষদেশে কাষ্ঠময় পতাকায় ক্ষোদিত আছে 'ওঁ রামকৃষ্ণ।' ইহা স্বামী ত্রিগুণাতীতের স্বহস্তে প্রস্তুত। ধুনিগিরিতে এবং আশ্রম-তোরণের দুইটি পতাকায় এইরূপ 'ওঁ রামকৃষ্ণ' লিখিত আছে।

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে ছাত্রছাত্রীগণের দৈনন্দিন কার্যসূচী এইভাবে চলিয়াছিল। ৩-৫৫ মিনিটে নিদ্রাত্যাগের জন্য বংশীধ্বনি। ৪টায় গাত্রোত্থানের জন্য পুনরায় বংশীধ্বনি। ৪।৩০—৫।৩০টা পর্যন্ত প্রথম সমবেত ধর্মপ্রসঙ্গ। ৭।৩০—৮।৩০ প্রাতরাশের সহিত গীতাপাঠ। ১০।৩০—১১।৩০ ছাত্রীদের জন্য পৃথক্ ক্লাস। ১২—১টা দ্বিতীয় সমবেত ক্লাস। ৩—৪টা সংস্কৃত শিক্ষা। ৪।৩০—৫।৩০টা সান্ধ্য আহার কালে ধর্মালোচনা। রাত্রি ৮—৯টা তৃতীয় সমবেত ক্লাস। ১০টায় আলোক নির্বাপন ও নিদ্রাগমন। কতিপয় বৎসর সকাল ছয়টায় ধ্যানঘরে সমবেত ধ্যান এবং সকল ক্লাস হইত। এই ধ্যানঘর স্বামী তুরীয়ানন্দের পূত স্মৃতিতে পুণ্য তীর্থে পরিণত। ধ্যানকক্ষ এবং আশ্রম-সীমানার মধ্যবর্তী একটি বৃহৎ ওক গাছ। ইহা বহু শাখা-প্রশাখা সমন্বিত হওয়ায় ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে তন্নিম্নে ধ্যান ও ক্লাস হইত। তদনুযায়ী স্বামী ত্রিগুণাতীত একটি নিম্ন কাষ্ঠমঞ্চ তথায় নির্মাণ করিলেন। উহাতে পঞ্চাশ জন লোক অনায়াসে বসিতে পারে। স্বামী ত্রিগুণাতীত ধ্যানের সময় সকাল ছয়টা হইতে ৪।৩০টায় পরিবর্তিত করিলেন। যে সকল ছাত্র-ছাত্রী ছয়টা বা সাতটার পূর্বে শয্যাত্যাগে অনভ্যস্ত ছিলেন তাঁহাদের পক্ষে ইহা নূতন অভিজ্ঞতা হইল। কিন্তু সকলে প্রফুল্লচিত্তে স্বামী ত্রিগুণাতীতের আদেশ পালনে বদ্ধ-পরিকর হইলেন। যখন সকলে স্ব স্ব কেবিন হইতে ধ্যানঘরে যাইতেন তখন চারিদিক বেশ অন্ধকার থাকিত এবং দূর হইতে কাহাকেও চেনা যাইত না। ওক গাছের শীর্ষে সাদা কালিতে বড় অক্ষরে 'ওঁ' লেখা ছিল। উহার নীচে কাষ্ঠমঞ্চের উপরে সকলে হিন্দু প্রথায় উপবেশন করিতেন।

মঞ্চটি উত্তর ও দক্ষিণে লম্বা ছিল। স্বামী ত্রিগুণাতীত উত্তরমুখী হইয়া দক্ষিণ পার্শ্বে বসিতেন একটি বড় চৌকীর উপর। তাঁহার সম্মুখে একটি ছোট ডেস্ক থাকিত, গ্রন্থাদি রাখিবার জন্য, এবং তৎপার্শ্বে উচ্চে রক্ষিত একটি কেরোসিন ল্যাম্প। স্বামী ত্রিগুণাতীত কিছুক্ষণ উচ্চ স্বরে গায়ত্রী উচ্চারণপূর্বক পাঠ আরম্ভ করিলেন। তাঁহার সুমধুর উচ্চারণ শ্রবণে প্রত্যেকের মনে আধ্যাত্মিক ভাবস্রোত প্রবাহিত হইত। এক ঘণ্টার মধ্যে প্রথমার্ধ ধ্যানে ও শেষার্ধ শাস্ত্র

পাঠে যাপিত হইত। স্বামী ত্রিগুণাতীত যখন উন্নত আসনে ক্ষীণালোকে ওক বৃক্ষতলে বসিয়া আবৃত্তি, পাঠ বা ধ্যান করিতেন তখন তাঁহার নিকট হইতে পবিত্র প্রশান্ত ভাব-জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হইয়া ছাত্রছাত্রীগণের হৃদয়-মন পরিপূর্ণ ও আলোকিত করিত। তদবস্থায় সেই নবীন হিন্দু ঋষিকে যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা তাঁহাকে কখনো ভুলিতে পারেন নাই। সূর্যোদয়ের কিঞ্চিৎ পূর্বে স্বামীজী কয়েক জনকে তালে তালে নিশ্বাস-প্রশ্বাস লইতে ও ফেলিতে অর্থাৎ প্রাথমিক প্রাণায়াম করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন। উক্ত অনুমতি দানকালে তিনি বলিয়াছিলেন, "ধ্যানকালে প্রাণায়াম ব্যতীত নিশ্বাস নিয়ন্ত্রিত হয়। মন শুদ্ধ হইলে নিশ্বাসের স্বাভাবিক গতি মন্থর হইয়া থাকে।"

সূর্যদেব দিক্-চক্রবালে উদিত হইলে স্বামী ত্রিগুণাতীত একটি সূর্য্য স্তব আবৃত্তি করিলেন এবং শিষ্যশিষ্যাদের বলিলেন, "তোমরা চোখ বুজিয়া ধ্যান কর এবং সুষুম্না-নাড়ীর মধ্য দিয়া মূলাধার হইতে আজ্ঞাচক্র পর্যন্ত সূর্যদেব প্রত্যেক চক্র ভেদ করিয়া উঠিতেছেন এইরূপ চিন্তা কর।" যখন ছাত্রগণ স্ব স্ব কেবিনে যাইতে প্রস্তুত হইলেন তখন ছাত্রীগণ দাঁড়াইয়া মিসেস পেটার্স'ন কর্তৃক রচিত একটি গান গাহিলেন। উক্ত গানের প্রথম পঙ্‌ক্তির ভাব এই—"হে জগন্মাতা, আমরা তোমার সন্তান।" ইহার পর ছাত্রগণও একটি ভক্তিমূলক সঙ্গীত গাহিলেন। তৎপরে প্রত্যেকে স্ব স্ব কর্মে নিযুক্ত হইলেন।

উক্ত বৎসর হইতে স্বামী ত্রিগুণাতীত স্বয়ং সকল রন্ধন-কার্য্য করিতেন। কয়েকজন ছাত্র তরকারী কাটিতে এবং পরিবেশন করিতে তাঁহার সহকারী হইত। ছাত্রীগণ বাসন কোসন ধুইতেন এবং রান্না-ঘর ও ভোজনশালা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতেন। স্বামী ত্রিগুণাতীত অত্যন্ত অভিজ্ঞ ও বহুদর্শী রন্ধনকারী ছিলেন। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অনেকেই তাঁহার কাছে তাঁহাদের জীবনে সর্বপ্রথম ভারতীয় খাদ্য ভোজনের আনন্দ উপভোগ করিয়াছেন। তাঁহারা লোকমুখে শুনিয়াছিলেন, ভারতে অধিক ধান ও নারিকেল উৎপন্ন হয় এবং ভারতীয় আহার অতি সাধারণ। স্বামী ত্রিগুণাতীতও আহার্য্যকে পুষ্টিকর করিবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিতেন, কিন্তু সুস্বাদু করিবার দিকে তাঁহার তত দৃষ্টি ছিল না। তথাপি

আহারকালে দেখা যাইত, টেবিলের উপর নানা রকম সুস্বাদু চাটনি, তরকারী ও ঝোল সজ্জিত রহিয়াছে। প্রধান ভোজনালয়ে সকলে আহারে বসিতেন। উক্ত গৃহের এক প্রান্তে একটা ছোট উন্নত মঞ্চ নির্মিত ছিল। উহার উপর বসিয়া এবং তদুপরি একটী ডেস্কের উপর বই রাখিয়া আহার কালে তিনি পাঠাদি চালাইতেন। তথায় তিনি প্রত্যহ স্বীয় আহার সমাপনান্তে গীতাপাঠ ও ব্যাখ্যা আরম্ভ করিতেন। পাঠের পরে প্রশ্নোত্তর চলিত। পাঠ এবং ব্যাখ্যার ন্যায় প্রশ্নোত্তরও ব্যক্তিগত ভাবে বিশেষ লাভজনক ছিল।

স্বামী ত্রিগুণাতীতের পরিশ্রম অবিরাম ও অপরিসীম ছিল। প্রত্যহ ভোর হইতে গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত তিনি অবিরত কাজ করিতেন। কখনো কখনো জানালা দিয়া দেখা যাইত, সারা রাত্রি তাঁহার ঘরে আলো জ্বলিতেছে এবং তিনি কর্ম্মরত। আমেরিকায় বেদান্ত প্রচারের জন্য তিনি এইরূপে আত্মাহুতি দিয়াছেন। তিনি সর্বদা আদর্শ সন্ন্যাসীর ভাবে উদ্বুদ্ধ থাকিতেন এবং আরাম ও বিলাস পদদলিত করিয়া তিনি ধর্ম্মজীবনের এমন উৎকৃষ্ট উদাহরণ দেখাইতেন যাহা প্রত্যেককে আদর্শনিষ্ঠ হইবার জন্য অনুপ্রাণিত করিত। উক্ত বৎসর হইতে আরম্ভ করিয়া ছাত্রগণ এবং ছাত্রীবৃন্দ ভিন্ন ভিন্ন টেবিলে খাইতে বসিতেন এবং অন্যান্য কার্য্যেও উক্তরূপ ব্যবস্থা অনুসৃত হইত।

স্বামী ত্রিগুণাতীতকে জানান হইল যে, ধুনিগিরি আশ্রমস্থ পর্বতসমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ শৃঙ্গ নহে এবং উহার পার্শ্ববর্তী শৃঙ্গটি অপেক্ষাকৃত উচ্চতর। ইহা শুনিয়া তিনি কয়েকজন শিষ্যকে উচ্চতর শৃঙ্গে যাইবার পথ করিতে আদেশ দিলেন। পথ প্রস্তুত হইলে যথাযোগ্য অনুষ্ঠানের দ্বারা নূতন শৃঙ্গ উৎসর্গীকৃত হইল। তিনি এই পর্বতের নাম রাখিলেন সিদ্ধগিরি। তখন হইতে সিদ্ধগিরিতেই সকল ধুনিরাত্রি যাপিত হইত। বাতরোগ এবং অন্যান্য দৈহিক কষ্ট সত্ত্বেও স্বামী ত্রিগুণাতীত নির্দোষ হাস্যকৌতুক ও নিরন্তর প্রফুল্লতা প্রকাশ করিতেন। ইহার ফলে আশ্রমবাসিগণ অনভ্যস্ত জীবন যাপনে যে অবসাদ অনুভব করিতেন তাহা দূরীভূত হইত। ব্যক্তিগত প্রয়োজন ও সামর্থ্য অনুসারে প্রত্যেককে প্রচুর ব্যায়াম করিতে তিনি নির্দেশ দিতেন। শান্তি

আশ্রমে মাছমাংসাদি আমিষ আহার নিষিদ্ধ ছিল। আশ্রমে কেবলমাত্র নিরামিষ আহার প্রত্যহ প্রস্তুত ও ভক্ষিত হইত। দর্শকবৃন্দ এবং আশ্রম-বাসিগণকে এই নিয়মটি সতত স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য প্রবেশ-তোরণে ইহা লিখিত ছিল যে, আশ্রম প্রাঙ্গণে সর্ব প্রকার আমিষ আহার, আগ্নেয় অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার এবং পশ্বাদি শিকার নিষিদ্ধ। পশুশিকার নিষিদ্ধ থাকায় নানা প্রকার পক্ষী ও ক্ষুদ্র বন্য জন্তু আশ্রমে আশ্রয় লইয়াছিল। সেই জন্য অসংখ্য ভারুই পাখী ও শশক স্বচ্ছন্দে আশ্রমে বাস করিত এবং মানুষের সম্মুখে নির্ভয়ে ঘুরিয়া বেড়াইত। যখন একটী উদ্যান করিবার চেষ্টা হইল তখন ইহা বেশ বোঝা গেল। আকস্মিক তুষারপাতের জন্য সেই পার্বত্য অঞ্চলে বাগান করা সমস্যাজনক ছিল। বাগান করার সঙ্গে সঙ্গেই শত শত শশক এবং কাঠবিড়ালী সপরিবারে আসিয়া তথায় বাসা বাঁধিল। ইহার ফলে বাগানের ভীষণ ক্ষতি হইল। তখন আশ্রমে একটী কুকুর ও কয়েকটী বিড়াল প্রতিপালিত হইল শশকাদির উৎপাত হইতে বাগান রক্ষার জন্য। বাগানে প্রচুর শাক্‌সব্জী ও ফুলফল জন্মিত। যে বৎসর যথেষ্ট বৃষ্টিপাত হইত সেই বৎসর শীতকালের জন্য আবশ্যকীয় শাক্‌সব্জী বাগান হইতে পাওয়া যাইত এবং সঞ্চিত থাকিত।

স্বামী ত্রিগুণাতীত পুনঃ পুনঃ এই সুস্পষ্ট উপদেশ দিতেন যে, প্রকৃত ধর্ম-জীবন স্বাভাবিক হয় এবং ইহা বহু পরীক্ষিত সাধনার দ্বারাই সমৃদ্ধ হওয়া উচিত। যে সাধনা যাহার স্বভাবের অনুকূল তাহাই তাহার অবলম্বনীয়। অলৌকিক শক্তিলাভ সম্বন্ধে সময় সময় প্রশ্ন উঠিত। তিনি প্রশ্নের উত্তর দান প্রসঙ্গে বলিতেন, "এই সকল অভ্যাস আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য অনাবশ্যক এবং অনেক ক্ষেত্রে অনিষ্টকর বলিয়া অনুসরণ করা অনুচিত।" তাঁহার নিকট সকলের মন উন্মুক্ত পুস্তকবৎ ছিল। অনেকে জানিতেন যে, তাঁহাদের সুগুপ্ত সংকল্প এবং কার্য্যও তাঁহার অবিদিত নাই। কোন কোন শিষ্য বা শিষ্যার অসংযত আগ্রহ এবং অবিবেচিত ব্যবহার তিনি জানিতে পারিয়া বন্ধ করিয়াছেন। কেহ কেহ ধ্যানকালে তাঁহার কৃপায় আধ্যাত্মিক অনুভূতি লাভ করিয়াছেন। যাঁহারা শান্তি আশ্রমের ধর্মপ্রসঙ্গ ও ধ্যানাভ্যাসাদিতে নিয়মিত

ভাবে যোগদান করিতেন তাঁহারা বহুবার দেখিয়াছেন যে, যতটুকু আন্তরিকতার সহিত তাঁহারা স্বামী ত্রিগুণাতীতের উপদেশ ও সাহচর্য্য গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা ততটুকুই ধর্মপথে অগ্রসর হইয়াছেন। যাঁহারা একবার আশ্রমবাসের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন তাঁহারা পুনরায় আশ্রমবাসী হইবার জন্য সমুৎসুক হইয়াছেন। শত শত মার্কিণ নরনারী শান্তি আশ্রমে স্বামী তুরীয়ানন্দ ও স্বামী ত্রিগুণাতীত প্রমুখ হিন্দু সন্ন্যাসীগণের পূত সঙ্গে থাকিয়া বেদান্তের দিব্যালোক লাভে ধন্য হইয়াছেন। সিদ্ধ-সঙ্কল্প স্বামী বিবেকানন্দের শুভাকাঙ্খা অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হইয়াছে।

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, সানফ্রান্সিস্কো বেদান্ত সমিতিতে সদস্যদের জন্য দুইটি ধর্মালোচনা হইত ; একটী সোমবার সন্ধ্যায় গীতা ব্যাখ্যা এবং অন্যটী বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় উপনিষদ্ ব্যাখ্যা। যে সদস্যগণ মূল হিন্দু শাস্ত্র পড়িতে ইচ্ছুক ছিলেন তাঁহাদের সংস্কৃত শিক্ষারও সুব্যবস্থা হইল। সোমবার সন্ধ্যায় গীতাব্যাখ্যার পরে স্বামী ত্রিগুণাতীত তাঁহাদিগকে সংস্কৃত শিক্ষা দিতেন। তাঁহার সংস্কৃত শিক্ষা দানের প্রণালী যতদূর সম্ভব সরল ছিল। ব্যাকরণের নিয়মাবলী ও বাক্যরচনা তিনি মুখে মুখে শিখাইতেন। এইরূপে অল্পায়াসে ছাত্রছাত্রীগণ ছোট ছোট বাক্য হইতে আরম্ভ করিয়া বড বড় বাক্য রচনা অচিরে শিখিয়া ফেলিতেন। ভারতবর্ষ হইতে সংস্কৃত ব্যাকরণ ও সংস্কৃত অভিধান আনীত হইল। সংস্কৃত শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সর্বপ্রথমে গীতার শ্লোকগুলি অধ্যয়ন ও আয়ত্ত করা। প্রত্যেক ছাত্র বা ছাত্রী সংস্কৃত শ্লোক সহিত গীতা এক একখানি কিনিলেন। প্রথম হইতেই সংস্কৃত শিক্ষায় সকলের আগ্রহ দেখা গেল। এই সুযোগে স্বামী ত্রিগুণাতীত নিগূঢ় আধ্যাত্মিক উপদেশ ও সাধনা শিক্ষা দিতে লাগিলেন। আধ্যাত্মিক সম্পদের হীরকখনিরূপে সংস্কৃত-শিক্ষা কাহারও কাহারও নিকট প্রতীয়মান হইল।

এই সময় স্বামী প্রকাশানন্দ মনে করিলেন যে, ভবিষ্যতে এমন দিন আসিতে পারে যখন হিন্দু মন্দিরে কোন সন্ন্যাসী প্রচারক পাওয়া যাইবে না, তখন আমেরিকায় বেদান্ত প্রচার কার্য্য হ্রাস পাইবে। তিনি স্বামী ত্রিগুণাতীতকে

বলিলেন যে, সমিতির কোন কোন শিক্ষিত সদস্যকে বক্তারূপে তৈয়ারী করা উচিত। স্বামী ত্রিগুণাতীতের অনুমোদন লাভের পর কয়েকটি ছাত্রছাত্রী এই কার্যের জন্য মনোনীত হইলেন। তাঁহারা আবশ্যকীয় অধ্যয়নাদি শেষ করিলে রবিবার বৈকালে তাঁহাদিগকে বক্তৃতা করিতে দেওয়া হইল। স্বামী ত্রিগুণাতীত বক্তৃতা প্রস্তুতের জন্য ছাত্রছাত্রীগণকে নিম্নলিখিত উপদেশ দিয়াছিলেন।—"চিন্তা কর, ব্যবহারিক জীবনে বেদান্ত দর্শনের প্রয়োগ-বিধি অনুসারে হিন্দু মন্দিরে বক্তৃতা দানের জন্য কিরূপে নিজেকে প্রস্তুত করিতে হয়। অর্থাৎ দৈনন্দিন জীবনে বেদান্ত প্রয়োগ দ্বারা কিরূপে মন্দকে ভাল করা যায়।"

"স্বীয় আধ্যাত্মিক উন্নতিকল্পে ধর্মসাধনার অঙ্গরূপে বক্তৃতাকে অকপট ও বিশ্বস্ত ভাবে প্রস্তুত করিতে হইবে। প্রার্থনাশীল হইয়া অনন্য মনে উপবেশন কর। মনকে চিন্তাশূন্য কর। ইহার ঐহিক দিকের সকল ভাবনা ও কামনা পরিহার কর, অর্থাৎ বক্তৃতার সফলতা বা বিফলতা, প্রশংসা বা সমালোচনাদির কথা ভাবিও না। তোমার মনের কোণে এরূপ কোন পার্থিব বাসনা গুপ্ত আছে কিনা তাহা জানিবার জন্য গভীর আত্মবিশ্লেষণ ও অনুসন্ধান কর। ইহা স্বাভাবিক যে, এরূপ কোন না কোন বাসনা নিঃসন্দেহে মনে থাকিবে। অকপট হইলে মানুষ মনোবিশ্লেষণ দ্বারা সেই চোরগুলিকে ধরিবার জন্য বিশ্বস্ত ভাবে চেষ্টা করিবে। প্রথমে কিছুক্ষণ ইষ্টধ্যান কর। তৎপরে বক্তৃতার বিষয় ধ্যান কর। পরে কয়েক বার, ইষ্টদেব এবং বক্তৃতার বিষয় উভয়ই ধ্যান কর, প্রত্যেকটী দুই এক মিনিট ধরিয়া। তদন্তে কয়েক মিনিট বক্তৃতার বিষয় গভীর ভাবে ভাবনা কর।"

"বক্তৃতার বিষয়টীকে ঈশ্বর-কৃপার দ্বারা বিশুদ্ধ করিয়া লইবার জন্য ইহা পবিত্র বস্তুরূপে আন্তরিকার সহিত ঈশ্বর-পদে সমর্পণ কর। সর্বপ্রকার স্বার্থ সিদ্ধির ভাব মন হইতে মুছিয়া দিবার জন্য ইষ্টদেককে আকুল প্রার্থনা জানাও। ধ্যান কর, ঈশ্বর-কৃপা বক্তৃতার বিষয়ের উপর বর্ষিত হইতেছে। ভাবনেত্রে দেখ, ইহা ঐশ স্পর্শে শুদ্ধীকৃত হইতেছে। ঈশ্বর-কৃপার দ্বারা ইহা প্রলিপ্ত কর যাহাতে ইহা সমগ্ররূপে তাঁহারই হইয়া যায়। পরে ইহাকে তাঁহার নিকট হইতে

গ্রহণ কর তাঁহার দয়ার দানরূপে। কয়েক মিনিট ধরিয়া ঈশ্বর-পদে কৃতজ্ঞতার ভাবে প্রণত থাক এবং তাঁহার আশীষ চাও। আন্তর অনুষ্ঠানের ইহাই প্রথমাঙ্গ। কিরূপে বক্তৃতা প্রস্তুত করিতে হয় তাহাই দ্বিতীয়াঙ্গ।

"প্রারম্ভে কোন অভিধান বা পুস্তক দেখিবার চিন্তা মনে আসিতে দিও না। এখন বক্তৃতার বিষয়টী পুরা আধ ঘণ্টা ধ্যান কর। তৎপরে ইহাকে পূর্ণ ভাবে ইষ্টপদে অর্পণ কর এবং ইহাকে ইষ্টদেবের সহিত সংযুক্ত কর। এই ধ্যান-লব্ধ প্রেরণার ফলে যে সকল চিন্তা মনে উদিত হইবে সেগুলি একখণ্ড কাগজে লিখিয়া ফেল। মঞ্চ-বক্তৃতাদির জন্য এই ভাবে আন্তর বিকাশের সাধনা করিতে হয়। যদি আলোচ্য বিষয়ের ধ্যানে সন্তোষজনক ভাবনা মনে উদিত না হয় তাহা হইলেও পুস্তকাদি পড়িও না এবং পুনরায় ধ্যানে বসিতে ভুলিও না। ধ্যান-লব্ধ চিন্তাই সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও মর্মস্পর্শী হয়। সর্বশেষে যখন তুমি বক্তৃতামঞ্চে আসিবে তখন মনে রাখিও, তুমি ইষ্টদেব সমীপে বিষয়টী ব্যক্ত করিতেছ এবং ইষ্টদেবই তোমার একমাত্র শ্রোতা।"

উক্ত প্রকারে বক্তৃতা-প্রস্তুতি অভ্যাস করিয়া সমিতির কয়েক জন সদস্য সুবক্তা হইয়াছিলেন। ১৯২৩-২৪ খ্রীঃ স্বামী প্রকাশানন্দ যখন ভারতে আসেন তখন তাঁহাদের মধ্যে কয়েক জন নয় মাস ধরিয়া হিন্দু মন্দিরের বক্তৃতাদি চালাইয়াছিলেন।

স্বামী ত্রিগুণাতীত দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করিতেন যে, ভারতের পরেই আমেরিকা মহান্ ধর্মভূমিতে পরিণত হইবে এবং সেই জন্যই তিনি মার্কিন ভক্ত-বন্ধুদের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য এই সকল উপায় অবলম্বন করিতেন। স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, "প্রাচ্যের মুখ্যাদর্শ পাশ্চাত্যকে অধ্যাত্মনিষ্ঠ করা এবং অতীতে অধ্যাত্ম আলোক যেমন পূর্বদিক হইতে আসিয়াছে ভবিষ্যতেও তেমনি আসিবে।" স্বামী ত্রিগুণাতীত প্রিয়তম গুরু-ভ্রাতার এই বাক্যে সুদৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন এবং সেই অনুসারে তাঁহার কর্মপদ্ধতিও রচিত হইত। তিনি মনে করিতেন যে, ভারত ও আমেরিকা দেশদ্বয়, হিন্দু ও মার্কিন জাতিযুগল ঐক্যবদ্ধ হইলে মানব জাতির পরম কল্যাণ সাধিত হইবে। এইজন্য তিনি

উভয় জাতির মধ্যে বিবাহ প্রচলনের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন এবং হিন্দু মন্দিরের নামকরণের অন্যতম কারণও ইহাই।

স্বামী ত্রিগুণাতীত দেখিলেন যে, পাশ্চাত্যের ধর্ম বৃহৎরূপে সামাজিক এবং ইহার ভিত্তি পর্যন্ত ঐহিক লাভ ও ইন্দ্রিয়ভোগে অনুস্যূত। সেইজন্য ইহার প্রতিকারার্থ তিনি আমেরিকায় হিন্দু প্রথার প্রবর্তন করিলেন। হিন্দু মন্দিরের সভা-সম্মিলনে পুরুষদিগের একদিকে এবং নারীদিগের অন্যদিকে পৃথক্ স্থানে বসিবার রীতি তৎকর্তৃক প্রবর্তিত হইল। এতকাল নরনারীগণের একত্র উপবেশন প্রথায় যাঁহারা অভ্যস্ত ছিলেন তাঁহাদের নিকট উক্ত পরিবর্তন বজ্রাঘাতবৎ কঠোর প্রতীত হইল। কিন্তু কালে সবই চলিয়া যায়। তাই এই প্রথায় ক্রমে ক্রমে শ্রোতৃমণ্ডলী অভ্যস্ত হইয়া উঠিলেন।

ঈশ্বরেচ্ছার উপর সমস্ত ছাড়িয়া দিতেন বলিয়া স্বামী ত্রিগুণাতীত সাফল্যের জন্য অধীর বা নিরাশ হইতেন না। অনন্ত কাল অপেক্ষা করিবার অসীম ধৈর্য তাঁহার ছিল। তিনি বলিতেন, "যখন তুমি আশীষ কামনা কর, অথবা জগন্মাতার নিকট কিছু চাও, অথবা তোমার জীবনে যাহার প্রয়োজন হয়, তাহার জন্য ধীর ভাবে প্রতীক্ষা করিতে প্রস্তুত থাকিও, আবশ্যক হইলে বহু বৎসর কিরূপে প্রতীক্ষা করিতে হয় সর্বাগ্রে তাহা শিক্ষা কর। ইহা নিশ্চিত জানিও যে, যাহা স্বীয় সন্তানের জন্য শুভকর তাহা জগন্মাতা সর্বাপেক্ষা ভাল জানেন। এমন কি, আমার কাছেও কোন কিছু আশা করিও না, তাহা হইলে আর কখনো হতাশ হইবে না।" যে অকপট ধর্মার্থীর নিকট ধ্যান দুষ্কর হইত তাঁহার প্রতি তিনি সর্বদা তাঁহার সহৃদয় ও সহায়ক ছিলেন। তিনি বলিতেন, "ধৈর্য্য ধারণ কর। কদাপি চিত্তকে অধীর করিও না। যখন চিত্ত চঞ্চল হইয়া ঘুরিয়া বেড়ায় তখন ইহাকে ধীর ভাবে ধরিয়া আনিয়া আদর্শবদ্ধ কর ; দরকার হইলে পুনঃ পুনঃ তদ্রূপ কর, কিন্তু সর্বদা ধীর ভাবে।"

যদিও তিনি সতত শিক্ষা দিতেন, 'যে যেখানে আছে সেখানেই সাধনা আরম্ভ করুক' তথাপি তিনি কখনো আদর্শকে নীচে নামাইতেন না, বা আদর্শ লাভার্থ আবশ্যকীয় আয়াসকে ছোট করিতেন না। তিনি আরও বলিতেন,

"যে মন একাধিক বস্তুর প্রতি অনুরক্ত সে মন লক্ষ্য বস্তু লাভে সমর্থ হয় না। তোমার চতুর্দিকে যে সকল বস্তু আছে তাহাদের মধ্যে ঈশ্বরকে দেখিতে শিক্ষা কর। তাহা হইলে তোমার মন সর্বদা তাঁহার কথাই ভাবিবে।"

শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক সন্তানরূপে স্বামী ত্রিগুণাতীতের অনুপম উদারতা সামান্যমাত্র সাম্প্রদায়িকতারও প্রশ্রয় দিত না। তাঁহার গুরুদেবের মত তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, আন্তারকতা থাকিলে প্রত্যেক ধর্মপথেই ঈশ্বরলাভ হয়। সত্যান্বেষীর বুদ্ধি-সামর্থ্য বা সামাজিক পদ নিম্নোচ্চ যাহাই হউক না কেন তাঁহার জীবন-পথে কোন প্রকার বাধা প্রদানের চিন্তা তাঁহার সকরুণ হৃদয়ে কখনো স্থান পাইত না। বিশ্বাসী অন্তরের ধর্মমত ভিন্ন হইলেও তিনি তাঁহার নিকট আশার অরুণ আলোক ধরিতেন এবং বেদান্ত মতে সনাতন তত্ত্ব প্রচার করিতেন। ধর্মসাধনার্থ তিনি সকলকে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে প্রেরণা দিতেন; কিন্তু তাঁহাদের নিকট কোন নির্দিষ্ট ধর্মমতে আস্থা স্থাপনের কথাই তুলিতেন না। পৃথিবীর সকল ধর্মশাস্ত্র হইতে তিনি বাক্যোদ্ধৃতি করিতেন, কিন্তু কোন ঈশ্বরাবতারের দাবী ঊর্দ্ধে বা নিম্নে স্থাপন করিতেন না। বস্তুতঃ খ্রীষ্টান দেশে প্রচাররত থাকায় তাঁহার মুখে জিশু খ্রীষ্টের নাম ও বাণী সর্বাপেক্ষা বেশী শোনা যাইত, কিন্তু তাহা তুলনামূলক বা তিরস্কারসূচক ভাবে নহে। ইহার ফলে হিন্দু মন্দির বলিতে পাশ্চাত্যে লোকে ধর্মবিষয়ক উদার ও অসাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান বুঝিত এবং ইহার শ্রোতৃমণ্ডলী বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত ও ধর্মাবলম্বী ছিল।

লেখক ও বক্তারূপে স্বামী ত্রিগুণাতীত সরল ভাবে বিষয়ের অন্তরে প্রবেশ করিতেন। সাহিত্যিক প্রকাশ-ভঙ্গীর কৃত্রিম কলা তিনি উপেক্ষা করিলেও তাঁহার ভাষা ও ভাব খুব শক্তিশালী ও সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ছিল। ১৯০৩ খ্রীঃ ১লা ফেব্রুয়ারীতে সানফ্রান্সিস্কো সহরের ইউনিয়ান স্কোয়ার হলে তাঁহার প্রথম সাধারণ বক্তৃতা প্রদত্ত হয়। উক্ত বক্তৃতার প্রারম্ভে এই স্মরণীয় বাক্যগুলি ছিল, "স্বাধীন দেশের সন্তানগণ, তোমরা স্বাধীনতার উপাসক, প্রকৃত স্বাধীনতার একনিষ্ঠ সাধক। কিন্তু তোমাদের সর্বপ্রথমে জানা দরকার, প্রকৃত স্বাধীনতার স্বরূপ কি? সর্বোচ্চ সুমহান্ ভাবরাশিতে পরম প্রকৃত স্বাধীনতা বিদ্যমান।"

১৯০৯ খ্রীঃ এপ্রিল মাসে "ভয়েস অব ফ্রিডাম্" পত্রিকার প্রথম সংখ্যার ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছিলেন, "আমাদের হৃদয়ের অন্তরতম তন্ত্রী ঝঙ্কৃত হউক। ইহা এমন সুরে ঝঙ্কৃত হউক, যাহাতে আমরা সকলে এক বাক্যে মুক্তির বিশ্বসঙ্গীত গাহিতে পারি। এস, আমরা মুক্তির ভাষায় কথা বলি। এস, আমরা মুক্তির আলোকে চিন্তা করি। এস, আমরা মুক্তির বলে কাজ করি।"

স্বামী ত্রিগুণাতীত শিক্ষা দিতেন যে, আত্মসাক্ষাৎকারই মানব জীবনের সর্বোচ্চ লক্ষ্য, সর্বশ্রেষ্ঠ কাম্য। তিনি বলিতেন, "আমাদের কায়ার মধ্যে, আমাদের স্বীয় প্রকৃতির মধ্যে দিব্য সত্ত্বা, পরমাত্মা নিহিত। যদি আমরা আত্মবিশ্লেষণ ও বিচার করি, যদি আমরা খুব নিয়মিত ও গভীর ভাবে কিছুক্ষণ চিন্তা করি, তাহা হইলে আমরা বিশুদ্ধ তত্ত্বের অবভাসক কিছু দেখিতে পাইব আমাদের মধ্যে এবং ক্রমে ক্রমে আমরা আমাদের আসল স্বরূপ, আমাদের গুপ্ত দেবত্ব প্রত্যক্ষ করিতে পারিব।" স্বামী ত্রিগুণাতীত সৎচরিত্র গঠনে এবং নির্দিষ্ট আদর্শ ও লক্ষ্য নির্ধারণে অবিরাম প্রয়াস করিতে শিষ্যগণকে সর্বদাই বলিতেন। এই সম্বন্ধে তাঁহার বাক্যগুলি এখানে উদ্ধৃত হইল।—"জীবনের উদ্দেশ্য আত্মবিকাশ করা, অধিকতর আত্মবিকাশ করা। প্রথমে আমাদের জীবন চেতনা লাভের পূর্বে এক প্রকার ছিল, পরে ক্রমাগত প্রচেষ্টা দ্বারা আমরা এখন সুবর্ধিত ও সচেতন হয়েছি। ভবিষ্যতে গুণাতীত তুরীয় অবস্থায় গমনই আমাদের জীবনের চরম উদ্দেশ্য। অমর জীবন লাভ করিতে হইলে আমাদিগকে আধ্যাত্মিক হইতে হইবে, আমাদিগকে ধার্মিক হইতে হইবে, আমাদিগকে চিন্তাশীল হইতে হইবে।"

সানফ্রান্সিস্কো গমনের দ্বিতীয় বৎসরে স্বামী ত্রিগুণাতীতের স্বাস্থ্য বাতরোগ এবং অন্যান্য দৈহিক অসুস্থতায় আক্রান্ত হয়। আত্মসাক্ষাৎকার লাভার্থ পূর্ব জীবনে যে কৃচ্ছ্র সাধনা তিনি নির্মম ভাবে করিয়াছিলেন উহার ফলেই তাঁহার স্বাস্থ্য জীর্ণ হইয়া পড়ে। আমেরিকার প্রভিন্ন জলবায়ুর জন্য ও কঠোর কর্তব্যানুরাগ হেতু গৃহবদ্ধ থাকার জন্য তাঁহার স্বাস্থ্য চিরতরে ভগ্ন হয়। যাঁহার নিকট স্থূল দেহ সিদ্ধি লাভের উপায়স্বরূপ আর নহে, এবং কেবলমাত্র মানব

সেবার্থ সংরক্ষিত তাঁহার পক্ষে দেহরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সাবধানতা অবলম্বন সম্ভবপর নহে। তাই সিদ্ধ-পুরুষ ত্রিগুণাতীতের দেহে নানা রোগ সহজে প্রবেশাধিকার পাইল এবং ইহার ফলে তিনি শেষ জীবনে সাংঘাতিক দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হইলেন।

অসুস্থ অবস্থায় বহুবার মিসেস সি. এফ. পেটারসন তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতি শ্রীমতী পেটারসনের অসীম শ্রদ্ধা ভক্তি ছিল। ছিল। উক্ত শিষ্যার পক্ষে কোন ত্যাগই শ্রীরামকৃষ্ণের একটি সন্তানের জন্য অসম্ভব ছিল না। পরবর্তী কালে তাঁহার আধ্যাত্মিক উন্নতি ও সেবানিষ্ঠতার জন্য তিনি স্বামী ত্রিগুণাতীতের প্রধানা শিষ্যারূপে পরিগণিত হন। স্বামী তুরীয়ানন্দ তাঁহার নাম রাখিয়াছিলেন ধীরা এবং পরে বেদান্তে তাঁহার অচল বিশ্বাস হেতু স্বামী ত্রিগুণাতীত উক্ত শিষ্যার পূর্ব নামের সহিত 'আনন্দ' শব্দ যোগ করিলেন। তখন শ্রীমতী পেটারসনের পুরা নাম হইল ধীরানন্দ। নামটি শিষ্যার জীবনে অক্ষরে অক্ষরে সার্থক হইয়াছিল। ধীরানন্দ স্বামী ত্রিগুণাতীতের নিকট যে ধর্মোপদেশনিচয় লাভ করিয়াছিলেন সেগুলি তিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। হাঙ্গেরীর অমর স্বদেশ প্রেমিক কোসুথের বংশধর ছিলেন ধীরানন্দ। তিনি মহানুভব পূর্বপুরুষের সকল চারিত্রিক মহত্ত্বের অধিকারিণী হইয়াছিলেন। বেদান্তোক্ত তত্ত্বের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধাহেতু রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার প্রতি তাঁহার জন্মগতপ্রীতির উৎকৃষ্ট প্রকাশ দৃষ্ট হয়। স্বভাবতঃ তিনি সরল, অকপট ছিলেন এবং কোন প্রকার অসত্য তিনি ভ্রমেও প্রশ্রয় দিতেন না। ধীরানন্দ সুযোগ্য তত্ত্বাবধায়িকা ছিলেন। তিনি মিতব্যয়িনী হইলেও মহৎ কার্যের প্রতি দানশীলা ছিলেন। তাঁহার পতি মিঃ সি. এফ. পেটারসন এইরূপ মহৎ পত্নীর সুযোগ্যা সহকারিণী ছিলেন এবং স্বামী ত্রিগুণাতীতের সময় সাত বৎসর সানফ্রান্সিস্কো বেদান্ত সমিতির প্রেসিডেণ্টরূপে কার্য্য করেন। যদিও ধীরানন্দ সন্তান-বৎসলা জননী এবং প্রীতিময়ী পত্নী ছিলেন তথাপি বেদান্ত সমিতির প্রতি তাহার অনুরাগ ছিল অধিকতর এবং সেই অনুরাগ বৎসরের পর বৎসর পরিবর্ধিত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের করুণা পাশ্চাত্য নরনারীর

প্রতি বেদান্ত সমিতির মাধ্যমে প্রবাহিত হইতেছে জানিয়া তিনি উক্ত সমিতির সেবায় তন, মন ও ধন নিয়োগ করেন। স্বামী ত্রিগুণাতীতের মহাসমাধির দুই বৎসর পরে ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে ডিসেম্বর খ্রীষ্টমাস ইভের দিন প্রাতে তিনি দেহত্যাগ করেন। সহসা তাঁহার হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় তাঁহার অকাল মৃত্যু ঘটে।

যতই বৎসরের পর বৎসর যাইতে লাগিল ততই স্বামী ত্রিগুণাতীতের রোগগুলি সংখ্যায় ও শক্তিতে বাড়িয়া উঠিল। কিন্তু জীবন্মুক্ত সন্ন্যাসী এই সকল অসুখকে তাঁহার কার্যের বিঘ্নস্বরূপ হইতে কখনো দেন নাই। দেহ ও মনের উপর তাঁহার অলৌকিক আধিপত্য ছিল। তাঁহার জীবনের শেষ পাঁচ বৎসর তিনি বহুমূত্র ও বাতরোগে দিবারাত্রি কষ্ট পাইয়াছিলেন। শীতকালে তিনি দুইটি মোটা পশমের পোষাক, পশমের মোজা এবং পশমের প্যাণ্ট ও সোয়েটার পরিতে বাধ্য হইতেন। প্রত্যহ সুনিয়মিত পথ্যাহার করা সত্ত্বেও তাঁহার কষ্টভোগ আদৌ হ্রাস পায় নাই। তাঁহার দৈহিক অসুস্থতা এত জটিল হইয়াছিল যে, তিনি বলিতেন, প্রবল ইচ্ছাশক্তি দ্বারা আমার দেহ ও মন একত্রে রক্ষিত। যখনি আমি ইচ্ছাশক্তি কমাইব তখনি উহা খণ্ড খণ্ড হইয়া স্বতঃই ছিন্ন ভিন্ন হইবে। ভগ্নস্বাস্থ্য সত্ত্বেও তিনি নিয়মিত ভাবে ভোর চারটায় উঠিতেন এবং প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে সমিতির সদস্যদের জন্য দুইটি রবিবাসরীয় বক্তৃতা ও ক্লাস লইতেন। এইরূপে তাঁহার কার্য্য আশাতীতভাবে প্রসার হইতে লাগিল। অসুস্থ অবস্থাতেও তিনি নিজ অফিসের মেজেতে নিদ্রা যাইতেন। ভক্তদের অনুরোধে তিনি কম্বলের পরিবর্তে পাতলা গদি এবং প্রচুর বিছানা ব্যবহার করিতেন শরীরকে রাখিবার জন্য।

স্বামী ত্রিগুণাতীত অসাধারণ সময়ানুবর্তী ছিলেন এবং সমিতির সদস্যগণকে তদ্রূপ হইতে বলিতেন। কোন শিষ্য কার্য্যকালে দীর্ঘসূত্রিতা ভাব দেখাইলে তিনি অচিরে তাঁহাকে সময়ানুবর্তিতা শিক্ষা দিতেন। প্রত্যেক শনিবার সকাল ঠিক সাড়ে ছয়টায় তিনি কংকর্ডস্থ উপনিবেশে যাত্রা করিতেন। কংকর্ডে যে শিষ্যটি থাকিতেন তাঁহার জন্য একটি বড় সুটকেশে তিনি জিনিষপত্র লইয়া

যাইতেন। সেই স্যুটকেশটী বহনার্থ সহায়করূপে জনৈক যুবক তাঁহার সঙ্গে খেয়া-গৃহ (ferry building) পর্যন্ত যাইতেন। উক্ত যুবক আসিতে কখনো কখনো কয়েক সেকেণ্ড দেরী করিতেন। স্বামী ত্রিগুণাতীত অপ্রত্যাশিত ভাবে দুই মিনিট পূর্বে যাত্রা করিয়া খেয়াগৃহে গমনার্থ মোটর বাস ধরিবার জন্য রাস্তায় যাইতেন। যুবকটি আসিয়া লজ্জিতভাবে দেখিতেন, তাহার বিলম্বহেতু স্বামীজি ভারী স্যুটকেশটী একাকী বহন করিয়া লইয়া গিয়াছেন। এইরূপে স্বামীজী দৃষ্টান্ত দেখাইয়া অপরকে সময়ানুবর্তিতা শিক্ষা দিতেন। সকলকে সময়ানুবর্তী করিবার উদ্দেশ্যে তিনি হিন্দু মন্দিরের মঠে, অফিস দ্বারে, সভাগৃহে এবং অন্যত্র এক একটী ক্লক রাখিয়াছিলেন এবং জনৈক যুবককে ভার দিয়াছিলেন উক্ত ক্লকগুলিকে মানমন্দিরের সময় অনুযায়ী সেকেণ্ড পর্যন্ত ঠিক রাখিতে। এইরূপ সময়াবর্তিতা আরও আশ্চর্যজনক প্রতীত হয় যখন আমরা স্মরণ করি যে, প্রথমতঃ ইহা তাঁহার পক্ষে আদৌ স্বাভাবিক নহে এবং দ্বিতীয়তঃ তাঁহার সন্ন্যাসী জীবন কাল-চিন্তার অতীত হইতে চাহে। কিন্তু পাশ্চাত্যের ব্যবসাগত ও সামাজিক জীবনে সময়ের মূল্য এবং ধর্মসাধকগণের চরিত্রে সময়ানুবর্তিতার স্থান দেখিয়া তিনি স্বীয় ইচ্ছাকে বিনত করিয়া নিজে শিষ্যগণকে ইহার উপকারিতা শিক্ষা দিতেন। এই সুকঠোর নিয়মানুগত্যের পশ্চাতে ছিল শিষ্যের দৈহিক, মানসিক ও অধ্যাত্ম কল্যাণার্থ জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপারে সুগভীর মঙ্গলচিন্তা। স্বামী ত্রিগুণাতীত প্রত্যেকের মনোভাব সময়ানুবর্তী হইলেন এবং বুঝিতে পারিয়া তাঁহার অগ্রগতির পথে সকল বাধাবিঘ্ন দূর করিবার জন্য সচেষ্ট হইতেন। তাঁহাদের শিষ্যত্বের প্রতিটি মুহূর্ত সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে শিক্ষার সময় ছিল। তাঁহার একটী উপদেশ এইরূপ—"অপরের মনোভাব বিবেচনা কর। স্বার্থপরতাই চিন্তাহীনতার নিকৃষ্টতম পরিণতি।"

উদাহরণের গভীর প্রভাব নিরন্তর তাঁহার স্মৃতিপটে ছিল। সানফ্রান্সিস্কোতে আগমনের সময় হইতে তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন, আমেরিকায় মদ্যপানের সহিত ধূম্রপানের নিকট সম্বন্ধ এবং তরুণদের স্বাস্থ্যের উপর ধূম্রপানের অনিষ্টকর প্রভাব। যদিও তাঁহাকে কোন অভ্যাস বশীভূত করিতে পারিত না এবং

তাঁহার ঈশ্বরবিশ্বাস সদাই ইন্দ্রিয়ের উপর আধিপত্য করিত, এবং যদিও ধূম্রপানে তাঁহার স্নায়ুমণ্ডলী কিঞ্চিৎ স্নিগ্ধ ও নিরন্তর বাত-ব্যথার সাময়িক উপশম হইত তথাপি দৃষ্টান্ত প্রদর্শনার্থ তিনি ধূম্রপান স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করিলেন। আদর্শ ও নীতিনিষ্ঠা উভয় দিক দিয়াই তিনি নিরামিষ আহারের অভ্যাস সর্বদা পালন করিতেন। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, আধ্যাত্মিক জীবনের পক্ষে নিরামিষ আহার সর্বাপেক্ষা উপকারী। কিন্তু এই বিষয়েও তাঁহার আতিশয্য ছিল না। বিশেষ কারণের জন্য তিনি কোন কোন শিষ্য বা শিষ্যাকে নির্দিষ্ট পরিমাণে আমিষ আহারের ব্যবস্থা দিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন যে, প্রত্যেক আকৃতি বা প্রকৃতি অন্যটী হইতে ভিন্ন। কিন্তু সর্বসাধারণের প্রতি তাঁহার উদাহরণ ও উপদেশ ছিল সর্বপ্রকার আমিষ আহার-বর্জন। এমন কি, যখন কতকগুলি দৈহিক কষ্ট অসহ্য হইয়া উঠিল এবং বন্ধুভাবাপন্ন চিকিৎসকগণ এবং শিষ্যতুল্য সহকারীগণ আমিষ পথ্য গ্রহণ করিতে পরামর্শ দিলেন তখনও তিনি তাহাতে সম্মত হইলেন না এবং শেষ পর্যন্ত নিরামিষ আহারের আদর্শই সংরক্ষণ করিলেন। দেহ-গঠনের উপযোগী পুষ্টি যে সকল খাদ্যে আছে সেইগুলির বিষয় তিনি উত্তমরূপে অধ্যয়ন করেন। তাঁহার ও তৎশিষ্যগণের আহার তদনুযায়ী নির্বাচিত হইত।

স্বামী ত্রিগুণাতীত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপারেও মিতব্যয়ী ছিলেন। এই বিষয়েও তিনি স্বীয় গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত। সুতরাং সর্ব ক্রয়ব্যাপারে গুরুর ন্যায় শিষ্যও অতিশয় সাবধান হইতেন। স্বামী ত্রিগুণাতীত অনুরক্ত শিষ্য ছিলেন এবং সকল কার্যে শ্রীগুরুকে অনুসরণ করিতেন। শ্রীগুরুর এই বাক্য তাঁহার মুখে প্রায়ই শোনা যাইত, "ক্রীত দ্রব্য সম্বন্ধে তখনই সন্তুষ্ট হইবে যখন তুমি সম্পূর্ণরূপে বুঝিবে যে, ইহা ব্যয়িত অর্থের অনুযায়ী।" অবশ্য, এই উক্তি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত। কারণ শ্রীরামকৃষ্ণ বা তাঁহার শিষ্যগণ কখনো ভাবিতেন না যে, ভগবদ্ভক্তগণ কৃপণ হইবেন। তাঁহাদের জীবনে অমিতব্যয়িতা অবজ্ঞাত এবং অর্থের সম্যক্ সদ্ব্যবহার প্রদর্শিত। ভারতে 'উদ্বোধন' পত্রিকার সম্পাদকরূপে এবং আমেরিকায় হিন্দু মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতারূপে

স্বামী ত্রিগুণাতীত যে মিতব্যয়িতা দেখাইয়াছেন তাহা সকলের অনুকরণীয় ও অসাধারণ।

স্বামী ত্রিগুণাতীতের চক্ষে ধনসম্পদ্ পবিত্র বস্তু ছিল। তিনি স্বশিষ্যগণকে শিক্ষা দিতেন, "তোমরা দুর্লভ অমরত্বের উত্তরাধিকারী। তোমরা অর্থের দাস হইও না। অর্থ তোমাদের দাস হউক। অর্থ বায়ু বা জলের স্রোতবৎ বহমান। উহা এক হাত হইতে অন্য হাতে চলিয়া যায়, কোন হাতে চিরস্থায়ী হয় না। উহা হাতে আসিলে নিঃস্বার্থ ভাবে উহার সদ্ব্যবহার কর, কিন্তু কখনো উহাকে নিজস্ব ভাবিও না। বহুমুখী কর্মচেষ্টা সত্ত্বেও কেহ তাঁহার মনে একটিও ঐহিক চিন্তার উদয় দেখে নাই। হিন্দু মন্দির এবং উহার ত্রিতল, ছাদ ও গম্বুজসমূহ নির্মাণকল্পে যে অর্থ-ব্যয় হয় তাহা সম্পূর্ণ সংগৃহীত না হওয়ায় উহাকে বন্ধক দিতে হয়। কিন্তু উক্ত বন্ধক তাঁহার কার্য্য-প্রসারের অন্যান্য সংকল্পকে আদৌ ব্যাহত করিতে পারে নাই। যখনই অন্যান্য কার্য্যের জন্য অর্থের আবশ্যক হইত তখনি উহা যেন যাদুবলে কোন স্থান হইতে তাঁহার হাতে আসিয়া যাইত। মাঝে মাঝে তিনি সানফ্রান্সিস্কো নগর ও সহরতলীর নব নব অংশে ভূমি ও গৃহাদি কিনিয়া রাখিতেন। উদ্দেশ্য ছিল, যখন ঐ সকলের মূল্যবৃদ্ধি হইবে কয়েক বৎসর পরে সেগুলির বিক্রয়লব্ধ অর্থে মন্দিরকে বন্ধক-মুক্ত করিবেন। কিন্তু ইহা তিনি দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। স্বামী ত্রিগুণাতীত গভীর আদর্শনিষ্ঠ সন্ন্যাসী ছিলেন এবং সর্বপ্রকার দুঃখকষ্ট সহনে সর্বদা প্রস্তুত থাকিতেন। যখন ভ্রমণে বা বক্তৃতা দিতে বাহিরে যাইতেন তখন প্রায়ই তিনি সস্তা হোটেলে খাইতেন, যাহাতে শিষ্যগণ তাঁহাকে দেখিয়া মিতব্যয়িতা শিক্ষা করেন।

শিষ্যগণের পোষাক পরিচ্ছদের দিকে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি থাকিত। তিনি সর্বদা তাঁহাদিগকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতে এবং সাধ্যানুযায়ী ভাল পোষাক পরিচ্ছদ পরিতে বলিতেন। তাঁহার মতে এই সকল জিনিষের উপর আত্ম-মর্য্যাদা এবং অন্যের মতামত কিঞ্চিৎ নির্ভর করে। কিন্তু আশ্রমের ধর্মালো-চনাগুলিতে ইহার বিপরীত করিতে হইত। তথায় ছাত্রছাত্রীগণ পোষাক

পরিচ্ছদ প্রভৃতির কথা একেবারে ভুলিয়া নিরভিমান হইয়া সমুচ্চ আধ্যাত্মিক পরিবেশের মধ্যে বাস করিতেন।

শিষ্যের জন্য তাঁহার কঠোর নীতি নির্ধারিত ছিল। শিষ্যের পারমার্থিক কল্যাণ সাধনার্থ তিনি নির্মম হইতে ইতস্ততঃ করিতেন না। যিনি তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিবেন তাঁহাকে সকল নীতি মানিয়া চলিতে হইবে। পুনঃপুনঃ নির্দ্দিষ্ট নীতি ভঙ্গ করিলে শিষ্যকে হিন্দুমন্দির ত্যাগ করিতে হইত। কিন্তু তাঁহার জন্য প্রত্যাগমনের পথ সদা উন্মুক্ত থাকিত, যদি তিনি পুনরায় নিয়ম-পালনার্থ আন্তরিক দৃঢ়তার প্রতিশ্রুতি দিতেন।. স্বামী ত্রিগুণাতীতের ক্ষমাশীলতা দেবতুল্য ছিল। বাইবেল-বাণী "সাতাত্তর গুণিত সাত বার ক্ষমা কর"[১] তিনি সত্য সত্যই পালন করিতেন। যাঁহারা তাঁহাকে ভুল বুঝিতেন তাঁহাদের সম্বন্ধে তিনি বলিতেন, "কোন দিন আমাকে তারা ঠিক বুঝবে।" যে মন দিব্য জ্ঞানে পরিপূর্ণ এবং দিব্য প্রেমে উদ্ভাসিত তাহা কাহারো প্রতি শত্রু-ভাব পোষণ করিতে পারে না। লোকে যতই অন্যায় বা সমালোচনা করুক না কেন তাহার প্রতিও শুদ্ধ মনে ক্রুদ্ধ ভাব আসে না। শুদ্ধচিত্ত ত্রিগুণাতীতের সঙ্গ করিলে ইহাই মনে হইত। যে শিষ্য দোষযুক্ত তাহার সর্বোচ্চ কল্যাণার্থ তিনি কঠোর নীতি অবলম্বন করিলেও অন্তরে তাহার পিতৃতুল্য পরম শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন।

যিনি শ্রীরামকৃষ্ণের পাদমূলে বসিয়া ধর্ম্মশিক্ষা লাভপূর্বক শিষ্যত্বের সকল সোপান উত্তীর্ণ হইয়াছেন তাঁহার মধ্যে যে দৈবী সম্পদ আবির্ভূত হইবে ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? শ্রীরামকৃষ্ণের দেবদুর্লভ উদাহরণ তাঁহার প্রত্যেক শিষ্যে প্রাণবন্ত হইয়াছিল। গুরুর ন্যায় শিষ্যগণও অলৌকিক স্বার্থত্যাগ ও মানবপ্রেম প্রভৃতি মহিমায় ভূষিত ছিলেন। স্বামী ত্রিগুণাতীত যে সকল দিব্যগুণে মণ্ডিত ছিলেন সেগুলির দ্বারা মার্কিন সমাজে সর্বশ্রেণী আকৃষ্ট হইত। পাশ্চাত্য নরনারীগণ যে গুণাবলীর কথা বাইবেলে এবং অন্যান্য খ্রীষ্টান শাস্ত্রে পড়িয়াছিলেন সেইগুলি স্বামী ত্রিগুণাতীতের মধ্যে বিমূর্ত দেখিয়া তাঁহারা

১ ইহুদি নীতি বাক্য। ইহার সমজাতীয় বাংলা প্রবাদ 'শত অপরাধ ক্ষমা কর'।

চমৎকৃত হইলেন। ধর্ম সম্বন্ধে যাঁহাদের বিকৃত ধারণা ছিল তাঁহারাও জীবন্ত নিঃস্বার্থতার চুম্বক কর্তৃক আকৃষ্ট হইলেন। ভারতীয় সন্ন্যাসীর জীবনে ভাগবত প্রেরণা ও প্রজ্ঞার পরিপূর্ণ প্রকাশ দেখিয়া তাঁহাদের বিস্ময়ের সীমা পরিসীমা রহিল না। ধর্মসাধকের হৃদয়ে যখন নিঃস্বার্থতা দৃঢ়মূল হয় তখনই তাঁহার চিত্ত সুনির্মল ও জ্ঞানালোকে সমুজ্জ্বল হয়। হৃদয়ে দিব্য প্রেম উদিত হইলে সাধক ক্ষুদ্র আমির তুচ্ছতা বুঝিতে পারেন। সিদ্ধ পুরুষের জীবনে যে মুক্তির আনন্দ প্রবাহিত হয় তাহা দ্বারা তিনি নম্রতা, প্রীতি, সত্যনিষ্ঠা প্রভৃতি সদ্‌গুণের অধিকারী হন। জ্ঞানলাভ হইলে এই সকল গুণ স্বতঃই জ্ঞানীর মনে সমুদিত হয়।

দিনান্তে ঘনায়মান অন্ধকার যেমন সান্ধ্য তারকার সৌন্দর্য্য প্রকটিত করে তেমনি নম্রতাদি সদ্‌গুণে জ্ঞানীর চরিত্র স্বভাবতঃই অলঙ্কৃত হয়। যীশুখ্রীষ্ট বলিয়াছেন, "নম্র ব্যক্তিই ধন্য; কারণ স্বর্গরাজ্য তৎকর্তৃক অধিকৃত হয়।" স্বামী ত্রিগুণাতীতের জীবনে নম্রতাদি গুণের পরিপূর্ণ বিকাশ দেখা যায়। তৎকালীন বিশিষ্ট নরনারীর দ্বারা সম্মানিত হইলেও তিনি নিজকে সর্বদা ঠাকুরের অযোগ্য সেবকরূপে ভাবিতেন এবং অজ্ঞ, অক্ষম শিশুর ন্যায় সর্বদা ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিতেন। তিনি বলিতেন, "আমার কর্ম-সাফল্যের সকল প্রশংসা ঠাকুরেরই প্রাপ্য। কারণ, তিনিই প্রকৃত কর্তা, এবং আমি যন্ত্রমাত্র। তিনি যেমন করান তেমনি আমি করি।"

স্বামী ত্রিগুণাতীত কালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বক্তৃতাদানার্থ প্রায়ই আহূত হইতেন। সানফ্রান্সিস্কোর অদূরবর্তী বিভিন্ন সহর হইতে বক্তৃতাদি দানের জন্য তাঁহার নিকট আহ্বান আসিত। প্রথমে এই সকল আহ্বান তিনি সাদরে গ্রহণ করিতেন। কিন্তু পরবর্তী কালে হিন্দু মন্দিরে কাজের চাপ বাড়িয়া যাওয়ায় তিনি সকল আমন্ত্রণ লইতে পারিতেন না। সানফ্রান্সিস্কো এবং নিকটবর্তী অন্যান্য সহরের সর্বশ্রেণীর অসংখ্য লোকের সহিত তিনি পরিচিত ছিলেন। প্রত্যেক ব্যক্তির ভাবভূমিতে নামিয়া তিনি সকলের সহিত মিশিতেন এবং সকলকে তদূর্দ্ধে তুলিবার জন্য সপ্রেম চেষ্টা

করিতেন। সেইজন্য সকলেই তাঁহাকে শুভাকাঙ্ক্ষী ও পরমাত্মীয় ভাবিতেন এবং তাঁহার পরামর্শ লইয়া চলিতেন। সানফ্রান্সিস্কো এবং পার্শ্ববর্তী সহরসমূহের অনেক বিশিষ্ট ব্যবসায়ী তাঁহার বক্তৃতাদি শুনিতে হিন্দু মন্দিরে আসিতেন। তাঁহারা সকলেই স্বামিজীকে বন্ধুরূপে পাইয়া ধন্য জ্ঞান করিতেন এবং আমরণ তাঁহার পুণ্য পরিচয় ভুলেন নাই। হিন্দু মন্দিরের করমুক্তি এবং উহার চতুষ্পার্শ্বে বৃক্ষরোপণের অনুমতি লাভার্থ তাঁহাকে সহরের নেতৃবর্গের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইত। এই সূত্রে তিনি সহরের জুনিয়ার মেয়র জেম্‌স. জি. রল্‌ফ প্রভৃতি সরকারী কর্মচারীদের সহিত পরিচিত হন। স্বামী ত্রিগুণাতীতের মহাসমাধির পরে বহু বৎসর তাঁহারা তাঁহাকে সশ্রদ্ধভাবে স্মরণ করিতেন।

শান্তি আশ্রমকে স্বাবলম্বী করার চিন্তা স্বামী ত্রিগুণাতীতের মনে বলবতী ছিল। তাঁহার আর একটি মহত্তর সঙ্কল্প ছিল যে, কোন উর্বর ও স্বাস্থ্যকর স্থানে একটি উপনিবেশ স্থাপিত হইবে যথায় বেদান্ত সমিতির সদস্যগণ স্ব স্ব ভূমিতে গৃহাদি নির্মাণপূর্বক স্বাবলম্বী হইয়া শান্তিতে ও আরামে বাস করিবেন। উক্ত উপনিবেশের একাংশ সমিতির অধীন থাকিবে এবং তাহা হইতে যে আয় হইবে তদ্দ্বারা হিন্দু মন্দিরের ব্যয়-নির্বাহ এবং কার্য-প্রসার হইবে। উপনিবেশে জমি চাষ এবং তৎসম্পর্কিত শিল্পকার্যাদিতে সমিতির কর্মীগণ নিযুক্ত থাকিবেন। কোন স্থানে একখণ্ড বৃহৎ ভূমি ওয়ালনাট গাছে পরিপূর্ণ ছিল। স্বামী ত্রিগুণাতীতের উপনিবেশ-স্থাপনের সঙ্কল্প শুনিয়া উক্ত ভূমির অধিকারিগণ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন এবং কিঞ্চিৎ অল্প মূল্যে জমি বিক্রয় করিতে সম্মত হন। তাঁহারা তাঁহাকে তাঁহাদের ভূমি দেখাইতে লইয়া যান। উক্ত ভূমি ক্ষুদ্র কংকর্ড সহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত এবং সানফ্রান্সিস্কো হইতে এক বা দেড় ঘণ্টার পথ। স্বামী ত্রিগুণাতীত দেখিলেন, সেই ভূমিখণ্ড ডায়াব্লো পর্বতের পাদদেশে উর্বর মোরাগা উপত্যকায় বিদ্যমান। ডায়াব্লো সেই অঞ্চলের অন্যতম সর্বোচ্চ পর্বত। স্থানীয় জলবায়ু স্বাস্থ্যকর এবং কূপগুলি হইতে প্রচুর পানীয় জল পাওয়া যায়। তথাকার ভূমি, জলবায়ু এবং মনোরম পারিপার্শ্বিক দেখিয়া তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং সমিতির সভ্য-সভ্যাগণকে

দলে দলে লইয়া যাইয়া সেই স্থান দেখাইলেন তাঁহাদের অভিমত জানিবার জন্য। যে সকল সভ্য ও সভ্যা ভূমি দেখিলেন তাঁহারা এক বাক্যে উহার অজস্র প্রশংসা করিলেন। তাঁহাদের অনুকূল অভিমত পাইয়া স্বামী ত্রিগুণাতীত ভূমি-ক্রয়ের আবশ্যকীয় ব্যবস্থা করিলেন। যথাসময়ে দুই শত একর ভূমি ক্রীত হইল, তন্মধ্যে ২৫ একর সমিতি প্রতিপালনার্থ নির্দিষ্ট রহিল। সমিতির যে যে সদস্য উপনিবেশে বসবাস করিতে সম্মত হইলেন তাঁহাদের মধ্যে অবশিষ্ট ভূমি বিতরিত হইল। যাঁহারা তথায় কাজ করিবেন তাঁহাদের বাসের জন্য সমিতির নির্দিষ্ট অংশে একটী গৃহ নির্মিত হইল। প্রতি সপ্তাহে স্বামী ত্রিগুণাতীত তথায় যাইয়া উক্ত গৃহে বাস করিতেন। উপনিবেশের কার্য্যালয়রূপেও তাহা ব্যবহৃত হইল। শনিবার সন্ধ্যায় ঔপনিবেশিকগণের জন্য স্বামীজি তথায় ধর্মপ্রসঙ্গ করিতেন। সমিতির ভূমিতে গৃহপালিত পশুদের জন্য বিভিন্ন গৃহ এবং একটী গভীর জলকূপও ছিল।

সমিতির সদস্যগণ একে একে স্ব স্ব ভূমিতে গৃহনির্মাণ, কূপখনন, ফলফুলের বাগান স্থাপন ও শস্যরোপণাদি করিলেন। অদীর্ঘ কালের মধ্যে উপনিবেশ অনেক দূর অগ্রসর হইল। সমিতির ভূমিতে অশ্বশালায় অশ্বগুলি থাকিত এবং ঔপনিবেশিকগণ কর্তৃক স্ব স্ব কার্য্যে ব্যবহৃত হইত। স্বামী ত্রিগুণাতীতের আশা ছিল যে, সমিতির সভ্যগণ বৃদ্ধ বয়সে কর্মজীবন হইতে অবসর গ্রহণপূর্বক তথায় শান্তিতে ও ঈশ্বরচিন্তায় থাকিবেন। তাঁহার আরও সঙ্কল্প ছিল যে, এই উপনিবেশ বেদান্ত প্রচারের একটি যোগ্য কেন্দ্র হইবে এবং তথায় একটি মন্দির ও গ্রন্থাগার থাকিবে। গ্রন্থাগারে বেদান্তদর্শন সম্বন্ধে সকল প্রধান গ্রন্থ রক্ষিত হইবে। অনাথ বালকবালিকাদের জন্য একটি আশ্রম এবং অসহায়, অক্ষম বৃদ্ধ-বৃদ্ধা ভক্তগণের জন্য আর একটি আশ্রম এবং রোগীদিগের জন্য একটি হাসপাতালের সঙ্কল্পও তাঁহার ছিল। সেই হাসপাতালে রোগীদের জন্য একটি চিকিৎসালয় ও ঔষধশালা থাকিবে, যাহাতে রোগীগণ মনোরম পরিবেশ, সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য ও স্বাস্থ্যকর জলবায়ুতে থাকিয়া আরোগ্যের সুযোগ পাইবেন। স্বামী ত্রিগুণাতীতের জীবনে ছিল যেমন চিন্তা তেমন কাজ। এমন কি, বৃহৎ

কর্মের জন্যও আবশ্যকীয় অর্থের অভাব তাঁহার কখনো হইত। নিম্নোক্ত প্রবাদের ভাবটি তাঁহার জীবনে আক্ষরিক ভাবে সত্য হইয়াছিল।—

"যিনি দুঃসময়ে এক কড়ি সঞ্চয় করেন এবং সুসময়ে রাজার মত মুক্তহস্তে বহু অর্থ ব্যয় করিতে পারেন ভাগ্যলক্ষ্মীর কৃপা তাঁহার উপর বর্ষিত হয়।" সামান্য ব্যাপারে মিতব্যয়ী ইহলেও তিনি কার্য্যকালে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতেন। সঙ্কল্প সুদৃঢ় হইলেই সঙ্কট মুহূর্তে অপ্রত্যাশিত ভাবে প্রয়োজনীয় অর্থ তাঁহার হস্তে উপস্থিত হইত। একাধিক বার ইহা দেখা গিয়াছে। স্বামী ব্রহ্মানন্দের নিবাসার্থ যখন হিন্দু মন্দিরের ত্রিতল নির্মাণের জন্য অর্থসংগ্রহের কথা তিনি একদিন গভীর ভাবে ভাবিতেছিলেন তখন মন্দির-দ্বারে হঠাৎ ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। জনৈক বক্রদেহ, জরাগ্রস্ত পুরাতন সদস্য অন্য একজনের সাহায্যে মন্দিরে আসিলেন। বয়োবৃদ্ধ এবং অসমর্থ হইলেও স্বামী ত্রিগুণাতীত এবং হিন্দুমন্দিরের প্রতি তাঁহার আন্তরিক অনুরাগ ছিল। তিনি একটি হাতের বাক্সে আট হাজার ডলার স্বর্ণমুদ্রা আনিয়া স্বামিজীর হস্তে দিলেন সঙ্কল্পিত ত্রিতল নির্মাণার্থ।

আর একবার তাঁহার হাতে আদৌ অর্থ ছিল না, অথচ পরদিন এক হাজার ডলারের একটি বিল দিতেই হইবে। অর্থাগমের উপায় উদ্ভাবনে তিনি গভীর চিন্তিত হইলেন। ঠিক সেইদিন সন্ধ্যায় জনৈক সদস্য আবশ্যকীয় অর্থ দানার্থ উপস্থিত হইলেন। পরদিন বিলের টাকা দিতে পারিয়া স্বামিজীর আনন্দের সীমা রহিল না। কংকর্ড উপনিবেশেও এইরূপ ঘটিত, যখনি অর্থাভাব হইত তখনি অর্থ আসিত। কূপ খনন, উদ্যান স্থাপন ও শস্যাদি রোপণ যথা সময়ে হইয়া গেল, ক্রমশঃ সুবৃহৎ ভূমিখণ্ড বর্ধিষ্ণু উপনিবেশের আকার ধারণ করিল। পরার্থে তিনি মহৎ কার্য্য করিতেছিলেন বলিয়া লক্ষ্মীদেবী সুপ্রসন্না হইয়া তাঁহার সকল অভাব মোচন করিতেন। জগন্মাতার যন্ত্রস্বরূপ হইয়া নিঃস্বার্থভাবে কার্য্য করিলে অর্থাভাব ঘটে না। ইহা স্বামী ত্রিগুণাতীতের জীবনে পুনঃ পুনঃ প্রমাণিত। মন্দিরের কর্তব্য সমাপনান্তে স্বামী ত্রিগুণাতীত প্রতি সপ্তাহে একবার উপনিবেশে যাইতেন কাজকর্ম তত্ত্বাবধান করিবার জন্য।

তখন তিনি নূতন নূতন সমস্যার সমাধান করিতেন এবং ঔপনিবেশিকগণের কুশল সংবাদ লইতেন।

উপনিবেশের ক্রমাগত উন্নতি হইতে লাগিল। ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দে জানুয়ারী মাসে স্বামী ত্রিগুণাতীতের আকস্মিক দেহত্যাগ না হইলে উপনিবেশ সম্বন্ধে সকল সঙ্কল্পই পরিপূর্ণ হইত। তাঁহার উপস্থিতি এবং অনুপ্রেরণার অভাবে ঔপনিবেশিকগণের আগ্রহ ক্রমশঃ হ্রাস পাইল এবং তাঁহারা পরবর্তী দুই বৎসরে একে একে স্থানত্যাগ করিলেন। অনেকে স্ব স্ব ভূমি ও গৃহ বিক্রয় করিয়া দিলেন। তখন সমিতির পরিচালকগণ দেখিলেন যে, স্বামী ত্রিগুণাতীতের স্থান গ্রহণের সময় বা সামর্থ্য অন্য কাহারো নাই। তাই তাঁহারা উপনিবেশে সমিতির যে. ভূসম্পদ ছিল তাহা বিক্রয় করিয়া দিলেন। এইরূপে কংকর্ড উপনিবেশ উঠিয়া গেল। কিন্তু উহার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয় নাই। কারণ যাঁহারা তথায় নিবাস ও কাজকর্ম করিয়া ছিলেন তাঁহারা সেই সময়কে তাঁহাদের জীবনের পুণ্যতম অংশ বলিয়া বিবেচনা করেন।

১৯১৫খ্রীঃ সানফ্রান্সিস্কোতে পানামা প্যাসিফিক আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী হয়। ইহাকে পৃথিবীর একটি অদ্ভুত বৃহত্তম প্রদর্শনী বলা যাইতে পারে। ঘটনা ক্রমে প্রদর্শনী কমিটি কয়েকটি সহজলভ্য স্থান বিবেচনান্তে সানফ্রান্সিস্কো উপসাগরের তীরবর্তী মেরিনা নামক বিস্তৃত উন্মুক্ত স্থানটি পরিশেষে পছন্দ করিলেন। উহা হিন্দু মন্দির হইতে মাত্র তিনটি বাড়ীর পরে সুবর্ণ তোরণের মধ্যবর্তী ছিল। হিন্দু মন্দিরের ছাদ হইতে উক্ত স্থানের গৃহনির্মাণাদি সকল কার্য্যই দেখা যাইত। পূর্ব বৎসর স্বামী ত্রিগুণাতীত নানা দেশীয় জাতীয় পতাকা ক্রয় করিলেন। প্রদর্শনীতে যে সকল জাতীয় দিবস উদ্‌যাপিত হইবে সেই সকল দিনে বিভিন্ন পতাকা হিন্দু মন্দিরে উত্তোলন করিবার জন্য এইগুলি ক্রীত হইল। হিন্দু মন্দিরকে এমন ভাবে অপূর্ব আলোক-সজ্জায় সজ্জিত করা হইল যে, উহাকে. রাত্রিতে পরীর দেশতুল্য অতি সুন্দর দেখাইল। ইহাতে প্রদর্শনীতে সমবেত সহস্র সহস্র নরনারীর দৃষ্টি হিন্দু মন্দিরে আকৃষ্ট হইল।

হিন্দু মন্দিরের চতুর্দিকে বাগান করিবার জন্য স্বামী ত্রিগুণাতীত নগর

সরকারের অনুমতি লইয়াছিলেন। পার্শ্ববর্তী পথ প্রস্থে দশ ফুট এবং মন্দিরের দেওয়াল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সহরের কর্তৃপক্ষগণ স্বামী ত্রিগুণাতীতকে গভীর শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন বলিয়া তাঁহারা সকলে সানন্দে উক্ত অনুমতি দিয়াছিলেন। হিন্দু মন্দিরের দুই দিকে সহরের দুইটী রাস্তা ছিল—সম্মুখ ভাগে ওয়েব্‌ষ্টার ষ্ট্রীট এবং সভাগৃহের পার্শ্বে ফিলবার্ট ষ্ট্রীট। স্বামিজী মন্দিরের ঐ দুই দিকে কংক্রীট প্রাচীর নির্মাণ করেন। প্রাচীর তিন ফুট উচ্চ এবং মন্দিরের দেওয়াল হইতে তিন ফুট দূরে ছিল। মধ্যবর্তী স্থান মৃত্তিকা-পূর্ণ করিয়া জনৈক বন্ধু মালীর সাহায্যে উহা বাগানে পরিণত হয়। বাগানে বিভিন্ন ফলফুলের গাছ রোপিত হয়। বাগানের জন্য হিন্দু মন্দির অপূর্ব শোভ ধারণ করিল। কিন্তু পার্শ্ববর্তী রাস্তার প্রস্থ কিঞ্চিৎ কমিল। প্রাচীরের উপরে কারুকার্যযুক্ত লৌহময় বেড়া ছিল পথচারীর উপদ্রব হইতে বাগানকে রক্ষা করিবার জন্য। বাগানের মধ্যে কয়েকটী শোভাবর্ধক প্রস্তরমূর্তি স্থাপিত ছিল। স্থানীয় পল্লীর মধ্যে এই উদ্যান-বেষ্টিত মন্দির সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত।

উদ্যান, পতাকা এবং অন্যান্য সৌন্দর্যবর্ধক বস্তুর দ্বারা দুইটি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইত। প্রথম উদ্দেশ্য বিরাট প্রদর্শনীকে সম্মানিত এবং সহরবাসী ও ব্যবসায়ী-দিগকে সন্তুষ্ট করা। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য প্রদর্শনীতে যে সহস্র সহস্র দর্শক আসিবেন তাঁহাদের একাংশকে মন্দিরে আকৃষ্ট করা। য়িহুদী ধর্মগুরু মুসা যেমন মর্ত্যে প্রতিশ্রুত স্বর্গরাজ্য স্থাপন করিতে পারেন নাই তেমনি স্বামী ত্রিগুণাতীত স্বীয় কার্যের সাফল্য দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। কারণ, প্রদর্শনী আরম্ভ হইবার পূর্বেই তিনি দেহরক্ষা করেন।

প্রদর্শনীর পূর্ববৎসর ১৯১৪ খ্রীঃ স্বামিজীর দৈহিক অসুস্থতা বহুগুণে বাড়িয়া গেল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, অসহ্য অসুস্থতা সত্ত্বেও তাঁহার দেহমন কর্মক্ষম রহিল। জনৈক শিষ্য কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া তিনি এই বিষয়ে বলিয়াছিলেন, "অসহ্য যন্ত্রণার মুহূর্তে বহুবার আমি ভাবি—আমার দেহ যাক্, আমার জীবন শেষ হোক্। কিন্তু আমি তা করতে পারি না। কারণ, মনে এই চিন্তা আসে যে, ঠাকুরের কাজ চলা উচিত। তখন প্রবল ইচ্ছাশক্তি দ্বারা

দেহকে কার্যাক্ষম রাখি। এই দেহ একটা শুষ্ক খোলসের মত হয়ে গেছে এবং যে কোন মুহূর্তে খণ্ড খণ্ড হতে পারে। গত তিন বৎসর যাবৎ মনের জোরেই আমি দেহকে চালিত করছি।" তাঁহার ইচ্ছাশক্তি কত সুদৃঢ় ও সবল ছিল তাহা তাঁহার অল্পসংখ্যক অন্তরঙ্গ শিষ্যই জানিতেন। তাঁহার বহুমুখী কার্য্যাবলী অক্ষীণ গতিতে চলিতে লাগিল। ইহার ফলে তাঁহার দেহ যে ক্রমেই জীর্ণ ও ভগ্ন হইল তাহার সুস্পষ্ট লক্ষণ প্রকাশ পাইল। ১৯১৪ খ্রীঃ বসন্তকালে তিনি কোন শিষ্যকে তাঁহার বক্তৃতার ভাব ও ভাষা প্রভৃতি সমালোচনা করিতে বলিলেন। ছাত্রটি স্বামিজীর বক্তৃতায় বর্ধমান শব্দকম্পন লক্ষ্য করিলেন। উক্ত কম্পন সম্বন্ধে শিষ্যের প্রথমে মনে হইল, ইহা তাঁহার ভাবাতিশয্যপ্রসূত এবং বক্তৃতার প্রধান চিন্তাগুলিকে মর্মস্পর্শী করিবার জন্য স্বেচ্ছাকৃত। উক্ত দিনের বক্তৃতায় ইহাই সমালোচিত হইল। স্বামিজী ইহা শুনিয়া বলিলেন যে, তিনি সেই কম্পন বন্ধ করিবার চেষ্টা করিবেন। কিন্তু পরবর্তী বক্তৃতাগুলিতে তিনি বিশেষ চেষ্টা করিয়াও অকৃতকার্য্য হইলেন। কম্পন পূর্ববৎ বক্তৃতার মাঝে মাঝে কখনো অল্প, কখনো অধিক দেখা গেল। তখন শিষ্যটির মনে হইল, স্বামিজীর স্নায়বিক দুর্বলতার ফলে উক্ত কম্পন উৎপন্ন হয়।

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে স্বামিজীর মনোযোগ এই বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইল। তখন তিনি ভাবাবিষ্ট হইয়া বলিয়াছিলেন, "ইহা বন্ধ করার জন্য আমি সাধ্যমত চেষ্টা করেছি, যাতে ইহা শ্রোতৃমণ্ডলীর লক্ষনীয় না হয়। কিন্তু যখনি আমি বক্তৃতামঞ্চে উপস্থিত হই তখনি জগন্মাতা সমক্ষে আবির্ভূতা হন এবং আমাকে দিব্য প্রেমের ভাবে পরিপূর্ণ করেন। সেই ভাবাতিশয্য আমি ভাষায় প্রকাশ করিতে পারি না। যখন খুব চেষ্টা করে আমি কণ্ঠস্বর সংযত রাখি তখনও কম্পন থাকিয়া যায়। ভাবাবেগ ক্রমশঃই বাড়িয়া চলিতেছে এবং উহা সম্পূর্ণরূপে সংযত করা আমার পক্ষে অসম্ভব হইয়াছে।" এই ঘটনা ডিসেম্বর মাসের মধ্যভাগে ঘটে। তখন সকলে আগামী বড়দিনের উৎসবের জন্য উদ্‌গ্রীব ছিলেন। সেই বৎসর বড়দিন পড়িল শুক্রবারে। তৎপূর্বে সাত দিন ধরিয়া উৎসবের জন্য হিন্দু মন্দিরে অভূতপূর্ব

আয়োজন চলিল। মন্দির ও সভাগৃহ বিশেষভাবে সজ্জিত হইল। অন্যান্য চিত্রের সহিত যীশুখ্রীষ্টের চিত্র সর্বাপেক্ষা আলোকিত ও সুশোভিত হইল।

বড়দিনের উৎসব সকাল ৬টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত ১৫ ঘণ্টা ব্যাপী চলিবে। পূর্বদিন তিনি বক্তৃতাদি এবং সুদীর্ঘ কার্যসূচীর জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। রাত্রি দুইটা পর্য্যন্ত তিনি উৎসবের ক্ষুদ্রতম বিষয়টী পর্যন্ত তত্ত্বাবধান করিলেন। তখন হইতে মাত্র দুই ঘণ্টা বিশ্রাম করিয়া আবার ভোর ৪টায় তিনি উঠিয়া পড়িলেন, সেদিন রাত্রে তাঁহার আদৌ ঘুম হইল না। এইরূপে স্বামী ত্রিগুণাতীত আমেরিকায় বেদান্ত প্রচারের জন্য দিনে দিনে আত্মাহুতি দিয়াছেন। পূর্ব দিন সকালে কোন শিষ্যকে ডাকিয়া তিনি বলিলেন, "আমি চাই, তুমি প্রতিজ্ঞা কর যে, যদি অদূর ভবিষ্যতে কিছু মন্দ ঘটে তুমি এমন ব্যবস্থা করিবে, যাহাতে আমার মৃত্যুর পর আমার মস্তিষ্ক পৃথক্ করিয়া কোন বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারে প্রেরিত এবং বিশ্লেষণার্থ এ্যাল্‌কোহলে সংরক্ষিত হয়।" উৎসব দিবসে তিনবার তিনি সেই শিষ্যকে উপরোক্ত অনুরোধ করিলেন। জগদম্বা কর্তৃক আসন্ন মৃত্যুর পূর্বাভাস পাইয়াই কি তিনি এইরূপ বলিয়াছিলেন? তাঁহার অটল বিশ্বাস ছিল যে, যোগীর মস্তিক ভোগীর মস্তিষ্ক অপেক্ষা আকারে বৃহৎ ও পৃথক্, ইহা অনুবীক্ষণ যন্ত্রসাহায্যে পরীক্ষা করিলে বোঝা যাইবে এবং ইহা প্রমাণিত হইলে বৈজ্ঞানিক জগৎ যোগের এই বিশেয়ত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য হইবে। এইরূপে তিনি সংকল্প করিয়াছিলেন যে, এমন কি মৃত্যুর পরেও তাঁহার দেহ যোগের সেবায় নিয়োজিত হইবে।

বড়দিন সকাল ৫॥০ টায় মন্দিরের সভা-গৃহ উন্মুক্ত হইল এবং ভক্তগণ আসিতে লাগিলেন। ছয়টায় অর্গ্যান সঙ্গীত এবং স্বামীজি কর্তৃক শান্তিপাঠ হইল। সুন্দর সাজসজ্জা, ধূপগন্ধ, ভক্তিভাবোদ্দীপক কণ্ঠসঙ্গীত, বিবিধ যন্ত্রসঙ্গীত, বিবিধ ধর্মগ্রন্থের পাঠ ও আবৃত্তি এবং স্বামী ত্রিগুণাতীতের দিব্য উপস্থিতি ও স্বর্গীয় প্রেম-পবিত্রতা বিকিরণ এমন এক ভাগবত পরিবেশ সৃষ্টি করিল যে, প্রত্যেক শ্রোতার হৃদয় ঊর্দ্ধে উন্নীত ও ধর্মভাবে পরিপূর্ণ হইল। উত্তপ্ত সৌরকরের স্পর্শে যেমন তুষার বিগলিত হয় তেমনি সেই স্বর্গীয় পরিবেশে

শ্রোতৃবৃন্দের মনোগত জড়ত্ব দ্রবীভূত হইল। অন্যান্য উৎসবের ন্যায় এই উৎসবেও তিনি সমগ্র দিনের মধ্যে মুহূর্তের জন্যও বেদী হইতে নামিলেন না। কিরূপে যে তিনি দৈহিক অসুস্থতা ভুলিয়া রোগ-জীর্ণ দেহকে ক্রমাগত পনের ঘণ্টা কার্য্যরত রাখিলেন তাহা তিনিই জানেন! তিনি সেদিন পূর্বাহ্ণে এগারটায়, অপরাহ্ণ তিনটায় এবং রাত্রি আটটায় তিনটী বক্তৃতা দিলেন এবং সকাল ৬টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত স্তবপাঠ, সঙ্গীত ও ধর্মগ্রন্থ ব্যাখ্যা করিলেন। উৎসবান্তে আশীর্বাণী ও শান্তিপাঠ তৎকর্তৃক সম্পন্ন হইল। যেদিন এক অবতারের সাক্ষাৎ শিষ্য দ্বারা অন্য অবতারের আবির্ভাব উৎসব অনুষ্ঠিত হইল সেদিন যাঁহারা উপস্থিত থাকিবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছিলেন তাঁহাদের কি অলৌকিক অভিজ্ঞতাই না হইয়াছিল! উৎসব সমাপ্ত হইল; কিন্তু উহার অসীম প্রভাব অনেকের হৃদয়ে ও জীবনে চিরস্থায়ী রহিল।

বড়দিনের উৎসবের মাত্র তিন দিন পরে রবিবারে যে দুর্ঘটনা ঘটিবে তাহা কে জানিত? রবিবারের প্রভাত সুন্দর ও সুখকর ছিল। সকলে প্রাতঃকালীন, মাধ্যাহ্নিক ও সান্ধ্য বক্তৃতাদির জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। কিন্তু সেদিন কোন কার্য্যই সুশৃঙ্খল ভাবে হইল না। যেদিন একটী স্বর্গীয় জীবন-প্রদীপ নির্বাপিত হইবে সে দিন হিন্দু মন্দিরের প্রত্যেকে অন্তরে অজ্ঞাত অব্যক্ত আতঙ্ক অনুভব করিলেন। যাঁহার জীবন পরার্থে উৎসর্গীকৃত এবং ঐশী প্রেরণায় চালিত তাঁহার জীবনে কোন কিছুই আকস্মিক নহে। সেই জীবনের প্রতি চিন্তা ও প্রতি কার্য্য দৈব ইঙ্গিতে নিয়ন্ত্রিত হয়।

রবিবারের বৈকালিক বক্তৃতায় যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা কেহই বিন্দুমাত্র ভাবিতে পারেন নাই যে, তাঁহাদের প্রেমিক উপদেষ্টার মহাপ্রয়াণ সমাসন্ন। যখন অন্তকাল সমাগত হইল তখন জিশু খ্রীষ্ট জানিতেন যে, যাঁহাদের তিনি বুকে রাখিয়া মানুষ করিয়াছেন তাঁহারা তাঁহার বিরুদ্ধেও বিশ্বাসঘাতকতা করিবে! যে শিষ্য হিন্দু মন্দিরে বাস করিয়াছিলেন এবং যাঁহাকে স্বামী ত্রিগুণাতীত তাঁহার মানসিক অশান্তি ও দুঃসহ সন্দেহের সময় কত সান্ত্বনা, সহানুভূতি ও উপদেশ দিয়াছেন সেই শিষ্যই গুরুর প্রাণনাশের কারণ হইলেন।

উক্ত শিষ্য ঘন ঘন বিষাদে অভিভূত হইতেন এবং মস্তিষ্ক-বিকৃতির পরিচয় দিতেন। এক চরম বিষণ্ণ মুহূর্তে তিনি মন্দির ত্যাগ করেন এবং দীর্ঘকাল অনুপস্থিত থাকেন। অবসন্ন অবস্থায় তাঁহার মনে বিকারসমূহ বর্ধিত হয় এবং আত্মহত্যার সংকল্প জাগে। এই কুসংকল্পের বশবর্তী হইয়া তিনি একটি বোমা লুকাইয়া স্মরণীয় উৎসবের অপরাহ্ণ অধিবেশনে মন্দিরে আসেন এবং অন্যের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হইবার পূর্বেই বেদীতে উহা নিক্ষেপ করেন। তখন বেদীতে স্বামী ত্রিগুণাতীত দাঁড়াইয়া বক্তৃতা দিতেছিলেন। বোমা বেদীতে পড়িয়া তৎক্ষণেই ফাটিয়া গেল ও ভীষণ শব্দ হইল এবং ঘন নীল ধূমের মেঘে বেদী আবৃত হইল। সৌভাগ্যক্রমে শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে কেহ আহত বা নিহত হন নাই। কিন্তু যিনি বোমা ফেলিলেন তিনিই গুরুতর আঘাত পাইলেন। বেদীরও অশেষ ক্ষতি হইল এবং স্বামী ত্রিগুণাতীত এমন সাংঘাতিক ভাবে আহত হইলেন যে, তাঁহাকে চিকিৎসার্থ এফিলিয়েটেড কলেজেস হাসপাতালে (Affiliated Colieges Hospital) লইয়া যাইতে হইল। সমিতির জনৈক সদস্য এই বিখ্যাত হাসপাতালে ভর্তির ব্যবস্থা করিলেন এবং অন্য একটী সদস্য স্বতন্ত্র কক্ষের ব্যয়ভার বহন করিতে স্বেচ্ছায় স্বীকৃত হইলেন। হাসপাতালে সশ্রদ্ধ শিষ্য-শিষ্যাগণ তাঁহার দুঃসহ ক্ষত-যন্ত্রণা নিবারণের জন্য যথাসাধ্য সেবা-শুশ্রূষা করিলেন। হাসপাতালে যাইবার পথে স্বামী ত্রিগুণাতীত জিজ্ঞাসা করিলেন, 'অমুক কোথায়? হায় হতভাগ্য!' অসহ্য যাতনার মধ্যেও তাঁহার অন্তর দুর্ভাগ্য শিষ্যের দুষ্কর্মের জন্য করুণার্দ্র ছিল।

স্বামিজীকে দেখিবার জন্য প্রত্যহ বহু ভক্ত হাসপাতালে যাইতেন এবং মন্দিরে তাঁহার সংবাদ দিতেন। একজন সেবক দিবারাত্রি তাঁহার কাছে থাকিতেন। তাঁহার দেহ খুব ভারী ছিল বলিয়া তাঁহাকে নাড়ান অত্যন্ত কঠিন ছিল। চিকিৎসা ও শুশ্রূষাদির উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা সত্ত্বেও তাঁহার রোগ-জীর্ণ দেহ ক্ষত-ব্যথা সহনে অক্ষম হইয়া পড়িল। যদিও তাঁহার প্রত্যেক জাগ্রত মুহূর্ত ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক ছিল তথাপি অভিযোগ বা অশান্তির একটী বাক্যও তাঁহার মুখ হইতে নির্গত হয় নাই। মাঝে মাঝে তিনি এক এক শিষ্যকে শেষ নিশ্বাস

পর্যন্ত হিন্দু মন্দিরের প্রতি বিশ্বস্ত থাকিবার জন্য সজীব প্রেরণা দিতেন। অন্তিম সময়েও তাঁহার মন নিজের চিন্তায় আদৌ নিরত ছিল না, ইহা ঠাকুরের কর্ম প্রসার ও বাণীপ্রচারের জন্য চিন্তিত ছিল। ১৯১৫ খ্রীঃ ৯ই জানুয়ারী বৈকালে বাহ্যতঃ সংজ্ঞাহীন অবস্থা হইতে জাগ্রত হইয়া পার্শ্বস্থ তরুণ সেবককে তাঁহার ভবিষৎ আধ্যাত্মিক উন্নতির আভাস দিয়া বলিলেন যে, পরবর্তী দিবস ১০ই জানুয়ারী স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিনে তিনি দেহরক্ষা করিবেন। ১০ই জানুয়ারী সন্ধ্যা ৭॥০ টার পূর্বে তরুণ সেবককে কয়েক মিনিটের জন্য কক্ষের বাহিরে আসিতে হয়। সেবক কক্ষে ফিরিয়া যাইয়া দেখিলেন, স্বামী ত্রিগুণাতীত কিঞ্চিৎপূর্বে মহাসমাধিমগ্ন হইয়াছেন। যে দিব্য ধাম হইতে তিনি জগদ্ধিতায় ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ কর্তৃক মর্ত লোকে আনীত হন তথায় তিনি এখন প্রত্যাগমন করিলেন। এইরূপে পুণ্যভূমি মহাভারত হইতে বহুদূরে আমেরিকায় প্রাণপ্রিয় গুরুভ্রাতৃবৃন্দের কাহারো সান্নিধ্য না পাইয়া একমাত্র শ্রীগুরুর চরণে আশ্রিত থাকিয়া তিনি অমর লোকে গমন করিলেন।

সন্ধ্যা ৭-৪৫ মিনিটে স্বামী ত্রিগুণাতীতের মহাসমাধির সংবাদ হিন্দু মন্দিরে আসিল। এই দুঃসংবাদে শিষ্য-শিষ্যাগণ শোক-সাগরে নিমজ্জিত হইলেন। তাঁহাদের ক্ষুদ্র শোক সভায় ইহা স্থিরীকৃত হইল যে, স্বর্গগত স্বামীজির ইচ্ছানুসারে তাঁহার দেহ সাইপ্রেস লন সেমিটারীতে ভস্মীভূত হইবে। ১৪ই জানুয়ারী যে স্মৃতিসভা হইল তাহাতে স্বামীজির বহু ভক্ত ও বন্ধু যোগ দিলেন। বেদান্ত সমিতির সভাপতি মিঃ পেটারসন উক্ত সভায় পৌরহিত্য করিলেন। অনুরাগী ভক্তবৃন্দ ও বন্ধুগণ কর্তৃক প্রেরিত সুন্দর সুগন্ধি বিবিধ পুষ্পে শোক-সভার ক্ষুদ্র কক্ষ সুসজ্জিত হইল। শিষ্যগণ স্তবপাঠ, সঙ্গীত ও ধর্মগ্রন্থ পাঠাদি দ্বারা শোকসভাকে চিরস্মরণীয় করিলেন। সভাপতির ভাষণ, স্তবপাঠ, সঙ্গীতাদি শোকাকুল শ্রোতৃমণ্ডলীর কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইয়া দিব্য ভাবতরঙ্গ সৃষ্টি করিল। তাঁহারা ইহা স্মরণ করিয়া অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিলেন যে, তাঁহাদের চরিত্র-গঠন ও ধর্মোন্নতির জন্য স্বামিজী সম্পূর্ণ আত্মাহুতি দিলেন। স্বর্গগত সন্ন্যাসীর অলৌকিক জীবন-দৃষ্টান্ত অল্পাধিক পরিমাণে মার্কিণ শিষ্য-শিষ্যাদের জীবনে

রূপায়িত হইয়াছিল। স্বামিজীর উপদেশ দৈনন্দিন জীবনে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য তাঁহারা বদ্ধপরিকর হইলেন এবং সুদৃঢ় সঙ্কল্প করিলেন যে, তাঁহাদের প্রত্যেকের জীবন যেন স্বর্গত মহাপুরুষের জীবন্ত স্মৃতিমন্দিরে পরিণত হয়।

সভান্তে সকলে অনুরুদ্ধ হইলেন, মহাসমাধিমগ্ন মহাপুরুষের শেষ দর্শন লাভের জন্য। অনেকেই বিশ্বাস করিতে পারিলেন না যে, তাঁহাদের স্বামিজী তাঁহাদিগকে চিরতরে ছাড়িয়া গিয়াছেন এবং আর স্থূল দেহে ফিরিবেন না। স্বামিজীর মুখমণ্ডল জ্যোতির্মণ্ডিত, প্রেমপূর্ণ, ও সুহাস্য-রঞ্জিত ছিল। মৃতদেহ দেখিয়া অনুরাগী ভক্তগণ বুঝিলেন, স্বামিজী মহাসমাধিতে দেহরক্ষা করিয়াছেন। অনেকে শোকাতিশয্যে অশ্রুসংবরণ করিতে পারিলেন না। কেহ কেহ অন্তরে অনুভব করিলেন স্বামিজীর চিরসান্নিধ্য। যখন সকলে বিদায় লইলেন তখন মৃতদেহ শবাধারে স্থাপিত হইল। বহু শিষ্যশিষ্যা শবাধারের অনুগমন করিলেন। যে সাইপ্রেস লন সেমিটারিতে শবদেহ বাহিত হইল তাহার বর্তমান নাম সাইপ্রেস লন মেমোরিয়েল পার্ক। শ্মশানে শিষ্যাগণ স্তবপাঠ ও সঙ্গীতাদি করিলেন। তৎপরে শবাধার দাহকক্ষে অগ্নিকুণ্ডে স্থাপিত হইল। কাঁচের দরজা দিয়া শোকাকুল শিষ্যশিষ্যাগণ দেখিলেন, স্বামী ত্রিগুণাতীতের স্থূল দেহ অচিরে পঞ্চভূতে বিলীন হইল। মহাপুরুষের মহাপ্রয়াণে প্রকৃতিও সমবেদনা প্রকাশ করিলেন। তখন প্রচুর বৃষ্টিপাত হইল এবং প্রবল ঝঞ্ঝা বহিল।

উক্তদিন পাশ্চাত্য জগতের পক্ষে স্মরণীয় ও অর্থপূর্ণ। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের একটি অন্তরঙ্গ পার্ষদ পাশ্চাত্যে বেদান্ত প্রচারের জন্য প্রাণদান করিলেন। ইহার ফলে আমেরিকায় বেদান্ত আন্দোলনের ভিত্তি সুদৃঢ় হইল। মহাসমাধির কয়েকদিন পূর্বে স্বামী ত্রিগুণাতীত স্বশিষ্যা শ্রীমতী পেটারসনকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, হিন্দুমন্দিরকে অচিরে বন্ধকমুক্ত করিবার জন্য। তদনুসারে শ্রীমতী পেটারসন স্বামিজীর মহাসমাধির পরে অর্থসংগ্রহ করিয়া স্বামিজীর শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করেন। বেলুড় মঠের নির্দেশে স্বামী প্রকাশানন্দ স্বর্গত অধ্যক্ষের স্থলে অভিষিক্ত হইলেন।

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই এপ্রিল যখন শান্তি আশ্রম বন্য পুষ্পে সুশোভিত

হইয়াছিল তখন স্বামী প্রকাশানন্দের নেতৃত্বে ভক্তগণের একটি ক্ষুদ্র দল স্বর্গত সন্ন্যাসীর ভস্মাস্থি লইয়া তথায় উপস্থিত হন। যখন তাঁহারা তোরণ অতিক্রম-পূর্বক আশ্রমে পদার্পণ করিলেন তখন তাঁহাদের চিত্তদল স্বর্গগত স্বামীজীর পুণ্য স্মৃতিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। শান্তি আশ্রমের প্রত্যেক কেবিনে এবং প্রত্যেক বস্তুতে ও প্রত্যেক বৃক্ষে স্বামী ত্রিগুণাতীতের পুণ্য স্মৃতি বিজড়িত। স্বামী তুরীয়ানন্দের দুশ্চর তপস্যা এবং স্বামী ত্রিগুণাতীতের নিবিড় সাধনা ও পূত ভস্মাস্থি দ্বারা শান্তি আশ্রম মহাতীর্থে পরিণত। যাঁহারা সংসার-সন্তপ্ত হইয়া এই আশ্রমে আগমন করিবেন তাঁহাদের জন্য উপরোক্ত মহাপুরুষদ্বয় তথায় শান্তির অনন্ত উৎস রাখিয়া গিয়াছেন। শিষ্যোপম তীর্থযাত্রীগণ পূত ভস্মাস্থি সিদ্ধগিরিতে মাথায় করিয়া লইয়া গেলেন। তথায় স্বামী প্রকাশানন্দ কর্তৃক পরলোকগত মহাপুরুষের প্রতি মর্মস্পর্শী শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনান্তে ত্রিভূজাকার ধুনিক্ষেত্রের নিম্নে ভস্মাস্থি প্রোথিত হইল। সেই রজনী পূর্ণিমালোকে উদ্ভাসিত ছিল। যাঁহার পুণ্য অস্থি শান্তি আশ্রমে রক্ষিত হইল তাঁহার নিকট জগৎপ্রপঞ্চ ঈশ্বরের বিরাট দেহরূপে প্রতীত হইত। সুদীর্ঘ পাইন গাছ ত্রিভুজাকার ধুনীক্ষেত্রের উপর প্রহরীবৎ দণ্ডায়মান। বসন্তকালে যখন পর্বতগাত্র পুষ্পাবৃত এবং মলয় পবন প্রবাহিত হইত তখন আশ্রমের তীর্থযাত্রীগণ স্বামী ত্রিগুণাতীতকে স্মরণ করিয়া মহতী প্রেরণা লাভ করিতেন।

স্বামী ত্রিগুণাতীত মহাযোগী ও মহাকর্মী ছিলেন। তাঁহার মহৎ কর্মের নিদর্শনরূপে হিন্দুমন্দির অদ্যাপি সানফ্রান্সিস্কো নগরে সগৌরবে বিদ্যমান। তাঁহার নিকট যোগশিক্ষা করিয়া শত শত মার্কিণ নরনারী ধর্মজীবনে দীক্ষিত হইয়াছেন। তিরোহিত মহাপুরুষের মৌন স্মৃতিরূপে যদিও শুধু ভস্মাস্থি বিদ্যমান তথাপি তাঁহার প্রভাব এবং উদাহরণ হিন্দু মন্দিরে ও শান্তি আশ্রমে চিরকাল অনুভূত হইবে। যাঁহারা তাঁহার সমসাময়িক ছিলেন তাঁহারা তাঁহার কর্মাবলীর সুদূর-প্রসারী প্রভাব তত অনুভব করিতে পারেন নাই। যতই দিন যাইতেছে ততই আমেরিকার ধর্মজীবনে বেদান্তের প্রভাব বাড়িতেছে। ইহা দেখিয়া আধুনিক প্রচারকগণ ও ভক্তমণ্ডলী স্বামী ত্রিগুণাতীতের কথা ভক্তি

ভরে স্মরণ করিতেছেন। বৈদিক যুগের ব্রহ্মজ্ঞ ঋষির ন্যায় তিনি দ্বাদশ বর্ষাধিক আমেরিকায় বেদান্ত প্রচার করিয়া সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করিয়াছেন। আমেরিকায় যাইবার পর তিনি আর ভারতে ফিরিয়া আসেন নাই। এই দীর্ঘকাল বুকের রক্ত বিন্দু বিন্দু পাত করিয়া আমেরিকায় তিনি শ্রীগুরুর বাণীপ্রচারে ব্রতী ছিলেন। তাঁহার বহুমুখী ব্যক্তিত্ব পণ্ডিতমূর্খ, ধনীনির্ধন সকলকে আকৃষ্ট করিত। পার্বত্যনদী যেমন প্রবল বেগে সমুদ্রের দিকে প্রধাবিত হয় তেমনি স্বামী ত্রিগুণাতীতের উদার নিঃস্বার্থ হৃদয় ঈশ্বর-চিন্তায় ও লোককল্যাণে নিঃশেষিত হইল। তিনি তাঁহার শিষ্যদিগকে বলিতেন, "শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সহ্য কর।" তিনি নিজেই স্বীয় বাক্যের জীবন্ত বিগ্রহ ছিলেন। নিবেদিত জীবন পার্থিব দুঃখকষ্ট কিরূপে অগ্রাহ্য করে তাহা স্বামী ত্রিগুণাতীতকে দেখিলে বেশ বোঝা যাইত। তিনি বলিতেন, "আমার কাজের পশ্চাতে যে মহৎ উদ্দেশ্য আছে তাহা কেহ পাঁচ বৎসরে বুঝিবে, কেহ বা দশ বৎসরে, কেহ বা পনের বৎসরে; কেহ হয়ত কখনো বুঝিতে পারিবে না।" তাঁহার ইচ্ছা ঈশ্বরেচ্ছার অধীন ছিল বলিয়া তাঁহার দেহমন জগদম্বার যন্ত্রস্বরূপ হইয়াছিল। আধুনিক যুগে হিন্দুধর্মের জন্য যাঁহারা বিদেশে প্রাণদান করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে স্বামী ত্রিগুণাতীত সর্বাগ্রণী বলিলে অত্যুক্তি হয় না। হিন্দুধর্মেরআধুনিক ইতিহাসে তাঁহার অলৌকিক জীবনচরিত স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে।

———

বত্রিশ

অধরলাল সেন*

অধরলাল সেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পরম ভক্ত ও প্রিয় পার্ষদ ছিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "তুমি আমার পরম আত্মীয়।" তিনি ভক্ত সঙ্গে অধরের বাড়ীতে যাইয়া ভগবদ্‌ভাবে নৃত্যগীতাদি করিতেন। তাই শ্রীম 'কথামৃতে' লিখিয়াছেন, "অধরের বাড়ীর বৈঠকখানা ও ঠাকুর দালান তীর্থ হইয়াছে।" 'কথামৃতে'র চতুর্থ ভাগে তিনি বলিয়াছেন, "আজ অধরের বৈঠকখানা শ্রীবাসের আঙ্গিনায় পরিণত।" ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে জুন ঠাকুর শ্রীমকে বলিয়াছিলেন, "ভাবে দেখলাম, অধরের বাড়ী, বলরামের বাড়ী, সুরেন্দ্রের বাড়ী—এ সব আমার আড্ডা। ওরা এখানে না এলে আমার ইষ্টাপত্তি নাই।" অধরের বাড়ীতেই সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করেন।

হুগলী জেলার সিঙ্গুর গ্রামে এক সুবর্ণবণিক পরিবার বাস করিতেন। উক্ত বংশের ঘনশ্যাম সেন সিঙ্গুর হইতে কলিকাতায় আসিয়া বাস করিতে থাকেন। ঘনশ্যামের পুত্র কানুরাম, কানুরামের পুত্র রামহরি, রামহরির পুত্র মথুরামোহন এবং মথুরামোহনের পুত্র রামগোপাল। আরমানি স্ট্রীটে সুতার ব্যবসা করিয়া রামগোপাল প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন। তিনি আহিরীটোলায় শঙ্কর হালদার লেনে থাকিতেন। তাঁহার ছয় পুত্র ও দুই কন্যা ছিল। পুত্রদের নাম বলাইচাঁদ, দয়ালচাঁদ, শ্যামলাল, রামলাল, অধরলাল ও হীরালাল। তাঁহার পঞ্চম পুত্র অধরলাল সেন ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে ২রা মার্চ দোলপূর্ণিমার দিনে ভূমিষ্ঠ হন।

---

* শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহার "সুবর্ণবণিক কথা ও কীর্তি" নামক পুস্তকে অধর সেনের সংক্ষিপ্ত জীবনী আছে। "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে"র ২য় হইতে মন ভাগে পাওয়া যায় ঠাকুরের সহিত অধরের সাক্ষাৎ ও প্রসঙ্গ। এই দুই পুস্তক অবলম্বনে শ্রীকুমুদবন্ধু সেন "ভক্ত অধর সেন" শীর্ষক যে প্রবন্ধ লেখেন তাহা 'উদ্বোধন' পত্রিকার ১৩৫৬ ফাল্গুন ও চৈত্র এবং ১৩৫৭ আষাঢ় ও শ্রাবণ সংখ্যা-চতুষ্টয়ে প্রকাশিত হইয়াছে।

তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলাইচাঁদ সুশিক্ষিত, সাহিত্যানুরাগী এবং বাংলা গদ্যে ও পদ্যে পাঁচ খানি গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন। তিনি পরোপকারী, হৃদয়বান্ ও ধর্মপরায়ণ বলিয়া সুখ্যাতি লাভ করেন। জনসেবায় তিনি মুক্তহস্ত ছিলেন এবং দরিদ্র রোগিগণকে বিনামূল্যে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ দিতেন। অধরলাল ও হীরালাল উভয়ে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন।

অধরলালের পিতা রামগোপাল আহিরীটোলায় ১৭নং বেনেটোলা স্ট্রীটে নূতন বাসভবন নির্মাণ করিয়া তথায় প্রতি বৎসর দুর্গোৎসব করিতেন। তিনি নিষ্ঠাবান্ ও ধর্মপ্রাণ হিন্দু ছিলেন। তাঁহার বাড়ীতে বার মাসে তের পার্বণ অনুষ্ঠিত হইত। তাঁহার বংশধরগণ এখনও দুর্গোৎসব করিয়া আসিতেছেন। এই বাড়ীতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বহু বার পদার্পণ করিয়াছেন। তথায় তাঁহার শুভাগমন উপলক্ষে ভগবৎপ্রসঙ্গ ও ধর্মসঙ্গীতাদি হইত এবং মহানন্দের হাট বসিত।

অধরলাল যখন বার বৎসরের বালকমাত্র তখন অর্থাৎ ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে খিদ্দিরপুরের রামচাঁদ শীলের সপ্তবর্ষবয়স্কা জ্যেষ্ঠা কন্যার সহিত বিবাহিত হন। এই সময় তিনি কৃতিত্বের সহিত মাইনর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। ইহার পাঁচ বৎসর পরে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে তিনি এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় অষ্টম স্থান অধিকার পূর্বক সরকারী বৃত্তি লাভ করেন। তৎপরে তিনি এফ. এ. পড়িবার জন্য কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। উক্ত কলেজে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁহার সহপাঠী ছিলেন। অধরলাল সহপাঠীদের সহিত প্রাণ খুলিয়া মিশিতেন এবং সহপাঠীরাও তাঁহাকে খুব ভালবাসিতেন। সাহিত্যানুরাগী এবং মেধাবী ছাত্ররূপে তিনি তখন সকলের সহিত পরিচিত হন। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে এফ. এ. পরীক্ষায় তিনি চতুর্থ স্থান অধিকার করিয়া ইংরাজী সাহিত্যে ডাফ বৃত্তি প্রাপ্ত হন। এই তরুণ বয়সে তিনি 'ললিতাসুন্দরী' ও 'মেনকা' নামক দুইখানি কবিতা পুস্তক প্রকাশ করেন। প্রথম গ্রন্থের বহু কবিতা দুই বৎসর পূর্বে 'মাসিক প্রকাশিকা' নামক পত্রিকায় বাহির হয়। 'বঙ্গদর্শনে'র ১২৮১ সালের শ্রাবণ সংখ্যায় সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র 'ললিতা

সুন্দরী'র সমালোচনা করেন। অধরলালের কবিতা হইতে জানা যায়, তৎকালীন ব্রাহ্ম ধর্ম তাঁহার মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। কারণ তিনি তখন স্বর্গে বা মূর্তিপূজায় অবিশ্বাসী ছিলেন। রামায়ণ ও মহাভারতের অমর কাহিনী তাঁহার হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে রেখাপাত করিয়াছিল। 'ললিতা সুন্দরী' প্রকাশিত হইবার কয়েক মাস পরেই 'মেনকা' আবির্ভূত হয়। 'মেনকা' প্রকাশের তিন বৎসর পরে ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার 'নলিনী' নামক কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই বৎসর অধরলাল বি. এ. পাশ করেন এবং 'নলিনী' ব্যতীত 'কুসুমকানন' নামক তাঁহার আর এক খানি কাব্যপুস্তক বাহির হয়। তখন তিনি মাত্র বাইশ বৎসরের তরুণ। 'কুসুমকাননে'র দ্বিতীয় ভাগ ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ভারতের তদানীন্তন বড়লাট লর্ড লিটনের 'The Wonderer' নামক একটি ইংরাজী গ্রন্থ ছিল। উহা আটাশটি কবিতার সমষ্টি। বাংলায় অধরলাল উক্ত কবিতা-গ্রন্থের যে পদ্যানুবাদ করেন তাহা 'লিটোনিয়ান নামক' পুস্তকরূপে ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। জ্যেষ্ঠাগ্রজ বলাইচাঁদের ন্যায় অধরলাল সাহিত্য-সাধনায় সুনাম অর্জন করিয়াছিলেন। এত অল্প বয়সে পাঁচ ছয় খানি গ্রন্থ প্রণয়নপূর্বক অধরলাল স্বীয় পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার বিশেষ পরিচয় দিয়াছিলেন।

১৮৭৯ খ্রীঃ ১০ই ফেব্রুয়ারী অধরলাল চব্বিশ বৎসর বয়সে ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিযুক্ত হন। তাঁহার প্রথম কর্মস্থল হইল চট্টগ্রাম। চট্টল ভূমির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য সুকবি ভাবুক অধরলালের চিত্তকে বিমুগ্ধ করিল। ১৮৮০ খ্রীঃ শিবচতুর্দশীর পর্বোপলক্ষে তিনি চট্টগ্রাম হইতে সীতাকুণ্ডে গিয়াছিলেন। তিনি সীতাকুণ্ডের পুরাকীর্তি ও তীর্থরাজি দর্শনান্তে সেই সম্বন্ধে ইংরাজিতে একটী পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধটীর নাম The Shrines of Sitakund ছিল। ১৮৮১ খ্রীঃ ২রা মার্চ কলিকাতাস্থ রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটী অব বেঙ্গলে উক্ত প্রবন্ধ পঠিত হয়। উপস্থিত সদস্যবর্গের মধ্যে কেহ কেহ প্রবন্ধোক্ত তথ্য সম্বন্ধে আলোচনা করেন। পরে উহা পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হইয়া পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। উক্ত প্রবন্ধ ছত্রিশটি গ্রন্থ হইতে বাক্যোদ্ধৃতি

দ্বারা সমৃদ্ধ হইয়াছিল। গ্রন্থগুলির নাম পড়িলে বোঝা যায়, সংস্কৃত শাস্ত্রে অধরলাল সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি ইতোপূর্বেই এশিয়াটিক সোসাইটির সভ্য হইয়াছিলেন। প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ টনি সাহেব উক্ত সোসাইটীর সহকারী সভাপতি ছিলেন। তিনি স্বীয় প্রিয় ছাত্র অধরকে অতিশয় স্নেহ করিতেন। এই টনি সাহেবই ঠাকুর রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে ইংরাজিতে কিছু লিখিয়াছিলেন।

অধরলাল ১৮৮০ খ্রীঃ জুলাই মাসে বদলী হইয়া যশোহরে আসেন। উক্ত বৎসর নভেম্বর মাসে তাঁহার পিতা রামগোপাল সেন পরলোক গমন করেন। ১৮৮২ খ্রীঃ এপ্রিল মাসে অধরলাল ডেপুটী কালেক্টর হইয়া যশোহর হইতে কলিকাতায় আসেন। তখন তিনি তাঁহার বেনেটোলা স্ট্রীটস্থ পৈতৃক ভবনে বাস করিতে লাগিলেন। এই সময় সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র, সহপাঠী হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, কৃষ্ণদাস পাল প্রভৃতি সাহিত্যিক ও মনীষিগণের সহিত তাঁহার গভীর ঘনিষ্ঠতা জন্মে এবং তাঁহার পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার সৌরভ বহু দূর বিস্তৃত হয়। সাধক বৈষ্ণবগণের পূত সংস্পর্শে আসিয়া তিনি 'চৈতন্যচরিতামৃত' ও 'চৈতন্যভাগবত' প্রভৃতি ভক্তিগ্রন্থ অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হন। ঠাকুরের মুহুর্মুহু ভাবসমাধি ও বাহ্য জ্ঞানরাহিত্য প্রভৃতির রোমাঞ্চকর অলৌকিক কাহিনী তিনি 'ইণ্ডিয়ান মিরর' ও 'সুলভ সমাচার' প্রভৃতি পত্রিকায় পাঠ করেন। সম্ভবতঃ ১৮৮৩ খ্রীঃ মার্চ মাসে তিনি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের প্রথম দর্শন লাভে ধন্য হন। প্রথম দর্শনেই ঠাকুর ভক্তকে পরমাত্মীয় বলিয়া চিনিলেন এবং ভক্তও ঠাকুরকে পরিত্রাতা বলিয়া জানিলেন। কথামৃতকারের মতে ১৮৮৩ খ্রীঃ ৮ই এপ্রিল অধর ঠাকুরকে দ্বিতীয় বার দর্শন করেন। শ্রীম লিখিয়াছেন, "শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিস্থ, ছোট খাটটীতে বসিয়া আছেন। ভক্তেরা চতুর্দিকে উপবিষ্ট। শ্রীযুত অধর সেন কয়টী বন্ধুর সঙ্গে আসিয়াছেন। অধর ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট। ঠাকুরকে এই দ্বিতীয় দর্শন করিতেছেন। অধরের বয়স ২৯।৩০, তাঁহার বন্ধু সারদাচরণ পুত্রশোকে সন্তপ্ত। তিনি স্কুলের ডেপুটী ইন্সপেক্টর ছিলেন, পেন্সন লইয়াছেন। আগেও তিনি

সাধন ভজন করিতেন। বড় ছেলেটী মারা যাওয়াতে কোনরূপে সান্ত্বনা লাভ করিতে পারিতেছেন না। তাই অধর ঠাকুরের নাম শুনাইয়া তাঁহার কাছে লইয়া আসিয়াছেন। অধরের নিজেরও ঠাকুরকে আবার দেখিবার ইচ্ছা হইয়াছিল।" অধর ঠাকুরকে বৃদ্ধ বন্ধুর নিদারুণ পুত্রশোকের কথা জানাইতে ঠাকুর গান গাহিয়া ও জগতের অনিত্যতা সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া শোকার্তকে শান্ত করিলেন। পরে তিনি তাঁহার ঘরের উত্তর বারান্দায় দাঁড়াইয়া অধরকে একান্তে বলিলেন, "তুমি ডেপুটী। এ পদও ঈশ্বরের অনুগ্রহে হয়েছে। তাঁকে ভুলো না। কিন্তু জেনো, সকলের এক পথে যেতে হবে। এখানে দুদিনের জন্য, সংসার কর্ম্মভূমি। এখানে কর্ম করতে আসা।" মানব জীবনের শ্রেয়ঃ কর্ম্ম সম্বন্ধে ঠাকুর অধরকে বলিলেন, "কিছু কর্ম করা দরকার, সাধন। তাড়াতাড়ি সেই কর্মগুলি শেষ করে নিতে হয়।" অধর ভাবিলেন, 'সাধন কি ? আমার পক্ষে কি সাধন সম্ভব ?' ভক্তের মনোভাব বুঝিয়া ঠাকুর বলিলেন, "খুব রোক চাই, তবে সাধন সম্ভব হয়। দৃঢ় সংকল্প চাই। তাঁর নামবীজের খুব শক্তি, অবিদ্যা অজ্ঞান নাশ করে। বীজ এত কোমল, অঙ্কুর এত কোমল ; তবু শক্ত মাটী ভেদ করে। মাটী ফেটে যায়। কামিনী-কাঞ্চনের ভিতর থাক্‌লে মন বড় টেনে লয়। সাবধানে থাকৃতে হয়। ত্যাগীদের অত ভয় নাই। ঠিক ঠিক ত্যাগী কামিনী-কাঞ্চন থেকে তফাতে থাকে। তাই সাধন থাকলে ঈশ্বরে সর্বদা মন রাখতে পারে। ঠিক ঠিক ত্যাগী—যারা ঈশ্বরে সর্বদা মন দিতে পারে তারা মৌমাছির মত কেবল ফুলে বসে, মধুপান করে। সংসারে কামিনী-কাঞ্চনের ভিতর যে আছে তার ঈশ্বরে মন হতে পারে, আবার কখনো কখনো কামিনী-কাঞ্চনে মন হয়। যেমন সাধারণ মাছি, সন্দেশেও বসে, আবার পচা ঘায়ও বসে।" পরে প্রিয় ভক্তকে অভয় দিয়া দক্ষিণেশ্বরের নর-দেবতা বলিলেন, "ঈশ্বরে সর্বদা মন রাখবে। প্রথমে একটু খেটে নিতে হয়। তার পর পেন্সন ভোগ করবে।"

তারপর অধরলাল প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে যাইতেন। একদিন ঠাকুর তাঁহার জিহ্বায় কিছু লিখিয়া দিলেন। অধর তাহাতে দিব্যানন্দে বিভোর

হইলেন। সম্ভবতঃ এইরূপে ঠাকুরের নিকট তিনি মন্ত্রদীক্ষা লাভ করিলেন। প্রায় তিনি প্রত্যহ সন্ধ্যায় গাড়ীতে শ্রীগুরু সমীপে যাইতেন এবং ঠাকুরকে প্রণামান্তে শ্রীশ্রীভবতারিণীকে দর্শন করিতেন। কালীমন্দির হইতে আসিয়া তিনি পুনরায় ঠাকুরের কাছে বসিয়া তাঁহার কথামৃত পান করিতেন। ঠাকুরের মুহুর্মুহু ভাবসমাধি দর্শনে অধর স্বীয় বন্ধু সারদাচরণকে বলিয়াছিলেন, "ঠাকুরের আনন্দঘন মধুর হাসি ও মাধুর্যময় ভাব দেখে আমার চোখ ফুটল।" পাশ্চাত্য শিক্ষা ও তৎকালীন জড়বাদের প্রভাবে অধরের মনে যে নাস্তিকভাব আসিয়াছিল তাহা ঠাকুরের দিব্য সঙ্গে তিরোহিত হইল। স্বামী ব্রহ্মানন্দ বলিতেন, "ঠাকুরকে দর্শন না করলে এবং তাঁর পূত সঙ্গ না পেলে অধরবাবুর মনের সংশয় কখনও ঘুচ্‌তো না।"

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ২১শে জুলাই শ্রীরামকৃষ্ণ অধরের বেনেটোলাস্থ বাসভবনে গিয়াছিলেন। রামলাল, মাস্টার মহাশয় প্রভৃতি ভক্তগণও তথায় সমবেত হন। রাখাল উপস্থিত ছিলেন না। ঠাকুর তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া অধরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কই রাখালকে খবর দাওনি? অধর উত্তর দিলেন, 'আজ্ঞে হাঁ, তাঁকে সংবাদ দিয়েছি।' রাখালের জন্য ঠাকুরকে ব্যস্ত দেখিয়া অধর একটি লোক সহ গাড়ী পাঠাইলেন তাহাকে আনিতে। শ্রীম কথামৃতে লিখিয়াছেন, "অধর ঠাকুরের কাছে বসিলেন। আজ ঠাকুরকে দর্শন করিবার জন্য তিনি ব্যাকুল হইয়াছিলেন। ঠাকুরের এখানে আসিবার কথা পূর্বে কিছু ঠিক ছিল না, ঈশ্বর-ইচ্ছায় তিনি আসিয়া পড়িয়াছেন।" তাই অধর বলিলেন, 'আপনি অনেক দিন আসেন নাই। আমি আজ খুব ডেকেছিলাম, এমন কি, চোখ দিয়ে জল পড়েছিল।' ঠাকুর প্রসন্ন হইয়া সহাস্যে বলিলেন, 'বল কি গো?' অধরের উক্তি হইতে প্রতীত হয়, ঠাকুর তৎপূর্বে তাঁহার বাড়ীতে বহু বার আসিয়াছিলেন।

সীতাকুণ্ডের জলে আগুনের শিখা জিহ্বার মত লক্ লক্ করে। এই অলৌকিক দৃশ্যের কথা অধর একদিন ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন। ইহা শুনিয়া ঠাকুর তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন, 'এ কেমন করে হয়?' অধর উত্তর দিলেন, 'জলে

ফসফরাস আছে।' বোধ হয়, অধরের মনে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি সমানভাবে খেলা করিত। তাই একদিন ঠাকুর ভাবমুখে তাঁহাকে বলিলেন, 'আপনাদের যোগ ও ভোগ দুইই আছে।' কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস-চেয়ারম্যানের পদ খালি হইলে অধর উক্ত পদের জন্য আবেদন করেন। তখন তিনি মাত্র চার পাঁচ বৎসর ডেপুটীর পদ পাইয়াছেন এবং তিন শত টাকার গ্রেডে আছেন। কিন্তু তিনি যে পদের জন্য প্রার্থী ছিলেন উহার মাসিক বেতন এক হাজার টাকা। তিনি সেই উচ্চ পদ লাভের জন্য কমিশনারদের ও পদস্থ ব্যক্তিদের সহিত দেখা করেন। যদু মল্লিক তখন কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির অন্যতম প্রভাবশালী কমিশনার। অধরের জন্য ঠাকুরও তাঁহাকে বলিয়াছিলেন। অধর এই কাজের জন্য চেষ্টা করায় ঠাকুর তাঁহার প্রতি বিরক্ত হন এবং শ্রীম ও নিরঞ্জনের সম্মুখে তাঁহাকে তিরস্কার করেন। ঠাকুর শ্রীম ও নিরঞ্জনের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "হাজরা বলেছিল, অধরের কর্ম হবে, তুমি মাকে একটু বল। অধরও আমাকে বলেছিল। মাকে একটু বলেছিলাম—মা, এ তোমার কাছে আনাগোনা করছে ; যদি হয় ত হোক না। কিন্তু সেই সঙ্গে মাকে এও বলেছিলাম, মা, এ কি হীন-বুদ্ধি ! জ্ঞান ভক্তি না চেয়ে তোমার কাছে এসব চাচ্ছে।' পরে অধরকে লক্ষ্য করিয়া ঠাকুর বলিলেন, "কেন হীনবুদ্ধি লোকগুলোর কাছে অত আনাগোনা করলে ? এত দেখলে শুনলে। সাতকাণ্ড রামায়ণ পড়ে সীতা কার ভার্য্যে !" অধর নম্রভাবে উত্তর দিলেন, "সংসার করতে গেলে এসব না হলে চলে না। আপনি ত বারণ করেন নি।" ঠাকুর অধরকে বলিলেন, 'নিবৃত্তিই ভাল, প্রবৃত্তি ভাল নয়।" ঠাকুর স্বীয় দৃষ্টান্ত দিয়া নিবৃত্তি-তত্ত্ব তাঁহাকে বুঝাইতে লাগিলেন। কিন্তু অধর ঠাকুরকে প্রশ্ন করিলেন, 'আচ্ছা, নরেন্দ্র কর্ম করবে না ?' পিতৃবিয়োগের পর নরেন্দ্র তখন অত্যন্ত অর্থাভাবে পড়িয়াছিলেন। তাই ঠাকুর অধরকে উত্তর দিলেন, 'হাঁ, নরেন্দ্র কর্ম করবে। তার মা ও ভাইরা আছে।' অধর বলিলেন, 'আচ্ছা নরেন্দ্রদের পঞ্চাশ টাকায় চলে, একশ টাকায়ও চলে। নরেন্দ্র একশ টাকার জন্য কি চেষ্টা করবে না ?' ঠাকুর তাঁহাকে উপদেশ দিলেন, "বিষয়ীরা ধনের

অ াদর করে। তারা মনে করে, এমন জিনিষ আর হবে না। শম্ভু বল্লে, 'এই সমস্ত বিষয় তাঁর পাদপদ্মে দিয়ে যাব, এইটি ইচ্ছা।' তিনি কি বিষয় চান ? তিনি চান জ্ঞান, ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্য।" মথুর বাবু একখানা তালুক ঠাকুরের নামে লিখিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন। ঠাকুর সেই কথা উল্লেখ করিয়া অধরকে বলিলেন, "আমি কালীঘর থেকে শুন্‌লাম, সেজবাবু আর হৃদে একসঙ্গে পরামর্শ করছে। আমি এসে সেজবাবুকে বললাম, 'দেখ অমন বুদ্ধি করো না। ওতে আমার ভারি হানি হবে।" ইহা শুনিয়া অধর বলিলেন, 'আপনি যা বলেছেন সৃষ্টির পর থেকে ছয়টি সাতটি লোক হদ্দ হয়েছে।' শ্রীরামকৃষ্ণ তদুত্তরে অধরকে বলিলেন, "কেন ? ত্যাগী আছে বৈকি। ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করলেই লোকে জানতে পারে। অনেকে গুপ্ত আছে, লোকে জানে না।" অবশেষে ঠাকুর প্রকৃত ত্যাগীর অবস্থা অধরের নিকট এইভাবে বর্ণনা করিলেন, "ঠিক ঠিক ত্যাগী ভক্ত চাতকের মত। চাতক স্বাতী নক্ষত্রের মেঘের জল বই আর কিছু পান করবে না। সাত সমুদ্র নদী ভরপুর। সে অন্য জল খাবে না। সে কামিনীকাঞ্চন স্পর্শ করবে না। কামিনীকাঞ্চন কাছেও রাখবে না, পাছে আসক্তি হয়।"

ঠাকুরের মুখে ত্যাগীর মহিমা শুনিয়াও অধরের সংশয় দূর হইল না। তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন, 'চৈতন্যও ভোগ করেছিলেন।' এই কথা শুনিয়া ঠাকুর চমৎকৃত হইয়া অধরকে প্রশ্ন করিলেন, 'তিনি কি ভোগ করেছিলেন ?' অধর উত্তর দিলেন, 'অত পাণ্ডিত্য, অত সম্মান !' ইহাতে ঠাকুর বলিলেন, 'অন্যের পক্ষে সম্মান, তাঁর পক্ষে কিছু নয়।' তুমিই আমায় মান ; আর নিরঞ্জন মানে ? আমার পক্ষে দুই এক। সত্য করে বলছি।' পরে কথা প্রসঙ্গে ঠাকুর বলিলেন, 'আমি যে রাখাল, নরেন্দ্র প্রভৃতিকে এত ভালবাসি, একি নিজের কোন লাভের জন্য ?' শ্রীম তখন বলিলেন, 'মার ভালবাসার মত।' ঠাকুর তাহাতে বলিলেন, "ছেলে তবু চাকরী করে খাওয়াবে বলে মা অনেকটা করে। আমি যে এদের ভালবাসি এদের মধ্যে সাক্ষাৎ নারায়ণ দেখি বলে, কথায় নহে।" পরে তিনি অধরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "শোন। আলো জ্বাললে বাদুলে পোকার

অভাব হয় না। তাঁকে লাভ করলে তিনি সব যোগাড় করে দেন; কোন অভাব অপূর্ণ রাখেন না। তাঁকে পেলে সেবা করবার লোক অনেক এসে জোটে।" এইভাবে ঠাকুর নানা উপদেশ দিয়া অধরকে বুঝাইলেন, "ঠিক ঠিক সাধু, ঠিক ঠিক ত্যাগী সোনার থালও চায় না, মানও চায় না। তবে ঈশ্বর তাদের কখনও অভাবে রাখেন না। তাঁকে পেতে হলে যা দরকার সব জোগাড় করে দেন।" ঠাকুরের অমৃতবাণী সমবেত ভক্তগণ উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেছিলেন। পরে অধরের প্রতি চাহিয়া ঠাকুর বলিলেন, "আপনি হাকিম, কি বলবো। যা ভাল বোঝ তাই কোরো। আমি মূর্খ।"

ইহা শুনিয়া অধর হাসিয়া উঠিলেন এবং ভক্তদিগের প্রতি তাকাইয়া বলিলেন, 'উনি আমাকে একজামিন করছেন।' ঠাকুরের উপদেশ অধরের প্রাণস্পর্শ করিল। ঠাকুর আবার সহাস্যে অধরকে বলিলেন, "নিবৃত্তিই ভাল। দেখ না, আমি সই করলাম না। ঈশ্বরই বস্তু, আর সব অবস্তু।" শ্রীরামকৃষ্ণ কালীমন্দির হইতে মাসিক সাত টাকা মাসহারা পাইতেন। খাজাঞ্চী উক্ত টাকা দিয়া হিসাবের খাতায় তাঁহাকে সহি করিতে বলেন। কিন্তু ঠাকুর তাঁহাদের খাতায় সহি করিতে সম্মত হন নাই। তিনি খাজাঞ্চীকে বলিলেন, "তা আমি ত চাচ্ছি না। তোমাদের ইচ্ছা হয় আর কারুকে দাও। এক ঈশ্বরের দাস, আবার কার দাস হব।" ঠাকুর অধরকে মিউনিসিপ্যালিটির পদের জন্য চেষ্টা করিতে নিষেধ করিলেন। তিনি তাঁহাকে বলিলেন, "যার কর্ম করছ, তারই কর। লোকে পঞ্চাশ টাকা মাইনের জন্য লালায়িত। তুমি তিনশ টাকা পাচ্ছ। ওদেশে (কামারপুকুরে) ডেপুটী আমি দেখেছিলাম। ঈশ্বর ঘোষাল। মাথায় তাজ, সব হাড়ে কাঁপে। ছেলেবেলায় দেখেছিলাম। ডেপুটি কি কম গা? যার কর্ম করছ তারই কর। একজনের চাকরী করলেই মন খারাপ হয়ে যায়। আবার পাচ জনের!"

যদিও ঠাকুর অধরকে তিরস্কার করিয়াছিলেন তথাপি যদু মল্লিকের সহিত দেখা হইলে তিনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কৈ, অধরের কর্ম হল না?' যদু বাবু তখন বন্ধুগণ সহ দক্ষিণেশ্বরে স্বীয় বাগান-বাটীতে ছিলেন। তাঁহার

সকলে ঠাকুরকে বলিলেন, "অধর যুবক, তার কর্মের বয়স যায়নি।" ইহা শুনিয়া ঠাকুর নীরব হইলেন। জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাপ্রচারের জন্য অধরলাল সচেষ্ট ছিলেন। তিনি বিদ্যালয়ের সভাসমিতিতে যোগদান করিতেন। সরকারী চাকরী এবং বিদ্যালয়ের কাজের জন্য ব্যস্ত থাকায় তিনি কয়েকদিন ঠাকুরের কাছে যাইতে পারেন নাই। ঠাকুর তাঁহার জন্য চিন্তিত ছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে অধর আসিতেই ঠাকুর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কিগো, এতদিন আসনি কেন?' অধর উত্তর দিলেন, 'আজ্ঞা অনেকগুলো কাজে পড়ে গেলাম। স্কুলের মিটিংএ যেতে হয়েছিল।' ঠাকুর বলিলেন, 'মিটিং স্কুল এসব নিয়ে একেবারে ভুলেছিলে? অধর বিনীত ভাবে উত্তর দিলেন, 'আজ্ঞে সব চাপা পড়ে গিয়েছিল।' পরে ঠাকুর অধরকে বলিলেন, "দেখ এ সব অনিত্য। মিটিং, স্কুল, আফিস এসব অনিত্য। ঈশ্বরই সত্য, আর সব মিথ্যা। সব মন দিয়ে তাঁকেই চিন্তা করা উচিত।"

ঠাকুরের মুক্তিপ্রদ উপদেশ শুনিয়া অধর নীরব ও নিরুত্তর হইয়া প্রস্তরবৎ বসিয়া রহিলেন। ঠাকুর আবার কম্বুকণ্ঠে বলিলেন, 'এ সব অনিত্য। স্থূল শরীর এই আছে, এই নাই। তাড়াতাড়ি তাঁকে ডেকে নিতে হয়।' ঠাকুর দিব্য দৃষ্টিতে অধরের মৃত্যু আসন্ন দেখিয়া তাঁহাকে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত করিলেন। কিন্তু অধর তাহা বুঝিতে পারেন নাই। হায়! ইহার কয়েক মাস পরেই অধরের নিকট পরলোকের ডাক আসিল। এই সময় অধর ভারত সরকার কর্তৃক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলোরূপে মনোনীত হইলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাবিভাগের একজন সদস্যরূপে তিনি নির্বাচিত হইলেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে তিনি এই উচ্চ পদ প্রাপ্ত হন।

একবার দক্ষিণেশ্বরে ঝাউতলার কাছে রেলিংয়ের তারের বেড়ায় ভাবাবস্থায় পড়িয়া ঠাকুর আহত হন। আঘাত লাগিয়া তাঁহার বাম হাতের হাড় সরিয়া যায়। ডাক্তার উক্ত হাতে বাড় বাঁধিয়া দেন। সেই সময় এক সন্ধ্যাকালে অধর ঠাকুরের কাছে আসিয়াছেন। তিনি ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি কেমন আছেন?' ঠাকুর কোমল স্বরে বাম হাতখানি দেখাইয়া বলিলেন,

"এই দেখ।" পরে সহাস্য বদনে আবার বলিলেন, 'হাতে লেগে কি হয়েছে? আছি আর কেমন?' অধর ঘরের মেজেতে ভক্ত সঙ্গে বসিয়াছিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে ডাকিয়া কাছে বসাইলেন এবং তাঁহার পায়ে হাত বুলাইতে বলিলেন। ছোট খাটটির একপ্রান্তে বসিয়া অধর ভক্তিভরে শ্রীরামকৃষ্ণের পদসেবা করিতে লাগিলেন। ইহা হইতে বুঝা যায়, ঠাকুর অধরকে কত গভীর স্নেহ করিতেন। তখন ঠাকুর সমবেত ভক্তগণকে অহৈতুকী ভক্তির কথা বলিতে-ছিলেন। ঠাকুর বলিলেন, 'অহৈতুকী ভক্তি যদি সাধতে পার তাহলে ভাল হয়।' অধর নিশ্চয়ই উক্ত ভক্তির সাধক দিলেন। ঠাকুরকে দর্শন ও প্রণাম করিয়াই তিনি পরিতৃপ্ত হইতেন। তিনি প্রত্যহ অফিস হইতে গৃহে ফিরিয়া সামান্য জলযোগান্তে একটি ভাড়াটিয়া গাড়ীতে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ সন্দর্শনে যাইতেন। শ্রীশ্রীভবতারিণীর আরতির পূর্বেই তিনি উপস্থিত হইতেন। গাড়ী হইতে নামিয়া ঠাকুরকে ভূমিষ্ঠ প্রণামপূর্বক কালীমন্দিরে যাইয়া আরতি দেখিতেন। তৎপরে তিনি ঠাকুরের কাছে আসিয়া পুনরায় প্রণামপূর্বক তাঁহার সম্মুখে বসিতেন, বা ঠাকুরের ইঙ্গিত পাইলে তাঁহার পদসেবা করিতেন। সারাদিন কর্মব্যস্ততার জন্য তাঁহার দেহ ক্লান্ত হইয়া পড়িত। সেইজন্য ঠাকুর অধরকে ক্লান্ত ও শ্রান্ত দেখিলে প্রায়ই বিশ্রাম করিতে বলিতেন। ঘরের মেজেতে যে মাদুর পাতা থাকিত তাহার উপর অধর শুইয়া পড়িতেন এবং অল্পক্ষণের মধ্যে নিদ্রাভিভূত হইতেন। রাত্রি নয়টা দশটায় সময় তাঁহাকে উঠাইয়া দিলে তিনি ঠাকুরকে প্রণামান্তে গৃহে প্রত্যাগমন করিতেন। প্রায় প্রত্যহই এরূপ ঘটিত। ঠাকুরকে নিত্য দর্শনের জন্য তিনি দেহশ্রম বা অর্থব্যয় অগ্রাহ্য করিতেন। শোভাবাজার বেনেটোলা হইতে দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করিতে প্রায় তিন ঘণ্টা সময় লাগিত। মধ্যরাত্রে গৃহে ফিরিয়া তিনি আহারাদি করিতেন। আন্তরিক অনুরাগের বশেই অধর এইরূপ করিতে পারিতেন। কর্মব্যস্ততায় যদি কোন দিন ঐরূপ করিতে না পারিতেন তিনি ঠাকুরের অদর্শনে নির্জনে একান্তে অশ্রুপাত করিতেন। তিনি ঠাকুরকে প্রতি সপ্তাহে গৃহে আনিয়া ভক্ত সঙ্গে উৎসবে মাতিতেন। ঠাকুর কোন সপ্তাহে তাঁহার গৃহে না আসিলে অধর

ঠাকুরকে বিনীতভাবে বলিতেন, "আপনি অনেক দিন যান নি, ঘরে দুর্গন্ধ হয়ে গেছে।" ইহা ঠাকুরের প্রতি গভীর ভক্তির উক্তি।

ঠাকুরের দিব্য অঙ্গসৌরভে অধরের মনপ্রাণ সুরভিত হইত। ঠাকুরের পদস্পর্শে তাঁহার গৃহ তীর্থে পরিণত হইয়াছিল। অধর গম্ভীরাত্মা ছিলেন। তাঁহার ভক্তির বাহ্যপ্রকাশ ছিল না। কিন্তু তিনি ঠাকুরের আগমনে আনন্দিত হইয়া কোন কোন দিন সরলভাবে বলিয়া ফেলিতেন, "আপনি অনেক দিন এ বাড়ীতে আসেন নি ; ঘর মলিন হয়েছিল। যেন এক রকম দুর্গন্ধ বেরিয়েছিল। আপনার শুভাগমনে আজ ঘরের কেমন শোভা হয়েছে, আর কেমন একটি সুগন্ধ বেরুচ্ছে। আজ আমি ঈশ্বরকে খুব ডেকেছিলাম। এমন কি, চোখ দিয়ে জল পড়েছিল।" অধরের বাড়ীতে ঠাকুরদালানে মৃণ্ময়ী প্রতিমায় দুর্গাপূজা হইত। পূজার তিন দিনই অধর ঠাকুরকে ভক্ত সহ নিমন্ত্রণ করিতেন। ঠাকুর দুই একটি ভক্ত সঙ্গে অধরের বাড়ীতে দুর্গোৎসবে যাইতেন এবং মহীময়ী দুর্গাপ্রতিমার সম্মুখে করজোড়ে দাঁড়াইয়া সমাধিস্থ হইতেন। সমাধি ভঙ্গের পর তিনি ভক্তগণের দিকে চাহিয়া বলিতেন, 'এমন হাস্যময়ী প্রতিমা আর দেখা যায় না।' ঠাকুরের আগমনে দুর্গোৎসবের আনন্দ শত গুণে বর্ধিত হইত।

ঠাকুরের আদেশ অধরের শিরোধার্য্য ছিল। ঠাকুরের আদেশ কার্য্যে পরিণত করিতে অধর যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন। ঠাকুর তাঁহাকে তাঁহার বাড়ীতে সুবিখ্যাত রাজনারায়ণের চণ্ডীর গান করিতে বলিয়াছিলেন। তদনুযায়ী অধর স্বগৃহে রাজনারায়ণের চণ্ডীগানের ব্যবস্থা করেন। ইহাতে ঠাকুর ও তাঁহার ভক্তগণ সাদরে নিমন্ত্রিত হইতেন। বিবেকানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, প্রেমানন্দ প্রভৃতি ত্যাগী অন্তরঙ্গগণ এবং মহেন্দ্রনাথ, গিরিশচন্দ্র, রামচন্দ্র, কেদারনাথ ও বিজয়কৃষ্ণ প্রভৃতি গৃহী ভক্তগণ এই সব উৎসবে যোগদান করিতেন। ঠাকুর চণ্ডীর গান শুনিতে শুনিতে কখনও কখনও সমাধিস্থ হইতেন, কখনও বা প্রেমোন্মত্ত হইয়া গন্ধর্বনিন্দিত দেবদুর্লভ মধুরকণ্ঠে মাতৃসঙ্গীত গাহিয়া শ্রোতৃবর্গকে প্রেমানন্দে মাতাইতেন। অধর তখন মাতৃভাবে মাতোয়ারা। মহাত্মা রামচন্দ্র

তৎপ্রণীত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের জীবন বৃত্তান্ত' গ্রন্থে লিখিয়াছেন, 'কলিকাতার ডেপুটি কালেক্টর অধরলাল সেন শাক্ত ছিলেন।' ঠাকুরের আদেশে রাজনারায়ণের চণ্ডীর গান যখন অধরের বাড়ীতে হইতেছিল তখন মহাত্মা রামচন্দ্রকে নিমন্ত্রণ করিতে তাঁহার ভুল হইয়া যায়। ইহাতে রামচন্দ্র মনঃক্ষুণ্ণ হন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাহা জানিতে পারিয়া অধরকে সেকথা বলেন। অধর ইহা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ রামচন্দ্রের বাটীতে যাইয়া উক্ত ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

এই ঘটনার কয়েক দিন পরে ঠাকুর রামচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করেন, "অধর বল্ছিল, "তুমি নাকি তার খুব খাতির করেছ।" রামবাবু বলিলেন, 'সে অধরের দোষ নয়; আমি জানতে পেরেছি, সেটা রাখালের দোষ। রাখালের উপর কাজের ভার ছিল।' রামচন্দ্রের ক্ষোভ ইতঃপূর্বে তিরোহিত হইয়াছিল। রামচন্দ্র ঠাকুরের প্রশ্নোত্তরে বলিলেন, "বলেন কি, চণ্ডীর গান হল।" ঠাকুর তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিলেন, "অধর তা জানত না। এই দেখ না, সেদিন অধর আমার সঙ্গে যদু মল্লিকের বাড়ী গিয়েছিল। সেখান থেকে চলে আসবার সময় অধরকে জিজ্ঞাসা করলুম, 'তুমি সিংহবাহিনীর বিগ্রহ দর্শন করলে, সেখানে কোন প্রণামী দিলে না?' তখন সে বল্লে, 'মশায়, আমি জানতাম না যে, প্রণামী দিতে হয়।' তা যদি না বলে থাকে হরি নামে দোষ কি। যেখানে হরিনাম হয় সেখানে না বললেও যাওয়া যায়; নিমন্ত্রণের দরকার হয় না।" ঠাকুরের উপদেশে রামচন্দ্রের মন হইতে সব অভিমান মুছিয়া গেল।

ঠাকুরের আদেশে অধর কিছুদিন সন্ধ্যাকালে বৈষ্ণবচরণের পদাবলীকীর্তন শুনিতেন। ঠাকুরও মাঝে মাঝে তথায় বৈষ্ণবচরণের গান শুনিতে যাইতেন। তাঁহার আগমনে কীর্তনের আসর জমিয়া উঠিত এবং প্রেমোৎসব হইত। সকল ভক্তই তথায় ঠাকুরের সহিত মিলিত হইতেন। কোন কোন দিন স্বামিজীও ঠাকুরের আদেশে তথায় ভজন গাহিতেন। এইরূপে ঠাকুরের আগমনে অধরের বাড়ীতে ভক্তের মজলিশ বসিত এবং সঙ্কীর্তনে, নৃত্যগীতে এবং ধর্মপ্রসঙ্গে আনন্দের স্রোত প্রবাহিত হইত। এই স্বর্গীয় দৃশ্য দেখিতে

গৃহ-প্রাঙ্গণে এবং রাস্তায় পর্যন্ত লোকের ভীড় জমিত। কীর্তনান্তে অধর পরম সমাদরে ঠাকুর ও ভক্তগণকে আহার করাইতেন।

অধর জাতিতে সুবর্ণবণিক ছিলেন। ঠাকুরের মতে ভক্তের জাত নাই। তাই ঠাকুর অধরের বাড়ীতে আহার করিতেন। কিন্তু কোন কোন ব্রাহ্মণ ভক্ত তাঁহার বাড়ীতে আহার করিতে ইতস্ততঃ করিতেন। আবার কেহবা আহারের পূর্বে চলিয়া যাইতেন। 'শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে' উল্লিখিত আছে, "প্রিয়নাথ ও মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ভ্রাতৃদ্বয়কে ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিতেছেন, 'কিগো, তোমরা খেতে যাবে না?' তাঁহারা ঠাকুরকে বিনীতভাবে নিবেদন করিলেন, 'আজ্ঞে, আমাদের থাক্।' ঠাকুর সহাস্যে ভক্তদের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এঁরা সবই করছেন, শুধু এইটেতেই সঙ্কোচ.' ভক্ত কেদার চট্টোপাধ্যায় একদিন অধরের বাড়ীতে কীর্তনান্তে গৃহে ফিরিবার উদ্দেশ্যে ঠাকুরকে প্রণামান্তে বলিলেন, 'আজ্ঞা, তবে আসি।' ঠাকুর তাঁহাকে বলিলেন, 'তুমি অধরকে না বলে যাবে? অভদ্রতা হয় না?' কেদার উত্তর দিলেন, "আপনি যে কালে রইলেন তখন সকলের থাকাই হল। 'তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টম্।' আর সমাজে বিয়েথা ত আছে। গোল একবার ত হয়েছে।' বিজয় অমনি বলিয়া উঠিলেন, 'এঁকে রেখে যাওয়া?" ঠিক সেই সময় অধর ঠাকুরকে অন্দরে লইয়া যাইতে আসিলেন। তিনি নম্রভাবে ঠাকুরকে নিবেদন করিলেন, 'ভিতরে পাতা করা হইয়াছে।' ঠাকুর উঠিয়া বিজয় ও কেদারকে সঙ্গে লইয়া অন্দর মহলে গেলেন। ঠাকুর স্বয়ং যেখানে আহার করেন সেখানে তাঁহার আপত্তি বা ইতস্ততঃ করা অনুচিত হইয়াছে বুঝিয়া কেদার প্রসাদ গ্রহণান্তে যুক্তকরে ঠাকুরের নিকট ক্ষমা চাহিলেন। ঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে কেদারকে বলিলেন, 'ভক্ত হলে চণ্ডালের অন্নও খাওয়া যায়।' অধর ঠাকুরের কত পরমাত্মীয় এবং অন্তরঙ্গ ভক্ত ছিলেন তাহা এই ঘটনা হইতে বোঝা যায়।

অধর ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্বাচিত হন তখন ভাইস-চ্যান্সেলার ছিলেন অনারেবল এইচ. জে. রেণল্ডস।

অফিসের কাজ শেষ করিয়া অধর সেনেটের অধিবেশনে যোগ দিতেন। স্কুলের মিটিংয়েও তাঁহাকে যাইতে হইত। এইরূপে তিনি সংসারে জড়িত হইয়া পড়িতেছেন দেখিয়া ঠাকুর তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দিতেন। অধর আর বেশী দিন ইহলোকে থাকিবেন না—ইহা দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইয়া ঠাকুর তাঁহাকে বার বার বলিয়াছিলেন, সব ছাড়িয়া ষোল আনা মন দিয়া ঈশ্বর-চিন্তায় মগ্ন হইতে। কিন্তু অধর নিজেকে সংসারী ভাবিয়া মনে করিতেন, একান্ত মনে ঈশ্বরকে ডাকা কি আমার পক্ষে সম্ভব? অন্তর্যামী ঠাকুর প্রিয় ভক্তের মর্মকথা বুঝিয়া অধরকে বলিলেন, "তোমাদের সব ত্যাগ করবার দরকার নেই। কচ্ছপের মত সংসারে থাক। কচ্ছপ জলে চরে বেড়ায়, কিন্তু ডিম আড়াতে রাখে। তার ডিম যেখানে, সেখানেই তার সব মনটা পড়ে আছে।" ঠাকুরের অমৃতময় উপদেশ হৃদয়ে দৃঢ়বদ্ধ করিয়া ভক্ত ভগবানকে নম্রভাবে অন্তরের আকাঙ্ক্ষা জানাইলেন, "আমাদের বাড়ীতে অনেক দিন আপনার যাওয়া হয়নি। বৈঠকখানা বিষয়-গন্ধে ভরে গেছে, বাড়ী যেন অন্ধকার হয়েছে।" এই কয়েকটি কথায় ভক্ত ভগবানের নিকট অন্তরের আবেগ প্রকাশ করিলেন। শ্রীম 'কথামৃতে' লিখিয়াছেন, "ভক্তের নিবেদন শুনিয়া ঠাকুরের স্নেহসাগর উথলিয়া উঠিল।" তিনি হঠাৎ দণ্ডায়মান হইয়া ভাবাবেশে অধর এবং মাষ্টারের মস্তক ও হৃদয় স্পর্শ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, আর সস্নেহে বলিলেন, "আমি তোমাদের নারায়ণ দেখছি। তোমরাই আমার আপনার লোক।"

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ২১শে জুলাই শ্রীম দক্ষিণেশ্বরে যাইতেছিলেন। তিনি যখন কালীবাড়ীর প্রবেশদ্বারের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন তখন দেখিলেন, ঠাকুর ভক্তসঙ্গে গাড়ীতে কলিকাতা যাইতেছেন। ঠাকুর শ্রীমকে দেখিয়া গাড়ী থামাইতে আদেশ দিলেন এবং সহাস্যে তাঁহাকে বলিলেন, "আমরা অধরের বাড়ী যাচ্ছি। তুমিও এস না।" ঠাকুরের আদেশ পাইয়া শ্রীম গাড়ীতে উঠিলেন। পথিমধ্যে ঠাকুর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা, অধরকে তোমার কি রকম মনে হয়?' শ্রীম অমনি উত্তর দিলেন, 'আজ্ঞে, তাঁর খুব অনুরাগ।' ইহা শুনিয়া প্রসন্ন বদনে ঠাকুর তাঁহাকে বলিলেন, 'অধরও তোমার খুব সুখ্যাতি

করে।' অধরকে দেখিলে ঠাকুরের হৃদয় স্নেহকরুণায় উদ্বেলিত হইত। একদিন অধর দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া দেখেন, ঠাকুরের ঘরের বারান্দায় কীর্তন হইতেছে এবং ঠাকুর ভক্তবৃন্দবেষ্টিত হইয়া তন্ময় চিত্তে কীর্তন শুনিতেছেন। তিনি তথায় ভূমিষ্ঠ প্রণামপূর্বক আসরের একপার্শ্বে বসিয়া কীর্তন শুনিতে লাগিলেন। কৃপাসিন্ধু ঠাকুর ভক্তকে দেখিতে পাইবা মাত্র সস্নেহে তৎসমীপে আসিয়া বসিতে ইঙ্গিত করিলেন।

"শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত" হইতে জানা যায়. ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ৬ই ডিসেম্বর শনিবার অধরের বাড়ীতেই সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। অধর ঠাকুরের নিকট বঙ্কিমচন্দ্রকে পরিচয় করাইয়া দিলেন। অধর ও বঙ্কিম উভয়েই ডেপুটি ও সাহিত্যিক ছিলেন। সেইজন্য উভয়ের মধ্যে গভীর প্রীতির সম্বন্ধ ছিল। বঙ্কিমকে দেখিয়া ঠাকুর বুঝিলেন, তিনি কৃষ্ণভক্ত। তাই তিনি বঙ্কিমের নিকট কৃষ্ণতত্ত্ব আলোচনা করিয়া বলিলেন, "শ্রীকৃষ্ণ প্রেমে বঙ্কিম হয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণ পুরুষ, শ্রীমতী তাঁর শক্তি। পুরুষ আর প্রকৃতি। যুগল মূর্তির মানে কি? পুরুষ আর প্রকৃতি অভেদ। তাঁদের ভেদ নাই। পুরুষ প্রকৃতি না হলে থাক্‌তে পারেন না। একটি বল্‌লেই আর একটি তার সঙ্গে বুঝতে হবে। যেমন অগ্নি আর তার দাহিকা শক্তি। দাহিকা শক্তি ছাড়া অগ্নিকে ভাবা যায় না।" আবার যুগল মূর্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে ঠাকুর বলিলেন, "যুগল মূর্তিতে কৃষ্ণের দৃষ্টি শ্রীমতীর দিকে এবং শ্রীমতীর দৃষ্টি কৃষ্ণের দিকে। শ্রীমতীর গৌর বর্ণ, বিদ্যুতের মত। তাই কৃষ্ণ পীতাম্বর পরেছেন। আর শ্রীমতী নীলকান্ত মণি দিয়ে অঙ্গ সাজিয়েছেন। শ্রীমতী পায়ে নূপুর পরেছেন। অর্থাৎ পুরুষ ও প্রকৃতির মধ্যে অন্তরে ও বাহিরে মিল আছে।" রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্বের এই সারগর্ভ ব্যাখ্যা শুনিয়া বঙ্কিম তাঁহার বন্ধুদের সহিত ইংরাজীতে আলোচনা করিলেন। ইহা দেখিয়া ঠাকুর অধরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ইংরাজীতে কি কথাবার্ত্তা হইতেছে?'' তদুত্তরে অধর তাঁহাকে বলিলেন, "আজ্ঞে, এই বিষয়ে একটু কথা হচ্ছিল, কৃষ্ণের রূপের ব্যাখ্যা।" বঙ্কিম ঠাকুরের মুখে এই তত্ত্ব-ব্যাখ্যা শুনিয়া চমৎকৃত ও বিস্মিত হইলেন। তিনি

ঠাকুরকে বলিলেন, 'মহাশয়, আপনি প্রচার করেন না কেন?' ঠাকুর উত্তর দিলেন, "ঈশ্বর সাক্ষাৎকার হয়ে যদি আদেশ দেন তবেই প্রচার হয়, লোক-শিক্ষা হয়। তা না হলে কে তোমার কথা শুনবে?" বঙ্কিম গম্ভীরভাবে ইহা শুনিলেন এবং ইহাতে নূতন আলোক পাইলেন। ঠাকুর আবার বঙ্কিমকে বলিলেন, "শুধু পণ্ডিত হলে কি হবে যদি ঈশ্বর চিন্তা না থাকে, যদি বিবেক বৈরাগ্য না থাকে?"

ঠাকুর বঙ্কিমের আর একটি ভ্রম দূর করিলেন। তিনি বঙ্কিমকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কি বল? আগে সায়েন্স না, আগে ঈশ্বর?' বঙ্কিম উত্তর দিলেন, "হাঁ, আগে পাঁচটা জানতে হয় জগতের বিষয়। একটু এদিককার জ্ঞান না হলে ঈশ্বর জানব কেমন করে? আগে পড়াশুনা করে জানতে হয়।" ঠাকুর নানা উপদেশ দিয়া বঙ্কিমকে বুঝাইলেন এবং শেষে বলিলেন, "তোমার দরকার ঈশ্বরলাভ করা। তুমি অত জগৎসৃষ্টি, সায়েন্স ফায়েন্স এসব করছ কেন? তোমার আম খাওয়া দরকার। তোমার বাগানে কতশ আম গাছ, কত হাজার ডাল, কত লক্ষ কোটি পাতা; এসব খবরে তোমার কাজ কি? তুমি আম খেতে এসেছ আম খেয়ে যাও।" বঙ্কিম বলিলেন, 'আম পাই কই?' ঠাকুর উত্তর দিলেন, "তাঁকে ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা কর। আন্তরিক হলে তিনি শুনবেনই শুনবেন।....কেউ হয়ত বলে দেয়, এমনি কর তাহলে ঈশ্বরকে পাবে।" বঙ্কিম অমনি বলিয়া উঠিলেন, 'কে? গুরু? তিনি আপনি ভাল আম খেয়ে আমায় খারাপ আম দেন।' ঠাকুর বঙ্কিমকে বুঝাইলেন, "গুরুবাক্যে বিশ্বাস করতে হয়। গুরুই সচ্চিদানন্দ, সচ্চিদানন্দই গুরু। তাঁর কথা বিশ্বাস করলে, বালকের মত বিশ্বাস করলে ঈশ্বরলাভ হয়। চাই ব্যাকুলতা।"

এইরূপ ধর্মপ্রসঙ্গের পর সঙ্কীর্তন আরম্ভ হইল। ঠাকুর কীর্তন শুনিতে শুনিতে সহসা দাঁড়াইয়া একেবারে সমাধিস্থ হইলেন। তাঁহার বাহ্য সংজ্ঞা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইল। ভক্তগণ এবং সমবেত শ্রোতৃবৃন্দ তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন। বঙ্কিম ব্যস্তভাবে ভীড় ঠেলিয়া একদৃষ্টে ঠাকুরকে দেখিতে লাগিলেন। তিনি

তৎপূর্বে সমাধিস্থ অবস্থা কখনও দেখেন নাই, পুস্তকে পড়িয়াছেন মাত্র। অর্ধবাহ্য অবস্থায় ঠাকুর প্রেমোন্মত্তভাবে নৃত্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার অলৌকিক নৃত্য দেখিয়া বঙ্কিম বিস্মিত হইলেন। কীর্তনান্তে ঠাকুর ভূমিষ্ঠ হইয়া ভাগবত-ভক্ত-ভগবানকে প্রণাম করিলেন এবং বলিলেন, 'জ্ঞানী, যোগী, ভক্ত সকলের চরণে প্রণাম।'

এই দিব্য দৃশ্য দেখিয়া বঙ্কিমের হৃদয় বিগলিত হইল। তিনি নম্রভাবে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভক্তি কেমন করে হয় ?' ঠাকুর বলিলেন, 'ঐ যে বলেছি, ব্যাকুলতা।' কিরূপ ব্যাকুলতা হইলে ঈশ্বরলাভ হয়, তাহা বঙ্কিমকে নানাভাবে বুঝাইয়া তিনি অবশেষে বলিলেন, 'তাই বলছি, ডুব দাও। কিছু ভয় নাই। ডুবলে অমর হয়।' বিদায় গ্রহণের সময় বঙ্কিম ঠাকুরকে বিনীত-ভাবে নিবেদন করিলেন, 'একটি প্রার্থনা আছে। অনুগ্রহ করে আমার কুটিরে একবার পায়ের ধূলো দেবেন।' ঠাকুর বলিলেন, 'বেশ ত, ঈশ্বরের ইচ্ছা।' বঙ্কিম সবিনয়ে জানাইলেন, 'সেখানেও দেখবেন, ভক্ত আছে।' ঠাকুর রহস্যচ্ছলে বলিলেন, "কি রকম সব ভক্ত সেখানে ? যারা গোপাল গোপাল, কেশব কেশব বলেছিল তাদের মত কি ?" কোন ভক্তের অনুরোধে ঠাকুর গল্পটি বলিলেন। ঠাকুরের উক্ত বাক্যের মর্মার্থ এই যে, আন্তরিক ঈশ্বরভক্তি অতি বিরল দেখা যায়। সিদ্ধ মহাপুরুষ রামপ্রসাদ তাই গাহিয়াছেন, 'লক্ষের দু একটা কাটে হেসে দাও মা হাত চাপড়ি।' বঙ্কিম গল্পটি মন দিয়া শুনিলেন।

বঙ্কিমের হৃদয় ঠাকুরের উপদেশে পরিবর্তিত হইয়াছিল। তিনি ঠাকুরের কথা শুনিতে শুনিতে এত চিন্তামগ্ন হইয়াছিলেন যে, গায়ের চাদর ফেলিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন। একজন তাঁহার চাদরখানি কুড়াইয়া তাঁহাকে দিলেন। ঠাকুরের কৃপাদৃষ্টি বঙ্কিমের উপর পড়িয়াছিল। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বঙ্কিমের 'দেবী চৌধুরাণী' বইখানি আনাইয়া ঠাকুর মাস্টার মহাশয়ের দ্বারা পড়াইয়া কিছু কিছু শুনিয়াছিলেন। তিনি গিরিশ ও শ্রীমকে বঙ্কিমের বাড়ীতে পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু ঠাকুরকে দ্বিতীয় বার দর্শনের সৌভাগ্য বঙ্কিমের আর হয় নাই। অধরের বাড়ীতেই বঙ্কিম ঠাকুরকে একবার মাত্র দর্শন করিয়া ধন্য হন।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ৬ই জানুয়ারী মঙ্গলবার অধরলাল সরকারী কার্য্যোপলক্ষে মাণিকতলা ডিষ্টিলারি পরিদর্শনে অশ্বারোহণে গিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ ফিরিবার সময় শোভাবাজার ষ্ট্রিটে ঘোড়া হইতে পড়িয়া তিনি মারাত্মক ভাবে আহত হন এবং তাঁহার বাম হাতের কব্জী ভাঙ্গিয়া যায়। এই দুর্ঘটনা শুনিয়াই ঠাকুর অধরলালকে দেখিতে গিয়াছিলেন। প্রিয় শিষ্যকে অন্তিম শয্যায় শায়িত এবং ধনুষ্টঙ্কারে বাক্‌শক্তিহীন দেখিয়া শিষ্যবৎসল ঠাকুর মর্মাহত হইলেন। তিনি বিষণ্ণ বদনে ও সজল নয়নে সস্নেহে ভক্তের গায়ে ও মাথায় শ্রীহস্ত বুলাইতে লাগিলেন। পতিতপাবন ঠাকুরকে মৃত্যুশয্যায় দেখিতে পাইয়া অধর পরম শান্তি পাইলেন। তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া দরদরধারে প্রেমাশ্রু প্রবাহিত হইল। শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবমুখে প্রিয় শিষ্যকে অভয়বাণী শুনাইলেন। অধরের মুখমণ্ডল অপূর্ব দিব্য ভাবে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। ১২৯১ সালের ২রা মাঘ (১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারী) বুধবার প্রাতে অধরলাল ইহলোক ত্যাগ করিলেন। শ্রীম বলেন, "অধরবাবুর যখন শরীর যায় তখন ঠাকুর জগদম্বার কাছে কেঁদে কেঁদে বলেছিলেন, "মা তুই আমাকে ভক্তি দিয়ে রেখেছিস বলেই ত আমার এই অবস্থা!" ভক্তবৎসল ভগবান প্রিয় ভক্তের মৃত্যুতে মর্মাহত হইয়া অশ্রুবিসর্জন করিলেন।

ত্রিশ বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্বেই অধরলাল ইহলীলা সাঙ্গ করিলেন। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে বোর্ড অব রেভিনিউ শোক প্রকাশ করেন। কটন সাহেবের সভাপতিত্বে অধরলালের স্মৃতিসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি কটন সাহেব অধরলালের বিবিধগুণের প্রশংসা করিয়া অবশেষে শোকাক্রান্ত হৃদয়ে বলিয়াছিলেন, 'How bright a promise has been blighted by his premature death!' (অধরের অকাল মৃত্যুতে একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ বিনষ্ট হইল।) ঠাকুরের প্রিয় ভক্তগণের মধ্যে কেহই অধরের মত এত অল্প বয়সে দেহত্যাগ করেন নাই। কিঞ্চিদূন দুই বৎসর ঠাকুরের দিব্য সঙ্গে থাকিয়া অধর দেখাইলেন, ভক্তের জীবন স্বল্পস্থায়ী ভগবানের লীলাক্ষেত্র হইতে পারে।

তেত্রিশ

অরবিন্দ ঘোষ*

পরাধীন ভারতকে পাশ্চাত্য প্রভাব হইতে বিমুক্ত এবং স্বভাবে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে বিগত শতাব্দীতে যে সকল অমর পুরুষের আবির্ভাব হয় অরবিন্দ ঘোষ তাঁহাদের অন্যতম। রাজা রামমোহন, স্বামী বিবেকানন্দ, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতির ন্যায় ঋষি অরবিন্দ একজন ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ এবং নবজাগরণের ধারক ও বাহক ছিলেন।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট শ্রীঅরবিন্দ কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা কৃষ্ণধন ঘোষ ইংলণ্ডে উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হন এবং ইণ্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিসের অন্তর্ভুক্ত ডাক্তার ছিলেন। তাঁহার মাতা স্বর্ণলতা দেবী ব্রাহ্ম সংস্কারক রাজনারায়ণ বসুর কন্যা। কৃষ্ণধন পাশ্চাত্য শিক্ষার একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার চারি পুত্র ও এক কন্যা ছিল। পুত্রগণের নাম বিনয়ভূষণ, মনোমোহন, অরবিন্দ ও বারীন্দ্র এবং কন্যার নাম সরোজিনী। অরবিন্দ অতি শৈশবে দার্জিলিং সেণ্ট পল্‌স স্কুলে কিছু কাল শিক্ষা লাভ করেন। যখন তাঁহার বয়স সাত বৎসর মাত্র তখন তিনি অগ্রজদ্বয় বিনয়ভূষণ ও মনোমোহনের সহিত ইংলণ্ডে শিক্ষার্থ প্রেরিত হন। সমুদ্রবক্ষে জাহাজে বারীন্দ্রের জন্ম হয়। রংপুরের তদানীন্তন ম্যাজিষ্ট্রেট গ্লেজিয়ার সাহেব কৃষ্ণধনের ঘনিষ্ঠ সুহৃদ ছিলেন। এই ম্যাজিষ্ট্রেটের আত্মীয় পাদ্রী ড্রইডের পরিবারে ম্যাঞ্চেষ্টারে থাকিয়া কৃষ্ণধনের তিন পুত্র লেখাপড়া করিতেন। ম্যাঞ্চেষ্টারের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের পর অরবিন্দ লণ্ডনের সেণ্ট পল্‌স স্কুলে ভর্তি হন। সেই স্কুল হইতে তিনি

---

* ১৯৫০ খ্রীঃ ৯ই ডিসেম্বর মঙ্গলবার বালিগঞ্জ মিলন মেলায়, ১৩ই ডিসেম্বর শনিবার কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটীতে এবং ১৪ই ডিসেম্বর রবিবার বহুবাজার রামকৃষ্ণ সমিতিতে প্রদত্ত ভাষণত্রয়ের সারাংশ।

কৃতিত্বের সহিত প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তিলাভ করেন। তৎপরে তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কিংস কলেজে পড়িতে আরম্ভ করেন। তখন তিনি ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিয়া দশম স্থান অধিকার করেন। এই সময়ে তিনি সামান্য বাংলা শিখিয়াছিলেন। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে মাত্র আঠার বৎসর বয়সে তিনি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষায় রেকর্ড মার্ক রাখেন। কিন্তু তিনি অশ্বারোহণ পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হওয়ায় সিভিল সার্ভিসে প্রবেশাধিকার পান নাই। পুনরায় তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িতে আরম্ভ করেন এবং ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে ক্লাসিকস্ ট্রাইপস্ পরীক্ষায় সসম্মানে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া গ্রীক ভাষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। গ্রীক ও ল্যাটিন, ফ্রেঞ্চ ও জার্মান, ইটালিয়ান ও ইংলিশ— এই ছয়টি ইউরোপীয় ভাষায় তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন। ইতালীয় ও জার্মান ভাষায় অভিজ্ঞ হওয়ায় তিনি ইটালীর মহাকবি দান্তে এবং জার্মানীর মহাকবি গ্যেটের মূল গ্রন্থগুলি পড়িতে পারিতেন। তিনি বিলাতে অবস্থান কালে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের কাব্যে ও সাহিত্যে, দর্শনে ও ইতিহাসে গভীর ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন।

ভারতের জনপ্রিয় ইংরাজ সার হেনরী কটন অরবিন্দের মাতামহ রাজনারায়ণ বসুর বিশেষ বন্ধু ছিলেন। সার হেনরীর পুত্র জেমস কটন অরবিন্দকে বরোদার মহারাজার সহিত ইংলণ্ডে পরিচয় করাইয়া দেন। অরবিন্দ গাইকোয়াড়ের প্রাইভেট সেক্রেটারীরূপে ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তখন তাঁহার বয়স মাত্র একুশ বৎসর। ১৮৭৯ হইতে ১৮৯৩ খ্রীঃ পর্য্যন্ত প্রায় চৌদ্দ বৎসর বিলাতে অবস্থানের পর বরোদায় আসিয়া তিনি কর্মজীবন আরম্ভ করেন এবং তথায় ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রায় তের বৎসর অতিবাহিত হয়। বরোদায় মহারাজের প্রাইভেট সেক্রেটারীরূপে এবং রাজস্ব বিভাগের অফিসাররূপে কিছুদিন কর্ম করিবার পর তিনি বরোদা কলেজে ইংরাজীর অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তিনি অচিরে ছাত্রপ্রিয় অধ্যাপকরূপে পরিচিত এবং উপাধ্যক্ষ পদে উন্নীত হন। বরোদায় সার রমেশ চন্দ্র দত্ত ও ভগ্নী

নিবেদিতা প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তির সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। সম্ভবতঃ ১৯০১।২ খৃষ্টাব্দে ভূপাল চন্দ্র বসুর কন্যা মৃণালিনী দেবীর সহিত তিনি পরিণীত হন। ভূপাল বাবু বঙ্গীয় কৃষি বিভাগে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই সময় অরবিন্দ সুসাহিত্যিক দীনেন্দ্রকুমার রায়ের নিকট বাংলা ভাষা শিক্ষা করেন। যুবক অরবিন্দের বিবাহিত জীবনে বিলাসিতা আদৌ প্রশ্রয় পায় নাই। তপস্বীর ন্যায় তিনি কঠোর জীবন যাপন করিতেন এবং লোহার খাটে গায়ে একখানা কম্বল জড়াইয়া রাত্রে শুইয়া থাকিতেন। সেই সময় তিনি বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ এবং রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলী মনোযোগের সহিত পাঠ করেন।

অরবিন্দের নিকট অধ্যয়ন তপস্যার তুল্য ছিল। অধ্যয়নে তাঁহার মন এত একাগ্র হইত যে, তাঁহার বাহ্য জ্ঞান থাকিত না। দীনেন্দ্রকুমার তাঁহার 'অরবিন্দ প্রসঙ্গে' লিখিয়াছেন, "তাঁহাকে পুস্তকের উপর বদ্ধদৃষ্টি অবস্থায় একই ভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া সেই স্থানে উপবিষ্ট দেখিতাম যোগ-নিমগ্ন তপস্বীর ন্যায় বাহ্য জ্ঞানশূন্য। ঘরে আগুন লাগিলেও বোধ হয় তাঁহার হুঁস হইত না। তিনি এই ভাবে প্রতিদিন রাত্রি জাগরণ করিয়া ইউরোপের নানা ভাষায় কত কাব্যগ্রন্থ, উপন্যাস, ইতিহাস, দর্শন পাঠ করিতেন তাহার সংখ্যা ছিল না। অরবিন্দের পাঠাগারে ইউরোপের নানা ভাষার গ্রন্থ স্তূপীকৃত ছিল। ফরাসী, জার্মাণ, রাশিয়ান, ইংরাজী, গ্রীক, লাটিন প্রভৃতি কত ভাষার কত রকমের পুস্তক, তাহার পরিচয় আমার জানা ছিল না।" বাংলা ও সংস্কৃত ব্যতীত আরও কয়েকটী ভারতীয় ভাষা অরবিন্দ বরোদায় আয়ত্ত করেন। ইউরোপীয় ও ভারতীয় সাহিত্য এবং দর্শনে সুগভীর পাণ্ডিত্য অরবিন্দের ন্যায় অন্য কোন ভারতীয় বর্তমান যুগে লাভ করিয়াছেন কিনা সন্দেহ।

বরোদার অদূরে নর্মদা তীরে মৌন মহাযোগী ব্রহ্মানন্দ থাকিতেন। তিনি কখনো কাহারো দিকে দৃষ্টিপাত করিতেন না। অরবিন্দ যখন তাঁহাকে দেখিতে যান তখন মৌন যোগী তরুণ অভ্যাগতের প্রতি পূর্ণভাবে দৃষ্টিপাত করেন। যোগীর আশ্রমে স্বশিষ্য মারাঠী পণ্ডিত লেলেও বাস করিতেন। লেলের নিকট অরবিন্দ যোগ সাধনায় দীক্ষিত হন। ইতঃপূর্বে তিনি স্বামী বিবেকানন্দের

'রাজযোগ' পাঠান্তে যোগসাধনায় আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। এখন লেলের নিকট যোগ-রহস্য অবগত হইয়া যোগ সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। ১৯০৫ খ্রীঃ লর্ড কার্জন কর্তৃক বঙ্গ-বিভাগের প্রতিবাদরূপে বাংলায় স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হয়। স্বীয় মুক্তি সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া অরবিন্দ পরাধীনা দেশমাতৃকার মুক্তি লাভের আশু প্রয়োজন মর্মে মর্মে অনুভব করিলেন। ১৯০২ খ্রীঃ হইতে তিনি নিজেকে স্বদেশসেবার জন্য প্রস্তুত করিতেছিলেন এবং ১৯০৬ খ্রীঃ বরোদার উচ্চপদ ত্যাগ করিয়া বাংলায় আসেন এবং স্বদেশী আন্দোলনে মাতিয়া যান।

কলিকাতায় আসিয়া প্রথমে তিনি নূতন জাতীয় শিক্ষা পরিষদ্ কর্তৃক স্থাপিত কলিকাতা জাতীয় কলেজের অধ্যক্ষ-পদে অধিষ্ঠিত হন। কিন্তু কলেজের কর্তৃপক্ষের সহিত মতভেদ হওয়ায় ১৯০৭ খ্রীঃ আগষ্ট মাসে অধ্যক্ষের পদ পরিত্যাগপূর্বক তিনি 'বন্দে মাতরম্' নামক ইংরাজী দৈনিক স্থাপনান্তে সমগ্র দেশে গণজাগরণ আনিবার জন্য সচেষ্ট হন। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশ-মন্ত্র 'বন্দে মাতরম্' এর নামানুসারে তিনি তৎপ্রতিষ্ঠিত দৈনিকের নাম রাখিলেন। 'বন্দে মাতরম্' দৈনিকে বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছিলেন, "কুকুরের মত আবেদন প্রণালী ত্যাগ করিয়া তিনি আমাদিগকে সিংহের ন্যায় বলপূর্বক অধিকার প্রণালী জাতীয় আন্দোলনে প্রয়োগ করিতে শিখাইলেন।" জাতীয় আন্দোলনে নরমপন্থী দলের আবেদন নীতি পরিত্যক্ত এবং পূর্ণ স্বরাজ লাভের আদর্শ গৃহীত হইল। বসিরহাটে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনে সুভাষচন্দ্র বলিয়াছিলেন, "জাতিকে পূর্ণ স্বরাজ লাভের আর্দর্শ দিয়াছিলেন শ্রীঅরবিন্দ।" সুরাট কংগ্রেসেও এই বিষয় তীব্রভাবে আলোচিত হয়। রাজদ্রোহের অপরাধে অরবিন্দ ১৯০৭ খ্রীঃ রাজরোষে পড়িলেন। আলীপুর ষড়যন্ত্র মামলায় সংশ্লিষ্ট হওয়ার সন্দেহে তিনি ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে আলীপুর জেলে আবদ্ধ হন। আলীপুর জেলে প্রায় এক বৎসর থাকিবার পর ব্যারিষ্টার দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের বাগ্মিতাপূর্ণ পক্ষ সমর্থনে তিনি কারামুক্ত হন। আলীপুর জেলে বিদ্রোহী দলের নেতা তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বারীন্দ্রও তখন আবদ্ধ ছিলেন। অরবিন্দের জীবনে পূর্বারব্ধ যোগসাধনা কারাগারেও চলিতেছিল। তাহার ফলে তিনি কারাগারে অলৌকিক ভগবদ্দর্শন

লাভ করেন। উত্তরপাড়া বক্তৃতায় তিনি উক্ত দর্শনের চিত্তাকর্ষক বর্ণনা দিয়াছেন। তাঁহার মেসো মহাশয় 'সঞ্জীবনী' সম্পাদক কৃষ্ণ কুমার মিত্র তদনুরোধে তাঁহাকে গীতা ও উপনিষদ্ জেলে পাঠাইয়াছিলেন। সেই সকল অধ্যয়ন এবং সকালে ও সন্ধ্যায় ধ্যানাভ্যাস দ্বারা তাঁহার এই ভাগবত অনুভূতি লাভ হয়। উপনিষদের 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' মন্ত্র জপ করিতে করিতে বৃক্ষে, গৃহে, প্রাচীরে, মনুষ্যে, পশুতে, ধাতুতে ও মৃত্তিকায় সর্বত্র তিনি ব্রহ্মদর্শন করিলেন। কারাগার আর তাঁহার কাছে কারাগার বোধ হইল না। বিচারালয়ে এবং সরকারী উকিল, সাক্ষী প্রভৃতির মধ্যেও ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে তিনি দেখিতে পাইলেন। শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শন তাঁহাকে দিব্য জীবন দান করিল। গীতার ভগবান তাঁহাকে সনাতন ধর্মের বাণী শুনাইলেন এবং স্বধর্ম সাধন ও সংরক্ষণের জন্য আত্মোৎসর্গ করিতে আদেশ দিয়া বলিলেন—"সনাতন ধর্মই ভারতকে অমর করিয়াছে।" এই সনাতন ধর্মের সাধনায়, সম্প্রচারে ও সংরক্ষণে অরবিন্দ-জীবনের অবশিষ্ট চল্লিশ বৎসর অতিবাহিত হয়।

'বন্দে মাতরম্' ব্যতীত 'কর্মযোগীন্' নামক ইংরাজী সাপ্তাহিক তিনি পরিচালনা করিতেন। এই পত্রিকাদ্বয়ে তিনি যে সকল সারগর্ভ ও সুচিন্তিত প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন সেগুলি পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। 'কর্মযোগীন্' সাপ্তাহিকের প্রচ্ছদপটে ছিল শ্রীকৃষ্ণ বিষাদগ্রস্ত অর্জুনকে স্বীয় ক্ষাত্র ধর্ম পালনে উদ্বুদ্ধ করিতেছেন।

বাংলায় রাজনীতি ক্ষেত্রে তিনি বিদ্রোহী বিপ্লবী নেতারূপে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। 'ধর্ম' পত্রিকায় ১৩১৬ সালের ১২ই পৌষ তিনি লিখিয়াছিলেন, "ধর্মের বলে, সাহসের বলে, সত্যের বলে ভারত আবার উঠিবে। যাঁহারা জাতীয়তার মহান আদর্শের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করিতে প্রস্তুত, যাঁহারা জননীকে আবার জগতের শীর্ষস্থানীয়া, শক্তিশালিনী, জ্ঞানদায়িনী, বিশ্বমঙ্গলকারিণী ঐশী শক্তিরূপে জগতের সম্মুখে ধরিতে উৎসুক, তাঁহারা মিলিত হউন এবং ধর্মবলে, ত্যাগবলে বলীয়ান হইয়া মাতৃসেবায় আত্মোৎসর্গ করুন। মায়ের সন্তান ধর্মভ্রষ্ট হইয়াছ, আবার ধর্মপথে এস।"

১৩১৬ সালের ৭ই ভাদ্র 'ধর্ম' সাপ্তাহিকে অরবিন্দ লিখিয়াছিলেন, "আমাদের ধর্ম সনাতন। এই ধর্ম ত্রিবিধ, ত্রিমার্গগামী, ত্রিকর্মরত। জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম এই ত্রিমার্গে আত্মশুদ্ধি হয়।....সনাতন ধর্মের মধ্যে অনেক গৌণ ধর্ম নিহিত। ব্যক্তিগত ধর্ম, জাতি ধর্ম, বর্ণাশ্রিত ধর্ম, যুগধর্ম ইত্যাদি গৌণ ধর্ম। এই গুলি অনিত্য হইলেও উপেক্ষণীয় নহে। এই গুলি অবলম্বনে সনাতন ধর্ম অনুষ্ঠিত হয়। আমাদের উদ্দেশ্য সনাতন ধর্ম প্রচার ও সনাতন ধর্মাশ্রিত জাতিধর্ম ও যুগধর্ম অনুষ্ঠান। আমরা ভারতবাসী, আর্য্য জাতির বংশধর, আর্য্য শিক্ষা ও আর্য্য নীতির অধিকারী। এই আর্য্য ভাবই আমাদের কুলধর্ম ও জাতি ধর্ম। জ্ঞান, ভক্তি ও যোগ আর্য্য শিক্ষার মূল ভিত্তি। উদারতা, প্রেম, সৎসাহস, ব্রহ্মচর্য্য, পবিত্রতা এবং বিনয়াদি আর্য্য চরিত্রের লক্ষণ। যুগধর্ম ও জাতিধর্ম পালিত হইলে জগৎময় সনাতন ধর্ম অবাধে প্রচারিত ও অনুষ্ঠিত হইবে।"

'কর্মযোগীন্' অফিস শ্যামপুকুরে অবস্থিত ছিল। তথায় অরবিন্দ তাঁহার সহকর্মীগণকে সংস্কৃত, ফরাসী ও ইতালীয় ভাষা শিখাইতেন, ছবি আঁকিতেন এবং automatic writing অভ্যাস করিতেন। দিন পনেরোর মধ্যেই তিনি তামিল ভাষা শিখিয়া উক্ত ভাষায় একটি কবিতা লিখিয়াছিলেন। তখন কে জানিত যে, অল্পদিন পরে তাঁহাকে তামিল দেশে যাইয়া বাকী জীবন কাটাইতে হইবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি শ্রীঅরবিন্দের হৃদয়ে গভীর শ্রদ্ধা ছিল। এই মহাপুরুষদ্বয়ের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা বহু লেখায় প্রকাশিত। তিনি বলিতেন, 'Ramkrishna the God Himself' (রামকৃষ্ণ সাক্ষাৎ ভগবান)। স্বামিজীর সম্বন্ধে তিনি বলিতেন, 'Man rising to God' (ঈশ্বরপদে আরুহ্যমান মানুষ) এবং নিজের সম্বন্ধে বলিতেন, 'Man rising to humanity' (মানবতায় আরোহনকারী মানুষ)। তৎসম্পাদিত 'ধর্ম' নামক সাপ্তাহিকে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে তিনি কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত "ভারতের প্রাণপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ" তাঁহারই লিখিত। অরবিন্দ দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে শ্রীরামকৃষ্ণের তপস্যার স্থানগুলি দর্শনার্থ যাইতেন। কালীবাড়ীর পবিত্র মৃত্তিকা একটি কার্ডবোর্ডের বাক্সে তাঁহার

বাড়ীতে ছিল। খানাতল্লাসীর সময় ইহা লইয়া যে হাস্যকর ব্যাপার ঘটে তাহা শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার "কারাকাহিনী"তে এই ভাবে বিবৃত করিয়াছেন।—"ক্ষুদ্র কার্ড বোর্ডের বাক্সে দক্ষিণেশ্বরের যে মাটী রক্ষিত ছিল ক্লার্ক সাহেব তাহা বড় সন্দিগ্ধ চিত্তে নিরীক্ষণ করেন। যেন তাঁহার মনে হইল যে, এটা কি নূতন ভয়ঙ্কর তেজবিশিষ্ট স্ফোটক পদার্থ। এক হিসাবে ক্লার্ক সাহেবের সন্দেহ ভিত্তিহীন বলা যায় না।"

শ্রীঅরবিন্দ ও তাঁহার অনুগামী দেবব্রত বসু বেলুড় মঠের সন্ন্যাসী হইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। দেবব্রত বেলুড় মঠে সন্ন্যাসী হইয়া স্বামী প্রজ্ঞানন্দ নামে পরিচিত ছিলেন। শ্রীঅরবিন্দকে গ্রহণ করিতে বেলুড় মঠের তৎকালীন অধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দ সম্মত হন নাই। চন্দননগরে যাইবার কিছু পূর্বে শ্রীঅরবিন্দ এবং তাঁহার সহধর্মিণী মৃণালিনী দেবী বাগবাজারে উদ্বোধন অফিসে শ্রীসারদা দেবীকে প্রণাম করিতে গিয়াছিলেন। কুমার অতীন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের ঘোড়ার গাড়ীতে শ্রীরামচন্দ্র মজুমদার* উভয়কে কৃষ্ণকুমার মিত্রের বাড়ী হইতে তথায় লইয়া যান। রামচন্দ্র বাবু তৎপূর্বে উদ্বোধন অফিসে যাইয়া স্বামী সারদানন্দকে জানাইয়াছিলেন, "অরবিন্দ বাবু শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে প্রণাম করিতে আসিতে চান।" স্বামী সারদানন্দ বলিলেন, "লইয়া আইস।" তদনুযায়ী রামচন্দ্র বাবু তাঁহাদিগকে তথায় লইয়া যান। উদ্বোধন অফিসে পৌঁছিয়া শ্রীঅরবিন্দ সস্ত্রীক দোতলায় যাইয়া সারদাদেবীকে দর্শন ও প্রণাম করেন। সারদাদেবী তাঁহার মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করেন এবং উপদেশ দিয়া বলেন, "এ আমার বীর ছেলে। এইটুকু মানুষ, একেই গবর্ণমেণ্টের এত ভয়!" সেদিন গৌরী-মাও তথায় উপস্থিত ছিলেন। অরবিন্দ শ্রীসারদাদেবীর ঘরের বাহিরে আসিলে গৌরী-মা তাঁহার চিবুক ধরিয়া স্বামিজীর কবিতার এই অংশটুকু বলিয়াছিলেন, "হৃদিবান্ নিঃস্বার্থ প্রেমিক এ জগতে নাহি তব স্থান। যত উচ্চ তোমার হৃদয় তত দুঃখ জানিহ নিশ্চয়।" অরবিন্দ কম্পিতপদে কিঞ্চিৎ

* তিনি "প্রবাসী"র ১৩৫২ শ্রাবণ সংখ্যায় 'অপ্রকাশিত ইতিহাসের আর এক পৃষ্ঠা' শীর্ষক প্রবন্ধে এই বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন। তিনি শ্রীঅরবিন্দের সহকর্মী ও সুহৃৎ ছিলেন।

ভাবস্থ হইয়া নীচে আসিয়া স্বামী সারদানন্দের সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার পত্নী মৃণালিনীদেবী সারদাদেবীর নিকট মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বরোদায় অবস্থান কালে শ্রীঅরবিন্দ ভগ্নী নিবেদিতার সহিত প্রথম পরিচিত হন। নিবেদিতা তাঁহাকে স্বামিজীর 'রাজযোগ'খানি উপহার দেন। অরবিন্দ বলিতেন, এই পুস্তক পড়িয়াই তাঁহার হিন্দু-দর্শন পড়িবার আগ্রহ জন্মে। ভগ্নী নিবেদিতা 'কর্মযোগিন্'এ প্রবন্ধ লিখিতেন। যখন অরবিন্দ চন্দননগরে আত্মগোপন করেন তখন নিবেদিতাই কাগজখানি চালাইয়াছিলেন। চন্দন-নগরে যাইবার পূর্বে অরবিন্দ সহকর্মী রামবাবুকে বলিলেন, "নিবেদিতাকে জিজ্ঞাসা করিয়া আইস।" তদনুযায়ী রামবাবু নিবেদিতার বাসায় যাইয়া তাঁহাকে সকল ঘটনা জানাইলেন। নিবেদিতা সব শুনিয়া বলিলেন, "Tell your chief to hide and the hidden chief through intermediary shall do many things. (তোমাদের দলপতিকে লুকাইতে বল এবং লুক্কায়িত দলপতি মধ্যস্থ ব্যক্তির দ্বারা অনেক কাজ করিবেন)। একদিন অরবিন্দ রামবাবুকে বলিয়াছিলেন, 'Mother Kali through Sister Nivedita ordered me to hide! (মা কালী ভগ্নী নিবেদিতার প্রমুখাৎ আমাকে লুকাইতে আদেশ দিলেন)। তদনুযায়ী অরবিন্দ চন্দননগরে যাইতে প্রস্তুত হন। বাগবাজারে গঙ্গার ঘাটে নৌকায় উঠিবার পূর্বে তিনি বোসপাড়া লেনে নিবেদিতার বাসায় যাইয়া তাঁহার সহিত 'কর্মযোগিন্' পরিচালনা সম্পর্কে পরামর্শ করেন। নিবেদিতা এবং জনৈক ব্রহ্মচারী অরবিন্দের সহিত গঙ্গাঘাট পর্যন্ত গিয়াছিলেন।*

১৩১৬ সালের ৫ই চৈত্র "কর্মযোগিন্" নামক ইংরাজী সাপ্তাহিকে শ্রীঅরবিন্দ লিখিয়াছিলেন, "রামকৃষ্ণ পরমহংসের উৎসব প্রতি বৎসর কলিকাতার অন্তরে গভীর সাড়া জাগাইয়া দেয়। যাঁহারা বিশ্বাস করেন যে, দক্ষিণেশ্বরের ঋষির আবির্ভাব বর্তমান ভারতের এই যুগ-সন্ধিক্ষণে একটী অর্থপূর্ণ ঘটনা তাঁহাদের

* শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী লিখিত এবং উদ্বোধনের ১৩৫১ আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত "শ্রীঅরবিন্দ" শীর্ষক প্রবন্ধ দেখুন।

সংখ্যা বৎসরের পর বৎসর উক্ত উৎসবে বাড়িতেছে। কেহ কেহ ইহা বিশ্বাস করেন এক কারণে, অপরে অন্য কারণে। ভক্তগণ তাঁহাকে ভগবানের শেষ অবতার বলিয়া ভক্তি করেন। ঐতিহাসিক তাঁহার মধ্যে হিন্দু ধর্মের মূল সূত্র দেখিতে পান। সাম্প্রদায়িক অনুভব করেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ সকল সম্প্রদায়ের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন, কাহারো প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন নহেন। দার্শনিক তাঁহার মধ্যে সর্বোচ্চ বেদান্তের জীবন্ত বিগ্রহ দর্শন করেন। এমন কি, কর্মিগণের মধ্যেও অনেকে আছেন যাঁহারা তাঁহার আবির্ভাবরূপ ঘটনা হইতে স্ব স্ব জীবন সংগ্রামের সমর্থক ও শক্তিদায়ক বিশ্বাস প্রাপ্ত হন।

"গত পাঁচ শত বৎসরের মধ্যে জগতে রামকৃষ্ণ পরমহংসের মত দ্বিতীয় মহাপুরুষ আবির্ভূত হন নাই। তিনি যে ভাবরাশি রাখিয়া গিয়াছেন সেগুলি প্রথমে অনুভূতিতে পরিণত করিতে হইবে। তৎপ্রকটিত আধ্যাত্মিক শক্তি আমাদের জীবনে সিদ্ধিতে পর্যাবসিত হওয়া আবশ্যক। যতক্ষণ তাহা না হইতেছে ততক্ষণ আরো চাহিবার কি অধিকার আমাদের আছে ? অধিক লইয়া আমরা কি করিতে পারি ?

"ভারতে সর্বদাই ধর্মজাগরণ জাতীয় জাগরণের পূর্ববর্তী। শঙ্করাচার্যো যে তরঙ্গের আরম্ভ তাহা সমগ্র দেশ প্লাবিত করিয়া বাংলায় চৈতন্যরূপে, পাঞ্জাবে শিখগুরুগণরূপে, মহারাষ্ট্রে শিবাজীরূপে এবং দাক্ষিণাত্যে রামানুজ ও মধ্বাচার্যারূপে পর্যাবসিত। ইঁহাদের প্রত্যেকের দ্বারা এক একটি জাতি আত্মসম্বিতে, জাতীয় শক্তিতে এবং স্বীয় ঐক্যবোধে উদ্বুদ্ধ হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ একাধারে এই সকল ধর্মগুরুগণের সমন্বয়-মূর্তি। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, রামকৃষ্ণ যুগের আন্দোলনগুলি অতীতের অধিকতর প্রাদেশিক ও একদেশিক আন্দোলনগুলিকে একীভূত ও সংঘবদ্ধ করিবে। রামকৃষ্ণ পরমহংস সামগ্রিক সমন্বয়ের অপূর্ব প্রতিমূর্তি। তাঁহার সমাধিপূত মহাজীবনই আমাদিগকে সমুদ্রমুখে বহনকারী স্রোতের অসীমতার সাক্ষী। আমাদের পশ্চাতে যে মহাশক্তি বিদ্যমান এবং আমাদের সম্মুখে যে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ উদীয়মান এই উভয়ের প্রকৃষ্ট প্রমাণ তিনিই। এত বড় মহাপুরুষের আবির্ভাব দ্বারা মহাযুগান্তর সূচিত হয়।"

উপরোক্ত ইংরাজী সাপ্তাহিকে ১৩১৬ সালের ১২ই আষাঢ় শ্রীঅরবিন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন, "ভারতের আত্মা প্রথমে ধর্মে জাগ্রত ও বিজয়ী হয়। ভারতে সর্বদা ইহার চিহ্ন দেখা যায় এবং নিরন্তর মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটে। কিন্তু যখন কলিকাতার শিক্ষিত যুবকগণের মধ্যে যাঁহারা উত্তম তাঁহারা অশিক্ষিত সমাধিবান মহাযোগী, সম্পূর্ণরূপে পাশ্চাত্য ভাব বা শিক্ষাবর্জিত হিন্দু সাধু পরমহংসের চরণে মস্তক অবনত করিলেন তখনই যুদ্ধজয় হইল। ঠাকুর স্বয়ং স্বামিজীর সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে, এ বীরপুরুষ এবং দুই হাতে জগৎকে ওলটপালট করবে। সেই বিবেকানন্দের পাশ্চাত্য গমন ও পাশ্চাত্য বিজয় প্রথমে জগৎকে দেখাইল যে, ভারত শুধু পুনরুত্থানের জন্য জাগ্রত নয়, ইহা অভূতপূর্ব জগজ্জয়ের জন্য জাগ্রত হইয়াছে।" পণ্ডিচেরী অরবিন্দ আশ্রম হইতে ১৯৪৮ খ্রীঃ প্রকাশিত "শ্রীঅরবিন্দ ও তাঁহার আশ্রম" নামক ইংরাজি পুস্তিকাতে (৪৪-৪৫ পৃষ্ঠায়) আছে শ্রীঅরবিন্দের এই স্বতঃস্ফূর্ত স্বীকৃতি—"It is a fact that I was hearing constantly the voice of Vivekananda speaking to me for a fortnight in the jail in my solitary meditation and felt his presence." (ইহা সত্য যে, কারাবাসে আমার নিভৃত ধ্যানে এক পক্ষকাল ধরিয়া বিবেকানন্দের বাণী আমি অবিরাম শুনিতেছিলাম এবং তাঁহার সান্নিধ্য অনুভব করিয়াছিলাম।"

শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার "যোগসমন্বয়" (Synthesis of Yoga) পুস্তকের পঞ্চম অধ্যায়ে লিখিয়াছেন, "একটি আধুনিক অতুলনীয় দৃষ্টান্ত রামকৃষ্ণ পরমহংসের জীবনে আমরা দেখি, বিশাল আধ্যাত্মিক সামর্থ্য দ্রুতবেগে ঋজুভাবে দিব্যদর্শনের অভিমুখে ধাবমান। তিনি যেন বলপূর্বক স্বর্গরাজ্য অধিকারে অগ্রসর। তিনি একটির পর একটি যোগমার্গ ধরিয়া এবং অসাধারণ ক্ষিপ্রতার সহিত উহার সারতত্ত্ব অনুভব করিয়া সমগ্র সাধনার মূলে সদা প্রত্যাবর্তিত। প্রেমবলে বা জন্মগত আধ্যাত্মিকতার প্রসার দ্বারা বিচিত্র অনুভূতি লাভ করিয়া এবং যোগজ জ্ঞানের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ দ্বারা ঈশ্বর সন্দর্শন এবং ভাগবত জ্ঞানলাভ তাঁহার জীবনের মুখ্য লক্ষ্য ছিল।"

শ্রীঅরবিন্দ আর এক স্থানে স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে বলেন, "বিবেকানন্দ ছিলেন পুরুষ-সিংহ। তাঁহার সৃজনী শক্তি ও সামর্থ্য সম্বন্ধে আমাদের যে সমুচ্চ ধারণা আছে উহার সহিত তদারব্ধ সামান্য কার্য্য আদৌ সুসমঞ্জস নহে। আমরা অনুভব করি, তাঁহার প্রভাব এখনও বিপুল বেগে ক্রিয়াশীল। কোথায় ও কিরূপে তাহা প্রকাশমান আমরা তাহা জানি না। সিংহতুল্য সুমহৎ, অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন মহাজাগরণ ভারত আত্মাকে অভিভূত করিয়াছে। তাই আমি বলি, দেখ, বিবেকানন্দ তাঁহার মাতৃভূমির অন্তরে এবং ভারত-ভারতীয় হৃদয়ে এখনও জীবিত।" শ্রীঅরবিন্দ আরও বলেন, "যে মহৎ কর্ম দক্ষিণেশ্বরে আরব্ধ তাহা সমাপ্ত হয় নাই; এমন কি, ইহা সকলের বুদ্ধিগত হয় নাই। বিবেকানন্দ যাহা লাভ করিয়া সমাজে রূপায়িত করিবার জন্য প্রাণপণ করিয়াছিলেন তাহা এখনো সংসিদ্ধ হয় নাই। যাহা ভারতে পূর্বে একবার দ্রুতবেগে ঘটিয়াছিল, কিন্তু সামান্য ফল প্রসব করিয়াছিল—যখন বুদ্ধ জীবিত ছিলেন এবং আর্য্য জাতিগণকে তাঁহার দর্শন ও নীতি শিক্ষা দিতেছিলেন—তাহারই বৃহত্তর পুনরাবৃত্তি এই যুগে ঘটিবে। সেই নবযুগের পূর্ব সূচনা আমরা বিবেকানন্দের বাণীতে ও কর্মে পাই।" বিবেকানন্দের আরব্ধ কর্ম যে সুদূরপ্রসারী ফল প্রসব করিবে তাহা শ্রীঅরবিন্দ এই ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, "যেদিন বিবেকানন্দের চরণে নিবেদিতা আত্মনিবেদন করিলেন সেদিন সূচিত হইল, পাশ্চাত্যও ভবিষ্যতে ভারতীয় ভাবে দীক্ষিত হইবে।"

১৯২৮ খ্রীঃ রোমাঁ রোলাঁ তাঁহার "বিবেকানন্দের জীবনী ও বিশ্ববাণী" নামক গ্রন্থে "বিবেকানন্দের পরে ভারতের জাগরণ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অরবিন্দ ঘোষ" শীর্ষক অধ্যায়ে* লিখিয়াছেন, "অরবিন্দ বিবেকানন্দের ভাব-সম্পদের প্রকৃত উত্তর সাধক।....ঐ মহান্ নব্য বেদান্ত ভাবের মহত্তম প্রতিনিধি

* মূল ফরাসী গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদের যে দুইটি সংস্করণ ভারত ও ইংলণ্ড হইতে প্রকাশিত তন্মধ্যে ভারতীয় সংস্করণে উক্ত অধ্যায়টী নাই, কিন্তু ইংলণ্ডীয় সংস্করণে আছে। এই দুষ্প্রাপ্য অধ্যায়ের মৎকৃত বঙ্গানুবাদ 'প্রবর্তক'এর ১৩৫৭ ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত এবং এই পুস্তকের (ঘ) পরিশিষ্টে প্রদত্ত।

ছিলেন এবং এমন কি এখনও আছেন অরবিন্দ ঘোষ। আলোচ্য কালের মধ্যে নির্বাপিত চিতা হইতে ব্যুত্থিত বিবেকানন্দের বাণী সুষ্ঠুভাবে তাঁহার কম্বুকণ্ঠে আমরা শুনিতে পাই।" সুসাহিত্যিক শ্রীমোহিতলাল মজুমদার ফরাসী মনীষী রোমাঁ রোঁলার সুচিন্তিত অভিমত সমর্থনপূর্বক তাঁহার "বাংলার নবযুগ" গ্রন্থে দেখাইয়াছেন, অরবিন্দের বাণীতে বিবেকানন্দের বাণী প্রতিধ্বনিত। মহাভারতের নবযুগ প্রবর্তকগণের মধ্যে ঋষি অরবিন্দ অন্যতম।

১৩১৬ বঙ্গাব্দের শেষে (১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে) অরবিন্দ ছদ্মবেশে নৌকায় কলিকাতা হইতে ফরাসী এলাকা চন্দননগরে গমন করেন। চন্দননগরে তিনি কিছুদিন শ্রীমতিলাল রায়ের গৃহে অতিথি ছিলেন এবং সেখান হইতে সমুদ্রপথে ১০ই এপ্রিল পণ্ডিচেরীতে উপস্থিত হন। কয়েকজন সঙ্গীকে লইয়া পণ্ডিচেরীতে আর্থিক অভাবের মধ্যেও তিনি অম্লান বদনে জীবন-যাপন করেন। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯৫০ খ্রীঃ পর্যন্ত প্রায় চল্লিশ বৎসর তথায় অরবিন্দ যোগসাধনায় ও গ্রন্থ-রচনায় নিমগ্ন ছিলেন। তৎপত্নী মৃণালিনী দেবী রাঁচিতে স্ব-পিতৃগৃহে থাকিতেন। তিনি মৃণালিনীকে পণ্ডিচেরী হইতে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন, "অন্য লোকে স্বদেশকে একটা জড়পদার্থ—কতকগুলা মাটী, ক্ষেত্র, বন, পর্বত, নদী বলিয়া জানে। আমি স্বদেশকে মা বলিয়া জানি ভক্তি করি, পূজা করি।····কোন মতে ভগবানের সাক্ষাৎ দর্শন করিতে হইবে।' শ্রীঅরবিন্দের বাংলা ত্যাগের নয় বৎসর পরে ১৩২৫ সালের ২রা পৌষ মৃণালিনী বঙ্গবাসী কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ গিরিশচন্দ্র বসুর বাটীতে দেহত্যাগ করেন।

'কেন তিনি পণ্ডিচেরীতে যাইয়া নির্জন-বাস আজীবন বরণ করিলেন?—ফরাসী মনীষী রোমাঁ রোলাঁর এই প্রশ্নের উত্তরে অরবিন্দ লিখিয়াছিলেন "মানব জাতির প্রগতির একটি উৎকৃষ্ট চাবি-কাঠি অতীত ভারতের হাতে আছে। চাবিটী কিছুকাল ব্যবহারের অভাবে কিঞ্চিৎ মলিন হইয়াছে। মধ্যমশ্রেণীর রাষ্ট্রনীতির অনুসরণ ছাড়িয়া এখন আমি এই দিকে আমার সর্বশক্তি নিয়োজিত করিয়াছি। ইহাই আমার নির্জন বাসের প্রধান কারণ। আত্মশুদ্ধি, আত্মজ্ঞান

এবং আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশের জন্য আমি নির্জন তপস্যার প্রয়োজনে দৃঢ় বিশ্বাস করি। আমাদের পূর্ব পুরুষগণ বিভিন্ন রূপে এই সকল উপায় অবলম্বন করিতেন আত্মজ্ঞান লাভের জন্য।" কারাগারে যে ভগবদ্বাণী শুনিয়াছিলেন তাহাতেই অরবিন্দ দিব্য জীবনের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাইলেন এবং তাহা লাভের জন্য পণ্ডিচেরীতে সাধন-সমুদ্রে ডুব দিলেন।

যে বৎসর প্রথম মহাসমর আরম্ভ হয় সেই বৎসর ১৯১৪ খ্রীঃ ১৫ই আগষ্ট তাঁহার ৪২তম জন্মদিবসে 'আর্য' নামক ইংরাজী মাসিক তিনি প্রথম প্রকাশ করেন। উহার প্রথম খণ্ডের ফরাসী সংস্করণও প্রকাশিত হয়। ১৯১৪—১৯২১ খ্রীঃ পর্যন্ত প্রায় সাত বৎসর মাসিকটী চলিয়াছিল পল রিবার্ড ও মিরা রিবার্ড নামক ফরাসী দম্পতীর সহযোগিতায়। ইহাতে গীতা সম্বন্ধে অরবিন্দের মৌলিক প্রবন্ধাবলী, যোগসমন্বয় এবং দিব্য জীবন শীর্ষক সারগর্ভ রচনাসমূহ ধারাবাহিক ভাবে বাহির হয়। ১৯১৮—১৯১৯ খ্রীঃ পর্যন্ত ইহাতে 'ভারতে মহাজাগরণ' শীর্ষক অনেক গুলি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। সেই গুলির কয়েকটী পুস্তকাকারে পাওয়া যায়। "ভারত ও ভবিষ্যৎ" (India and the Future) নামক একটী পুস্তক উইলিয়াম আর্চার প্রকাশ করেন ভারতীয় সংস্কৃতিকে আক্রমণোদ্দেশ্যে। তদুত্তরে শ্রীঅরবিন্দ 'আর্য' পত্রিকায় ছয়টী সুচিন্তিত প্রবন্ধ লেখেন। ভারত-প্রেমিক সার জন উড্রফের "ভারত কি সভ্য?" (Is India civilized?) পুস্তকখানিও উইলিয়াম আর্চারের পুস্তকের প্রতিবাদস্বরূপ লিখিত।

ভারত সংস্কৃতি সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের প্রবন্ধাবলী 'আর্য' পত্রিকার পঞ্চম খণ্ডে প্রকাশিত। ভারতীয় সভ্যতার ভিত্তি ও লক্ষ্য, দোষ ও গুণ, উত্থান ও পতন এবং আধুনিক জাগরণ ও মানব জাতির ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য ইহার আবশ্যকতা সম্বন্ধে এরূপ অভ্রান্ত, সম্পূর্ণ ও সুচিন্তিত বিবরণ কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। উক্ত পর্য্যায়ের প্রথম প্রবন্ধে ভারত সংস্কৃতির তিনটী বিশেষত্ব প্রদর্শিত। অরবিন্দের মতে ভারতীয় মনকে বুঝিতে হইলে এই বিশেষত্বত্রয়ের অবগতি অপরিহার্য্য। ভারত সংস্কৃতির প্রথম বিশেষত্ব আধ্যাত্মিকতা। বিপদসঙ্কুল ভারতেতিহাসের

আদি হইতে অন্ত পর্যন্ত উক্ত বিশেষত্ব সুপ্রকটিত। ভারতীয় প্রতিভার দ্বিতীয় বিশেষত্ব অফুরন্ত বহুমুখিতা (inexhaustible manysidedness) এবং কল্পনাতীত অনন্ত সৃজনী শক্তি। অরবিন্দ বলেন, "অন্ততঃ তিন হাজার বৎসর, বস্তুতঃ অনন্ত কাল, ধরিয়া অবিরত, বিপুল ও অদ্ভুত ভাবে ভারত শক্তি সৃজনশীল। গণতন্ত্র, স্বারাজ্য ও সাম্রাজ্য, দর্শন, বিজ্ঞান ও সৃষ্টিতত্ত্ব, মতবাদ, শিল্প-কার্য ও চারুকলা, প্রাসাদ, মন্দির ও ধর্মশালা, সম্প্রদায়, সমিতি ও ধর্মসংঘ আইন নীতি বিভিন্ন প্রকার ভাস্কর্য, ব্যবসা, বাণিজ্য প্রভৃতি মহাভারতে এত অফুরন্ত ভাবে উৎপন্ন হইয়াছে যে, ইহাদের সম্পূর্ণ তালিকা করাও অসম্ভব। প্রত্যেক বিভাগে অসীম বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্য বিদ্যমান। প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির তৃতীয় বৈশিষ্ট্য সমৃদ্ধ বুদ্ধিমত্তা। এরূপ সুসূক্ষ্ম ও সুবিশাল বুদ্ধি ভারত ব্যতীত অন্য কোন দেশে সংসৃষ্ট হয় নাই।" অরবিন্দের মতে বিকৃত আধ্যাত্মিকতা (diseased spirituality) আমাদের বর্তমান অধঃপতনের মূল কারণ। ধর্মের এই রুগ্নতা দূরীভূত হইলেই আমাদের জাতীয় জীবন আবার সবল ও সুপুষ্ট হইয়া উঠিবে।

অরবিন্দ বলেন, "ঋগ্বেদে মানব জাতির অন্তরাত্মার ঊর্ধ্বগামী স্পৃহা সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশিত। আত্মার অমরত্বে আরোহণের উপযোগী ভাবনা ও আখ্যান ইহাতে পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে এবং ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক, তৈত্তিরীয় ও ঈশা এই চারিটি প্রাচীন উপনিষদে এবং গীতায় পূর্ণাঙ্গ সনাতন ধর্ম ব্যাখ্যাত। পরবর্তী যুগে সনাতন ধর্ম বিকৃত ও অঙ্গহীন হইয়া পড়ে।" অনেকের মতে অরবিন্দের "দিব্য জীবন" (The Life Divine) নামক গ্রন্থখানি সর্বাপেক্ষা দার্শনিক, উৎকৃষ্ট ও মৌলিক। স্যার ইয়ং হাসব্যাণ্ড নামক ইংরাজ মনীষী বলেন, "বহু শতাব্দীর মধ্যে ভারতে এরূপ ধর্মীয় ও দার্শনিক গ্রন্থ রচিত হয় নাই। ইটালীর মহাকবি দান্তের 'ডিভাইনা কমেডিয়া'র সহিত তিনি ইহার তুলনা করিয়াছেন। গীতাতত্ত্ব সম্বন্ধে অরবিন্দ যে প্রবন্ধাবলী লিখিয়াছেন সেগুলি অতিশয় মৌলিক। গীতার এরূপ মৌলিক ভাষ্য বর্তমান যুগে আর রচিত হয় নাই বলিলেই চলে। বাল গঙ্গাধর তিলকের 'গীতা-রহস্য' তুল্য ইহা একখানি

অপূর্ব গ্রন্থ। স্বীয় গীতাভাষ্যে অরবিন্দ পুরুষোত্তমবাদ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ের নাম পুরুষোত্তম যোগ। পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের দিব্য জীবন ইহাতে ব্যাখ্যাত।

কর্ম, যোগ, জ্ঞান ও ভক্তি এই চারি যোগের সমন্বয় দ্বারা তিনি যে মতবাদ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন তাহাকে তিনি পূর্ণ যোগ বলেন। 'যোগ সমন্বয়' নামক তাঁহার গ্রন্থে এই তত্ত্ব আলোচিত। গীতাতে যে পুরুষত্রয় উল্লিখিত সে সম্বন্ধে অরবিন্দ বলেন, "প্রকৃতির অধীন জীবাত্মাই ক্ষর পুরুষ। প্রকৃতির অধীন ঈশ্বরই অক্ষর পুরুষ এবং যে ভগবান প্রকৃতিতে পরিব্যাপ্ত এবং প্রকৃতির অতীত তিনিই পুরুষোত্তম।" গীতার মতে ক্ষর, অক্ষর ও উত্তম পুরুষ যথাক্রমে জড়জগৎ, জীবাত্মা ও পরমাত্মা। শ্রীঅরবিন্দের পুরুষোত্তম একও নহেন, বহুও নহেন। তাঁহাতে একত্ব ও বহুত্ব উভয়ই সত্য এবং সমঞ্জস। 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'—উপনিষদের এই উক্তি অবলম্বনে অরবিন্দ বলেন, "একত্ব যেমন সত্য বহুত্বও তেমনি সত্য।" অরবিন্দ-দর্শনের মূল সূত্র বা বীজাক্ষরই অতিমানস (supermind)। বেদে 'ঋত-চিৎ' নামে একটি শব্দ আছে। অরবিন্দ ইহাকে অতিমানসরূপে ব্যাখ্যা করেন। প্রাকৃত জীবনে এই অতিমানসের অবতরণ হইলেই দিব্য জীবন প্রকটিত হয়। দেবত্বে মানবের আরোহণ বা আধ্যাত্মিক ক্রমবিকাশ একটি সিঁড়ির মত ধাপযুক্ত নহে; উহা একটি ঢালু রাস্তার মত নিরবচ্ছিন্ন। অতিমানসের সহিত সংযুক্ত হইলেই মানুষ অতিমানব (superman) হইয়া যান। জার্মান দার্শনিক নিট্‌শের অতিমানব এবং অরবিন্দের অতিমানব সম্পূর্ণ ভিন্ন। নিট্‌শে গ্রীসীয় ভাববাদী এবং খ্রীষ্টীয় ভাববিরোধী ছিলেন। তাঁহার অতিমানব ঐহিক শক্তিসম্পন্ন মহাসুর। কিন্তু অরবিন্দের অতিমানব দেবতা, জীবন্মুক্ত বা ঋষি। অরবিন্দ যাহাকে পূর্ণ জীবন বলেন তাহাতে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্বর্গ এবং ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—এই চতুরাশ্রম সমন্বিত। গীতাতে ও চণ্ডীতে যে ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ উপদিষ্ট তাহাই অরবিন্দের মতে ভাগবত জীবন লাভের উৎকৃষ্ট উপায়।

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে 'আর্য্য' পত্রিকা বন্ধ হইয়া যায়। ইহার সঙ্গে সঙ্গে অরবিন্দের সৃজনী শক্তি অস্তমিত হয় বলিলেও চলে। ইহার পরে পাচ বৎসর তিনি একান্ত সাধনায় নিমগ্ন হন। তাহার ফলে ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে নভেম্বর তিনি যোগ-সিদ্ধি বা ঋষিত্ব লাভ করেন। সেই দিনের অলৌকিক অনুভূতির প্রভাবে তাঁহার অবশিষ্ট জীবনের চব্বিশ বৎসর তিনি মৌন ও গুপ্ত থাকেন। দিব্যদর্শন বা ঋষিত্ব লাভ না হইলে সুদীর্ঘ চব্বিশ বৎসর মৌন ও গুপ্ত থাকা সম্ভব নহে। উক্ত কালে বৎসরে মাত্র চার দিন ঋষি অরবিন্দ লোকসমক্ষে বাহির হইতেন। ২১শে ফেব্রুয়ারী ও ২৪শে এপ্রিল যথাক্রমে মীরা রিচার্ডের জন্মদিন ও আশ্রমে আগমন দিবস এবং ১৫ই আগষ্ট ও ২৪শে নভেম্বর যথাক্রমে শ্রীঅরবিন্দের জন্মদিন ও সিদ্ধি-দিবস। এই চারি দিনে ধ্যান-মৌন ঋষিকে দর্শনার্থ পণ্ডিচেরী আশ্রমে অসংখ্য লোকসমাগম হইত। সম্ভবতঃ ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ অরবিন্দকে কবিতায় অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। উহার প্রথমাংশ এইরূপ—

অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।

হে বন্ধু, হে দেশবন্ধু, স্বদেশ আত্মার বাণীমূর্তি তুমি॥

১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে ২৯শে মে ইউরোপ যাত্রার পথে রবীন্দ্রনাথ জাহাজ হইতে পণ্ডিচেরীতে অবতরণপূর্বক আশ্রমে যাইয়া অরবিন্দের সহিত সাক্ষাৎ করেন। প্রায় বিশ বৎসর পরে অরবিন্দকে দেখিয়া তাঁহার মনে কি ভাবোদয় হইয়াছিল তাহা তিনি ১৩৩৫ সনের শ্রাবণ সংখ্যা 'প্রবাসী'তে একটি প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করেন। কবি উক্ত প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন, "অরবিন্দের মধ্যে সহজ প্রেরণা-শক্তি পুঞ্জিত। তাঁর মুখশ্রীতে সৌন্দর্য্যময় শান্তির উজ্জ্বল আভা।"

১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে ১৫ই আগষ্ট তাঁহার ৭৯তম জন্মদিবস পণ্ডিচেরী আশ্রমে, কলিকাতায় এবং অন্যান্য বহু স্থানে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৎসর ২৪শে নভেম্বর সিদ্ধি-দিবসে তাঁহার পুণ্য দর্শন লাভের জন্য বহুশত নরনারী আশ্রমে সমবেত হন। নভেম্বরের শেষার্ধে তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং মূত্রাশয়ের পীড়ায় আক্রান্ত হন। তখন তিনি ডাঃ প্রভাকর সেনের চিকিৎসাধীন ছিলেন। ৫ই ডিসেম্বর সোমবার রাত্রি দেড়টার সময় ঋষি অরবিন্দ আটাত্তর

বৎসর বয়সে পরম শান্তিতে মহাপ্রয়াণ করেন। তাঁহার মৃত্যুর ১১১ ঘণ্টা পরে শনিবার একটি শবাধারে প্রধান আশ্রম প্রাঙ্গণে তাঁহার মৃতদেহ সমাহিত করা হয়। পণ্ডিচেরী অরবিন্দ আশ্রমে দেশবিদেশের আট শত আশ্রমিক এখন আছেন। তাঁহাদের সহিত সমগ্র ভারতও তাঁহার মৃত্যুতে শোকমগ্ন হইল।

ঋষি অরবিন্দ যে দিব্য জীবনের কথা তাঁহার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থে লিখিয়াছেন তাহা তিনি স্বীয় জীবনে দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি যে পূর্ণ যোগের কথা বলিতেন বা লিখিতেন তাহা তাঁহার জীবনে রূপায়িত হইয়াছিল। ভারত-শক্তিকে এবং সনাতন ধর্মকে সঞ্জীবিত করিবার জন্য তিনি সমগ্র জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। এইরূপ মহাপুরুষ, মহাযোগী, মহাজ্ঞানী ও মহাপণ্ডিত ঋষির দিব্য জীবন দ্বারা হিন্দু জাতি নবজীবন লাভ করিয়াছে, নবশক্তিতে বলীয়ান হইয়াছে। ঋষি অরবিন্দের তিরোধানে ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ বলিয়াছিলেন, "শ্রীঅরবিন্দ আমাদের যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষী এবং ভাগবত জীবনের সাধক। সংস্কৃতি ও দর্শনে তাঁহার অবদানের কথা ভারত কখনও বিস্মৃত হইবে না এবং বিশ্ববাসীও কৃতজ্ঞ চিত্তে ধর্মের ক্ষেত্রে তাঁহার অমূল্য অবদান স্মরণ করিবে।" রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ বলিয়াছিলেন, "শ্রীঅরবিন্দ মানব জাতির জন্য যে বাণী রাখিয়া গিয়াছেন এবং অধ্যাত্মবাদের যে সৌরভ ছড়াইয়া দিয়াছেন তাহা যুগযুগান্তর ধরিয়া কেবলমাত্র ভারতেরই নহে, সমগ্র বিশ্বের ভবিষ্যৎ মানব সমাজকে উদ্বুদ্ধ করিবে। ভারত চিরদিন হৃদয়-মন্দিরে তাঁহার স্মৃতির পূজা করিবে এবং উহার শ্রেষ্ঠ মুনিঋষিদের সহিত তাঁহাকে একাসনে স্থান দিবে।"

চৌত্রিশ

স্বামী কল্যাণানন্দ*

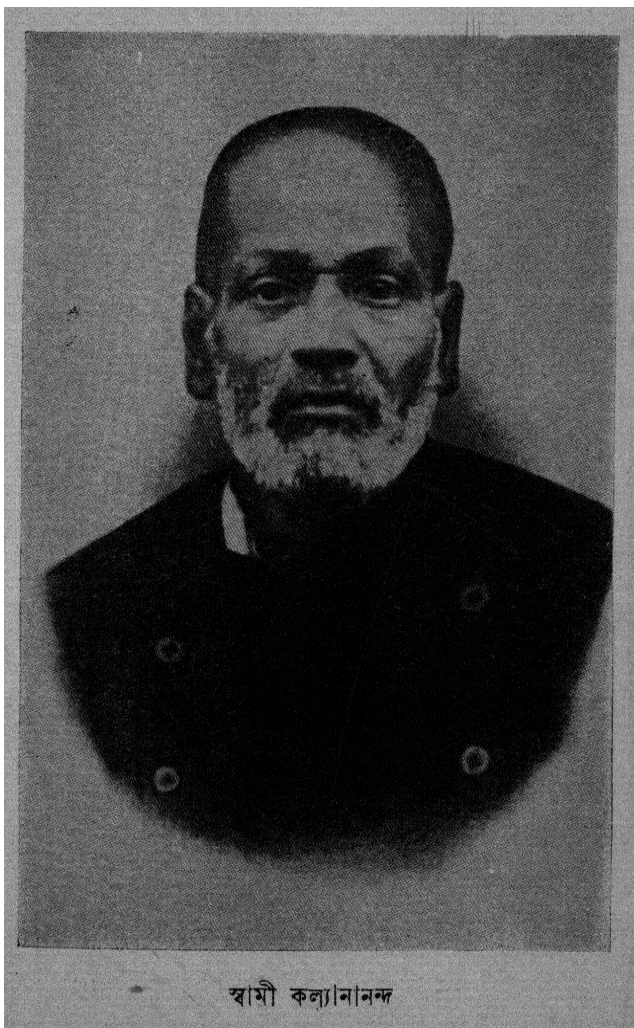
স্বামী বিবেকানন্দের যে কয়েকটী সন্ন্যাসী শিষ্য তৎপ্রবর্তিত সেবাধর্ম প্রচারে ও রামকৃষ্ণ সংঘ প্রসারে প্রাণপাত করেন স্বামী কল্যাণানন্দ তাঁহাদের অন্যতম। হরিদ্বারে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের যে সুবিশাল সেবাশ্রম বিদ্যমান তাহা স্বামী কল্যাণানন্দের অক্ষয় কীর্তি। ১৯০১ খ্রীঃ হইতে ১৯৩৭ খ্রীঃ পর্য্যন্ত প্রায় ছত্রিশ বৎসর তিনি উল্লিখিত তীর্থস্থানে একনিষ্ঠ ভাবে সেবাকার্য্যে ব্রতী ছিলেন। জাতিধর্মনির্বিশেষে সেবাকার্য্যের জন্য ১৯১১ খৃঃ ইংলণ্ডের রাজা পঞ্চম জর্জ কর্তৃক ভারত সরকারের মাধ্যমে তিনি দরবার পদক প্রাপ্ত হন। শ্রীগুরু-প্রবর্তিত এই সেবাধর্ম ত্যাগী শিষ্যের জীবনে জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

পূর্বাশ্রমে স্বামী কল্যাণানন্দের নাম ছিল দক্ষিণারঞ্জন গুহ। বরিশাল জেলার অন্তর্গত উজিরপুরের সমীপে হাস্নুয়া† গ্রাম তাঁহার জন্মস্থান। সম্ভবতঃ ১৮৭৪ খৃঃ তিনি জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু তাঁহার জন্ম-দিন জানিতে পারি নাই। তিনি উমেশচন্দ্র গুহের একমাত্র পুত্র ছিলেন এবং বাল্যকালেই পিতৃহীন হইয়া জ্যেষ্ঠতাতের অভিভাবকত্বে থাকিয়া বানারীপাড়া হাই স্কুলে এণ্ট্রান্স ক্লাশ পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করেন। বালক দক্ষিণারঞ্জনের চরিত্রে ধর্মানুরাগ ও গাম্ভীর্য্য পরিলক্ষিত হইত। যখন তিনি হাই স্কুলের ছাত্র তখন হইতেই তিনি 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশ' প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ নিবিষ্ট মনে পাঠ করিতেন। যৌবনের প্রারম্ভেই তাঁহার হৃদয়ে তীব্র বৈরাগ্য উদিত হয়। বিধবা জননীর একমাত্র সন্তান হইয়াও তিনি সংসারে আবদ্ধ রহিলেন না। বৈরাগ্য-শস্ত্রে মায়িক বন্ধন অনায়াসে কাটিয়া ফেলিয়া প্রায় চব্বিশ বৎসর বয়সে গৃহত্যাগ পূর্বক ১৮৯৮ খৃঃ তিনি বেলুড়

---

* ১৩৪৪ সালের অগ্রহায়ণ-সংখ্যা 'উদ্বোধনে' প্রকাশিত প্রবন্ধ দেখুন।

† উজিরপুর বানারীপাড়া হইতে ৬।৭ মাইল দূরে অবস্থিত। তাঁহার মাতুলালয় ছিল গাভা গ্রামে।



স্বামী কল্যানানন্দ

মঠে যোগ দান করেন। তখন বেলুড় গ্রামে ভাড়াটিয়া বাড়ীতে রামকৃষ্ণ মঠ অবস্থিত ছিল।

স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্যে বেদান্ত প্রচারান্তে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। উক্ত বৎসরের শেষভাগে রামকৃষ্ণ মঠ আলমবাজার হইতে বেলুড়ে উঠিয়া আসে। বাল্যকাল হইতে দক্ষিণারঞ্জন আর্তের সেবায় আনন্দ পাইতেন। সেবানুরাগ তাঁহার হৃদয়ে আজন্ম বদ্ধমূল ছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। রামকৃষ্ণ মঠে যোগদানের প্রথম হইতেই দক্ষিণারঞ্জন বেলুড় এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামের পল্লীতে পল্লীতে যাইয়া আর্ত ও রুগ্নদের সেবায় অতিশয় প্রীতি ও নিষ্ঠাসহকারে নিযুক্ত হইতেন। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ শিষ্য স্বামী যোগানন্দ যখন কলিকাতায় অন্তিম রোগ-শয্যায় শায়িত তখন ব্রহ্মচারী দক্ষিণারঞ্জন প্রায় একমাস কাল তাঁহার সেবার সৌভাগ্য লাভ করেন।

স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৯ খ্রীঃ জুন মাসে দ্বিতীয়বার আমেরিকায় গমন করেন। বিদেশ যাত্রার পূর্বেই শ্রীগুরু কর্তৃক সুযোগ্য শিষ্য সন্ন্যাস-ব্রতে দীক্ষিত হন। সন্ন্যাস দানান্তে গুরু শিষ্যের নাম রাখিলেন কল্যাণানন্দ। স্বামী কল্যাণানন্দের নাম অক্ষরে অক্ষরে সার্থক হইয়াছিল। কারণ, তাঁহার সমগ্র সন্ন্যাস-জীবন মানবের কল্যাণসাধনে সর্বতোভাবে উৎসর্গীকৃত হয়। সন্ন্যাস দানের অব্যবহিত পূর্বে গুরু শিষ্যের আন্তরিকতা পরীক্ষার্থ জিজ্ঞাসা করিলেন, “আমার এখন টাকার দরকার। আমি যদি টাকা নিয়ে তোকে চা-বাগানের কুলীরূপে বিক্রয় করি তাতে তুই রাজী আছিস্?” শিষ্য গুরুকে সর্বান্তঃকরণে সম্মতি জানাইলেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ বলেন, “কল্যাণানন্দ সত্যই তাই করেছে, নিজেকে স্বামিজীর কাছে বিক্রয় করে দিয়েছে।” স্বামী কল্যাণানন্দের সমগ্র জীবন পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায়, তিনি সম্পূর্ণরূপে তদীয় গুরুদেবের পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন।

১৮৯৯ খ্রীঃ জুলাই মাসে স্বামী কল্যাণানন্দ তীর্থভ্রমণে বহির্গত হইয়া কাশীধামে উপস্থিত হন এবং গুরুভ্রাতা স্বামী অচলানন্দের পূর্বাশ্রমে আতিথ্য গ্রহণ করেন। তিনি শ্রীকেদার মৌলিকের নিকট স্বীয় গুরুভ্রাতা স্বামী

শুদ্ধানন্দের পরিচয়-পত্র লইয়া যান। স্বামী কল্যাণানন্দের সংস্পর্শে আসিয়া স্বামী অচলানন্দ (তখন কেদার মৌলিক) এবং তাঁহার বন্ধুবর্গের অন্তরে সেবাধর্মের ভাব বিশেষরূপে জাগ্রত হয়। তাঁহারা ১৯০০ খ্রীঃ জুন মাসে কাশীধামে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম স্থাপনপূর্বক সেবাব্রতে আত্মনিয়োগ করেন। তৎপরে স্বামী কল্যাণানন্দ এলাহাবাদে যাইয়া ডাঃ মহেন্দ্রনাথ ওদেদারের গৃহে অতিথি হন। তথায় 'এলাহাবাদ অনাথাশ্রম' নামক একটী প্রতিষ্ঠান পরিচালনে তিনি কিছুকাল সাহায্য করেন। তিনি পরে মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমের প্রথম অধ্যক্ষ গুরুভ্রাতা স্বামী স্বরূপানন্দের সাহায্যে ও অনুরোধে রাজপুতানার অন্তর্গত কিষণগড়ে যাইয়া দুর্গতদের সেবায় নিযুক্ত হন। দুর্ভিক্ষের জন্য কিষণগড়ের অধিবাসিগণ তখন ভীষণ অন্নকষ্টে পড়িয়াছিল। স্বামী কল্যাণানন্দ দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের জন্য সেবাকার্য্য আরম্ভ এবং সাময়িকভাবে একটী অনাথাশ্রম স্থাপন করেন। তিনি অত্যধিক পরিশ্রমে অসুস্থ হইলে তাঁহার কার্য্য করিবার জন্য বেলুড় মঠ হইতে ১৯০০ খ্রীঃ মার্চ মাসে স্বামী নির্মলানন্দ ও স্বামী আত্মানন্দ কিষণগড়ে প্রেরিত হন।

স্বামী বিবেকানন্দ ১৯০০ খ্রীঃ দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্য হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। স্বামী কল্যাণানন্দ গুরুদেবের সন্দর্শন মানসে রাজপুতানার কাজ শেষ করিয়া ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে বেলুড় মঠে ফিরিয়া আসিলেন। বেলুড় মঠে কিছুদিন থাকিবার পর তিনি মায়াবতী অদ্বৈতাশ্রমে চলিয়া যান। ১৮৯০ খ্রীঃ স্বামী বিবেকানন্দ যখন ঋষিকেশে রোগাক্রান্ত হন তখন চিকিৎসার অভাবে বিশেষ কষ্ট পাইয়াছিলেন। তাঁহার আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা ছিল কাশীর ন্যায় হরিদ্বার, বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থস্থানে তীর্থযাত্রী ও সাধুসন্তদের চিকিৎসার্থ সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বামী কল্যাণানন্দ যখন হরিদ্বারে গিয়াছিলেন তখন তথায় তিনি ঔষধপথ্য ও সেবাশুশ্রূষার অভাবে সাধুদের দারুণ দুরবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া মর্মাহত হন। হরিদ্বারে একটী সেবাশ্রম স্থাপনের জন্য স্বামী স্বরূপানন্দ তাঁহাকে বিশেষভাবে উৎসাহ দেন এবং তদুদ্দেশ্যে নাইনিতালে যাইয়া দ্বারে দ্বারে অর্থসংগ্রহ করেন।

স্বামী কল্যাণানন্দ হরিদ্বারে যাইয়া ১৯০১ খ্রীঃ জুন মাসে কনখল পল্লীতে রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম স্থাপন করেন। কনখলে মহানন্দ মিশনের বিপরীত দিকে 'নির্বাণী আখড়া'র যে বড় বাড়ী আছে উহার নাম 'বারকুঠরী'। উক্ত গৃহের দ্বিতলে দুই তিনটি ঘর ভাড়া লইয়া কনখল সেবাশ্রমের কার্য্য আরম্ভ হয়। ইহার এক বৎসর পরে গুরুভ্রাতা স্বামী নিশ্চয়ানন্দ আসিয়া স্বামী কল্যাণানন্দের সহকর্মী হইলেন। এই সময়ে উভয়ে মাধুকরী ভিক্ষা দ্বারা উদরপূর্ত্তি করিতেন এবং নিঃস্বার্থ নর সেবায় ব্রতী থাকিতেন। স্বামী নিশ্চয়ানন্দ খুব ভোরে জল-যোগান্তে ঔষধের বাক্স লইয়া কনখল হইতে আঠার মাইল দূরে হৃষীকেশে পদব্রজে যাইতেন এবং তথায় সাধুদের কুঠিয়ায় কুঠিয়ায় ঘুরিয়া রুগ্ন সাধুদিগকে ঔষধ-পথ্য দিতেন এবং অসহায় অসমর্থ সাধুদের সেবা করিতেন। তিনি হৃষীকেশে সাধুসেবা সমাপনান্তে স্থানীয় ছত্রে ভিক্ষা করিয়া খাইয়া অপরাহ্নে পুনরায় কনখলে পদব্রজে ফিরিয়া আসিতেন। এইরূপে রোজ ছত্রিশ মাইল হাঁটিয়া কিছুকাল সেবা করিতেই হরিদ্বারে ও হৃষীকেশে সাধুমহলে মহা সাড়া পড়িয়া যায়। স্বামী কল্যাণানন্দ ও নিশ্চয়ানন্দের সপ্রেম সেবা এবং ঐকান্তিকতায় শীঘ্রই অনেক মহানুভব ব্যক্তির দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হইল। ১৯০৩ খ্রীঃ এপ্রিল মাসে সেবাশ্রমের জন্য বিস্তৃত ভূমি সংগৃহীত এবং অবিলম্বে তদুপরি কয়েকটি পর্ণকুটির নির্মিত হয়। সুচিকিৎসকরূপেও তিনি হরিদ্বারে প্রসিদ্ধিলাভ করেন এবং বহু রোগীর বাড়ীতে যাইয়াও চিকিৎসা করিতেন।

হরিদ্বারে কৈলাস মঠ অতি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ। উহার মোহন্ত ধনরাজ গিরির নিকট স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ প্রভৃতি গুরু-ভ্রাতৃগণ বেদান্ত পড়িয়াছিলেন। তিনি স্বামী কল্যাণানন্দ ও স্বামী নিশ্চয়ানন্দকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন এবং তাঁহাদের সাধুসেবার ভূয়সী প্রশংসা করিতেন। তিনি যখন কনখলে আসিয়া সুরত গিরির বাংলোয় ছিলেন তখন তাঁহার দুই শেঠ শিষ্য তাঁহার নিকট প্রস্তাব করেন যে, তাঁহারা কোন সৎকার্য্যের জন্য কিছু টাকা দিতে ইচ্ছুক। ইহা শুনিয়া ধনরাজ গিরি শেঠদ্বয়কে বলেন, "যদি সৎকার্য্যের জন্য টাকা দিতে চাও তবে এই কনখলে যে দুই জন মহাত্মা অসহায় ও অসুস্থ সাধুদের

সেবা করিতেছেন তাঁহাদিগকে দাও। অর্থাভাবে তাঁহারা স্থায়ী প্রতিষ্ঠান করিতে পারিতেছেন না। ইঁহাদের সাহায্য করিলে সৎপাত্রে দান এবং তোমাদের মঙ্গল হইবে।” শেঠদ্বয় স্বামী কল্যাণানন্দ ও নিশ্চয়ানন্দকে চিনিতেন না। ধনরাজ গিরি তাঁহাদিগকে ডাকিয়া আনাইলেন এবং তাঁহারা আসিতেই শেঠদ্বয়ের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিলেন। তন্মধ্যে এক শেঠ জমির জন্য এবং অন্য শেঠ কিছুকাল পরে গ্রন্থাগারের পাকা-বাড়ীর জন্য সমস্ত টাকা দেন। প্রথম শেঠের টাকায় সেবাশ্রমের বর্তমান জমি সম্ভবতঃ ১৯০৩ খ্রীঃ ক্রীত হয় এবং উহার উপর দুইটী ফুসের ঘর করিয়া সেবাকার্য্য চলে। কিছুকাল পরে গ্রন্থাগারের জন্য পাকা-বাড়ী নির্মিত হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রথম অধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দ ১৯০৩ খ্রীঃ কনখল সেবাশ্রমে প্রথম পদার্পণপূর্বক প্রায় একমাস অবস্থান করেন। তাঁহার উপস্থিতিতে কর্মীগণের মধ্যে অপূর্ব উৎসাহ সঞ্চারিত হয়। যতই দিন যাইতে লাগিল ততই সেবাশ্রমের কাজ বাড়িয়া উঠিল এবং কর্মী ও অর্থ আসিতে থাকিল। কনখল সেবাশ্রমের আধুনিক কার্য্যবিবরণী হইতে জানা যায়, ১৯০১ খ্রীঃ জুন মাস হইতে ১৯০২ খ্রীঃ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত আঠার মাসে ভিতরের ও বাহিরের রোগী-সংখ্যা ছিল ১০৫৪ জন মাত্র। ১৯১১ খ্রীঃ রোগী-সংখ্যা বাড়িয়া ৯৪২০ হইল। ১৯১২ খ্রীঃ উহাতে যক্ষ্মারোগীদের জন্য একটি বিভাগ খোলা হয়। ১৯১৪ খ্রীঃ সরকারের সাহায্যে সেবাশ্রমের সম্মুখে ছয় বিঘা জমি সংগৃহীত হয়। ১৯১৫ খ্রীঃ কলেরারোগীদের জন্য একটি বিভাগ এবং সাধারণ রোগীদের জন্য আর একটি বিভাগ নির্মিত হয়। ১৯১৫, ১৯২৬, ১৯৩৮ এবং ১৯৫০ খ্রীঃ হরিদ্বারে পূর্ণকুম্ভ মেলা হয়। উক্ত মেলা উপলক্ষে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সহস্র সহস্র সাধু-সন্ন্যাসী এবং লক্ষ লক্ষ নর-নারী সমবেত হন। তাঁহাদের সেবার জন্য কনখল সেবাশ্রম হরিদ্বারের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অস্থায়ী চিকিৎসা-কেন্দ্র স্থাপন করেন। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর যাবৎ উক্ত সেবাশ্রম এই প্রসিদ্ধ তীর্থে শত শত সাধু-সন্ন্যাসী ও তীর্থ-যাত্রীর সেবা-শুশ্রূষা করিয়া আসিতেছেন। স্বামী কল্যাণানন্দ ও স্বামী নিশ্চয়ানন্দের প্রাণপাতী প্রচেষ্টায়

এই সেবাশ্রম আজ ভারতের অন্যতম সুবৃহৎ ও সর্বশ্রেষ্ঠ জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত। এই সেবাশ্রমে এখন পঞ্চাশটি বেড-যুক্ত একটি হাসপাতাল, বৃহৎ ডিসপেন্সারী, অতিথিশালা, মন্দির, গ্রন্থাগার কর্মীনিবাস প্রভৃতি আছে। স্বামী কল্যাণানন্দের সেবাময় জীবন এবং কনখল সেবাশ্রমের ইতিবৃত্ত অভিন্ন বলিলেও চলে।*

স্বামী কল্যাণানন্দের গুরুভক্তি ও গুরুসেবা অনন্যসাধারণ ছিল। ১৯০১ খ্রীঃ বেলুড় মঠে অবস্থানকালে তিনি সমগ্র মন-প্রাণ দিয়া গুরুদেবের সেবা করিয়াছিলেন। যখন স্বামী বিবেকানন্দ বহুমূত্র রোগে কষ্ট পাইতেছিলেন তখন তাঁহার জন্য কিছু বরফ আনিতে স্বামী কল্যাণানন্দ আদিষ্ট হন। তিনি অবিলম্বে কলিকাতায় যাইয়া প্রায় আধ মণ বরফ স্বয়ং বহন করিয়া বেলুড় মঠে আসেন। গুরু শিষ্যের সেবানুরাগ দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "ভবিষ্যতে এমন দিন আসিবে যখন কল্যাণানন্দ পরমহংসত্ব লাভ করিয়া ধন্য হইবে।" গুরুবাক্য শিষ্যের জীবনে সত্য হইয়াছিল। শেষ জীবনে কনখল ও হরিদ্বারের নিষ্ঠাবান্ মহান্তগণ তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেন এবং মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ করিয়া স্ব স্ব মঠে লইয়া যাইতেন। তাঁহার চরিত্র আজন্ম সেবাপ্রবণ থাকিলেও কখনো সাধনাহীন ছিল না। সেবার কার্য্য প্রচুর থাকিলেও তিনি নিত্য নিয়মিত ভাবে জপধ্যান অর্থাৎ গুরুদত্ত সাধন অভ্যাস করিতেন। সেবা ও সাধনার স্রোত তাঁহার জীবন-নদীতে সমান বেগে বহিয়াছিল। সেবা ও সাধনার সমন্বয়ই রামকৃষ্ণ সংঘের প্রাধানিক উদ্দেশ্য। উক্ত সংঘের মঠ বিভাগে সাধনা এবং মিশন বিভাগে সেবা অনুষ্ঠিত হয়। স্বামী কল্যাণানন্দ প্রায়ই বলিতেন, "যদিও কনখল সেবাশ্রমকে রামকৃষ্ণ মিশনেরই শাখাকেন্দ্র বলা হয় তথাপি উহাতে মঠ ও মিশন উভয় বিভাগের কর্মই চলে।" তিনি মধ্যে মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিষ্যগণকে সাদরে আহ্বান করিয়া কনখল সেবাশ্রমে লইয়া যাইতেন এবং পরম ভক্তিভরে তাঁহাদের সেবা করিতেন।

---

* ১৩৫৬ সালের ফাল্গুন সংখ্যা 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত এবং মল্লিখিত 'পুণ্যতীর্থ হরিদ্বার' শীর্ষক প্রবন্ধ দেখুন।

১৯১২ খ্রীঃ স্বামী ব্রহ্মানন্দ পুনরায় তথায় যাইয়া প্রায় সাত মাস কাল অতিবাহিত করেন। তিনি কলিকাতা হইতে দুর্গা-প্রতিমা আনাইয়া সেবাশ্রমে দুর্গা-পূজা করান। তখন হইতে কনখল সেবাশ্রমে মাঝে মাঝে দুর্গাপূজা হইয়া আসিতেছে। স্বামী তুরীয়ানন্দ মধ্যে মধ্যে কনখলে যাইয়া থাকিতেন এবং সেবাশ্রমের সাধু-ব্রহ্মচারীগণকে শাস্ত্রগ্রন্থাদি পড়াইতেন। তিনি যখন তথায় থাকিতেন তখন তাঁহার তপস্যায় ও শাস্ত্রচর্চায় সেবাশ্রম তপোবনে পরিণত হইত। স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী বিজ্ঞানানন্দ, মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রভৃতি রামকৃষ্ণ-শিষ্যগণও তথায় নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছেন। রামকৃষ্ণ মঠের বা অন্য কোন সম্প্রদায়ের সাধু-সন্ন্যাসিগণ অসুস্থ হইয়া কনখল সেবাশ্রমে উপস্থিত হইলে কল্যাণানন্দজী তাঁহাদের ঔষধপথ্য ও সেবাশুশ্রূষার সুব্যবস্থা করিতেন এবং তাঁহারা সাধনভজনের জন্য তথায় থাকিতে চাহিলে তাঁহাদিগকে থাকিতে অনুমতি দিতেন। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমার্ধে সেবাশ্রম-সংক্রান্ত ব্যাপারে শ্রীগুরুর উপদেশ লইবার জন্য তিনি বেলুড় মঠে আসিয়া কয়েক মাস ছিলেন। তারপর যে চলিয়া যান আর জীবনে বাংলা দেশে আসেন নাই। কনখল সেবাশ্রম স্থাপনের প্রথম দিকে তিনি কুম্ভমেলায় সেবাকার্য্য ব্যপদেশে দুইবার এলাহাবাদে আসিয়াছিলেন। জীবনের শেষ পনের বৎসর তিনি বহুমূত্র রোগে কষ্টভোগ করেন। কলিকাতায় বা কাশীতে আসিয়া চিকিৎসা করিবার জন্য বহুবার অনুরুদ্ধ হইলেও তিনি আসিতে সম্মত হন নাই। বহুমূত্র রোগের উপশমনার্থ তিনি গ্রীষ্মকালে আলমোড়া, মুসৌরী বা কাশ্মীর প্রভৃতি স্বাস্থ্যকর পার্বত্য স্থানে যাইতেন দুই চার মাসের জন্য। বিশেষ ভাবে অনুরুদ্ধ হইয়া সম্ভবতঃ ১৯৩২ খৃঃ তিনি একবার মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমে বায়ু-পরিবর্তনার্থ গিয়াছিলেন।

১৯৩৭ খ্রীঃ এপ্রিল মাসে স্বামী কল্যাণানন্দ ভীষণ ভাবে ম্যালেরিয়া-জ্বরে আক্রান্ত হন এবং নিজেই নিজের চিকিৎসা করিতে ও ঔষধাদি খাইতে থাকেন। যখন তাঁহার অসুখ হইত, নিজেই নিজের চিকিৎসা করিতেন, অন্য ডাক্তারের পরামর্শ বড় একটা গ্রাহ্য করিতেন না। সেইবার অধিক মাত্রায় কুইনাইন

খাইয়া ফেলায় তাঁহার অবস্থা খুবই খারাপ হইয়া পড়ে। তিনি কাহারো কোন পরামর্শ গ্রাহ্য করিলেন না, আর জ্বরও কমিল না। জরুরী তার পাইয়া স্বামী দুর্গানন্দ বেলুড় মঠ হইতে কনখলে চলিয়া যান এবং কল্যাণানন্দজীকে অন্য ডাক্তারের চিকিৎসাধীন থাকিতে সম্মত করেন। তদনুযায়ী হরিদ্বার সরকারী হাসপাতালের ডাক্তারকে আনান হইল। তিনি সেবাশ্রমে আসিয়া কল্যাণ মহারাজকে পরীক্ষা করিয়া ঔষধ-পথ্যের ব্যবস্থা দিলেন। উক্ত ব্যবস্থানুসারে ৩।৪ দিন চলিবার পর কল্যাণ স্বামী ধীরে ধীরে আরোগ্যলাভ করিলেন। তৎপরে স্বাস্থ্যলাভের জন্য তিনি সিমলা পাহাড়ে যাইতে ইচ্ছা করিয়া তথায় কোন ভক্তকে পত্র লিখিলেন। কিন্তু সহকর্মী সাধুদের পরামর্শে মুসৌরী পাহাড়েই যান। তৎপূর্ব বৎসরে তিনি মুসৌরীতেই গ্রীষ্মকাল অতিবাহিত করেন। এবার মুসৌরীতে বাংলো ভাড়া করিয়া তথায় প্রায় ৪।৫ মাস রহিলেন।

স্বামী কল্যাণানন্দ দুই বৎসর আলমোড়ায় বায়ু পরিবর্তনার্থ গিয়াছিলেন। তিনি যখন আলমোড়ায় ছিলেন তখন একটী ভদ্রলোক এবং একটী ভদ্রমহিলা তাঁহার কাছে প্রায়ই আসিতেন এবং তাঁহার মুখে ঠাকুর ও স্বামিজীর কথা সাগ্রহে শুনিতেন। ভদ্রলোকটী ছিলেন উকিল এবং ভদ্রমহিলাটী উচ্চ শিক্ষিতা ও অল্পবয়স্কা। উভয়ে গুপ্ত সমিতির সভ্য ছিলেন বলিয়া ব্রিটিশ সরকার তাঁহাদিগকে আলমোড়ায় নজর-বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন। সন্ত্রাসবাদী হইলেও ঠাকুর স্বামিজীর প্রতি তাঁহাদের অগাধ শ্রদ্ধাভক্তি ছিল। ১৯৩৭ খ্রীঃ যখন স্বামী কল্যাণানন্দ মুসৌরীতে যান তখন তাঁহারাও তথায় আসেন। ইতোপূর্বেই তাঁহারা সরকারী কুনজর হইতে মুক্তিলাভ করেন। ভদ্রলোকটি প্রত্যহই স্বামী কল্যাণানন্দের নিকট আসিয়া ঠাকুর-স্বামিজীর কথা শুনিতেন। যখন কল্যাণানন্দজী তথায় অসুখে পড়িলেন তখন উক্ত ভদ্রলোক অনেক প্রকারে তাঁহার সেবা করেন। কল্যাণ মহারাজের অবস্থা আশঙ্কাজনক হইলে সেই ব্যক্তি ডাক্তার ডাকিয়া আনেন এবং চিকিৎসার বন্দোবস্ত করেন। তিনি স্বামী কল্যাণানন্দের মৃত্যুকালে যে অলৌকিক ঘটনা দেখিয়াছিলেন তাহা পরে স্বামী

দুর্গানন্দের নিকট ব্যক্ত করেন। তিনি যখন ডাক্তার ডাকিয়া আনিলেন তখন কল্যাণানন্দজীর অবস্থা খুবই খারাপ। ডাক্তার মুমূর্ষু রোগীকে পরীক্ষা করিতেছেন এবং রোগী ডাক্তারকে বলিতেছেন, "ডাক্তার, কি আর হবে? I am dying, I am dying (আমি মরে যাচ্ছি, আমি মরে যাচ্ছি)।" ঠিক সেই মুহূর্তে উপরোক্ত ভদ্রলোক দেখিলেন, মুমূর্ষু সন্ন্যাসীর ঠিক মাথার দিকে স্বামী বিবেকানন্দের জীবন্ত চিকাগো-মূর্তি দণ্ডায়মান। ইহা দেখিয়া প্রথমে তিনি মনে করিলেন, 'আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি?' তখন একবার চোখ বন্ধ করিয়া তিনি চাহিয়া দেখিলেন, শ্রীগুরু মুমূর্ষু শিষ্যের শিয়রে পূর্ববৎ দাঁড়াইয়া আছেন। দ্বিতীয়বার চোখ বন্ধ করিয়া পুনরায় চাহিয়া তিনি আর সেই দিব্য মূর্তি দেখিতে পাইলেন না। ঠিক সেই মুহূর্তেই স্বামী কল্যাণানন্দ তিনবার 'ম'। 'মা' বলিয়া দেহত্যাগ করিলেন। গুরুগতপ্রাণ শিষ্য যে প্রয়াণ-মুহূর্তে গুরুর দর্শন লাভ করিবেন, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? গুরুভক্ত শিষ্য দেহান্তে গুরুপদে চিরতরে বিলীন হইলেন।*

স্বামী কল্যাণানন্দ ১৯৩৭ খ্রীঃ জুন মাসে মুসৌরীতে স্বাস্থ্যলাভের জন্য গিয়াছিলেন। কিছুদিন তথায় বাস করিবার পর তিনি অনেকটা সুস্থ বোধ করেন। কনখল সেবাশ্রমের সাধুগণ আশা করিতেছিলেন তিনি শীঘ্রই সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া ফিরিয়া আসিবেন এবং হরিদ্বারে পূর্ণ কুম্ভ মেলার সেবাকার্য্য স্বহস্তে গ্রহণ করিবেন। তিনি যে এত শীঘ্র চলিয়া যাইবেন তাহা কেহই ভাবিতে পারেন নাই। ২০শে অক্টোবর সকালবেলা হইতে তিনি অধিকতর অসুস্থ বোধ করেন। সেজন্য সেদিন দ্বিপ্রহরে তিনি কোন পথ্য গ্রহণ করেন নাই এবং সমস্ত দিন শয়ন করিয়াই কাটান। বৈকাল ৩টার সময় সামান্য দুগ্ধ পানার্থ উঠিয়া তিনি বিছানা ত্যাগ করেন এবং আরাম-চেয়ারে বসেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি চেয়ার হইতে উঠিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার শরীর কাঁপিতে থাকে এবং তিনি সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়েন। অবিলম্বে ডাক্তার ডাকা হইল এবং প্রস্রাব পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল, তিনি ডায়াবিটিক

* ঘটনাটী স্বামী দুর্গানন্দের নিকট প্রাপ্ত।

কমা (diabetic coma) রোগে আক্রান্ত। ডাক্তার তাঁহাকে পর পর দুইটি ক্যাম্ফার ইন্‌জেকসন্ দিলেন। কিন্তু ইহাতে কোনই ফল দেখা গেল না। তখনই তিনি ডাক্তারকে বলিয়াছিলেন, "ডাক্তার, আর কি হবে? আমি মরে যাচ্ছি।"

ইহার পর তিনি শরীরে খুব জ্বালা অনুভব করিতে এবং মাঝে মাঝে 'মা' 'মা' বলিতে থাকেন। রাত্রি প্রায় সাড়ে দশটার সময় উঠিয়া তিনি আবার আরাম-চেয়ারে বসেন ও দুইবার সামান্য জলপান করেন। ১১টা ১০ মিনিটের সময় মুমূর্ষুর মুখে তিনবার 'মা' নাম উচ্চারিত হয় এবং তৎসঙ্গে তাঁহার প্রাণবায়ু বিনিষ্ক্রান্ত হয়। তাঁহার মৃতদেহ পরদিন কনখলে আনাইয়া গঙ্গাগর্ভে সমাহিত করা হয়। স্বামী কল্যাণানন্দ স্বামী বিবেকানন্দের সুযোগ্য শিষ্য ছিলেন। তাঁহার জীবনে গুরুভক্তি ও সেবাধর্ম বিমূর্ত হইয়াছিল। রামকৃষ্ণ সংঘের ইতিহাসে তাঁহার নাম চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। কনখল রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম স্বামী কল্যাণানন্দের অবিনশ্বর কীর্তিস্তম্ভ। সূর্য্যসদৃশ স্বামী বিবেকানন্দের এক একটী রশ্মিস্বরূপ ছিলেন স্বামী কল্যাণানন্দ প্রভৃতি সন্ন্যাসী শিষ্যগণ।

সেবাব্রতী কল্যাণানন্দের জীবনে সন্ন্যাসের উচ্চাদর্শ অক্ষুণ্ণ ছিল। তিনি নারীর সংশ্রবাদি সর্বথা পরিহার করিতেন এবং সেবাশ্রমের কোন সাধু সন্ন্যাসীর নীতি লঙ্ঘন করিলে বিরক্ত হইতেন। অনেক শেঠ বহুবার তাঁহাকে নারী রোগীদের জন্য হাসপাতাল স্থাপনার্থ প্রচুর অর্থ দিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু কল্যাণানন্দজী উক্ত প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। তাঁহার মত কর্মযোগী মিতব্যয়ী সেবাব্রতী সন্ন্যাসী অধুনা বিরল দেখা যায়।

———

পঁয়ত্রিশ

স্বামী নিশ্চয়ানন্দ

যুগাচার্য্য বিবেকানন্দের মর্মস্পর্শী আহ্বানে যে কয়েকটী যুবক সর্বস্ব ছাড়িয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণপূর্বক সেবাধর্মে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন স্বামী নিশ্চয়ানন্দ তাঁহাদের অন্যতম। স্বামী কল্যাণানন্দ এবং স্বামী নিশ্চয়ানন্দের সম্মিলিত সাধনায় ও প্রাণপাতী পরিশ্রমে হরিদ্বারে রামকৃষ্ণ নামাঙ্কিত বিরাট সেবায়তনটী গড়িয়া উঠিয়াছে। স্বামী নিশ্চয়ানন্দ স্বামী কল্যাণানন্দের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত প্রায় একত্রিশ বত্রিশ বৎসর উক্ত সেবাশ্রমের কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার কর্তব্যনিষ্ঠা এত সুগভীর ও সর্বান্তরিক ছিল যে, তিনি সমগ্র সন্ন্যাস জীবন এই একই স্থানে কাটাইয়াছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। "তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রম, আত্যন্তিক আগ্রহ ও অদ্ভুত কর্মতৎপরতা ব্যতীত কনখল সেবাশ্রম নিশ্চয়ই এত বড় হইতে পারিত না। তাঁহার অপূর্ব সেবাপরায়ণতা ত্যাগ পবিত্রতা চরিত্রবল ও সর্বোপরি অকৃত্রিম গুরুভক্তি চিরকাল সকলের শিক্ষণীয় হইয়া থাকিবে। জ্ঞানীরা বিচারের দ্বারা, ভক্তেরা ভজন দ্বারা এবং যোগীরা ধ্যান দ্বারা যে পদ লাভ করেন তিনি স্বামিজী-প্রবর্তিত নরনারায়ণ সেবা দ্বারা সেই পদ লাভ করিয়াছেন।"*

পূর্বাশ্রমে স্বামী নিশ্চয়ানন্দের নাম ছিল সুরজ রাও। রাওজী নামে তিনি রামকৃষ্ণ সংঘে এবং ছোট স্বামিজী নামে কনখল সেবাশ্রমে পরিচিত ছিলেন। মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত দক্ষিণ কানাড়ায় জানজিরা নামক স্থানের সন্নিকটে একটী গ্রামে ক্ষত্রিয় বংশে তিনি ১৮৬৫।৬৬ খ্রীঃ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মস্থান মহারাষ্ট্র ও মান্দ্রাজের সংযোগস্থলে অবস্থিত বলিয়া তিনি মারাঠী ও মান্দ্রাজী

---

* 'উদ্বোধন' পত্রিকার ১৩৪১ অগ্রহায়ণ সংখ্যার সম্পাদকীয় মন্তব্য হইতে উদ্ধৃত।

উভয় ভাষাই জানিতেন। সাধু জীবনে তিনি বাংলা বলিতে শিখিয়াছিলেন; কিন্তু লিখিতে বা পড়িতে পারিতেন না। তাঁহার কয়েকটি অগ্রজ ও অনুজ ভাইভগিনী ছিল। বাল্যে তাঁহার ইংরাজি শিক্ষা অধিক দূর অগ্রসর হয় নাই। অবস্থার বৈগুণ্যে তাঁহাকে দক্ষিণ কানাড়ার সরকারী সৈন্যদলে যোগদান করিতে হয়। তিনি যে পল্টনের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন তাহা দক্ষিণ ভারতের নানা স্থানে যাইয়া ছাউনি স্থাপন করিত। ধর্মভাব স্বভাবগত থাকায় রাওজী মাঝে মাঝে ছুটি লইয়া তীর্থভ্রমণ করিতেন। এইরূপে তিনি রামায়ণে বর্ণিত পম্পা ও ঝম্পা সরোবরদ্বয় এবং দাক্ষিণাত্যের বড় বড় মন্দিরগুলি দেখিয়াছিলেন। উক্ত মন্দির-সমূহ সম্বন্ধে তিনি পরবর্তী জীবনে বলিতেন, 'এক একটী মন্দির এক একটী কেল্লা বা নগরের মত।' তিনি উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত না হইলেও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও প্রখর বুদ্ধির সহায়ে মন্দিরাদি এত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দর্শন করিয়াছিলেন যে, শেষ জীবনেও তাঁহার সেই সকলের সুস্পষ্ট স্মৃতি বিদ্যমান ছিল।

পল্টনের সহিত রাওজী ব্রহ্মদেশের যুদ্ধেও গিয়াছিলেন। যুদ্ধের অবসানে পল্টনকে কিছু কাল উক্ত দেশে থাকিতে হয়। সেই সময় তিনি ল্যান্স কর্পোরালের পদ প্রাপ্ত হন এবং টেলিগ্রাফ বিভাগে কার্য্য করেন। ব্রহ্মদেশে অবস্থানকালে তিনি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ মন্দিরগুলি দেখিয়াছিলেন এবং মাঝে মাঝে অরণ্যে বন্য বরাহ ও বন্য হরিণ শীকার করিতে যাইতেন। স্বদেশে প্রচলিত বর্ণ-প্রথানুসারে তিনি তখন বরাহ ও হরিণের মাংসাহার করিতেন। বর্মা হইতে তিনি আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে বেড়াইতে যান। জনকতক সঙ্গী ও কয়েক ঝুড়ী মিঠাই লইয়া তিনি জাহাজে উঠিলেন এবং আন্দামানে নামিয়া জঙ্গলে স্থানীয় আদিম অধিবাসীদিগকে দেখিতে গেলেন। আন্দামানের অসভ্য অধিবাসীরা উলঙ্গ থাকে এবং তীরধনু লইয়া শিকার করে। রাওজী দোভাষীর সাহায্যে তাহাদের সহিত কথা বলিলেন। জঙ্গলীরা মিঠাই দেখিয়া খুব খুসী হইল এবং তীরের সাহায্যে গোড়াশুদ্ধ আস্ত কলাপাতা কাটিয়া আসনরূপে তাঁহাকে বসিতে দিল। আবার তাহারা নারিকেল গাছের মাথায় কাঁদির গোড়ায় তীর মারিল। নারিকেলের কাঁদিটা যখন স্থানচ্যুত হইয়া মাটীতে পড়িতেছিল তখন শূন্যপথে

উহাকে ধরিয়া ফেলিল এবং তীরের ফলা দিয়া নারিকেল ছাড়াইয়া অতিথি-দ্বয়কে খাইতে দিল। সৈনিক জীবনে রাওজী লক্ষ্যভেদে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাই আন্দামানের জঙ্গলীদের অসাধারণ লক্ষ্যভেদ শক্তি দেখিয়া আনন্দিত হইলেন। জঙ্গলীরা তাঁহাকে বলিয়াছিল, কিরূপে তাহারা তীর দ্বারা সমুদ্রের বড় বড় মাছ ধরিয়া আনে এবং তটস্থ বালুকারাশির উপর পোড়াইয়া একত্রে বসিয়া খায়।

বর্মা হইতে রাওজী শ্যামদেশে ভ্রমণে গিয়াছিলেন। বর্মা হইতে ভারতে প্রত্যাগমনের কয়েক বৎসর পরে তিনি সেনাবিভাগের কার্যোপলক্ষে জিব্রাল্টার গমন করেন এবং তথায় কিছু কাল থাকিয়া মাল্টা হইয়া বোম্বাইতে ফিরিয়া আসেন। মধ্য প্রদেশের প্রসিদ্ধ সহর রায়পুরেও রাওজীর পল্টন একবার ছাউনি করিয়াছিল। রায়পুরে তাঁহার জীবনের গতি পরিবর্তনোন্মুখ হইল। আশ্চর্য্যের বিষয়, ইহার বহু বৎসর পূর্বে তাঁহার গুরু স্বামী বিবেকানন্দ যখন চৌদ্দ বৎসরের বালক তখন অর্থাৎ ১৮৭৭ খ্রীঃ তিনি পিতামাতা ও ভাই-ভগিনীদের সহিত প্রায় দুই বৎসর রায়পুরে বাস করেন। রাওজীর পল্টন যখন রায়পুরে ছিল স্বামিজীর গুরুভ্রাতা স্বামী নিরঞ্জনানন্দ তথায় ভ্রমণার্থ উপস্থিত হন। ঘটনাক্রমে নিরঞ্জনানন্দজীর সহিত তথায় তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। রাওজী নিরঞ্জন মহারাজের নিকট সর্বপ্রথম ঠাকুর ও স্বামিজীর কথা শুনেন। নিত্যসিদ্ধ সন্ন্যাসীর সহিত সাক্ষাতের ফলে তাঁহার মনে বৈরাগ্যভাব প্রবল হয় এবং তিনি সন্ন্যাস-গ্রহণের সংকল্প করেন। তাহার পর আমেরিকায় ও ইউরোপে স্বামীজির বেদান্তপ্রচারের কথা সংবাদপত্রে তিনি অবগত হইয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্য আকুল হন। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে স্বামীজি যখন পাশ্চাত্য হইতে সিংহল ভ্রমণান্তে মান্দ্রাজে আসেন তখন রাওজী উক্ত সহরের অনতিদূরে ছিলেন।

সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইল, স্বামিজী কুম্ভকোণম্ হইতে স্পেশাল ট্রেণে মান্দ্রাজে যাইবেন এবং পথে আর কোথাও নামিবেন না। তথাপি শত শত নরনারী স্টেশনে সমবেত হইলেন স্বামিজীকে দর্শন করিবার জন্য। রাওজী



স্বামী নিশ্চয়ানন্দ

প্রমুখ দর্শনার্থিগণ স্টেশনে পাঁচ মিনিট কাল ট্রেণ থামাইবার জন্য স্টেশন-মাস্টারকে বিশেষ অনুরোধ করিলেন। কিন্তু স্টেশন-মাস্টার যখন তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত করিলেন না তখন রাওজীপ্রমুখ অনেক ব্যাকুল দর্শনার্থী প্রাণপণ করিয়া ট্রেণ আসিবার কিঞ্চিৎ পূর্বে রেল লাইনের উপর শুইয়া পড়িলেন। দূর হইতে গার্ড রেল লাইনের উপর বহু লোক দেখিয়া বিপদাশঙ্কায় গাড়ী থামাইতে বাধ্য হইলেন। স্বামিজীর ভাবী শিষ্য গুরুভক্ত রাওজীর গুরু-দর্শনের প্রবল আগ্রহ ঈশ্বর-কৃপায় এইরূপে পূর্ণ হইল। স্বামিজী গাড়ী হইতে হাত তুলিয়া সমবেত জনতাকে কয়েকটী উপদেশ দিলেন। স্বামিজীকে ক্ষণিক দর্শন করিয়া রাওজী তৃপ্ত হইলেন না। তিনি আর বাসায় না ফিরিয়া মহাপুরুষের দর্শনাভিলাষে মান্দ্রাজ অভিমুখে পদব্রজে যাত্রা করিলেন। সহরে যাইবার পথে সমুদ্রতীরে জেলেরা স্ব স্ব গৃহে প্রদীপশ্রেণী জ্বালাইয়া আনন্দোৎসব করিতেছিল। তিনি কয়েকটী বালককে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তাহারা বিস্মিত হইয়া বলিল, 'ক্যা জান্‌তা নহি জগদ্‌গুরু আগিয়া!' রাওজী বুঝিলেন, গ্রামের অশিক্ষিত লোকেরাও স্বামিজীর আগমন-সংবাদ জানে।

রাওজী পূর্বে কখনও মান্দ্রাজ সহরে যান নাই। সুতরাং তিনি সহরের পথ জানিতেন না। তিনি ভুলক্রমে সহর হইতে সাত মাইল দূরে চলিয়া গিয়াছিলেন। কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিয়া যখন তিনি ভুল বুঝিলেন তখন পথশ্রমে অত্যন্ত ক্লান্ত। তাই পথি পার্শ্বে একটী পুষ্করিণীর পাকা ঘাটের উপর কাপড় পাতিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিলেন। তৎপরে হাঁটিয়া বেলা সাতটার সময় মান্দ্রাজ সহরের সমুদ্রতীরবর্তী ক্যাসল কার্নন ভবনে উপস্থিত হইলেন। উক্ত ভবনে স্বামিজী সপ্তাহাধিক অবস্থান করিতেছিলেন। স্বামিজীর দর্শনাভিলাষী অগণিত নরনারী তথায় সমবেত। সেইজন্য পাঁচ ঘণ্টা কাল অপেক্ষা করিয়া রাওজী বেলা বারটার সময় স্বামিজীর দর্শন পাইলেন। তিনি স্বামিজীর কাছে যাইয়া তাঁহার পদতলে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। যখন সকলে চলিয়া গেলেন তখন স্বামিজীর দৃষ্টি তাঁহার উপর পড়িল। রাওজী স্বামিজীকে ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন এবং জিজ্ঞাসিত হইয়া সব প্রাণের কথা

আবেগভরে বলিলেন। তাঁহার আহারাদি হয় নাই শুনিয়া স্বামিজী পার্শ্ববর্তী জনৈক সাধুকে নির্দেশ দিলেন, রাওজীর আহারের ব্যবস্থা করিবার জন্য। রাওজী তথায় আহারাদি করিয়া সুস্থ হইলেন এবং আর সংসারে না ফিরিয়া স্বামিজীর সহিত কলিকাতা যাইয়া তাঁহার নিকট সন্ন্যাস-দীক্ষা গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু স্বামিজী তাঁহাকে তখন সঙ্গে লইতে রাজী হইলেন না। তিনি রাওজীকে বলিলেন, "পরে আমার সঙ্গে কলিকাতায় দেখা করো।" রাওজী অনন্যোপায় হইয়া বাড়ীতে ফিরিলেন। মান্দ্রাজে স্বামিজীর বক্তৃতাবলী শুনিবার সৌভাগ্য তাঁহার হইয়াছিল।

স্বামিজীর নির্দেশমত রাওজী কলিকাতা যাইবার জন্য চাকুরী ছাড়িতে চাহিলেন ; কিন্তু সৈন্যবিভাগের নিয়মানুসারে স্বেচ্ছায় কর্মত্যাগ করা যায় না ! চাকুরী ছাড়িবার জন্য তিনি পাগলের ভাণ করিলেন। তাঁহার পাগলামি সারাইবার জন্য পল্টনের ডাক্তার তাঁহার মাথায় প্রতিদিন আধ মণ হইতে এক মণ পর্য্যন্ত বরফ বাঁধিয়া রাখিতে লাগিলেন। কেহ নিদ্রার ভাণ করিলে যেমন তাহাকে জাগান যায় না তেমনি সেয়ান পাগলের পাগলামি কোন চিকিৎসায় সারান সম্ভব হয় না। চিকিৎসার অত্যাচার সহ্য করিয়া রাওজী পাগলামি করিতে লাগিলেন। যখন কঠোর চিকিৎসায়ও তাঁহার রোগ সারিল না তখন 'উহার মাথা সত্যই খারাপ হইয়াছে' বলিয়া ডাক্তার ঘোষণা করিলেন এবং তাঁহাকে কর্ম হইতে চির মুক্তি দিলেন। সরকারী কর্ম হইতে মুক্তিলাভপূর্বক রাওজী দীন হীন ভাবে বেলুড় মঠে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং স্বামিজীর ঘরের পার্শ্বে হাত জোড় করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। স্বামিজীর শরীর তখন অসুস্থ। তিনি আহারান্তে বিশ্রাম করিতে ছিলেন। কোন সেবক যাইয়া তাঁহাকে খবর দিলেন, 'একটি মারাঠী যুবক আপনার দর্শনপ্রার্থী।' স্বামিজী আদেশ দিলেন, 'যুবকটিকে স্নানাহার করিতে বল। আমি বিশ্রামান্তে তাহার সহিত দেখা করবো।' স্বামিজীর নির্দেশ শুনিয়া রাওজী বলিলেন, 'আমি স্বামিজীকে প্রণাম না করে স্নানাহার করবো না। আমি অনেক দূর দেশ হতে স্বামিজীকে দর্শন করতে এসেছি, স্নানাহারের প্রত্যাশী নই।'

রাওজীর এইরূপ দৃঢ় নিশ্চয় জানিয়া স্বামিজী নীচে নামিলেন। রাওজী স্বামিজীকে দর্শন ও প্রণামান্তে তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ করিলেন। স্বামিজী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কি সাধু হইতে চাও? তোমার ইচ্ছা কি?' রাওজী করযোড়ে উত্তর দিলেন, "আপনার দাস হতে চাই। অন্য কোন ইচ্ছা নাই।"

তখন হইতে রাওজী বেলুড় মঠে বাস করিতে লাগিলেন। তিনি মঠে অবস্থান কালে গুরুসেবা ও ঠাকুর ঘরের কাজ প্রধানতঃ করিতেন। গুরু শিষ্যের দৃঢ় নিশ্চয়ের কথা স্মরণ করিয়া সন্ন্যাস দীক্ষা দানের সময় তাঁহার নাম রাখিলেন নিশ্চয়ানন্দ। গুরুর যে কত গভীর অন্তর্দৃষ্টি ছিল তাহা এই নামকরণ হইতে বোঝা যায়। কারণ, দৃঢ় নিশ্চয় ছিল উক্ত শিষ্যের জীবনের মূল মন্ত্র। স্বামী নিশ্চয়ানন্দের গুরুদত্ত নাম অক্ষরে অক্ষরে সার্থক হইয়াছিল। তাঁহার মানসিক নিশ্চয় কেমন সুদৃঢ় ছিল এবং তিনি গুরুর আদেশ পালনার্থ কতদূর প্রাণপণ করিতেন তাহা নিম্নোক্ত ঘটনা হইতে জানা যায়। দক্ষিণেশ্বরের নিকটবর্তী আড়িয়াদহ গ্রামের কোন গোয়ালার কাছে স্বামিজীর জন্য একটি দুগ্ধবতী গাভী ক্রয় করা হয়। অন্য দুইটি সাধুর সহিত স্বামী নিশ্চয়ানন্দ গাভীটিকে বেলুড় মঠে আনিবার জন্য প্রেরিত হইলেন। তখন বালিতে গঙ্গার উপর পুল ছিল না, নৌকায় গঙ্গাপার হইতে হইত। নিশ্চয়ানন্দজী এবং অন্য দুইটি সাধু গাভী ও বাছুর সহিত গঙ্গাপার হইবার জন্য নৌকায় উঠিলেন। তখন বর্ষাকাল। গঙ্গা জলপূর্ণা ও বেগবতী। নৌকাটি মাঝ গঙ্গায় আসিয়া বায়ুভরে ভীষণ ভাবে দুলিতে লাগিল। তখন গাভীটি ভীত হইয়া জলে লাফাইয়া পড়িল। এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় সকলে 'হায় হায়' করিয়া উঠিলেন। কিন্তু স্বামী নিশ্চয়ানন্দ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইলেন না। তিনি গুরুবাক্য স্মরণপূর্বক গঙ্গায় ঝাঁপ দিলেন এবং গরুর মুখে জল ছিটাইয়া উহাকে কিনারার দিকে লইয়া যাইতে লাগিলেন। গুরু শিষ্যকে বলিয়াছিলেন, 'গরুর দড়িটা হাতে ধরে থাকবি। তাহলে পালাতে পারবে না।' শিষ্য গঙ্গাগর্ভেও গরুর দড়ি ধরিয়াই রহিলেন। তিনি গাভীর

সহিত গঙ্গাস্রোতে ভাসিয়া চলিলেন এবং অতি কষ্টে পূর্ব কূল হইতে পশ্চিম কূলে যাইয়া প্রায় শালকিয়ার কাছে ক্লান্ত দেহে তীরে উঠিলেন। তখন ভাঁটার সময় বলিয়া কিনারায় খুব কাদা ছিল। তিনি গরুটিকে তীরে তুলিবার চেষ্টায় সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়া গেলেন! তখনও গরুর দড়িটা তাঁহার হাতে ধরা ছিল। মূর্চ্ছিত শিষ্যের হাত হইতে দড়িটা টানিয়া খোলা গেল না। মূর্চ্ছা ভাঙ্গিবার পর অন্যান্যের সাহায্যে গরুটিকে তীরে তোলা হইল।

তখন তিনি সানন্দে গাভীটি লইয়া বেলুড় মঠে আসিলেন। মঠের সাধুদ্বয় তাঁহাকে ও গাভীকে নিরাপদে ফিরিতে দেখিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। কিন্তু গরুর নিমিত্ত স্বীয় জীবন বিপন্ন করার জন্য কেহ কেহ তাঁহাকে তিরস্কার করিলেন। গুরু শিষ্যকে বলিলেন, 'তুই মূর্খের মত কেন গরুর জন্য জীবনটা দিতে গিয়েছিলি? শিষ্য বিনীত ভাবে উত্তর দিলেন, 'আপনি আমাকে গরু আনতে পাঠিয়েছিলেন, গরুটি ফেলে কেমন করে আসি?' শিষ্যের দৃঢ় নিশ্চয়ে গুরু সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া আশীর্বাদ করিলেন।

স্বামীজির গুরুভ্রাতা স্বামী তুরীয়ানন্দের প্রতি স্বামী নিশ্চয়ানন্দ বিশেষ শ্রদ্ধান্বিত ছিলেন। শ্রীগুরুর অন্তর্ধ্যানের পর শিষ্য মহাতপা তুরীয়ানন্দের সৎসঙ্গলাভের জন্য উত্তর কাশী গিয়াছিলেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ তখন হিমালয়ের উক্ত নির্জন স্থানে তপস্যারত ছিলেন। তিনি কুঠিয়ায় থাকিয়া মাধুকরী ভিক্ষায় উদরপূর্তি করিতেন। স্বামী নিশ্চয়ানন্দ তখন কনখল সেবাশ্রমের প্রধান কর্মী ও সহকারী অধ্যক্ষ। তিনি কনখল সেবাশ্রম হইতে দেরাদূন পার হইয়া মুসুরী পাহাড় চড়াই করিয়া পার্বত্য পথ অতিক্রমপূর্বক একাকী এক সন্ধ্যায় উত্তর কাশীতে স্বামী তুরীয়ানন্দের কুঠিয়ায় পৌছিলেন। তিনিও তুরীয়ানন্দজীর মত মাধুকরী ভিক্ষায় জীবন ধারণপূর্বক সৎসঙ্গে ও তপস্যায় কিছুদিন কাটাইলেন। একদিন উভয়ে উত্তর কাশীর গঙ্গায় স্নানান্তে অদূরে দুইটী পাথরের উপর বসিয়া স্ব স্ব কাপড় ধুইতেছেন। এমন সময় হরি মহারাজের চাদর খানি হস্তচ্যুত হইয়া হঠাৎ গঙ্গায় পড়িয়া গেল। হরি মহারাজ বলিয়া উঠিলেন, 'নিশ্চয়, চাদরটা গেল!' স্বামী নিশ্চয়ানন্দ গুরুতুল্য সন্ন্যাসীর চাদর খানি উদ্ধারের জন্য

গঙ্গাজলে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। তুরীয়ানন্দজী তাঁহাকে উঠিয়া আসিতে অনুরোধ করিলেও তিনি প্রবল স্রোতের সহিত পাথরের পর পাথরের ধাক্কা খাইতে খাইতে ভাসিয়া চলিলেন। এক স্থানে ঘূর্ণীজলে পড়িয়া চাদরটি ডুবিয়া গেল। স্বামী নিশ্চয়ানন্দজীও চাদরের সহিত জলে ডুবিলেন। পার্বত্য নদীর জলস্রোতে ভাসা বা প্রবল ঘূর্ণীপাকে ডুব দেওয়া যে কত বিপজ্জনক তাহা প্রত্যক্ষদর্শী বা ভুক্তভোগী ব্যতীত অন্যে বুঝিতে পারিবেন না। নিশ্চয়ানন্দজী যে পাকে ডুবিলেন তাহা খুব গভীর ছিল। কয়েক মুহূর্ত তিনি গঙ্গাগর্ভে অদৃশ্য রহিলেন। তৎপরে তাঁহাকে চাদরটি লইয়া ভাসিয়া উঠিতে দেখা গেল। কিন্তু সেখানে খাড়া পাথর থাকায় উপরে উঠিতে পারিলেন না, আরও কিছু দূর তাঁহাকে ভাসিয়া যাইতে হইল। তিনি যখন চাদরটী লইয়া উঠিলেন তখন তাঁহার শরীরের নানা স্থান ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে ও রক্ত পড়িতেছে। হরি মহারাজকে চাদর খানি দিয়া তিনি আনন্দিত হইলেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ তাঁহাকে সস্নেহে তিরস্কারপূর্বক বলিলেন, 'সামান্য জিনিষের জন্য তুমি প্রাণ দিতে গিছ্‌লে কেন?' স্বামী নিশ্চয়ানন্দ সবিনয়ে উত্তর দিলেন, "আপনি বল্‌লেন, 'নিশ্চয়, ঐ গেল!' আমি কাছে থাকৃতে আপনার চাদরটি যাবে তা হবে না।" তিনি ক্ষতস্থানগুলিতে গঙ্গামাটি লাগাইয়া স্বীয় কুঠিয়ায় ফিরিলেন। যিনি শ্রীগুরু ও তৎগুরুভ্রাতার আদেশ পালনার্থে এইরূপে স্বীয় প্রাণ দিতে সদা প্রস্তুত তিনি যে কত বড় ত্যাগী তপস্বী তাহা সহজেই অনুমেয়।*

বেলুড় মঠে অবস্থান কালে স্বামী নিশ্চযানন্দ শ্রীগুরুর সেবাধিকার পাইয়া যেমন নিজেকে ধন্যজ্ঞান করিতেন তেমনি শ্রীগুরুর ঘনিষ্ঠ সঙ্গলাভের সুযোগও পাইতেন। এইজন্য স্বামিজীর জীবনের অনেক ঘটনা তিনি জানিতেন। আর্য্য সমাজের কয়েকজন প্রতিনিধি আসিয়া যেদিন স্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন সেদিনও তিনি উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা স্বামিজীকে

---

* এই ঘটনাদ্বয় শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত "সাধু নিশ্চয়ানন্দের অনুধ্যান" নামক পুস্তিকায় উল্লিখিত।

জানাইলেন, তিনি যদি মূর্তিপূজা ত্যাগ করেন তাহা হইলে তাঁহারা তাঁহাকে আর্য্য সমাজের নেতা করিবেন। স্বামিজী তাঁহাদিগকে প্রতীকোপসনার আধ্যাত্মিক অর্থ বুঝাইয়া বলিলেন, 'আমি আর্য্যসমাজভুক্ত হতে চাই না। আমি শ্রীরামকৃষ্ণের আশ্রিত। আজীবন তাই থাকবো।' জাপানী মনীষি ওকাকুরা ও লোকমান্য তিলক যে যে দিন বেলুড় মঠে আসেন তখন নিশ্চয়ানন্দজী তাঁহা দিগকে দেখিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ ১৯০১ খ্রীঃ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশন উপলক্ষে তিলক কলিকাতায় আসেন এবং বেলুড় মঠে স্বামীজীর সহিত কয়েকবার সাক্ষাৎ করেন। তিনি একবার বেলুড় মঠে মোগলাই চা তৈয়ার করিয়া স্বামিজী ও অন্যান্য সাধুদিগকে খাওয়াইয়াছিলেন। স্বামী নিশ্চয়ানন্দ বারবার বলিতেন, "স্বামিজীর সংস্পর্শে আসিয়া তিলকের মনোভাব পরিবর্তিত হইয়াছিল। পূর্বে তিনি মারাঠী ব্রাহ্মণদের উন্নয়নের চেষ্টা করিতেন। স্বামিজীর সংস্পর্শে আসিবার পর তিনি নিম্নশ্রেণীর লোকদের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিলেন।" নিশ্চয়ানন্দজী ছত্রপতি শিবাজীব প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইতেন। তিনি শিবাজীর কথা বলিতে বলিতে তন্ময় হইয়া যাইতেন। মহারাষ্ট্রের ইতিহাস তিনি ভালরূপে জানিতেন। শিবাজীর ভাবে ভাবিত ছিলেন বলিয়াই বোধ হয় তিনি স্বামীজীর মহিমা এত গভীর ভাবে বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

১৯০২ খ্রীঃ জুলাই মাসে স্বামিজীর দেহত্যাগ হইবার পর স্বামী নিশ্চয়ানন্দ আর বেলুড় মঠে থাকিতে চাহিলেন না। শ্রীগুরুর অভাবে তাঁহার কাছে বেলুড় মঠ শূন্য বোধ হইতে লাগিল। তিনি বলিলেন, 'যাঁর জন্য এসেছিলাম তিনি যখন চলে গেলেন আমি আর এখানে থাকবো না। যেখানে মন যায় সেখানে গিয়ে থাকবো।' স্বামী সারদানন্দের অনুরোধে তিনি আরো কিছু কাল বেলুড় মঠে থাকিয়া তীর্থভ্রমণে বহির্গত হইলেন। নানা স্থানে ভ্রমণান্তে তিনি ১৯০৩ খ্রীঃ কুম্ভমেলার সময় হরিদ্বারে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার গুরুভ্রাতা স্বামী কল্যাণানন্দ ১৯০১ খ্রীঃ জুন মাসে রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম স্থাপন করিয়াছিলেন। স্বামী নিশ্চয়ানন্দ গুরুভ্রাতার সহকর্মীরূপে সেবাশ্রমে

যোগ দিলেন এবং মৃত্যু কাল পর্যন্ত ৩১।৩২ বৎসর তথায় সেবাকর্মে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি আর বাংলা দেশে ফিরেন নাই, বা অন্যত্র যান নাই। এই দীর্ঘকালের মধ্যে তিনি মাত্র দুইবার কনখল ত্যাগ করিয়াছিলেন। প্রথম বার স্বামী তুরীয়ানন্দের নিকট উত্তর কাশীতে যান। এই বিষয় পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। দ্বিতীয়বার সম্ভবতঃ ১৯২২ খৃঃ স্বামী তুরীয়ানন্দের শেষ অসুখের সময় তিনি কাশীধামে আসেন। স্বামীজী তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "দেখ নিশ্চয়! সাধু হয়ে অপরের গলগ্রহ হওয়া উচিত নয়। কোনও ব্যক্তির অন্ন গ্রহণ করলে তার প্রতিদান দিতে হয়। সাধু সমাজ অপরের অন্ন খেয়ে খেয়ে জড় হয়ে গেছে। সমস্ত দেশ অপরের উপর নির্ভর করে পঙ্গু হয়েছে। তুমি কখনো কারো উপর নির্ভর করো না। যদি অন্য কাজ কিছু করতে না পার এক পয়সার একটা মাটীর কলসী কিনে রাস্তার ধারে বসে তৃষ্ণাতুর পথিকদের জল খাওয়াবে। তাতেও কিছু সৎকাজ হবে। নিষ্ক্রিয় হয়ে অপরের অন্ন খাওয়া পাপ। গুরুবাক্য শিরোধার্য্য করিয়া স্বামী নিশ্চয়ানন্দ আর্তসেবায় সমগ্র জীবন অতিবাহিত করেন।

স্বামী নিশ্চয়ানন্দ যখন কনখল সেবাশ্রমে যোগ দান করেন তখন প্রতিষ্ঠানটী ভাড়া বাটীতে অবস্থিত ছিল। তাঁহারা ছত্রে ভিক্ষা করিয়া খাইতেন এবং রোগীসেবায় নিযুক্ত থাকিতেন। স্থানীয় সাধুগণ তাঁহাদিগকে ভাঙ্গী মেথর সাধু বলিয়া অবজ্ঞা করিতেন। ক্রমে শত শত গৃহী সন্ন্যাসী তীর্থযাত্রী বা তীর্থবাসী তাঁহাদের সেবা লইতে বাধ্য হইতেন। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে সেবাশ্রমের জন্য পনের বিঘা জমি ক্রয় করা হয়। প্রথমে উহার উপর কয়েকখানি চালাঘর করিয়া সেবাকার্য্য চলিতে থাকে। পরে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ কর্তৃক গৃহাদির নক্সা প্রস্তুত এবং স্বামী কল্যাণানন্দ ও স্বামী নিশ্চয়ানন্দের তত্ত্বাবধানে স্থায়ী গৃহাদি নির্মিত হয়। স্বামী নিশ্চয়ানন্দ রোজ সকালে কনখল হইতে হাঁটিয়া ঋষিকেশে যাইতেন এবং তথায় সাধুদের কুঠিয়ায় কুঠিয়ায় ঘুরিয়া রোগী-চিকিৎসা করিতেন। সাধু-সেবা সমাপনান্তে তিনি ছত্রে ভিক্ষা করিয়া খাইয়া পুনরায় হাঁটিয়া কনখলে ফিরিতেন। এই সংবাদ অচিরে কৈলাস মঠের

মোহন্ত ধনরাজ গিরিজীর কর্ণগোচর হয়। তিনি কোন শিষ্য দ্বারা নিশ্চয় মহারাজকে ডাকিয়া পাঠান এবং তাঁহার মুখে তৎকৃত সাধুসেবার বিবরণ শুনিয়া তাঁহাকে কৈলাস মঠে প্রত্যহ আহার করিতে অনুরোধ করেন। ধনরাজ গিরি স্বামী নিশ্চয়ানন্দের মুখে স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত সেবাধর্মের কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হন। স্বামী নিশ্চয়ানন্দ তখন হইতে প্রত্যহ দ্বিপ্রহরে কৈলাস মঠেই আহার করিতেন। এইরূপে কিছুদিন চলিবার পর ধনরাজ গিরি শিষ্যদের লইয়া সুদূর ভ্রমণে বহির্গত হন। যাইবার সময় তিনি এক নূতন কুঠারীকে বলিয়া যান, "কনখল হইতে যে মহাত্মা এখানে প্রত্যহ সাধুসেবা করিতে আসেন তিনি ভিক্ষা লইতে আসিলে তাঁহাকে সাদরে ভোজন করাইবে।" স্বামী নিশ্চয়ানন্দ ধনরাজ গিরির অনুপস্থিতিতে কৈলাস মঠে যাইয়া দেখেন, নূতন কুঠারী তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না। তখন তিনি মলিন গেরুয়া বস্ত্র পরিতেন, পাদুকা ব্যবহার করিতেন না এবং হাতে ঔষধের বাক্সটি রাখিতেন! নূতন কুঠারী তাঁহাকে দেখিয়া মনে করিলেন, ইনি কোন ক্যাঙ্গলা সাধু এবং বলিলেন, "এখানে বাহিরের কোন সাধুকে ভোজন করাইবার ব্যবস্থা নাই।" এই কথা শুনিবামাত্র নিশ্চয় মহারাজ কালীকমলীর ছত্রে চলিয়া যান। তখন অন্নসত্র বন্ধপ্রায় এবং তত্ত্বাবধায়ক রামনাথজী গদিতে উপবিষ্ট। নিশ্চয় মহারাজকে দেখিয়া রামনাথজী বলিলেন, "এতদিন কোথায় ছিলেন? আপনাকে অনেকদিন ছত্রে দেখি নাই। আপনার ভোজন হইয়াছে কি?" নিশ্চয় মহারাজ কৈলাস মঠের কোন কথা না বলিয়া বিলম্বের অন্য কারণ নির্দেশ করিলেন এবং ছত্রে ভিক্ষা লইয়া খাইয়া কনখলে ফিরিলেন। এইরূপে কিছুদিন তিনি কালীকমলীর ছত্রে আহার করিতে লাগিলেন। ইতোমধ্যে ধনরাজ গিরি ভ্রমণ হইতে কৈলাস মঠে ফিরিয়া কুঠারীর নিকট নিশ্চয় মহারাজের সন্ধান লইলেন। তিনি কয়েকদিন নিশ্চয়ানন্দজীকে কৈলাস মঠে ভিক্ষার্থ আসিতে না দেখিয়া কুঠারীকে তীব্র তিরস্কার করিলেন এবং নিশ্চয়ানন্দজীকে ছত্র হইতে ডাকিয়া আনিবার জন্য তাঁহাকে পাঠাইলেন। উক্ত সাধু অন্নসত্রের ফটকের সামনে নিশ্চয়ানন্দজীকে দেখিতে পাইয়া তাঁহার পা দুটী জড়াইয়া ধরিয়া

কাঁদিতে লাগিলেন এবং স্বীয় অপরাধের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। নিশ্চয় মহারাজ সেইদিন হইতেই কৈলাস মঠে গিয়া পুনরায় আহার করিতে লাগিলেন এবং পূর্ববৎ রুগ্ন সাধুদের সেবায় ব্রতী হইলেন।

স্বামী নিশ্চয়ানন্দ প্রায় একত্রিশ বৎসর স্বামী কল্যাণানন্দের সহকর্মী এবং দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন। স্বামী কল্যাণানন্দ তাঁহার উক্ত সহকর্মী গুরুভ্রাতা সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন, "প্রথমে সে লেখাপড়া বিশেষ কিছু জানিত না। কিন্তু নিজের অদম্য অধ্যবসায়, আত্মত্যাগ ও সেবানুরাগের প্রেরণায় ক্রমে ক্রমে সে সব কাজ উত্তমরূপে শিক্ষা করিল। সেবাশ্রমে যতগুলি বাড়ী হইয়াছে সব সে নিজ হাতে করিয়াছে। ডাক্তারী ক্রমশঃ সে ভালভাবে শিখিয়াছিল; মৃত্যু পর্যন্ত সে ডাক্তারীই করিয়া গিয়াছে। হিসাবপত্র রাখাও সে ধীরে ধীরে বেশ আয়ত্ত করিয়াছিল। ডাক্তারী করা, হিসাব রাখা, বাড়ী প্রস্তুত ও মেরামত করা প্রভৃতি সব কাজ সে একা অক্লান্তভাবে করিত। এই সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসর কাল একদিনও ছুটী না লইয়া মৃত্যুর শেষ দিন পর্যন্ত সেবা করা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। গীতায় নিষ্কাম কর্মের কথা আছে, "মা কর্মফল-হেতুর্ভূঃ মা তে সঙ্গোঽস্ত্ব অকর্মণি।" ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত ছিল নিশ্চয়ানন্দের অভূতপূর্ব সেবাময় জীবন। তাঁহার মৃত্যুও তেমনি ধ্যান করিতে করিতে পদ্মাসনে বসিয়া হইয়াছিল।"

কনখল সেবাশ্রমে স্বামী নিশ্চয়ানন্দ জীর্ণ জুতা ও ছিন্ন জামা-কাপড় পরিয়া অধিকাংশ সময় কাটাইতেন এবং সর্বদা বিভিন্ন সেবাকার্যে সকাল হইতে গভীর রাত্রি পর্যন্ত ব্যাপৃত থাকিতেন। সেবাশ্রমের ঠাকুর-ঘরে না যাইয়া স্বীয় কক্ষে নিভৃতে তিনি ধ্যান-ভজন করিতেন। একবার কথামৃতকার শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত সেবাশ্রমে যাইয়া কিছুকাল বাস করেন। তিনি আশ্রমের সাধুব্রহ্মচারীদিগকে লইয়া ধর্মপ্রসঙ্গ করিতেন এবং ঠাকুর-ঘরে যাইয়া জপধ্যানে বসিতেন। স্বামী নিশ্চয়ানন্দকে কয়েকদিন ঠাকুর-ঘরে যাইতে না দেখিয়া তিনি তাঁহাকে বলিলেন, "দেখ নিশ্চয়, ঠাকুর বলতেন, ঈশ্বরলাভই সাধু জীবনের উদ্দেশ্য। কাজকর্ম সাধু-জীবনের একমাত্র লক্ষ্য নহে। তুমি নিয়মিতভাবে ঠাকুর-ঘরে

যাও না কেন?” ঠাকুরের জনৈক শিষ্যের মুখে এই কথা শুনিয়া স্বামী নিশ্চয়ানন্দ নীরব রহিলেন এবং এইরূপ শোনা সত্ত্বেও ঠাকুর-ঘরে গেলেন না, পূর্ববৎ সেবাকার্যে মাতিয়া রহিলেন। মাষ্টার মহাশয় তাঁহাকে দ্বিতীয়বার বলাতেও কোন ফল হইল না। কিছুদিন পরে তিনি যখন তাহাকে তৃতীয়বার বলিলেন তখন নিশ্চয়ানন্দজী কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং করজোড়ে জানাইলেন, “আমি স্বামিজীর গোলাম। সাধনভজন কিছুই জানি না। তাঁর কাজ করাই আমার জীবনব্রত।” নিশ্চয মহারাজের গুরুভক্তি দেখিয়া শ্রীম বিস্মিত হইয়া বলিয়াছিলেন, “তোমাকে সাধন-ভজন কিছুই করতে হবে না, গুরু-কৃপায় তোমার সব হয়ে যাবে।” নিশ্চয়ানন্দজীর অদ্ভুত দেহ-ত্যাগের বিবরণ শুনিয়া সত্যই মনে হয়, শ্রীম'র ভবিষ্যদ্বাণী বর্ণে বর্ণে সত্য হইয়াছিল।

যাঁহারা স্বামী নিশ্চয়ানন্দের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করেন নাই তাঁহারা অনেক সময় তাঁহাকে ভুল বুঝিতেন। তিনি নিজে যেমন কঠোর সন্ন্যাসী ও অক্লান্ত কর্মী ছিলেন, সংঘের অন্যান্য সন্ন্যাসীদিগকেও সেইরূপ হইতে চাহিতেন। যে সকল সাধু-ব্রহ্মচারী অলসভাবে ঠাকুর ও স্বামিজীর অন্ন-ধ্বংস করিতেন তাঁহাদিগকে তিনি পছন্দ করিতেন না। এইজন্যই সময় সময় তিনি কোন কোন সাধুকে তীব্র তিরস্কার করিতেন। কিন্তু যে সব সাধু-ব্রহ্মচারী সেবাকার্যে ও সাধন-ভজনে নিষ্ঠাবান্ ছিলেন তাঁহাদিগকে তিনি খুব ভাল বাসিতেন। তাঁহার নিজের অশেষ সহ্যগুণ ছিল। তিনি স্বামী কল্যাণানন্দ অপেক্ষা বয়সে বড় ছিলেন। বড় হইলেও তিনি কল্যাণ মহারাজকে বরাবর বড় ভাইয়ের মত ভক্তিশ্রদ্ধা করিতেন। কার্যক্ষেত্রে কল্যাণ মহারাজের সহিত মতভেদ হইলে কল্যাণ মহারাজ তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া কখনো কখনো তাঁহাকে ভৎর্সনা করিতেন। ইহার জন্য স্বামী নিশ্চয়ানন্দ কোন উচ্চবাচ্য না করিয়া নিশ্চল ও নীরব থাকিতেন। তিনি কখনো কোন সাধু-ব্রহ্মচারীর সেবা লইতেন না। ইহা হইতে বুঝা যায়, বেলুড় মঠের সাধূ-ব্রহ্মচারীদিগকে কি শ্রদ্ধার চক্ষে তিনি দেখিতেন। সন্ন্যাসীর কঠোর নিয়ম তাঁহার জীবনে

বিন্দুমাত্র উল্লঙ্ঘিত হয় নাই। সেবাময় জীবনে সাধনার ফল্গু-স্রোত বহিলে চারিত্রিক উৎকর্ষ এইরূপই হইয়া থাকে।

সম্ভবতঃ ১৯৩২ খ্রীঃ স্বামী নিশ্চয়ানন্দ gastric ulcer (বায়ুবৃদ্ধি-জনিত অন্ত্রক্ষত) রোগে আক্রান্ত হন। তখন বর্ষাকাল এবং স্বামী কল্যাণানন্দ মায়াবতী অদ্বৈতাশ্রমে। গুরুভ্রাতার অসুখের সংবাদ তারযোগে পাইয়াও বর্ষার জন্য তিনি মায়াবতী হইতে কনখলে আসিতে পারিলেন না। স্থানীয় ডাঃ বসুর চিকিৎসাধীনে থাকিয়া স্বামী নিশ্চয়ানন্দ ধীরে ধীরে আরোগ্যলাভ করিলেন। ইত্যবসরে স্বামী কল্যাণানন্দ মায়াবতী হইতে ফিরিয়া আসিলেন। ১৯৩৪ খ্রীঃ শ্রাবণ মাসে পুনরায় স্বামী নিশ্চয়ানন্দ উক্ত রোগে আক্রান্ত হইলেন। যথাযোগ্য চিকিৎসা সত্ত্বেও কোন ফল হইল না। ক্রমশঃ তাঁহার অবস্থা খারাপ হইতে লাগিল। স্বামী কল্যাণ্যানন্দের নির্দেশে স্বামী দুর্গানন্দ নিশ্চয়ানন্দজীর নিকট হইতে সেবাশ্রমের হিসাবপত্র বুঝিয়া লইতে চাহিলেন। দুর্বিষহ অসুস্থতা সত্ত্বেও নিশ্চয়ানন্দজী বিছানার উপর বসিয়া হিসাবের খাতা লিখিতেন। স্বামী দুর্গানন্দ তাঁহাকে বলিলেন, "মহারাজ, এরূপ অসুস্থ শরীর লইয়া এখন কাজ করা আপনার উচিত নয়। আমাকে খাতাগুলি দিন, আমি হিসাব লিখিব।" ইহাতে তিনি সম্মত না হইয়া উত্তর দিলেন, "হবে গো হবে, আমি আর কত দিন! এর পরে তোমরাই সব করবে। যতক্ষণ এই শরীরে প্রাণ আছে ততক্ষণ স্বামিজীর কাজ করতে আমায় বাধা দিও না!" স্বামী দুর্গানন্দের মুখে স্বামী কল্যাণানন্দ এই কথা শুনিয়া নিশ্চয়ানন্দজীকে অনেক বুঝাইলেন। কিন্তু নিশ্চয়ানন্দজী উহার কোন জবাব না দিয়া চুপ করিয়া রহিলেন.

একদিন হঠাৎ স্বামী নিশ্চয়ানন্দ সেবাশ্রমের সেবকগণকে ডাকিয়া বলিলেন, "আমার ঘরের চারিদিকে ভাল করে ধূপ ধুনা দাও; আর বাইরে ঐ বড় বাড়ীর (যক্ষ্মারোগী বিভাগের) সামনের জমিতে চেয়ার সাজাইয়া রাখ এবং সেখানেও ধূপ ধুনা দাও। আজ আমার গুরুদেব ঐখানে আসবেন আমার সঙ্গে দেখা করতে। আমি ওখানে গিয়ে তাঁকে দর্শন করবো।" তিনি তখন স্বামী কল্যাণানন্দের কক্ষের পার্শ্ববর্তী কক্ষে থাকিতেন। তাঁহার নির্দেশে সেবাশ্রমের

সাধু-ব্রহ্মচারীগণ তাঁহার পাশে গিয়া বসিলেন। তখন নিশ্চয়ানন্দজী তাঁহাদের সকলকে হাতজোড় করিয়া নমস্কার করিলেন। অনন্তর তিনি সেবকদিগকে বলিলেন, "বাহিরের মাঠে যেখানে আরাম চেয়ার রাখা হয়েছে সেখানে স্বামিজী এসে বসেছেন। আমাকে সেখানে নিয়ে চল।" সেবকগণ তদনুসারে তাঁহাকে তথায় লইয়া গেলেন। তিনি আরাম চেয়ারের সম্মুখে যাইয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া উপবেশনপূর্বক ধ্যানস্থ হইলেন। কিছুক্ষণ ধ্যানান্তে তিনি সেবকগণকে বলিলেন, "স্বামিজী চলে গেছেন, আমি এবার ঘরে যাব।" সেবকগণ তৎপরে তাঁহাকে ধরিয়া ঘরে আনিলেন। তখন তিনি সেবকগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা স্বামিজীকে দেখতে পেয়েছিলে?" সেবকগণ উত্তর দিলেন, "আজ্ঞে না। আমরা তাঁকে দেখতে পাইনি।" ইহা শুনিয়া তিনি আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলিলেন, "স্বামিজী এতক্ষণ বসে রইলেন, আর তোমরা তাঁকে দেখতে পেলে না! তোমাদের দুর্ভাগ্য!" মহাপ্রয়াণের পূর্বে এই অলৌকিক অনুভূতি* হইতে বুঝা যায়, স্বামী নিশ্চয়ানন্দের মন গুরুধ্যানে এবং দেহ গুরুকর্মে আজীবন নিমগ্ন ছিল। তিনি জুলাই মাসে রোগাক্রান্ত হইয়াছিলেন। জুলাই, আগষ্ট, সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর কাটিয়া গেল। কিন্তু রোগের কিঞ্চিৎমাত্রও উপশম হইল না এবং তিনি হিসাব লেখাও ছাড়িলেন না। সেবাশ্রমে দুর্গাপূজা সমারোহে অনুষ্ঠিত হইল। ইহার পর স্বামী নিশ্চয়ানন্দের অবস্থা ক্রমেই খারাপ হইতে লাগিল। পূর্ব পূর্ব বৎসরের ন্যায় সে বৎসরও কালীপূজা ধূমধামের সহিত সম্পন্ন হইল। কালীপূজার সময় স্বামী নিশ্চয়ানন্দ অশেষ আনন্দ প্রকাশ করিলেন এবং একটু প্রসাদ চাহিয়া খাইলেন। কালীপূজার পরদিন হইতে তিনি শয্যাশায়ী হইলেন। শয্যাশায়ী হওয়ার পরও শেষ পর্যন্ত তিনি কাহারো সাহায্য না লইয়া পিছনের ঘরে মলমূত্র ত্যাগ করিতে যাইতেন। ঐ সামান্য চার পাঁচ পা দূরে যাইতেও তিনি টলিতেন এবং সেজন্য দেওয়াল ধরিয়া যাইতেন। তবুও কাহারো সাহায্য লইতেন না, বরং কেহ সাহায্য করিতে গেলে তিনি বিরক্তি ও ক্রোধ প্রকাশ করিতেন। শয্যাশায়ী হইবার তিন চার দিন

* উক্ত ঘটনা স্বামী দুর্গানন্দ কথিত।

পরে তাঁহার অবস্থা সঙ্কটজনক হইল। পঞ্চম দিন সকাল বেলা হইতেই তাঁহার অবস্থা অতিশয় খারাপ হইয়া পড়িল। স্বামী কল্যাণানন্দ আসিয়া তাঁহার কাছে বসিলেন এবং সেবাশ্রমের সেবকগণ তাঁহার চারিদিকে সমবেত হইলেন। স্বামী কল্যাণানন্দ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "নিশ্চয় কেন তুমি এরূপ করিতেছ? ঠাকুরের কৃপায় তুমি আরোগ্য লাভ করিবে।" দেওয়ালে স্বামিজীর যে ধ্যানস্থ ফটোখানি ছিল তাহার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া স্বামী নিশ্চয়ানন্দ শায়িত ছিলেন। একটু পরে হঠাৎ স্বামী দুর্গানন্দের দিকে চাহিয়া হাত নাড়িয়া ইসারা করিলেন, 'আমাকে উঠাইয়া বসাইয়া দাও।' তখন স্বামী দুর্গানন্দ ও উত্তমানন্দ তাঁহাকে ধরিয়া উঠাইয়া বসাইয়া দিলেন এবং তৎপরে উভয়ে তাঁহাকে ধরিয়া রহিলেন। তখনো তিনি স্বামিজীর ছবির দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া ছিলেন। এমন সময় ধীরে ধীরে তাঁহার ঘাড় লটকাইয়া পড়িল এবং তাঁহার প্রাণবায়ু বাহির হইয়া গেল। তখন বেলা ১টা, কি ১॥০টা হইবে।

স্বামী নিশ্চয়ানন্দ যেমন সেবাপরায়ণ তেমনি সাধননিষ্ঠ ছিলেন। তিনি সঙ্গোপনে নিয়মিতভাবে জপধ্যান করিতেন। তাঁহার বিবেক ও বৈরাগ্য অসাধারণ ছিল। আহার-বিহারে সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও পরিধেয়ের পারিপাট্যের দিকে তাঁহার আদৌ নজর ছিল না। স্বামী কল্যাণানন্দের সহিত তাঁহার সুগভীর সদ্ভাব ও সম্প্রীতি ছিল। গুরুভ্রাতার প্রতি এরূপ অনুরাগ ও আনুগত্য অতি বিরল দেখা যায়। এই সেবাব্রতী সন্ন্যাসী গুরুভ্রাতৃদ্বয়কে শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত অভিন্নাত্মা যুগ্ম দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের সহিত তুলনা করিয়াছেন। স্বামী নিশ্চয়ানন্দ প্রায় ৬৮ বৎসর বয়সে ১৩৪১ সালে ৫ই কার্তিক (১৯৩৪ খ্রীঃ ২২শে অক্টোবর) কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার দিন অপরাহ্ণে সুখাসনে উপবিষ্ট থাকিয়া ধ্যানযোগে নশ্বর দেহ পরিত্যাগপূর্বক অমর লোকে গমন করিয়াছেন। তাঁহার মহাপ্রয়াণ সম্বন্ধে 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকার ১৯৩৪ খ্রীঃ নভেম্বর সংখ্যায় এই সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হয়।—

"স্বামী নিশ্চয়ানন্দের অক্লান্ত পরিশ্রম ও আন্তরিক আগ্রহের ফলে কনখল

সেবাশ্রম ক্ষুদ্রাকার হইতে বর্তমান বিরাট সেবায়তনে পরিণত হইয়াছে। তিনি সেবানুরাগ, ত্যাগতপস্যা ও আত্মোৎসর্গের জীবন্ত প্রতিমূর্তি ছিলেন। তাঁহার চারিত্রিক বিশুদ্ধতা এবং সকল বাধাবিঘ্নকে তুচ্ছ করিয়া আদর্শ অনুসরণার্থ লৌহবৎ সুদৃঢ় নিশ্চয় এবং সর্বোপরি অসামান্য গুরুভক্তি চিরকাল অনুকরণীয় ও স্মরণীয় থাকিবে। তিনি মহা কর্মযোগী ছিলেন, এবং স্বীয় সেবাময় জীবনে দেখাইয়াছেন, কিরূপে স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত সেবাধর্ম আধ্যাত্মিক বিকাশের সহায়ক হয় এবং জীবনকে সংশুদ্ধ, সুমহৎ ও সমুন্নত করে।" সেবায় ও সাধনায় তাঁহার সুদৃঢ় নিশ্চয় নিত্য প্রকটিত হইত। তাঁহার 'নিশ্চয়ানন্দ' নাম সার্থক হইয়াছিল।

ছত্রিশ

স্বামী বোধানন্দ*

যুগাচার্য্য স্বামী বিবেকানন্দের তিনটী সন্ন্যাসী শিষ্য স্বামী প্রকাশানন্দ, স্বামী পরমানন্দ ও স্বামী বোধানন্দ আমেরিকায় শ্রীগুরুর আরব্ধ বেদান্ত-প্রচারার্থ প্রাণপাত করিয়াছেন। প্রথমে স্বামী প্রকাশানন্দ এবং তৎপরে স্বামী পরমানন্দ যথাক্রমে সানফ্রান্সিস্কো ও বোষ্টনে বহু পূর্বেই দেহরক্ষা করিয়াছিলেন। ১৯৫০ খ্রীঃ ১৮ই মে বৃহস্পতিবার স্বামী বোধানন্দ প্রায় আশি বৎসর বয়সে নিউ ইয়র্কে দেহত্যাগ করিয়াছেন। ১৯০৬ খ্রীঃ হইতে ১৯৫০ খ্রীঃ পর্য্যন্ত প্রায় চুয়াল্লিশ বৎসর তিনি আমেরিকায় বেদান্তপ্রচারে ব্রতী ছিলেন। বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু আমেরিকায় উপরোক্ত স্বামীত্রয়ের সহিত সাক্ষাৎ

* এই অধ্যায়ের অধিকাংশ "মাসিক বসুমতী"র ১৩৫৭ পৌষ ও মাঘ সংখ্যাদ্বয়ে মল্লিখিত প্রবন্ধে প্রকাশিত।

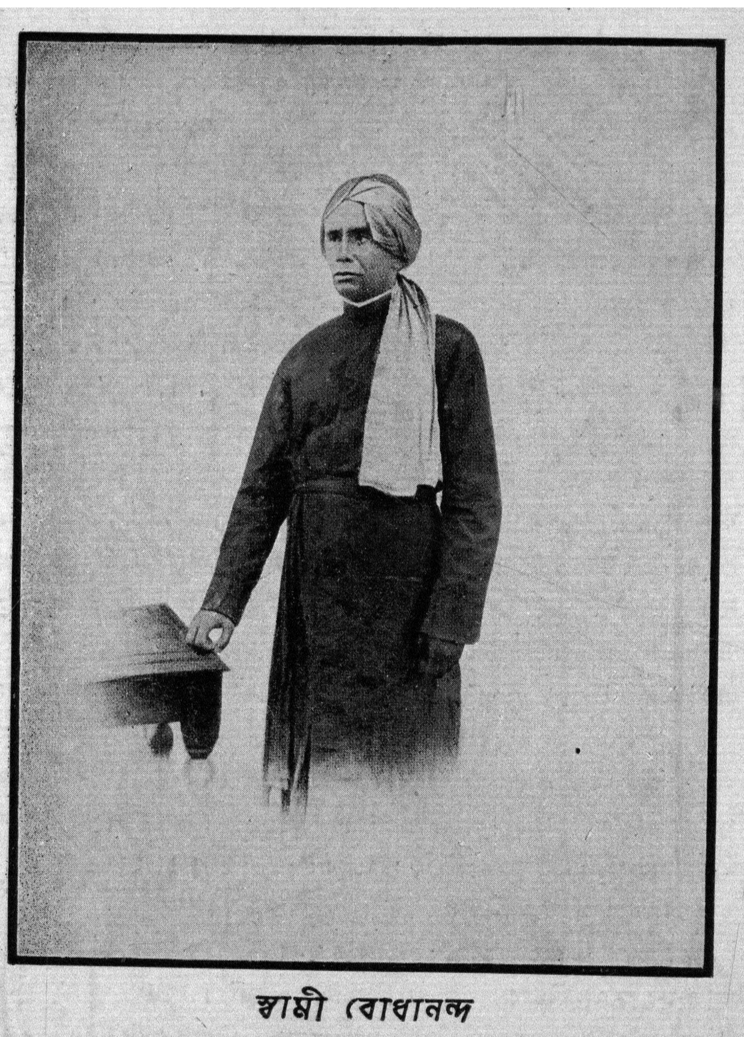
করিবার পর ভারতে ফিরিয়া জনৈক রামকৃষ্ণ-ভক্তকে কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, "স্বামী প্রকাশানন্দ is a friend (বন্ধু), স্বামী পরমানন্দ a prince (রাজকুমার) এবং স্বামী বোধানন্দ a saint (মহাপুরুষ) ।"

স্বামী বোধানন্দের পূর্ব নাম ছিল হরিপদ চট্টোপাধ্যায়। ১২৭৭ সালে বৈশাখ (১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের মে) মাসে অক্ষয় তৃতীয়ার দিন হরিপদ হুগলী জেলার অন্তঃপাতী বাগাণ্ডা গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। বাগাণ্ডা গ্রাম অধুনা হাওড়া জেলার মধ্যবর্তী। তাঁহার পিতা শিবনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ন্যায়শাস্ত্রে সুপণ্ডিত এবং নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি কখনো জামা পরেন নাই, আজীবন উত্তরীয় ব্যবহার করিতেন। তাঁহার পিতা কালাচাঁদ পাটলির চাটুজে বংশের সুসন্তান ছিলেন। পাটলির চাটুজ্যেরা শ্রীকৃষ্ণের সন্তানরূপে প্রসিদ্ধ। তাঁহারা ছিলেন সর্বানন্দী মেল, আর ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ফুলে মেল। কালাচাঁদের দুই পুত্র শিবনারায়ণ ও বেণী মাধব। বেণী মাধবের পুত্র খগেন্দ্রনাথই শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘে স্বামী বিমলানন্দ নামে এবং স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যরূপে প্রসিদ্ধ। তাঁহার জীবনী এই পুস্তকের প্রথম ভাগে প্রদত্ত। শিবনারায়ণের পাচ পুত্র দুর্গাপদ, হরিপদ, তারাপদ, উমাপদ ও ভবপদ এবং এক কন্যা কালীদাসী। শিবনারায়ণের দ্বিতীয় পুত্র হরিপদ শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘে স্বামী বোধানন্দ নামে পরিচিত। হরিপদের মাতা মোক্ষদা দেবী সংসারে উদাসীনা ও কর্মকুশলা রমণী ছিলেন। স্বামী বোধানন্দ ও স্বামী বিমলানন্দ সন্ন্যাস-জীবনে গুরুভ্রাতা এবং পূর্বাশ্রমে জ্যেষ্ঠতাত ও খুল্লতাত ভ্রাতা ছিলেন। হরিপদ ও খগেন বাল্যকালেই চরিত্র-মাধুর্যে পল্লীর গুরুজনের স্নেহপাত্র হইয়াছিলেন। উভয়ের পিতামহকে পল্লীর জনৈক প্রবীণ বলিয়াছিলেন, "খগেন ও হরিপদ কখনো কোন মেয়ের মুখের দিকে তাকায় না।"

হরিপদ জগৎবল্লভপুর হাই স্কুলে পড়িতেন এবং সেই স্কুল হইতেই তিনি ১৮৯০ খ্রীঃ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কলিকাতা রিপণ কলেজ হইতে এফ. এ. এবং বি. এ. পাশ করিবার পর তিনি উপরোক্ত হাই স্কুলে কিছুকাল শিক্ষকতা করেন। সম্ভবতঃ ইহা ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের শেষার্ধ হইতে ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমার্ধ পর্য্যন্ত। জগৎবল্লভপুর হাই স্কুল বাংলার একটি সুপ্রাচীন উচ্চ

ইংরাজী বিদ্যালয় এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে ১৮৪৬ খ্রীঃ স্থাপিত। ছাত্ররূপে হরিপদ খুব অধ্যবসায়ী ও নিলোর্ভ ছিলেন। প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার পূর্বেই তিনি চেম্বার-কৃত ইংরাজী অভিধান খানির অধিকাংশ মুখস্থ করেন এবং খুল্লতাত ভ্রাতা ফণীন্দ্রনাথকে উহা মুখস্থ বলেন। হরিপদের বাড়ীতে অনেকগুলি ছাত্র একত্রে বসিয়া পড়িতেন। সেই সময় সকলে দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিতেন। এইরূপে বসিয়া পড়ায় কাহারো দিকে কাহারো দৃষ্টি পড়িত না বলিয়া পড়ার কোন ব্যাঘাত হইত না। ১৮৮৬ খ্রীঃ শ্রীরামকৃষ্ণের দেহরক্ষার পর কয়েক মাস স্বামিজী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বহুবাজার শাখা হাই স্কুলে প্রধান শিক্ষকের কার্য্য করিয়াছিলেন। সেই সময় হরিপদ উক্ত বিদ্যালয়ে চতুর্থ শ্রেণীতে পড়িতেন এবং কলিকাতায় কাকার বাড়ীতে থাকিতেন। তাঁহার স্কুল-বাড়ীর প্রধান দরজার সামনে খানিকটা ফাঁকা জমি ছিল। স্বামিজী ওরফে নরেন্দ্রনাথ স্কুলে অসিবার সময় সেই স্থানটি অতিক্রম করিতেন। হরিপদ দোতলা হইতে জানালা দিয়া তাঁহার সমুজ্জ্বল নয়নযুগল এবং তেজোদ্দীপ্ত চলন-ভঙ্গী নিরীক্ষণ করিতেন। নরেন্দ্রনাথ প্যাণ্টালুন ও চাপকান পরিয়া আসিতেন এবং তাঁহার এক হাতে প্রবেশিকা শ্রেণীর একখানি বই এবং অন্য হাতে একটী ছাতা থাকিত। তাঁহার ধীর গতি এবং জ্যোতির্ময় মুখমণ্ডল দেখিয়া হরিপদ তখনই তাঁহাকে এক অসাধারণ পুরুষ বলিয়া মনে করেন। বরাহনগর মঠে যাতায়াত কালে যখন তিনি শুনিলেন পূর্বতন প্রধান শিক্ষকই স্বামী বিবেকানন্দ হইয়াছেন তখন তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না। তখন তিনি বুঝিলেন, কেন ছাত্র জীবনে প্রথম দর্শন হইতেই তাঁহার চিত্ত স্বামিজীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল।

কলিকাতায় রিপণ কলেজে পড়িবার সময় হরিপদর সহপাঠী ছিলেন স্বামী আত্মানন্দ, স্বামী বিরজানন্দ, স্বামী বিমলানন্দ প্রভৃতি। তখন সুধীর, সুশীল, বিজয়, শশী, কুঞ্জ, খেলাত, উপেন, শরৎ, দেবেন, প্রিয়নাথ প্রভৃতি ১৪।১৫ জন ছাত্র মিলিয়া একটী দল বাঁধিয়া ধর্মচর্চায় রত হইতেন। খগেন ও কালীকৃষ্ণের বাড়ীতেই তাঁহাদের বেশী বৈঠক বসিত। ঐ সময় তাঁহারা প্রায় প্রত্যহ



স্বামী বোধানন্দ

গঙ্গাস্নান, বার-তিথি বিশেষে উপবাস, নিরামিষ ভোজনাদি নিয়মিত ভাবে করিতেন। ইহা ব্যতীত ভাগবত, গীতা, উপনিষদাদি শাস্ত্রপাঠ, সুবিধামত সাধুদর্শন ও সংকীর্তনাদিতে যোগদান তাঁহাদের ধর্মচর্চার অঙ্গীভূত ছিল। একদিন সকলের ইচ্ছা হইল, ভিক্ষা দ্বারা চাউলাদি সংগ্রহ করিয়া উহার বিক্রয়-লব্ধ অর্থে সাধুভোজন করাইবেন। পরদিন বৈকালে সকলে ভিক্ষায় বাহির হইলেন। ভিক্ষায় মোট ১০।১২ সের চাউল, কিছু আলু ও ফল সংগৃহীত হইল, কালীকৃষ্ণদের কোচম্যানের নিকট চাউল বিক্রয় করিয়া আন্দাজ এক টাকা পাওয়া গেল। ইহার তিন চার দিন পরে হরিপদ প্রমুখ ৩।৪ জন মিলিয়া ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বাদুড়বাগানস্থ বাড়ীতে অর্থভিক্ষা করিতে যান।* তখন বৈকাল প্রায় ৩টা হইবে। বিদ্যাসাগর স্বগৃহের দোতলায় গ্রন্থাগারে ছিলেন। তরুণগণ তথায় যাইয়া তাঁহাকে প্রণামান্তে মেজের উপর বসিলেন। বিদ্যাসাগর তাঁহাদের যাইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তন্মধ্যে একজন বলিলেন, "সাধুভোজন করাইবার ইচ্ছায় কিছু অর্থভিক্ষার জন্য আপনার কাছে আসিয়াছি।" ইহা শুনিয়া তিনি তাঁহাদের মুখের দিকে তাকাইয়া বিরক্তি প্রকাশপূর্বক বলিলেন, "যখন অর্থোপার্জনে সমর্থ হইবে তখন স্বোপার্জিত অর্থে সাধুসেবা করিও। আমি ইহার জন্য এক পয়সাও দিব না।" বিদ্যাসাগর সম্ভবতঃ মনে করিয়াছিলেন, এই তরুণগণ ধর্মের ধুয়া ধরিয়া অধ্যয়ন অবহেলা করিতেছে। কিন্তু তাঁহার কথায় তরুণদের শুভ সংকল্প পরিবর্ত্তিত হয় নাই।

উক্ত তরুণদলের মধ্যে শুকুল, খগেন, সুধীর, হরিপদ, সুশীল, কালীকৃষ্ণ প্রভৃতি কলেজের ছাত্র ছিলেন। তাঁহাদের সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা চলিত এবং জপধ্যান খগেনের বাড়ীতে হইত। জপধ্যানে কখনো কখনো তাঁহারা সারা রাত্রি অতিবাহিত করিতেন। তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে এমন সম্প্রীতি ছিল যে, কেহ কখনো ভাল খাবার পাইলে একা খাইতেন না, সকলে মিলিয়া ভাগ করিয়া

* 'উদ্বোধন' মাসিকে ১৩৫৭ সালের ভাদ্র হইতে পৌষ পর্য্যন্ত পাঁচ সংখ্যায় প্রকাশিত এবং স্বামী বোধানন্দ লিখিত 'শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘে আমার যোগদান' শীর্ষক প্রবন্ধাবলী দেখুন।

খাইতেন। বাড়ীতে বাড়ীতে যাইয়া রোগীর শুশ্রূষা এবং বিপথগামী ছাত্রদিগকে ধর্মপথে চালিত করাও তাঁহাদের দুইটি প্রধান কাজ ছিল। উক্ত দলের ছয়জন —কালীকৃষ্ণ, শুকুল, খগেন, সুধীর, হরিপদ ও সুশীল সন্ন্যাসী হইয়া স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণপূর্বক যথাক্রমে স্বামী বিরজানন্দ, আত্মানন্দ, বিমলানন্দ, শুদ্ধানন্দ, বোধানন্দ ও প্রকাশানন্দ নামে পরিচিত হন। ১৮৯১।৯২ খ্রীষ্টাব্দে একদিন হরিপদ ছোট গোলদিঘীর ধারে বেড়াইবার সময় কাঁকুড়গাছিতে রামচন্দ্র দত্তের যোগোদ্যানে রামকৃষ্ণ উৎসবের একটি মুদ্রিত বিজ্ঞপ্তি পাইলেন। ১৮৮৬ খ্রীঃ আগষ্ট মাসে শ্রীশ্রীঠাকুরের মহাসমাধির পর উক্ত যোগোদ্যানে তাঁহার ভস্মাস্থি সমাহিত হয়। উহার উপর মর্মর পাথরের একটি বেদী নির্মিত হইয়াছিল। উক্ত বেদীর উপর ঠাকুরের একখানি ছবি রাখা হইত। ঐ বেদীর উপরে একটি সঙ্কীর্ণ চতুষ্কোণ মন্দির নির্মিত হয়। ইহাকে ঠাকুর-ঘর বলা হইত এবং ইহাতে অস্থি-সমাধির দিন হইতে নিত্য পূজা চলিত। উক্ত ঠাকুর-ঘরটি সাধারণের নিকট কাঁকুড়গাছি সমাধি-মন্দির নামে পরিচিত। প্রতি বৎসর মন্দির প্রতিষ্ঠার দিন তথায় ঠাকুরের তিরোভাব উৎসব হয়। বিজ্ঞপ্তি খানি পড়িয়া সমাধি-মন্দিরটি দেখিবার জন্য হরিপদ আগ্রহান্বিত হইলেন। পরদিন তিনি বন্ধুদের কাহাকেও না বলিয়া একাকী কাঁকুড়গাছিতে গেলেন। রংপুর জেলার অন্তর্গত তাজহাটের রাজা গোবিন্দলাল রায়ের একখানি বাগান বাড়ী ছিল কাঁকুড়গাছিতে। হরিপদ তথায় পূর্বে অনেক বার গিয়াছিলেন। এবার সেখানে যাইয়া বাগানের সরকারের নিকট সমাধি-মন্দিরের পথ জানিয়া লইলেন। তৎপরে তথায় উপস্থিত হইয়া তিনি ঠাকুর-ঘরে প্রণামান্তে উপবিষ্ট ব্যক্তিদের সহিত কথাবার্তা কহিলেন।

তখন আগষ্ট মাস। সম্ভবতঃ সেদিন রবিবার ছিল। বেলা ৫।৫।।০ টা হইবে। যাঁহারা উপবিষ্ট ছিলেন তন্মধ্যে রামচন্দ্র দত্ত, মনোমোহন মিত্র ঠাকুরের সাক্ষাৎ শিষ্য ছিলেন। রামবাবুই হরিপদর সঙ্গে কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। নাম, বাড়ী প্রভৃতির কথা জিজ্ঞাসা করিবার পর তিনি হরিপদকে প্রশ্ন করিলেন, "আচ্ছা শ্রীশ্রীপরমহংসদেবকে আপনার কি মনে হয়?" রামবাবু

তাঁহাকে 'আপনি' বলিয়া সম্বোধন করায় তিনি একটু জড়সড় হইলেন এবং আর 'আপনি' বলিয়া সম্বোধন না করিতে করযোড়ে তাঁহাকে মিনতি জানাইলেন। তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে হরিপদ বলিলেন, "পরমহংসদেব একজন সিদ্ধপুরুষ।" ইহা শুনিয়া রাম বাবু বলিলেন, "তিনি শুধু সিদ্ধ পুরুষ নহেন, তিনি ঈশ্বরাবতার।" পরমহংসদেবের অবতারত্ব প্রমাণার্থ তিনি তাঁহার জীবনের দুই একটী অলৌকিক ঘটনাও বিবৃত করিলেন। পরমহংসদেবের সহিত সাক্ষাৎলাভের পূর্বে তিনি যখন ধর্মপিপাসায় ব্যাকুল হইয়া নানা স্থানে ঘুরিতেছিলেন তখন একদিন তিনি নিভৃতে বসিয়া চিন্তাকুল আছেন এমন সময় এক অপরিচিত ব্যক্তি হঠাৎ সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "ব্যস্ত হচ্ছ কেন? সয়ে থাক।" এই কথায় সান্ত্বনা দিয়া তিনি অন্তর্হিত হইলেন এবং তাঁহাকে আর দেখিতে পাওয়া গেল না। রামকৃষ্ণদেবকে দর্শন করিবার পর রামবাবু জানিতে পারিলেন যিনি তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়াছিলেন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কেহ নহেন। পরমহংসদেব রামবাবুকে স্বপ্নে মন্ত্রদীক্ষা দিয়াছিলেন এবং উক্ত মন্ত্র একদিন ভাবাবেশে ফিরাইয়া লইয়া তাঁহাকেই 'বকল্‌মা' দিতে বলেন।

তখন হইতে রামবাবু অন্তরে অন্তরে বুঝিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণদেব ঈশ্বরাবতার এবং তাঁহার দর্শন, পূজা, ধ্যান, নামকীর্তন ও আলাচনাদিতে জীবন উৎসর্গ করিলেন। রামচন্দ্র হরিপদকে আরও বলিলেন, "সিদ্ধ পুরুষ, একটি মাত্র সাধনমার্গ অনুসরণ করিয়া সেইটিতে সমগ্র জীবন অতিবাহিত করেন এবং শেষ দশায় সিদ্ধি প্রাপ্ত হন। কিন্তু পরমহংসদেব জগতের প্রধান ধর্মগুলির, বিশেষতঃ হিন্দুধর্মের, প্রধান প্রধান সমস্ত সাধন বিধিপূর্বক দীক্ষার সহিত অল্পকাল অনুষ্ঠানান্তে সিদ্ধ হন এবং সকল পথে একই চরম সত্য উপলব্ধি করেন। তাই তিনি বলিতেন, 'যত মত তত পথ'। অর্থাৎ সকল ধর্মের লক্ষ্য একই ঈশ্বর। দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় কলিযুগে ধর্মসমন্বয়ের শ্রেষ্ঠ আচার্য শ্রীরামকৃষ্ণ। সুতরাং তিনিই যুগাবতার।"

ঠাকুরের সাক্ষাৎ শিষ্য রামচন্দ্রের মুখে এই সকল কথা শুনিয়া হরিপদ নবালোক পাইলেন। সেদিন মাত্র এক ঘণ্টাকাল রামবাবুর সঙ্গে হরিপদর

ধর্মকথা হইয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অবতারত্ব প্রমাণের উপসংহারে রামবাবু বিশেষ জোর দিয়া বলিলেন, "সিদ্ধপুরুষ কখনো বকল্‌মা লইতে পারেন না। শ্রীরামকৃষ্ণ অবতার না হইলে তদ্রূপ করিতে পারিতেন না।" তিনি ঠাকুরের সম্বন্ধে আরো যে দুই একটি অলৌকিক ঘটনা সেদিন হরিপদকে বলেন সেগুলি তৎপ্রণীত 'শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন বৃত্তান্ত' পুস্তকে প্রকাশিত। কিছুদিন পরে রামবাবু উক্ত গ্রন্থের কয়েকখানি হরিপদ প্রভৃতিকে দিয়াছিলেন; সেগুলি তাঁহারা পরমাগ্রহে পড়িয়াছিলেন। সান্ধ্য অন্ধকার ঘনাইয়া আসিলে সমাধি-মন্দিরে আরাত্রিকাদি হইল। তদন্তে রামবাবু কলিকাতায় শিমুলিয়া পল্লীতে মধু রায়ের লেনস্থ স্বীয় বাসভবনে ফিরিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তাঁহার অনুরোধে হরিপদ তাঁহার গাড়ীতে উঠিলেন এবং ঠন্‌ঠনিয়াতে নামিয়া গেলেন। ইহার পাঁচ ছয় দিন পরেই তিরোভাব উৎসব ছিল। রামবাবু উক্ত উৎসবে যোগদান করিবার জন্য হরিপদকে নিমন্ত্রণ করিলেন। হরিপদ তাঁহার বন্ধুগণকে উক্ত উৎসবে আনিতে পারেন কিনা জিজ্ঞাসা করায় রামবাবু যারপরনাই আন্তরিকতার সহিত সকলকে আনিতে বলিলেন। হরিপদ রামবাবুর সৌজন্যে ও স্নেহে মুগ্ধ হইয়া বাড়ী ফিরিয়াই ধর্মবন্ধুগণকে এই শুভ সংবাদ দিলেন।

হরিপদর কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে যাইবার কথা তাঁহারা কেহ জানিতেন না। তাঁহারা সকলে উৎসুক হইয়া খগেনের বাড়ীতে অনুপস্থিত বন্ধুর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। রামবাবুর সহিত কথোপকথন এবং ঠাকুরের সমাধি-মন্দির দর্শনাদির কথা শুনিয়া সকলেই এত আনন্দিত হইলেন যে, সারারাত্রি এই প্রসঙ্গেই কাটিয়া গেল। মাঝে মাঝে রাস্তায় বাহির হইয়া তাঁহারা পায়চারী করিলেন, কিন্তু সর্বদা একই প্রসঙ্গ চলিয়াছিল। তাহার পর দিন চাঁদা তুলিয়া কিছু টাকা পাওয়া গেল। উহাতে এবং পূর্বে সংগৃহীত চাউলের বিক্রয়লব্ধ অর্থে মোট ৮।১০ টাকা হইল। উহার দ্বারা কয়েকটী ভাল আম ও কিছু মিষ্টান্ন কিনিয়া সকলে মিলিয়া সন্ধ্যার সময় কাঁকুড়গাছি সমাধি-মন্দিরে গেলেন। সেবার তথায় রাম বাবু প্রভৃতি ৮।১০ জন উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা সমাগত

তরুণদিগকে দেখিয়া আনন্দিত হইলেন এবং পূর্ববৎ পরমহংসদেবের প্রসঙ্গই করিলেন। সান্ধ্য আরতির পর সংকীর্তন হইল। সেদিন বলরাম সিংহ নামক জনৈক ভক্তের ভাবাবেশ দেখা গেল। উহাই হরিপদ প্রভৃতি তরুণদের প্রথম ভাবাবেশ দর্শন।

অনেক সৎপ্রসঙ্গের পর প্রসাদাদি পাইয়া তাঁহারা রাম বাবু প্রভৃতির নিকট হইতে বিদায় লইয়া পদব্রজে কলিকাতায় ফিরিলেন। উৎসবের দিন তথায় যাইবার জন্য রাম বাবু আবার তাঁহাদিগকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিলেন। উৎসবের তিন চার দিন পূর্বে রাম বাবু পুনরায় হাঁপানী অসুখে আক্রান্ত হওয়ায় কয়েক দিবস শয্যাগত রহিলেন। সেজন্য তিনি উৎসবের দিন নগর কীর্তনে যোগদান করিতে পারিলেন না। উক্ত কীর্তনে তিনিই প্রধান নায়ক হইতেন। উৎসবের প্রায় দুই মাস পূর্ব হইতে প্রত্যহ এই সংকীর্তনের আখড়াই চলিত। তখনকার প্রসিদ্ধ খুলি গোষ্ঠ বাবাজী খোল বাজাইতেন। নগর কীর্তন সিমলা পল্লীর মধু রায়ের লেনে রাম বাবুর বাড়ী হইতে বাহির হইয়া কলেজ স্ট্রীট, সার্কুলার রোড ও মানিকতলা দিয়া কাঁকুড়গাছি যাইত। প্রায় চার পাচ মাইল পথ দিয়া নগর কীর্তন তিন চার ঘণ্টা ধরিয়া চলিত। হরিপদ প্রভৃতি তরুণগণ সংকীর্তনে অনভ্যস্ত হইলেও উহাতে যোগদান করিয়া গান গাহিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহারা ভালরূপে গান গাহিতে 'পারেন নাই বলিয়া সুগায়কগণ তাঁহাদিগকে তিরস্কার করিলেন। সমাধি-মন্দিরে কীর্তনদল উপস্থিত হইলে বহু লোক সমাগত হইল। ঠাকুর-ঘরের সম্মুখস্থ চাতালের উপর কীর্তন চলিতে লাগিল। তথায় পূর্ব বঙ্গের নব রসিক সম্প্রদায়ের ভক্ত নৃত্যগোপালের ভাবাশ্রিত নৃত্য দেখিয়া সকলে মুগ্ধ হইলেন। নৃত্যগোপাল উন্মত্তবৎ ঊর্ধবাহু হইয়া চাতালের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত দ্রুত পদ বিক্ষেপে নাচিতে লাগিলেন এবং অনেককে আলিঙ্গনও করিলেন। হরিপদর দুই তিন জন বন্ধুও সেদিন তাঁহার প্রেমালিঙ্গন লাভ করিয়া ধন্য হইলেন। নৃত্যগোপাল শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দক্ষিণেশ্বরে বহুবার দর্শন করিয়াছিলেন। সংকীর্তনে আরো অনেকের ভাবাবেশ হইয়াছিল। উহা শেষ হইবার পর

ভোগ ও আরতি হইল। সমবেত প্রায় সহস্রাধিক নরনারী প্রসাদ পাইলেন। ভুনি খিচুড়ি, আলুর দম, বেগুন ও পাঁপড় ভাজা, মালপো, দই ও জিলিপী ইত্যাদি প্রসাদ বিতরিত হইল। জনৈক ভক্ত শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের (আসনে উপবিষ্ট সমাধিস্থ) লিথোগ্রাফ ছবি বিনামূল্যে তথায় বিতরণ করিয়াছিলেন। হরিপদ এই সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন, "ঐ দিনের মত আনন্দ জীবনে পূর্বে কখনো অনুভব করি নাই। ঐ আনন্দ-স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে আমরা দল বাঁধিয়া সন্ধ্যার সময় পদব্রজে বাড়ী ফিরিলাম।"

রিপন কলেজের অধ্যাপক মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রিয় শিষ্য শুনিয়া তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিবার জন্য হরিপদর ইচ্ছা হইল। একদিন কলেজে টিফিনের ছুটীর সময় হরিপদ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা উত্থাপন করা মাত্র তিনি শ্রদ্ধাভরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাকে কাঁকুড়গাছি উৎসবের কথা বলা হইল। তিনি কেন উৎসবে যান নাই, জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন, "শ্রীরামকৃষ্ণদেবের তিরোভাব নাই। তিনি সর্বদা বিরাজমান।" মহেন্দ্র বাবু হরিপদ ও তাঁহার বন্ধুগণকে বরাহনগর মঠে পরমহংসদেবের সন্ন্যাসী শিষ্যগণের নিকট যাইতে বলিলেন। তিনি এই প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, "ঠাকুরের সন্ন্যাসী শিষ্যগণ কামকাঞ্চন ত্যাগী। রাম বাবু প্রমুখ গৃহী ভক্তদের তুলনায় সন্ন্যাসী শিষ্যগণ জাতে আম—ফজলী, ল্যাংড়া; কিন্তু এখনো পাকে নাই। গৃহী শিষ্যগণ টোকো আম, কিন্তু পেকেছে। তোমরা তাঁদের দর্শন ও সেবা করে ধন্য হও।" অতঃপর হরিপদ প্রমুখ চার পাঁচ জন ধর্মবন্ধু মিলিয়া একদিন বৈকালে বরাহনগর মঠে গেলেন। তথায় স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের সহিত সর্বপ্রথম তাঁহাদের দেখা হইল। তাঁহারা কলেজে পড়েন শুনিয়া তিনি পড়াশুনা সম্বন্ধে দুই একটি প্রশ্ন করিবার পর তাঁহাদিগকে বলিলেন, "ঠাকুর বিদ্যার্থীদের খুব পড়াশুনা করিতে উৎসাহ দিতেন। তাঁর উপদেশ ছিল, লেখাপড়ায় বুদ্ধি-শুদ্ধি হয়।"

বেলা চারটার সময় মঠের ঠাকুর-ঘর খোলা হইলে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ তাঁহাদিগকে তথায় লইয়া যাইয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিতে বলিলেন। আর

একজন সন্ন্যাসী তাঁহাদিগকে একটী প্রসাদী ফুল দিলেন। তাঁহারা সেই ফুলটি মস্তকে রাখিয়া চাদরের খুঁটে বাঁধিয়া লইলেন। ঠাকুরের বৈকালিক ভোগ নিবেদিত হইবার পর তাঁহাদিগকে প্রসাদ দেওয়া হইল। প্রসাদ গ্রহণান্তে তাঁহারা হাতমুখ ধুইয়া ঠাকুরের শিষ্যগণের কাছে আসিয়া সশ্রদ্ধ চিত্তে বসিলেন। বরাহনগর মঠ একটি পুরাতন অর্ধভগ্ন দ্বিতল গৃহে অবস্থিত ছিল। উহার দোতলায় ঠাকুর-ঘর। অনেকে গৃহটিকে ভুতুড়ে বাড়ী বলিয়া বিশ্বাস করিতেন এবং ইহাতে প্রায়ই বিষাক্ত সাপ দেখা যাইত। সন্ন্যাসিগণ ইহা সত্ত্বেও তথায় থাকিয়া তপস্যা করিতেন। সেদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত সাধুসঙ্গ লাভ করিয়া তরুণগণ কলিকাতায় ফিরিলেন। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ তাঁহাদিগকে পুনরায় মঠে আসিতে এবং সুবিধামত মাষ্টার মহাশয়ের মুখে ঠাকুরের কথা শুনিতে পরামর্শ দিলেন।

সেই সময় মাষ্টার মহাশয় প্রায় প্রত্যেক শনিবার মঠে যাইয়া রবিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত থাকিতেন এবং ছুটির সময়েও অনেকদিন মঠে কাটাইতেন। তখন তাঁহার বাসা ছিল কলুটোলায় এবং সেই বাড়ীতেই হরিপদ প্রভৃতি তরুণগণ প্রায়ই যাইতেন। তাঁহারা বরাহনগর মঠেও নিয়মিতভাবে যাতায়াত করিতেন। একবার চৈত্র-সংক্রান্তির দিন হরিপদ বরাহনগর মঠে গিয়াছেন। স্বামী ত্রিগুণাতীত তাঁহাকে বলিলেন, "ওহে হরিপদ, আমি গ্রামে ভিক্ষা করতে যাব। তুমি আমার সঙ্গে যাবে?" হরিপদ সানন্দে সম্মতি জানাইলেন। সিঁড়ি দিয়া নামিবার সময় সারদা মহারাজ স্বহস্তস্থিত একখানি গেরুয়া কাপড় হরিপদকে পরিতে এবং তৎপরিহিত সাদা ধুতিখানি পুঁটলী পাকাইয়া মঠের এক কোণে রাখিতে বলিলেন। হরিপদ অবিলম্বে তাঁহার আদেশ পালন করিলেন। সেদিন হরিপদকে গেরুয়া কাপড় পরিতে আর কোন সন্ন্যাসী দেখেন নাই। উভয়ে সিঁথীর দিকে যাইয়া পাঁচ সাত বাড়ীতে ভিক্ষা করিলেন। প্রত্যেক গৃহদ্বারে যাইয়া তাঁহারা 'জয় রাধেকৃষ্ণ' বলিয়া দাঁড়াইলেন এবং ভিক্ষা লইলেন। মঠে ফিরিবার সময় তাঁহারা বরাহনগরের ৺সর্বমঙ্গলা দেবী দর্শন করিয়া আসিলেন। হরিপদ মঠবাড়ীর সিঁড়ির নিম্নে গেরুয়া কাপড় খানি

ছাড়িয়া আবার সাদা ধুতি পরিলেন। তৎপরে দুইজনেই দোতলায় উঠিয়া শশী মহারাজ প্রভৃতিকে ভিক্ষার কথা বলিলেন এবং ঝুলি হইতে চাউলাদি বাহির করিলেন। উক্ত ভিক্ষালব্ধ চাউল রান্না করিয়া সেদিন ঠাকুরকে ভোগ দেওয়া হইল।

হরিপদ যখন বরাহনগর বাজারের পার্শ্ববর্ত্তী রাস্তা দিয়া সিঁথীর দিকে ভিক্ষা করিতে যাইতেছিলেন তখন কলিকাতায় তাঁহার প্রতিবেশী মৃত্যুঞ্জয় মুখোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ জামাতা রামলাল চট্টোপাধ্যায়ের সহিত হঠাৎ দেখা হইল। উক্ত জামাতা শ্বশুর বাড়ীতে যাইতেছিলেন। গেরুয়া পরিয়া একজন সন্ন্যাসীর সহিত হরিপদকে যাইতে দেখিয়া তিনি একটু চমকিত হইলেন; কিন্তু কোন কথা বলিলেন না। শ্বশুর বাড়ীতে যাইয়া তিনি এই কথা তাঁহার শ্যালকদের নিকট ব্যক্ত করেন। তাঁহারা কালবিলম্ব না করিয়া উহা হরিপদর বাড়ীর লোকদের নিকট জানাইলেন। ইহা শুনিয়া সকলে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। যাহা হউক, সেদিন সন্ধ্যায় হরিপদ বাড়ী ফিরিবার পর এই উদ্বেগ আর কাহারো রহিল না।

সুবিধা হইলেই হরিপদ বন্ধুদের সহিত বরাহনগর মঠে যাইতেন এবং কখনো কখনো শশী মহারাজ প্রমুখ সন্ন্যাসীদের আদেশমত দুই তিন দিন মঠবাস করিতেন। বরাহনগর মঠে সমস্ত ধর্ম্মমত সম্মানিত হইত। বিশেষতঃ বড়দিনের সময় বাইবেল হইতে মহাপুরুষ জীশুর জন্মবৃত্তান্ত পাঠ, পিষ্টক উৎসর্গ এবং মাতা মেরী ও দ্বাদশ জন শিষ্যের গুণকীর্তনাদি হইত। ফাল্গুনী শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে অষ্টপ্রহরব্যাপী পূজার নিয়ম ছিল। দিবাভাগে দশাবতার ও দশমহাবিদ্যার পূজা এবং ব্রাহ্ম মুহূর্তে হোমান্তে পূজা শেষ হইত। উহার পরবর্তী রবিবারে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে সাধারণ উৎসব হইত। ১৮৯০ খ্রীঃ হইতে ১৮৯৭ খ্রীঃ পর্যন্ত আট বৎসর বরাহনগর ও আলমবাজার মঠে তিথিপূজায় এবং দক্ষিণেশ্বরে সাধারণ উৎসবে হরিপদ প্রভৃতি তরুণগণ প্রতি বৎসর যোগ দিতেন। দক্ষিণেশ্বরের উৎসবে প্রথমে দুই তিন হাজার হইতে পরে এক লক্ষ পর্যন্ত লোক-সমাগম তাঁহারা দেখিয়াছেন।

বরাহনগর মঠে কালীপূজা, রথযাত্রা, দোলযাত্রা, বড়দিন প্রভৃতি পর্বে এবং ঠাকুরের তিথিপূজার দিন বহু ভক্ত আসিতেন। প্রত্যেক উৎসবে বৈঠকী গান, কীর্তন ও আলোচনাদি খুব হইত। যখন সকলে দাঁড়াইয়া নৃত্য করিতে করিতে কীর্তন গাহিতেন' তখন বাস্তবিকই পুরাতন বাড়ীটি কাঁপিত। একদিন সান্ধ্য আরত্রিকের পর সতীশচন্দ্র ঘোষ 'হর হর, ব্যোম্ ব্যোম' বলিয়া তাণ্ডব নৃত্য করিয়াছিলেন। সেই সময় বাড়ীটি এত কাঁপিয়াছিল যে, কাহারো কাহারো ভয় হইয়াছিল, পাছে বাড়ীটি ভাঙ্গিয়া পড়ে। সতীশচন্দ্র স্থূলকায়, দীর্ঘাকৃতি, সরল ও ভাবুক লোক ছিলেন এবং নৃত্যকালে মত্তপ্রায় হইতেন।

একবার কলেজ কামাই করিয়া হরিপদ দুই তিন দিন বরাহনগর মঠে ছিলেন। শশী মহারাজ ইহা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে খুব ধমকাইলেন এবং তৎক্ষণাৎ বাড়ী ফিরিয়া পড়াশুনায় মনোযোগ দিতে বলিলেন। তাঁহার ধমক খাইয়া হরিপদ এত কাঁদিয়াছিলেন যে, তাহা দেখিয়া শশী মহারাজ সেদিনটা তাঁহাকে মঠে থাকিতে অনুমতি দিলেন। তখন বেলা ১০টা কি ১১টা হইবে। ইহার ঘণ্টাখানেক পরেই হরিপদর পিতা পুত্রসন্ধানে মঠে আসিয়া উপস্থিত হন। শশী মহারাজ প্রভৃতি তাঁহাকে যথোচিত আদরযত্ন করিলেন। হরিপদর পিতা বয়সে তাঁহাদের অপেক্ষা বড় হইলেও তাঁহাদের আসনের পাশে বসিয়া অনেক ধর্ম-বিষয়ক প্রশ্ন করিলেন। শশী মহারাজ তাঁহাকে স্নানাদি করিয়া মঠে ভোজন করিতে অনুরোধ জানাইলেন। সেদিন ছিল একাদশী। একাদশীর দিন তিনি অন্নভোজন করিতেন না এবং অনাহারী থাকিতেন। তিনি পরগোত্র-পক্ক অন্ন গ্রহণ করিতেন না এবং নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ ছিলেন। বরাহনগর মঠের সন্নিকটেই ভাগীরথী প্রবাহিতা। বয়স্থ ব্রাহ্মণ গঙ্গাস্নান করিতে যাইয়া ঘাটে মহেন্দ্রনাথ গুপ্তকে দেখিতে পাইলেন এবং তাঁহার সহিত অনেক কথাবার্তা বলিলেন। মহেন্দ্রবাবু কথায় কথায় তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "মঠের সন্ন্যাসীরা গিরেবাজ পায়রার ন্যায়। ইহারা অনেক উপরে উড়িয়া অন্যান্য পায়রা আকর্ষণ পূর্বক নিজেদের দলে আনে।" ব্রাহ্মণ সম্ভবতঃ,উক্ত বাক্যের বাচ্যার্থই বুঝিয়াছিলেন, লক্ষ্যার্থ ধরিতে পারেন নাই। স্নানান্তে মঠে ফিরিয়া তিনি সামান্য

ফলমিষ্টি প্রসাদ খাইয়া কলিকাতায় গেলেন। হরিপদ পিতার সঙ্গে না যাইয়া সেদিন সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরিলেন। তাঁহার পিতা শশী মহারাজ প্রভৃতি যুবক সন্ন্যাসীদের বাক্যে ও ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। ইহার পর তিনি একবার দক্ষিণেশ্বরের উৎসবেও গিয়াছিলেন এবং পুত্রের নিকট তাঁহাদের সংবাদ লইতেন।

এই সময়ে আহিরীটোলা হইতে হরিপদর ন্যায় অনেকগুলি তরুণও বরাহ-নগর মঠে প্রায়ই যাইতেন। তাঁহাদের মধ্যে কানাই, নন্দলাল ও নিবারণ প্রধান ছিলেন। কানাই খুব শ্রমসহিষ্ণু ও বলিষ্ঠ ছিলেন। ১৮৯২-৯৩ খ্রীঃ মঠ যখন বরাহনগর হইতে আলমবাজারে উঠিয়া যায় তখন আবশ্যকীয় সমস্ত জিনিষ নূতন বাড়ীতে লইয়া যাওয়া হয়।

কাপড় শুকাইবার জন্য প্রায় ত্রিশ হাত লম্বা একখানি বাঁশ ছিল বরাহনগর মঠে। লইবার অসুবিধা বোধে সেটী ফেলিয়া যাইবার কথা উঠায় কানাই অনুনয়পূর্বক বলিলেন যে, তিনি উহা কাঁধে করিয়া আলমবাজার মঠে লইয়া যাইবেন। কারণ সেখানেও উহা কাজে লাগিবে। আলমবাজার মঠ বরাহনগর মঠ হইতে প্রায় আড়াই মাইল দূরে অবস্থিত ছিল। কানাই সেই লম্বা বাঁশটী কাঁধে লইয়া বরাহনগর বাজারের মধ্য দিয়া আলমবাজার মঠে উপস্থিত হইলেন। তিনি পরে স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণপূর্বক স্বামী নির্ভয়ানন্দ নামে অভিহিত হন। নিবারণ জাতিতে সুবর্ণ বণিক ছিলেন। স্বামীজি আমেরিকা হইতে ফিরিয়া যে কয়েকজন ব্রাহ্মণেতর যুবককে উপবীত দিয়াছিলেন নিবারণ তাঁহাদের অন্যতম। সকলে তাঁহাকে 'বারণ ঠাকুর' বলিয়া ডাকিতেন। 'বারণ ঠাকুর' উপবীতটীর বেশ যত্ন লইতেন এবং আহিরীটোলা গঙ্গাঘাটে স্নান করিবার সময় পাড়ার ব্রাহ্মণদিগকে দেখাইয়া উহা তাঁহাদের মত মাজিয়া গলায় পরিতেন। ইহা দেখিয়া ব্রাহ্মণগণও রুষ্ট হইয়া তাঁহাকে উপহাস করিতে ছাড়িতেন না।

বরাহনগর মঠে যাইবার সময়েও হরিপদরা মধ্যে মধ্যে কাঁকুড়গাছি 'যোগোদ্যানে' যাইতেন। ১৮৯০ খ্রীঃ ঠাকুরের তিরোভাব উৎসবের পূর্বে যেদিন

তাঁহারা সকলে মিলিয়া কাঁকুড়গাছিতে গিয়াছিলেন সেদিনটীতে প্রতি বৎসর তাঁহারা একটী ছোটখাটো ভাণ্ডারা দিতেন। ঠাকুরের সন্ন্যাসী শিষ্যগণ কাঁকুড়গাছিতে বেশী যাইতেন না। রামবাবু হরিপদ প্রভৃতিকে বলিয়াছিলেন, "একটী ভাব আশ্রয় করিয়া তাহাতে দৃঢ় হওয়া দরকার। নানা ভাবে মন দিলে ফলে কোনটাতে চিত্ত স্থির হয় না এবং ধর্মজীবনের উন্নতি ঘটে না।" এই কথাটী বুঝাইবার জন্য তিনি রামকৃষ্ণদেবের কূপখননকারীর গল্পটী বলিয়াছিলেন। রামবাবুর মুখে হরিপদরা অনেকবার এই গানটী শুনিয়াছিলেন—

"নাথ তুমি সর্বস্ব আমার, প্রাণাধার সারাৎসার।

(নাহি) তোমা বিনে ত্রিভুবনে কেহ নাই আপনার বলিবার॥ ইত্যাদি।

হরিপদরা স্পষ্ট ভাবে বুঝিয়াছিলেন, রামবাবু শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে সাক্ষাৎ পরম পুরুষ জ্ঞানে জীবন-দেবতারূপে ভক্তি করিতেন। তাই তাঁহারা রামবাবুর কাছে মাঝে মাঝে যাইতেন। রামবাবু ঠাকুরকে বকল্‌মা দিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে মুক্তিদাতাজ্ঞানে পূজা করিতেন। তিনি হরিপদ প্রভৃতিকে বলিয়া ছিলেন, "ঠাকুরকে যারা দর্শনমাত্র করেছে তারাও ধন্য।" ইহাতে হরিপদ ধৃষ্টতা সহকারে বলিয়াছিলেন, "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে অনেক মাঝি-মাল্লাও দেখিয়াছে। তাহাদের কি হইয়াছে?" ইহা শুনিয়া রামবাবু ব্যথিত হইয়া বলিলেন, "পাষণ্ড! তুই, রামকৃষ্ণদেবের দ্বারে ভিক্ষুক, আর এই সব কথা বল্‌ছিস্? নিশ্চয় জানিস্, যে যে মাঝি-মাল্লা সুকৃতিবশতঃ তাঁর শ্রীমূর্তি দর্শন করেছে তারা তোর চেয়ে অনেক বেশী ভাগ্যবান্।" ইহা শুনিয়া হরিপদ রামবাবুর পায়ে পড়িয়া ক্ষমা চাহিলেন এবং অনেক পরে বুঝিলেন, রামবাবুর কথা অতি সত্য।

একদা কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে পূজারী ব্রাহ্মণের অভাব হওয়ায় রামবাবু হরিপদকে ৩।৪ দিনের জন্য ঠাকুরের পূজা করিতে আদেশ দেন। তখন বর্ষাকাল, প্রত্যহ খুব বৃষ্টি হইত। সান্ধ্য আরতি ও ভোগাদির পর হরিপদ নারিকেলডাঙ্গায় কালীকৃষ্ণদের বাড়ীতে আসিয়া রাত্রি কাটাইতেন এবং প্রত্যুষে উঠিয়া আবার যোগোদ্যানে যাইতেন। কালীকৃষ্ণদের বাড়ী হইতে যোগোদ্যান

প্রায় দুই মাইল পথ। বর্ষাবশতঃ গলিটি জলে ডুবিয়া থাকিত। সেই জন্য রাত্রিতে বা প্রত্যুষে আসিতে হরিপদ অশেষ অসুবিধা ভোগ করিতেন। একটী স্থানীয় ঝি যোগোগ্যানে আসিয়া বাসন-মাজা, রান্না-ঘর ধোয়া ও মসলা বাটা প্রভৃতি কাজ করিয়া দিত। ফুল তোলা, ভোগ রান্না ও ঠাকুর পূজা এবং ঠাকুর-ঘর ধোয়া প্রভৃতি কাজ হরিপদ নিজেই করিতেন। খগেন, সুধীর, কালীকৃষ্ণ প্রভৃতি সময় পাইলেই কয়েক ঘণ্টার জন্য যোগোগ্যানে যাইয়া হরিপদের সহকর্মী হইতেন। এক দিন তরকারীতে এত কাঁচা লঙ্কা দেওয়া হয় যে, সুধীর খাইবার সময় প্রত্যেক গ্রাসে ঢেকুর তুলিয়াছিলেন। কথক ঠাকুর ওরফে শিরোমণি মহাশয়ের নিকট হরিপদ ঠাকুর-সেবার পদ্ধতি শিখিয়া ছিলেন। মনোমত পূজার অভাবে ঠাকুর-সেবার ত্রুটি হইতেছে দেখিয়া রাম বাবু স্বয়ং যোগোগ্যানে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। তখন হইতে তিনি নিজেই প্রত্যহ ঠাকুরের পূজা করিতেন এবং একটী বেতন-ভোগী ব্রাহ্মণ ভোগরান্না করিয়া দিত। ব্রাহ্মণটীর নাম কৃত্তিবাস। সে পরে ঠাকুরের পরম ভক্ত হইয়াছিল। সকালে পূজাদির পর প্রসাদ পাইয়া রামবাবু কলিকাতায় কর্ম্মস্থলে যাইতেন এবং সন্ধ্যার পূর্বে আবার বাগানে ফিরিয়া আরাত্রিকাদি করিতেন। তখন দুই চারিটি শিষ্যও তাঁহার যথেষ্ট সহায়তা করিতেন। প্রত্যহ কলিকাতায় যাতায়াতের সুবিধার জন্য রামবাবু তখন একটী ঘোড়া-গাড়ী কিনিয়াছিলেন। তখন যোগোগ্যানের বিশেষ পরিবর্তন ও সংস্কার সাধিত হয় এবং উহাতে যাইবার গলিটিরও মেরামত করা হয়। সেই সময় রামবাবুর পিতার মৃত্যু হয়। পিতৃশ্রাদ্ধ দিবসে তাঁহার বাড়ীতে যাইয়া হরিপদ প্রভৃতি তরুণগণ পরিবেশনাদি করিয়াছিলেন।

ক্রমে হরিপদদের দলটী বাড়ীতে লাগিল। রামবাবুর প্রধান শিষ্যদের মধ্যে একজন প্রথমে তাঁহাদের সঙ্গেই মিশিয়া ছিলেন। তাঁহার নাম সুরেশ। তিনি প্রথমে রামবাবু এবং পরে স্বামী বিবেকানন্দের নিকট সন্ন্যাস লইয়া স্বামী যোগেশ্বরানন্দ নামে পরিচিত হন এবং বাঙ্গালোর সহরে উলসুর পল্লীতে একটি মঠ স্থাপন করেন। এতদ্ব্যতীত মুকুল, যদুপতি, বিধুভূষণ, নারায়ণ,

অতুল, সুপ্রকাশ (ধানু), ভোলাদা (সুরেন) প্রভৃতি প্রথমে এই দলেই যোগদান করেন। পরে এই দলটী তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। অনেকে বিবাহাদি করিয়া গৃহস্থ হইলেন। তাঁহারা সুবিধামত কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে যাইতেন। খগেন, সুধীর, সুশীল, সুকুল, কালীকৃষ্ণ ও হরিপদ রামকৃষ্ণ মঠে যোগদান করিলেন। অন্যান্য কেহ কেহ রামবাবুর নিকট দীক্ষা লইয়া অধিকাংশ সময় কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে কাটাইতেন। তাঁহারা রামবাবুর জীবিত অবস্থায় বড় একটা মঠে আসিতেন না। রামবাবুর দেহত্যাগের পর তাঁহারা স্বামী বিবেকানন্দের কাছে আসিয়া যোগোদ্যান পরিচালনের পরামর্শ লইতেন এবং হরিপদ প্রভৃতিও আর যোগোদ্যানে তত যাইতেন না। রামবাবুর জীবদ্দশায় শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘ-জননী সারদাদেবী একবার যোগোদ্যানে গিয়াছিলেন। হরিপদ এই শুভ সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে দর্শন ও প্রণাম করিবার জন্য যথাসময়ে তথায় উপস্থিত হন। শ্রীশ্রীমার সঙ্গে স্বামী যোগানন্দ প্রভৃতি ৩।৪ জন সন্ন্যাসী ছিলেন। যোগোদ্যানের ঠাকুর-ঘরের পশ্চাতে যে ঘরটী আছে শ্রীশ্রীমা তথায় বিশ্রাম ও অবস্থান করেন। ইহার পূর্বে বা পরে শ্রীমা আর কখনো বোধ হয় তথায় যান নাই। রামবাবুর দেহত্যাগের অল্প পূর্বেই স্বামী বিবেকানন্দ ভারতে প্রত্যাগত হন। একদিন স্বামিজী রামবাবুকে দেখিতে গিয়াছেন। রামবাবু তখন অসুস্থতা নিবন্ধন সর্বদা শয্যাশায়ী থাকিতেন এবং অতিকষ্টে উঠিতে পারিতেন। তাঁহার ঘরে স্বামিজী উপস্থিত হইলে তিনি বিছানা হইতে ধীরে ধীরে উঠিয়া নীচে নামিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তখন স্বামিজী শ্রদ্ধাভরে রামবাবুর জুতা তাঁহার পায়ের কাছে আনিয়া ছিলেন। রামবাবু নিষেধ করা সত্ত্বেও স্বামিজী এই ভাবে তাঁহাকে গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে যাইবার পর হইতে গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ গৃহস্থ ভক্তদের সহিত হরিপদ পরিচিত হন। সুরেন্দ্রনাথ মিত্র ও বলরাম বসু ব্যতীত ঠাকুরের অন্য সকল গৃহী-ভক্তকে তিনি দেখিয়াছিলেন। গিরিশ বাবুর সহিত সাক্ষাতের দিনই হরিপদরা তাঁহাকে ঠাকুরের কথা জিজ্ঞাসা করেন। গিরিশ বাবু তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন, "শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের কৃপালাভের পূর্বে "গুরুব্রহ্মা

গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ। গুরুরেব পরব্রহ্ম” ইত্যাদি শ্লোকটী মাত্র শুনিতাম। কিন্তু তাঁহার কৃপাপ্রাপ্তির পর উহার গূঢ় অর্থ উপলব্ধি করিয়াছি।” উক্ত প্রসঙ্গে গিরিশ বাবু ঠাকুরের অদ্ভুত আকর্ষণী-শক্তির কথাও এইরূপে উল্লেখ করিলেন। একদিন গিরিশ বাবু শুনিলেন যে, শ্রীশ্রীঠাকুর রামবাবুর বাড়ীতে আসিবেন। অভিমানী গিরিশচন্দ্র ভাবিলেন, তিনি সেখানে যাইবেন কি না। এইরূপ বিচারকালে শ্যামবাজার হইতে কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটে রামবাবুর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তাটী ৩।৪ বার পায়চারি করিবার পরে তিনি সাব্যস্ত করিলেন যে, ঠাকুরের কাছে নিশ্চয়ই যাইবেন। গিরিশ বাবু বলিলেন, “সেখানে না যাইয়া থাকিতে পারিলাম না। কে যেন টানিয়া লইয়া গেল।” রামবাবুর বাড়ীতে সেবার ঠাকুরকে দর্শন ও প্রণাম করিয়া তিনি প্রাণে পরম তৃপ্তি পাইলেন।

স্বামী বোধানন্দ অন্তিম জীবনে যে স্মৃতিকথা লিখিয়াছিলেন, তাহাতে বরাহনগর মঠ ও স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ সম্বন্ধে এই সকল কথা লিখিয়াছেন, “শশী মহারাজ সর্বদাই মঠে থাকিতেন। প্রথম চারি বৎসরের মধ্যে একদিনও তিনি কলিকাতায় যান নাই। মঠের সমস্ত কার্য্য তিনি একাই করিতেন। রাঁধিবার জন্য একজন ব্রাহ্মণ ছিল, তখনও তিনি অনেক সময় নিজে ঠাকুরের জন্য একটী তরকারী রাঁধিতেন। ঠাকুর-ঘরের সমস্ত কাজ ঘড়ির কাঁটা অনুযায়ী ঠিক সময়ে তিনি করিতেন। ঠাকুর-ঘর খোলা এবং সকাল, দুপুর, বৈকাল ও সন্ধ্যায় ঠাকুর-সেবাদি তিনি যথাসময়ে সম্পন্ন করিতেন। ঠাকুর-ঘরটী দেখিলে মহাপাষণ্ডের মনেও ভক্তির উদয় হইত। গ্রীষ্মকালে অত্যন্ত গরমের দিনে বৈকালে ও রাত্রে তিনি একখানি বড় তালপাতার পাখা লইয়া ঠাকুরের শয্যার উপর দুই তিন ঘণ্টা অবিশ্রাম বাতাস করিতেন। শশী মহারাজের ঠাকুরসেবা দেখিলে মনে হইত, ঠাকুর যেন সশরীরে তাঁহার সমক্ষে সর্বদা বিরাজমান হইয়া তাঁহার সেবা গ্রহণ করিতেছেন। বাবুরাম মহারাজ, মহাপুরুষজী, শরৎ মহারাজ, যোগেন মহারাজ, খোকা মহারাজ প্রভৃতি মঠে থাকিলে শশী মহারাজকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতেন। কিন্তু তিনি এমন

সুদক্ষ, উত্থমী ও স্বাধীন সাধু ছিলেন যে, কখনো কাহারো সাহায্যের আশায় বা অপেক্ষায় থাকিতেন না। এমন কি, প্রয়োজন হইলে তিনি তামাক সাজিয়া অন্যান্য গুরু-ভ্রাতাকে সশ্রদ্ধভাবে খাওয়াইতেন। কিন্তু তিনি নিজে কখনো ধূম্রপান করিতেন না। আমরা মঠে যাওয়া আরম্ভ করিলে কখনো কখনো আমাদিগকে ঠাকুর-ঘরের একটু-আধটু কাজ করিতে আদেশ দিতেন। উহার জন্য আমরা নিজেদিগকে কৃতার্থ মনে করিতাম। কুঠিঘাটার হরিদাস বড়াল নামক একটী ছাত্র শশী মহারাজের খুব প্রিয় ছিল। সে প্রত্যহ স্কুলের ছুটীর পর আসিয়া আরাত্রিক পর্য্যন্ত থাকিয়া মঠের অনেক কাজ করিয়া দিত। বরাহনগর মঠে থাকিবার সময় শশী মহারাজ একদিন গঙ্গার ধারে বেড়াইতে বেড়াইতে মঠে না ফিরিয়া প্রব্রজ্যা করিবার জন্য চলিয়া যান। তিনি বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত হাঁটিয়া গিয়াছিলেন। সেখানে যাইবার পর তাঁহার ম্যালেরিয়া হয়। সেইজন্য আর বেশী দূর যাইতে না পারিয়া মঠে ফিরিয়া আসেন। সর্বসমেত প্রায় দুই সপ্তাহ তিনি মঠের বাহিরে ছিলেন। এই ঘটনাটী বরাহনগর মঠ আলমবাজারে উঠিয়া যাইবার কিছু পূর্বেই ঘটিয়াছিল।”

প্রথম দুই তিন বৎসরের মধ্যে হরিপদ স্বামী বিবেকানন্দ, ব্রহ্মানন্দ ও তুরীয়ানন্দ ব্যতীত ঠাকুরের অন্য সব সন্ন্যাসী শিষ্যকে দেখিয়া ধন্য হন। স্বামিজী যখন ১৮৯৭ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী মাসে পাশ্চাত্য হইতে কলিকাতায় আসেন তখনই হরিপদ তাঁহাকে প্রথম দর্শন করেন। হরিপদ তাঁহাকে দর্শনের পূর্বেই লক্ষ্য করিয়াছিলেন, স্বামিজীর প্রতি তৎগুরুভ্রাতাগণের আন্তরিক প্রীতি ও গভীর শ্রদ্ধা ছিল এবং সকলেই তাঁহার গুণবর্ণনাকালে গদ্‌গদ হইতেন। শশী মহারাজ, বাবুরাম মহারাজ, মহাপুরুষজী ও নিরঞ্জন মহারাজ তাঁহাদিগকে বলিতেন, “নরেন মঠে ফিরিলে তোমাদের সন্ন্যাস হইবে।”

হরিপদরা যখন কাঁকুড়গাছি যোগাত্মানে এবং বরাহনগর মঠে যাইয়া ঠাকুরের শিষ্যদের সহিত মিশিতেন তখন তাঁহাদের অনুরাগের আতিশয্য দেখিয়া পল্লীর কেহ কেহ তাঁহাদিগকে ‘রামক্রীশ্চান’ বলিয়া ঠাট্টা করিতেন। কিন্তু দুই চারি বৎসরের মধ্যেই তাঁহাদের অনেকে ঠাকুরের ভক্ত হইয়াছিলেন।

হরিপদদের বয়োজ্যেষ্ঠ আত্মীয় পড়াশুনায় তাঁহাদের অবহেলা দেখিয়া হিতোপদেশের নিম্নোক্ত শ্লোকটি আবৃত্তিপূর্বক ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন—

অজরামরবৎ প্রাজ্ঞঃ বিদ্যামর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ।
গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্মমাচরেৎ॥*

ভোলাদা এই গানটি রচনা করিয়াছিলেন—

বেণীবাবুর বাড়ীর সবে হল যে যোগী।
দুর্গাপদ প্রধান যোগী, তার চেলাটি রজনী॥
নগেন, খগেন, হরিপদ, কালী, মণি ইত্যাদি।

বেণীমাধব ছিলেন হরিপদর কাকা। সুযোগ পাইলে সহপাঠীরাও হরিপদদের লক্ষ্য করিয়া তামাসা করিতেন। একদিন একজন জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, মহেন্দ্র গুপ্তের সঙ্গে আপনাদেরও কি পরমহংস বলে?" কেহ কেহ খগেন, কালীকৃষ্ণ ও হরিপদকে 'কবি' বলিতেন। হরিপদকে বিবাহ দিবার জন্য বাড়ীর লোকেরা অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু ঠাকুরের কৃপায় তিনি বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হন নাই।

১৮৯১।৯২ খ্রীঃ হরিপদ প্রমুখ কয়েকজন শ্রীশ্রীসারদা দেবীর দর্শন লাভ করেন। খগেন, সুশীল, ভোলাদা এবং হরিপদ একত্রে জয়রামবাটীতে যাইয়া মাতৃদর্শনের জন্য প্রস্তুত হন। কিন্তু হরিপদ হঠাৎ জলবসন্তে আক্রান্ত হওয়ায় তাঁহাদিগের সহিত যাইতে অসমর্থ হন। তাঁহারা জয়রামবাটী হইতে প্রত্যাগত হইবার পর তাঁহাদের মুখে শ্রীমার অপার্থিব স্নেহ-করুণার কথা শুনিয়া হরিপদ তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য ব্যাকুল হইলেন। এই সময়ে তিনি শুনিলেন, স্বামী নিরঞ্জনানন্দ গিরিশ বাবুকে লইয়া জয়রামবাটীতে যাইবার আয়োজন করিতেছেন। হরিপদ তাঁহাদের সঙ্গে যাইবার কথা বলা মাত্র নিরঞ্জন মহারাজ সস্নেহে তাহা অনুমোদন করিলেন এবং তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে চাহিলেন।

---

* অনুবাদ—নিজেকে অজর অমর ভাবিয়া বুদ্ধিমান্ বিদ্যা ও অর্থলাভের চেষ্টা করিবেন। কিন্তু ধর্মাচরণের সময় প্রত্যেকের ভাবা উচিত, যম যেন কেশ ধরিয়া টানিতেছে।

নিরঞ্জন স্বামীর উক্ত অনুগ্রহ হরিপদ সারা জীবন ভুলিতে পারেন নাই। যাইবার পথে ও জয়রামবাটীতে থাকিবার সময়ে নিরঞ্জন মহারাজ তাঁহাকে অতিশয় আদর-যত্ন করিয়াছিলেন। যাত্রার পূর্বদিন গিরীশবাবুর বাড়ীতে নিরঞ্জন মহারাজের সঙ্গে হরিপদর যাত্রার সব কথা স্থির হইল এবং পরদিন প্রত্যুষে সকলে গিরিশবাবুর বাড়ী হইতেই যাত্রা করিলেন।

স্বামী নিরঞ্জনানন্দ ও গিরীশবাবু ব্যতীত উক্ত দলে স্বামী সুবোধানন্দ, কালীকৃষ্ণ ও কানাই ছিলেন। শ্রীশ্রীমায়ের সুবিধার জন্য গিরিশ বাবু একটি পাচক ব্রাহ্মণ ও একটি চাকর সঙ্গে লইলেন। ৮।৯ টার সময় চা ও জলখাবার খাইয়া সকলে গিরীশ বাবুর বাড়ী হইতে যাত্রা করিলেন এবং আধ ঘণ্টা পরে হাওড়া স্টেশনে উপস্থিত হইলেন। সেখান হইতে ট্রেণে উঠিয়া প্রায় ১২টার সময় বর্ধমানে পৌছিলেন। তথায় কোন চটিতে আশ্রয় লইয়া ভাত, মাছের ঝোল, ডাল, তরকারী ও দুধ সহযোগে মধ্যাহ্ন ভোজন করিলেন। তখন গ্রীষ্মকাল। আহারান্তে বিশ্রামের পর কেহ কেহ চা খাইলেন। গিরীশ বাবুর দুই বেলা চা পানের অভ্যাস ছিল। তিনি হরিপদ প্রভৃতিকে চা খাইতে বলিলেন। সন্ধ্যার প্রাক্কালে পাঁচখানি গরুর গাড়ী ভাড়া করিয়া, তাহাতে চড়িয়া সকলে বর্ধমান হইতে রওনা হইলেন। একখানি গাড়ীতে স্বামী নিরঞ্জনানন্দ, আর একখানি গাড়ীতে গিরীশ বাবু এবং বাকী তিনখানি গাড়ীতে হরিপদ প্রভৃতি ছয়জন চড়িলেন। বর্ধমান হইতে এক হাঁড়ি লুচি এবং তদুপযোগী আলু ভাজা, হালুয়া ও মতিচুর লওয়া হইল পথে খাইবার জন্য। কামারপুকুরে রামলাল দাদা প্রভৃতির জন্য এবং জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমা ও মামাদের জন্য দুই তিন হাঁড়ি ভাল মিষ্টান্ন আলাদা কেনা হইল। সেই হাঁড়িগুলি নিরঞ্জন মহারাজের গাড়ীতে ছিল।

বর্ধমান হইতে দামোদর নদী দুই তিন মাইল দূরে। তখন উহা শুষ্কপ্রায় এবং উহার দুই এক স্থানে খুব সংকীর্ণ জলস্রোত ছিল। সেই স্রোত প্রায় এক হাত গভীর এবং দুই তিন হাত চওড়া। কিন্তু উহার জল সুশীতল ও উপাদেয়। দামোদর নদী পার হইয়া উহার তীরে বসিয়া সকলে পূর্বোক্ত লুচি,

আলু ভাজা, হালুয়া ইত্যাদি সহকারে সান্ধ্য ভোজন করিলেন। রাত্রি আন্দাজ ১০টার সময় আবার সকলে গাড়ীতে উঠিয়া গন্তব্য স্থানাভিমুখে যাত্রা করিলেন। দুই তিন ঘণ্টা যাত্রার পর গরুর গাড়ীর ঝাঁকানিতে গিরীশবাবুর পেটটা নাড়াচাড়া পাওয়ায় তাঁহার দুই তিন বার পাতলা দাস্ত হইল। তখন তাঁহারা বিস্তীর্ণ মাঠের মধ্যে। সমীপস্থ গ্রামও প্রায় চার মাইল দূরে। সকলেই অতিশয় উদ্বিগ্ন হইলেন। নিরঞ্জন মহারাজের আদেশে গাড়ী হইতে গরু খুলিয়া দিয়া সকলে কথাবার্তা বন্ধ করিয়া নীরব রহিলেন। ঘণ্টা খানেকের মধ্যে গিরীশ বাবু ঘুমাইয়া পড়িলেন এবং ভোরে উঠিয়া নিজেই বলিলেন, "আমার পেট ভাল আছে।" সকালে আবার তাঁহারা গরুর গাড়ীতে উঠিলেন। পাল্কির অভাবে গিরীশবাবুকেও পূর্ববৎ গরু-গাড়ীতে যাইতে হইল। পূর্বাহ্নে ৯।১০টার সময় সকলে উচালঙ্গ নামক গ্রামে পৌছিলেন। সেখানে এক দিঘীর পারে পূর্বদিনের মত ভাতডালাদি রান্না করিয়া খাওয়া হইল। আহারান্তে বিশ্রামের পর চা খাইয়া আবার সকলে গাড়ীতে উঠিলেন। সন্ধ্যা সমাগমে এক দোকান হইতে লুচি, হালুয়া ইত্যাদি কিনিয়া নৈশ আহার করা হইল। উচালঙ্গ বর্ধমান হইতে প্রায় ষোল মাইল এবং কামারপুকুর হইতেও প্রায় ষোল মাইল দূরে। পরদিন কামারপুকুরে পৌছিয়া গাড়োয়ানদের ভাড়া মিটাইয়া দিয়া তাঁহারা গরু-গাড়ী ছাড়িয়া দিলেন।

রামলালদা ও লক্ষ্মীদিদি তখন কামারপুকুরে ছিলেন। স্নানান্তে সকলে রঘুবীরের দর্শন করিলেন। তৎপরে আহার ও বিশ্রাম হইল। সেই রাত্রি কামারপুকুরে কাটাইয়া পরদিন সকালে তাঁহারা জয়রামবাটীতে যাত্রা করিলেন। কামারপুকুর হইতে জয়রামবাটী তিন চার মাইল মেঠো পথ। গিরীশ বাবুর জন্য একটি পাল্কির ব্যবস্থা হইল। অন্যান্য সকলেই হাঁটিয়া চলিলেন এবং মুটের মাথায় জিনিস-পত্র লইলেন। বেলা ১০।১১ টার সময় সকলে জয়রাম-বাটীতে পৌছিলেন। গিরীশবাবু তালপুকুরে স্নান করিয়া একটি বড় আম হাতে ভিজা কাপড়েই শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীতে যাইয়া উঠানে মাতৃচরণে দণ্ডবৎ প্রণত হইলেন। এই দিব্য দৃশ্যটি হরিপদর স্মৃতিপটে চিরকাল জাজ্জ্বল্যমান ছিল।

জয়রামবাটিতে অবস্থানকালে হরিপদ গিরীশবাবুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার সুযোগ পাইলেন। উভয়ে এক ঘরে অবস্থান এবং একত্রে স্নানাহার ও ভ্রমণাদি করিতেন। গিরীশ বাবু নিরঞ্জন মহারাজ ব্যতীত সকলকে 'তুই' বলিয়া ডাকিতেন। প্রত্যহ সন্ধ্যায় এক মাইল দূরে ফাঁকা মাঠে যাইয়া সকলে কথাবার্তা বলিতেন। গিরীশবাবু তখন মদ খাইতেন না। কিন্তু প্রত্যহ সকালে ও সন্ধ্যায় গাঁজা টানিতেন। তাঁহার খানসামা শিউপাল গাঁজা দলিয়া প্রস্তুত করিত। সন্ধ্যার সময়ে তিনি মাঠেই গাঁজা খাইতেন। গাঁজা খাইবার পর তাঁহার মনটা খুব দরাজ হইত এবং তিনি গান গাহিতেন। কিন্তু তিনি মিষ্ট স্বর করিয়া গান গাহিতে পারিতেন না। তবে তাঁহার ভক্তিপূর্ণ সঙ্গীত শ্রোতার হৃদয় দ্রবীভূত করিত। "চমকে চপলা চমকে প্রাণ, চাহ মা চপলা-হাসিনী" এবং "মদমত্ত মাতঙ্গিনী উলঙ্গিনী নেচে ধায়" এই দুটি গান গাহিয়া তিনি হরিপদ প্রভৃতিকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন।

এতগুলি অতিথির জন্য আহারাদির বন্দোবস্ত করিতে শ্রীশ্রীমা সর্বদাই ব্যস্ত থাকিতেন। সকাল হইতে রাত্রি ১১টা পর্যন্ত তিনি বিশ্রামের সময় পাইতেন না। পাচক ও চাকর থাকা সত্ত্বেও তাঁহাকে অনেক বিষয়ে ভাবিতে ও দেখিতে হইত। পল্লীগ্রামে সকালে দুধ পাওয়া সহজ নয়। সমাগত সন্তানদের চা-পানের জন্য তিনি স্বয়ং পল্লী হইতে দুধ আনিতেন এবং চায়ের সঙ্গে মুড়ি ও সন্দেশ খাইতে দিতেন। স্নানান্তে কিছু প্রসাদ মিলিত। মধ্যাহ্ন ভোজনে আট দশটি তরকারী, দুধ, দধি ও মিষ্টান্নাদি থাকিত। বৈকালে চা ও কিছু জল-যোগের ব্যবস্থা ছিল। নৈশ আহার রুটি বা লুচি বা ভাত, বিবিধ ব্যঞ্জন, মোহন ভোগ ও ক্ষীরাদি সহযোগে সম্পন্ন হইত। প্রায় দুই সপ্তাহ মাতৃ সন্নিধানে কাটাইবার পর স্বামী সুবোধানন্দ, কালীকৃষ্ণ, কানাই ও হরিপদ কলিকাতায় ফিরিলেন। স্বামী নিরঞ্জনানন্দ ও গিরীশ বাবু আরো কিছুদিন মাতৃসদনে রহিলেন। হরিপদরা জয়রামবাটি হইতে ঘাটাল পর্যন্ত গরু-গাড়ীতে যাইয়া তথা হইতে ষ্টীমারযোগে কলিকাতায় আসিলেন।

জয়রামবাটিতে থাকিবার সময় দুই তিন দিন হরিপদ রুটি বেলিয়া দিতেন

এবং শ্রীশ্রীমা সেঁকিতেন। লজ্জাশীলা জননী হরিপদ প্রভৃতির সহিত পুত্রবৎ আচরণ করিতেন। হরিপদ পরবর্তীকালে বলিয়াছিলেন, "শ্রীশ্রীমায়ের স্নেহ অকৃত্রিম ও অমানব। উহা বর্ণনা করা অসাধ্য। যে উহার সাক্ষাৎ স্পর্শ লাভ করিয়াছে সেই উহার মহিমা জানে। জয়রামবাটিতে যে কয়দিন ছিলাম সে কয়দিন মহানন্দে কাটিয়াছিল। শ্রীশ্রীমায়ের দর্শনলাভ তাঁহার অহৈতুকী কৃপা ব্যতীত সম্ভব হয় না।" ১৯০০ খ্রীঃ মার্চ বা এপ্রিল মাসে এবং অক্টোবর বা নভেম্বর মাসে জয়রামবাটিতে যাইয়া হরিপদ আরো দুইবার শ্রীশ্রীমায়ের দর্শন লাভ করেন। জয়রামবাটিতে প্রথম ও দ্বিতীয় দর্শনের মধ্যে সাত আট বৎসর অতিবাহিত হয়। উক্ত সময়ে হরিপদ বেলুড়ের বাগানবাড়ীতে এবং বাগবাজারে বহুবার শ্রীশ্রীমায়ের দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ প্রথম দর্শনেই তিনি শ্রীশ্রীমায়ের নিকট মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন। শ্রীশ্রীমায়ের স্নেহ ও কৃপা প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার জীবন এইরূপে আধ্যাত্মিক আলোকে পরিপূর্ণ হইল।

বরাহনগর মঠে প্রথম যাইবার দুই তিন বৎসর পরে বোধ হয় ১৮৯২ খ্রীঃ মঠ আলমবাজারে উঠিয়া যায় চৈত্র সংক্রান্তির দিন। সেদিন হরিপদ উপস্থিত থাকিয়া জিনিষপত্রাদি স্থানান্তরিত করিবার কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। গৃহত্যাগ না করিলেও মনে প্রাণে হরিপদ প্রভৃতি যুবকবৃন্দ মঠের সহিত বরাহনগর হইতেই সংযুক্ত হন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ তীর্থভ্রমণ হইতে ১৮৯৫ খ্রীঃ আলমবাজার মঠে ফিরিয়া আসেন। হরিপদ সেই সময় প্রথম তাঁহাকে দর্শন করেন। তিনি হরিপদকে গা হাত পা টিপিয়া দিতে বলিতেন। হরিপদ বলিতেন, "মহারাজের গা হাত পা টিপিয়া দিবার সময় দেখিয়াছি তাঁহার দেহ ননীর মত নরম ছিল।" ১৮৯৬ খ্রীঃ শ্রীশ্রীমা বাগবাজারে গঙ্গার ধারে একটি ভাড়া-বাড়ীতে ছিলেন। উক্ত বাড়ীটি দ্বিতল ছিল। উপর তলায় মা থাকিতেন, নীচের তলায় রাখাল মহারাজ। রাখাল মহারাজ কচিৎ দোতলায় যাইতেন। শ্রীমা তাঁহার জন্য ফল-মিষ্টি হরিপদকে দিয়া বলিতেন, "রাখালকে দিয়ে এস।" ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্য ভাগে আমেরিকা যাইবার পথে স্বামী বিবেকানন্দ জাপান হইতে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে যে চিঠি লেখেন তাহা আগস্ট মাসে আলমবাজার মঠে

আসে। হরিপদ আলমবাজার মঠে এই চিঠির বিষয় অবগত হন। স্বামিজী ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে কলিকাতায় আসিলে হরিপদ যেদিন তাঁহার প্রথম দর্শন লাভ করেন সেদিন ঠাকুরের পুণ্য তিথি-পূজা দিবস। হরিপদ জগৎবল্লভপুর হাই স্কুলে শিক্ষকতা করিতেন এবং তথা হইতে ঠাকুরের জন্মোৎসব দেখিতে আসিয়াছিলেন। স্বামিজী তখন আলমবাজার মঠ হইতে দুই মাইল দূরে গোপাল শীলের বাগান-বাড়ীতে থাকিতেন। হরিপদ যখন উক্ত স্থানে উপস্থিত হন তখন স্বামিজী বিশ্রাম হইতে উঠিয়া হাত-মুখ ধুইতেছিলেন।

স্বামী শিবানন্দজী হরিপদকে স্বামিজীর সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন। স্বামিজী হরিপদকে বলিলেন, "বাবা, আমি তোমাকে সন্ন্যাসী করবো। আমার জন্য এক গ্লাস জল এনে দিতে পার?" হরিপদ সবিনয়ে সম্মতি জানাইয়া জল আনিয়া দিলেন। তখন স্বামিজী তাঁহাকে বলিলেন, "আমি মঠে যাচ্ছি হ্যারিসনকে দীক্ষা দেবার জন্য, তুমি আমার সঙ্গে যেতে পার।" হরিপদ বলিলেন, "যদি গাড়ীতে জায়গা না থাকে আমি হেঁটে যাব।" কিন্তু স্বামিজী বলিলেন, "না, তুমি গাড়ীর ছাদে বসে যেতে পার।" তিনখানি ঘোড়া-গাড়ী ভাড়া করা হইল। স্বামিজীর সঙ্গে জি. জি. কিডি এবং চক্রবর্তী ও হরিপদ গেলেন। আলমবাজার মঠে যাইয়া স্বামিজী হ্যারিসনকে দীক্ষা দিলেন এবং ঠাকুরের ভোগ নিবেদিত হইলে সকলে প্রসাদ পাইলেন।*

তৎপরে তাঁহারা স্বামিজীর সঙ্গে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে গেলেন। তথায় উৎসব উপলক্ষে বিশাল জনসমাগম হইয়াছিল। অসংখ্য লোক স্বামিজীকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। স্বামিজী দুই তিন বার চেষ্টা করিলেন কিছু বলিবার জন্য। কিন্তু জনতার গোলমালে কিছুই বলিতে পারিলেন না। তিনি আলমবাজার

* ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ মঠে স্বামী বোধানন্দ যে পূর্ব স্মৃতি বিবৃত করেন তাহা 'বেদান্ত কেশরী' নামক ইংরাজী মাসিকে উক্ত বৎসর মে, আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর সংখ্যাত্রয়ে প্রকাশিত হয়। তদবলম্বনে বর্তমান অধ্যায়ের কিয়দংশ লিখিত।

মঠে ফিরিয়া আসিলেন। ইহার পর দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের জন্মোৎসব আর হয় নাই। সেদিন হরিপদ স্বামিজীকে পাখার বাতাস করিবার সুযোগ পাইলেন। কিন্তু তিনি স্বামিজীর কাছে বেশীক্ষণ থাকিতে পারিলেন না। স্কুলের কাজের জন্য তাঁহাকে চলিয়া আসিতে হইল।

ইহার পর হরিপদ মাঝে মাঝে আসিয়া স্বামিজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। তিনি উক্ত বৎসর গ্রীষ্মাবকাশে আলমবাজার মঠে আসিয়া কিছুকাল বাস করেন। তখন স্বামিজী মঠের নিয়মাবলী লিখিতেছিলেন। এক সন্ধ্যায় তিনি শিষ্যগণকে শাঙ্কর দর্শন পড়াইতেছিলেন। তখন শশী মহারাজ মাদ্রাজে চলিয়া গিয়াছেন। তৎপরিবর্তে স্বামী প্রেমানন্দ ঠাকুরের পূজা করিতেন। সেই সন্ধ্যায় স্বামিজীকে ছাড়িয়া কেহই ঠাকুর-ঘরে আরাত্রিকের সময় গেলেন না। সেজন্য প্রেমানন্দজী স্বামিজীর নিকট অভিযোগ করিলেন। কিন্তু স্বামিজী ইহাতে বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "এই আলোচনা শুনা আরাত্রিক দেখার চেয়ে কোন অংশে কম নয়।" বাবুরাম মহারাজ একদিন অসুস্থ হওয়ায় ব্রহ্মানন্দজী ঠাকুরের পূজা করিয়াছিলেন। তাঁহার ভক্তিময় পূজা দেখিয়া হরিপদ পরম প্রীতিলাভ করেন। স্বামিজী কর্তৃক ঠাকুরের পূজা করিবার সুদৃশ্য দর্শনের সুযোগও তাঁহার একদিন হইয়াছিল। তিনি সেদিন দেখিলেন, স্বামিজী ঔপচারিক পূজার দিকে লক্ষ্য না দিয়া গভীর ধ্যানে ডুবিয়া গেলেন।

স্বামিজী একবার নিয়ম করিয়াছিলেন যে, ঠাকুর-ঘরে পালা করিয়া সারারাত্রি জপ-ধ্যান চলিবে। হরিপদকেও এই সঙ্গে নিয়মিত জপ-ধ্যান করিতে হইত। একদিন বেলা সাড়ে দশটার সময় সকলে ঠাকুর-ঘরে বসিয়া ধ্যান করিতেছেন, এমন সময় প্রেমানন্দজী আসিয়া স্বামিজীকে অনুরোধ করিলেন ঠাকুরের পূজা করিবার জন্য। স্বামিজী তদনুযায়ী পূজার আসনে বসিয়া ফুলের উপর চন্দন ছিটাইয়া দিয়া এবং বেদী, কৌটা ও পাদুকার উপর ফুল দিয়া সাজাইলেন, এবং বাকী ফুলগুলি ধ্যান-মগ্ন শিষ্যদের উপর ছড়াইয়া দিলেন। তিনি ঘণ্টা বাজাইলেন না, জল ছিটাইলেন না, বা প্রাণপ্রতিষ্ঠাও করিলেন না। হরিপদ বলেন, "স্বামিজী তাঁর শিষ্যদের মধ্যেও ঠাকুরের

অস্তিত্ব অনুভব করিতেন। সেইজন্য তিনি শিষ্যদিগকেও পূজা করিলেন। তাঁর পূজার কি মহৎ ভাব ছিল!" পূজার পর সকলে স্বামিজীকে প্রণাম করিলেন। তখন মঠের খুব কড়া নিয়ম ছিল। প্রত্যেককে ভোর চারটায় উঠিয়া জপ-ধ্যান করিতে ও গীতা পড়িতে হইত। স্বামিজী হরিপদ প্রমুখ শিষ্যদিগকে আদেশ দিয়াছিলেন, রোজ দশটি করিয়া গীতার শ্লোক মুখস্থ করিয়া তাঁহার কাছে আবৃত্তি করিতে।

উক্ত বৎসর জুন মাসে স্বামিজী আলমোড়ায় চলিয়া যান। বেলা একটার সময় তিনি কলিকাতা যাইবার পূর্বে গীতার এই শ্লোকটি শিষ্যদের নিকট ব্যাখ্যা করেন।—

"ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়-দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ॥"

স্বামিজী বলিতেন, গীতার সার তত্ত্ব এই শ্লোকে নিহিত। যখন তিনি এই শ্লোকটি ব্যাখ্যা করিতেছিলেন তখন তাঁহার মুখমণ্ডল দিব্য জ্যোতিতে ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছিল। স্বামী যোগানন্দ এবং আলাসিঙ্গা স্বামিজীর সঙ্গে আলমোড়া গেলেন। স্বামিজী আলমোড়া হইতে কাশ্মীর যাইয়া কয়েক মাস অবস্থান করেন এবং নভেম্বর মাসে মঠে ফিরিয়া আসেন। ১৮৯৮ খ্রীঃ আলমবাজার হইতে বেলুড়ে এক ভাড়া-বাটীতে মঠ উঠিয়া যায়। এই বৎসর স্কুলের শিক্ষকতা ছাড়িয়া ও সংসার ত্যাগ করিয়া হরিপদ মঠে যোগ দেন। তাঁহার গর্ভধারিণী সন্ন্যাসের অনুমতি না দেওয়ায় খুড়ীমা অর্থাৎ খগেন মহারাজের মাতার অনুমতি লইয়া তিনি সংসার ত্যাগ করেন. এই সময় স্বামী সারদানন্দ আমেরিকা হইতে ফিরিয়া আসিলেন। তিনি মঠে দুইটি ক্লাস লইতেন, একটি গীতার ও অপরটি ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যের। স্বামী নির্মলানন্দ উপনিষৎ পড়াইতেন। এই ক্লাশগুলি নিয়মিতভাবে কয়েক বৎসর চলিয়াছিল।

তখন স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মঠের নব গৃহের নির্মাণ-কার্য্য তত্ত্বাবধান করিতেন। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে মঠ স্থায়ী গৃহে আসিল। তদুপলক্ষে মঠ-প্রাঙ্গণে কয়েকদিন যাবৎ রুদ্রযাগ হইল। স্বামিজী মাথায় বরিয়া 'আত্মারামের কৌটা'

ঠাকুর-ঘরে আনিলেন। উক্ত বৎসর হরিপদ স্বামিজীর নিকট সন্ন্যাস লইয়া স্বামী বোধানন্দ নামে পরিচিত হন। মঠের ঠাকুর প্রতিষ্ঠার কার্য্যাদি দেখিবার অপূর্ব সুযোগ বোধানন্দজী লাভ করিয়াছিলেন। ১৮৯৯ খ্রীঃ স্বামিজী হরি মহারাজকে সঙ্গে লইয়া আমেরিকা যান। স্বামিজী বলিতেন, "হরি ভাই মঠের অলঙ্কার, মঠের শোভা।" তিনি ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে মঠে ফিরিয়া আসেন। যে রাত্রিতে তিনি মঠে আসিলেন সে রাত্রিতে কাহারো আর ঘুম হইল না। তিনি সকলের সহিত আমেরিকার গল্প করিয়া সারারাত কাটাইয়া দিলেন। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমেই স্বামী বোধানন্দ হরিদ্বার ও হৃষিকেশে যাইয়া কিছুকাল তপস্যা করেন। তখন কনখল সেবাশ্রম সবেমাত্র আরম্ভ হইয়াছে এবং স্বামী কল্যাণানন্দ কনখলে থাকিয়া মাধুকরী করিয়া খাইয়া রুগ্ন সাধুদের সেবা করিতেছেন।

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে স্বামিজী জাপানী মনীষী ওকাকুরার সহিত কাশীধাম ও সারনাথে গমন করেন। এই সংবাদ পাইয়া স্বামী বোধানন্দ গুরুদর্শন মানসে হরিদ্বার হইতে কাশীধামে আসেন। শিষ্যের আগমন সংবাদ পাইয়া গুরু বলিয়া পাঠাইলেন, "তাকে বল আমার কাছে সোজা আসতে। আমি তাকে ঋষিকেশের পোষাকে দেখতে চাই।" বোধানন্দজী স্বামিজীর নিকট যাইতেই স্বামিজী শিষ্যের স্বাস্থ্য ও তপস্যার কুশল-কথা জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন, "তুমি আসাতে আমি খুব খুসী হয়েছি। কোন মহারাজা কাশীতে আশ্রম স্থাপনের প্রাথমিক ব্যয়ভার বহন করতে রাজী হয়েছেন। তুমি কি উক্ত কাজের ভার নেবে?" বোধানন্দজী নম্রভাবে স্বীয় অক্ষমতা জ্ঞাপনান্তে গুরুকে জানাইলেন, "এখানে অনেক বড় বড় পণ্ডিত আছেন যাঁরা আমা অপেক্ষা ভাল ভাবে শাস্ত্র-ব্যাখ্যা করতে পারেন।" ইহা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ স্বামিজী বলিলেন, "তুমি অপরের অনুকরণ করিও না। আমি বলি, তুমি আদর্শনিষ্ঠ জীবন যাপনপূর্বক স্বাভাবিক ভাবে কাজ কর। আন্তরিক ভাবে কাজ করিলে তুমি নিশ্চয়ই সফল-কাম হইবে।"

স্বামিজী যখন কাশী হইতে বেলুড়ে ফিরিলেন তখন স্বামী বোধানন্দ তাঁহার

সঙ্গে বেলুড়ে আসিলেন। এই সময় হইতে কয়েকমাস তিনি গুরুর সেবায় ও সঙ্গে কাটাইলেন। বোধানন্দজী নিজ মুখে একবার বলিয়াছিলেন, মঠের জমাদার কিছুদিন যাবৎ না আসাতে তিনি নিজে পায়খানা পরিষ্কার করিয়া ময়লা অপর জায়গায় মাথায় করিয়া লইয়া যাইয়া প্রোথিত করিয়াছিলেন। মঠে তখন ভোরে উঠিয়া ধ্যান করিবার নিয়ম স্বামিজী করিয়াছিলেন। এক দিন বোধানন্দজী প্রভৃতি ভোরে উঠিতে পারেন নাই। স্বামিজী সকলের শাস্তি-বিধানার্থ বলিলেন, "আজ কেউ মঠে খেতে পাবে না। সকলে আজ কলিকাতা যাইয়া ভিক্ষা করিয়া খাক।" স্বামী বোধানন্দের কাকার বাড়ী ছিল কলিকাতায়। তাই স্বামিজী তাঁহাকে বিশেষ ভাবে বলিলেন, "কোন আত্মীয়ের বাড়ীতে খেও না।" কলিকাতায় স্বামী ত্রিগুণাতীতের সহিত বোধানন্দজীর দেখা হইল। স্বামী ত্রিগুণাতীত তাঁহাকে কিছু পয়সা দিতে চাহিলেন, কিন্তু বোধানন্দজী লইলেন না। সন্ধ্যায় যখন বোধানন্দজী মঠে ফিরিলেন তখন খেয়া-ঘাটে স্বামিজীর সহিত তাঁহার দেখা হইল। গুরু শিষ্যকে সেই দিনের স্বীয় অভিজ্ঞতার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

বেলুড় মঠে একদিন স্বামিজী বোধানন্দ প্রমুখ শিষ্যবর্গের সহিত গঙ্গার ধারে বেড়াইতেছিলেন। বেড়াইতে বেড়াইতে দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দির স্বামিজীর দৃষ্টিগোচর হইল। তখন তিনি শিষ্যগণকে ঠাকুরের কথা প্রমত্ত ভাবে বলিতে লাগিলেন। সাধারণতঃ তিনি কাহাকেও ঠাকুরের কথা বলিতেন না। কিন্তু সেদিন ঠাকুরের কথা বলিতে বলিতে তিনি এত ভাববিহ্বল হইয়া পড়িলেন যে, তাঁহার মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইল না। উক্ত দিন তিনি স্বয়ং স্বীয় জীবন-রহস্য প্রকাশ করিলেন যে, তিনি অন্তরে দ্বৈতবাদী ও বাহিরে অদ্বৈতবাদী এবং ঠাকুর ছিলেন তদ্বিপরীত। ইহার পরে তিনি রহস্যচ্ছলে বলিলেন, "এক নিরক্ষর ব্রাহ্মণ পুজারীর স্নেহের গোলাম হয়ে আমার অমূল্য জীবনের সকল উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আমি নষ্ট করেছি।" স্বামী বোধানন্দ বলেন, "ঠাকুরের প্রতি স্বামিজীর কি প্রগাঢ় প্রেম ছিল তাহার পরিচয় দেওয়া অসম্ভব। তিনি তাঁহাকে অবতার বলিয়া বর্ণনা করিলেন না, বা সেইভাবে

জনপ্রিয় করিবার চেষ্টা করেন নাই। তিনি বলেন, 'ঠাকুর অবতার ছিলেন কি তদপেক্ষা বড় ছিলেন তা জানি না। তাঁকে বর্ণনা করবার চেষ্টা করলেই তাঁর মহিমাকে ক্ষুণ্ণ করা হয়।"

গুরু-ভাইদের প্রতিও স্বামিজীর গভীর প্রীতি ছিল। একদিন বেলুড় মঠে গঙ্গার ধারে কলিকাতার কয়েকজন মাড়োয়ারী আসিয়া 'চড়ুই ভাতি' করিলেন তাঁহাদের সকলের সম্মুখে বিবেকানন্দ স্বামিজী রাখাল মহারাজকে নির্দেশ করিয়া বলিলেন, "ইনি আমাদের রাজা এবং আমরা তাঁর সেবক।" যেদিন রাত্রে স্বামিজী দেহরক্ষা করিলেন সেদিন স্বামিজীর শরীর এক রকম ভালই ছিল। বৈকালে তিনি বোধানন্দজী প্রভৃতি শিষ্যদিগকে পাণিনি ব্যাকরণ পড়াইয়া প্রেমানন্দজীর সঙ্গে খানিকটা বেড়াইয়া আসিলেন। তিনি যখন বেড়াইয়া ফিরিলেন তখন বোধানন্দজী প্রভৃতি সাধুগণ মঠের বারান্দায় চায়ের টেবিলের চারিদিকে বসিয়াছিলেন। স্বামিজী সিঁড়িতে উঠিয়া আবার কয়েক পা নামিয়া আসিয়া উপবিষ্ট সাধুদের লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "ম্যালেরিয়ার সময় আস্‌ছে। যাদের মশারি ছেঁড়া আছে তারা সেগুলি শীঘ্র সারিয়ে নাও।" এই বলিয়া স্বামিজী উপরে উঠিয়া গেলেন। স্বামিজীর এই শেষ কথাগুলি বোধানন্দজীর কর্ণগোচর হইল। সেই রাত্রিতে স্বামিজী মহাসমাধিতে দেহরক্ষা করিলেন। ব্রহ্মানন্দজী ঐ রাত্রে কলিকাতায় ছিলেন। তাঁহাকে অবিলম্বে সংবাদ পাঠান হইল। তিনি যখন নৌকা হইতে নামিলেন তখন শোকে-দুঃখে তাঁহার সর্বাঙ্গ কাঁপিতেছিল। তিনি সোজা উপরে উঠিয়া স্বামিজীর ঘরে যাইয়া তাঁহার পা ধরিয়া বালকের মত কাঁদিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ তিনি এই ভাবে ছিলেন। পরে তাঁহাকে ধরিয়া সরাইয়া লওয়া হইল। শ্রীগুরুর মহাসমাধি বোধানন্দজী স্বচক্ষে দেখিয়া মর্মাহত হইলেন। শিষ্য গুরুর সম্বন্ধে বলিতেন, "স্বামিজী ছিলেন প্রকৃত পুরুষোত্তম। তাঁহার গভীর মানব প্রেমের বর্ণনা দেওয়া অসম্ভব। তাঁহার উদার মানব-প্রেমিক হৃদয়ই আমাকে চিরতরে আকৃষ্ট ও আবদ্ধ করেছিল।"

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীগুরুর মহাসমাধির পর হইতে ১৯০৫ খ্রীঃ পর্য্যন্ত প্রায়

তিন বৎসর স্বামী বোধানন্দ বেলুড় মঠেই ছিলেন। সেই সময় স্বামী ব্রহ্মানন্দ টাইফয়েড রোগে কয়েক দিন শয্যাশায়ী হন। স্বামী বোধানন্দ অক্লান্তভাবে রোগ শয্যাগত ব্রহ্মানন্দজীর সেবা-শুশ্রূষা করেন। ১৯০৫ খ্রীঃ স্বামী বোধানন্দ তীর্থ-ভ্রমণে বহির্গত হইয়া স্বামী প্রকাশানন্দের সহিত কেদারনাথ ও বদ্রীনারায়ণ এবং আরও কয়েকটি তীর্থ ও বিভিন্ন স্থান দর্শনপূর্বক মান্দ্রাজ মঠে গমন করেন। মান্দ্রাজ হইতে তিনি বাঙ্গালোরে যাইয়া তত্রস্থ রামকৃষ্ণ আশ্রমে চৌদ্দ মাস অবস্থান করেন। তথায় তিনি তখন নিয়মিত ভাবে বক্তৃতা দিতেন এবং সাপ্তাহিক শাস্ত্র-ব্যাখ্যা চালাইতেন। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে আমেরিকায় বেদান্ত প্রচারার্থ যাইবার জন্য স্বামী ব্রহ্মানন্দ তাঁহাকে নির্দেশ দেন। সংঘ-গুরুর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া ১৫ই এপ্রিল কলিকাতা হইতে যাত্রা করিয়া তিনি মে মাসের শেষ সপ্তাহে নিউইয়র্কে উপস্থিত হন। তখন হইতে প্রায় আট মাস স্বামী অভেদানন্দের সহকারীরূপে নিউইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটিতে তিনি কাজ করেন। তৎপরে তিনি পিটস্‌বার্গে যাইয়া বেদান্ত প্রচারে নিযুক্ত হন।

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত পাঁচ ছয় বৎসর তিনি পিটস্‌বার্গে বেদান্তপ্রচারে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে সংঘ-গুরুর নির্দেশে তিনি নিউইয়র্কে আসিয়া স্থানীয় বেদান্ত সমিতির কার্যভার গ্রহণ করেন। তখন নিউইয়র্কে বেদান্ত সমিতির কোন স্থায়ী গৃহ ছিল না এবং উহার আর্থিক অবস্থা খুবই অসচ্ছল ছিল। প্রায় প্রত্যেক দুই বৎসর অন্তর সমিতিকে এক ভাড়াটীয়া বাড়ী হইতে অন্য ভাড়াটিয়া বাড়ীতে লইয়া যাইতে হইত। ইহা দেখিয়া তাঁহার এক ধনী শিষ্যা কুমারী মেরী মর্টন তাঁহাকে চল্লিশ হাজার ডলার দান করেন। কুমারী মর্টন মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের এক ভাইস-প্রেসিডেন্টের কন্যা ছিলেন। তদ্দত্ত অর্থে নিউইয়র্ক নগরীর এক ভদ্র পল্লীতে একটি ছয়তলা গৃহ সমিতির জন্য কেনা হয়। ১৯২১ খ্রীঃ বেদান্ত সমিতি উক্ত স্থায়ী গৃহে প্রতিষ্ঠিত হয়। অদ্যাবধি উক্ত গৃহেই সমিতির কার্য্য চলিতেছে। ইহা আমেরিকার সর্বাপেক্ষা পুরাতন বেদান্ত সমিতি এবং ১৮৯৪ খ্রীঃ স্বামিজীর প্রেরণায় স্থাপিত হয়।

স্বামী বোধানন্দ সমিতিগৃহে প্রত্যেক রবিবার একটি সাধারণ বক্তৃতা করিতেন এবং সপ্তাহে দুই দিন তাঁহার ছাত্রছাত্রীগণকে যোগ ও বেদান্ত শিক্ষা দিতেন। তাঁহার শাস্ত্রব্যাখ্যা ও বক্তৃতা শুনিতে বহু মার্কিণ নরনারীর সমাগম হইত। তিনি আদর্শনিষ্ঠ জীবন যাপন করিতেন বলিয়া তাঁহার ধর্মশিক্ষা বহু নরনারীর জীবন পরিবর্তিত করিয়াছে। তাঁহার ব্যক্তিত্ব-প্রভাবে ও চরিত্র-মাধুর্য্যে ও অনাড়ম্বর জীবনযাপনে শত শত নরনারী আকৃষ্ট হইয়াছে। তৎকৃত প্রত্যেক কার্য্যে তাঁহার ব্যক্তিত্বের ছাপ পড়িয়া যাইত। যাঁহারা তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছেন তাঁহারা চিরকাল তাঁহার সহযোগী ও পদানুগ হইয়াছেন। আমেরিকা হইতে তিনি একটি বাঙ্গালী ভক্তকে লিখিয়াছিলেন, "স্বামিজীর মত মহাপুরুষের আশ্রয়লাভ, ঠাকুরের দরবারে স্থানলাভ এবং সংসার হইতে অব্যাহতিলাভ—এই তিনটিই আমার জীবনের প্রধান ঘটনা বলিয়া মনে করি।" আমেরিকায় রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যান্য কেন্দ্রে যাইয়া স্বামী বোধানন্দ মাঝে মাঝে থাকিতেন। স্বামী যতীশ্বরানন্দ যাইয়া তাঁহার সহিত নিউইয়র্ক বেদান্ত সমিতিতে কিছুদিন ছিলেন। তখন তাঁহাকে বোধানন্দজী স্বীয় প্রাচীন স্মৃতিগুলি মহানন্দে বলিতেন। স্বামিজী, শ্রীমা ও ব্রহ্মানন্দজী প্রভৃতির কথা বলিতে বলিতে তিনি তন্ময় হইয়া যাইতেন। প্রবৃদ্ধ বয়সেও তিনি 'রামকৃষ্ণ-কথামৃত' এবং 'রামকৃষ্ণ-লীলা প্রসঙ্গে'র সকল ভাগ পুনঃ পুনঃ মনোযোগের সহিত পড়িয়াছিলেন। আহার-বিহারাদি সব কাজ তিনি সময় মত ঘড়ি ধরিয়া করিতেন। সেইজন্যই বোধ হয় তিনি দীর্ঘজীবী হইতে পারিয়াছিলেন। সময়ানুবর্তিতা, আদর্শনিষ্ঠা ও আত্মসংযম তাঁহার জীবনে বিমূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার কঠোর বহিরাবরণের অন্তরালে যে সুকোমল হৃদয় লুকায়িত ছিল, তাহা স্নেহ ও সহানুভূতিতে পরিপূর্ণ ছিল। যে সকল সন্ন্যাসী সহকর্মী তাঁহার সঙ্গে দীর্ঘকাল ছিলেন তাঁহারা একবাক্যে ইহা স্বীকার করিয়াছেন। সাধু-জীবনের মূল মন্ত্র সংযম। সংযম-সাধনায় সিদ্ধ হইবার জন্য সাধু স্বীয় জীবনকে বিধি-নিষেধের গণ্ডী দিয়া বাঁধেন। সেইজন্যই বোধানন্দজীকে গ্রীকদেশীয় ষ্টোইকদের (Stoics) মত সুকঠোর ও নিয়মনিষ্ঠ দেখা যাইত।

১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে স্বামী রাঘবানন্দ নিউইয়র্কে যাইয়া স্বামী বোধানন্দের সহকারীরূপে কার্য্য করেন। একজন সহকারী পাইয়া তিনি কিঞ্চিৎ বিশ্রামলাভে সমর্থ হন। স্বামী রাঘবানন্দ ভারত হইতে যাইয়া নিউইয়র্ক রেলওয়ে ষ্টেশনে উপস্থিত হইলে স্বামী বোধানন্দ আসিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গনান্তে সাদর সম্বর্ধনা করেন এবং বেদান্ত সমিতিতে লইয়া যান। সেই বৎসর গ্রীষ্মকালে তিনি একটি শীতপ্রধান জায়গায় গিয়াছিলেন রাঘবানন্দজীকে সঙ্গে লইয়া। তথায় উভয়েই কোন শিষ্যার অতিথিরূপে কয়েক সপ্তাহ ছিলেন। রাঘবানন্দজী যাইবার তিন মাস পরে বোধানন্দজী ভারতে আসিবার জন্য প্রস্তুত হন এবং নবাগত সহকর্মীকে কাজ বুঝাইয়া ও সমিতির সভ্যদের সঙ্গে পরিচিত করাইয়া দেন এবং ক্লাস ও বক্তৃতাদি করিতে বলেন। ভারত যাত্রার পূর্বে বোধানন্দজী রাঘবানন্দজীকে তথায় মেয়েদের সঙ্গে বেশী মিশিতে এবং সভ্যদের সহিত ধর্ম্মদর্শন ব্যতীত অন্য বিষয়ে আলোচনা করিতে নিষেধ করেন। রাঘবানন্দজী তখন উক্ত উপদেশের আবশ্যকতা বুঝিতে না পারিয়া কিঞ্চিৎ মনঃক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন। কিন্তু বোধানন্দজী চলিয়া আসিবার পর উহার তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিয়া আনন্দিত হইলেন। আমেরিকার বহুলোকে সমিতিতে আসে সন্ন্যাসীদের পরীক্ষা করিবার জন্য, সাধুরা যাহা বলে তাহা কাজে করে কিনা দেখিবার জন্য। বোধানন্দজী নিজেও হিন্দু সন্ন্যাসীদের মত থাকিতেন ভোগবিলাসভূমি নিউইয়র্ক সহরে। তিনি সাধুর কড়া নীতি মানিয়া চলিতেন এবং মেয়েদের সহিত অধিক মেলামেশা করিতেন না।

স্বামী বোধানন্দ সামাজিকতার বেশী প্রশ্রয় দিতেন না এবং বাহিরের লোকের সহিত বেশী সংশ্রব রাখিতেন না। সহজে তাঁহার নিকট কেহ যাইতে বা কথা বলিতে পারিত না। পূর্ব হইতে সময় নির্দেশ করিয়া তাঁহার কাছে যাইতে হইত। সমিতির সভ্য-সভ্যাদের সহিতও ক্লাসের বা বক্তৃতার আলোচ্য বিষয় ব্যতীত অন্য কথা বলিতে চাহিতেন না। তাঁহার কোন ছাত্রী একবার অসুস্থ হইয়া পড়েন। ছাত্রীটি বেদান্ত শ্রবণে আগ্রহান্বিতা এবং বোধানন্দজীর প্রতি শ্রদ্ধাশীলা ছিলেন। তাঁহার অসুখের সময় তিনি সাধারণ ভাবে ঔষধ-পথ্যের

নির্দেশ দেন, বন্ধু-বান্ধবের অসুখ হইলে লোকে যেমন করিয়া থাকে। ছাত্রীর স্বামী ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া আদালতে এই অভিযোগ করেন, "বোধানন্দজী ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত চিকিৎসক নহেন। তাঁহার উচিত নয় রোগীকে ঔষধ-পথ্যাদির ব্যবস্থা দেওয়া।" ভুল বোঝাই জগতের সাধারণ নিয়ম। এই মিথ্যা মোকদ্দমায় বোধানন্দজীকে আদালতে যাইতে হইল। তখন হইতে বিরক্ত হইয়া তিনি অধিক লোকসঙ্গ বর্জন করিলেন। এই কারণে সাধুর জীবনে লৌকিকতার প্রশ্রয় না দিবার জন্য শাস্ত্র এত নিষেধ করিয়াছেন। তবে তিনি আদৌ অসামজিক ছিলেন না, সমাজের সব সংবাদ রাখিতেন। বেস বল Base Ball খেলা দেখিতে তিনি খুব ভালবাসিতেন এবং যুবক দর্শকদের মত খেলা দেখিতে দেখিতে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া টুপি ও ছড়ি তুলিয়া খেলোয়াড়দের বলিয়া উঠিতেন, "এগিয়ে যাও! সাবাস! চমৎকার!"

স্বামী বোধানন্দ ১৯২৩ খ্রীঃ অক্টোবর মাসে নিউইয়র্ক হইতে যাত্রা করিয়া ইউরোপে কয়েক সপ্তাহ কাটাইয়া ১০ই ডিসেম্বর বোম্বাইতে পদার্পণ করেন। বোম্বাইতে তিনি স্থানীয় রামকৃষ্ণ আশ্রমে অবস্থান করেন। বোম্বাই নগরীর কাওয়াজী জেহাঙ্গীর হলে তাঁহাকে নাগরিকগণের পক্ষ হইতে অভিনন্দন দেওয়া হয়। সতের বৎসর আমেরিকায় অবস্থান সত্ত্বেও তিনি পূর্বের সেই সহজ সরল অনাড়ম্বর সাধুর মতই ছিলেন। বোম্বাইতে তিনি কোন ভক্তকে বলিয়াছিলেন, "পাশ্চাত্য সভ্যতার চাকচিক্যে বিমোহিত না হইয়া খাঁটি ধর্ম জীবন যাপনই তাঁহার সাফল্যের প্রধান কৌশল।" প্রায় এক সপ্তাহ বোম্বাইতে কাটাইয়া স্বামী বোধানন্দ ২০শে ডিসেম্বর বেলুড় মঠে উপস্থিত হন।

১৯২৪ খ্রীঃ ২০শে জানুয়ারী রবিবার কলিকাতায় ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউট হলে কলিকাতার নাগরিকবৃন্দ কর্তৃক তিনি অভিনন্দিত হন। ব্যারিষ্টার ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তীর পৌরোহিত্যে তাঁহাকে উক্ত সভায় অভিনন্দন-পত্র দেওয়া হয়। কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের দর্শনাধ্যাপক ডাঃ প্রভুদত্ত শাস্ত্রী এবং ডাঃ এইচ. ডবলিউ. বি. মোরেনো প্রভৃতি বক্তাগণ আমেরিকায় স্বামী বোধানন্দের বেদান্ত প্রচার সম্বন্ধে ভাষণ দেন। তৎপরে সভাপতি একটি

রৌপ্য মণ্ডিত কমণ্ডলু ও মান-পত্র স্বামী বোধানন্দকে উপহার দেন। স্বামী বোধানন্দ উপহার ও মানপত্র দানের জন্য উদ্যোক্তগণকে ধন্যবাদ প্রদানান্তে বলেন, "বহু আমেরিকাবাসী হিন্দুধর্মের প্রকৃত ভাব গ্রহণ করিয়াছে। অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের বলে আমেরিকা ভারত অপেক্ষা নানা বিষয়ে সমৃদ্ধ। আমেরিকার ন্যায় ভারতেও শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিলে দেশের প্রকৃত উন্নতি হইবে।" তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া আমাদের মনে হইয়াছিল, তিনি শাশ্বত সত্য সরল সহজ ভাবে বলিলেন, পুষ্পিত বাক্যে ঘুরাইয়া বলিলেন না। তাঁহার বাক্যে ছিল দৃঢ়তা, বিশ্বাস ও অনুভূতির অপূর্ব সমাবেশ। স্বামী বোধানন্দ কলিকাতায় যে অভিনন্দন-পত্র পাইলেন, তাহা নিউইয়র্ক বেদান্ত সমিতির সভ্য-সভ্যাগণ পড়িয়া পরম আনন্দিত হন। উক্ত সমিতির বাৎসরিক সভায় ইহা পঠিত ও প্রশংসিত হয়। সমিতির সম্পাদিকা শ্রীমতী আভা এল-ষ্টুয়ার্ট অভিনন্দন পাঠান্তে বোধানন্দজীকে ভারতে একখানি পত্র* লিখিয়াছিলেন। উক্ত পত্রে আছে, "প্রিয় স্বামী,....এই নিউইয়র্ক নগরীতে আপনি বেদান্ত-বাণী স্বীয় জীবনে দেখাইয়া এবং সরল মধুর ভাবে প্রচার করিয়া আমাদিগকে যে জ্ঞান দান করিয়াছেন, সেইজন্য আমরা আপনার কাছে চিরঋণী। আপনি আমাদের সম্মুখে একটি মহৎ আদর্শ দেখাইয়া দৃষ্টান্ত দ্বারা আমাদিগের উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন।" কলিকাতার অভিভাষণে তিনি তাঁহার গুরুর বাণী সম্বন্ধেও আলোচনা করেন। কলিকাতা অভিনন্দনের পর তিনি সহরের নানা সমিতিতে ধর্মালোচনাদি করিয়াছিলেন।†

১৩৩০ সালে ১৪ই মাঘ (১৯২৪ খ্রীঃ ২৮শে জানুয়ারী) সোমবারে বেলুড় মঠে স্বামী বিবেকানন্দের দ্বিষষ্টিতম জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সেই উপলক্ষে বেলুড় মঠে স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতি-মন্দিরের প্রতিষ্ঠা কার্য্য সম্পন্ন হয়। এই উৎসবের অঙ্গরূপে যে সভা আহূত হয় তাহাতে বালকবালিকাগণ স্বামিজীর

* ১৯২৪ খ্রীঃ জুলাই মাসে 'বেদান্ত কেশরী'তে প্রকাশিত।

† ১৯২৪ খ্রীঃ মার্চ সংখ্যায় 'প্রবুদ্ধ ভারত' মাসিকে বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত।

কবিতাবলী আবৃত্তি করে। স্বামী বোধানন্দ তাহাদিগকে পুরস্কার ও পদক বিতরণ করেন এবং উক্ত সভায় বাংলা ভাষায় স্বামিজীর বাণী সম্বন্ধে একটি সারগর্ভ ও সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দেন। স্বামিজীর জন্মোৎসব উপলক্ষে স্বামী বোধানন্দ ১৯২৪ খ্রীঃ ২রা ও ৩রা ফেব্রুয়ারী শনিবার ও রবিবার পাটনা রামকৃষ্ণ আশ্রমে উপস্থিত ছিলেন। তিনি স্বামিজীর বাণী সম্বন্ধে তথায় ইংরাজীতে যে বক্তৃতা দেন তাহা শ্রোতৃমণ্ডলীর প্রাণস্পর্শী হইয়াছিল। পাটনা হইতে তিনি কাশীধামে গমন করেন এবং তথায় অদ্বৈতাশ্রমে থাকেন। কাশী হইতে প্রত্যাবর্তনান্তে তিনি স্বামী শঙ্করানন্দ সমভিব্যাহারে রেঙ্গুন যাত্রা করেন। কাশীতে ও রেঙ্গুনে তিনি ধর্মপ্রসঙ্গ ও বক্তৃতাদি করিয়াছিলেন।

স্বামী বোধানন্দ কথাপ্রসঙ্গে একদিন বলিলেন, "পাণিনি ব্যাকরণ ও সংস্কৃত ভালরূপে আমেরিকায় পড়েছি।" তিনি জন্মভূমি দর্শনের জন্য বাগাণ্ডা গ্রামে যাইয়া পুরাতন পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধারের ব্যবস্থা করেন। আন্দুল মৌরীতে কাকার বাড়ীতে তিনি একবার গিয়াছিলেন। তখন এই কালী-সঙ্গীত দুইটী তিনি পরমানন্দে শুনিয়াছিলেন—(১) হৃদি-কমলে বড় ধূম লেগেছে (২) দেমা শ্যামা চরণ দুটি। সাধুসঙ্গ ও সাধুসেবা করিবার জন্য তিনি তখন ভক্তগণ ও আত্মীয়-স্বজনকে উপদেশ দিয়াছিলেন। তখন বারাসতে চর্মকারদের একটি সম্মিলনী হয়। স্বামী বোধানন্দ সেখানে যাইয়া তাহাদিগকে ধর্মোপদেশ দেন এবং তাহাদের বর্তমান কর্তব্য নির্দেশ করেন।*

একদা 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকার প্রতিনিধি আসিয়া স্বামী বোধানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করেন।† প্রতিনিধির প্রশ্নের উত্তরে বোধানন্দজী আমেরিকায় তাঁহার বেদান্ত প্রচারের সংক্ষিপ্ত বিবরণাদি দিয়া বলেন, "পাশ্চাত্য জাতি সমূহ এত বৈজ্ঞানিক উন্নতি সত্ত্বেও ধর্মজীবনে অনুন্নত। মানব-সমাজে শান্তি ও সাম্য স্থাপনের জন্য মানবের আন্তর বিকাশ অপেক্ষা বাহ্য সমৃদ্ধিকে তাহারা

---

* ১৩৩০ সালের ফাল্গুন মাসে 'উদ্বোধন' মাসিকে এই সংবাদ প্রকাশিত।

† ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকায় সমগ্র কথোপকথন পাওয়া যায়।

অধিকতর মূল্যবান্ মনে করে। আমেরিকাবাসিগণ জড়বাদী ও কর্ম্মকুশল হইলেও তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ অবশ্য ধর্ম্মবিশ্বাসী ও নীতিভাবসম্পন্ন আছেন। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ বা শ্রীরামকৃষ্ণের মত মহাপুরুষ আমি আমেরিকায় একটিও দেখি নাই। হিন্দুদের আধ্যাত্মিক সহায়তা আমেরিকার আবশ্যক। হিন্দুদের উচিত আমেরিকার কর্ম্মকৌশল ও বৈজ্ঞানিক দক্ষতা শিক্ষা করা। পাশ্চাত্যকে আধ্যাত্মিক আলোক প্রদানই ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কার্য্য।"

দীর্ঘকাল আমেরিকায় থাকিলেও পাশ্চাত্য প্রভাব তাঁহার উপর পড়ে নাই। আসবাব-পত্র ও পোষাক-পরিচ্ছদ খুব সামান্যই তাঁহার সঙ্গে ছিল। প্রকৃত সাধু স্থান ও কালের প্রভাব এড়াইয়া চলেন। ঠাকুরের ত্যাগী শিষ্যদের প্রতি তাঁহার কত গভীর শ্রদ্ধা ছিল তাহা নিম্নোক্ত ঘটনা দেখিয়া বুঝিয়াছি। বেলুড় মঠের পুরাতন বাড়ীর পশ্চিম দিকের বারান্দায় হেলান-দেওয়া বেঞ্চিতে স্বামী সারদানন্দ প্রভৃতির সঙ্গে স্বামী বোধানন্দ বসিয়া আছেন। একজনের তামাক খাওয়া হইলে বোধানন্দজী হুঁকাটী স্বহস্তে সরাইয়া শরৎ মহারাজের কাছে রাখিলেন। শরৎ মহারাজ ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "থাক্, থাক্।" তাহা সত্ত্বেও বোধানন্দজী সশ্রদ্ধ ভাবে এই সামান্য সেবাটুকু করিলেন। কারণ, শ্রীগুরুর গুরুভ্রাতাদিগকে তিনি গুরুবৎ শ্রদ্ধা করিতেন।

স্বামী বোধানন্দ ১৯২৪ খ্রীঃ ৮ই এপ্রিল পূজ্যপাদ মহাপুরুষজীর সহিত ট্রেনে মান্দ্রাজ যান। মান্দ্রাজ মঠে তিনি মাসাধিক কাল অবস্থান করেন। তিনি স্থানীয় শ্রীসচ্চিদানন্দ সংঘে ও শ্রীরামকৃষ্ণ ছাত্রাবাসে যথাক্রমে 'ভারতের আধ্যাত্মিকতা ও আমেরিকার কর্ম্মনিষ্ঠা' এবং 'আমেরিকার জীবন' সম্বন্ধে দুইটী সুচিন্তিত ভাষণ দেন। উক্ত ছাত্রাবাসে বুদ্ধোৎসবের দিন বুদ্ধদেব সম্বন্ধেও তিনি কিছু বলেন এবং ভেপারী আনন্দ আশ্রমে 'তত্ত্বমসি' বিষয়ে বক্তৃতা করেন। মান্দ্রাজ হইতে-বাঙ্গালোরে যাইয়া স্থানীয় রামকৃষ্ণ আশ্রমে তিনি আর এক মাস থাকেন। বাঙ্গালোর আশ্রমে প্রত্যেক রবিবার তিনি ধর্ম্মপ্রসঙ্গ করিতেন এবং সহরে দুইটি সাধারণ বক্তৃতাও দিয়াছিলেন। ২৭শে জুন বাঙ্গালোরবাসিগণ তাঁহাকে রত্নাবলী থিয়েটার হলে বিদায়-অভিনন্দন দেন।

সভায় সহরের সকল গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। রাও সাহেব চিন্নাইয়া মানপত্রটি পাঠ করেন। উহাকে একখানি পার্চমেণ্টে ছাপাইয়া একটি সুন্দর চন্দন কাঠের বাক্সে করিয়া বোধানন্দজীকে উপহার দেওয়া হয়। স্বামিজী অভিনন্দনের যথাযোগ্য উত্তর দেন। মিশনের স্বামী সোমানন্দ স্থানীয় জেলে কয়েদীদের মধ্যে দীর্ঘকাল ধর্মপ্রচার করিতেছিলেন। সোমানন্দজীর আমন্ত্রণে স্বামী বোধানন্দ জেলে যাইয়া তাঁহার কার্য্য পরিদর্শন করিয়া সুখী হন। কয়েদিগণও বোধানন্দজীকে একটি মানপত্র দিয়াছিল। ১৯২৪ খ্রীঃ ২৯শে জুন বাঙ্গালোর হইতে মান্দ্রাজে ফিরিয়া কয়েকদিন অবস্থানের পর তিনি বোম্বাই যাত্রা করেন। বোম্বাই হইতে ১৫ই জুলাই তিনি জাহাজে উঠিয়া ইউরোপে যান এবং ইটালী, সুইজারল্যাণ্ড ও ফ্রান্স দেখিয়া নিউইয়র্কে উপস্থিত হন। প্রায় এগার মাস অনুপস্থিতির পর তিনি পুনরায় আমেরিকায় মহোৎসাহে বেদান্ত প্রচার আরম্ভ করেন। ১৯২৪-২৫ খ্রীঃ স্থানীয় বেদান্ত সমিতিতে তিনি যে সকল বক্তৃতা দেন তন্মধ্যে চব্বিশটি পুস্তকাকারে সমিতি হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার এক প্রিয় শিষ্যা ও সমিতির সভ্যা তখন নিউইয়র্কের বাহিরে গিয়াছিলেন। স্বয়ং বক্তৃতা শ্রবণে অক্ষম হইয়া তিনি সাঙ্কেতিক লেখক নিযুক্ত করিয়া বক্তৃতাগুলি লিপিবদ্ধ করান। সেইগুলিই সংশোধিত হইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত। উক্ত পুস্তকটির নাম বেদান্ত দর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতাবলী (Lectures on Vedanta Philosophy)। ইহা ৩২১ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এই চব্বিশটি বক্তৃতায় বেদান্ত দর্শনের মূলতত্ত্ব, কর্মবাদ, যোগসাধন, প্রাণায়ামবিজ্ঞান, বুদ্ধবাণী, শঙ্করদর্শন, পুনর্জন্মবাদ, মৃত্যুতত্ত্ব, উপনিষদের বাণী প্রভৃতি বিষয় প্রাঞ্জল ভাষায় মার্কিণ নরনারীগণের উপযোগী করিয়া আলোচিত। এই পুস্তকের ভূমিকায় স্বামী বোধানন্দ লিখিয়াছেন, "এই বক্তৃতাগুলি আমার কাছে এত সামান্য ও নগণ্য যে, আমি এইগুলি প্রকাশ করিবার ইচ্ছা কখনো করি নাই।" আত্মগোপনে অভ্যস্ত সাধু আত্মপ্রকাশে অনিচ্ছুক। 'বেদান্ত দর্পণ' নামে একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকাও তিনি কিছুকাল পরিচালন করেন। উহাতে তাঁহার বক্তৃতাবলী মাঝে মাঝে প্রকাশিত হইত।

এই ভাবে নীরবে অনুকরণীয় আধ্যাত্মিক জীবন চুয়াল্লিশ বৎসর যাবৎ স্বামী বোধানন্দ আমেরিকায় যাপন করেন। এই চুয়াল্লিশ বৎসরের মধ্যে একবার মাত্র তিনি ভারতে আসেন ১৯২৩ খ্রীঃ ডিসেম্বর মাসে। শেষ জীবনটি পুণ্যভূমি ভারতে কাটাইবার জন্য তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা হইয়াছিল। ১৯৫০ খ্রীঃ ১৪ই এপ্রিল বর্তমান লেখককে তিনি স্বহস্তে বাংলায় এই পত্র লিখিয়াছিলেন ঃ—

ওঁ নমো ভগবতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণায় বেদান্ত সমিতি

৩৪ ওয়েষ্ট ৭১তম স্ট্রীট, নিউইয়র্ক ২৩

ইউ. এস. এ.

শ্রীমান্ স্বামী জগদীশ্বরানন্দ কল্যাণবরেষু,

তোমার ৯ই ফেব্রুয়ারীর চিঠিখানি প্রায় এক সপ্তাহ পূর্বে পাইয়াছিলাম। উহাতে তুমি স্বামী আত্মানন্দের জীবনীতে প্রকাশের জন্য একটি ভূমিকা লিখিয়া দিতে অনুরোধ করিয়াছ। উহা এই পত্র সহ পাঠাইতেছি। উহাতে অনেক ভুল আছে। সংশোধন করিয়া দিও। এখানকার বর্তমান সংবাদ কুশল। আগামী গ্রীষ্মে সোসাইটীর কার্য্য তিন মাস বন্ধ থাকিবে। এখানে এখনও বেশ শীত। গত রাত্রে ভয়ানক বরফ পড়িয়াছে। এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি এরূপ বরফ কখনো এখানে পড়ে নাই। এখানকার কার্য্য শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় এক রকম চলিতেছে। কতদিনে আমার ভারতে যাওয়া হইবে জানি না। যদি যাওয়া ঘটে পূর্বে সংবাদ পাইবে। সকলে আমার ভালবাসা ও নমস্কার জানিবে। এই চিঠি খানি পাইবার পর প্রাপ্তি-সংবাদ পাঠাইবে। ইতি—

১৯৪৯ খ্রীঃ ৭ই অক্টোবর স্বামী বোধানন্দ কোন বাঙ্গালী ভক্তকে নিউইয়র্ক হইতে একটি পত্রে লিখিয়াছিলেন, "আমার বয়স ৭৯ বৎসর হইল। ৺মা কত দিনে তাঁর কাছে নিয়ে যাবেন তিনিই জানেন। এখন সর্বদা এই গানটী মনে হয়, "যখন যে ভাবে মাগো রাখিবে আমারে সেই সে মঙ্গল যদি না ভুলি তোমারে। তাঁহাকে স্মরণ করাই স্বর্গবাস।"

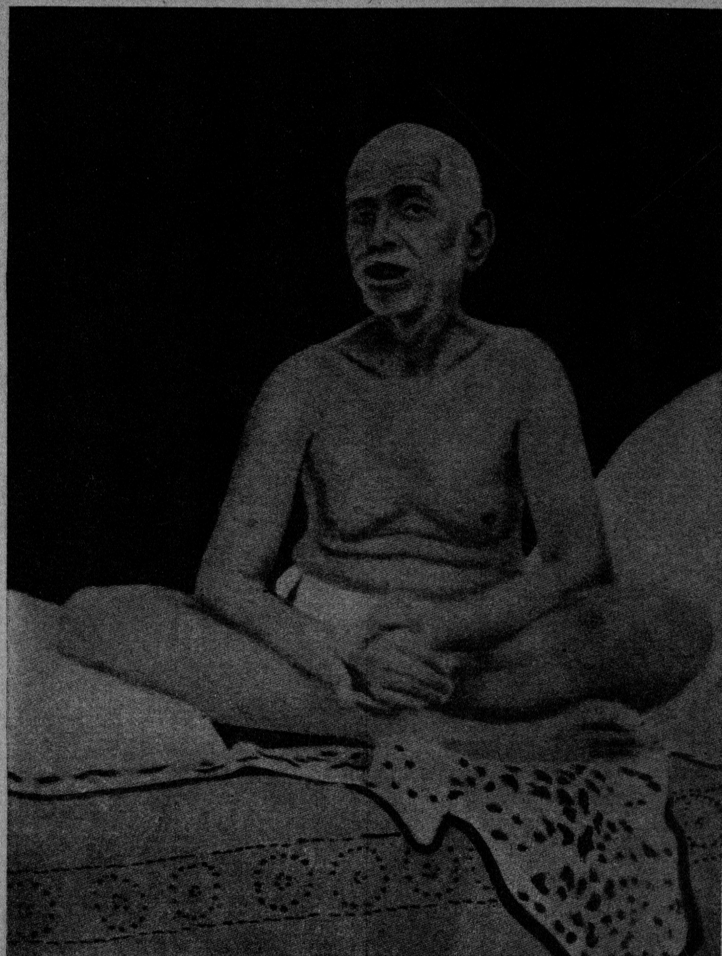
শেষজীবনে কিছুদিন যাবৎ স্বামী বোধানন্দ prostrate glands (মূত্রাশয়ের গ্রন্থি) রোগে ভুগিতেছিলেন। রোগবৃদ্ধি হওয়ায় ১৪ই মে রবিবার বৈকালে তিনি চিকিৎসার্থ নিউইয়র্ক সহরের রুজভেল্ট হাসপাতালে ভর্ত্তি হন এবং ১৮ই মে বৃহস্পতিবার বৈকাল ৩-১৫ মিনিটে অস্ত্রোপচার-কালে দেহত্যাগ করেন। স্বামী বোধানন্দ অশীতিতম বর্ষে পদার্পণ করিয়াই লোকান্তরিত হন। তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ আমেরিকা ও ভারতের নানা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। বেদান্তের বার্ত্তাবহরূপে আমেরিকায় এবং বিবেকানন্দ-বাণীর ধারক ও বাহকরূপে ভারতে স্বামী বোধানন্দের নাম ভারতীয় সাংস্কৃতিক ইতিহাসে চিরস্মরণীয় থাকিবে।

সাঁইত্রিশ

শ্রীরমণ মহর্ষি*

দক্ষিণ ভারতে বর্তমান যুগে তিনটি প্রসিদ্ধ মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে দুইজন শ্রীনারায়ণ গুরু এবং শ্রীসিদ্ধারূঢ় স্বামী বহু পূর্বেই শরীর রক্ষা করিয়াছেন। মালাবারে শ্রীনারায়ণ গুরুর প্রভাব সমধিক এবং তাঁহার সন্ন্যাসী শিষ্যগণ মালাবারে একটি বৃহৎ সমাজ-সংস্কার আন্দোলন চালাইতেছেন। কর্ণাটকে সিদ্ধারূঢ় স্বামীর অসংখ্য শিষ্য ও প্রশিষ্য আছে। এই মহাপুরুষত্রয়ীর মধ্যে শ্রীরমণ মহর্ষি সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। সুখের বিষয় এই যে, তিনি কোন প্রকার সঙ্ঘ স্থাপন বা শিষ্য গ্রহণ করেন নাই। শ্রীরমণ মহর্ষি প্রস্তরবৎ, মেরুবৎ নিশ্চলভাবে অধিকাংশ সময় বসিয়া থাকিতেন। তিনি জীবনের শেষ

* অধুনালুপ্ত 'অমৃত' মাসিকের ১৩৪১ কার্তিক, পৌষ, মাঘ ও ফাল্গুন সংখ্যাচতুষ্টয়ে প্রকাশিত।



শ্রীরমণ মহর্ষি

প্রায় ৫৪ বৎসর মান্দ্রাজ প্রদেশের তিরুবনমালাই পাহাড়ের একটি গুহায় বাস করিতেন। পরণে কৌপিন, হাতে একটী কমণ্ডলু ও বাঁশের লাঠি মাত্রই তাঁহার সম্বল ছিল। তিনি অতি অল্প কথা বলিতেন। দিনের মধ্যে তিনি যে কয়টী কথা বলিতেন তাহা আঙ্গুলে গণা যাইত। কিন্তু তাঁহার কথা অপেক্ষা তাঁহার নীরবতাই সমধিক মর্মস্পর্শী। তাঁহার নিকটে বসিলে মনে হইত, যেন শান্তি-সমুদ্রের তীরে বসিয়া আছি। তৎসন্নিধানে উপবিষ্ট ব্যক্তির মনে শান্তির মলয় পবন বহিতে থাকিত।

শ্রীরমণ মহর্ষি নিজেই নিজের শিষ্য এবং নিজেই নিজের গুরু। তিনি নিজ জীবনে যেমন কোন গুরু বরণ করেন নাই, তদ্রূপ তিনি কোন শিষ্যও গ্রহণ করেন নাই। তিনি আজ অবধি কাহাকেও মন্ত্র-দীক্ষা দেন নাই। ইংরাজ লেখক পল ব্রাণ্টন তাঁহাকে মন্ত্র দীক্ষা দিতে অনুরোধ করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, "অজ্ঞানের রাজত্বে গুরু-শিষ্য ভেদ আছে। কিন্তু জ্ঞানী এই দ্বৈতভাবের অতীত। তাঁহার নিকট সবই ব্রহ্ম।" মহম্মদের মত তিনি বলিতেন যে, মানুষ ও ঈশ্বরের মধ্যে কোন দ্বিতীয় মধ্যস্থ থাকিবে না। মানুষ নিজেই নিজের উদ্ধারকর্তা। "মানুষ-গুরু মন্ত্র দেন কাণে, জগৎগুরু মন্ত্র দেন প্রাণে।" শ্রীরমণ মহর্ষি কাহারো কাণে মন্ত্র দেন নাই। তবে তিনি মানুষকে একটা দিব্য প্রেরণা দিতেন যাহার দ্বারা মানুষ নিজেই নিজের গুরু হইতে পারিত। তিনি বলিতেন, "মানুষের প্রকৃত গুরু তাহার অন্তরেই রহিয়াছে। যতদিন না মানুষ তাহার অন্তস্থ গুরুর সন্ধান পায় ও তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে, ততদিন বাহিরের গুরু কিছুই করিতে পারে না।" শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, "শুদ্ধ মনই শেষে মানুষের গুরু হয়।" শ্রীরমণ মহর্ষির মতে "জীবনই মানুষের প্রধান শিক্ষক।" শ্রীরামকৃষ্ণের ন্যায় তিনি কাহারো নিকট হইতে কোন অর্থ গ্রহণ করেন নাই। আধ্যাত্মিকতার হোমাগ্নি তাঁহার মধ্যে সদা প্রজ্বলিত থাকিত। তিনি ধর্মের কোন প্রকার আড়ম্বর করেন নাই। তিনি নাম, যশ ও প্রতিষ্ঠাকে কাকবিষ্ঠাবৎ ঘৃণা করিতেন। তিনি কখনও কোন সিদ্ধাই বা বিভূতি প্রদর্শন করেন নাই। শ্রীরমণ মহর্ষির প্রধান উপদেশ এই—

"আমি'র অনুসন্ধান কর। 'আমি কে' উহা জানিলেই সমস্ত সন্দেহের সমাধান হইবে। 'আমি'র খবর পাইতে হইলে চিন্তা-রাজ্যের ওপারে যাইতে হইবে।" "মানুষ সদা আনন্দের জন্য ছুটিতেছে। মানুষ যে পাপ করে তাহা সে আনন্দের জন্যই করে। কিন্তু আনন্দ বাহ্য জগতে কোথাও নাই। উহার খনি অন্তরের গভীরতম প্রদেশে লুক্কায়িত। সদা আনন্দী হইতে হইলে আদি 'আমি' কে জানা আবশ্যক।"

শ্রীরমণ মহর্ষি তিরুবনমালাই নামক যে পাহাড়ে থাকিতেন তাহা মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত নর্থ আর্কট জেলার মধ্যে অবস্থিত। ইহা শৈবদিগের একটী মহাতীর্থ। তথায় শিবের 'তেজলিঙ্গ' বিরাজমান। তাই পাহাড়টীর আর এক নাম অরুণাচল। কথিত আছে, একবার মহাদেব জ্যোতিরূপে এই পর্বতের উপর প্রকাশিত হইয়াছিলেন। তাই তথায় কার্ত্তিক মাসে প্রত্যেক বৎসর কয়েক দিন ঘৃত ও কর্পূর সহযোগে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয় ও তদুপলক্ষে এক বিরাট মেলা বসে। তখন দক্ষিণ ভারতের নানা স্থান হইতে সহস্র সহস্র যাত্রী দেবদর্শনে তথায় আসেন। মহর্ষি সতের বৎসর বয়সে ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষে তথায় যান এবং তদবধি মহাসমাধি পর্যন্ত প্রায় ৫৪ বৎসর তথা হইতে অন্য কোথাও যান নাই। মাদুরার অনতিদূরে তিরুকুঞ্জী গ্রামে তামিল ব্রাহ্মণ সুন্দরম্ আইয়ারের দ্বিতীয় পুত্ররূপে ১৮৭৯ খ্রীঃ মহর্ষি জন্মগ্রহণ করেন। সুন্দরম্ ছিলেন সামান্য উকিল ও তাঁহার তিনটী সন্তান ছিল। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র ভেঙ্কটরমণই জগৎপূজ্য শ্রীরমণ মহর্ষি নামে প্রসিদ্ধ। সুন্দরম্ অতি নিষ্ঠাবান্ ও ধর্মপরায়ণ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার গৃহে সদা শাস্ত্রপাঠ ও অতিথি-সেবা হইত। তাঁহার বংশের এক বিশিষ্ট ধারা এই যে, প্রত্যেক পুরুষে এক এক জন সন্ন্যাসী হন। সুন্দরমের এক খুল্লতাত ও এক ভাই এইরূপে সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন্। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রও পিতার মৃত্যুর পর সংসার ত্যাগ করিলেন। ছেলেবেলায় পড়াশুনায় ভেঙ্কটরমণের তত মন ছিল না। অথচ তিনি সাঁতার দেওয়া, কুস্তি করা, ফুটবল খেলা এবং মুষ্টিযুদ্ধ প্রভৃতি নানা খেলায় পারদর্শী ছিলেন। মাদুরার মিশনারীদের স্কুলে এণ্ট্রান্স ক্লাশ অবধি তিনি বিদ্যাশিক্ষা করেন।

শাস্ত্রে আছে, যে দিনই বৈরাগ্য আসিবে সেই দিনই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবে।* একদিন ভেঙ্কটরমণ বাড়ী হইতে স্কুলে যাইবার সময় তিনটী মাত্র টাকা লইয়া অরুণাচলম্ যাত্রা করিলেন। যাইবার সময় বাড়ীতে এক চিঠি লিখিয়া রাখিয়া গেলেন। পত্রখানির মর্ম এই, "আমি ঈশ্বরের সন্ধানে যাইতেছি। আমার জন্য আপনারা চিন্তিত হইবেন না, বা আমাকে খুঁজিবার ও ফিরাইবার জন্য বৃথা চেষ্টা করিবেন না।" গীতায় (৯।১২) শ্রীকৃষ্ণ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, "অনন্যচিন্ত হইয়া যে-ই আমার ভজনা করিবে আমি তাহার যোগক্ষেম বহন করিব।" ভেঙ্কটরমণ ঈশ্বরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হইয়া গৃহত্যাগ করিলেন ১৮৯৬ খ্রীঃ ২৯শে আগষ্ট। ট্রেনে বসিয়া তিনি প্রায়ই ধ্যানস্থ হইয়া পড়িতেন। তাঁহার চিজ্জড়-গ্রন্থি ছিন্ন হইয়াছিল। তাই দেহাত্মবুদ্ধি আর তাঁহাকে আবদ্ধ করিতে পারিল না। পথে অনেক দুঃখদৈন্য ও বাধাবিপত্তি আসিয়া তাঁহার সম্মুখীন হইল। পথের খবর তাঁহার ভাল জানা ছিল না। তাই অনশন ও অনিদ্রায় তাঁহাকে খুব ভুগিতে হইয়াছিল। কিন্তু দেহবুদ্ধির অভাবে তিনি তাহাতে বিচলিত হন নাই। অর্থাভাব হওয়ায় তিনি তাঁহার দুইটী স্বর্ণ-নির্মিত ইয়ার-রিং বন্ধক দিয়া মাত্র কয়েকটী টাকা লইয়া অজ্ঞাত পথে চলিলেন। শেষে তিনি অরুণাচলমের মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। মন্দিরে আসিয়া প্রথম প্রথম তিনি মহাকষ্টে পড়িলেন। আহার পাওয়া যায় না, ধ্যান করিবার স্থান নাই, ধ্যান করিতে বসিলে দুষ্ট মুসলমান যুবকগণ আসিয়া তাহাকে বিরক্ত করে। তিনি তাহাদিগকে অবশ্য কিছুই বলিতেন না। প্রথম তিন বৎসর তিনি মৌনী ছিলেন। মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াই পরিহিত বস্ত্র ও সঙ্গে যে কয়েকটী টাকা ছিল তৎসমুদয় পুষ্করিণীতে নিক্ষেপ করিয়া কৌপীনমাত্র সম্বলে উলঙ্গ হইলেন। কেশ মুণ্ডন ও যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করিয়া তিনি নিজেই সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। এইরূপ সন্ন্যাস গ্রহণকে বেদান্ত শাস্ত্রে বিদ্বৎসন্ন্যাস বলা হইয়াছে। কারণ জ্ঞানলাভান্তে এই সন্ন্যাস লইতে হয়। সিদ্ধিলাভের জন্য সাধনাযুক্ত যে সন্ন্যাস লইতে হয় তাহার নাম

---

* যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ—জাবাল উপনিষৎ

বিবিদিষা সন্ন্যাস। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, রমণ মহর্ষি মন্ত্র, ব্রহ্মচর্য বা সন্ন্যাস দীক্ষা কাহারো নিকট হইতে গ্রহণ করেন নাই। তিনি নিজেই নিজের গুরু এবং নিজেই নিজের শিষ্য। সন্ন্যাসগ্রহণের পর তিনি কাঞ্চন স্পর্শও করেন নাই। অরুণা-চলমের মহর্ষি দিবারাত্রির অধিকাংশ সময় বাহ্য জ্ঞানশূন্য হইয়া ধ্যানস্থ থাকিতেন। দিবা ও রাত্রি, সুষুপ্তি ও সমাধি তাঁহার নিকট সমান হইয়া দাঁড়াইল। মন্দিরপ্রাঙ্গণে অজ্ঞানীদের উপদ্রবে ধ্যানের ব্যাঘাত হওয়ায় পাতাল-পুরী নামক ভূ-মধ্যস্থিত এক নির্জন অন্ধকার কুটীরে তিনি আশ্রয় লইলেন। কিন্তু তথায় এত মশা-মাছি-বিছা-পোকা-মাকড় ছিল যে, তথায় কেহ বাস করিতে পারিত না। এই সকলের দংশনে তাঁহার শরীরে ক্ষত ও পুঁজ হইতে লাগিল। কিন্তু তাঁহার সে দিকে আদৌ ভ্রূক্ষেপ ছিল না। তাঁহার দেহ-জ্ঞান এত কম ছিল যে, তিনি এই সব উপদ্রব একেবারে গ্রাহ্য করিলেন না। কোন কোন দিন যৎকিঞ্চিৎ আহার ভিক্ষা করিয়া আনিতেন। বহুদিন তাঁহার আহারেরও আবশ্যক হইত না। কেহ কখনও তাঁহার নিকট কিছু রাখিয়া যাইত, তাহাই তিনি ভোজন করিতেন। মন যতই অন্তর্মুখীন হয়, ততই ক্ষুধাতৃষ্ণা-নিদ্রার তাড়না কমিয়া যায়। কোন সহৃদয় ব্যক্তি তাঁহার শরীরে এইরূপ ক্ষত দেখিয়া তাঁহাকে তথা তুলিয়া লইয়া একটি উত্তম স্থানে বসাইলেন। কারণ মহর্ষি প্রায় সর্বদা 'সমকায়শিরগ্রীব' হইয়া ধ্যানস্থ থাকিতেন। নিদ্রার ন্যায় তাঁহার ধ্যানও এত সুগভীর হইত যে, চীৎকার ত দূরের কথা, শরীর ধরিয়া নাড়াইলেও তাঁহার ধ্যান ভাঙ্গিত না।

মন্দিরে দেব-স্নানের যে দুগ্ধ নালায় গড়াইয়া আসিত প্রথম প্রথম মহর্ষি তাহাই পান করিতেন। এই বহুদ্রব্যমিশ্রিত দুগ্ধ একজন আনিয়া দিত। পরে মন্দিরের পুরোহিত কৃপা-পরবশ হইয়া তাঁহাকে ভাল দুগ্ধ পান করিতে দিতেন। তিনি মৌনী ছিলেন এবং এক কালে ১৮।১৯ ঘণ্টা ধ্যানস্থ থাকিতেন। প্রায়ই তাঁহার কোমর হইতে কৌপীন খুলিয়া পড়িত। জনৈক ভক্ত তাঁহার মুখে আহার জোর করিয়া পুরিয়া দিতেন। তিনি স্বেচ্ছায় আহার করিতেন না, তাঁহাকে আহার করাইতে হইত। কয়েকটী অশিষ্ট যুবক তাঁহার একাগ্রতা

পরীক্ষা করিবার জন্য তাঁহার শরীরে একবার মলমূত্র ঢালিয়া দেয়। ইহা তিনি আদৌ টের পান নাই। কয়েক ঘণ্টা পরে যখন তাহার ধ্যান ভাঙ্গিল তখন আবার তিনি স্নান করিয়া শুদ্ধ হইলেন। অথচ অসভ্য অত্যাচারীর প্রতি তিনি কোন প্রকার ক্রোধ প্রকাশ করিলেন না। এই সময় তাঁহার প্রথম সেবক আসিয়া জুটিলেন। এই সেবক মহাপণ্ডিত ছিলেন। বহু বৎসর শাস্ত্রচর্চা করিয়া তিনি আদৌ শান্তি পান নাই। তিনি মহর্ষিকে যোগবাশিষ্ঠ ও গীতা প্রভৃতি অদ্বৈত-বেদান্ত গ্রন্থ পড়িয়া শুনাইতেন। মহর্ষি আদৌ শরীরের যত্ন লইতে পারিতেন না। স্নানাদির অভাবে তাঁহার শরীরে ময়লা জমিয়া গেল। তাঁহার মাথায় লম্বা লম্বা জটা ও হাতে এত বড় নখ হইয়া গেল যে, হস্তদ্বয় কর্মের অযোগ্য হইয়া পড়িল। তিনি একটি দেওয়ালে ঠেস দিয়া ধ্যান করিতেন। শুধু ঘণ্টার পর ঘণ্টা নয়, দিনের পর দিন নয়, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, এবং এমন কি, মাসের পর মাস একস্থানে প্রস্তরমূর্তিবৎ বসিয়া তিনি স্তিমিত নয়নে ধ্যানমগ্ন থাকিতেন। এই স্থানে তখন এত পিপীলিকা ছিল যে, অন্য লোকে তথায় যাইয়া দাঁড়াইতে পারিত না! কিন্তু তিনি অম্লান বদনে তথায় সমাধিস্থ থাকিতেন। তাঁহার শরীর-চেতনা তিলমাত্রও ছিল না। দীর্ঘকাল একস্থানে দেওয়ালে হেলান দিয়া বসায় দেওয়ালে গভীর দাগ পড়িয়া গেল। তখন কয়েকজন ভক্ত তাঁহার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়া তাঁহাকে অন্য একটি স্থানে বসাইয়া দেন। অন্যত্র একটি টুলের উপর তাঁহাকে বসান হইল এবং টুলের পায়াগুলি জলের বাটীতে রাখা গেল, যাহাতে পিপীলিকা আসিতে না পারে। কিন্তু তথায়ও তিনি দেওয়ালে ঠেস দিয়া বসিতেন বলিয়া পিপীলিকা আসিয়া তাঁহার শরীরে বাসা বাঁধিল এবং পুনরায় মাটির দেওয়ালে তাঁহার পিঠের দাগ পড়িল। উক্ত দাগ এখনও দেখা যায়। মহর্ষির কঠোর তপস্যা হইতে আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারি যে, বাল্মীকি মুনির তপস্যার কথা অসম্ভব নহে। সত্য যুগে মুনিঋষিগণ দীর্ঘকাল ধ্যানস্থ থাকিলে বল্মীক আসিয়া তাঁহাদের শরীর ঘিরিয়া ফেলিত।

এই সময় তাঁহার আর এক শিষ্য ও সেবক জুটিলেন। তিনিও শাস্ত্রে

বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। মহর্ষির সর্বপ্রকার সেবাদি তিনি করিতেন। ইতিমধ্যেই মহর্ষির নাম দিগ্বিদিকে প্রচার হইয়াছিল এবং বহুলোক তাঁহাকে দেখিতে আসিত। একদিন উক্ত সেবক ভক্তির আতিশয্যে তাঁহাকে জীবন্ত ঈশ্বরজ্ঞানে মন্দিরস্থিত দেবমূর্তির মত ফুলচন্দন ও পঞ্চামৃত দ্বারা পূজা করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। মহর্ষি তখনও মৌনী ছিলেন। তিনি ইহা শুনিয়া অতিশয় বিরক্ত হইলেন এবং নিকটস্থ দেওয়ালে কয়লা দিয়া লিখিয়া দিলেন যে, "এই শরীরের দুটী অন্ন ব্যতীত অন্য কোন সেবা ও যত্নের আবশ্যক নাই, নাই।" উহাতে সেবক স্বীয় সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন। এই সময় একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক নিয়মিতভাবে মহর্ষির নিকট আসিতেন এবং তাঁহাকে অতিশয় ভক্তি-বিশ্বাস করিতেন।

রমণ মহর্ষি প্রথমতঃ অরুণাচলোপরি বিরূপাক্ষ গুহায় থাকিতেন। এই গুহাটী ওঙ্কারাকৃতি। বিরূপাক্ষ নামক জনৈক মহাপুরুষ উক্ত গুহায় তপস্যায় প্রাণপাত করিয়াছিলেন, তাঁহার নামানুযায়ী উহার এই নাম হইয়াছে। মহর্ষিকে দর্শন করিবার জন্য উৎসবাদি ব্যতীতও সাধারণ সময়ে লোকের ভীড় লাগিয়া থাকিত। তাই মন্দিরের ট্রাষ্টিগণ অর্থাগমের জন্য মহর্ষির দর্শনপ্রার্থী যাত্রীদের প্রত্যেকের নিকট হইতে এক এক পয়সা করিয়া 'কর' লইতে আরম্ভ করিলেন। মহর্ষি তৎশ্রবণে অতিশয় বিরক্ত হইয়া গুহার বহির্দেশে উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে আসিয়া আসন পাতিলেন। ট্রাষ্টিগণ প্রাঙ্গনে প্রবেশার্থীদিগের নিকট হইতেও এইরূপ চাঁদা আদায় করিতে লাগিলেন। তাহাতে মহর্ষি নিরতিশয় দুঃখিত হইয়া অন্য গুহায় চলিয়া গেলেন। তথায়ও তদ্রূপ লোকসমাগম হইতে লাগিল, আর বিরূপাক্ষ গুহায় কেহ আসিল না। তখন মন্দিরের তত্ত্বাবধায়কগণ মহর্ষির নিকট যাইয়া 'যাত্রীদের নিকট হইতে কর আদায় করিবেন না'—এই প্রতিজ্ঞা করিয়া ক্ষমা চাহিলেন। ইহাতে মহর্ষি পুনরায় বিরূপাক্ষ গুহায় আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

মহর্ষির দর্শকগণের মধ্যে অনেক পণ্ডিত শাস্ত্রের সংশয় বা ধর্ম-জীবনের সমস্যার সমাধানের জন্য তাঁহাকে প্রশ্ন করিতেন। তিনি তৎসমুদয় স্বীয় জীবন-

বেদের আলোকে পরিষ্কার ও প্রাঞ্জল করিয়া বুঝাইয়া দিতেন। এই সময় তামিল অনুবাদের সাহায্যে শঙ্করাচার্য্যের 'বিবেক-চূড়ামণি' তিনি পাঠ করিলেন এবং তামিলে উহার একটি বিবরণ লিখিয়াছিলেন। জনৈক ভক্ত-প্রদত্ত অর্থে উহা প্রকাশিত হইয়াছে। যিনি জীবন-বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন তাঁহার নিকট সমস্ত শাস্ত্রের গূঢ়ার্থ সহজ হইয়া যায়। অলৌকিক জীবন-বেদের নানা অংশ লইয়াই ধর্ম-শাস্ত্রসমূহ লিখিত। মহর্ষির নিকট বহু শাস্ত্রী ও পণ্ডিত শাস্ত্রার্থ বুঝিতে আসিতেন। তিনি উত্তরসমূহ মাটীতে, শ্লেটে বা কাগজে লিখিয়া দিতেন। গম্ভীরম্ শেষাইয়ার ১৯০০ এবং ১৯০১-২ খ্রীঃ অনেকগুলি উত্তর সহ কাগজ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। সেই সকল হইতে 'বিচার সংগ্রহ' নামক তামিল গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থে মহর্ষির উপদেশাবলীর সারাংশ পাওয়া যায়। মহর্ষি কাহাকেও প্রাণায়াম শিক্ষা দেন নাই। তিনি বলেন, উহা মনঃসংযমের অন্যতম উপায় মাত্র। তিনি স্বীয় জীবনেও উহা অভ্যাস করেন নাই। আত্মার উপর মনোনিবেশ করিলে চুম্বকের নিকটবর্তী লৌহখণ্ডের ন্যায় মন শীঘ্র সমাহিত হয়। শিবপ্রকাশম পিলে নামক জনৈক গ্রাজুয়েট সরকারী চাকুরী ত্যাগ করিয়া ধর্মসাধনে মনোযোগ দিলেন। পূর্ব হইতেই তাঁহার বৈরাগ্য ছিল এবং স্ত্রীবিয়োগের পর উহা বর্ধিত হয়। তিনি অরুণাচলের মন্দিরে ঈশ্বরাদেশ শুনিবার জন্য ধরণা দিয়া বিফলমনোরথ হন। শেষে তিনি মহর্ষির আশ্রয় গ্রহণ করেন। যখন তিনি মহর্ষির নিকট আসিয়া বসিয়া থাকিতেন, তাঁহার নানা দর্শনাদি হইত। তিনি কখনও মহর্ষিকে সহস্রচন্দ্রকিরণোজ্জ্বল দেবমূর্তিরূপে দেখিতেন। একবার তিনি দেখিয়াছিলেন, মহর্ষির মস্তক হইতে স্বর্ণবর্ণ শিশু বাহিরে আসিতেছে ও পুনর্বার ভিতরে প্রবেশ করিতেছে। যাহা হউক, এই সকল ঘটনা হইতে বুঝা যায় যে, তিনি মহর্ষির কৃপা লাভ করিয়াছিলেন। মহর্ষির নিকট যাতায়াতে তাঁহার মনে শান্তির উদয় হয়। তৎজিজ্ঞাসিত প্রশ্নগুলির উত্তর মহর্ষি অতি সুন্দরভাবে দিয়াছিলেন। 'আমি কে' এই প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি তাঁহাকে বলিলেন, "শরীর, ইন্দ্রিয়গণ, প্রাণ বা মন 'আমি' নহে। কারণ সুষুপ্তিতে এই সকলের লয় হয়। সুষুপ্তিতে এই সকলের অস্তিত্ব থাকে না।

নেতি নেতি ভাবেই 'আমি কে' জানার একমাত্র উপায়। যাহা আমি নয় তাহা বিচারপূর্বক ত্যাগ করিতে করিতে বাক্য-মনাতীত এমন এক অবস্থায় পৌছান যায় যেখানে তুমি বুঝিবে মৌনাবলম্বন অবশ্যম্ভাবী। সেই অবস্থাতেই মানুষ প্রকৃত 'আমি'র সন্ধান পায়। জগৎ, শরীর এবং ঈশ্বর এই অবস্থায় লয় পায়। কারণ 'আমি' ব্যতীত অন্য কিছুরই, এমন কি ঈশ্বরেরও, পরমার্থ সত্তা নাই। জগৎ, শরীর ও ঈশ্বরের সৃষ্টি মনেতেই হয়। মনোনাশের সঙ্গে সঙ্গে এই সকলের নাশ ঘটে। আর মনের উৎপত্তি হইলেই এই সব উৎপন্ন হয়। মন চিন্তাপ্রবাহ মাত্র। মনোনাশ করার অর্থ মনের ওপারে যাওয়া, চিন্তারাজ্যের অতীত হওয়া। এই অবস্থা লাভের শ্রেষ্ঠ উপায় বিবেক ও বৈরাগ্য সহ বিচার।"

মহর্ষি বলেন, মনের সমূহ বৃত্তি ও চিন্তার নিরোধ বা বিনাশই প্রকৃত বৈরাগ্য। তাঁহার একটী উপদেশ এই যে, মনে সন্দেহ উপস্থিত হইলে তাহা নিরাকরণের চেষ্টা না করিয়া সন্দেহকারীর খোঁজ করিলে সন্দেহ সহজে দূর হয়। মন যতদিন থাকিবে সন্দেহ ততদিন আসিবে। সংকল্প-বিকল্পই মনের ধর্ম। সুতরাং সম্পূর্ণ সন্দেহ-মুক্ত হইতে হইলে মনের পরপারে যাইতে হইবে।

কাব্যকণ্ঠ গণপতি শাস্ত্রী দাক্ষিণাত্যের একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত। তিনি মহর্ষির একান্ত অনুগত ভক্ত। তিনিই 'রমণ মহর্ষি' এই নামকরণ করিয়াছিলেন। উক্ত নামেই নবযুগের এই মহাপুরুষ জগৎপ্রসিদ্ধ। গণপতি শাস্ত্রী শিশুকালে মূক ছিলেন, পরে তিনি সুদক্ষ সংস্কৃত কবি হইয়াছেন। তিনি নবদ্বীপ ও কাশী প্রভৃতি তীর্থস্থান ভ্রমণ করিয়া পণ্ডিতগণকে তর্কযুদ্ধে পরাজিত করিয়াছেন। ইতিহাস, কাব্য, বেদ, ব্যাকরণ ও উপনিষদাবলী তিনি অধ্যয়ন করিয়াছেন। কনফুসিয়াসের মত তাঁহার বিশ্বাস ছিল, তিনি জগতে কোন বিশেষ কর্ম সাধনার্থ জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি মহাজাপক ছিলেন এবং সর্বদা জপ করিতেন। বেলোর স্কুলে শিক্ষকতা করিবার সময় তিনি একদল ছাত্র লইয়া মন্ত্রজপ দ্বারা শক্তিলাভের জন্য তপস্যা করিতে থাকেন। তাঁহাদের আদর্শ ছিল, উক্ত শক্তিলাভ করিয়া জগতের উন্নতি ও কল্যাণ বিধানে রত হইবেন। কিন্তু শক্তি তো দূরের কথা, তিনি শান্তিলাভ করিতে না পারিয়া

মহর্ষির চরণাশ্রিত হন। মহর্ষি প্রথম দর্শনে তাঁহাকে বলিলেন, "'আমি' বা 'অস্মিতার' উৎপত্তি-স্থল অন্বেষণ কর। তবেই শক্তি ও শান্তি লাভ করিতে পারিবে। মন্ত্রোচ্চারণ করিবার কালে মন্ত্র-শব্দ কোথা হইতে উঠিতেছে তাহা জান। উহাই প্রকৃত জপ।" এই শাস্ত্রীর শিষ্যত্বে ও সান্নিধ্যে মহর্ষির সংস্কৃতজ্ঞান অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছিল। মহর্ষি শ্বেত বস্ত্র পরিতেন, গেরুয়া বা কাষায় নহে। শাস্ত্রী অষ্টাদশ অধ্যায়ে পদ্যে 'রমণ গীতা' রচনা করিয়াছিলেন। মহর্ষির সহিত বাস করিবার সময় তিনি দেখিয়াছিলেন, আকাশ হইতে উল্কাসদৃশ জ্যোতির্ময় পদার্থ মহর্ষির মস্তক পুনঃ পুনঃ ছয় বার স্পর্শ করিয়া অন্তর্হিত হইল। মাদ্রাজের তিরিবত্তিউর নামক একটি স্থানে একটী গণেশ মন্দির আছে। তথায় শাস্ত্রী একবার মৌনাবলম্বনপূর্বক আঠার দিন তপস্যা করিতেছিলেন। শেষ দিবস তিনি জাগ্রত অবস্থায় শায়িত আছেন, এমন সময় মহর্ষিকে কোথা হইতে আসিয়া তাঁহার নিকট উপবিষ্ট হইতে দেখিলেন। শাস্ত্রী উঠিয়া বসিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু মহর্ষি তাঁহার মাথায় হাত দিয়া তাঁহাকে উঠিতে নিষেধ করিলেন। ইহাতে তিনি "হস্তদীক্ষা" লাভ করিলেন। তাঁহার সমস্ত শরীরে বিদ্যুতের ন্যায় দিব্যশক্তি প্রবেশ করিল। মহর্ষির নিকট উক্ত ঘটনা বর্ণনা করায় তিনি বলিয়াছিলেন, "একদিন আমি শুইয়া আছি, অথচ জাগ্রত। সহসা আমার শরীর শূন্যে উঠিতে লাগিল এবং চতুস্পার্শ্বস্থ বস্তুসকল ছাড়িয়া জ্যোতির্ময় রাজ্যে উপস্থিত হইল। ক্ষণকাল পরে অপরিচিত স্থানে আমি কোন এক গণেশ-মন্দিরে উপস্থিত হইলাম।"

রামস্বামী আইয়ার সরকারী চাকুরী করিতেন। তিনি উদরাময় রোগে বহু কষ্ট পাইয়াছিলেন। তাঁহার ভুক্তদ্রব্য আদৌ হজম হইত না, এবং রাত্রে একটুও ঘুম হইত না। তিনি অতিশয় চিন্তিত হইয়াছিলেন। মহর্ষির নিকট যাইয়া তিনি কৃপা প্রার্থনা করিলেন। তিনি বলিলেন, "মহাপুরুষগণ পাপী ও পীড়িত লোকদিগের শোক তাপ দূর করেন শুনিয়াছি। আমার কি কোন আশা নাই?" মহর্ষি তৎক্ষণাৎ কৃপার্দ্র হইয়া বলিলেন, "তোমার আশা আছে, কোন চিন্তা করিও না।" এই কথা বলিতে না বলিতেই অগ্নি বা

বিদ্যুতের মত এক শক্তি রামস্বামীর শরীরে প্রবেশ করিল। মুহূর্তের মধ্যে তাঁহার মস্তকের উত্তাপ কমিয়া গেল। মাথা শান্ত ও শীতল হইল। কোন ভক্ত মহিলা সেই দিন মহর্ষির নিকট অনেক ফল ও মিষ্টি আনিয়াছিলেন। মহর্ষির আদেশে অনিচ্ছাসত্ত্বেও তিনি অনেক খাবার খাইয়া ফেলিলেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই সব হজম হইয়া গেল এবং সেই দিন হইতে রামস্বামীর গভীর নিদ্রা হইতে লাগিল এবং পেটের অসুখ সারিয়া গেল। মহর্ষি মৌমাছি, বানর, ময়ূর প্রভৃতি অনেক পক্ষী এবং বন্য জন্তুদের প্রতি বিশেষ দয়ালু ছিলেন। তাহারাও স্বাধীন ভাবে নিঃসঙ্কোচে আসিয়া তাঁহার নিকট আহার গ্রহণ করিত। মহর্ষি তাঁহার ভক্তদের 'রিভুগীতা' পাঠ করিতে প্রায়ই বলিতেন। তিনি বলেন, "প্রকৃত আত্ম-স্বরূপ-বিস্মৃতিই আমাদের সর্বপ্রকার দুঃখের মূল। সদা পরমাত্মার চিন্তা করিলে মানুষ চির শান্তিলাভ করিবে এবং সর্ব দুঃখের পারে যাইবে।" অনেক মহাপুরুষ হস্তপদ দ্বারা স্পর্শ করিয়া শিষ্যদেহে শক্তি সঞ্চার করেন, কিন্তু মহর্ষি কেবল দৃষ্টি দ্বারা সব কিছু করিতে পারেন। এইরূপ প্রক্রিয়াকে শাস্ত্রে 'দৃষ্টি-দীক্ষা' বলে। মনের ও মস্তিষ্কের শক্তি বৃদ্ধির একমাত্র উপায় মহর্ষির মতে চিন্তা বন্ধ রাখা। বেশী চিন্তা করিলে মন অবসন্ন হইয়া পড়ে। তখন মনের কর্ম বা চিন্তা স্থির করিতে হয়। উহাই প্রকৃত ধ্যান। নিদ্রায় কেবল দেহের বিশ্রাম হয়। কারণ নিদ্রিত অবস্থায় মনের চিন্তা চলিতে থাকে। স্বপ্ন তাহার প্রমাণ। কিন্তু ধ্যানে শরীর ও মন উভয়ই বিশ্রাম লাভ করে। যিনি প্রকৃত-ভাবে ধ্যান করিতে পারেন তাঁহার আর নিদ্রার আবশ্যক হয় না। তাই যোগীদের 'গুড়াকেশ' বলে। প্রকৃত ধ্যানী যে আত্যন্তিক বিশ্রাম লাভ করেন সুষুপ্তিতে তাহার খুব কমই লাভ হয়। মহর্ষির মতে স্থায়ী শান্তি ও বিশ্রাম আনিতে পারিলে শরীরের অনেক রোগ দূর হয়। ফ্রয়েড, জুং ও এ্যাড্‌লার প্রভৃতি বিখ্যাত মনোবৈজ্ঞানিকগণ বলেন যে, মনের অশান্তি ও ক্লান্তিই অধিকাংশ রোগের মূল কারণ। আমেরিকার বিখ্যাত দার্শনিক উইলিয়াম জেম্‌স্ তাঁহার বিখ্যাত Verities of Religious Experience নামক পুস্তকে স্বীয় অভিজ্ঞতা হইতে উক্ত সত্য সমর্থন করেন। তিনি বাল্যকাল হইতেই চল্লিশ

বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ভগ্ন স্বাস্থ্য ও অনিদ্রায় ভুগিতেছিলেন। তিনি বহু প্রকার চিকিৎসালাভ ও নানাস্থানে বায়ুপরিবর্তন করিয়াও কোন উপকার পান নাই। সহসা জনৈক mental healer (মানসিক চিকিৎসক) এর সহিত তাঁহার আলাপ হয়। উক্ত চিকিৎসক তাঁহাকে বলিলেন, "মনই সর্বশক্তিসম্পন্ন। মনের শক্তিতেই শরীরের সমস্ত কাজ চলিতেছে। মনের হাতে শরীর পুত্তলিকা মাত্র। 'আমি সম্পূর্ণ নীরোগ ও সুস্থ'—এইরূপ যতই আমরা ভাবিব ততই আমাদের শরীর নীরোগ ও সুস্থ হইবে। নিদ্রার পূর্বে এই চিন্তা করিয়া শয়ন করায় জেম্‌স্‌ বহু বৎসর পরে প্রথম দিনেই গভীর নিদ্রা উপভোগ করিলেন। ইহার পর তিনি যে উনিশ বৎসর জীবিত ছিলেন তাহাতে কখনও অনিদ্রায় কষ্ট পান নাই। তিনি বলেন যে, শিশুর ন্যায় মনের এই অসীম শক্তিমত্তায় সরল বিশ্বাস আনিতে তাঁহাকে প্রায় দুই বৎসর অভ্যাস করিতে হইয়াছিল। কিন্তু ইহার ফলে তাঁহার শরীরের সর্বত্র স্বাস্থ্য বিকশিয়া উঠিতে লাগিল। তিনি এইরূপ নিরাময় হইবার কৌশলকে Gospel of Relaxation (বিশ্রাম-বাণী) বলিয়াছেন।

মহর্ষির নিকট যাঁহারা আসিতেন তাঁহারা প্রায়ই বলিতেন যে, তাঁহাদের অনেকের জ্যোতিঃদর্শন, রোগারাম, শান্তিলাভ প্রভৃতি হইয়াছে। ইচ্ছাম্মল নামক জনৈকা বৃদ্ধা জীবনে অনেক শোক ও কষ্ট পাইয়াছিলেন। যৌবনকালেই তাঁহার পতি, পুত্র ও কন্যার মৃত্যু হয়। তিনি ধনীর কন্যা ছিলেন। ভারতের নানা স্থানে সাধুসেবা ও সাধুদর্শনাদি করিয়াও তাঁহার হৃদয় শান্ত হয় নাই। অত্যন্ত দুঃখিত অন্তরে তিনি রমণ মহর্ষির চরণে উপস্থিত হইলেন। একঘণ্টা কাল প্রথম দর্শনে বৃদ্ধা মহর্ষির নিকট বসিয়া রহিলেন, কোন বাক্যালাপ করিলেন না। অথচ আশ্রম ছাড়িতে তাঁহার ইচ্ছা হইল না। তাঁহার মনে এক গভীর পরিবর্তন আসিল। সেইদিন হইতে তিনি চির শান্তির অধিকারিণী হইলেন। তাঁহার হৃদয়াকাশ হইতে দুঃখ-মেঘ চিরতরে অন্তর্হিত হইল। তিনি তাহার পর দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর কাল মহর্ষি ও তৎশিষ্যগণের সেবায় জীবন পাত করিয়াছিলেন। তাঁহার সমস্ত অর্থ, দেহ ও মন রমণ মহর্ষির চরণে উৎসর্গীকৃত হয়।

"দুঃখীর সহিত দুঃখিত এবং সুখীর সংসর্গে সুখী হও।" ইহাই মহর্ষির বাণী। তাঁহার মত এই যে, Sorrow shared is sorrow lost but happiness shared is infinitely multiplied. অর্থাৎ সহানুভূতি দ্বারা দুঃখ বিনষ্ট কিন্তু সুখ শতগুণে বর্ধিত হয়। সাধুসেবাতে ইচ্ছাম্মল নিজেকে বিলাইয়া দিলেন। তদ্ব্যতীত তিনি আধ্যাত্মিক রাজ্যেও যথেষ্ট অগ্রসর হইতেছিলেন। ধ্যান করিতে করিতে তাঁহার জ্যোতিঃদর্শনাদি হইত। তিনি একাসনে চব্বিশ ঘণ্টারও অধিক কাল ধ্যানস্থ থাকিতে পারিতেন। মহর্ষি তাঁহার ভক্তদের জ্যোতিঃদর্শনাদিতে বিন্দুমাত্র মনোযোগ দিতে নিষেধ করেন। প্রায়ই বলিতেন, জ্যোতিঃদর্শন নহে, আত্মসাক্ষাৎকারই আমাদের উদ্দেশ্য ও আদর্শ। ইচ্ছাম্মল সর্বদা মহর্ষির চিন্তায় ও সেবায় ডুবিয়া থাকিতেন। তাই তিনি অনেক সময় মহর্ষির সূক্ষ্ম শরীর দেখিতে পাইতেন। মহর্ষি তাঁহাদের সকলকে দর্শনাদির দিকে লক্ষ্য না করিয়া আত্মধ্যানে নিমগ্ন হইতে বলিতেন। রাঘবাচারিয়ার নামক মহর্ষির এক ভক্ত একদিন দেখিলেন, মহর্ষির শরীর জ্যোতির্ময় হইয়া নিরাকার আকাশে পরিণত হইতেছে। খানিকক্ষণ পরে আবার তাহা পূর্বরূপ ধারণ করিল।

এফ. এইচ. হাম্‌ফ্রেজ নামক জনৈক ইংরাজ সরকারী পুলিশ বিভাগে চাকুরী করিতেন। তিনি মহর্ষিকে দুই তিনবার দর্শন করিতে আসেন। তিনি সিদ্ধাই বা যৌগিক শক্তিবলে জগৎকে সাহায্য করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে মহর্ষি তাহাকে বলিয়াছিলেন, "প্রথমে নিজেকে সাহায্য কর ও নিজেকে জান। তাহার দ্বারাই দুনিয়াকে প্রকৃত সাহায্য করিতে পারিবে। ধ্যানাভ্যাসে অগ্রসর হইলে 'দর্পণে দৃশ্যমান নারীতুল্যা' এই বিশ্বকে যখন মনে ভাসমান দেখিবে, তখন এই বিভূতি-তৃষ্ণা দূর হইবে।" মহর্ষি হাম্‌ফ্রেজকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা এবং তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী. হাম্‌ফ্রেজ ইংলণ্ডের International Psychic Gazetteএ প্রকাশ করিয়াছিলেন। হাম্‌ফ্রেজকে প্রদত্ত উপদেশাবলীর সারাংশ এই, "প্রকৃত মহাত্মা তিনিই যিনি ঈশ্বরের চিন্তায় আত্মহারা হইয়াছেন এবং নিজেকে ঈশ্বরের হস্তে যন্ত্রবৎ উপলব্ধি করিয়াছেন।

এইরূপ মহাত্মার মুখ দিয়াই ভগবান কথা বলেন। তাঁহার হাত দিয়াই ভগবান ঐশ্বর্য প্রকাশ করেন। আমি তোমাকে অন্তরের কথা বলিতেছি। দর্শন বা দৃশ্য বস্তু হইতে মন তুলিয়া লও। যিনি জ্ঞাতা ও দ্রষ্টা তাঁহাকেই জান। বিজ্ঞাতাকে জানাই প্রকৃত জ্ঞান। ইহাই প্রকৃত ধর্ম। সর্বধর্মের আদর্শ এই মনাতীত ভূমিতে পৌছানো। ঈশ্বরই সংসার, সবই ঈশ্বর। জন্মজন্মান্তরীণ অভ্যাস সকল ভাঙ্গিয়া দৃশ্য জগতের পশ্চাতে এক অখণ্ড সত্তা দেখিতে শেখ। দৃশ্য জগতই সব বা শেষ নয়, উহা বিশ্বমনের কল্পনা বা সৃষ্টি। মনের যে অসীম সৃষ্টি-শক্তি আছে তাহা স্বপ্নে বিশেষরূপে জানা যায়। মনের কল্পনাশক্তি বন্ধ কর এবং মনের উৎস জানিতে সচেষ্ট হও। এইরূপ শুদ্ধ মনে আত্মজ্ঞান প্রতিভাত হয়। প্রকৃত জ্ঞান বাহির হইতে আসে না। উহা অন্তরেই বিদ্যমান। মনের সংকল্প-বিকল্প বন্ধ হইলে সূর্য্যের ন্যায় সেই প্রজ্ঞা প্রকাশিত হইবে। স্বারাজ্য, স্বাধীনতাই মানবের সনাতন স্বভাব। মানুষ যে পাপাচরণ করে তাহা এই স্বাধীনতা ও সুখের অন্বেষণেই। ভ্রমের অধীন হইয়াই মানুষ বৃথা এই পথে সুখ অন্বেষণ করে। পাপী ও ধার্মিক, সংসারী ও সন্ন্যাসী সকলের উদ্দেশ্য একই, সুখলাভ।”

রমণ মহর্ষি অন্যান্য সাধুদের নিকট হইতেও অনেক যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন। তৎসমুদয় তিনি অম্লান বদনে সহ্য করিতেন এবং অত্যাচারীদের প্রতি ঈর্ষাভাব পোষণ করিতেন না। একজন তাঁহাকে আঘাত বা হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার দিকে পাহাড়ের উপর হইতে সুবৃহৎ প্রস্তরখণ্ড গড়াইয়া দিয়াছিলেন। আর একজন সন্ন্যাসী, যিনি ইংরাজী, ফ্রেঞ্চ, সংস্কৃতাদি নানা ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন, মহর্ষির গুহায় আসিয়া মহর্ষির গুরুরূপে আসর জমাইলেন। মহর্ষি ছিলেন সদা মৌনী; তিনি এ বিষয়ে আদৌ দৃক্‌পাত করিতেন না। লোকজন মহর্ষিকে দেখিতে আসিলে উক্ত সন্ন্যাসী বলিতেন, “এই সাধু আমার চেলা, ইহাকে তোমরা ফল, দুধ খেতে দিও” ইত্যাদি। মহর্ষির ভক্তগণ উহাতে বিশেষ বিব্রত হইয়া পড়িলেন। একদিন একজন সাধু রাগ করিয়া মহর্ষির গায়ে থুথু ফেলায় মহর্ষি স্বভাবসুলভ নীরবতা অবলম্বন করিয়া বসিয়া

রহিলেন, তাঁহাকে কিছু বলিলেন না। অথচ তাঁহার অনুগত ভক্তগণ এই সাধুকে কিছু উত্তম মধ্যম (প্রহার) দিতে চাহিলেন, তখন ভণ্ড সাধু পলাইয়া বাঁচিল। আর একজন সাধু নির্বিকল্প সমাধি শিক্ষা দিবেন বলিয়া মহর্ষিকে নিকটে ডাকাইয়া ধ্যানস্থ হইলেন। মহর্ষিকে ধ্যান দীক্ষা দেওয়া তো দূরের কথা, আধ ঘণ্টা পরে সাধু নিজেই সুষুপ্তিমগ্ন হইলেন! কোন সাধু তাঁহাকে অভিশাপের ভয় দেখাইয়া বলিলেন, "যদি মহর্ষি তাঁহাকে গুরুরূপে গ্রহণ না করেন মহর্ষির সর্বশক্তি বিনষ্ট হইবে।" ইহাতে মহর্ষি অচল অটল মেরুবৎ অবিচলিত রহিলেন। অন্য কতিপয় সাধু তাঁহাকে বলিলেন, "আমরা তোমাকে দত্তাত্রেয় মন্ত্রে দীক্ষিত করিব। ঈশ্বর আমাকে স্বপ্নে দর্শন দিয়া তোমাকে উপদেশ দিবার জন্য আদেশ করিয়াছেন।" মহর্ষি তদুত্তরে বলিলেন, "ভগবান নিজে আমাকে দর্শন দিয়া তাহা গ্রহণ করিতে না বলিলে আমি উহা লইব না।" মহর্ষির সম্মান ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া তত্রস্থ ভণ্ড সাধুদের গাত্রদাহ উপস্থিত হইল। তাহাদের কয়েকজন মিলিয়া মহর্ষিকে অরুণাচল হইতে তাড়াইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হন নাই।

মহর্ষির দুই ভ্রাতার মধ্যে অগ্রজ নাগস্বামীর মৃত্যু ইতোপূর্বেই হইয়াছিল। স্বগৃহে মাত্র তদনুজ নাগসুন্দরম্ ছিলেন। বৃদ্ধা মাতা নাগসুন্দরমের সহিত কখনো কখনো মহর্ষিকে দেখিতে আসিতেন। বৃদ্ধার নাম ছিল আল্লগম্মল। তিনি একবার ৺কাশীধামে গিয়াছিলেন। একসময় তিনি সন্ন্যাসীপুত্র রমণ মহর্ষিকে দেখিতে যাইয়া দুই তিন মাস পীড়িত হইয়া পড়েন। সেবার মহর্ষি তাঁহাকে প্রাণপণে সেবাশুশ্রূষা করিয়া বাঁচাইলেন। একটি ঋণদায়ে তাঁহার পৈতৃক গৃহ ও সম্পত্তিসমূহ বিক্রীত হইয়া গেল। আল্লগম্মল ও নাগসুন্দরম্ মহর্ষির নিকট বাস করিতে লাগিলেন। মাতা মহর্ষি ও তাঁহার ভক্তদের জন্য রন্ধনাদি কার্য্য করিতেন এবং এইরূপে ব্রহ্মজ্ঞানী জীবন্মুক্ত সুপুত্রের পবিত্র স্পর্শে থাকিয়া শেষ জীবন ঈশ্বরচিন্তায় কাটাইলেন। নাগসুন্দরম্ সন্ন্যাস গ্রহণান্তে নিরঞ্জনানন্দ স্বামী নামে মহর্ষির নিকট বাস করিতে লাগিলেন। আল্লগম্মল প্রথমতঃ নির্বুদ্ধিতার জন্য মহর্ষির নিকট বিশেষ সম্মান ও শ্রদ্ধা চাহিতেন। মহর্ষি তাঁহাকে স্পষ্ট

বলিয়া দিলেন যে, সব নারীই এখন তাঁহার জননী। সুতরাং সকলকেই তিনি সমানভাবে শ্রদ্ধা করিবেন। মাতা নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া মিথ্যাভিমান ত্যাগ করিলেন। তিনি শেষে কাষায় বস্ত্র পরিয়া সন্ন্যাসিনীর মত থাকিতেন. বৃদ্ধা জননী পুত্রের সহিত প্রায় ছয় বৎসর ছিলেন। শেষ জীবনে প্রায় দুই বৎসর তিনি অনেক রোগ-যন্ত্রণা ভোগ করেন। মহর্ষি এই সময় আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া মাতার সেবা করিয়াছিলেন। মৃত্যু-দিবস মহর্ষি মাতার মস্তকে হাত রাখিয়া ঈশ্বরের ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। এদিকে সমবেত ভক্তগণ উচ্চৈঃস্বরে রামনাম গান করিতে লাগিলেন। বেদপাঠও চলিতে লাগিল। এরূপ স্বর্গীয় পরিবেশে মাতার প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। মৃতদেহ যথারীতি প্রোথিত হইলে মহর্ষি অন্নাহার করিলেন; কোন প্রকার অশৌচ পালন করিলেন না। শাস্ত্রও বলেন যে, জীবন্মুক্ত পুরুষ শুচি-অশুচির অতীত। মাতার মৃত্যুতে মহর্ষি আদৌ শোকে মুহ্যমান হন নাই। যিনি নশ্বর শরীর ও মনের পরপারে পরমাত্মার দুর্লভ দর্শন লাভ করিয়াছেন তাঁহার নিকট মৃত্যু মিথ্যা! মৃত্যুর বিভীষিকা তাঁহাকে আদৌ ভীত করিতে পারে নাই। মাতার মৃত শরীর মহর্ষির আদেশে প্রোথিত করা হইল, অগ্নিসাৎ করা হইল না। তাঁহার কবরের উপরে একটি সমাধিমন্দির নির্মিত হইয়াছে এবং মাতৃভূতেশ্বর নামক শিবলিঙ্গের নিত্য পূজা তথায় হয়। ধন্য জননী! তুমি এমন সুপুত্র গর্ভে ধারণ করিয়াছিলে। তোমার পুত্রের তপস্যায় জননী, কুল, জন্মভূমি ও ধরিত্রী কৃতার্থা হইয়াছেন।

অরুণাচল পর্বতে মহর্ষি ব্যতীত শেষাদ্রি স্বামী নামে আর একজন মহাপুরুষ বাস করিতেন। তিনি ১৯১৯ খ্রীঃ দেহরক্ষা করিয়াছেন। তিনি প্রকৃত সাধু ছিলেন। তাই তাঁহার মৃত্যুর সময় সহস্র সহস্র নরনারী সমবেত হইয়াছিল। এই দুই মহাপুরুষকে অরুণাচলের 'দুই চক্ষু' বলা হইত। উভয়ের মধ্যে গভীর প্রেম ছিল। গ্রীক মনীষি এপিক্টেটাস (Epictatus) সত্যই বলিয়াছেন যে, জ্ঞানীদের বা সাধুদের মধ্যে প্রকৃত স্থায়ী প্রেম ও প্রীতি সম্ভব। জ্ঞানীই জ্ঞানীকে বুঝিতে সমর্থ। অজ্ঞানী জ্ঞানীকে বুঝিবে কিরূপে? কাঞ্চীর

কামাক্ষী মন্দিরে শেষাদ্রি স্বামী দিবারাত্র ধ্যানজপে অতিবাহিত করিতেন। কামাক্ষী দেবী তাঁহাকে দর্শন দিয়াছিলেন। তাহার পর হইতে শেষাদ্রি স্বামী সমস্ত রাত্রি ধ্যানে কাটাইয়া দিতেন। তাঁহার ব্রাহ্মণ শরীর ছিল এবং তিনি চিরকুমার ছিলেন। মহর্ষি ও শেষাদ্রি স্বামী উভয়েই বাল্যকালে গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন। উভয়েই মৌনী ছিলেন। উভয়ের প্রতি উভয়ে শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন। এইজন্য উভয়েই জীবনের অধিকাংশ সময় অরুণাচলে কাটাইয়াছেন। শেষাদ্রি স্বামী মহাপণ্ডিত ছিলেন এবং ধ্যানে মন্ত্র দর্শন করিয়া অপরকে দীক্ষা দিতে পারিতেন। অরুণাচলে আসিয়া মহর্ষি যখন কাঞ্চন ত্যাগ করিয়াছিলেন তাহার পর তিনি আর কাঞ্চন গ্রহণ তো দূরের কথা, উহা আর স্পর্শই করেন নাই! অথচ তাঁহার আশ্রমে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আহার্য্য আসিত। শত শত অতিথি ও অভ্যাগত ভোজন করিতেন, কোন কিছুর অভাব হইত না। কাঞ্চন এমন বস্তু যে, উহাকে যিনি ত্যাগ করেন তাঁহার নিকট উহার প্রচুর আমদানি হয়। আর যিনি উহার পশ্চাৎ ধাবন করেন তিনি বৃথা আলেয়ার অন্বেষণ করেন। ঋষি ডাইওজিনিস স্বীয় টাবে শুইয়া সম্রাট আলেকজাণ্ডারকেও অগ্রাহ্য করিলেন। আলেকজাণ্ডার তাঁহার কিছু সেবা করিতে চাহিলে ডাইও-জিনিস বলিয়াছিলেন, "তুমি এস্থান ত্যাগ করিলেই আমি সুখী হইব।" শ্রীরমণ মহর্ষি আজীবন সংসারের স্পর্শে আদৌ আসেন নাই। তাঁহার জীবন অনাঘ্রাত কুসুমতুল্য সুন্দর ও পবিত্র ছিল। ঈশার মত তিনি যে শুধু কামিনী-কাঞ্চনত্যাগী ছিলেন তাহা নহে, তিনি অন্যায় (evil) এর প্রতিবাদও করিতেন না।

একবার আশ্রমে কয়েকজন চোর আসিয়া প্রবেশ করিল। গ্রীষ্মকালের গরম রাত্রি। তাহারা সকলের অজ্ঞাতসারে কিছু জিনিষ লইয়া পলায়ন করিল। সাহস পাইয়া আবার কয়েকজন দস্যু গভীর রাত্রে আশ্রমে একদিন উপস্থিত হয়। তাহারা প্রথমে আশ্রমবাসীদের মনে ভয় জাগাইবার জন্য জানালার গ্লাসগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিল। আশ্রমবাসীরা জাগ্রত হইয়া দস্যুদের বাধা দিতে ও প্রহার করিতে চাহিলে মহর্ষি বাধা দিয়া বলিলেন, "দস্যুরা

তাহাদের ধর্ম পালন করুক। আমরা সাধু, আমরা আমাদের ধর্ম পালন করিব। আমরা সমস্ত বিপদ সহ্য করিয়া যাইব। উহাদের সহিত লড়িব না।” তাঁহাদের তিতিক্ষায় উৎসাহিত হইয়া দস্যুগণ আশ্রমের চাকর দুইটিকে ভীষণভাবে প্রহার করে। মহর্ষিকেও তাহারা এক ঘুষি মারিয়াছিল। মহর্ষি ইহাতে বিচলিত না হইয়া বলিয়াছিলেন, “তোমরা যদি ইহাতে সন্তুষ্ট না হও, আমাকে আরও প্রহার করিতে পার।” দস্যুগণ একটী ল্যাম্প চাহিলে চাকরেরা তাহা দিতে অস্বীকার করিল। কিন্তু মহর্ষি দস্যুদের আলোক দিবার জন্য চাকরদের আদেশ দিলেন। আশ্রমে কোন অস্থাবর সম্পত্তিই ছিল না। দস্যুগণ অর্থ চাহিলে মহর্ষি বলিলেন, “আমরা ভিক্ষান্নে জীবন ধারণ করি; আমাদের সঞ্চিত কোন অর্থ নাই। সামান্য আহার্য্য মাত্র আছে।” চাকরদের নিকট কয়েকটি টাকা ছিল। দস্যুরা তাহা লইয়া পলাইয়া গেল। চাকরেরা তখন দস্যুদের প্রহার করিতে উদ্যত হইলে মহর্ষি তাহাদের নিষেধ করিয়া বলিলেন, “আমরা আমাদের ধর্ম ত্যাগ করিব না। তাহারা অজ্ঞানী ও বিপদগামী। আমাদের কর্ত্তব্য আমরা ভুলিব না। অন্যায়ের দ্বারা কখনও অন্যায়ের প্রতিকার সম্ভব নয়। হিংসার দ্বারা হিংসা দূর হয় না। প্রেমই হিংসার একমাত্র ঔষধ। কুকুর আমাদের পা কামড়াইলে আমরাও কি তাহার পা কামড়াইব? আমরা ভুলিয়া যদি কখনও দাঁত কামড়াই তখন কি আমরা দাঁত তুলিয়া ফেলি?” মহর্ষি উহাতে আদৌ বিচলিত হইলেন না। তিনি প্রথম হইতে শেষ অবধি স্থির, ধীর ও শান্ত ছিলেন। কিছুক্ষণ পরে যখন খবর পাইয়া পুলিশ আসিল তখন তাহাদের নিকট দস্যুদের বিরুদ্ধে তিনি কোন কিছুই বলিলেন না। তিনি পূর্ববৎ সমবেত লোকদের সহিত সৎপ্রসঙ্গ করিতে লাগিলেন। সেইদিন বা তাহার পর কোন দিনই মহর্ষি চোরদের বিষয়ে কোন ক্রোধ বা হিংসা প্রকাশ করেন নাই। এরূপ ক্রোধমুক্ত মহাপুরুষ জগতে বিরল দেখা যায়। কয়েক সপ্তাহ পরে এই সকল চোর অন্যগৃহে চুরি করিতে যাইয়া ধৃত হয়। বিচারে তাহাদের গুরুতর শাস্তিও হইয়াছিল। অনেকেই অহিংসার বাণী প্রচার করেন। আমরা প্রায়ই শুনি বা পড়ি যে,

দক্ষিণ গণ্ডে কেহ চড় মারিলে বাম গণ্ড তাহাকে বাড়াইয়া দিবে, কিন্তু এই নীতি জীবনে কয়জন পালন কবিতে পারেন ?

ধর্মজগতেও বকাউল্লা এবং শোনাউল্লাই সমধিক ; করমুল্লা অতি অল্প। দুঃখ ও যন্ত্রণা সহ্য করিয়া প্রেম ও অহিংসা পালন অতি অল্প লোকেই করিতে পারেন। শ্রীরমণ মহর্ষির জীবন সমত্বে ও বৈরাগ্যে এইরূপ পূর্ণ হইয়াছিল যে, তিনি অহিংসা ও প্রেমের প্রতিমূর্তি ছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। দক্ষিণেশ্বরের শ্রীরামকৃষ্ণ এবং গাজীপুরের পওহারী বাবার জীবনে এইরূপ অহিংসার জীবন্ত আদর্শ দেখিতে পাওয়া যায়। পওহারী বাবার কুটীরে যে চোর আসিয়াছিল সে সব জিনিষ লইয়া যাইতে পারে নাই বলিয়া তিনি নিজে বাকী দ্রব্য লইয়া চোরের পশ্চাতে ছুটিয়াছিলেন। মহাপুরুষের প্রেমে মহাপাপী শেষে চৌর্যবৃত্তি ছাড়িয়া উন্নত সাধু হইয়া গেল।

সত্যই জনৈক মনীষি বলিয়াছেন, "An embrace of love is stronger than a crusade of war." (ধর্মযুদ্ধ অপেক্ষা প্রেমালিঙ্গন অধিকতর শক্তিশালী)। পওহারী বাবা গভীর প্রেম প্রদর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া সেই চোর পরজীবনে মহাসাধু হইয়াছিল। ভগবান্ বুদ্ধের প্রেমস্পর্শে অঙ্গুলিমালা মহাভিক্ষু হইয়াছিলেন।

যিনি উচ্চ নীচ সকলকেই সমানভাবে ভালবাসেন তিনিই প্রকৃত সাধু। রমণ মহর্ষি আশ্রমের পশুদিগকে অতিশয় স্নেহ করিতেন। তিনি নাম ধরিয়া ডাকিলে আহূত পশুটি তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইত। মানুষ ও পশু তাঁহার নিকট সমান ছিল। তিনি সমদর্শী ছিলেন, কারণ সকলের মধ্যে তিনি আত্মদর্শন করিতেন। ইংরাজ কবি পোপ (Pope) সত্যই বলিয়াছেন যে, প্রকৃতি যাঁহার শরীর, ঈশ্বর যাঁহার আত্মা, সেই বিশ্বসত্বাই ব্রহ্ম হইতে কীট পরমাণু সকলের মধ্যে বিরাজমান। কুকুর, বিড়াল, গাভী প্রভৃতি গৃহপালিত জন্তুরা মহর্ষির অতীব প্রিয় ছিল। তিনি তাহাদিগকে শুধু স্নেহ নহে, শ্রদ্ধাও করিতেন। তাহাদিগকে তিনি কখনও দুর্ব্যবহার বা প্রহার করিতেন না। জনৈক আশ্রমবাসী একদিন একটি কুকুরকে সামান্য প্রহার করে।

কুকুরটি তাহাতে চিরতরে আশ্রমত্যাগ করিয়া পলায়ন করে। আশ্রমে সেণ্ট বার্ণার্ড (St. Bernard) কুকুরদের মত কয়েকটি বড় বড় কুকুর ছিল। তাহারা মহর্ষির ইঙ্গিতে যাত্রিগণ ও দর্শকদিগকে অরুণাচলের সমস্ত দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখাইয়া দিত। এইরূপ একটি কুকুরকে একটা চাকর কোন কারণে গালিগালাজ করে। অল্পক্ষণ পরে দেখা গেল. কুকুরটীর মৃতদেহ আশ্রম-পুষ্করিণীতে ভাসিতেছে! সে অভিমানে জলে ডুবিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে! মহর্ষি সেদিন আশ্রমবাসিগণকে বলিলেন, "কোন সাধু হয়ত কর্মবশে এই কুকুর-শরীর ধারণ করিয়াছিল। মানুষের মত তাহাদের প্রতি আমাদের ভদ্র ব্যবহার করা উচিত।"

আশ্রমস্থ কোন কুকুর বা গাভী বা বানরের অসুখ হইলে মহর্ষি স্বয়ং তাহার শুশ্রূষা করিতেন। তাহাদের মৃত্যুশয্যায় তিনি বসিয়া থাকিতেন এবং তাহাদের মৃতদেহ নরশবদেহের ন্যায়ই ভূগর্ভে প্রোথিত করা হইত। বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গাভী হস্তী, কুকুর ও চণ্ডালের প্রতি মহর্ষি সমদর্শী ছিলেন। গীতোক্ত সমদর্শিত্ব তিনি সত্যসত্যই লাভ করিয়াছিলেন।

শ্রীরমণ মহর্ষির সমক্ষে পণ্ডিত ও গাভী সমান আহার, সেবা ও যত্ন পাইত। ক্ষুধিত গাভী তাহার নিকট আসিয়া আবদার জানাইলে তিনি তাহাকে আহার দিতেন। বাগানের কলা ও অন্যান্য ফল তিনি তাহাদের মুখে দিতেন। পূর্বে বানরগণ মহর্ষিকে তাহাদের অন্যতম বলিয়া মনে করিত। তাহাদের মধ্যে কলহ হইলে উভয় পক্ষ মহর্ষির নিকট উপস্থিত হইত এবং তিনি তাহাদের বিবাদ মিটাইয়া দিতেন। একবার একটি ছোট বানরকে দলের মোড়ল কোন কারণে প্রহার করে। তাহাতে তাহার একটি হাত ভাঙ্গিয়া যায়। মহর্ষি তাহাকে আশ্রমে রাখিয়া সেবাশুশ্রূষা করিয়া আরোগ্য করেন। তাহার পর হইতে দলে দলে বানর মহর্ষির নিকট আহারার্থ আসিত। আর সেই ছোট বানরটি মহর্ষির কোলে গিয়া বসিত। তাহাকে দুধ, অন্ন বা ফল প্রভৃতি খাইতে দিলে সে মহর্ষির ক্রোড়ে বসিয়াই তাহা আহার করিত। বানরদের রাজার যখন অসুখ হয় তখন মহর্ষি উহাকে স্বীয় ক্রোড়ে রাখিয়া তাহার ঔষধ ও

পথ্যাদির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাহার মৃত্যু হইলে তাহাকে সন্ন্যাসিগণের মত যথারীতি কবর দেওয়া হইয়াছিল।

কাক ও কোকিলাদি পক্ষিগণও মহর্ষির গাত্রে বসিয়া তাহার হাত হইতে আহার্য্য গ্রহণ করিত। বৃশ্চিককেও তিনি নিহত করিতেন না। তিনি তিন বার বৃশ্চিকদষ্ট হইয়াছিলেন, কিন্তু কোন যন্ত্রণা পান নাই। একটি সাপ আশ্রমে প্রবেশ করিলে মহর্ষি তাহাকে বাহিরে যাইতে আদেশ করেন। সাপটি কিয়দ্দূর যাইয়া আবার ফিরিয়া দাঁড়ায় ও মহর্ষির দিকে তাকায়। মহর্ষিও কয়েক মিনিট তাহার দিকে তাকাইয়া রহিলেন। ইহাতে উভয়ের মধ্যে এইরূপ প্রীতি স্থাপিত হয় যে, সাপটি তাহার পদতলে খানিকক্ষণ পড়িয়া থাকিয়া পরে চলিয়া যায়। একদিন অরণ্যের মধ্য দিয়া যাইবার সময় তাঁহার বামপদ লাগিয়া তত্রস্থ মৌমাছির চাক ভাঙ্গিয়া যায়। একদল মৌমাছি আসিয়া মহর্ষির উরুপদে কামড়াইতে আরম্ভ করিল। তিনি তাহাদিগকে তাড়াইলেন না, বা নিজে যন্ত্রণায় অস্থির হইলেন না। সমাধির অবস্থায় তাঁহার মুখমণ্ডলে যেমন সৌম্যভাব দৃষ্টিগোচর হয় এই যন্ত্রণাদায়ক অবস্থায়ও তাহা অন্তর্হিত হইল না। খানিকক্ষণ পরে মৌমাছিরা চলিয়া গেল। তখন মহর্ষি বলিলেন, "এইরূপ বিশেষ কষ্টভোগের দ্বারা বিশেষ বিশেষ কর্মক্ষয় হইয়া যায়।" এই বিষয়ে মহর্ষির মর্মবাণী এই, "যে সকল বিষয় সংশোধন করা আমাদের ক্ষমতার অতীত সেই সকল বিষয় আমাদের সহ্য করা উচিত। সহ্যশক্তি যতই বাড়িবে মন ততই সমাধি সাধনের উপযুক্ত হইবে।" শ্রীরামকৃষ্ণদেবও বলিতেন, 'শ, ষ, স'। যে যতই সহ্য করিবে তাহার জীবনের বিকাশ ততই বেশী হইবে। মহর্ষি পঞ্চাশ বৎসরেরও অধিককাল অরুণাচলে বাস করিয়াছিলেন। প্রত্যেক বৎসর কয়েকবার তিনি উহা প্রদক্ষিণ করিতেন। প্রদক্ষিণ-পথ প্রায় আট মাইল। কেহ কেহ ভক্তির আতিশয্যে গড়াইয়া গড়াইয়া অঙ্গ-প্রদক্ষিণ করেন। কেহ কেহ আত্ম-প্রদক্ষিণ ও গিরি-পরিক্রমণ একত্র অভ্যাস করেন। যদিও এই আট মাইল চলিতে প্রায় তিন ঘণ্টার বেশী লাগে না, তথাপি মহর্ষি প্রায়ই ধ্যানস্থ হইয়া পরিক্রমণ করিতেন বলিয়া তাঁহার সূর্য্যাস্ত হইতে সূর্য্যোদয় অবধি

প্রায় বার ঘণ্টা সময় লাগিত। তাঁহার এই সকলের কোন আবশ্যকতা না থাকিলেও তিনি লোকশিক্ষার জন্য এইগুলি করিতেন। শাস্ত্রে আছে, তীর্থ পরিক্রমণ দশ মাস কাল গর্ভবতী স্ত্রীলোকের ন্যায় অতি ধীরে ধীরে করিতে হয়, এত ধীরে ধীরে যেন পদশব্দ শোনা না যায়। মহর্ষি প্রদক্ষিণ করিতে করিতে একবার 'অরুণাচলাষ্টকম্', আর একবার 'অরুণাচলশতকম্' নামক তামিল স্তোত্র দুইটি রচনা করিয়াছিলেন। স্তোত্রদ্বয়ের সারাংশ সংক্ষেপে নিম্নে প্রদত্ত হইল।— "সমুদ্রের গভীরত্ব যেমন ফিতার দ্বারা মাপিতে চেষ্টা করা বৃথা, তেমনি বস্তুর মত ব্রহ্মকে জানিতে চেষ্টা করাও বৃথা। ব্রহ্মজ্ঞান বস্তুজ্ঞানের মত নয়। চিনির পুতুল সমুদ্রের তলদেশ জানিতে চাহিলে যেমন জলের সহিত মিশিয়া যায় মানুষও তেমনি ব্রহ্মকে জানিতে যাইয়া ব্রহ্মভূত হয়। আত্মার জ্যোতিঃ মধ্যাহ্ন সূর্য্য অপেক্ষাও অধিক। বিভিন্ন ধর্ম আত্মদর্শনেরই বিভিন্ন উপায় মাত্র। সমাধিতে মন লয় হয়। **Mind cremates itself.** (সমাধিতে মনোনাশ হয়)।"

"যে মনে একবার ব্রহ্মানুভূতি হয় তাহাতে আর সংসারের স্পর্শ সম্ভব নহে। সমস্ত চিন্তার মূল এই অহংভাব। অহংকে জানিতে পারিলে চিরতরে চিন্তার নিরোধ হয়।" মহর্ষি নিজের সম্বন্ধে সকল প্রকার আড়ম্বর অপছন্দ করিতেন। যখন তাঁহার প্রথম জন্মোৎসব করিবার আয়োজন হইয়াছিল, তিনি তাহা বাধা দিয়া তামিলে একটী শ্লোক রচনা করিয়া বলিলেন, "তোমরা জন্মোৎসব করিতে চাহিতেছ; কিন্তু কোথা হইতে জন্ম হইল তাহার খবর নিয়াছ কি? জন্ম-মৃত্যুর পরপারে যেদিন পৌছিবে সেইদিনই প্রকৃত উৎসবের দিন। জন্মের সঙ্গে এই দুঃখের সংসারে প্রবেশ হয়, এই দিন আনন্দ না করিয়া দুঃখ করাই উচিত। জন্মের জন্য আনন্দিত হওয়া এবং শবদেহকে শোভিত করা একই কথা।" মহর্ষি পূজা গ্রহণ করিতেন না! কেহ ফুল-চন্দন দিয়া বা আরাত্রিক করিয়া তাঁহার পূজা করিতে চাহিলে তিনি তাহা গ্রহণ করিতেন না। অথচ তাঁহার ছবি শত শত গৃহে আজ পূজিত হইতেছে। তাঁহার ভক্তগণ পিত্তল নির্মিত একটি সম্পূর্ণ প্রতিমূর্তি নির্মাণ করাইয়া তিরুবন্নমালাই সহরে প্রতিষ্ঠিত

করিয়াছেন। আহার কালেও সকলকে তিনি একটি আদর্শ দেখাইতেন। ভালমন্দ খাদ্যাদিতে তিনি হর্ষ বা বিমর্ষতা প্রকাশ করিতেন না। আশ্রমে কোন বড়লোক (যথা—জমিদার, রাজা বা সরকারী লোক) আসিলে তাঁহাকে কোন বিশেষ সম্মান দেওয়া হইত না। সকলে যে সম্মান লাভ করিত তিনি তাহাই পাইতেন। কোন বড়লোক আসিলে তিনি কোন প্রকার ব্যস্ততা বা আহ্লাদজনিত স্ফীততা অনুভব করিতেন না। রামনাদের পরলোকগত মহারাজা স্যার মুথাইয়া চেট্টিয়ার আশ্রমে বিভিন্ন সময়ে আসিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে আসন গ্রহণ করিতে বলিলেন মাত্র। মহারাজা প্রায় পনের মিনিট কাল তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন, কিন্তু তিনি একটি কথাও বলিলেন না। চেট্টিয়ার পনর মিনিট কাল বসিয়া শেষে চলিয়া গেলেন। তিনি লোকবিশেষে কথা কম বলিতেন এমন নহে, তিনি সারাদিনে অল্প কয়েকটি মাত্র কথা বলিতেন। তাঁহাকে মৌনী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মহর্ষির নিকট বহু সঙ্গীতজ্ঞ ওস্তাদ গানবাজনা করিতে আসিতেন। তিনি সঙ্গীতকালে প্রস্তরবৎ নিশ্চল থাকিতেন, আন্তর ভাবের কোন প্রকার বহিঃপ্রকাশ দেখাইতেন না। সঙ্গীত শেষ হইলে তিনি একবার মৃদু হাস্য করিতেন মাত্র, আর কিছুই বলিতেন না। আশ্রমের বৈঠকখানায় মহর্ষি সারা দিনরাত্রি একটি খাটে পড়িয়া থাকিতেন। সেইজন্য সকলে আশ্রমে যাইয়া তাঁহার দর্শন পাইতেন। তাঁহার দর্শনের জন্য কোন অনুমতির প্রয়োজন হইত না। ধার্মিক নরনারী আসিয়া তামিল, তেলেগু, সংস্কৃত ও মালয়ালম ভাষায় তাঁহাকে স্তব করিতেন; কেহ পুত্র বা পিতার মৃত্যু-সংবাদ কেহবা কোন অসুখের কথা, কেহবা অন্তরের দুঃখদৈন্য তাঁহাকে কাতরভাবে নিবেদন করিতেন। তিনি এই সকলে আদৌ বিচলিত না হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতেন। কিন্তু কাহারো প্রার্থনা একেবারে বিফল হইত না। মহর্ষিকে দর্শনান্তে সকলে শান্তিপূর্ণ হৃদয়ে আশ্রম ত্যাগ করিতেন। বিমর্ষ ব্যক্তি হাসিমুখে স্বগৃহে ফিরিয়া যাইতেন। কয়েক বৎসর পূর্বে কে. এম. শাস্ত্রী নামক জনৈক ব্যক্তি একছড়া কলা লইয়া মহর্ষির নিকট যাইতেছিলেন। তিনি পথে গণেশের মূর্তি দেখিয়া মনে মনে

একটি কলা (ছড়া হইতে না লইয়াই) গণেশকে নিবেদন করিয়াছিলেন। আশ্রমে কলা উপস্থিত হইলে যখন কলা রাখা হইল তখন মহর্ষি বলিলেন, "এস, আমরা নিবেদিত কলাটি ভক্ষণ করি।" এই বলিয়া তিনি নিবেদিত কলাটি বাছিয়া লইলেন। মহর্ষি ঐসময় পতঞ্জলি কথিত 'চিত্তসম্বিৎ' লাভ করিয়াছিলেন।

উক্ত শাস্ত্রী বাল্মীকি রামায়ণের একটি অংশ গদ্যে রচনা করিয়া সঙ্গে আনিয়াছিলেন। তিনি উহার বিষয় কাহাকেও না বলিয়া মনে মনে মহর্ষিকে বলিতেছিলেন, "আপনি তো অন্তর্যামী। আপনাকে আর আমার আগমনের কারণ কি জানাইব ?" মহর্ষি তাঁহার মনের ভাব জানিয়া বলিলেন, "তোমার রামায়ণ খুলিয়া তুমি পড় না ?" মহর্ষি তৎরচিত রামায়ণ শুনিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন। শাস্ত্রী যখন মহর্ষির নিকটে ছিলেন, তখন বৃক্ষগুলি হইতে কয়েকটি কাক ও অন্যান্য পাখী আসিয়া মহর্ষির হাত হইতে শস্যাদি লইয়া আহার করিল দেখিয়া শাস্ত্রী আশ্চর্যান্বিত হইলেন। শ্রীরমণ মহর্ষি শ্রীরামকৃষ্ণ এবং স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ও বাণী শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইতেন। তিনি স্বামী বিবেকানন্দের 'রাজযোগ' প্রভৃতি কয়েকটী গ্রন্থ তামিলে পড়িয়াছিলেন। তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের সাধুসন্ন্যাসীদিগকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন এবং তাঁহারাও প্রায়ই তাঁহার আশ্রমে যাইয়া তাঁহাকে দর্শন ও প্রণাম করিতেন।* মহর্ষিকে সিদ্ধাই বা বিভূতির কথা বলিলে তিনি বলিতেন, "ঐ সকল অলৌকিক শক্তি লাভ করা স্বপ্নে ধনলাভ করার ন্যায় বৃথা। ভুল ভাঙ্গিলে সবই মিথ্যা মনে হয়। আত্মজ্ঞানই প্রকৃত বিভূতি।" জনৈক উকিল তাঁহাকে ঈশ্বরের ও অন্যান্য দেবতার অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, "ব্যবহারিক ভাবে এইগুলি সত্য। পরমার্থিক ভাবে উহাদের কোন সত্তা নাই।"

* মল্লিখিত এই প্রবন্ধটী যখন 'অমৃত' মাসিকে প্রকাশিত হয় তখন মুদ্রিত প্রবন্ধটি তাঁহার নিকট পাঠাইয়াছিলাম। তিনি উহা কোন বাঙ্গালী ভক্ত দ্বারা পড়াইয়া শুনিয়াছিলেন। রামকৃষ্ণ মিশনের কোন সাধু তাঁহর কাছে যাইলে তিনি কৃপা করিয়া তাঁহার নিকট আমার সংবাদ লইতেন।

মহর্ষি অতি প্রত্যুষে প্রায় তিনটার সময় শয্যাত্যাগ করিতেন। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আশ্রমের সকলে শয্যাত্যাগ করিয়া ধ্যানাদি অভ্যাসে নিযুক্ত হইতেন। তিনি আশ্রমস্থ বাগানের এবং রান্নাঘরের কর্মে নিজে যোগদান করিতেন। তরকারী কাটা ও চাল তৈরী করা প্রভৃতি অন্যান্য রান্নার কার্য্যেও তিনি সহজ ভাবে যোগ দিতেন। আশ্রমের অন্য কোন কাজ না থাকিলে বা শাস্ত্রপাঠাদির আবশ্যক না হইলে তিনি বেড়াইবার ছড়ি ও কমণ্ডলু তৈরী করা, আহারের জন্য তাল-পাতা সেলাই করা, নোট বই বা পুস্তক বাঁধান, শাস্ত্রগ্রন্থ নকল করা প্রভৃতি কর্মে রত হইতেন। তিনি পরিশ্রমের যথোচিত মূল্য ও মর্য্যাদা দিতেন, কখনো কোন কর্ম করিতে লজ্জাবোধ করিতেন না। তিনি বলিতেন, আত্মাকে জানিলে মানুষ সমস্ত কাজের ও সমস্ত চিন্তার মধ্যে আনন্দ লাভ করে। মহর্ষি সর্বধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁহার নিকট বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব, এমন কি খ্রীষ্টান ও মুসলমানগণও আধ্যাত্মিক আলোক লাভ করিতে আসিতেন। মহর্ষির জীবনে কোন বিশেষ ঘটনা-বৈচিত্র্য নাই বলিলেও চলে। এইরূপ অনাড়ম্বর অথচ অলৌকিক জীবন জগতে দুর্লভ। মহর্ষি কাহারো ধর্মবিশ্বাস ভঙ্গ করিতেন না। যাঁহারা যে দেবদেবী পূজা, মন্ত্র জপ বা ধ্যান করেন তিনি তাহাই করিতে তাহাদিগকে উৎসাহ দিতেন। তিনি বলিতেন, যে যাহা করে তাহা করিলেই আদর্শে পৌছিবে। যিনি কোন কিছু সাধনা গ্রহণ করেন নাই তাঁহাকে তিনি আত্মধ্যান করিতে উপদেশ দিতেন এবং বলিতেন, "আমির অনুসন্ধান কর"। 'আমি কে' জানা হইলে পরম সত্য লাভ হইবে। অন্তরের বা বাহিরের কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা এই আত্মাকে কেহ জানিতে পারে না। বালিকা স্বীয় মাতাকে যদি প্রসব-বেদনা ও জন্মদানের ব্যথার কথা জিজ্ঞাসা করে তবে তিনি তাহা প্রকাশে অসমর্থা হইয়া বলেন, 'অপেক্ষা কর, নিজের অভিজ্ঞতা হইতেই বুঝিতে পারিবে।' তদ্রূপ আত্মানুভূতির আনন্দ কাহাকেও বুঝান যায় না।"

মহর্ষির আশ্রমে রাত্রিকালীন আহারের পূর্বে 'রিভু গীতা' প্রভৃতি শাস্ত্রপাঠ প্রায় দুই ঘণ্টা ধরিয়া চলিত, কোন কোন দিন সমস্ত রাত্রি পাঠে অতিবাহিত হইত। মহর্ষি বলিতেন, 'রিভু গীতা' প্রভৃতি শাস্ত্র পাঠ ধ্যানাভ্যাসের তুল্য

উপকারী। মহর্ষি নিরাকার ধ্যান করিতেই তাঁহার তথা-কথিত শিষ্যদিগকে উপদেশ দিতেন। অদ্বৈত বেদান্তের ধ্যানপদ্ধতি বিবেকপূর্ণ বিচারের উপরই স্থাপিত। বিচার ব্যতীত আসক্ত বস্তু হইতে মন তুলিয়া আনা অসম্ভব। অনাসক্তি, একাগ্রতা ও অন্তর্মুখীনতাই প্রকৃত ধ্যানের উপায়। আর্. এম. বাক্ (R. M. Bucke) তাঁহার "Cosmic Consciousness" নামক পুস্তকে পাশ্চাত্যবাসী ধ্যানী মিষ্টিকদের বিষয় অতি চমৎকারভাবে লিখিয়াছেন। শ্রীরমণ মহর্ষি গায়ত্রী জপ এবং ধ্যান করিতেও বলিতেন। তাঁহার মতে যাঁহারা নিরাকার ধ্যান করিতে অসমর্থ তাঁহারা সাকার ধ্যানই করিবেন। সাকার ধ্যানই কালে নিরাকার ধ্যানে পরিণত হইবে। মহর্ষি সকলকে স্ব স্ব ইষ্টদেব বা ইষ্টদেবী নির্বাচনে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিতেন। হৃদয়ে, কণ্ঠে বা মস্তকে তিনি যেখানে ধ্যান করিতে ইচ্ছুক তাঁহাকে সেখানেই করিতে বলিতেন। তিনি বলেন, স্বীয় অভিজ্ঞতা হইতেই মানুষ নিজের সাধন-পথ বুঝিয়া ও বাছিয়া লইতে পারিবে।

যাঁহারা স্ব স্ব ধ্যানে অগ্রসর ও উন্নত হইবার জন্য সাহায্য প্রার্থনা করিতেন তিনি তাঁহাদিগকে বলিতেন, "শরীরের প্রতি আসক্তি সর্বপ্রথমে ত্যাগ কর। মূত্র-পুরীষ-কীটপূর্ণ এই শরীর—এইরূপ চিন্তা করিলে দেহ-প্রীতি সহজে দূরীভূত হয়। যে বস্তুতে মন আসক্ত তাহার দোষ দর্শন করিবে। কাহারো প্রতি ক্রোধ বা বিদ্বেষ আসিলে মনে করিবে, তাহার অন্তরে যে ঈশ্বর আছেন তাঁহার প্রতি এই ক্রোধ বা দ্বেষ প্রকাশ করিতেছি। এইরূপ চিন্তায় মন শীঘ্র শান্ত হয়। মন নিম্নগামী হইলেই ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ হয়। সর্বদা উচ্চ চিন্তা করিবে ও উচ্চ আদর্শ সম্মুখে রাখিবে। মন দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ। উহার সম্মুখে যাহাই কর তাহাই প্রতিফলিত হইবে। ক্ষুদ্র চিন্তা করিয়াই মন ক্ষুদ্র হইয়াছে। এখন উচ্চ চিন্তা অভ্যাস কর, মন আবার ঊর্দ্ধগামী হইবে। সর্বাগ্রে আত্মবিশ্বাস বা ঈশ্বরে বিশ্বাস আন। তখন সবপথ তোমার নিকট মুক্ত হইবে।" উইলিয়াম জেম্স তাঁহার "Varieties of Religious Experience" নামক পুস্তকে (২৬২ পৃষ্ঠায়) কর্ণেল গার্ডিনারের উদাহরণ দিয়া দেখাইয়াছেন, কাম-রিপু ও মদ্যপানে

বশীভূত মনকে পবিত্র ও শুদ্ধ করিয়া লইবার উপায় কেবল উচ্চ চিন্তা। মহর্ষির আর এক বিশেষত্ব এই যে, পাপী-তাপীদের তিনি কখনো অবজ্ঞা বা ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন না। শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া তিনি তাহাদের মনে সৎসাহস ও আত্মবিশ্বাস জাগ্রত করিয়া দিতেন। ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের মত শ্রীরমণ মহর্ষি নিয়তাত্মা, দ্যুতিমান, ইন্দ্রিয়বশী, বুদ্ধিমান, নীতিমান, বাগ্মী, শ্রীমান, আর্য্য, অন্তর্য্যামী, সদৈক প্রিয়দর্শন, ধর্মজ্ঞ, সত্যসন্ধ, স্মৃতি ও প্রতিভাবান ছিলেন। মহর্ষি গাম্ভীর্য্যে সমুদ্র ইব, ধৈর্যে হিমবান তুল্য, সোমবৎ প্রিয়দর্শন, ক্ষমায় পৃথিবীসম, ধনদানে কুবেরবৎ এবং সত্যে সাক্ষাৎ ধর্ম ইব ছিলেন।

অজ্ঞান তিমির যিনি দূর করেন তাঁহাকে শাস্ত্রে গুরু বলে। মহর্ষি অজ্ঞাতসারেই সর্বদা গুরুভাবে আরূঢ় থাকিয়া কাহারো সহিত ধর্মসম্বন্ধীয়, রাজনৈতিক, কি সামাজিক কোন রকম বিতণ্ডা পছন্দ করিতেন না। তিনি সর্বদ্বন্দ্বাতীত বলিয়া কোন প্রকার দ্বন্দ্বে যোগ দিতে চাহিতেন না। তাঁহার জীবনের মূলনীতি ছিল অহিংসা, সমত্ব ও সর্বহিতত্ব। এইগুলি তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতেন। তাঁহাকে এইগুলির জীবন্ত প্রতিমূর্তি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। নিম্ন জাতীয় লোকই প্রথম হইতে তাঁহার সেবাদি করিতেন। ব্রাহ্মণ ও নীচজাতির মধ্যে তিনি কোন ভেদ দেখিতেন না। 'শূদ্র ও স্ত্রীলোকের ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকার আছে কি না'—জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছিলেন, "নিশ্চয়ই"। তিনি অসংখ্য শূদ্র ও নারীকে ধর্মোপদেশ দিয়াছেন। দক্ষিণ ভারতে এইরূপ কার্য্য করা কম শক্তির কথা নহে। তাঁহার মতে জীবনে পূর্ণতার বিকাশ নির্জন তপস্যা অপেক্ষা ধ্যানযুক্ত সমাজ-সেবায় সহজে হয়। এই বিষয়ে এবং আরও অনেক বিষয়ে তিনি স্বামী বিবেকানন্দের সহিত একমত ছিলেন। উভয়ের মতে আত্মমুক্তি জগদ্ধিত দ্বারাই সুলভ। পারিবারিক বা সামাজিক জীবনে ধর্মসাধন অনেক প্রকারে সহজ। ইহা বুঝিলে সংসার ত্যাগের জন্য মন অস্থির হইবে না।

জনৈক ভদ্রলোক তামিল ভাষায় স্বামী বিবেকানন্দের 'জ্ঞানযোগ' নামক পুস্তক পাঠ করিয়া সংসার ত্যাগের বাসনা করেন। তিনি মনে মনে রমণ

মহর্ষিকে গুরুরূপে বরণ করিয়া সর্বদা তাঁহার চিন্তা করিতে থাকেন। একদিন রাত্রে স্বপ্নে মহর্ষি তাঁহাকে বলিলেন, "সর্বদা আমার চিন্তা করিও না। ইহাতে কি ফল? মহাদেবের চিন্তা কর। তাহাতেই তোমার কল্যাণ হইবে। আমার আশীর্বাদ উহার সঙ্গে সঙ্গেই আসিবে।" অপর এক ভক্ত তাঁহাকে প্রায়ই দর্শন করিতে আসিতেন। তিনি একদিন ভাবাতিশয্যে অশ্রুবিসর্জন করিয়া প্রার্থনা করিলেন, "আমায় কৃপা করুন।" মহর্ষি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, "আমি তো সর্বদাই তোমাদিগকে কৃপা করিতেছি। তোমরা তাহা যদি গ্রহণ না কর, আমি কি করিব।"

সত্য বা জ্ঞান লাভের পর মহাপুরুষদের জীবনধারণ কেবল লোককল্যাণার্থ হয়। তখন তাঁহাদের প্রত্যেক চিন্তা ও প্রত্যেক কর্ম পরোপকারের জন্য হইয়া থাকে। কিন্তু মানুষের মন শুদ্ধ না থাকায় ইহা বুঝিতে পারে না।

মহর্ষি হঠাৎ কাহাকেও সংসার ত্যাগ করিতে পরামর্শ দিতেন না। তিনি বলেন, গৃহে অনাসক্ত থাকিয়া সাধন-সমরে যোগ দাও। সংসারে অসুবিধা অপেক্ষা সুবিধাই বেশী। সংসারে থাকিয়াই সন্ন্যাস জীবন যাপন কর। উহাতে গৃহ ও গ্রাম উভয়েই উপকৃত হইবে। কোন ধনী মহিলা আবার তাঁহার আদেশে কাষায় বস্ত্র পরিয়া মুণ্ডিত-কেশিনী সন্ন্যাসিনীর ন্যায় জীবন যাপন করিতেছেন। ধনীদের আহার ও পোষাক ত্যাগ করিয়া তিনি ভিক্ষান্নে এবং কঠোর তপস্যায় জীবন যাপনে অভ্যস্তা হইয়াছেন।

মহর্ষির শিষ্যদের মধ্যে অনেকেই সাধন-পথে সমুন্নত। যোগী রামাইয়া মহর্ষির একজন উন্নত শিষ্য। তিনি জমিদার ছিলেন। তিনি যখন দীক্ষা গ্রহণ করেন তাঁহার গুরু বলিলেন, "পাচ হাজার মন্ত্র প্রত্যহ জপ করিবে।" শিষ্য উত্তর দিলেন, "যদি অধিক করি?" গুরু বলিলেন, 'তবে আরও ভাল।' শিষ্য শেষে বলিলেন, 'যদি সর্বদা অজপা জপ করি?' গুরু উত্তর দিলেন, 'সর্বোত্তমা'। যোগী রামাইয়া অবিবাহিত। মহর্ষি তাঁহাকে সন্ন্যাসী হইতে দেন নাই। মহর্ষির আশ্রমগৃহ তিনি স্বীয় অর্থে নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন। তিনি একাসনে বার ঘণ্টা কাল ধ্যানস্থ থাকেন। তাঁহার সৌম্যমূর্তি দেখিলেই মন শান্তিতে ভরিয়া

যায়। উচ্চস্তরের অনেক আধ্যাত্মিক অনুভূতি তিনি লাভ করিয়াছেন। তিনি বলেন, "আধ্যাত্মিক রাজ্যে বিষয়-বিষয়ী বা অস্মৎ-যুস্মৎ সম্বন্ধ তিরোহিত হয়। শেষে ঈশ্বর বস্তুরূপে নহে, অন্তরাত্মারূপেই অনুভূত হন।" মহর্ষির আরও অনেক উন্নত শিষ্য আছেন। মহর্ষি সর্বদা সহজ সমাধিতে অবস্থান করিতেন। সদা সাক্ষীভাবে জীবন-রঙ্গমঞ্চে থাকিয়া তিনি জগতের অনিত্যত্ব দর্শন করিতেন। আবার কখনও তিনি নির্বিকল্প সমাধিতে এরূপ লীন হইয়া যাইতেন যে, তাঁহার হৃদয়ের স্পন্দন ও নিশ্বাসপ্রশ্বাস পর্য্যন্ত বন্ধ হইয়া যাইত। তখন তাঁহার দেহে মৃত্যুর সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইত।

ইংলণ্ডের বিখ্যাত লেখক ও সাংবাদিক পল ব্রাণ্টন বহু বৎসর পূর্বে ভারতে প্রকৃত যোগীর অন্বেষণে আসিয়া মহর্ষিকে দেখিয়া অতীব মুগ্ধ হন। মহর্ষির কৃপায় তাঁহার কয়েকটি আধ্যাত্মিক অনুভূতি লাভ হয়। ব্রাণ্টন তাঁহার ভারত ভ্রমণের বৃত্তান্ত "A search in secret India" নামক একটি বৃহৎ ইংরাজি পুস্তকে বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থের তিনটি পরিচ্ছেদ তিনি মহর্ষির জীবনী ও বাণী লিখিয়া পূর্ণ করিয়াছেন। দেশবিদেশের অনেক লোকই শ্রীরমণ মহর্ষির দর্শনে আসিতেন। মহর্ষির অবস্থান হেতু অরুণাচল আজ মহাতীর্থে পরিণত হইয়াছে।

১৮৯৬ খ্রীঃ ১লা সেপ্টেম্বর শ্রীরমণ মহর্ষি অরুণাচল পর্বতে উপস্থিত হন। তথায় তাঁহার নিবাস পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হয় ১৯৪৬ খ্রীঃ ১লা সেপ্টেম্বর। এই উপলক্ষে উক্ত বৎসর সুবৃহৎ সুবর্ণ জয়ন্তী গ্রন্থ রমণাশ্রম হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থখানি তেত্রিশটি চিত্রে সুশোভিত এবং ছেষট্টিটি প্রবন্ধে সুসমৃদ্ধ। ভারতে, ইউরোপে এবং আমেরিকায় বহু প্রসিদ্ধ মনীষি কর্তৃক প্রবন্ধগুলি লিখিত। লেখকগণের মধ্যে সার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান্, কালিফোর্ণিয়ার ভেরোনিকা ঈটন, সুইজারলণ্ডের ডাঃ সি. জে. জুং, মিঃ গ্রাণ্ট ডাফ্, প্যারিসের ওলিভিয়ার লাকোম্বে, ইউরোপের এলা মৈলার্ট, জেকোশ্লোভাকিয়ার মিঃ ডি. ফুস্ বার্জার, ইংলণ্ডের ডানকান গ্রানলিজ, আমেরিকার এলানকর পলিন নয়ে প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। শ্রীরমণ মহর্ষির মহিমাসূচক কয়েকটী সংস্কৃত স্তোত্রও উক্ত পুস্তকে সন্নিবিষ্ট।

স্যার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান্ উক্ত পুস্তকে বলেন, "যে জগৎ উচ্চতর সত্য ও মহত্তর সত্তায় পরিপূর্ণ তাহা ইহজগতে প্রবিষ্ট হইলেই ইহা বাঁচিতে পারে। একমাত্র উক্ত উপায়ে ইহা রক্ষা পাইবে, অন্য উপায়ে নহে।....সেই উর্দ্ধলোকের সহিত সংযোগ স্থাপনে আমাদের অক্ষমতাই আমাদের আধিব্যাধির মূলীভূত কারণ। শ্রীরমণের মত মহর্ষিগণ সেই পরমার্থ সত্তার সহিত আমাদের জন্মগত অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ স্মরণ করাইয়া দেন।"

মিঃ গ্রাণ্ট ডাফ বলেন, "যখন মহর্ষিকে প্রথম দর্শন করিলাম তখন আমার কি যে হইল আমি বলিতে পারি না। কিন্তু যে মুহূর্তে তিনি আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন আমি অনুভব করিলাম, তিনি সত্যস্বরূপ, জ্যোতিঃস্বরূপ।"

এ. বি. রিচার্ডসন বলেন, "আমি বিশ্বাস করি, শ্রীমহর্ষি আধুনিক মনোবিজ্ঞান ও মনোবিশ্লেষণের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা, এবং বস্তুতঃ এক অর্থে উহাদের পূর্ণ পরিণতি। সুতরাং তাঁহার জীবনী ও বাণী পাশ্চাত্য বা প্রাচ্য জড়বাদিগণেরও অধ্যয়নযোগ্য এবং আলোচ্য বিষয়।"

সুইজারলণ্ডের বিশ্ববিখ্যাত মনোবৈজ্ঞানিক ডাঃ সি. জে. জুঙ্গ লিখিয়াছেন, "শ্রীরমণের জীবনী ও বাণীতে আমরা যাহা পাই তাহা ভারতের বিশুদ্ধ বাণী। ইহাতে মুক্ত বিশ্বের অভয়, মানবজাতিকে মুক্তিদানের প্রেরণা এবং সত্যযুগের সামগান অভিব্যক্ত।"

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বি. এল. আত্রেয় বলেন, "অদ্বৈত বেদান্তের দুরূহ তত্ত্বকে জীবনে রূপায়িত করাই শ্রীরমণ মহর্ষির প্রকৃত মহত্ত্ব। বেদান্তমতে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মই পরমার্থ সত্তা এবং এই দৃশ্যমান নামরূপাত্মক বিশ্ব ব্রহ্মময়। তত্ত্বানুভূতির ফলে কিছুই মহর্ষির নিকট অজ্ঞাত নহে, কেহই তাঁহার নিকট অপর নহে, এবং কোন ব্যাপারই অবাঞ্ছিত নহে।....এই ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের হৃদয় হইতে প্রেম, প্রীতি, করুণা, সমবেদনাদি এবং ঐক্যবোধ সদা স্বতঃই বিচ্ছুরিত হইতেছে। মহর্ষির অনুপম মহত্ত্ব এবং তজ্জন্য জনপ্রিয়তার ইহাই নিগূঢ় রহস্য। এই মহর্ষি সমগ্র মানবজাতির শ্রদ্ধার্হ।"

প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের ম'সিয় লাকোম্বে বলেন, "তাঁহার তপঃপূত দেহ হইতে আত্মসংযম ও আত্মজ্ঞানের অপার্থিব আলোক বিকীর্ণ হয়। তাঁহার চক্ষুদ্বয় উজ্জ্বল, গম্ভীর এবং কাঠিন্যমুক্ত ও সুস্থির। তাঁহার নিস্পন্দ শরীরে চারু ও মৃদু হাবভাবের স্বর্গীয় কোমলতা প্রকটিত। বিচক্ষণ বিচারকগণ কর্তৃক তিনি অতি উন্নত যোগী এবং উচ্চতম অনুভূতির অধিকারী বলিয়া বিবেচিত।"

ইংলণ্ডের বিখ্যাত সাংবাদিক পল ব্রাণ্টন লিখিয়াছেন, "তাঁহার দেহ অস্বাভাবিক রূপে প্রস্তরবৎ নিশ্চল। একবার মাত্রও তিনি আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন না। কারণ তাঁহার নয়নযুগল সুদূর শূন্যে, অসীম আকাশের অন্তঃস্থলে নিবদ্ধ। যেমন প্রস্ফুটিত কুসুম উহার দলসমূহ হইতে সৌরভ বিকীর্ণ করে তদ্রূপ এই মহামানব, এই মহর্ষি, অসীম আধ্যাত্মিক সৌরভ নিয়ত বিতরণ করিতেছেন। তাঁহার দিব্য সান্নিধ্যে গতকালের তিক্ত স্মৃতি এবং আগামী কালের দুশ্চিন্তা তিরোহিত হয়।....তাঁহার করুণায় বুঝিয়াছি, ঈশ্বরকে জানার অর্থ সকলকে শুধু ক্ষমা করা নহে, সকলকে পরমাত্মীয় জ্ঞানে ভালবাসা। তাঁহার পূত স্পর্শে আমার হৃদয় পরিবর্তিত ও পরমানন্দিত।"

শ্রীরমণ মহর্ষি ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম হইতে মহাসমাধি পর্য্যন্ত বৎসরাধিক কাল দুরারোগ্য কষ্টদায়ক কর্কটরোগে (Cancer) ভুগিয়াছিলেন।

১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তাঁহার বাম হস্তের কনুইয়ের পশ্চাদ্দিকে একটি ক্ষুদ্র গুটিকা উঠে। চাপ দিলে উহাতে তিনি ব্যথা পাইতেন। অবসর-প্রাপ্ত জেলা মেডিকেল অফিসার ডাঃ শঙ্কর রাওয়ের পরামর্শে ১৯৪৯ খ্রীঃ ৯ই ফেব্রুয়ারী উক্ত গুটিকা অস্ত্রোপচার দ্বারা কাটিয়া ফেলা হয়। ইহার এক সপ্তাহ মধ্যেই ক্ষতটি সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। কিন্তু মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে গুটিকাটি পুনরায় একই স্থানে দেখা যায়। অনুবীক্ষণ যন্ত্রের দ্বারা পরীক্ষা করিয়া জানা গেল, গুটিকাটি দুশ্চিকিৎস্য রক্তস্রাবী কর্কট (Sarcoma)। পুনরায় অস্ত্রোপচার দ্বারা গুটিকাটী উৎপাটিত করা হয়। দ্বিতীয় অস্ত্রোপচারে যে ক্ষত হয় তাহা আর সারে নাই। ইহার কয়েক দিন পরে একটি নূতন

অর্বুদ বাহির হইল এবং তাহা হইতে প্রচুর রক্তস্রাব হইতে লাগিল। রেডিয়াম চিকিৎসায় সাময়িক উপকার পাওয়া গেল।

ডাক্তারগণ কর্কটটির কয়েক ইঞ্চি উপর হইতে বাহুচ্ছেদ করিবার পরামর্শ দেন। কিন্তু মহর্ষি এবং তাঁহার অধিকাংশ ভক্তের অমত থাকায় অঙ্গচ্ছেদ করা হয় নাই। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে অর্বুদটি পুনরায় দেখা যায়। তখন স্থানীয় কোন কবিরাজের চিকিৎসাধীনে মহর্ষিকে রাখা হয়। কিন্তু কবিরাজী চিকিৎসায় কোন উপকার হইল না; তাঁহার স্বাস্থ্য ক্রমশঃ খারাপ এবং অর্বুদটি দ্রুত বাড়িতে লাগিল। সেইজন্য ১৪ই আগস্ট পুনরায় অস্ত্রোপচার করা হয়। ইহার ফল সন্তোষজনক হইল এবং তিন মাসের মধ্যে আর কোন উদ্ভেদ দেখা গেল না। উক্ত বৎসর ডিসেম্বর মাসে আর একটি ক্ষুদ্র উদ্ভেদ বাহির হইল। ১৯শে ডিসেম্বর এই উদ্ভেদটি অস্ত্রোপচার দ্বারা কাটিয়া ফেলা হয়। তখন পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল, ক্ষতটি পেশী পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং বাহুর সমস্ত উপরিভাগে ব্যাপ্ত। চারি বার অস্ত্রোপচার করা সত্ত্বেও ব্যাধির গতিরোধ করা সম্ভব হইল না।

তখন এলোপ্যাথি ছাড়িয়া হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসা আরম্ভ হইল। কিন্তু তাহাতেও কোন ফল পাওয়া গেল না। পুনরায় কবিরাজী মতে চিকিৎসা করান হইল। স্থানীয় কবিরাজগণের চিকিৎসায় ফলোদয় না হওয়ায় কলিকাতা হইতে কবিরাজ যোগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রীকে আনান হইল। কিন্তু তাঁহার চিকিৎসাতেও কোন ফল হইল না, ব্যাধি দ্রুতগতিতে বাড়িয়া চলিল। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাস হইতে রক্তক্ষরণ হইতেছিল। তখন হইতে মহাসমাধি পর্য্যন্ত এক বৎসর রক্তক্ষরণ বন্ধ হয় নাই। ক্ষতস্থানে অসহ্য যন্ত্রণাও ছিল। কিন্তু সেই যন্ত্রণা তিনি নির্বিকার চিত্তে সহ্য করিতেন। যন্ত্রণার কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন, 'কিছুই না'। তাঁহাকে দেখিলে মনে হইত, তাঁহার দেহজ্ঞান আদৌ নাই এবং তিনি দেহ হইতে স্বতন্ত্র। দেহত্যাগের কয়েকদিন পূর্বে তাঁহার এক সেবক অসাবধানতাহেতু হঠাৎ ক্ষতস্থানের উপরস্থ আবরক পটিটা স্পর্শ করিয়াছিলেন মাত্র। ইহাতে তাঁহার মুখে গভীর বেদনার চিহ্ন পরিস্ফুট

হয়, কিন্তু মুখে তিনি উহা কিছুই প্রকাশ করেন নাই। জিজ্ঞাসিত হইয়া তিনি বলিয়াছিলেন, ক্ষতস্থানের উপরের পটিটা পর্বতবৎ ভারী মনে হইতেছে।

এইরূপ কষ্টদায়ক অবস্থায় তাঁহার ক্ষতস্থান ধৌত ও তথায় ঔষধাদি প্রয়োগ করিবার সময় তিনি নির্বিকার চিত্তে উহার দিকে তাকাইয়া থাকিতেন। কখন কখন তাঁহাকে এই বিষয়ে কৌতুকাদি করিতে দেখা যাইত, এবং পটি ভালভাবে বাঁধিবার জন্য তিনি নিজেই চিকিৎসকদিগকে সাহায্য করিতেন। এক রাত্রে তাঁহার ক্ষতস্থান ধৌত করিবার এবং উহাতে ঔষধ লাগাইবার সময় তথা হইতে এরূপ অধিক রক্তস্রাব হইতে লাগিল যে, তাহা দেখিয়া কয়েক জন ভক্ত ও সেবক ব্যথিত চিত্তে কাঁদিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া মহর্ষি তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দানার্থ বলিলেন, 'আমি কোথায় যাইব? আমি আর কোথায় যাইতে পারি?' এপ্রিল মাসের প্রথমে চিকিৎসকগণ ও ভক্তবৃন্দ বুঝিলেন, মহর্ষির মহাসমাধি সমাসন্ন। ৯ই এপ্রিল তাঁহার নাড়ীর গতি অতিশয় দুর্বল এবং হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া মন্দীভূত দেখা গেল। ইহার পূর্ব পর্যন্ত তিনি স্নানাগারে যাইতেন। কিন্তু সেদিন হইতে তাহা আর করিতে পারিলেন না। তিনি শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন। ফেব্রুয়ারী মাস হইতে তাঁহার রক্তের চাপও হ্রাস পাইয়াছিল।

উত্তর আর্কট জেলার ডিস্ট্রীক্ট মেডিকেল অফিসার কর্ণেল পি. ভি. করমচান্দানি আই. এম. এস. মহাশয়ও মহর্ষির চিকিৎসা করিয়াছিলেন। তিনি ১৩ই এপ্রিল তাঁর শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন। সেদিন মহর্ষি স্তিমিত নয়নে শায়িত ছিলেন। তাঁহার অত্যন্ত শ্বাসকষ্ট হইতেছিল। ১৪ই এপ্রিল মহর্ষির জীবনের শেষ দিন। সেদিনও তাঁহার খুব শ্বাসকষ্ট। এবং ওষ্ঠদ্বয় শুষ্ক ছিল। কর্ণেল করমচান্দানি তাঁহার শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহার মুখে সামান্য জল দিলেন। একটু কমলা লেবুর রস মুখে দিলে তাঁহার আরাম হইবে ভাবিয়া তাঁহাকে তিনি দুইবার জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভগবান, আপনার মুখে একটু কমলালেবুর রস দিব কি? কিন্তু তিনি দুইবারই মাথা নাড়িয়া অসম্মতি জানাইলেন। তখন সাধুভক্ত করমচান্দানি মনে মনে তাঁহাকে

কাতর প্রার্থনা জানাইলেন একটু কমলালেবুর রস খাইবার জন্য। অন্তর্দ্রষ্টা মহর্ষি ভক্তবাঞ্ছা পূরণের জন্য সম্মতি জানাইয়া মুখব্যাদান করিলেন এবং করমচান্দানি তাঁহার মুখে তিন চামচ লেবু-রস ঢালিয়া দিলেন। প্রত্যেক বারই তিনি তাহা খাইলেন। ইহাই তাঁহার শেষ পথ্য। তখন রাত্রি পৌনে আটটা।*

এই মুমূর্ষু অবস্থায় ব্রহ্মজ্ঞ মহর্ষির মুখমণ্ডলে কোন ভয় বা কষ্টের চিহ্ন প্রকাশিত হয় নাই। মৃত্যুকালেও তাঁহার আত্মজ্ঞান অচল অটল ছিল। রাত্রি ৭টা ৫০ মিনিটের সময় তাঁহার নাড়ী আরো ক্ষীণ এবং গভীর শ্বাসকষ্ট হইতেছিল। মহাসমাধির কিঞ্চিৎ পূর্বে তাঁহার নাড়ী নিষ্পন্দ এবং শ্বাসগতি স্বাভাবিক হইল। ক্রমে নিঃশ্বাস ও প্রশ্বাস মৃদু হইতে মৃদুতর হইয়া ৮টা ৪৭ মিনিটের সময় একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। তিনি শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। আশ্চর্যের বিষয়, শেষ নিঃশ্বাসটিও তৎপূর্ব নিঃশ্বাসবৎ সহজ সরল ছিল। সাধারণ লোকের শেষ নিঃশ্বাস বহির্গমনের সময় একটা ঝাঁকানি হইতে দেখা যায়। কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় মহর্ষির সেইরূপ হয় নাই। যিনি জীবিত অবস্থায় আত্মজ্ঞানে সমারূঢ় হইয়া দেহ হইতে নিজেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বোধ করিতেন, তাঁহার মৃত্যুকালে দেহবোধ আসিবে কেন? সেইজন্য শ্রীমন্মহর্ষির মত মহাপুরুষের মৃত্যুকে মহাসমাধি বা মহানির্বাণ বলা হয়। জীবন্মুক্ত মহর্ষি ৭১ বৎসর বয়সে মহাসমাধি লাভ করেন। মহাসমাধির দিন শুক্রবার, ১লা বৈশাখ, ১৩৫৭ (১৪ই এপ্রিল, ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দ) সাল।

সংস্কৃতে, হিন্দীতে, তেলেগুতে, ইংরাজিতে ও বাংলায় শ্রীরমণ মহর্ষি সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে। এমন কি, জার্মান ভাষায়ও তাঁহার জীবনী প্রকাশিত। ডাঃ জিমার জার্মান ভাষায় শ্রীরমণ মহর্ষির জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে যে গ্রন্থ লিখিয়াছেন তাহাতে ডাঃ সি. জি. জুঙ্গের ভূমিকা আছে। প্রাচ্যে ফিজি দ্বীপ হইতে পাশ্চাত্যে কালিফোর্ণিয়া পর্যন্ত সমগ্র সভ্য জগতে নবযুগের এই অমর মহাপুরুষের দিব্য জীবনী প্রচারিত।

---

* 'প্রবর্তক'এর ১৩৫৭ আষাঢ় সংখ্যায় শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র রায় লিখিত প্রবন্ধে মহর্ষির শেষ বৎসরের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়।

আটত্রিশ

স্বামী শুভানন্দ*

যুগাচার্য্য স্বামী বিবেকানন্দের যে কয়েকটী সন্ন্যাসী শিষ্য তৎপ্রচারিত সেবাধর্মের জন্য আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন তন্মধ্যে স্বামী শুভানন্দ অন্যতম। মোক্ষতীর্থ কাশীধামে যে সুবৃহৎ রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম অবস্থিত তাহা স্বামী শুভানন্দের অক্ষয় কীর্তি। উক্ত সেবাশ্রমের ইতিবৃত্তের সহিত স্বামী শুভানন্দের সেবাময় জীবনেতিহাস অভিন্ন ভাবে বিজড়িত। স্বামী শুভানন্দের জীবনী পড়িলে বুঝা যায়, স্বামী বিবেকানন্দের সেবাধর্ম অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাধনা ও অন্যনিরপেক্ষ মুক্তিমার্গ।

পূর্বাশ্রমে স্বামী শুভানন্দের নাম ছিল চারুচন্দ্র দাস। তাঁহার পিতা শ্যামশঙ্কর দাস চব্বিশ পরগণা জেলার অন্তর্গত ইছাপুরের অধিবাসী ছিলেন। তিনি কলিকাতায় মুসলমান পাড়া লেনে বাস করিতেন। তাঁহার পঞ্চ পুত্রের মধ্যে চারুচন্দ্র ছিলেন চতুর্থ। ১৮৯১ খ্রীঃ তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতায় রিপন কলেজে উচ্চ শিক্ষা লাভার্থ ভর্তি হন। যখন তিনি উক্ত কলেজে দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়নরত তখন তিনি অনুভব করিলেন, অর্থকরী শিক্ষা তাঁহার জীবনে অনাবশ্যক। সেইজন্য তিনি কলেজ ছাড়িয়া সাধুসঙ্গে ও ধর্মপ্রসঙ্গে যোগ দিতে লাগিলেন। প্রত্যেক মঙ্গলবারে তিনি দক্ষিণেশ্বর যাইয়া ভবতারিণী দেবী দর্শন ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গ শ্রবণ করিতেন। সুযোগ পাইলেই তিনি ঠাকুরের পরম ভক্ত মহাত্মা রামচন্দ্রের সারগর্ভ বক্তৃতাবলী শুনিতে যাইতেন। মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর কলিকাতাস্থ

---

* কাশী রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম হইতে প্রকাশিত এবং স্বামী নরোত্তমানন্দ কর্তৃক রচিত 'সেবা' নামক পুস্তক অবলম্বনে লিখিত।

ভবনে প্রত্যহ ভাগবত পাঠ এবং ধর্মসঙ্গীতাদি হইত। তথায় চারুচন্দ্র প্রায়ই উপস্থিত থাকিতেন। সেই সময় তিনি 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত' এবং স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী পড়িবার সুযোগ পাইলেন। এই সকল ধর্মগ্রন্থ পাঠে তাঁহার অন্তরে প্রবল ত্যাগ-বৈরাগ্য জাগ্রত হইল।

পিতা পুত্রের বৈরাগ্য হ্রাস করিবার জন্য তাঁহার বিবাহ দিতে চাহিলেন। কিন্তু চারুচন্দ্র উক্ত প্রস্তাবে এরূপ দৃঢ় অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন যে, পিতামাতা এবং আত্মীয়-স্বজন তাঁহাকে এই বিষয়ে কিছু বলিতে আর সাহস করেন নাই অবশেষে তাঁহারা তাঁহাকে সলিসিটারার্স সিংহ এবং চন্দ্রের অফিসে কেরানী পদে নিযুক্ত করেন। চারুচন্দ্র স্বাধীনতা পাইবার আশায় উহাতে স্বীকৃত হইলেন স্বোপার্জিত অর্থে পিতৃগৃহের সমীপে একখানি ঘর ভাড়া করিয়া তথায় তিনি স্বাধীনভাবে জীবন যাপন আরম্ভ করিলেন। তবে তিনি স্বগৃহে যাইয়া আহারাদি করিতেন এবং ধর্মগ্রন্থাদি পাঠ, সাধন-ভজন ও শয়নাদির জন্য উক্ত ভাড়া-ঘরটি ব্যবহার করিতেন। এইরূপে তিনি তাঁহাদের বৃহৎ পরিবারের কোলাহল হইতে কিঞ্চিৎ দূরে রহিলেন। চারুচন্দ্র ১০টা হইতে ৪টা পর্যন্ত অফিসে থাকিতেন এবং সকালে ও সন্ধ্যায় স্বীয় কক্ষে শাস্ত্রপাঠে ও ধ্যানভজনে কাটাইতেন। সন্ধ্যা হইতে গভীর রাত্রি পর্যন্ত স্থানীয় ধর্মবন্ধুগণের সহিত তাঁহার সৎপ্রসঙ্গ চলিত। এইরূপে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দ অতিবাহিত হইল।

১৮৯৫ খ্রীঃ তিনি দুই একজন অন্তরঙ্গ ধর্মবন্ধুর সহিত কাশী, হরিদ্বার, বদ্রী-নারায়ণ প্রভৃতি তীর্থস্থানে গমন করেন এবং ধর্মজগতের নূতন আলোক পাইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। এইরূপে ধর্মপ্রসঙ্গে ও ধর্মসাধনায় দুই এক বৎসর অতীত হইল। ১৮৯৭ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী মাসে স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য জগতে বেদান্ত প্রচারান্তে কলিকাতায় ফিরিলেন। স্বামিজীকে সম্বর্ধনা জানাইবার জন্য শিয়ালদহ স্টেশনে যে বিশাল জনসমাগম হইয়াছিল তন্মধ্যে চারুচন্দ্র উপস্থিত ছিলেন। স্বামিজীকে প্রথম দর্শন করিয়া চারুচন্দ্র পরম আনন্দিত হইলেন এবং এক অভিনব ভাবরাজ্যের সন্ধান পাইলেন। তিনি বন্ধুগণের সহিত মিলিত হইয়া স্বামিজীর গাড়ীর ঘোড়াগুলি ছাড়িয়া দিলেন এবং

নিজেরাই গাড়ী টানিতে লাগিলেন। এইরূপে যখন তিনি স্বামিজীর গাড়ী টানিতেছিলেন তখন তাঁহার মনে হইল, তিনি যেন ৺জগন্নাথের রথ টানিতেছেন। সেদিন স্বামিজীর দর্শন লাভ করিয়া এবং বক্তৃতা শুনিয়া চারুচন্দ্র দিব্য অনুপ্রেরণা লাভ করিলেন। পরদিন তিনি আলমবাজার মঠে যাইয়া স্বামিজীর কৃপালাভ করিয়া ধন্য হন। তিনি স্বীয় অন্তরের অন্তঃস্থলে বুঝিলেন, স্বামিজীর কৃপায় তিনি ক্রমশঃই বর্তমান যুগাদর্শের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন।

এটর্ণীর অফিসে শ্রম সাধ্য কর্ম তাঁহাকে ধর্মসাধনে বিরত করিতে পারিল না। বেলুড় মঠ প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি তথায় যাইয়া ঠাকুরের সাক্ষাৎ শিষ্যগণের সহিত পরিচিত হইলেন। তাঁহাদের দিব্যস্পর্শে আসিয়া চারুচন্দ্রের বিবেক-বৈরাগ্য ও ভক্তি-বিশ্বাস শতগুণে বর্ধিত হইল। তখন তাঁহার বয়স ২৩।২৪ বৎসর মাত্র। ১৮৯৮ খ্রীঃ তাঁহার পিতামাতা অবশিষ্ট জীবন তীর্থস্থানে কাটাইবার জন্য কাশী যাত্রা করিলেন। এই সুযোগে চারুচন্দ্র এটর্ণীর অফিসের কাজটি কাহারো সহিত পরামর্শ না করিয়াই ছাড়িয়া দিলেন এবং পরম প্রিয় ধর্মগ্রন্থগুলি ও ঠাকুরের একখানি ছবি সঙ্গে লইয়া কাশীধামে রওনা হইলেন। এই লিথোগ্রাফ ছবিখানি স্বামী নিরঞ্জনানন্দ তাঁহাকে দিয়াছিলেন। তখন ঠাকুরের আলোক-চিত্র পাওয়া যাইত না, কেবল লিথোগ্রাফ ছবি প্রস্তুত হইত। কাশীধামে কেদার ঘাটের উত্তরে ক্ষেমেশ্বর ঘাটে একটি ভগ্ন শিবমন্দিরে এই ছবিখানি বসাইয়া চারুচন্দ্র পূজা করিতেন এবং তথায় ধ্যান-ধারণায় কাল কাটাইতেন। অবশ্য উহা কিছুকাল পরের ঘটনা। কিন্তু সেখানেই স্বামী সারদানন্দ বুড়ো বাবাকে সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষিত করেন। ইহাই কাশীধামে রামকৃষ্ণ সংঘের সূত্রপাত। তখন কাশীতে রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম বা অদ্বৈত আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। চারুচন্দ্র যে ছবিটি পূজা করিতেন সেটি এখন কাশী রামকৃষ্ণ অদ্বৈতাশ্রমের হলঘরে দেখা যায়।

কাশীবাস চারুচন্দ্রের বিশেষ মনঃপূত হইল। তিনি ভোরে উঠিয়া জপ-ধ্যানাদি সমাপনান্তে পিতৃ-মাতৃসেবায় ব্রতী হইতেন। পরে গঙ্গাস্নানে যাইতেন এবং গঙ্গাস্নানান্তে কোন না কোন দেবমন্দির দর্শনপূর্বক শিবপ্রসন্ন মৈত্রের

স্কুলে যাইয়া মধ্যাহ্ন ভোজন করিতেন। উক্ত স্কুলে তিনি তখন অবৈতনিক শিক্ষকরূপে নিযুক্ত ছিলেন। প্রত্যহ সন্ধ্যায় চারুচন্দ্র গঙ্গাতীরস্থ দেবমন্দির, সন্তনিবাস ও ধর্মস্থানগুলি দেখিয়া বেড়াইতেন। এই সকলের উদ্দেশ্য ও ইতিবৃত্ত এবং সাধুসন্তদের জীবনী ও বাণী জানিবার আকাঙ্ক্ষাও তাঁহার হৃদয়ে তখন বর্ধিত হয়। মানস সরোবর তীর্থ হইতে প্রত্যাগত স্বামী শুদ্ধানন্দের সহিত কাশীতে একদিন হঠাৎ তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। যথোচিত শ্রদ্ধা জ্ঞাপনান্তে তিনি শুদ্ধানন্দজীকে আহ্বান করিলেন, কিন্তু স্বামী শুদ্ধানন্দ অপরিচিত ব্যক্তির সাদর আহ্বানে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, "মহাশয়, আপনাকে চিনতে পারছি না।" চারুচন্দ্র উত্তর দিলেন, "সংসার ত্যাগের পূর্বে আপনি একদিন পদার্পণ করিয়াছিলেন ক্ষীরোদ বাবুর সহিত কলিকাতায় বৈঠকখানা রোডে পাঁচু খানসামা লেনে আমার দীন কুটীরে।" স্বামী শুদ্ধানন্দ চারুচন্দ্রের প্রখর স্মৃতির প্রশংসান্তে বলিলেন, "হাঁ, সত্যই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পরম ভক্ত ক্ষীরোদ বাবু এক সন্ধ্যায় আমাকে একটি ভক্তের বাড়ীতে লইয়া যান। সেখানে গিয়া দেখি, ঠাকুরের প্রতিকৃতির সম্মুখে আপনি ধ্যানমগ্ন। আমাদের পদশব্দে আপনি উঠিয়া আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন এবং আপনার মাতা কর্তৃক প্রেরিত মিষ্টান্ন ঠাকুরকে নিবেদন করিয়া আমাদিগকে প্রসাদ দিলেন এবং মিষ্ট বাক্যে আমাদের সৎকার করিলেন। এত দীর্ঘকাল পরেও আপনি আমাকে মনে রাখিয়াছেন দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি।"

বেড়াইতে বেড়াইতে উভয়ে অনেকক্ষণ কথাবার্তা কহিলেন। বিদায়কালে স্বামী শুদ্ধানন্দ চারুচন্দ্রকে জানাইলেন যে, সোনারপুরাতে বংশীদত্তের বাড়ীতে পূজ্যপাদ স্বামী নিরঞ্জনানন্দের কাছে তিনি আছেন। তদনুসারে চারুচন্দ্র সেইদিন সন্ধ্যায় এবং পরদিন হইতে প্রায় প্রত্যহ তথায় যাইয়া স্বামী শুদ্ধানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন ও করিতেন। দৈবাৎ একদা স্বামী শুদ্ধানন্দ অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। তখন চারুচন্দ্র তাঁহার ঔষধপত্র এবং সেবাশুশ্রূষার ব্যবস্থা করিবার সুযোগ পাইলেন। কিন্তু শুদ্ধানন্দজীর স্বাস্থ্যোন্নতির কোন লক্ষণ দেখা গেল না। সেজন্য স্বামী নিরঞ্জনানন্দ তাঁহাকে কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে

পাঠাইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সেইরূপ কোন ব্যবস্থা তখন সম্ভবপর হইল না এবং স্বামী সারদানন্দ তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ লিখিলেন কলিকাতা যাইবার জন্য। সেইহেতু ১৮৯৮ খ্রীঃ স্বামী শুদ্ধানন্দ কলিকাতায় আসিলেন। ১৮৯৯ খ্রীঃ জানুয়ারী মাসে বেলুড় মঠের বাংলা মুখপত্র 'উদ্বোধন' পাক্ষিক পত্রিকারূপে প্রথম প্রকাশিত হয়। চারুচন্দ্র স্বামী শুদ্ধানন্দের নিকট হইতে উক্ত পত্রিকার কয়েকখানি নমুনা সংখ্যা পাইলেন কাশীধামে গ্রাহক সংগ্রহার্থ।

চারুচন্দ্র সাগ্রহে কাশীতে উদ্বোধনের গ্রাহক সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিলেন। এই উপলক্ষ্যে তিনি হরিনাথ ও কেদারনাথ প্রভৃতি সেবাপরায়ণ এবং ধর্মপ্রাণ তরুণদের সংস্পর্শে আসিলেন। কেদারনাথের বাড়ীতে একটি ক্ষুদ্র গ্রন্থাগার ছিল। হরিনাথ উদ্বোধনের প্রথম সংখ্যার একখণ্ড তদীয় প্রিয় বন্ধু কেদারনাথকে তাঁহার লাইব্রেরীর জন্য দিয়া গ্রাহক হইতে অনুরোধ করিলেন। কেদারনাথ 'উদ্বোধন' পত্রে স্বামী বিবেকানন্দ লিখিত প্রথম প্রবন্ধটি পড়িয়া হরিনাথকে বলিলেন, "আমি ইহার গ্রাহক হইব না ; কারণ ইহার ভাষা জটিল এবং ইহাতে নূতন কিছু নাই।" হরিনাথ চারুচন্দ্রকে উক্ত নমুনা সংখ্যা ফেরৎ দিয়া কেদারনাথের মন্তব্য তাঁহাকে জানাইলেন। চারুচন্দ্র সিংহনাদে বলিলেন, "কি! স্বামিজীর ভাষা জটিল? এই পাক্ষিকে নূতন কিছুই নেই? যে একথা বলে সে পড়তেই জানে না। আমি তার সঙ্গে দেখা করে তাকে প্রবন্ধটি পড়ে শোনাতে চাই।" শান্তস্বভাব, সরলচিত্ত তরুণ হরিনাথ এই ব্যাপারে মহামুস্কিলে পড়িলেন। অবশেষে তিনি চারুচন্দ্রকে কেদারনাথের সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন। কেদারনাথ তখন বলিষ্ঠ দ্রঢ়িষ্ঠ অবিবাহিত যুবক এবং পুলিশ বিভাগীয় কর্মে নিযুক্ত। তাঁহার উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল, সহরের শৃঙ্খলা ও শান্তিরক্ষার্থ তিনি উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মচারী হইয়া, পুলিশের পোষাক পরিয়া ও কোমরবন্ধ হইতে তলোয়ার ঝুলাইয়া ও ঘোড়ায় চড়িয়া রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইবেন।

চারুচন্দ্রের শীর্ণদেহ প্রথম সাক্ষাতে কেদারনাথের মনে অনুকূল রেখাপাত করিতে পারিল না। উক্ত ক্ষণস্থায়ী সাক্ষাতে কেদারনাথ চারুচন্দ্রকে বলিলেন পরদিন সন্ধ্যায় আসিবার জন্য। যথাসময়ে কয়েকজন বন্ধু সহ কেদারনাথ স্বীয়

গ্রন্থাগারে পুস্তক ও পত্রিকাদি পড়িতেছিলেন। এমন সময়ে চারুচন্দ্র এবং হরিনাথ তথায় উপস্থিত হইলেন। কেদারনাথ চারুচন্দ্রকে যথোচিত অভ্যর্থনান্তে তাঁহাকে তাঁহার বন্ধুদের সহিত পরিচিত করাইয়া দিলেন এবং তাঁহার আগমনের কারণ শুধাইলেন। চারুচন্দ্র শান্ত ভাবে 'উদ্বোধন' পত্রিকাটি খুলিয়া স্বামিজী কর্তৃক লিখিত ভূমিকাটি পড়িতে লাগিলেন। তাঁহার কণ্ঠস্বর স্বভাবতঃ মধুর এবং উচ্চারিত বাক্যগুলি সম্ভ্রমপূর্ণ ছিল। প্রবন্ধোক্ত ভাবের সহিত তাঁহার স্বরও উচ্চ বা নীচ হইতে লাগিল। শ্রোতাদের মনে তাঁহার পাঠভঙ্গী গভীর প্রভাব বিস্তার করিল। উপস্থিত সকলেই তাঁহাকে প্রশংসা করিলেন এবং কেদারনাথ তাঁহার পূর্বকৃত অপ্রিয় মন্তব্যের জন্য ক্ষমা চাহিলেন ও তৎক্ষণাৎ 'উদ্বোধনে'এর গ্রাহক হইলেন।

গ্রাহকরূপে তিনি তাঁহার প্রপিতা রামচন্দ্র মৌলিকের নাম দিলেন এবং স্বামী বিবেকানন্দের 'রাজযোগ' একখানি তাঁহার জন্য আনাইয়া দিতে বলিলেন। এখন হইতে চারুচন্দ্র, কেদারনাথ এবং হরিনাথের মধ্যে গভীর সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য স্থাপিত হইল। তিনজনে কেদারনাথের বাড়ীতে মিলিয়া বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ এবং নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের নাটকাবলী পাঠ ও আলোচনা করিতেন। তাঁহাদের আরো কয়েকজন মনোনীত বন্ধুও তত্রস্থ আলোচনায় যোগ দিতেন। চারুচন্দ্র ছিলেন উক্ত ক্ষুদ্র দলের কেন্দ্রীয় ব্যক্তি এবং বন্ধুগণ তাঁহার প্রতি ক্রমে এত অনুরক্ত হইয়া পড়িলেন যে, তিনি যখন তাঁহাদের আলোচনা সভায় অনুপস্থিত থাকিতেন সকলে তাঁহার অভাব বিশেষ ভাবে অনুভব করিতেন। তখন ঠাকুরের সাক্ষাৎ শিষ্য স্বামী নিরঞ্জনানন্দ কাশীধামে অবস্থান করিতেছিলেন। চারুচন্দ্র তাঁহাকে তাঁহাদের আলোচনা সভায় আনিয়া তাঁহার মুখে ঠাকুরের জীবনী ও বাণীর আলোচনা শুনিতে চাহিলেন। উক্ত প্রস্তাবে সকলে সম্মত হইলেন এবং স্বামী নিরঞ্জনান্দকে আনিবার দিন স্থির হইল। নির্দিষ্ট সন্ধ্যায় সভ্যগণ তাঁহাকে যথাযোগ্য অভ্যর্থনার আয়োজন করিলেন। ঠাকুরের একখানি ছবির প্রয়োজন হইল এবং কেদারনাথ উহা সংগ্রহ করিতে পারিলেন না। তখন ঠাকুরের ছবি খুবই দুষ্প্রাপ্য ছিল। চারুচন্দ্র বলিলেন, "তুমি ছবির জন্য চিন্তা করো না।

ঠাকুর আমার পিঠে চড়ে ইতিমধ্যে কাশীতে এসেছেন।” তিনি কলিকাতা হইতে ঠাকুরের যে ছবি আনিয়াছিলেন তাহার কথাই উল্লেখ করিলেন। এই অদ্ভুত মন্তব্যে সকলে হাসিয়া উঠিলেন। কিন্তু চারুচন্দ্র প্রমুখ কেহই তখন বুঝিলেন না, এই মন্তব্যে অজ্ঞাতসারে কি মহাসত্যের ইঙ্গিত করা হইল। যথাসময়ে ঠাকুরের ছবি আনীত হইল। চারুচন্দ্র আরো দুই একজন বন্ধুকে লইয়া স্বামী নিরঞ্জনানন্দকে আনিতে গেলেন এবং ভক্তরাজ ফুল ও মালা সংগ্রহার্থ চলিলেন। চারুচন্দ্র হরিনাথকে 'ভক্তরাজ' নাম দিয়াছিলেন। হরিনাথ সন্ন্যাস গ্রহণান্তে স্বামী সদাশিবানন্দ নামে পরিচিত হন। কেদারনাথকে সকলে 'কেদার বাবা' বলিয়া ডাকিতেন এবং উক্ত ডাক নামেই রামকৃষ্ণ সংঘে তিনি প্রসিদ্ধ হন। কিন্তু তাঁহার সন্ন্যাস-নাম ছিল স্বামী অচলানন্দ। পরবর্তী জীবনে তিনি রামকৃষ্ণ সংঘের সহকারী অধ্যক্ষের পদে অধিষ্ঠিত হন। সেদিন সন্ধ্যায় চারুচন্দ্র ও হরিনাথ কোন কার্য উপলক্ষে বাহিরে গেলেন এবং কেদারনাথ গৃহে রহিলেন। অতঃপর তিনি আলো জ্বালিয়া যখন ধুনা দিতে গেলেন তখন হঠাৎ তাঁহার দৃষ্টি ঠাকুরের পটের দিকে আকৃষ্ট হইল। ভুবনমোহন ঠাকুরের সেই চিত্র দেখিয়া তিনি বিমুগ্ধ ও নিশ্চল হইলেন। ধুনুচীতে জ্বলন্ত অঙ্গার ক্রমে ভস্মে পরিণত হইল। আলেখ্যে ঠাকুরকে দেখিয়া তাঁহার মনে বৈরাগ্যানল জ্বলিয়া উঠিল এবং মনোগত বাসনারাশি ভস্মীভূত করিল। তিনি অনুভব করিলেন, ঠাকুর তাঁহার প্রিয় পরমাত্মীয়। অনেকক্ষণ পরে তিনি ভক্তিভরে ঠাকুরকে সাষ্টাঙ্গ প্রণামপূর্বক নতজানু হইয়া করযোড়ে অশেষ প্রার্থনা করিলেন।

এমন সময়ে স্বামী নিরঞ্জনানন্দ চারুচন্দ্র প্রভৃতির সঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কেদারনাথ ঠাকুরের উক্ত সাক্ষাৎ শিষ্যকে গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে সম্বর্ধনা করিলেন এবং ভক্তরাজ যথাসময়ে আসিয়া পূজনীয় অভ্যাগতকে এবং ঠাকুরের পটে মালা পরাইলেন। স্বামী নিরঞ্জনানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অত্যদ্ভুত জীবনী ও অনুপম বাণী সম্বন্ধে চিত্তাকর্ষক ও হৃদয়গ্রাহী আলোচনা করিলেন। সেই আলোচনা শ্রবণে সকলের মনে পরম শান্তি আসিল এবং ঠাকুরের ধর্মসমন্বয় সম্বন্ধে গভীর শ্রদ্ধা জন্মিল।

ইহার কয়েক দিবস পরে ঠাকুরের শুভ জন্মতিথি সমাগত হইল। উক্ত দিবসে কেদারনাথের গৃহে স্বামী নিরঞ্জনানন্দ ঠাকুরের বিশেষ পূজা করিলেন এবং সাধ্যানুসারে উৎসব অনুষ্ঠিত হইল। এইরূপে ঠাকুর চারুচন্দ্রের পৃষ্ঠে কাশী যাইয়া কেদারনাথের গৃহে প্রতিষ্ঠিত এবং স্বশিষ্য কর্তৃক প্রপূজিত হইলেন। ইহার অল্প কাল পরে স্বামী বিবেকানন্দের অন্যতম সন্ন্যাসী শিষ্য স্বামী কল্যাণানন্দ গুরুভ্রাতা স্বামী শুদ্ধানন্দের পরিচয়-পত্র লইয়া কাশীধামে কেদারনাথের গৃহে অতিথি হইলেন। তিনিই স্বীয় গুরু কর্তৃক প্রচারিত আত্মমুক্তি ও সেবাধর্মের বাণী এই তরুণ দলের কাছে আনয়ন করিলেন এবং তাহা- দিগকে ত্যাগী সেবাব্রতী হইবার জন্য উৎসাহিত করিলেন। তরুণগণের অন্তরে বিবেক-বৈরাগ্য ও ত্যাগ-তপস্যার হোমাগ্নি প্রজ্বালিত হইল। চারুচন্দ্র কেদারনাথকে বৈরাগ্যবান্ দেখিয়া বলিলেন, "আর দেরী কেন? সংসার-ত্যাগের ইহাই প্রশস্ত মুহূর্ত।" কেদারনাথ এই বাক্যের ইঙ্গিত বুঝিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় যাবো?" চারুচন্দ্র উত্তর দিলেন, "নিরঞ্জনানন্দজী এখন হরিদ্বারে আছেন। তুমি তথায় যাইয়া কিছুদিন তাঁহার কাছে থাকিতে পার। আমি পত্র লিখিয়া তাঁহার অনুমতি আনিতে পারি।" কেদারনাথ তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন; কিন্তু সমস্যা হইল, তিনি তাঁহার প্রিয় প্রপিতা বৃদ্ধ রামচন্দ্র মৌলিক ও পিতা শম্ভুচন্দ্র মৌলিককে ছাড়িয়া যাইবেন কিরূপে? তাঁহারা উভয়েই মুহূর্তের জন্যও তাঁহাকে চক্ষুর অন্তরালবর্তী হইতে দেন না। কারণ, তিনিই তাঁহাদের একমাত্র বংশধর। যদি তাঁহারা কেদারনাথের সংসারত্যাগের সংকল্প জানিতে পারেন তবে তাঁহারা চারুচন্দ্র প্রভৃতিকেও তাঁহাদের গৃহে আর আসিতে দিবেন না। চারুচন্দ্রের ক্ষুরধার বুদ্ধি এই বাধা অতিক্রম করিতে সহজে সমর্থ হইল। তিনি কেদারনাথের দ্বারা কয়েকখানি পোষ্টকার্ড লিখাইয়া লইলেন তাঁহার প্রপিতা রামচন্দ্র মৌলিকের নামে। পত্রগুলির তারিখ যথাযোগ্য ব্যবধানে কলিকাতা হইতে লেখা হইল। এই গুলিতে উল্লিখিত ছিল যে, কেদারনাথ কলিকাতায় চাকুরীর চেষ্টা করিতেছেন। এই মিথ্যা পত্রগুলি চারুচন্দ্র

কলিকাতায় তাঁহার কোন বন্ধুকে পাঠাইলেন এবং নির্দিষ্ট কালের ব্যবধানে ডাকে দিতে বলিলেন।

১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে হরিদ্বার যাইবার সময় কেদারনাথ চারুচন্দ্রের নিকট ঠাকুরের ছবিখানি রাখিয়া গেলেন এবং প্রপিতাকে ডাকে একখানি চিঠি লিখিয়া দিলেন যে, তিনি কলিকাতায় চাকুরীর সন্ধানে যাইতেছেন। ১৯০০ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী মাসে কেদারনাথ হরিদ্বার হইতে কলিকাতায় ফিরিলেন এবং তথা হইতে শ্রীঠাকুরের জন্মস্থান কামারপুকুর এবং শ্রীমায়ের জন্মস্থান জয়রামবাটীতে তীর্থ যাত্রা করিলেন। কেদারনাথের অনুপস্থিতিতে ক্ষুদ্র দলটী হরিনাথের গৃহে আড্ডা করিলেন। অচিরে চারুচন্দ্রের নেতৃত্বে একটী অল্পপরিসর অথচ সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিল। ১৯০০ খ্রীঃ ১২ জুন বৈকালে চারুচন্দ্র 'উদ্বোধন' এর একখানি নূতন সংখ্যা পাওয়া মাত্র খুলিয়া স্বামী বিবেকানন্দ রচিত 'সখার প্রতি' কবিতাটী পড়িলেন। কবিতার এই শেষাংশটী প্রথমে তাঁহার মর্মস্পর্শ করিল—

বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর।
জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর॥

এই অভিনব যুগ-বাণী পাঠে তাঁহার মনোজগতে এক তুমুল আলোড়ন উপস্থিত হইল। এই অংশটী বার বার পড়িবার পর নিম্নলিখিত চরণদ্বয় তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল—

ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণু, সর্বভূতে সেই প্রেমময়।
মন প্রাণ শরীর অর্পণ, কর সখে, এ সবার পায়॥

চারুচন্দ্রের দেহ রোমাঞ্চিত হইল। স্বামীজির অন্তর্ভেদী বাণী তাঁহার অন্তরের গভীরে প্রবেশ করিল। অবশেষে তিনি উক্ত কবিতার চরণযুগল পড়িলেন—

মন্ত্র-তন্ত্র, প্রাণ-নিয়মন, মতামত, দর্শন বিজ্ঞান।
ত্যাগ ভোগবুদ্ধির বিভ্রম, 'প্রেম' 'প্রেম' এই মাত্র ধন॥

চারুচন্দ্র চমকিত হইলেন। তাঁহার আন্তরিক বিশ্বাস জন্মিল যে, ইহাই কালোচিত মহাবাণী। এই যুগবাণীর সাধনায় তিনি আত্মোৎসর্গ করিবার সুদৃঢ় সঙ্কল্প করিলেন। অবশেষে হৃদয়ের উদ্বেলিত আবেগ সংবরণে অসমর্থ হইয়া কোন বন্ধুর নিকট যাইয়া উহা ব্যক্ত করিলেন এবং বলিলেন, "স্বামিজী-প্রবর্তিত সেবাধর্মই যুগধর্ম।" উক্ত 'উদ্বোধন'খানি তখনও তাঁহার হাতে ছিল। তিনি বন্ধুকে স্বামিজীর কবিতার উদ্ধৃতাংশটি পড়িয়া শুনাইলেন এবং এই বিষয়ে কিছুক্ষণ আলাপান্তে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

কাশীধামের ধার্মিক সমাজে তখন ত্রৈলঙ্গ স্বামী, স্বামী ভাস্করানন্দ এবং স্বামী বিশুদ্ধানন্দের প্রভাব প্রবল ছিল। উক্ত সুপ্রাচীন তীর্থে সহস্র সহস্র সাধু ও ভক্ত বাস করিতেন। কিন্তু তাঁহাদের সেবাশুশ্রূষা করার কথা কাহারও মনে উঠিত না। চারুচন্দ্র প্রভৃতি যুবকগণ যখন সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে নারায়ণজ্ঞানে নরসেবায় ব্রতী হইলেন তখন উহা ধীরে ধীরে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। তাঁহারা কেদারনাথের গৃহে তাঁহাদের দরিদ্র সেবা সমিতির কার্য্যালয় স্থাপিত করিলেন। পথোপরি দুঃস্থ অসহায় রোগীদিগকে পথ হইতে তুলিয়া বা পর্ণ কুটীর হইতে আনিয়া তাঁহারা হাসপাতালে পাঠাইতেন এবং তাহাদের ঔষধপথ্য, এবং পোষাক পরিচ্ছদের আবশ্যকীয় খরচ ভিক্ষা দ্বারা সংগ্রহ করিতেন।

১৯০০ খ্রীঃ সেপ্টেম্বর মাসে সেবা সমিতি জঙ্গম বাড়ীতে স্থানান্তরিত হইল। তথায় একটি হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয় খোলা হইল। একটি ঘরে অসহায় রোগীদিগকে রাখিয়া চিকিৎসা করা হইত এবং আরেকটি ঘরে চারুচন্দ্র জনৈক বন্ধুর সহিত থাকিয়া রোগী-সেবাদি করিতেন। কেদারনাথ সংসার-ত্যাগের পর কাশীধামে ক্ষেমেশ্বর ঘাটে একটি ছোট ঘর (ভগ্ন শিবমন্দির) ভাড়া করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। স্বীয় পিতৃগৃহে চারুচন্দ্র ঠাকুরের যে পট প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তাহাও ক্ষেমেশ্বর ঘাটে ভাড়া-বাড়ীতে স্থাপিত হইল ও পূজিত হইতে লাগিল। কেদারনাথ স্বয়ং ঠাকুরের পূজা ও আরাত্রিক করিতেন। কাশীধামে ইহাকেই প্রথম রামকৃষ্ণ মন্দির বলা যাইতে পারে। কেদারনাথ তথায় রাত্রিবাস করিতেন এবং দিবাভাগে সেবা সমিতিতে যাইয়া

স্বয়ং রোগীসেবায় নিযুক্ত হইতেন। ভদ্রবংশীয় শিক্ষিত তরুণগণকে সেবাব্রতী হইতে দেখিয়া কাশীধামের রায় বাহাদুর প্রমদাদাস মিত্র প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তির দৃষ্টি উক্ত সেবা সমিতির দিকে আকৃষ্ট হইল। প্রমদাবাবু ঠাকুর-পূজার জন্য তাঁহাদিগকে কতকগুলি বাসন-কোসন দিলেন।

চারুচন্দ্র ছিলেন সেবা সমিতির মস্তিষ্কস্বরূপ, কেদারনাথ ও যামিনী উহার বাহুযুগলবৎ এবং অন্যান্য সেবকেরা উহার বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গতুল্য ছিলেন। সেই সময় রাজপুতানায় কিষণগড়ে ভীষণ দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হয়। স্বামী কল্যাণানন্দের তত্ত্বাবধানে তথায় রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক সেবাকার্য্য চলিতেছিল। স্বামী কল্যাণানন্দ সেবক প্রেরণের জন্য চারুচন্দ্রকে লিখিলেন। তদনুসারে কেদারনাথ ১৯০০ খ্রীঃ সেপ্টেম্বর মাসে তথায় স্বেচ্ছাসেবকরূপে প্রেরিত হন। চারুচন্দ্র কাশীধামে যে সেবাকার্য্য আরম্ভ করেন তাহা তাঁহার বন্ধু কলিকাতার শচীন্দ্রনাথ বসু ও মন্মথনাথ মুখার্জী সবিশেষ প্রশংসা করেন। এই বন্ধুযুগল পরে কলিকাতা হাইকোর্টের জজ্ হইয়াছিলেন।

তাঁহারা বারাণসী সেবা সমিতির সাহায্যার্থ কলিকাতায় একটি সহকারী সমিতি স্থাপনপূর্বক অর্থসংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে ১৯০০ খ্রীঃ অক্টোবর ও নভেম্বর মাসের মধ্যে সেবা সমিতি সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইল। অনতি-বিলম্বে সেবা সমিতি কাশীতে জনপ্রিয় হইয়া উঠিল এবং ডাঃ প্রমথনাথ বসু, সোমনাথ ভাদুড়ী প্রভৃতি বিশিষ্ট প্রবাসী বাঙ্গালীবৃন্দ ইহার পৃষ্ঠপোষক হইলেন। ১৯০০ খ্রীঃ সেপ্টেম্বর মাসে সেবা সমিতির সভ্যবৃন্দ এবং সেবকগণের যে সাধারণ সভা আহূত হইল তাহাতে রায় বাহাদুর প্রমদাদাস মিত্র প্রভৃতি ব্যক্তিগণ যোগদান করিলেন। পাঁচ মাসের মধ্যে সেবা সমিতির কার্য্য এত প্রসার লাভ করিল যে, ১৯০১ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী মাসে উহাকে দশাশ্বমেধ ঘাট রোডে একটি বৃহত্তর ভাড়া-বাড়ীতে উঠাইয়া লইতে হইল। উক্ত গৃহে স্থান-সংকুলান না হওয়ায় সেই বৎসর জুন মাসে রামপুরায় আরো বড় ভাড়া-বাড়ীতে সমিতি স্থানান্তরিত হয়। প্রথম দেড় বৎসরে সমিতিতে ৩৩০ জন পুরুষ এবং ৩৩৪ জন মহিলা—মোট ৬৬৪ জন দরিদ্র নরনারী কোন না কোন প্রকারে সেবা

বা সাহায্য প্রাপ্ত হয়। আন্তরিক সেবানুরাগ ও প্রাণপাতী পরিশ্রম দ্বারা কত মহৎ কার্য্য করা যায় তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই সেবা সমিতি। কোন অজ্ঞাত বন্ধু প্রদত্ত চারি আনা মূলধনে সেবা সমিতি প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়।

স্বামী বিবেকানন্দ বেলুড় মঠ হইতে বুদ্ধগয়া দর্শনান্তে সারনাথ যাইবার পথে কাশীধামে শুভাগমন করেন ১৯০২ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী মাসে। তিনি কাশীবাসিগণ কর্তৃক সাদরে সম্বর্ধিত হন এবং শ্রীকালীকৃষ্ণ ঠাকুরের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেন। চারুচন্দ্র ও হরিনাথ কয়েক জন সেবক-বন্ধুর সহিত মোগলসরাই জংশন পর্য্যন্ত যাইয়া স্বামী বিবেকানন্দকে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাইলেন। তাঁহাদের মধ্যে কতিপয় সেবক কাশীধামে স্বামিজীর সহিত দিবারাত্র থাকিয়া তাঁহার সেবায় ব্রতী হন। জাপান সরকারের প্রতিনিধি মনীষী কে-ও কাকুরা, স্বামী বোধানন্দ ও নির্ভয়ানন্দ স্বামীজীর সঙ্গে বেলুড় হইতে কাশীতে আসেন। স্বামীজীর যথাযোগ্য অভিনন্দনের আয়োজনার্থ স্বামী নিরঞ্জনানন্দ ও স্বামী শিবানন্দ ইতোপূর্বেই কাশীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

স্বামিজী জীবনাদর্শ ও সেবাধর্ম সম্বন্ধে যে সকল হৃদয়গ্রাহী ও সহজবোধ্য আলোচনা করেন তৎশ্রবণে চারুচন্দ্র প্রভৃতি সেবকবৃন্দের মনে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না—তাঁহারা জীবনে যে ব্রত বরণ করিয়াছেন তাহা সুমহৎ ও সমুচ্চ। চারুচন্দ্র, হরিনাথ ও হরিদাস স্বামিজীর নিকট মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করিয়া ধন্য হইলেন। নবীন শিষ্যগণ সেবাধর্ম সাধনার্থ গুরু পদে দেহ-মন সমর্পণ করিলেন। সেই পরম শুভ লগ্নে সিদ্ধ গুরু শিষ্যগণকে মানব জীবনের উচ্চতম লক্ষ্য নির্দেশান্তে বলিলেন, "অসহায় নররূপী নারায়ণের সপ্রেম সেবাই মানব জীবনের চরম লক্ষ্য। শুদ্ধচিত্ত ব্রহ্মচারী, নিষ্কাম কর্মী ও জনসাধারণের পক্ষে সেবাধর্ম সমভাবে উপযোগী।" স্বামীজির এই বাক্যগুলি সেবকগণের হৃদয়ে সুগভীর ও অনপনেয় রেখাপাত করিল। স্বামীজি আবার বলিলেন, "সাহায্য বা দুঃখমোচন করিবার তুমি কে? সপ্রেম সেবা ব্যতীত অন্য কিছুই তোমার আয়ত্তাধীন নহে। অন্যকে সাহায্য করিবার অভিমান সাধকের অধঃপতনের পূর্ব লক্ষণ। সকল অভিমান ত্যাগ ও সমস্ত বাসনা বর্জন করিয়া সত্য ও

প্রেমের পথ অনুসরণ কর। মানুষকে নারায়ণ-বুদ্ধিতে সেবা কর। এইরূপে নিষ্কাম কর্ম করিলে তুমি নিশ্চয়ই গন্তব্য স্থলে উপনীত হইবে। ইহার দ্বারা তুমি যে শুধু তোমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সদ্ব্যহার করিতে সমর্থ হইবে তাহা নহে ; পরন্তু তোমার সমাজের ও তোমার দেশের প্রভূত কল্যাণসাধন করিতে পারিবে। সেবাধর্ম সহায়ে সর্বভূতের সহিত ঈশ্বরের ঐক্য সহজে অনুভবগম্য। তোমাদের কর্মজীবনে তোমরা দয়াকে উচ্চ স্থান নির্দেশ করিয়াছ ; কিন্তু মনে রাখিও, কাহারও প্রতি দয়া প্রদর্শনের অধিকার আমাদের নাই। যিনি সর্বভূতের ঈশ্বর একমাত্র তিনিই দয়া প্রদর্শনের অধিকারী। উচ্চ ভূমি হইতে নিম্ন ভূমিতে দয়া-বারি প্রবাহিত হয়। কিন্তু যে মানুষ দয়া দেখাইতে চায় সে নিশ্চয়ই গর্বিত ও অহঙ্কৃত। কারণ, সে অপরকে নিজ অপেক্ষা অধিকতর নীচ ও হীন মনে করে। দয়া নহে, সেবাই তোমাদের জীবনের প্রধান নীতি হউক। দেবমূর্তিজ্ঞানে জীবসেবা দ্বারা কর্ম ধর্মে পরিণত হয়। তখন কর্ম মানুষকে ঈশ্বরের দিকে লইয়া যায়। ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কেহ মানবের দুঃখ দূর করিতে পারে না। শিষ্যগণ, তোমরা এই প্রতিষ্ঠানের নাম রাখ Home of Service (সেবাশ্রম)।" স্বামিজী চারুচন্দ্রের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "দরিদ্র সেবার জন্য যে পয়সাটি সংগৃহীত হয় তাহাকে তোমার বুকের রক্ত মনে করিবে। যাঁহারা সংসারত্যাগী, সর্বস্ব-সন্ন্যাসী, তাহাদের দ্বারাই এই সকল মহৎ কাজ সুষ্ঠু ও স্থায়ী ভাবে পরিচালিত হইতে পারে।" শ্রীগুরুর নিকট দিব্য প্রেরণা পাইয়া শিষ্যগণের দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তিত এবং কর্মপথ সুনির্দিষ্ট হইয়া গেল।

এই সময় ভিঙ্গার ধর্মপরায়ণ ও মহদাশয় রাজা উদয় প্রতাপসিংহ কাশীধামে দুর্গাকুণ্ডের নিকট তাঁহার বাগান-বাটীতে গৃহস্থ-সন্ন্যাসীরূপে বাস করিতেছিলেন। তিনি রাজকর্ম হইতে অবসর গ্রহণপূর্বক অবশিষ্ট জীবন কাশীধামে অতিবাহিত করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি এই ব্রত লইয়াছিলেন যে, তাঁহার বাগান-বাড়ীর বাহিরে অন্যত্র কোথাও যাইবেন না। ভিঙ্গারাজ স্বামী বিবেকানন্দকে দেখিবার জন্য অতিশয় উৎসুক হইলেন ; কিন্তু উক্ত ব্রত গ্রহণের জন্য মহামুস্কিলে পড়িলেন। একবার ভাবিলেন, তিনি স্বামিজীকে স্বীয় বাগান-

বাটীতে আসিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিবেন। কিন্তু স্বামিজী তাঁহার আমন্ত্রণ গ্রহণ করিবেন কিনা, সে বিষয়ে তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন না। অবশেষে তিনি ব্রতভঙ্গপূর্বক স্বামিজীর সাক্ষাৎ লাভের জন্য মনস্থ করিলেন।

স্বামী গোবিন্দানন্দ নামে এক বৃদ্ধ সন্ন্যাসী দৈবাৎ ভিঙ্গারাজের সহিত দেখা করিতে আসেন। তিনি রাজার নিকট তাঁহার সঙ্কল্পের কথা শুনিয়া বলিলেন, "আপনি অপেক্ষা করুন। আমি স্বামিজীর সঙ্গে দেখা করে তাঁকে সব কথা বলি এবং আপনার ব্রতভঙ্গের সঙ্কল্পও তাঁকে জানাই।" রাজা সম্মত হইলেন এবং গোবিন্দানন্দজী বিবেকানন্দ স্বামিজীর নিকট যাইয়া সব কথা নিবেদন করিলেন। তখন স্বামিজী বলিলেন, "রাজার পক্ষে ব্রত ভঙ্গ করা উচিত হবে না। আমি নিজে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করব।"

স্বামিজী পরদিন ভিঙ্গারাজের বাগানবাটীতে গেলেন। রাজা স্বামিজীর সহিত সাক্ষাৎ এবং বহু সাময়িক সমস্যার আলোচনা করিয়া সুখী হইলেন। সর্বশেষে তিনি করযোড়ে স্বামিজীকে বলিলেন, "আমার সামান্য বিচারে বুদ্ধ এবং শঙ্করের মত আপনি মহাপুরুষ। এই অকিঞ্চনকে আপনার আশীর্বাদ দিন। আপনি যদি অনুগ্রহ করে কাশীধামে বেদান্ত প্রচারার্থ একটী আশ্রম স্থাপন করেন তাহার দ্বারা স্থানীয় জনসাধারণের অশেষ কল্যাণ হইবে।" রাজা উক্ত আশ্রম স্থাপনার্থ অর্থসাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেন। কিন্তু স্বামিজী অসুস্থতা নিবন্ধন স্বয়ং আশ্রম স্থাপন করিতে স্বীকৃত হইলেন না; কিন্তু বলিলেন, "ঈশ্বরেচ্ছা হলে বারণসীতে বেদান্ত প্রচারার্থ একটী আশ্রম স্থাপিত হবে। এই কাজটি হাতে নেবার জন্য আমি আমার এক গুরুভাইকে অনুরোধ করব।" স্বামিজী দুই এক দিন পরে ভিঙ্গারাজের নিকট হইতে একখানি চিঠি এবং তৎসহ পাঁচ শত টাকার চেক দক্ষিণাস্বরূপ পাইলেন। স্বামিজী উক্ত চেক ও পত্র মহাপুরুষ মহারাজকে দিয়া বলিলেন, "এই টাকা দিয়া এখানে বেদান্ত প্রচারার্থ একটি কেন্দ্র স্থাপন করুন।" শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব দিবস আসন্ন হইলে স্বামী বিবেকানন্দ বেলুড় মঠে ফিরিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

স্বামিজী কাশীত্যাগের পূর্বে সেবাশ্রমের সেবকবৃন্দের অনুরোধে নিম্নোক্ত আবেদন ইংরাজীতে বলিয়া দিলেন। "প্রিয় মহাশয়, কাশী রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের বিগত বৎসরের কার্যবিবরণী গ্রহণ করিতে আপনাকে অনুরোধ জানাই। আমরা অতি সামান্য ভাবে বহুসংখ্যক কাশীবাসী নরনারীর, বিশেষতঃ বৃদ্ধবৃদ্ধাগণের, দুর্গতি দূরীকরণার্থ যে চেষ্টা করিয়াছি তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ইহাতে পাইবেন। আধুনিক যুগের শিক্ষা এবং জনমতের যে জাগরণ আসিয়াছে তাহাতে হিন্দু তীর্থগুলির এবং হিন্দুদের দুর্দশা ও কর্মপন্থা সমালোচনা এড়াইতে পারে নাই। অন্যান্য তীর্থে হিন্দু নরনারীগণ পুণ্যলাভের জন্য গমন করেন। সেইজন্য উহাদের সহিত হিন্দুদের সম্বন্ধ সাময়িক ও অল্পস্থায়ী। কাশী প্রাচীনতম ধর্মক্ষেত্র এবং আর্যধর্মের জীবন্ত কেন্দ্র। যে প্রবৃদ্ধ অথর্ব হিন্দু নরনারীগণ অন্তিম অবস্থায় আসিয়া বাবা বিশ্বনাথের শ্রীচরণাশ্রয়ে থাকিয়া জগদ্ধিতায় সংসার ত্যাগ করিয়া এবং আত্মীয়-স্বজনগণের সংসর্গ ছাড়িয়া এখানে বাস করিতেছেন তাঁহাদের সংখ্যাও অল্প নয়। তাঁহারাও সাধারণ নরনারীর ন্যায় রোগাকারে দৈহিক কষ্ট ভোগ করেন। এই স্থানের ব্যবস্থাও আশানুরূপ নয়, এমনকি নিন্দনীয়ও বলা চলে। সাধারণতঃ সুতীব্র সমালোচনা পুরোহিতগণের উপর স্তূপীকৃত করা হয়। তাঁহারা যে নির্দোষ একথাও বলা চলে না। কিন্তু এই মহাসত্য ভুলিলে চলিবে না যে, জনসাধারণ যেমন, তাহাদের ধর্ম-যাজকেরাও তেমনি।"

"যদি লোকে করযোড়ে দাঁড়াইয়া দেখে যে, বালকবৃদ্ধবনিতা এবং সন্ন্যাসী ও গৃহী সকলে দুর্বার দুঃখস্রোতে তাহাদের গৃহদ্বারেই ভাসিয়া যাইতেছে, অথচ দুর্গতদের দুঃখ নিবারণে নিশ্চেষ্ট থাকে এবং তীর্থ স্থানের পাণ্ডাদের দুষ্কর্মের নিন্দা করে তাহা হইলে দুঃখের এক কণাও দূরীভূত হইবে না, বা কেহই তজ্জন্য সুখানুভব করিবে না। এই সনাতন মুক্তিক্ষেত্র শিবপুরীতে আমাদের পিতৃ-পুরুষগণের ধর্মরক্ষা করিতে আমরা কি চাই না? যদি আমরা চাই, তাহা হইলে আমরা দেখিয়া কি আহ্লাদিত হইব না যে, যাহারা তনুত্যাগার্থ এখানে আসেন তাহাদের সংখ্যা প্রতিবৎসর বাড়িয়া যাইতেছে। শিবের নাম জয়যুক্ত হউক।

পূর্ববৎ এখনও আমাদের দেশের দরিদ্রগণ আন্তরিক মুক্তিকামী। যে সকল অসহায় নরনারী এখানে দেহরক্ষা করিতে আসেন তাঁহারা গৃহের সহিত সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করেন। জরা-ব্যাধি কর্তৃক অভিভূত হইলে তাঁহাদের কি দুরবস্থা হয় তাহা মানস চক্ষে দেখিতে আপনাকে অনুরোধ করি। ভ্রাতঃ। এই অপার্থিব পুণ্যস্থানে দেহত্যাগার্থ যে অদ্ভুত আকর্ষণ হিন্দু নরনারীগণকে গৃহসুখ ভুলাইয়া দেয় তাহা একবার ভাবিয়া দেখুন। মৃত্যুর মাধ্যমে মুক্তিলাভার্থ বৃদ্ধ তীর্থযাত্রিগণের অনন্ত জনস্রোত লক্ষ্য করিলে কাহার মনে না দিব্য ভাবের উদয় হয়? যদি আপনার হৃদয়ে সেই স্বর্গীয় ভাব জাগে তবে আসুন এবং এখানে তীর্থযাত্রীদিগের সেবায় আমাদিগকে সাহায্য করুন। আপনি যদি একটি কড়িমাত্র দান করেন, বা অত্যল্প সাহায্য করেন তাহাতেই কাহারো না কাহারো কিঞ্চিৎ উপকার হইবে। প্রাচীন প্রবাদ বাক্যে আছে, তৃণগুচ্ছ দ্বারা রজ্জু করিলে তাহাতে মত্তহস্তীও বাধা যায়। সতত শুভানুধ্যায়ী—বিবেকানন্দ।”

কাশীধামে তিন সপ্তাহ থাকিয়া স্বামী বিবেকানন্দ বেলুড় মঠে ফিরিলেন। ইহাই তাঁহার প্রচার কার্য্যের শেষ দফা। সেই সময় কলিকাতার প্রসিদ্ধ জমিদার কালীকৃষ্ণ ঠাকুর সেবইকে সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে স্বামী নিরঞ্জনানন্দকে স্বীয় ইচ্ছা জ্ঞাপন করেন। স্বামী নিরঞ্জনানন্দ তাঁহাকে সবিনয়ে জানাইলেন যে, সেবাশ্রমের একটি নিজস্ব গৃহের বিশেষ প্রয়োজন। উপরোক্ত দানশীল ভদ্রলোক এইরূপ একটি গৃহনির্মাণের সমস্ত ব্যয়-ভার বহন করিতে সম্মত হইলেন। এই শুভ সংবাদ স্বামী বিবেকানন্দকে জানান হইল। স্বামিজী উত্তরে লিখিয়াছিলেন, “দরিদ্রদিগের জন্য একটি গৃহ, এমন কি একটি পর্ণ কুটীর, নির্মাণার্থ দানে কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের যে পুণ্য হইবে তাহা সহস্র দেবমূর্তি প্রতিষ্ঠার সমান।” স্বামিজীর এই আশীর্বাণীতে দানশীল হিন্দুগণের হৃদয় দ্রবীভূত হইল এবং তাঁহাদের কেহ কেহ সেবাশ্রমকে সাহায্যের জন্য অগ্রসর হইলেন। স্বামিজীর নূতন শিষ্যগণ মহোদ্যমে ও মহোৎসাহে সেবাধর্মে আত্ম-নিয়োগ করিলেন। তাঁহাদের জীবনে সেবার সহিত সাধনাও চলিল। সেবা ও সাধনা সংযুক্ত হইলে আত্মবিকাশ বর্তমান যুগে অভূতপূর্ব হয়। শিষ্যগণ গুরুদেবকে বেলুড়

মঠে লিখিলেন পূজ্যপাদ স্বামী শিবানন্দকে কাশীতে পাঠাইতে, তাঁহাদিগকে আধ্যাত্মিক প্রেরণা দানার্থ। পূর্বে স্বামী শিবানন্দ কিছুকাল উক্ত সেবাশ্রমে থাকিয়া সাধারণ সেবকের মত রোগীদের মলমূত্রাদি পরিষ্কার পর্য্যন্ত করিতে সঙ্কুচিত হন নাই। তাঁহার তীব্র ত্যাগ-তপস্যাও সেবকদিগকে অসীম অনুপ্রেরণা দান করিত। সেইজন্য সকলে তাঁহাকে পুনরায় পাইবার জন্য আগ্রহান্বিত হইলেন। ভিঙ্গারাজের অনুরোধে স্বামিজী কাশীতে একটী বেদান্ত আশ্রম স্থাপন করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। শিষ্যগণের অনুরোধে এখন তিনি উক্ত ইচ্ছা পূরণে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার নির্দেশে স্বামী শিবানন্দ ব্রহ্মচারী কেদারনাথের সহিত ১৯০২ খ্রীঃ জুন মাসে কাশী সেবাশ্রমে উপস্থিত হইলেন। সেবাশ্রমে সপ্তাহ খানেক থাকিয়া স্বামী শিবানন্দ লাক্ষা পল্লীতে একটী বাগান-বাড়ী মাসিক দশ টাকা ভাড়ায় লইলেন। ১৩০৯ সাল ২০শে আষাঢ় (৪ঠা জুলাই, ১৯০২ খ্রীঃ) শুভ দিনে নব মঠ প্রতিষ্ঠিত হইল। স্বামী শিবানন্দ উহার নাম রাখিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রম। ক্ষেমেশ্বর ঘাটে ভাড়া-বাড়ীতে চারুচন্দ্র প্রদত্ত ঠাকুরের যে ছবিখানি প্রতিষ্ঠিত হইয়া পূজিত হইত তাহাই অদ্বৈতাশ্রমে স্থাপিত হইল। সেইদিন হইতেই স্বামী শিবানন্দ নবস্থাপিত অদ্বৈতাশ্রমে বাস করিতে থাকেন। কেদারনাথ, চারুচন্দ্র প্রভৃতি সেবকগণও সেদিন তথায় রাত্রিবাস করিলেন। কিন্তু সেই রাত্রে কাহারো ঘুম হইল না, সকলের মন কোন্ এক অব্যক্ত কারণে আন্দোলিত ছিল। অবশ্য, নিদ্রাভাবের কারণ কেহ কেহ অত্যধিক গরম ও মশার উপদ্রব বলিয়া মনে করিলেন। প্রাতে সেবকগণ সেবাশ্রমে যাইয়া নিত্য কর্মে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহাদের হৃদয়-ভার লঘু হইল না। বৈকালে পোষ্ট-ম্যান আসিয়া স্বামী শিবানন্দের নামে একটী টেলিগ্রাম চারুচন্দ্রকে দিয়া গেল। তখন চারুচন্দ্র টেলিগ্রামটী খুলিলেন না। সন্ধ্যায় যখন তিনি অদ্বৈতাশ্রমে গেলেন উহা স্বামী শিবানন্দকে দিলেন। স্বামী শিবানন্দ খামটী খুলিয়া পড়িলেন, "গত রাত্রে নয়টার সময় স্বামী বিবেকানন্দ নশ্বর দেহ ত্যাগপূর্বক মহাসমাধি লাভ করিয়াছেন।" এই দুঃসংবাদে গত রাত্রে চারুচন্দ্র প্রভৃতির অনিদ্রা ও উদ্বেগের কারণ নিঃসংশয়ে আবিষ্কৃত হইল।

স্বামী শিবানন্দ প্রথমে এই দুঃসংবাদ সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। তিনি কেদারনাথ প্রভৃতিকে বলিলেন, "অমি বিশ্বাস করি না যে, স্বামিজী দেহরক্ষা করেছেন, হয়ত কোন শত্রু এই মিথ্যা তার করেছে।" কিন্তু ইহাতে কেহই আশ্বস্ত হইলেন না। পরদিন পূর্বাহ্ণে চারু চন্দ্র কলিকাতাস্থ কোন বন্ধুর নিকট হইতে আর একটী টেলিগ্রামে একই দুঃসংবাদ পাইলেন। এখন আর কাহারো সন্দেহের অবকাশ রহিল না। তাঁহারা দুঃখভারাক্রান্ত অন্তঃ-করণে অদ্বৈতাশ্রমে যাইয়া স্বামী শিবানন্দজীকে দ্বিতীয় তারটী দেখাইলেন। তিনি সজল নয়নে সেবকগণকে বলিলেন, "আচার্য্যদেব কখনো বলিতেন কাশীর কাজ আমার শেষ কাজ। দেখ, তাঁহার কথা কেমন আশ্চর্য্য ভাবে ফলিয়া গেল। কয়েক মাস পূর্ব তিনি তোমাদের অন্তরে সেবা-ধর্মের বীজ বপন করিলেন এবং তাঁহারই ইচ্ছানুসারে গত কাল অদ্বৈতাশ্রম প্রতিষ্ঠার দিবসই তিনি মহাসমাধিমগ্ন হলেন। এই ঘোর বিপদ দ্বারা ভারতের কি কল্যাণ সাধিত হইবে কে জানে? ঠাকুর ও স্বামিজী যে কর্মপন্থা নির্দেশ করেছেন তাহাই ভারতের প্রত্যেক নরনারীর কল্যাণকর গন্তব্য পথ।"

স্বামী বিবেকানন্দ সেবাশ্রমের কার্য্য-বিবরণীর সহিত উপরোক্ত স্বাক্ষরযুক্ত যে আবেদন লিখিয়া দিয়াছিলেন তাহা যাদুবৎ কার্য্যকরী হইল এবং জনসাধারণের মধ্যে সেবাশ্রমের প্রতি অপূর্ব সমবেদনা উদ্রেক করিল। সেবা সমিতির কার্য্য-নির্বাহক সভা উক্ত সমিতিকে রামকৃষ্ণ মিশনের সহিত সংযুক্ত করিলেন এবং পূর্ব নাম পরিবর্তিত করিয়া উহার নাম রাখিলেন রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম। ১৯০২ খ্রীঃ কারমাইকেল লাইব্রেরীতে সমিতির কার্য্যনির্বাহক সভার যে বিশেষ অধিবেশন হয় তাহাতে সর্বসম্মতিক্রমে উক্ত প্রস্তাব গৃহীত হয়। রামকৃষ্ণ মিশনের সহিত সংযুক্ত হইবার পর সেবাশ্রমের কর্ম-প্রসার অভাবনীয়ভাবে চলিতে লাগিল। স্বামিজীর ইংরাজ শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতা মাঝে মাঝে কাশীতে যাইয়া সেবাশ্রমে থাকিতেন এবং ত্যাগী সেবকদের সহিত দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া অর্থভিক্ষা করিতেন। তিনি সেবাশ্রমের উদ্যোগে তথায় কয়েকটী সাধারণ বক্তৃতাও দিয়াছিলেন। ইহার ফলে স্থানীয় শিক্ষিত সমাজ

স্বামিজীর সেবাধর্ম এবং সেবাশ্রমের আদর্শের সহিত গভীর ভাবে পরিচিত হইলেন।

সেবাশ্রমের তৎকালীন কর্ম-প্রচেষ্টা ও অদ্ভুত সাফল্য সম্বন্ধে স্বামী শিবানন্দ 'উদ্বোধন' পত্রিকায় যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন তাহাতে নিম্নোক্ত ঘটনাটী উল্লিখিত।

পশ্চিম বঙ্গে চব্বিশ পরগণা জেলার অন্তর্গত কোন গ্রামে উপেন্দ্র নামক একটী ত্রিশবর্ষবয়স্ক দরিদ্র যুবক বাস করিত। বার বার দীর্ঘ কাল ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া তাহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। স্বাস্থ্যোন্নতির আশায় সে কাশীতে যায় এবং অন্নসত্রে ভিক্ষা করিয়া খায়। এইরূপে সে কয়েক মাস ভাগ্য-বিড়ম্বিত জীবন যাপন করে। কোনও ভদ্রলোকের পরামর্শে সে স্থানীয় রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে যাইয়া রোগীরূপে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং প্রায় আট মাসের মধ্যে যথাযোগ্য ঔষধপত্র ও সেবাশুশ্রূষা পাইয়া সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠে। কিন্তু সুস্থ হইয়া সে আর গৃহে ফিরিতে চাহিল না। সে সেবাশ্রমে রুগ্ন নরনারীর সেবায় আত্মনিয়োগ করিল। রোগীর সেবায় সে এত আনন্দ পাইত যে, দিবারাত্রি সেবাকার্যে মাতিয়া থাকিত। কোন কোন দুঃস্থ রোগীর জন্য সে রাত্রে ঘুমাইতে পারিত না। উপেন্দ্র সেবাশ্রমের জন্য মুষ্টিভিক্ষা সংগ্রহ করিতেও যাইত এবং সর্বপ্রকার সেবাকার্যই তাহার ভাল লাগিত। একবার কোন বসন্ত-রোগীর সেবায় সে নিযুক্ত হয়। রোগীটি তাহার সপ্রেম সেবায় সুস্থ হইয়া উঠিল, কিন্তু তৎপরে সেবক উপেন্দ্র নিজেই উক্ত সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হইল এবং উহাতেই দেহত্যাগ করিল। যে সকল রোগী উপেন্দ্রের সেবায় রোগমুক্ত হইয়াছিল তাহারা সকলেই তাহার মৃত্যুতে অশ্রুপাত করিল।

১৯০৩ খ্রীঃ রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম অধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দ কাশী সেবাশ্রমে গিয়াছিলেন। তিনি সেবকগণকে সেবাশ্রমের নিজস্ব গৃহ করিবার জন্য পরামর্শ দেন। তিনি সেবকদিগের সহিত উপযুক্ত জমির সন্ধানে শহরের নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইলেন। সেবাশ্রমের জন্য আবশ্যকীয় জমি নির্দিষ্ট হইল,

কিন্তু ভূমিক্রয়ের অর্থ কোথায়? সৎকাজে আন্তরিকতা থাকিলে ঈশ্বরই সহায়ক হন। আশাতীত ভাবে আবশ্যকীয় অর্থ পাওয়া গেল। সেবাশ্রম এখন যে ভূমির উপর অবস্থিত তাহা ছয় হাজার টাকা মূল্যে ক্রীত হইল। কলিকাতার শ্রীউপেন্দ্র নারায়ণ দেব ও হুগলীর শ্রীতারিণীচরণ পাল ভূমিক্রয়ের সমগ্র অর্থ দান করেন। উক্ত ভূমির অধিকারী স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া স্বামী শিবানন্দের নিকট ভূমি বিক্রয়ের প্রস্তাব করেন। স্বামী শিবানন্দ চারুচন্দ্রকে ভূমিক্রয়ের সকল ব্যবস্থা করিতে আদেশ দেন। চারুচন্দ্র উক্ত সংবাদে মহানন্দে বলিয়া উঠিলেন, "হে প্রভু! তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।" স্বামীজীর শুভ সংকল্প অবিলম্বে সংসিদ্ধ হইল। রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম সম্পাদক স্বামী সারদানন্দ তখন মায়াবতী আশ্রমে যাইবার পথে কাশীধামে অবতরণ ও কয়েকদিন অবস্থান করেন। তাঁহার পরামর্শে ১৯০৬ খ্রীঃ উক্ত জমি-ক্রয় সমাপ্ত হইল। ১৯০৮ খ্রীঃ এপ্রিল মাসে স্বামী ব্রহ্মানন্দ সেবাশ্রমে নবগৃহের ভিত্তি স্থাপন করিলেন। স্বামী বিজ্ঞানানন্দের তত্ত্বাবধানে এবং স্বামী সচ্চিদানন্দ ও স্বামী অচলানন্দের অক্লান্ত পরিশ্রমে দুই বৎসরের মধ্যেই নূতন গৃহ নির্মাণ সম্পূর্ণ হইল। ১৯১০ খ্রীঃ ১৬ই মে ব্রহ্মানন্দজী নবগৃহের দ্বারোদ্ঘাটন করিলেন। এই উপলক্ষ্যে ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র রামলাল চট্টোপাধ্যায় এবং কয়েকজন সাধু ও ব্রহ্মচারী কলিকাতা হইতে আসিয়াছিলেন। উক্ত শুভানুষ্ঠানের পর স্বামী শিবানন্দ বেলুড় মঠে চলিয়া যান। কাশীধামের তদানীন্তন ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ গাস্কেলের পৌরোহিত্যে ৬ই মে সেবাশ্রমের প্রধান কার্যালয়ের দ্বার উন্মুক্ত হয়।

চারুচন্দ্র ১৯২১ খ্রীঃ ঠাকুরের তিথিপূজার দিন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মানস পুত্র স্বামী ব্রহ্মানন্দের নিকট কাশীধামে সন্ন্যাস গ্রহণান্তে স্বামী শুভানন্দ নামে অভিহিত হন। শুভানন্দজী কিরূপে সেবাশ্রমের কার্য পরিচালনা করিতেন তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। তিনি অতিশয় মিতব্যয়ী ছিলেন এবং স্বীয় গুরুর আদেশক্রমে সেবাশ্রমের কপর্দকটীকে নিজ রক্তবিন্দুবৎ মূল্যবান মনে করিতেন। তিনি ভ্রাতাদের নিকট হইতে পৈত্রিক সম্পত্তির আয়ের কিয়দংশ প্রতিমাসে পাইতেন। উক্ত অর্থে তাঁহার অন্নবস্ত্রের

ব্যয়নির্বাহ হইত এবং উহার কিঞ্চিৎ সেবাশ্রমের কর্মীদের জন্য তিনি তাঁহাদের অজ্ঞাতসারে খরচ করিতেন। তিনি সেবাশ্রমের জন্য প্রাণপাত করিলেও কখনো উহার অন্নবস্ত্র গ্রহণ করিতেন না। এরূপ নিঃস্বার্থ সেবাব্রতী জগতে সুদুর্লভ।

স্বামী শুভানন্দ কিরূপে সেবাশ্রমের অমিত ব্যয় বন্ধ করিতেন তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। একবার কোন সাধু সেবক আহারান্তে তাঁহার নিকট দুইটি জামা চাহেন। কিন্তু আশ্রমের নিয়মানুসারে প্রত্যেক সেবক একটি মাত্র জামা পাইতেন। এই জন্য স্বামী শুভানন্দ উক্ত সাধুকে উত্তর দিলেন, "আমি সেবাশ্রমের তত্ত্বাবধায়ক মাত্র, স্বত্ত্বাধিকারী নহি। সুতরাং সাধারণ নিয়ম ভঙ্গ করিয়া তোমাকে দুইটি জামা দিবার অধিকার আমার নাই।" তিনি প্রত্যহ ছয় সাতটির অধিক দেশলাই কাঠি কাহাকেও ব্যবহার করিতে দিতেন না। তিনি প্রাপ্ত পত্রসমূহ হইতে খামগুলি এবং পুস্তকের পার্শ্বেল. পত্রিকা ও সংবাদপত্র হইতে প্যাকিং কাগজ সংগ্রহ করিয়া স্তূপাকারে সাজাইয়া রাখিতেন। কোনও সেবক সেইসকল ছিন্ন কাগজ প্রভৃতি ফেলিয়া দিবার অনুমতি চাহিলে তিনি সবিনয়ে বলিলেন, "মশাই, ক্ষমা করিবেন। আপনি কি এগুলিকে অনাবশ্যক মনে করেন যে ফেলিয়া দিতে চান! যদি তাই হয় তবে স্মরণ রাখিবেন যে, কোন কিছুকে অপ্রয়োজনীয় মনে করিবার অধিকার মানুষের নাই। এই কাগজের টুকরাগুলিকে রাখিবার যথেষ্ট স্থান সেবাশ্রমে আছে। যদি পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্যের অনুরোধে এগুলিকে ফেলিয়া দিতে চান তাহা হইলে এগুলিকে ভাল করিয়া সাজাইয়া রাখুন। জগতের প্রত্যেক বস্তুর কিছু না কিছু প্রয়োজন আছে। কোন বস্তু ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র হইলেও যদি সংরক্ষিত হয় তবে একদিন কোন না কোন কাজে লাগিবে।" স্বামী শুভানন্দের এই যুক্তিপূর্ণ মন্তব্যে সেবক নীরব রহিলেন; কিন্তু উহার বিশদার্থ সম্ভবতঃ তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইল না। প্রথম ইউরোপীয় মহাসমরের সময় সেই ছিন্ন কাগজের স্তূপ বিক্রয় করিয়া পঁয়ষট্টি টাকা পাওয়া গিয়াছিল।

স্বামী শুভানন্দ যেমন কড়া নিয়মনিষ্ঠ ছিলেন তেমনি সহৃদয় ও সুনম্র

ছিলেন। তিনি সুপ্রীতি ও সদ্ব্যবহার দ্বারা সেবকদিগের হৃদয় জয় করিতেন। যদিও তিনি সেবাশ্রমের প্রধান তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন তথাপি নিজে নগণ্য ভৃত্যরূপে ব্যবহার করিতেন। মাতা যেমন স্বীয় সন্তানকে সস্নেহে যত্ন করেন তিনি তেমনি সেবাশ্রমের রোগীদিগের সুবিধা, আরাম ও শুশ্রূষা বিধান করিতেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের সাক্ষাৎ গৃহী শিষ্য দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার কাশী সেবাশ্রমের সেবকগণের সেবানুরাগ ও মানবপ্রেম দেখিয়া বিমুগ্ধ হন এবং নিম্নোক্ত কবিতা রচনা করেন।—

"কাশীধাম পুণ্যক্ষেত্রে ব্রহ্মচারিগণ, কে তোমরা দেহ পরিচয়।
পরিহরি ধ্যানজপ দেবতা দর্শন, কি কাজে করিছ কাল-ক্ষয়॥
গৈরিক বসন পরি, ভিক্ষান্নে জীবন ধরি
ভোগতৃষ্ণা করেছ বর্জন।
কেন তবে নাহি কর দেবতা-অর্চন॥১

বিশ্বনাথ সাক্ষাৎ আছেন কাশীধামে, যে ভজে সে পায় মুক্তিধন।
ভবের বন্ধন খসে যাঁর পুণ্য নামে, তায় উদাসীন কি কারণ॥
বুঝিতে নারিনু ভাব, বোঝ না কি লাভালাভ
ভক্তি মুক্তি চাহ নাকি ভাই।
অদ্ভুত রহস্য তাই পরিচয় চাই॥২

পুনঃ কে এ চারু মূর্তি তোমাদের মাঝে, নহে ত গৈরিক বস্ত্র ধারী।
ব্রহ্মচারীসনে কেন সংসারীর সাজে, মর্ম কিছু বুঝিতে না পারি॥
সংশয় করিয়া নাশ, পূর্ণ কর অভিলাষ
তোমা সবে এই নিবেদন।
বিস্ময়-তরঙ্গে মম আন্দোলিত মন॥৩

বুঝেছি বুঝেছি হায় বুঝেছি সম্প্রতি, কে তোমরা নর-নারায়ণ।
জরাজীর্ণ মুমূর্ষুর হরিতে দুর্গতি, সেবাধর্ম করেছ গ্রহণ॥

ভক্তি মুক্তি নাই চাও, বিপন্নে যথায় পাও
বক্ষে করি আনি সযতনে।
সেবাশ্রমে সেবা কর অতি সন্তর্পণে ॥৪

পরহিতে সর্ব স্বার্থ করি বলি দান, সেবাব্রত করেছ গ্রহণ।
নিয়ত সাধিতে যত্ন পরের কল্যাণ, জপতপ সব বিসর্জন ॥

শাস্ত্রে আছে উপদেশ, সর্বঘটে পরমেশ
কিন্তু হায় বুঝে কয়জন।
অনুভব বিনা মাত্র মুখের বচন ॥৫

সর্বঘটে নারায়ণ না হলে দর্শন, হেন সেবা কে করিতে পারে।
সংক্রামক রোগী বৈদ্য করে না স্পর্শন, তুমি যত্নে সেবা কর তারে ॥

মলমূত্র-মাখা কায়, অচেতন মৃতপ্রায়
দুর্গন্ধে নিকটে কেবা যায়।
কুড়াইয়া আনি ব্যস্ত তার শুশ্রূষায় ॥৬

কাশীবাসী দরিদ্র গৃহস্থ অর্থহীন, পীড়িত কে আছে কোন খানে।
ঘরে ঘরে তত্ত্ব লয়ে ফের প্রতিদিন, বাঁচাও ঔষধ-পথ্য দানে ॥

যে ভাবে বিপন্ন যেবা, সাহায্য বা চায় সেবা
বিমুখ তাহে না কভু হায়।
হেন স্নেহ কেবা কোথা দেখেছে ধরায় ॥ ৭

কেহ বলে মাতার সমান স্নেহ নাই, মাতৃস্নেহ অতুল এ ভবে।
সন্তানের প্রতি বটে দেখিবারে পাই, অন্যে কি তা কখনো সম্ভবে ॥

নিজ পুত্রে যে যতন করে মাতা অনুক্ষণ
পর পুত্রে না হয় তেমন।
তাই বলি মাতৃস্নেহ স্বভাব বন্ধন ॥৮

আত্মার স্বাধীন ভাব প্রেম নাম তার, আত্মপর থাকে না বিচার।
জাতি-নির্বিশেষে খোলা সে প্রেম-ভাণ্ডার, প্রবেশে সবার অধিকার ॥

ঘৃণাভয় পরিহরি, এই প্রেম হৃদে ধরি
অকাতরে বিলাও ধরায় ।
স্বার্থপর নর ব্যস্ত নিজের চিন্তায় ॥৯

এ হেন পবিত্র প্রেম-রস আস্বাদন, এ জীবনে ঘটিল না হায়।
বৃদ্ধের অবশ তনু দুর্বল জীবন, অনুদিন জরাগ্রস্ত তায় ॥
পর সেবা কেবা করে, ব্যস্ত নিজ সেবাতরে
কর্মফল যাহার যেমন ।
তাই বলি ধন্য হে তোমরা মহাজন ॥১০

সেবাশ্রমে সেবাকার্য্যে যে আছ যেখানে, সবাকারে করি নমস্কার ।
বিপন্নে করিছ রক্ষা বিবিধ বিধানে, দেবপূজ্য প্রেম-অবতার ॥
পরহিত-ব্রত ধরি, অবনীতে অবতরি
পবিত্র করিলে ধরা-ধাম ।
নিলে নাম, স্বার্থ যায়, পূর্ণ হয় কাম ॥১১

এক সন্ধ্যায় স্বামী শুভানন্দ সেবাশ্রমের কার্য্যোপলক্ষে সহরের কোন পল্লীতে গিয়াছিলেন। ফিরিবার পথে কোন পুরাতন বন্ধুর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। বন্ধুটীর জরুরী প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিবার জন্য পথে কিছু দেরী হইল। সেবাশ্রমে ফিরিয়া তিনি জানিলেন, নৈশ আহারের ঘণ্টা বাজিয়া গিয়াছে এবং সাধু-সেবকবৃন্দ ভোজনার্থ উপবিষ্ট। শুভানন্দজী বলিলেন, "যথাসময়ে ফিরিতে পারলাম না, সুতরাং আজ রাত্রে কিছু খাব না।" অবশেষে কোন সাধুর সনির্বন্ধ অনুরোধে একখানি মাত্র রুটী খাইয়া তিনি শুইয়া পড়িলেন। তিনি সেবাশ্রমের সর্বাধ্যক্ষ ছিলেন এবং যখন ইচ্ছা খাইতে পারিতেন। কিন্তু সেবাশ্রমের নিয়ম-কানুন তিনিই সর্বাগ্রে মানিয়া চলিতেন। ইহা হইতে স্পষ্ট প্রতীতি হয়, উক্ত সেবাব্রতীর জীবনে নিয়ম-নিষ্ঠা কত অসাধারণ ছিল! তিনি সেবাশ্রমের অন্ন গ্রহণ করিতেন না, প্রত্যেক মাসে স্বীয় খাবার খরচ বাবদ সেবাশ্রমকে কিছু টাকা দিতেন।*

* স্বামী হরানন্দ কথিত।

একদিন একটি যুবক আসিয়া স্বামী শুভানন্দের নিকট বলিল যে, সে সেবাশ্রমের সেবক হইতে চায়। শুভানন্দজী যুবকটিকে তাঁহার সমস্ত সংবাদ জিজ্ঞাসা করায় সে কাঁদিয়া বলিল, "আমার মা বাপও আমাকে বিশ্বাস করেন না। আমি বাপের বাক্স ভেঙ্গে টাকা চুরি করেছি, মার গহনাও চুরি করেছি। এখন বাড়ীতে থাকতে আমার ইচ্ছা নাই। আমি সেবা করে শুদ্ধ হতে ইচ্ছা করি।" স্বামী শুভানন্দ তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "তোমার যখন সেবাধর্মে বিশ্বাস হয়েছে তোমার কল্যাণ হবে। তুমি সেবাশ্রমে থেকে নারায়ণ-জ্ঞানে রোগী সেবা কর।" যুবকটী সেবাশ্রমেই রহিল এবং প্রাণ মন দিয়া সেবায় ব্রতী হইল। নিঃস্বার্থ সেবার ফলে তাহার পূর্বপ্রকৃতি অচিরে পরিবর্তিত হইয়া গেল। একদিন শুভানন্দজী তাহাকে চার পাঁচ শত টাকা দিলেন ডাকঘরে ইনসিওর করিবার জন্য। যুবকটী বিস্মিত হইয়া সজল নয়নে বলিল, "আমাকে বাপ মা পর্যন্ত বিশ্বাস করে অল্প টাকাও দিতেন না। আর আপনি বিশ্বাস করে আমাকে এত টাকা দিচ্ছেন? আমি যদি টাকা নিয়ে পালাই?" স্বামী শুভানন্দজী তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "আমি তোমাকে বিশ্বাস করি। তুমি নিশ্চয়ই টাকা নিয়ে পালাবে না। আর যদি পালাও ত পালাবে। তুমি টাকা নিয়ে ডাক-ঘরে যাও।" যুবকটী টাকা লইয়া ডাক-ঘরে গেল এবং ইনসিওর করিয়া অবিলম্বে ফিরিল। এইরূপ বিশ্বাস করিয়াই শুভানন্দজী মানবের চিত্ত জয় করিতেন। মানব চরিত্রের মহত্ত্বে বিশ্বাসী না হইলে মানব-প্রেমিক হওয়া যায় না।*

একবার স্বামী শুভানন্দ বেলুড় মঠে আসিয়াছেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রভৃতি রামকৃষ্ণ-সন্তানগণ খাইতে বসিয়াছেন। অন্যান্য সাধু তাঁহাদের কাছে খাইতে বসিবার জন্য উদ্গ্রীব। কিন্তু স্বামী শুভানন্দ দীর্ঘ পঙ্গতের এক প্রান্তে নীরবে উপবিষ্ট। স্বামী ব্রহ্মানন্দ তাঁহাকে ডাকিলেন তৎপার্শ্বে আসিয়া বসিতে। শুভানন্দজী স্বীয় আসনোপরি দাঁড়াইয়া করযোড়ে সংঘগুরু ব্রহ্মানন্দজীকে মিনতি জানাইলেন, "মহারাজ, এই খানেই বসেছি।" পার্শ্ববর্তী জনৈক সাধু শুভানন্দজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি বড় মহারাজের কাছে গেলেন না কেন?"

* স্বামী বলদেবানন্দ কথিত।

বিনম্র উত্তর আসিল "এঁরা কি মানুষ! এঁরা সাক্ষাৎ দেবতা, ভগবানের অন্তরঙ্গ পার্ষদ। এঁদের কাছে বসবার যোগ্যতা কি আমার আছে? আমার মনে কত মলিনতা!" ইহা হইতে বুঝা যায়, শুভানন্দজী স্বীয় গুরু এবং ঠাকুরের সাক্ষাৎ শিষ্যগণকে কি চক্ষে দেখিতেন। তিনি অন্যান্য তরুণ সন্ন্যাসীকে ঠাকুরের শিষ্যদের কাছে যাইতে উৎসাহ দিতেন। জনৈক তরুণসাধু একবার বলিলেন, "তাঁদের কাছে গিয়ে কি হবে? তাঁরা ত ধর্ম কথা বিশেষ বলেন না, আমাদের সঙ্গে অনেক সময় হাস্য কৌতুক করেন।" তদুত্তরে স্বামী শুভানন্দ বলিলেন, "তাঁদের কাছে গিয়ে বসলেই চিত্ত শুদ্ধ হয়, মনের অজ্ঞান দূরীভূত হয়।"

সহকর্মীদের সহিত মতভেদ হওয়ায় স্বামী শুভানন্দ প্রয়াগতীর্থে ত্রিবেণী-সঙ্গমে ঝুসীতে যাইয়া বাস করেন। কিন্তু সেবাশ্রম পরিচালনায় অসুবিধা হওয়ায় স্বামী কালিকানন্দ আবার তাঁহাকে ধরিয়া সেবাশ্রমে লইয়া আসেন। পুনরায় যখন মতভেদ ঘটিল সহকর্মীদের সহিত তখন তিনি কাশীধামে টিলাতে যাইয়া রহিলেন। সেবাশ্রম পরিচালনার সৌকর্য্যার্থ তাঁহাকে আবার সেবাশ্রমেআনা হইল। পুনরায় মতভেদ ঘটায় তিনি দেরাদূনের নিকটে মুসৌরী পাহাড়ের পাদদেশে কিষণপুরে যাইয়া বাস করেন। কিষণপুরের সাধন কুটীর প্রধানতঃ তাঁহার জন্যই ক্রীত হইল। স্থির হইল যে, সেবাশ্রমের সেবকগণ মাঝে মাঝে তথায় যাইয়া সাধনভজন করিবেন এবং শুভানন্দজী সেখানে স্থায়ী ভাবে থাকিবেন। তথায় তাঁহাকে জনৈক সন্ন্যাসী বলিলেন, "আপনাকে সেবাশ্রমে বার বার ডাকিতেছে, বার বার সরাইয়া দিতেছে। আপনি আর যাইবেন না।" নিরভিমান শুভানন্দ বলিলেন, "কে কাকে ডাকে? কে বা কাকে তাড়ায়? ঈশ্বরেচ্ছায় সব হয়। তাঁর ইচ্ছা হলে যেতে হবে।" যে শুভানন্দ সারাদিন সেবাশ্রমের কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন তিনিই সন্ধ্যার পর কাজের কথা ভুলিয়া সাধন ভজন ও সৎপ্রসঙ্গে মাতিয়া যাইতেন। রাত্রিতে তিনি একেবারে অন্য লোক হইতেন। দিনে যিনি সেবক ছিলেন রাত্রে তিনি সাধক হইতেন। তাঁহার জীবন-নদীতে সেবা ও সাধনার স্রোত সমান বেগে

বহিত। সন্ধ্যা হইলেই দুই একজন সেবককে সঙ্গে লইয়া তিনি গঙ্গাতীরে, দাওজীর মন্দিরে, দুর্গাবাড়ীতে বা অন্য কোন দেবস্থানে বেড়াইতে যাইতেন।

চারুচন্দ্র সেবাশ্রমের নিয়মকানুন প্রস্তুত করিয়া ক্ষান্ত হইতেন না। তিনি সর্বাগ্রে স্বয়ং প্রত্যেক নিয়ম পালন করিতেন। সেবাশ্রমে তিনি ব্রতধারী, মিষ্টভাষী, নিয়মনিষ্ঠ ও সাধনশীল সাধুরূপে শ্রদ্ধা পাইতেন। সেবাশ্রমের বাহিরে তিনি সরল, অমায়িক এবং হৃদয়বান্ বন্ধুরূপে পরিগণিত হইতেন। দিবাবসানে তিনি কয়েকজন সেবককে লইয়া গঙ্গাতীরে বা কোন দেবমন্দিরে বেড়াইতে যাইতেন। তখন তিনি সেবকদের সহিত বন্ধুভাবে মিশিতেন, হাস্যকৌতুক করিতেন এবং নিজব্যয়ে কখন কখন তাঁহাদিগকে ফলমিষ্টান্নাদি খাওয়াইতেন। কখনো বা তিনি সেবকদের সহিত শ্রীগুরুপ্রসঙ্গে মাতিয়া যাইতেন। সেইজন্য সেবকগণ তাঁহার সহিত বেড়াইতে যাইবার জন্য দিনান্তে আগ্রহান্বিত হইতেন। উক্ত সান্ধ্য ভ্রমণ ব্যতীত তিনি মহাষ্টমী, শিবচতুর্দশী প্রভৃতি বিশেষ উপলক্ষ্যে সেবকদের লইয়া বিভিন্ন মন্দিরে যাইতেন। উপরোক্ত দিবসদ্বয় তিনি নির্জলা উপবাস করিতেন। সেবকদের মধ্যে যাঁহারা অনশনে অসমর্থ হইতেন তাঁহাদিগকে দুধ বা ফল খাইতে দিতেন। প্রতিবৎসর তিনি বাসন্তী পঞ্চমীতে ব্যাসকাশী এবং বৈশাখী পূর্ণিমাতে সারনাথ দর্শন করিতেন।

দীর্ঘ ভ্রমণে বহির্গত হইলে তিনি সঙ্গে চাল-ডাল প্রভৃতি লইয়া যাইতেন এবং পথিমধ্যে বৃক্ষতলে ডাল-ভাত বা খিচুড়ী রান্না করিয়া খাইতেন। আহার ও বিশ্রামান্তে স্থানীয় দর্শনীয় বস্তুগুলি দেখিতেন বা ধর্মপ্রসংগে কাটাইতেন। দেবদেবীর মূর্তির প্রতি স্বামী শুভানন্দের স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল। মহানন্দে তিনি মন্দিরের পর মন্দির নিত্য দর্শন করিয়া বেড়াইতেন। যে মূর্তিপূজা সুপ্রাচীন কাল হইতে এই পুণ্যভূমিতে প্রচলিত তাহাকে তিনি খুব উচ্চ স্থান দিতেন এবং বলিতেন, "মূর্তিপূজার দ্বারা শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ শক্তিই বর্ধিত হয়।" গঙ্গাতীর তাঁহার একটি প্রিয় গন্তব্য স্থান ছিল। তথায় তিনি সেবকগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়া থাকিতেন এবং

দেবমন্দির, তীর্থস্থান বা সাধুভক্তদের বিষয় আলোচনা করিতেন। তাঁহার পূত স্পর্শে আসিয়া বহু সেবকের জীবন ধর্মভাবে পরিবর্তিত হইয়াছিল।

কাশী সেবাশ্রমের মহিলা বিভাগ খোলা হইল। বসন্ত, কলেরা প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধির জন্য পৃথক্ পৃথক্ ওয়ার্ড নির্মিত হইল। সেবাশ্রমে যে বিবেকানন্দ মন্দির আছে তাহা নির্মিত হয় স্বামিজীর মার্কিণ শিষ্যা মিসেস বি. এম. লেগেটের অর্থব্যয়ে। মিসেস লেগেট ছিলেন কুমারী জোসেফাইন ম্যাকলিয়ডের সহোদরা। এইরূপে সেবাশ্রমটি ভারতের অন্যতম সুবৃহৎ সেবায়তনে পরিণত হয়। ১৯১২ খ্রীঃ অক্টোবর মাসে শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘ-জননী সারদাদেবী কাশীধামে গমন করেন। তিনি সেবাশ্রমের নিকটবর্তী লক্ষ্মী নিবাসে থাকিতেন। সেই উপলক্ষ্যে স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী তুরীয়ানন্দ এবং স্বামী শিবানন্দ কাশীধামে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীমায়ের পুণ্য উপস্থিতিতে অদ্বৈতাশ্রমে কালীপূজা, জগদ্ধাত্রীপূজা, রাসযাত্রা প্রভৃতি উৎসব মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইল।

৮ই নভেম্বর শ্রীমা সেবাশ্রম দর্শনান্তে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা কথামৃতকার শ্রীমহেন্দ্র নাথ গুপ্ত দর্শক-গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন। উহা হইতে জানা যায়, শ্রীমা অদ্বৈত আশ্রমে ঠাকুর দর্শনান্তে সকাল ৭টায় সেবাশ্রমে উপস্থিত হন। তাঁহার সঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী তুরীয়ানন্দ, স্বামী শুভানন্দ ও স্বামী অচলানন্দ প্রভৃতি ছিলেন। শ্রীমা পাল্কীতে বসিয়া সেবাশ্রম পরিদর্শন করেন। স্বামী অচলানন্দ তাঁহার পাল্কীর সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছিলেন। তিনি বিভিন্ন ওয়ার্ড, এলোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়, অস্ত্রোপচার-কক্ষ ও উদ্যানাদি দেখিয়া পরম প্রীতি লাভ করেন এবং তিনি সুপ্রসন্না হইয়া বলিয়াছিলেন, "ঠাকুর সাক্ষাৎ এখানে বিরাজিত আছেন, এবং মা লক্ষ্মীও এখানে আশ্রয় নিয়েছেন। এই স্থানটি আমার এত ভাল লাগছে যে, এখানে স্থায়ী ভাবে থাকতে ইচ্ছা হচ্ছে।" শ্রীমা লক্ষ্মী নিবাসে ফিরিয়া কিছুক্ষণ পরে দশ টাকার একটী নোট সেবাশ্রমে দানস্বরূপে পাঠাইলেন। শ্রীমা যে নোটটী দিয়াছিলেন সেটী লক্ষ্মীদেবীর আশীর্বাদরূপে সেবাশ্রমে এখনো সংরক্ষিত আছে।

১৯১৩ খ্রীঃ সেপ্টেম্বর মাসে স্বামী ব্রহ্মানন্দ কাশী সেবাশ্রমে যাইয়া কিছুদিন অবস্থান করেন। তাঁহার উৎসাহে সেই বৎসর অদ্বৈতাশ্রমে প্রতিমায় দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। ১৯১৪ খ্রীঃ এপ্রিল মাসে কাশীধামের কালেক্টর মিঃ ষ্ট্রেট্‌ফিল্ডের সাহায্যে সেবাশ্রমের জন্য পঁচিশ বিঘা জমি ক্রীত হয়। স্বামী বিজ্ঞানানন্দ নূতন নূতন ওয়ার্ডের নক্‌সাদি করিয়া দেন। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে এবং ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে স্বামী প্রেমানন্দ ও স্বামী শিবানন্দ সেবাশ্রমে কিছুদিন বাস করেন। স্বামী সারদানন্দ, স্বামী অখণ্ডানন্দ প্রভৃতি মহাপুরুষগণ সেবাশ্রমে একাধিক বার গিয়াছেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ তাঁহার জীবনের শেষ সাড়ে তিন বৎসর সেবাশ্রমে অতিবাহিত করেন। তাঁহাদের সকলের শুভাশীর্বাদে এবং স্বামী শুভানন্দ, স্বামী অচলানন্দ প্রভৃতি সাধুগণের প্রাণপাতী পরিশ্রমে সেবাশ্রম মাত্র চারি আনা মূলধনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বর্তমানে সুবিশাল সেবা-প্রতিষ্ঠানে পরিণত।

কলিকাতায় যে নিবেদিতা বালিকা-বিদ্যালয় আছে তখন উহার প্রধান শিক্ষয়িত্রী ছিলেন বেলুড় মঠের স্বামী প্রজ্ঞানন্দের সহোদরা ব্রহ্মচারিণী সুধীরা বসু। তিনি একবার কাশী সেবাশ্রম দেখিয়া অতিশয় পরিতুষ্টা হন। কলিকাতায় ফিরিয়া বিশ্বস্তা সহকর্মিনীদের সহিত আলাপ করিয়া তিনি স্বামী শুভানন্দকে লিখিলেন, অনাথা বালিকা ও অসহায়া তরুণীদের জন্য যদি কোন বিভাগ সেবাশ্রমে খোলা হয় তবে তিনি তাহার ভার গ্রহণ করিতে প্রস্তুত এবং সেজন্য তিনি যোগ্যা সহকারিণীও সংগ্রহ করিবেন। শ্রীমতী সুধীরার প্রস্তাব সাদরে গৃহীত হইল। ১৯১৮ খ্রীঃ আঠারটী অনাথা বালিকাকে লইয়া উক্ত বিভাগ খোলা হয়। সুধীরা সহকর্মিণীগণকে লইয়া উক্ত বিভাগের ভার গ্রহণ করেন। কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছা অন্যরূপ। সুধীরা দেবী প্রয়াগ তীর্থ হইতে বি. এন. ডবলিউ. রেলওয়ে দিয়া কাশীধামে ফিরিতেছিলেন। কাশীধামের অনতিদূরে একটী দুর্ঘটনা ঘটিল। সুধীরা ট্রেনের যে কামরায় ছিলেন উহার দরজা দৈবাৎ খুলিয়া যায় এবং তিনি ট্রেন হইতে ভূমিতে পড়িয়া যান। তাঁহার সঙ্গিনীগণ ট্রেনের শিকল টানিতেই ট্রেন কিছু দূর যাইয়া থামিল। অতি কষ্টে

সংজ্ঞাশূন্যা সুধীরাকে ট্রেণে তুলিয়া বেনারস ক্যাণ্টনমেণ্ট স্টেশনে আনা হইল। কাশীর রাজা স্যার মতিচাঁদ সেই ট্রেনে যাইতেছিলেন। তিনি তাঁহার প্রাসাদের সমীপে মান্দুয়াদি স্টেশনে নামিলেন এবং মধ্যরাত্রে স্বীয় মোটরকারে লোক মারফৎ সেবাশ্রমে এই দুঃসংবাদ পাঠাইলেন। তদনুসারে কয়েকজন সেবক স্টেশনে যাইয়া সুধীরাকে সেবাশ্রমে আনিলেন। অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণের সুচিকিৎসা এবং সেবকগণের সেবাশুশ্রূষায় কোন সুফল হইল না। সুধীরার সংজ্ঞা আর ফিরিয়া আসিল না। তিনি প্রায় বাইশ ঘণ্টা সংজ্ঞাহীনা থাকিয়া পরদিন সন্ধ্যায় দেহত্যাগ করিলেন। সন্ধ্যাসমাগমে বিশ্বনাথ, অন্নপূর্ণা প্রভৃতি দেবদেবীর মন্দিরে যখন শঙ্খ-ঘণ্টা-কাঁসর বাজিয়া উঠিল তখন সুধীরার শুদ্ধাত্মা নশ্বর দেহ ছাড়িয়া গুরুলোকে যাত্রা করিলেন। তাঁহার দেহত্যাগের পর সুযোগ্যা অধ্যক্ষার অভাবে নবস্থাপিত মহিলা বিভাগটি ক্রমশঃ উঠিয়া গেল।

স্বামী শুভানন্দের প্রধান সহকারী ছিলেন স্বামী কালিকানন্দ। কালিকানন্দজী ১৯২০ খ্রীঃ কয়েকটি অনাথ বালক লইয়া সেবাশ্রমের একটি বালকবিভাগ স্থাপন করেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ তাঁহাকে এই কার্যে বিশেষ উৎসাহ দেন। পাঁচ বৎসরের মধ্যে উহার দুইটি বালক ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। কিন্তু কিছুদিন পরে উক্ত বিভাগও নানা অসুবিধায় পড়িয়া উঠিয়া যায়। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম হইতে ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগ পর্যন্ত স্বামী তুরীয়ানন্দ কাশী সেবাশ্রমের অম্বিকা কুটিরে অবস্থান করেন। তাঁহার অবস্থানে সেবাশ্রমে অপূর্ব আধ্যাত্মিক পরিবেশ সৃষ্ট হয়। তিনি সেবাকার্যে সেবকগণকে অসীম উৎসাহ দিতেন এবং তাহাদের ত্রুটিবিচ্যুতি সংশোধন করিতেন। তিনি প্রত্যহ ভগবদ্গীতা, যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ, উপনিষদাবলী এবং স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী ব্যাখ্যা করিতেন। তাঁহার শাস্ত্রব্যাখ্যা শুনিতে সেবাশ্রমের সেবকগণ, অদ্বৈত আশ্রমের সাধুব্রহ্মচারীগণ এবং সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজের অধ্যাপকগণ এবং বহু ভক্ত আসিতেন। তিনি যখন পাতঞ্জল যোগসূত্র ব্যাখ্যা করিতেন তখন এক একটি সূত্রের চার পাঁচ প্রকার ব্যাখ্যা বলিতেন। দেহরক্ষার কয়েকদিন পূর্বে তিনি সেবাশ্রমের সেবকগণকে এই আশ্বাসবাণী দিয়াছিলেন, "সকল

সন্দেহ ত্যাগ কর। ঠাকুরের কাজে দেহ মন প্রাণ উৎসর্গ করে ধন্য হও। সন্দেহের অবকাশ আর নাই। নিষ্কাম সেবার দ্বারাই তোমরা নিশ্চয়ই গন্তব্য স্থলে পৌঁছিবে। স্বামিজী আমাকে দার্জিলিংএ একবার বলেছিলেন, "হরি ভাই, জগৎকে এবার একটা নূতন পথ দেখিয়ে দিয়ে গেলাম। এতকাল মানুষ বিশ্বাস করত যে, জপধ্যান বিচার দ্বারাই মুক্তি লভ্য। বর্তমান যুগের যুবকেরা ঠাকুরের কাজ করে এই জীবনেই মুক্তিলাভ করবে।" এ তাঁর বাণী। সব সন্দেহ দূর কর। সপ্রেম সেবায় আত্মবলি দাও।"

ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস এবং বৎসরের পর বৎসর স্বামী শুভানন্দ কায়ে, মনে ও বাক্যে সেবাকার্যে নিযুক্ত ছিলেন। এই ভাবে সুদীর্ঘ বিশ বৎসর সেবাকার্য্য করিবার পর তিনি অবসর গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হইলেন। সপ্রেম সেবার বা নিষ্কাম কর্মের সুফল চিত্তশুদ্ধি ও মুমুক্ষুত্ব। ১৯২০ খ্রীঃ ২৯শে জানুয়ারী স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসবের পূর্বদিন স্বামী শুভানন্দ জনৈক সেবককে ডাকিয়া বলিলেন, "এখন হতে স্বামী কালিকানন্দ সেবাশ্রমের তত্ত্বাবধান করবেন। আমি সেবাকার্য্য থেকে চিরবিদায় নিচ্ছি।" এই বলিয়া তিনি শয়ন করিলেন। পরদিন প্রভাতে তাঁহাকে আর সেবাশ্রমে দেখা গেল না। এইরূপে স্বামী শুভানন্দ নীরবে সেবাশ্রম ছাড়িয়া প্রয়াগ তীর্থে তপস্যার্থ গমন করিলেন। তথায় ত্রিবেণী সঙ্গমের অদূরে ঝুঁসিতে একটি কুঠিয়ায় তিনি আশ্রয় লইলেন। যে সেবাশ্রমের জন্য বিশ বৎসর যাবৎ তিনি বুকের রক্ত বিন্দু বিন্দু পাত করিয়াছিলেন তাহা ছাড়িয়া আসিতে তাঁহার আদৌ কষ্ট হইল না। নিষ্কাম কর্মের ফলে গীতোক্ত অনাসক্তি তাঁহার জীবনে সুপ্রতিষ্ঠ হইয়াছিল।

নিষ্কাম না হইলে অনাসক্তি আসে না। সেবাশ্রমের কয়েকজন সেবক তাঁহাকে দেখিবার জন্য ঝুঁসিতে গিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাদের লইয়া প্রাতে ত্রিবেণী সঙ্গমে স্নান করিতেন। তথায় কিছুদিন তপস্যা করিবার পর তিনি কাশীধামে ফিরিয়া আসেন এবং ১৯২১ খ্রীঃ শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মতিথির দিন স্বামী ব্রহ্মানন্দের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। সন্ন্যাস গ্রহণান্তে তিনি ভারতের

প্রায় সকল প্রধান তীর্থ দর্শনে বহির্গত হন। তিনি তীর্থ হইতে তীর্থান্তরে ঘুরিয়া সাধু ও দেবতা দর্শনে পরম আনন্দ লাভ করেন। তীর্থভ্রমণকালে তিনি ভীষণ কঠোরতা অভ্যাস করিতেন, ভিক্ষান্নে তাঁহার উদরপূর্তি হইত। তীর্থরেণু তাঁহার নিকট স্বর্গের ধূলির মত পবিত্র মনে হইয়াছিল। যতই মন শুদ্ধ হয় ততই জগৎকে শুদ্ধ দেখা যায়, ততই জগৎ সুন্দর মনে হয়।

তীর্থভ্রমণ হইতে ফিরিয়া স্বামী শুভানন্দ কাশীধামে শ্রীগিরীশ্বর মন্দিরে বাস করিতে লাগিলেন। ১৯২১ খ্রীঃ হইতে স্বামী কালিকানন্দ সেবাশ্রমের অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। একদিন স্বামী কালিকানন্দ ব্যথিত অন্তরে তাঁহার নিকট যাইয়া বলিলেন, "আমার পক্ষে আর সেবাশ্রম চালান সম্ভব নয়। কারণ আমি দেখছি, সেবকগণ দ্রুত আদর্শচ্যুত ও বিপথগামী ও অবাধ্য হচ্ছে। আপনি যদি এখন সেবাশ্রমে না আসেন সেবকদের সেবানুরাগ আরও হ্রাস-প্রাপ্ত হবে। এই সঙ্কটে আপনি ভিন্ন অন্য কেহ সেবকগণকে সেবাদর্শ শিক্ষা দিতে পারবে না। আমার একান্ত অনুরোধ, আপনি আজই সেবাশ্রমে চলুন।" শুভানন্দজী হাসিয়া উত্তর দিলেন, "আমার কাছ থেকে আর কিছু কাজ নেবার ইচ্ছা যদি আপনার হয়ে থাকে আমি তা সানন্দে করবো। আপনি যান, আমি শীঘ্র আসছি।"

সেবাশ্রম পরিচালনার যে সকল অসুবিধা উপস্থিত হইয়াছিল সেগুলি সম্বন্ধে শুভানন্দজী স্বামী কালিকানন্দের সহিত আলোচনা করিলেন এবং বলিলেন, "এই সঙ্কট কাটাবার একমাত্র উপায় সেবকগণকে মাঝে মাঝে কোন স্বাস্থ্যকর তীর্থস্থানে বিশ্রাম ও তপস্যার জন্য পাঠান। হিমালয়ে বা গঙ্গাতীরে কোন নিভৃত স্থানে এই উদ্দেশ্যে একটি আশ্রম স্থাপন করা দরকার।" স্বামী তুরীয়ানন্দ উক্ত প্রস্তাব আন্তরিক সমর্থন করিয়া বলিলেন, "আমার পরামর্শে মাস্টার মহাশয় এরূপ একটি আশ্রম খুলেছিলেন কনখলে এক ভাড়া-বাড়ীতে। তিনি নিজেই উক্ত বাড়ীর ভাড়া দিতেন। আশ্রমটির নাম ছিল 'সাধন কুটীর'। তথায় চার পাঁচটি সাধু থাকিতেন। স্বামিজী যখন আলমোড়ায় যান তখন সাধুরা সেখানে চলে গেলেন এবং আশ্রমও উঠে গেল। আমি খুব আনন্দিত যে,

শুভানন্দ সেরূপ আর একটি আশ্রম স্থাপন করতে ইচ্ছুক। পূর্ব নাম 'সাধন কুটির' রাখা উচিত নূতন আশ্রমের। তোমাদের সেই শুভ সঙ্কল্প অচিরে সিদ্ধ হোক্।"

১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে স্বামী সারদানন্দ কাশী সেবাশ্রমে উপস্থিত হইলেন। তিনিও উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। তদনুসারে জনৈক সেবক বিন্ধ্যাচল, চুনার, ঝুঁসি, কনখল, আলমোড়া এবং অন্যান্য স্থান দেখিয়া আসিলেন। কিন্তু কোথাও কোন মনোমত স্থান পাওয়া গেল না। প্রস্তাবিত আশ্রমের জন্য কিছু অর্থ সংগৃহীত হইল এবং অবশেষে দেরাদুনের নিকটে কিষণপুর গ্রামে উক্ত আশ্রমের জন্য একটি বাগান-বাটী কেনা হইল। স্বামী তুরীয়ানন্দের পরামর্শ অনুসারে উহার নাম রাখা হইল 'সাধন কুটির'। স্বামী শুভানন্দ তিন চার জন সেবকের সহিত তথায় যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন। কাশী সেবাশ্রমে যেমন তিনি সেবাকার্যে নিযুক্ত ছিলেন সেখানেও তেমনি তিনি কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন হইলেন। কঠোর তপস্যায় তাঁর শরীর জীর্ণ শীর্ণ হইল। অসুস্থ অবস্থায়ও তিনি সেবকগণের সেবা লইতেন না। তিনি যে সেবা করিতে আসিয়াছিলেন, সেবা লইতে আসেন নাই! চিকিৎসার্থ তাঁহাকে কিষণপুর হইতে কাশী সেবাশ্রমে লইয়া আসা হইল।

ক্ষীণ কণ্ঠে শুদ্ধানন্দজী বলিলেন, "আমি নিজেই একজন নগণ্য সেবক। এরূপ কেন হল যে অপরে আমার সেবা করছে?" তিনি দেখিয়া ব্যথিত হইলেন যে, তাঁহার অক্ষম শরীরের জন্য অপরের সেবা আবশ্যক হইতেছে। তিনি প্রায়ই বালিতেন, "এই অপটু দেহ আর কত কাল অপরের সেবায় চল্‌বে। আমার পক্ষে এ অসহ্য।" তিনি সেবকগণকে তাঁহার সেবা করিতে নিষেধ করিলেন এবং এবিষয়ে কড়া নজর রাখিলেন। কিন্তু সেবকগণ শ্রদ্ধাভরে তাঁহার অবাধ্য হইলেন। যিনি অন্যের সেবায় বিশ বৎসর যাবৎ সর্বান্তঃকরণে নিযুক্ত ছিলেন তাঁহার জীর্ণ দেহের সেবা না করিয়া থাকা সেবকগণের পক্ষে সম্ভব নহে। যিনি তাঁহাদিগকে আত্মজীবনের দৃষ্টান্ত দ্বারা সেবা-ধর্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন তাঁহার সেবা হইতে তাঁহারা বিরত হইবেন কিরূপে?

১৯২৬ খ্রীঃ এপ্রিল মাসে বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘের সাধুসম্মেলন হয়। স্বামী সারদানন্দ শুভানন্দজীকে পত্রে লিখিলেন, "বেলুড় মঠে সাধুসম্মেলনে যোগদানান্তে তুমি পুরীধামে স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য যাও।" স্বামী শুভানন্দ গুরুজনের পত্রখানি স্বীয় মস্তকে কিছুক্ষণ রাখিলেন এবং পত্রোক্ত আদেশ পালনে অসামর্থ্য প্রকাশপূর্বক নীরব রহিলেন। তিনি কাশীধাম ছাড়িতে অনিচ্ছুক ছিলেন।

ইতোমধ্যে স্বামী কালিকানন্দ প্রভৃতি সাধুগণ শুভানন্দজীকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইলেন যে, তাঁহাকে না লইয়া তাঁহারা বেলুড় মঠে যাইবেন না। সহকর্মিগণের সনির্বন্ধ অনুরোধ উপেক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া তিনি বলিলেন, "যদি তোমরা এই বিষয়ে এত আগ্রহান্বিত হও তাহলে আমাকে যেতেই হবে।" কিন্তু কালিকানন্দজী কার্যান্তর ব্যপদেশে নির্দিষ্ট দিনের পূর্বে বেলুড় যাত্রা করিলেন এবং স্বামী শুভানন্দের সঙ্গে অন্য এক সাধুকে যাইবার জন্য বলিয়া গেলেন। নির্দিষ্ট দিনে যথাসময়ে ঘোড়ার গাড়ী আসিয়া সেবাশ্রমের ফটকের কাছে দাঁড়াইল। শুভানন্দজীর বিছানাপত্র গাড়ীতে তোলা হইল। কিন্তু তাঁহার অন্তর কাশীধাম ছাড়িতে অসম্মত ছিল। তিনি পুনরায় বেলুড় যাইতে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন এবং স্বীয় কক্ষের মধ্যে পাদচারণ করিতে করিতে অনুচ্চ স্বরে বলিলেন, "না, আমি যাবো না। আমাকে নিয়ে যেও না। আমার দেহ ভ্রমণের অনুপযুক্ত। আমি যাবো না।" শিশু যেমন মাতৃক্রোড় ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে অনিচ্ছুক হয় তদ্রূপ এই মধ্যবয়স্ক সন্ন্যাসী কাশীধাম ছাড়িয়া বেলুড়ে যাইতে অসম্মত হইলেন এবং শিশুসুলভ সারল্য সহকারে বলিলেন, "আমার এদেহ আর বেশী দিন থাকবে না। জীবনের আর বাকী যে কদিন আছে এই মোক্ষধামেই থাকি। আমাকে মা অন্নপূর্ণার আশ্রয় থেকে টেনে নিয়ে যেও না।" তাঁহার চিত্ত অতিশয় আন্দোলিত এবং স্বর ভাবাবেগে রুদ্ধপ্রায় হইল। সেবকগণ নিরুপায় হইয়া তাঁহার জিনিষপত্র নীরবে গাড়ী হইতে আনিয়া ঘরের মধ্যে রাখিলেন।

স্বামী শুভানন্দের সঙ্গে যাঁহার বেলুড় যাইবার কথা ছিল তিনি একাকী

যাইয়া স্বামী সারদানন্দকে সকল সংবাদ দিলেন। সারদানন্দজী চিন্তিত হইয়া মন্তব্য করিলেন, "দেখছি, অত্যধিক পরিশ্রমে শুভানন্দের স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়েছে। স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য তার অন্যত্র যাওয়া দরকার। কাশীতে এখন খুব গরম পড়েছে এবং শীঘ্র আরো বেশী গরম পড়বে। তার জীবনরক্ষা করতে হলে তাকে কাশী অপেক্ষা অধিকতর স্বাস্থ্যকর স্থানে পাঠাতে হবে। আমি তাকে শীঘ্র পত্র লিখছি।" পরদিন তিনি শুভানন্দজীকে লিখিলেন জনৈক সেবক সহ কনখল সেবাশ্রমে যাইতে। সেইদিন তিনি কনখল সেবাশ্রমের অধ্যক্ষ কল্যাণানন্দজীকে পত্র দিলেন স্বামী শুভানন্দের জন্য আবশ্যকীয় ব্যবস্থা করিতে। স্বামী সারদানন্দের পত্র পাইয়া শুভানন্দজী কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন এবং পত্রখানি স্বশিরে রাখিয়া শূন্যে দৃষ্টিপাতপূর্বক পার্শ্বস্থ সেবককে বলিলেন, "আমি ভেবেছিলাম, আমার এ নশ্বর দেহ কাশীর গঙ্গাতেই বিসর্জিত হবে। কিন্তু বাবা বিশ্বনাথের ইচ্ছা অন্যরূপ দেখছি। তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্। আমি কনখলেই যাব।"

পত্রপ্রাপ্তির দুই দিনের মধ্যে একখানি গাড়ী আসিয়া সেবাশ্রমের ফটকের সামনে দাঁড়াইল। শুভানন্দজী কনখল যাইবার জন্য প্রস্তুত। জনৈক সন্ন্যাসী সেবকরূপে তাঁহার সঙ্গী হইলেন। যাত্রার প্রাক্কালে সেবাশ্রমের সাধুগণ, ব্রহ্মচারীগণ ও সেবকগণ তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি প্রত্যেকের নিকট আলিঙ্গনপূর্বক বিদায় লইলেন। গাড়ীতে উঠিয়া তিনি স্বামী অমরানন্দকে বলিলেন, "আমি কনখলে যাচ্ছি, হয়ত আর ফিরব না। ডাকঘরে আমার নামে যে সামান্য অর্থ আছে নিম্নোক্ত ভাবে সেটি ব্যয়িত হবে। যখন শুনবে, আমার নশ্বর দেহ আর নাই তখন উক্ত অর্থ দিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা এবং সাধুদের ভাণ্ডারা দিও। অবশিষ্ট অর্থ দরিদ্র নারায়ণের সেবায় খরচ করবে।" অনন্ত পথের যাত্রীর ন্যায় তিনি কাশীধাম হইতে চিরবিদায় লইলেন।

কনখলে যাইয়া স্বামী শুভানন্দের মন ভারমুক্ত হইল। হিমালয়ের পরম স্বাস্থ্যকর বায়ু, গঙ্গার কুলুকুলু ধ্বনি এবং মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য তাঁহার প্রাণে শান্তি বর্ষণ করিল। কাশীত্যাগের ক্ষোভ তাঁহার মন হইতে মুছিয়া গেল।

তিনি সেখানে যাইয়া ওপারের ডাক শুনিতে পাইলেন এবং পরপারে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলেন। গুরুচিন্তায় মগ্ন হইয়া ইহলোকের সব স্মৃতি মন হইতে দূরীভূত করিলেন। একদিন প্রাতে একাকী তিনি কনখল সেবাশ্রম হইতে চিন্তাকুল চিত্তে অনির্দিষ্ট ভ্রমণের জন্য বহির্গত হইলেন। সেবক তাঁহার উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেন। তিনিও নীরবে স্বামী শুভানন্দের পশ্চাদ্‌গমন করিলেন। শুভানন্দজী গঙ্গার তীর ধরিয়া হরিদ্বারের অভিমুখে চলিলেন। তিনি এত ভাবমগ্ন ছিলেন যে পশ্চাদ্‌বর্তী সেবক তাঁহাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহসী হইলেন না। সহসা শুভানন্দজী পথ পরিবর্ত্তন করিলেন, এবং একটু থমকিয়া দাঁড়াইয়া গঙ্গার বাঁধান ঘাটের দিকে অগ্রসর হইলেন। উক্ত স্নানঘাটটি অতি মনোরম এবং দেবদারু ও শিশম্ প্রভৃতি ছায়াপ্রদ বৃক্ষ দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। তিনি ঘাটের সিঁড়ির উপর বসিলেন এবং কিছুক্ষণ বিশ্রামান্তে চাদর ও চটীজুতা খুলিয়া রাখিলেন এবং করযোড়ে খরস্রোতা জাহ্নবীবক্ষে নামিলেন। তিনি কোমর পর্যন্ত দেহ কয়েকবার জলে ডুবাইলেন। সেবক তখন নীরবতা ভঙ্গ করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি স্নান করিবেন?" গঙ্গাজলে নিমজ্জমান সন্ন্যাসী ক্ষীণকণ্ঠে অনিচ্ছাসত্ত্বেও উত্তর দিলেন, "না"। অন্যদিন স্নানের পূর্ব্বে সেবক তাঁহাকে তেল মাখাইয়া দিতেন। কিন্তু সেদিন তাহা সম্ভব হইল না। সেবক ভাবিলেন, শুভানন্দজী নিশ্চয়ই এখন স্নান করিবেন এবং তাঁহার একখানি কাপড়ের প্রয়োজন হইবে। ইহা ভাবিয়া তিনি অনতিদূরবর্তী সেবাশ্রমে একখানি কাপড় আনিতে ছুটিলেন। কিন্তু অবিলম্বে ফিরিয়া আসিয়া শুভানন্দজীকে আর তথায় দেখিতে পাইলেন না। তাঁহার চাদর ও চটীজুতা পূর্ববৎ ঘাটেই পড়িয়াছিল। ইহাতে সেবক অতিশয় চমৎকৃত হইলেন। তিনি উচ্চ স্বরে তাঁহাকে ডাকিলেন। কিন্তু কোন উত্তর পাওয়া গেল না। তাঁহার আহ্বান সুনির্জন প্রান্তরে প্রলয়নাদে প্রতিধ্বনিত হইল এবং আসন্ন বিপদের সম্যক্ সূচনা করিল। দৈবাৎ সেবকের মনে হইল, শুভানন্দজী ত সন্তরণে অসমর্থ! ইহা ভাবিয়া তাঁহার মন ভয়বিহ্বল হইল। তিনি গঙ্গাস্রোতের অভিমুখে ক্ষিপ্র

বেগে চলিলেন। দ্রুত গমনে তাঁহার শ্বাসরোধের উপক্রম হইল। কিন্তু তিনি পথিমধ্যে বা গঙ্গাজলে কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। কিছু দূরে জাহ্নবী ও ক্যানেলের সংযোগস্থলে তিনি দেখিলেন, কয়েকটি সন্ন্যাসী স্নানরত। তিনি ব্যগ্রভাবে তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা কোন সাধুকে স্রোতবাহিত দেখেছেন কি ?" তাঁহারা সত্বর উত্তর দিলেন, "হাঁ, হাঁ। গেরুয়া-পরা একটী বাঙ্গালী সাধু স্রোতে ভেসে যাচ্ছিলেন। আমরা তাঁকে জল থেকে তুলেছিলাম এবং দেখেছিলাম, তিনি তখনো জীবিত। চারটি সন্ন্যাসী তাঁহাকে বাঙ্গালী হাসপাতালে নিয়ে গেছেন।"

সেবক এই সংবাদ শুনিয়া মর্মাহত হইলেন। তিনি ঊর্ধ্বশ্বাসে সেবাশ্রমে ছুটিলেন এবং তথায় যাইয়া বিস্মিত নয়নে দেখিলেন, জনৈক ডাক্তার সংজ্ঞাশূন্য শুভানন্দজীকে সংজ্ঞাযুক্ত করিবার জন্য সচেষ্ট। সেবাশ্রমের সাধুগণ তাঁহার চারিদিকে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। কিন্তু অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও স্বামী শুভানন্দের সংজ্ঞা আর ফিরিয়া আসিল না। ডাক্তার ও সেবকগণের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল। স্বামী শুভানন্দের আত্মা তনুত্যাগ করিয়া গুরুপদে বিলীন হইলেন। তাঁহার মৃতদেহ গঙ্গাগর্ভে সলিল-সমাধি দেওয়া হইল। ১৩৩৩ সালের ১লা বৈশাখ স্বামী শুভানন্দ মহাসমাধি লাভ করিলেন।

———

উনচল্লিশ

কেশবচন্দ্র সেন*

আচার্য্য কেশবচন্দ্র ঊনবিংশ শতাব্দীর একজন ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ ছিলেন। কলিকাতার কলুটোলাস্থ বিখ্যাত সেন-বংশে ১৮৩৮ খ্রীঃ ১৯শে নভেম্বর (বাংলা ১২৪৫ সালের ৫ই অগ্রহায়ণ) শুক্লা দ্বিতীয়া সোমবার প্রাতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং মাত্র ৪৫ বৎসর বয়সে ১৮৮৪ খ্রীঃ ৮ই জানুয়ারী (১২৯০ সালে ২৫শে পৌষ) মঙ্গলবার পূর্ব্বাহ্নে মানবলীলা সংবরণ করেন। তাঁহার জন্ম-শতবার্ষিকী ১৩৪৫ সালে (১৯৩৮ খ্রীঃ) অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

১৮৩৮ খ্রীঃ 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রের ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রও জন্মগ্রহণ করেন। কেশবচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্র উভয়েই সহপাঠী ও সুহৃদ্ ছিলেন। কেশবের পিতামহ রামকমল কলিকাতাস্থ এশিয়াটিক্ সোসাইটীর সম্পাদক এবং কাউন্সিলের সভ্য ছিলেন। তিনি ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে ৭০০ পৃষ্ঠাযুক্ত সুবৃহৎ ইংরাজি-বাংলা অভিধান প্রণয়ন করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। যখন পাদ্রী আলেকজেণ্ডার ডফ্ রামমোহনের সহায়তায় ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের চেষ্টা করেন, উইলসন ও রামকমল তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। রামকমলের দ্বিতীয় পুত্র প্যারীমোহন এবং প্যারীমোহনের দ্বিতীয় পুত্র কেশবচন্দ্র। পিতামহ ও পিতার ন্যায় কেশবচন্দ্র 'বেঙ্গল ব্যাঙ্কে' কাজ করিতেন। কেশবচন্দ্র নামটী জ্যেষ্ঠতাত হরিমোহন কর্তৃক প্রদত্ত। কেশবচন্দ্র অতিশয় প্রিয়দর্শন সুপুরুষ ছিলেন এবং একাদশ বর্ষ বয়সে পিতৃহীন হন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব কেশবের পুণ্যশীলা জননী সারদা সুন্দরীকে অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন এবং 'মা' বলিয়া ডাকিতেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "মা, তোর যত নারীভুঁড়ি নিয়ে এর পরে পৃথিবীর লোকে নাচ্‌বে! তোর ঐ ভাণ্ড থেকে এই ছেলে বেরিয়েছে।" সারদাসুন্দরী দেবী তাঁহার আত্ম-চরিতে লিখিয়াছেন—"এই কলুটোলার তেতালার ঘরে আমি

---

* ইহার কিয়দংশ "উদ্বোধন' মাসিকের ১৩৪৫ পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত।

পরমহংসদেবকে দেখি। কেশবের কাছে আসিয়া তিনি কেশবের হাত ধরিয়া নাচিতেন ও গাহিতেন। আমি প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে যাইতাম। তিনি কত যে ভাল ভাল কথা বলিতেন তাহা এখন আমার মনে নাই।" পরিবারের অন্যান্য বালকের ন্যায় পঞ্চমবর্ষীয় শিশু কেশবকে রামকমল একছড়া তুলসীর মালা দিয়া হরিনাম করিতে উপদেশ দেন। যে হরিনামে কেশবচন্দ্র ভবিষ্যৎ জীবনে বাংলাদেশ মাতাইয়াছিলেন তাহা শিশুকাল হইতেই তিনি জপ করিতেন। একবার বিজয়া দশমীর দিন বালক কেশব বয়স্যদিগের সহিত নগর সংকীর্তনের জন্য বহির্গত হন। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে হরিনাম কীর্তনের প্রচলন তিনিই অগ্রে করিয়াছেন এবং তিনিই ব্রাহ্ম সমাজে সর্বপ্রথম সংকীর্তন প্রবর্তন করেন। অনাবৃত পদে, একতন্ত্রী হস্তে গৈরিক অঙ্গে কেশবচন্দ্র কলিকাতা মহানগরীর দ্বারে দ্বারে যাইয়া হরিনাম প্রচার করিয়াছিলেন। বাল্যকালে তাঁহার ক্রীড়াকৌতুকও অদ্ভুত রকমের ছিল। তিনি কখনো কখনো চিকিৎসালয় বা ডাকঘর খুলিয়া তাহাতে ডাক্তার বা পোষ্টমাষ্টার সাজিয়া বসিতেন এবং বন্ধুগণকে তাঁহার অধীনে অন্যান্য কার্য্যে নিয়োগ করিতেন। তিনি অতিশয় অনুকরণপ্রিয় ছিলেন এবং কোন বিষয় দুই এক বার দেখিয়াই তাহা হুবহু নকল করিতে পারিতেন। একবার তাঁহার কলেজে গিলবার্ট নামক জনৈক সাহেব ম্যাজিক্ ল্যাণ্টার্ণ এবং ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া প্রদর্শন করেন। কেশব তাহা দুই এক দিন দেখিয়া সহপাঠীদিগকে অনুরূপ নানা প্রকার ম্যাজিক্ দেখাইয়াছিলেন। তিনি বাল্যকালে সন্দেশ ও রসগোল্লা খাইতে খুব ভালবাসিতেন এবং প্রত্যহ সন্দেশ দিবার জন্য মাতাকে অনুরোধ করিতেন। নয় বৎসর বয়সে তাঁহার একবার মূর্চ্ছারোগ হয়, উহা প্রায় দুই বৎসর ছিল। একদিন স্কুলে শিক্ষক কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করায় তিনি কোন উত্তর দেন নাই; কারণ তখন তাঁহার উক্ত রোগের আক্রমণ আরম্ভ হইয়াছিল। শিক্ষক উহা বালকের হঠকারিতা ও অবাধ্যতা মনে করিয়া একটী ছুরী দিয়া তাঁহার হাতের চেটো চিরিয়া দেন এবং তাহাতে কেশব মূর্চ্ছিত হইয়া ভূপতিত হন। পরে তাঁহাকে অজ্ঞানাবস্থায় গৃহে আনা হয় এবং তিনি কয়েক দিনের পর সুস্থ হন।

সাত বৎসর বয়সে কেশব হিন্দু কলেজে ভর্তি হন এবং মাঝখানে কিছুদিন মেট্রোপলিটান কলেজে পড়িয়া পুনরায় হিন্দু কলেজেই ফিরিয়া আসেন এবং ষোল বৎসর বয়সে কলেজের পাঠ সমাপ্ত করেন। বার বৎসর বয়সে তিনি কলেজে একখানি এরূপ বৃহৎ গণিতগ্রন্থ উপহার পান যে তাহা বহনে অসমর্থ হইয়াছিলেন। ষ্টরজিয়ন্ নামক জনৈক সাহেব তদ্দর্শনে বলিয়াছিলেন, কেশব "বৃহৎ পুস্তকবাহী ক্ষুদ্র বালক।" কলেজে পড়িবার সময় তিনি সেক্ষপিয়ারের 'হ্যামলেট' নামক নাটকাভিনয়কালে হ্যামলেটের ভূমিকা গ্রহণ করেন। রোম্যাঁ রোঁলা বলেন."In point of fact Kesab remained the young Prince of Denmark to the end of his life." (প্রকৃত পক্ষে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত কেশব দেনমার্কের তরুণ রাজকুমারই ছিলেন।)

পরিণত বয়সে ধর্ম-প্রচার মানসে সঙ্গীতাচার্য্য ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল ওরফে চিরঞ্জীব শর্মা রচিত 'নব বৃন্দাবন' নাটক অভিনয় কালে কেশব চৈতন্যদেবের ভূমিকা লইয়াছিলেন। যৌবনেই তিনি জগতের অনিত্যতা উপলব্ধি করিয়া একবার একখানি কাগজে 'জগৎ অসার ও দুঃখময়' এইরূপ লিখিয়া সকলকে এই সত্য শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে রাস্তার দেওয়ালে টাঙ্গাইয়া দেন। তিনি হিন্দু কলেজের বিখ্যাত শিক্ষক ডিরোজিয়োর ছাত্র ছিলেন; কিন্তু অপর সকলের ন্যায় তিনি তাঁহার প্রভাবে অভিভূত হন নাই। ডিরোজিয়োর ভাবে ভাবিত যুবকগণকে লোকে তখন 'Young Bengal' (তরুণ বাংলা) বলিত। কারণ, তাঁহারা বিকৃত আধুনিকতায় উন্মত্ত হইয়া গোমাংস ভক্ষণ এবং মদ্যপান করিতে গৌরব অনুভব করিতেন। কেশবচন্দ্র আজীবন নিরামিষাশী ছিলেন এবং তিনি কখনও, এমন কি বিলাতেও, ইউরোপীয় পোষাক পরিধান করেন নাই। সংস্কার-সংগ্রাম আরম্ভ করিয়া তিনি প্রথমেই 'মদ্যপান নিবারণী সভা' স্থাপন করেন এবং যুবকগণের নৈতিক জীবন গঠনে মনোযোগী হন। তিনি সংস্কৃত জানিতেন না, তাই ভারতীয় ধর্ম ও দর্শন শাস্ত্র আলোচনা করিতে পারেন নাই। কিন্তু তিনি বাইবেল ও পাশ্চাত্য দর্শন উত্তমরূপে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তিনি কুলগুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ না করিয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের নিকট ব্রাহ্ম ধর্মে

দীক্ষিত হন এবং গোপনে ব্রাহ্ম সমাজের অঙ্গীকারপত্রে স্বাক্ষর দান করেন। বাড়ীতে কৌল গুরু উপস্থিত, দীক্ষার সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত; কিন্তু সেদিন কেশব গৃহে ফিরিলেন না। পরদিন কেশব ব্রাহ্ম ধর্ম সম্বন্ধীয় কয়েকখানি পুস্তক আনিয়া জননীর নিকট দেন। জননী সেগুলি পাঠে মুগ্ধ হন এবং কুলগুরুও কেশবকে উদার ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ করিতে উৎসাহ দেন।

১৮৫৭ খ্রীঃ কেশব ব্রাহ্ম সমাজে যোগদান করেন। তিনি 'বেঙ্গল ব্যাঙ্কের কাজ ছাড়িয়া ব্রাহ্ম ধর্মের সাধন ও প্রচারে জীবন উৎসর্গ করেন এবং গৃহত্যাগ পূর্বক মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের গৃহে সপরিবারে আশ্রয়গ্রহণ করেন। মহর্ষি তাঁহাকে পুত্রাদপি প্রিয় জ্ঞান করিতেন। কেশবচন্দ্র মহর্ষির জ্যেষ্ঠ পুত্র সত্যেন্দ্রনাথের সহিত সিংহল ভ্রমণে গিয়াছিলেন। মহর্ষি কেশবকে 'ব্রহ্মানন্দ' উপাধি দান করিয়া ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য্যের পদে অভিষিক্ত করেন। তিনি যে ব্রহ্মবিদ্যালয় খুলিয়া ছিলেন তাহাতে কেশব ধর্মশিক্ষা দিতেন। রামমোহন ছিলেন ব্রাহ্ম সমাজ ও ব্রাহ্ম ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা, দেবেন্দ্রনাথ তাহার কর্ম প্রবর্তক এবং কেশবচন্দ্র তাহার প্রচারক ছিলেন। এই মহাপুরুষত্রয় ব্রাহ্ম সমাজের Trinity (ত্রয়ী) এবং তদানীন্তন ভারতের প্রধান সমাজসংস্কারক ছিলেন।* আদি ব্রাহ্ম সমাজ ১৮৩০ খ্রীঃ, ১৮৬৬ খ্রীঃ ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ এবং ১৮৭৮ খ্রীঃ সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন রক্ষণশীল প্রাচীনপন্থী, আর কেশব ছিলেন উদার নবীনপন্থী। কেশবচন্দ্র সমাজের আমূল সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি সমাজের কুসংস্কারগুলির বিরুদ্ধে ভীষণ ক্রুসেড (crusade) আরম্ভ করেন এবং অসবর্ণ বিবাহ, বিধবা বিবাহ, উপবীত ত্যাগ প্রভৃতি অত্যুগ্র সংস্কারে প্রবৃত্ত হন। ইহার ফলে মহর্ষির সহিত তাঁহার মতবিরোধ উপস্থিত হয় এবং তিনি ১৮৬২ খ্রীঃ আদি সমাজ ত্যাগ করিয়া ১৮৬৬ খ্রীঃ ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপন করেন। কিন্তু এখানেও তিনি বেশী দিন সহকর্মীদের সহিত অধিকাংশ বিষয়ে একমত হইতে পারেন নাই। কেশব ব্রাহ্ম বিবাহবিধি লিপিবদ্ধ

---

* আলেকজাণ্ডার ডফ্ রাজা রামমোহনকে ভারতের মার্টিন লুথার বলিতেন।

করিয়া বিবাহের বয়স বালকদের জন্য ১৮ এবং বালিকাদের জন্য ১৪ নির্দিষ্ট করেন। কিন্তু তিনি কুচবিহারের রাজকুমারের সহিত স্বীয় কন্যার আরও অল্প বয়সে বিবাহ দেওয়ায় তাঁহার বন্ধুগণ পৃথক্ হইয়া ১৮৭৮ খ্রীঃ সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন।

সম্প্রতি কলিকাতায় সম্মিলন ব্রাহ্ম সমাজের উদ্ভব হইয়াছে। উহাতে আদি, ভারতবর্ষীয় এবং সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সভ্যগণ মিলিত হইবার চেষ্টা করিতেছেন। ব্রাহ্ম সমাজের অনুকরণে ঊনবিংশ শতাব্দীতে বোম্বাইতে প্রার্থনা সমাজ, লাহোরে দেব সমাজ এবং আর্য্য সমাজ স্থাপিত হইয়াছে। এই সমাজগুলির অন্যান্য বিষয়ে মত-পার্থক্য থাকিলেও ধর্মসংস্কার ও সমাজসংস্কারই ইহাদের প্রধান উদ্দেশ্য। সেইজন্য উনবিংশ শতাব্দীতে আবির্ভূত ভারতীয় মহাপুরুষগণের মধ্যে কতকগুলি চিন্তা সাধারণ (common) ছিল। রোমাঁ রোলাঁ তাই লিখিয়াছেন—"Ideas are the natural outcome of the age and are born in different minds." (ভাবরাশি যুগের স্বাভাবিক সৃষ্টি এবং বিভিন্ন মনে জাত হয়।)

ভারতের ন্যায় অন্যান্য দেশেও প্রোটেষ্টাণ্ট সংস্কার আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। এক এক যুগের এক একটি ভাব-স্রোত কোন দেশে আবদ্ধ না থাকিয়া বায়ুর ন্যায় পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হয়। এই জাতীয় আন্দোলনগুলিকে ধ্বংসমূলক মনে করা ভুল ধারণা। কারণ ধর্মের সামাজিক ও সেবামূলক আদর্শটি জাগ্রত ও জীবন্ত করাই উহাদের উদ্দেশ্য। প্রাচীনতার তিরোভাব ও নবীনতার আবির্ভাবের সন্ধিক্ষণে যখন সজীব ধর্ম সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নির্জীব প্রস্তরীভূত হয়, তখনই এইরূপ আন্দোলন উৎপন্ন হইয়া ধর্মকে নবজীবন দান করে. যুগে যুগে এইরূপ হইয়াছে ও হইবে। যাঁহারা জীবনের ও সমাজের প্রকৃত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী তাঁহারা সর্বদা নবীনতার ছাঁচে প্রাচীনতাকে বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত থাকিবেন। আমার মতে কেশবচন্দ্রের জীবনের ইহাই একটী প্রধান শিক্ষা।

আদি সমাজে হিন্দুধর্মের প্রভাব সমধিক ছিল এবং উপনিষদাবলী ছিল

প্রধান ধর্মগ্রন্থ। ব্রাহ্মগণ উপবীত ত্যাগ না করিয়াও এই সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়া ব্রহ্মোপাসনা করিতেন। কেবল তাঁহারা মূর্তি পূজার বিরোধী ছিলেন। কিন্তু কেশব তাঁহার সমাজে নবভাব সঞ্চার করিলেন। ১৮৮০ খ্রীঃ তিনি তাঁহার সমাজকে 'নববিধান' আখ্যা দিয়া উহাকে হিন্দু, মুসলমান, খৃস্টান ও বৌদ্ধ ধর্মের সমন্বয়-ভূমিরূপে প্রচার করিলেন।

"True mission of Brahmo Samaj was to establish the Harmony of Religions". অর্থাৎ তাঁহার মতে ধর্মসমূহের সমন্বয় সাধনই ব্রাহ্ম সমাজের প্রকৃত আদর্শ। এই বিষয়ে তিনি রাজা রামমোহনেরই পদানুসরণ করিয়াছেন। ভারতের বিভিন্ন সহরে প্রচারকল্পে, গমন পূর্বক কেশব অনেক বক্তৃতাদি প্রদান করেন। সেই সময় তাঁহার প্রভাবে নানা স্থানে ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৭০ খ্রীঃ তিনি ইংলণ্ডে গমন করেন এবং তথায় ছয় মাস অবস্থান কালে চল্লিশ হাজার নরনারীর সম্মুখে প্রায় ৭০টী বক্তৃতা প্রদান করেন। তাঁহার অসাধারণ বাগ্মিতায় সকলে মুগ্ধ হন এবং ইংরাজগণ তাঁহাকে গ্লাডষ্টোনের সহিত তুলনা করেন। কেহ কেহ তাঁহাকে 'Burke of Bengal' (বাংলার বার্ক) এবং কেহ কেহ বা তাঁহাকে 'Indian Demonsthenes' (ভারতীয় ডেমনস্থিনিস্) বলিয়াছেন। বিলাতে গ্লাডষ্টোন, জন ষ্টুয়ার্ট মিল, মোক্ষমূলার, মার্টিনো প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সহিত তাঁহার পরিচয় হয় এবং মহারাণী ভিক্টোরিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন। মহারাণী কেশবচন্দ্রের মৃত্যুর পর শোক প্রকাশ করিয়া তাঁহার পুত্রের নিকট পত্র দিয়াছিলেন। তিনি বিলাতে "England's Duties to India" (ভারতের প্রতি ইংলণ্ডের কর্তব্য) নামক বক্তৃতায় সগর্বে বলিয়াছিলেন—

"Let England always remember that she is responsible to God for the future of India". (ইংলণ্ড সর্বদা স্মরণ রাখুক যে, সে ভারতের ভবিষ্যতের জন্য ঈশ্বরের নিকট দায়ী।)

কেশবের "Lectures in England" (ইংলণ্ডে বক্তৃতাবলী) পুস্তকখানি আমাদের সকলের পাঠ করা উচিত। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছিলেন যে,

তিনি কোন রাজনৈতিক বা ধর্ম-সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরূপে বিলাতে যান নাই; তিনি ভারতীয় জাতির প্রতিনিধিরূপে তথায় গিয়াছিলেন। কেশবের অদ্ভুত স্বদেশপ্রীতি ছিল। তিনি লণ্ডনে একটি বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন—"I come here as an Indian and return a confirmed Indian". (আমি এখানে একজন ভারতীয়রূপে এসেছি এবং ভারতীয়রূপে দেশে ফিরে যাবো।) তখন ভারতে জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম হয় নাই। সুতরাং তাঁহাকে তখনকার দিনের political extremist (রাজনৈতিক চরমপন্থী) বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বিলাতের একেশ্বরবাদী ইউনিটেরিয়ানগণ তাঁহাকে একটি বৃহৎ ও বহুমূল্য বাদ্যযন্ত্র উপহার দেন। ইহা অদ্যাপি কলিকাতায় কেশবচন্দ্রের নববিধান ব্রহ্মমন্দিরে সংরক্ষিত আছে।

কেশবচন্দ্রের বক্তৃতাশক্তি ছিল অপূর্ব ও অতুলনীয়। বাংলা ও ইংরাজি উভয় ভাষাতেই তিনি অনর্গল বক্তৃতা দিতে পারিতেন। রাজা রাজমোহনের পর বাংলায় এত বড় বাগ্মী আর হয় নাই বলিলেই চলে। তখন সবেমাত্র ইংরাজি শিক্ষা এদেশে প্রবর্তিত হইয়াছে। সাহেবরা ভারতীয় ও বাঙ্গালীদের ইংরাজিকে ইংরাজি বলিয়াই মনে করিতেন না। রো এবং ওয়েব সাহেব দেশীয় লোকের ইংরাজিকে 'Babu English (বাবু ইংরাজি) বলিতেন। বিলাতে কেশবের বাগ্মিতাময় ও স্বদেশপ্রীতিপূর্ণ বক্তৃতা পাঠ করিয়া এদেশের এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানগণ অস্থির হইয়া উঠিলেন। বোম্বাইএর জনৈক ইংরাজ প্রচার করিলেন যে, তিনি যখন চাবুক হস্তে দাঁড়াইবেন, তাঁহার সম্মুখে যদি কেহ লণ্ডনে প্রদত্ত কেশবচন্দ্রের "England's Duties to India" (ভারতের প্রতি ইংলণ্ডের কর্তব্য) নামক বক্তৃতা পাঠ করিতে সাহস করেন, তাঁহাকে তিনি পাঁচ শত টাকা পুরস্কার দিবেন! কেশবের অদ্ভুত বাগ্মিতার বিষয় সংবাদপত্রে পাঠ করিয়া ভারতের তৎকালীন রাজপ্রতিনিধি লর্ড লরেন্স তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। লর্ড লরেন্সের পর যত রাজপ্রতিনিধি ভারতে আগমন করিয়াছেন সকলেই কেশবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। লর্ড নর্থব্রুক স্বদেশে প্রত্যাগমনকালে কেশবের ফটো সঙ্গে লইয়া যান। একবার কেশব ঢাকায়

বক্তৃতা করিতে যাইয়া জনসাধারণের মধ্যে ধর্ম বিষয়ে অসামান্য উত্তেজনা, উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সহস্র সহস্র নরনারী তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া মুগ্ধ হইত এবং সভাস্থল অশ্রুসিক্ত করিত। কেশবের বাগ্মিতা সম্বন্ধে নানা আখ্যান প্রচলিত হইয়াছে। একবার কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মধর্ম বিষয়ে বক্তৃতাকালে ভগবানের যে নাম-মাহাত্ম্য বর্ণনা করেন, তাহাতে সভাস্থ অন্যান্য ব্যক্তিগণের মধ্যে জনৈক বাবাজী অশ্রুপাত করেন। ইহাতে বৈষ্ণব সমাজে চাঞ্চল্য উপস্থিত হইল এবং সকলে বাবাজীকে সমাজচ্যুত করিতে চাহিল। বাবাজীর প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ছিল। তিনি বলিলেন, "আমি কেশবের ব্যাখ্যা ও ব্রাহ্ম ধর্মের জন্য কাঁদি নাই ; বক্তৃতার মধ্যে পরম ভক্ত প্রহ্লাদের নাম হয়েছিল, তাই কেঁদেছিলাম।" এইরূপে সে যাত্রায় বাবাজী রক্ষা পান। একবার একটী যুবক মাতুলালয়ে থাকিয়া লেখাপড়া করিত। ছাত্রগণের অভিভাবকগণ তাঁহাদের বাড়ীর যুবকদিগকে কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা শুনিতে নিষেধ করিতেন। কারণ, তাহারা কেশবের বক্তৃতা শুনিলে ব্রাহ্ম ধর্মে আকৃষ্ট হইবে। যুবকগণ অভিভাবকের নিষেধ অমান্য করিয়া গোপনে বক্তৃতা শুনিতে যাইত। উপরোক্ত যুবক মাতুলের কথা না শুনিয়াই বক্তৃতা শুনিতে গিয়াছিল। মাতুল জানিতে পারিয়া ভাগিনেয়কে গৃহ হইতে বিতাড়িত করিতে আদেশ দেন। যুবকটী ছিল খুব চতুর। সে বক্তৃতা শ্রবণান্তে গৃহে ফিরিয়া মাতুলের আদেশ শুনিয়া মাতুলের নিকটে গমন করিলে তিনি রাগান্বিত হইয়া বলিলেন, "হাঁ বুঝিয়াছি, আমার গৃহে থাকিতে পারিবে না।" যুবক বলিল, "না, মামা আমি তোমাকে সে কথা বলিতে আসি নাই। আমি তোমাকে আর একটী গোপনীয় কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি। আমি সেদিন এক মুসলমানের সঙ্গে আহার করিয়াছি।" মাতুল চমৎকৃত হইয়া বলিলেন, "চুপ, চুপ, একথা আর কাহাকেও বলিস্ না। আচ্ছা তুই কেশবের বক্তৃতা শুনিতে যাস্, কিন্তু সঙ্গে কাহাকেও নিস্ না।" কেশবচন্দ্র ঢাকায় এলান প্রমুখ পাদ্রীদের সমালোচনার প্রতিবাদ করেন। তখনকার পাদ্রীগণ খৃষ্টধর্ম প্রচারের সময় হিন্দুধর্মের অযথা নিন্দা করিতেন।

ব্রাহ্ম সমাজের মহাদান নব্য বাংলার যুবকগণকে সদা স্মরণ রাখিতে হইবে। বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, জগদীশ, বিজয়কৃষ্ণ প্রভৃতি বাংলার শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষগণ ব্রাহ্ম সমাজের নিকট ঋণী। এক অর্থে নব্য বাংলা, তথা নব্য ভারতের প্রত্যেক হিন্দু-যুবকই ব্রাহ্ম। যে উদার ভাব ব্রাহ্ম সমাজ হিন্দু ও হিন্দুধর্মের মধ্যে প্রবেশ করাইতে চাহিয়াছিলেন তাহা হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে। আজ প্রত্যেক হিন্দু ব্রাহ্মের মতই উদার হইয়াছে, আজ হিন্দু ধর্ম ব্রাহ্ম ধর্মের মতই কুসংস্কারমুক্ত হইয়াছে ১৯২১ খ্রীঃ সমগ্র ভারতে ব্রাহ্মগণের সংখ্যা ছিল ৬৪০০ মাত্র। তাহার মধ্যে ৪০০০ই বাংলাদেশে। ইহার দ্বারা বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, ব্রাহ্ম সমাজের মিশন পূর্ণ হইয়াছে—ব্রাহ্ম সমাজ ও হিন্দুসমাজের মধ্যে আর তফাৎ নাই। বিনা প্রয়োজনে কোন কিছুর উৎপত্তি হয় না। সমাজের বিশেষ প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য ব্রাহ্ম সমাজের আবির্ভাব আবশ্যক হইয়াছিল। সেমিটিক্ সভ্যতার স্রোত বন্ধ করাই ঊনবিংশ শতাব্দীর সংস্কার-ব্রতী সমাজগুলির উদ্দেশ্য। বাংলায় ব্রাহ্ম সমাজ খ্রীষ্টান ধর্মের স্রোত এবং পাঞ্জাবে আর্য্য সমাজ ইসলাম-স্রোত বন্ধ করিয়াছে। ব্রাহ্ম সমাজ ব্যতীত হিন্দু সমাজ সেমিটিক্ সভ্যতার আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইত না।

কঠোর শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমে কেশবের স্বাস্থ্য ভগ্ন হইল। তিনি ১৮৮৩ খ্রীঃ মারাত্মক ব্যাধিতে আক্রান্ত হইলেন। স্বাস্থ্যলাভার্থ তিনি সিমলায় গমন করিলেন; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। তিনি জীর্ণ, শীর্ণ ও রুগ্ন শরীর লইয়া কলিকাতায় ফিরিলেন। বিখ্যাত হোমিওপ্যাথ ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার (যিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে তাঁহার অন্তিম অসুখে চিকিৎসা করিয়াছিলেন) তাঁহাকে চিকিৎসা করিলেন। কেশবের মৃত্যুশয্যায় কলিকাতার বিশপ, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও শ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রভৃতি তাঁহাকে দেখিতে আসেন। ১৮৮৪ খ্রীঃ ৮ই জানুয়ারী মঙ্গলবার কেশব 'মা' 'মা' শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে অমর লোকে প্রয়াণ করেন। তাঁহার শেষ বাণী—'জগৎ মিথ্যা ও মায়া।' মৃত্যুর পর তাঁহার মুখমণ্ডল সমুজ্জ্বল ও অপার্থিব জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়াছিল। মৃত্যুঞ্জয় কেশবের মুখে স্বর্গীয় শোভা দেখিয়া শোকাতুরা জননী বলিয়াছিলেন

"এ যে মহাদেবের মূর্তি দেখিতেছি।" হিন্দু, মুসলমান, ইহুদী, খ্রীষ্টান, এবং ইংরাজ প্রভৃতি সকল শ্রেণী ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক নিমতলা শ্মশানে কেশবের মৃতদেহের অনুগমন করিলেন। শ্বেত চন্দনের চিতায় মহাপুরুষের স্থূল দেহ ভস্মীভূত হইল। নিমতলার শ্মশান ঘাট কেশবচন্দ্রের ব্রহ্মমন্দিরে পরিণত হইল। কেশব দেশের সর্বাঙ্গীন কল্যাণের জন্য মহর্ষি দধীচির ন্যায় স্বীয় অস্থি প্রদান করিলেন। কেশব অগ্নিমন্ত্রের উপাসক ছিলেন। আহিতাগ্নি ঋষিগণ যেমন তাঁহাদের প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা জীবনে নির্বাপিত হইতে দেন না, তেমনি কেশব তাঁহার জীবনে সাধন-অগ্নি নির্বাপিত হইতে দেন নাই। কেশবের ধর্ম্ম-জীবনে প্রধান অবলম্বন ছিল প্রার্থনা। তিনি তাঁহার 'জীবন বেদ' নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, তাঁহার জীবনের মুখ্য আশ্রয় ছিল প্রার্থনা। জীবনের উষাকালে যখন তিনি গুরু গ্রহণ করেন নাই, ঈশ্বর বা ধর্ম কি তাহা জানিতেন না, তখন অন্তরের গভীরতম প্রদেশ হইতে এই ভাগবত বাণী উচ্চারিত হইত 'প্রার্থনা কর', 'প্রার্থনা কর'। তাঁহাকে জিশু খ্রীষ্টের ন্যায় 'Prophet of Prayer' বা প্রার্থনাচার্য্য বলা যাইতে পারে। প্রার্থনা হইতেই তিনি জীবনে সাহস, শক্তি, পবিত্রতা, ভক্তি ও বৈরাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। যোগী অঘোরনাথ ও ভক্ত বিজয়কৃষ্ণকে উপদেশ প্রদানের সময় তিনি একটু চঞ্চল হইলেন। কারণ, তাঁহারা শাস্ত্র-জ্ঞানী ছিলেন। তিনি প্রার্থনায় ডুবিয়া গেলেন এবং তদুত্তরে এই অনাহত বাণী শুনিলেন, 'যখন যাহা আবশ্যক হইবে তাহা তোমাকে বলিয়া দিব, তুমি চিন্তা করিও না।' তাঁহার প্রার্থনার আন্তরিকতা ও ঐকান্তিকতা এই ঘটনা হইতে প্রতীত হয়। মহাপুরুষগণই কেবল প্রার্থনার উত্তর এত শীঘ্র পাইতে পারেন। জর্জ্জ মূলারের সহিত কেশবকে এই বিষয়ে তুলনা করা যাইতে পারে। আশ্রমের ক্ষুধিত বালকগণ তাঁহার নিকট আহার চাহিলে তিনি প্রার্থনায় বসিলেন এবং বলিয়া গেলেন, "তোমরা থাল পাতিয়া বস, ঈশ্বর শীঘ্রই তোমাদের জন্য আবশ্যকীয় আহার প্রেরণ করিবেন।" অবিলম্বে প্রার্থনার ফল ফলিল, অচিরে ঈশ্বর-বিশ্বাসীর জয় হইল। কোন ধনী দানী অনাথ বালকগণের জন্য অনতিকালমধ্যে প্রচুর আহার প্রেরণ করিলেন।

কেশবচন্দ্র অতিশয় সাধুভক্ত ছিলেন ও সর্বধর্মের সাধুদিগকে পরম শ্রদ্ধা করিতেন। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের প্রতি বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন এবং পরমহংসদেবের নিকট প্রায়ই যাইতেন। পরমহংসদেবও তাঁহার নিকট ও তাঁহার সমাজে মধ্যে মধ্যে আগমন করিতেন। রোমাঁ রোলাঁ লিখিয়াছেন—

"In the whole of Keshab's life so worthy of respect and affection, there is nothing more deservedly dear to us than the attitude of respect and affection adopted from the first by this great man at the height of his fame and maintained until the end towards the little poor man of Dakshineswar then either obscure or misrepresented."

অনুবাদ—শ্রদ্ধা-প্রেমার্হ কেশবচন্দ্র যখন দক্ষিণেশ্বরের সুদীন পরমহংসকে প্রথম দর্শন করেন তখন পরমহংসকে অল্প লোকেই জানিত, বা অনেকে ভুল বুঝিত। তখন হইতে কেশব পরমহংসের প্রতি যে শ্রদ্ধা-ভক্তির ভাব পোষণ করিতেন তাহাই কেশবের সমগ্র জীবনের মধ্যে আমাদের নিকট সর্বাপেক্ষা শোভনীয় মনে হয় এবং তাহাই হওয়া উচিত। যখন মহানুভব কেশবচন্দ্র ধর্মভাবের চরম বিকাশে ও সুখ্যাতির সর্বোচ্চ শিখরে উপনীত হন তখনও পর্যন্ত তিনি পরমহংসের প্রতি এই শ্রদ্ধাভক্তি রক্ষা করিয়াছিলেন।

কেশবচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রথম দর্শন করেন ১৮৬৩ খ্রীঃ জোড়াসাঁকো আদি ব্রাহ্ম সমাজে। কেশব অন্যান্য ব্রাহ্মদের সহিত বসিয়া কাষ্ঠবৎ ধ্যানমগ্ন। শ্রীরামকৃষ্ণ মথুর বাবুর সহিত আদি ব্রাহ্ম সমাজে গিয়াছিলেন, এবং কেশবকে ধ্যানমগ্ন দেখিয়া বলিয়াছিলেন "দেখ, ওর ফাতনায় মাছ খেয়েছে।" অর্থাৎ ওর ধ্যানই ঠিক ঠিক জমেছে। বার বৎসর পরে ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে মাঘোৎসবের পর শ্রীরামকৃষ্ণ কেশবের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ করেন বেলঘরিয়ায় জয়গোপাল সেনের তপোবনে। ঠাকুর তথায় কেশবকে ধ্যানস্থ দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "এরই ল্যাজ খসেছে।" ইহা শুনিয়া সভাস্থ সকলে হাসিয়া উঠিলেন। তখন তাঁহাদিগকে কেশব

বলিলেন, "তোমরা হেসো না, এর কিছু মানে আছে। এঁকে জিজ্ঞাসা করি।" স্বীয় উক্তির ব্যাখ্যা ঠাকুর স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এইভাবে দিলেন, "যতদিন ব্যাঙাচির ল্যাজ না খসে ততদিন তাকে জলে থাকতে হয়, আডায় উঠে ডাঙ্গায় সে বেড়াতে পারে না। যেই ল্যাজ খসে অমনি লাফ দিয়ে ডাঙ্গায় উঠে। তখন জলেও থাকে, আবার ডাঙ্গায়ও লাফায়। তেমনি মানুষের যতদিন অবিদ্যার ল্যাজ না খসে ততদিন সে সংসার-জলে পড়ে থাকে। অবিদ্যার ল্যাজ খসলে, জ্ঞান হলে. মুক্তভাবে ঘুরে বেড়ায় আবার ইচ্ছা করলে সংসারেও থাকতে পারে।"

ঠাকুর স্বীয় ভাগিনেয় হৃদয়রামকে সঙ্গে লইয়া বেলঘরিয়ায় কেশবকে দেখিতে গিয়াছিলেন। কেশবের কাছে যাইবার পূর্বে ঠাকুর নারায়ণ শাস্ত্রীকে বলিয়াছিলেন, "তুমি একবার যাও কেশবকে দেখে এস কেমন লোক।" শাস্ত্রী কেশবকে দেখিয়া আসিয়া ঠাকুরকে জানাইলেন, কেশব জপে সিদ্ধ। নারায়ণ শাস্ত্রী জ্যোতিষ জানিতেন। তিনি গণনা করিয়া বলিলেন, কেশবের ভাগ্য ভাল। শাস্ত্রী সংস্কৃতে কথা বলিলেন, এবং কেশব বাংলায় উত্তর দিলেন। ঠাকুরকে পরীক্ষা করিবার জন্য কেশব তিন জন ব্রাহ্ম কালীবাড়ীতে পাঠাইয়াছিলেন। তিন জনের মধ্যে এক জনের নাম ছিল প্রসন্ন। কথা ছিল, রাতদিন ঠাকুরকে দেখিয়া তাঁহারা কেশবের কাছে খবর দিবেন। তাঁহারা প্রথম রাত্রে ঠাকুরের ঘরে শুইয়াছিলেন এবং কেবল 'দয়াময়' 'দয়াময়' বলিয়া ভগবানকে ডাকিতে লাগিলেন, আর ঠাকুরকে বলিলেন, "তুমি কেশব বাবুকে ধর, তাহলে তোমার ভাল হবে।" শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, "আমি সাকার মানি।" ইহা বলা সত্ত্বেও তাঁহারা পূর্ববৎ 'দয়াময়' 'দয়াময়' বলিতে এবং ঠাকুরকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। ইহাতে ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়া রুদ্র মূর্তি ধারণ করিলেন এবং তাঁহাদিগকে বলিলেন, "এখান থেকে চলে যা।" ঠাকুর তাঁহাদিগকে ঘরের মধ্যে আর থাকিতে দিলেন না। তাঁহারা বারান্দায় যাইয়া শুইয়া রহিলেন।

বেলঘরিয়ার বাগানে প্রথম দর্শনের পর কেশব ১৮৭৫ খ্রীঃ ২৮শে মার্চ

রবিবার 'ইণ্ডিয়ান মিরর' (Indian Mirror) নামক ইংরাজি সংবাদপত্রে লিখিয়াছিলেন, "আমরা অল্পদিন হইল দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস রামকৃষ্ণকে বেলঘরিয়ার বাগানে দর্শন করিয়াছি। তাঁহার ভাব-গাম্ভীর্য্য, অন্তর্দৃষ্টি ও বালকস্বভাব দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। ধর্মকথা বলিবার সময় তিনি যে সকল উপমা ও উপাখ্যান অফুরন্ত ভাবে বিবৃত করেন সেগুলি যেমন অর্থপূর্ণ তেমনি মর্মস্পর্শী। তাঁহার প্রকৃতি পণ্ডিত স্বামী দয়ানন্দ হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত। শ্রীরামকৃষ্ণ শান্তস্বভাব, কোমলপ্রকৃতি ও ধ্যানপ্রবণ। কিন্তু স্বামী দয়ানন্দ পুরুষস্বভাব, তর্ক-প্রবণ ও স্থূল-প্রকৃতি। এখন আমাদের বোধ হইতেছে যে, হিন্দু ধর্মের গভীরতম প্রদেশ অনুসন্ধান করিলে কত সৌন্দর্য্য, সত্য ও সাধুত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা না হইলে পরমহংসের মত মহাপুরুষের আবির্ভাব কিরূপে সম্ভব হয়?"

১৮৭৬ খ্রীঃ জানুয়ারী মাসে মাঘোৎসবের সময় কলিকাতার টাউন হলে কেশব যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহার বিষয় ছিল "আমাদের ধর্মবিশ্বাস ও অভিজ্ঞতা।' উক্ত বক্তৃতায় তিনি হিন্দুধর্মের অনেক উৎকর্ষের কথা উল্লেখ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন এবং তাঁহার অনুভূতি-প্রসূত উপদেশ শ্রবণে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে কেশবের ধারণা আমূল পরিবর্তিত হয়। ক্রমে কেশব সশিষ্য দক্ষিণেশ্বরে আসিতে লাগিলেন। উভয় মহাপুরুষের মধ্যে অচিরে গভীর সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠিত হইল। শ্রীরামকৃষ্ণ কেশবকে যেমন ভালবাসিতেন কেশবও তাঁহাকে তদ্রূপ শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতেন। প্রায় প্রতি বৎসর ব্রাহ্মোৎসবের সময় এবং অন্যান্য বিশেষ উপলক্ষ্যে কেশব দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ সমীপে যাইতেন এবং কখনো বা তাঁহাকে স্বীয় ভবন 'কমলকুটীরে' লইয়া আসিতেন।

কখনো কখনো কেশব শ্রীরামকৃষ্ণকে কমল কুটিরের দ্বিতলস্থ উপাসনাকক্ষে লইয়া যাইয়া পরমাত্মীয়জ্ঞানে ভক্তিভরে একান্তে পূজা করিতেন। ১২৮২ সালের ১লা জ্যৈষ্ঠ (১৮৭৫ খ্রীঃ ১৪ই মে) শ্রীরামকৃষ্ণ পুনরায় বেলঘরিয়ার বাগানে যাইয়া কেশবের সহিত প্রথম আলাপ করেন।

ঠাকুর কেশবকে কেন এত ভালবাসিতেন তাহার কারণ ঠাকুরের নিম্নোক্ত

বাক্যে পরিস্ফুট।—"কেশব সেনের সঙ্গে দেখা হবার আগে তাকে দেখলাম। সমাধি অবস্থায় দেখলাম, কেশব সেন আর তার দল। একঘর লোক আমার সামনে বসে আছে। কেশবকে দেখাচ্ছে যেন একটি ময়ুর তার পাখা বিস্তার করে বসে রয়েছে। পাখার অর্থ দলবল। কেশবের মাথায় দেখলাম লালমণি। ওটি রজোগুণের চিহ্ন। কেশব শিষ্যদের বলছে, 'ইনি কি বলছেন তোমরা সব শোন।' মাকে বললাম, মা এদের ইংরাজি মত, এদের বলা কেন? তারপর মা বুঝিয়ে দিলেন যে, কলিতে এরকম হবে। তখন এখান থেকে হরিনাম আর মায়ের নাম ওরা নিয়ে গেল। তাই মা কেশবের দল থেকে বিজয়কে নিলে; কিন্তু আদি সমাজকে নিলে না।"

১৮৭৯ খ্রীঃ ১৫ই সেপ্টেম্বর, সোমবার (১২৮৬ সাল, ৩১শে ভাদ্র) ভাদ্রোৎসবের সময় কেশব আবার শ্রীরামকৃষ্ণকে নিমন্ত্রণ করিয়া বেলঘরিয়ার তপোবনে লইয়া যান। ২১শে সেপ্টেম্বর কমল-কুটীরের উৎসবে শ্রীরামকৃষ্ণ যোগদান করেন কেশবের আমন্ত্রণে। এই সময় শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিস্থ হইলে ব্রাহ্ম ভক্তগণ সহ তাঁহার ফটো তোলা হয়। ঠাকুর দণ্ডায়মান হইয়া সমাধিস্থ, হৃদয় তাঁহাকে ধরিয়া আছেন। ২২শে অক্টোবর ৬ই কার্তিক মহাষ্টমী দিবসে কেশব দক্ষিণেশ্বর যাইয়া শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করেন। ১২৮৬ সাল ১৩ই কার্তিক বুধবার (১৮৭৯ খ্রীঃ ২৯শে অক্টোবর) কোজাগরী পূর্ণিমার দিন বেলা একটার সময় কেশব আবার ভক্তগণ সহ শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিতে দক্ষিণেশ্বরে যান। স্টীমারের সঙ্গে একটি বজ্‌রা, ছয়টী নৌকা ও দুইটী ডিঙ্গি এবং প্রায় ৮০ জন ভক্ত ছিল। তাঁহাদের হাতে পতাকা, পুষ্পপল্লব, খোল, করতাল ও ভেরী। হৃদয় অভ্যর্থনা করিয়া কেশবকে স্টীমার হইতে লইয়া আসেন। সকলে এই গাহিতে গাহিতে আসিলেন, "সুরধনীর তীরে হরি বলে কে, বুঝি প্রেমদাতা নিতাই এসেছে!" অন্যান্য ব্রাহ্ম ভক্তগণও পঞ্চবটী হইতে এই কীর্তন করিতে করিতে তাঁহার সঙ্গে আসিতে লাগিলেন "সচ্চিদানন্দবিগ্রহ রূপ আনন্দঘন।" তাঁহাদের মধ্যে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন। তিনি কীর্তনানন্দে মাঝে মাঝে সমাধিস্থ হইলেন। সেই দিন সন্ধ্যার পর বাঁধান ঘাটে পূর্ণিমার আলোকে কেশব উপাসনা করিয়াছিলেন।

উপাসনার পর ঠাকুর বলিতেছেন, "তোমরা বল, ব্রহ্ম আত্মা ভগবান, ব্রহ্ম মায়া জীব জগৎ, ভাগবত ভক্ত ভগবান।" কেশবাদি ব্রাহ্ম ভক্তগণ জ্যোৎস্নালোকে গঙ্গাতীরে বসিয়া সমস্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত উক্ত বাক্যাবলী ভক্তিভরে উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। আবার যখন শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, "বল গুরু, কৃষ্ণ, বৈষ্ণব" তখন কেশব আনন্দে হাসিতে হাসিতে নিবেদন করিলেন, "মহাশয়, এখন অতদূর নয়। আমরা যদি বলি, 'গুরু, কৃষ্ণ, বৈষ্ণব, লোকে ভাবিবে 'আমরা গোঁড়া।" শ্রীরামকৃষ্ণও সহাস্যে উত্তর দিলেন, "বেশ তোমরা যতদূর পার তাই বলো।"

১৮৮০ খ্রীঃ গ্রীষ্মকালে রামচন্দ্র ও মনোমোহন কমলকুটীরে যাইয়া কেশবের সহিত সাক্ষাৎ করেন। উভয়েই শ্রীরামকৃষ্ণের পরম ভক্ত। তাঁহাদের একান্ত ইচ্ছা শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে কেশবের ধারণা অবগত হইবেন। জিজ্ঞাসিত হইয়া কেশব তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন, "দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস সামান্য সাধু নহেন। এক্ষণে পৃথিবীর মধ্যে এত বড় সাধু লোক আর কেহ নাই। ইনি এত সুন্দর, এত অসাধারণ ব্যক্তি যে, ইঁহাকে অতি সাবধানে সন্তর্পণে রাখিতে হয়। অযত্ন করিলে এর দেহ থাকিবে না, যেমন মূল্যবান্ দ্রব্য কাঁচের বাক্সে রাখিতে হয়।" ১৮৮০ খ্রীঃ ৩রা মার্চ বুধবার (২১ শে ফাল্গুন) শ্রীরামকৃষ্ণ কামারপুকুর যাইয়া ১০ই অক্টোবর (২৫ শে আশ্বিন) পর্য্যন্ত প্রায় আট মাস স্বীয় পিতৃভবনে অবস্থান করেন। কেশব শ্রীরামকৃষ্ণকে কয়েক মাস দেখিতে না পাইয়া চিন্তিত হন এবং কোন ব্রাহ্ম ভক্তকে তাঁহার সংবাদ আনিতে কামারপুকুরে পাঠান। শ্রীরামকৃষ্ণ কামারপুকুর হইতে শিহোর ও শ্যামবাজার প্রভৃতি স্থানে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। ফিরিবার পথে রাস্তায় প্রেরিত ব্রাহ্ম ভক্তের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল।

১২২৮ সাল ১৮ই পৌষ (১৮৮১ খ্রীঃ ১লা জানুয়ারী) শনিবার মাঘোৎসবের পূর্বে প্রতাপ, ত্রৈলোক্য, জয়গোপাল সেন প্রভৃতি ব্রাহ্ম ভক্তগণকে লইয়া কেশবচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখিবার জন্য দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে গিয়াছিলেন। রামচন্দ্র, মনোমোহন প্রভৃতি রামকৃষ্ণ-ভক্তগণও তখন উপস্থিত। ব্রাহ্ম ভক্তগণ

অনেকেই কেশবের আসিবার পূর্বে কালীমন্দিরে আসিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে বসিয়া আছেন। সকলেই ব্যস্তভাবে কেশবের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহার আগমন পর্য্যন্ত ঘরে গোলমাল হইতেছিল। কেশব জাহাজে করিয়া আসিলেন। জাহাজ হইতে অবতরণপূর্বক তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহার হাতে দুইটি বেল ও ফুলের একটি তোড়া ছিল।

কেশব শ্রীরামকৃষ্ণের চরণ স্পর্শ করিয়া ঐসকল দ্রব্য তাঁহার কাছে রাখিয়া দিলেন ও ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রতিনমস্কার জানাইলেন। ঠাকুর আনন্দপূর্ণ সহাস্য বদনে কেশবকে বলিলেন, "কেশব তুমি আমায় চাও, কিন্তু তোমার চেলারা আমায় চায় না। তোমার চেলাদের বলছিলুম, এখন আমরা খচমচ করি, তারপর গোবিন্দ আসবেন।" শ্রীরামকৃষ্ণ কেশবের শিষ্যগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "ঐগো, তোমাদের গোবিন্দ এসেছেন। আমি এতক্ষণ খচমচ করছিলুম, জম্‌বে কেন?" এই কথা শুনিয়া ব্রাহ্ম ভক্তগণ হাসিয়া উঠিলেন। পুনরায় শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, "গোবিন্দের দর্শন সহজে পাওয়া যায় না। কৃষ্ণ-যাত্রায় দেখ নাই, নারদ ব্যাকুল হয়ে যখন ব্রজে বলেন, 'প্রাণ হে গোবিন্দ মম জীবন' তখন রাখাল সঙ্গে কৃষ্ণ আসেন, পশ্চাতে সখীগণ, গোপীগণ। ব্যাকুল না হলে ভগবানের দর্শন লাভ হয় না।" ব্রাহ্ম ভক্তগণের মনোভাব বুঝিয়া কেশবকে ঠাকুর বলিলেন, "কেশব তুমি কিছু বল। এরা সকলে তোমার কথা শুনতে চায়।"

কেশব বিনীতভাবে সহাস্যে উত্তর দিলেন, "এখানে কথা কওয়া যেমন, কামারের নিকট ছুঁচ বিক্রি করতে আসা তেমন।" ইহা শুনিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ সহাস্যে বলিলেন, "তবে কি জান, ভক্তের স্বভাব গাঁজাখোরের মত। তুমি একবার গাঁজার কল্‌কেটা নিয়ে টানলে, আমিও একবার টানলুম।" (সকলের হাস্য)। বেলা চারটা বাজিল, কালীবাড়ীর নহবতের বাজনা শোনা গেল। বাজনা শুনিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ কেশব প্রভৃতিকে বলিলেন, "দেখলে কেমন সুন্দর, বাজনা! একজন কেবল পোঁ ধরেছে, আর একজন নানা সুরে লহরী তুলে কত রাগরাগিনী বাজাচ্ছে। আমারও ঐ ভাব। আমার সাত ফোকর থাকতে

কেন শুধু পোঁ করবো, কেন শুধু সোঽহং সোঽহং বলব ? আমি সাত ফোকরে নানা রাগরাগিনী বাজাব। শুধু কেন 'ব্রহ্ম' 'ব্রহ্ম' করবো। শান্ত, দাস্য বাৎসল্য, সখ্য ও মধুর পঞ্চভাবে তাঁকে ডাকব ও আনন্দ করব।"

কেশব অবাক হইয়া ঠাকুরের কথা শুনিলেন ও বলিলেন, "জ্ঞান ও ভক্তির এরূপ আশ্চর্য্য সুন্দর ব্যাখ্যা কখনো শুনি নাই। (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) আপনি কতদিন এরূপ গোপনে থাকবেন, ক্রমে এখানে লোকারণ্য হবে।" ইহা শুনিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, "ও তোমার কি কথা ! আমি খাই দাই থাকি, তাঁর নাম করি। লোক জড় করা করি আমি জানি না, 'কে জানে তোর গাঁই গু ই, বীরভূমের বামন মুই।' হনুমান বলেছিলেন, "আমি বার, তিথি, নক্ষত্র ও সব জানি না, কেবল এক রাম-চিন্তা করি।" কেশব—আচ্ছা আমি লোক জড় করব, কিন্তু আপনার এখানে সকলকে আসতে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণ —আমি সকলের রেণুর রেণু। যিনি দয়া করে আসবেন, আসবেন।" কেশব— আপনি যাই বলুন, আপনার আসা বিফল হবে না।

এদিকে সংকীর্তনের আয়োজন হইল। বহু ভক্ত সংকীর্তনে যোগ দিলেন। হৃদয় শিঙ্গা বাজাইলেন, গোপীদাস খোল, আর দুইজন করতাল। পঞ্চবটী হইতে কীর্তনদল শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহাভিমুখে আসিল। শ্রীরামকৃষ্ণ নিম্নোক্ত গানটি গাহিলেন—

হরিনাম নিলেরে জীব তুই সুখে থাকবি।
নামের গুণে বৈকুণ্ঠে যাবি, ওরে মোক্ষফল পাবি ॥
যে নাম শিব জপেন পঞ্চমুখে।
আজ সেই হরি নাম দিব তোকে ॥

গান গাহিতে গাহিতে শ্রীরামকৃষ্ণ সিংহবিক্রমে নৃত্য করিলেন এবং শেষে সমাধিস্থ হইলেন। সমাধিভঙ্গের পর নিজঘরে আসিয়া খাটে বসিলেন এবং কেশব প্রভৃতিকে বলিলেন, "সব পথ দিয়েই তাঁকে পাওয়া যায়—যেমন তোমরা কেউ গাড়ীতে, কেউ নৌকায়, কেউ জাহাজে, কেউ বা পদব্রজে এখানে এসেছ। যার যাতে সুবিধা, যার যা প্রকৃতি, সে সেই পথ ধরেছে। কিন্তু উদ্দেশ্য এক ॥

কেউ আগে এসেছে, কেউ পরে।" (পুনরায় কেশবাদির প্রতি) "যতই উপাধি কমবে, ততই তিনি কাছে হবেন। উঁচু ঢিপিতে বৃষ্টির জল জমে না, নীচু জমিতে জমে। যেখানে অহংকার, সেখানে তাঁর কৃপাবারি নামে না। তাঁর কাছে দীন হীন ভাবই ভাল। খুব সাবধানে থাকতে হয়, এমন কি কাপড়চোপড়েও অহংকার হয়। পিলে রোগী দেখেছি, কালপেড়ে কাপড় পরেছে, অমনি নিধুবাবুর টপ্পা গাইছে। কেউ বুট পরেছে, অমনি তার মুখে ইংরাজি কথা বেরুচ্ছে। সামান্য আধার হলে গেরুয়া পরলে অহংকার হয়, একটু ত্রুটি-বিচ্যুতি হলে ক্রোধ অভিমান হয়।"

শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাবিষ্ট হইয়া কেশবকে বলিতে লাগিলেন, "ব্যাকুল না হলে তাঁকে দেখা যায় না। এই ব্যাকুলতা ভোগান্ত না হলে হয় না। যারা কামিনী-কাঞ্চনের মধ্যে আছে, ভোগান্ত হয় নাই, তাদের ব্যাকুলতা আসে না। ওদেশে হৃদয়ের ছেলে সমস্ত দিন আমার কাছে থাকত। সে চার পাঁচ বছরের ছেলে। আমার সামনে এটা ওটা খেলা করত। সব ভুলে থাকত। যেই সন্ধ্যা হল, অমনি বলে, 'মা যাব'। আমি কত বলতুম, 'পায়রা দেব, ইত্যাদি'; কিন্তু ঐসব কথায় সে আর ভুলত না। কেঁদে কেঁদে সে বলত, 'মা যাব'। তখন খেলাটেলা তার কিছুই ভাল লাগত না। আমি তার অবস্থা দেখে কাঁদতুম। এই বালকের মত ঈশ্বরের জন্য কান্না চাই। এই ব্যাকুলতা হলে খেলাধুলা, খাওয়াপরা কিছুই ভাল লাগবে না। ভোগান্তে এই ব্যাকুলতা আসে। তখন মানুষ ঈশ্বরের জন্য কাঁদে।"

সকলে অবাক্ হইয়া মনোযোগ সহকারে ঠাকুরের কথা শুনিলেন। সন্ধ্যা হইল, ফরাস আলো জ্বালিয়া দিয়া গেল। কেশবাদি ব্রাহ্ম ভক্তগণের জন্য জলযোগের আয়োজন হইল। কেশব সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজও কি মুড়ি?" শ্রীরামকৃষ্ণ সহাস্যে উত্তর দিলেন, "হৃদু জানে।" পাতা পড়িল। পাতায় পাতায় প্রথমে মুড়ি, তারপরে লুচি ও শেষে তরকারী দেওয়া হইল। সকলে খুব আনন্দ করিয়া জলযোগ করিলেন। জলযোগ শেষ হইতে রাত প্রায় দশটা বাজিয়া গেল। শ্রীরামকৃষ্ণ পঞ্চবটীতলে ব্রাহ্ম ভক্তগণকে আবার

বলিলেন, "ঈশ্বরলাভের পর সংসারে বেশ থাকা যায়। বুড়ি ছুঁয়ে তারপর খেলা কর.না! ঈশ্বরলাভের পর ভক্ত সংসারে নির্লিপ্ত থাকে, যেমন পাঁকাল মাছ পাঁকে থাকে। পাঁকের মধ্যে থাকলেও তার গায়ে পাঁক লাগে না।"

রাত্রি প্রায় এগারটা হইল। সকলে বাড়ী ফিরিবার জন্য অস্থির। প্রতাপ বলিলেন, "আজ রাত্রে এখানে থেকে গেলে হয়।" শ্রীরামকৃষ্ণ কেশবকে বলিলেন, "আজ এখানে থাক না।" কেশব সহাস্যে জানাইলেন, "কাজটাজ আছে, যেতে হবে।'" ঠাকুর হাসিতে হাসিতে কেশবকে বলিলেন, কেন গো, আঁশ চুবড়ীর গন্ধ না হলে কি তোমার ঘুম হবে না! মেছুনী মালীর বাড়ীতে রাত্রে অতিথি হয়েছিল। তাকে ফুলের ঘরে শুতে দেওয়াতে তার আর ঘুম হয় না। (সকলের হাস্য) সে হুস্‌খুস্‌ করছে দেখে মালিনী এসে তাকে বললে, "ঘুমুচ্ছিস্‌ নি কেন গো?" মেছুনী বললে, "কি জানি মা, যেন ফুলের গন্ধে ঘুমহচ্ছে না। তুমি একবার আঁশ চুবড়ীটা আনিয়ে দিতে পার?" তখন মেছুনী আঁশ চুবড়ীতে জল ছিটিয়ে সেই গন্ধ আঘ্রাণ করতে করতে গভীর নিদ্রায় অভিভূত হল।"

বিদায়ের সময় কেশব ঠাকুরের চরণ-স্পর্শ-করা একটী ফুলের তোড়া লইলেন এবং ভূমিষ্ঠ প্রণামান্তে 'বিধানের জয় হোক' একথা ব্রাহ্ম ভক্ত সঙ্গে বলিতে লাগিলেন। তিনি ব্রাহ্ম ভক্ত জয়গোপাল সেনের গাড়ীতে উঠিয়া কলিকাতায় গেলেন।

১৮৮১ খ্রীঃ জানুয়ারী মাসে মাঘোৎসবের সময় কেশব শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিতে দক্ষিণেশ্বরে গিয়াছিলেন। তখন রামচন্দ্র, মনোমোহন, জয়গোপাল সেন প্রভৃতি অনেকে উপস্থিত ছিলেন। ১২৮৮ সালে ১লা শ্রাবণ (১৮৮১ খ্রীঃ ১৫ই জুলাই) শুক্রবার কেশব তাঁহার জামাতা কুচবিহারের মহারাজার জাহাজে চড়িয়া বহু ব্রাহ্ম ভক্ত সঙ্গে কলিকাতা হইতে সোমড়া পর্য্যন্ত বেড়াইয়াছিলেন। কেশব দক্ষিণেশ্বরের কাছে জাহাজ থামাইয়া পরমহংসদেবকে তুলিয়া লইলেন। হৃদয় ঠাকুরের সঙ্গে জাহাজে উঠিলেন। জাহাজে কেশব, ত্রৈলোক্য প্রভৃতি ব্রাহ্ম ভক্তগণ, এবং রাজকুমার গজেন্দ্র নারায়ণ ও নগেন্দ্র গুপ্ত প্রমুখ অনেকে

ছিলেন। শ্রীত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল গান গাহিলেন, মৃদঙ্গ ও করতাল বাজিতেছিল। নিরাকার ব্রহ্মের কথা বলিতে বলিতে শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিস্থ হইলেন। সমাধিভঙ্গের পর ঠাকুর গান ধরিলেন—

শ্যামা মা কি কল করেছে।
চৌদ্দ পোয়া কলের ভিতর কত রঙ্গ দেখাতেছে॥

ফিরিবার সময় ঠাকুরকে দক্ষিণেশ্বরে জাহাজ হইতে নামাইয়া দেওয়া হইল। কেশব আহারীটোলা ঘাটে জাহাজ হইতে নামিয়া পদব্রজে শ্রীকালীচরণ ব্যানার্জির বাড়ীতে নিমন্ত্রণ রক্ষার্থ গেলেন। উক্ত বৎসর নভেম্বর মাসে মনো-মোহনের বাড়ীতে ঠাকুরের শুভাগমনে উৎসব হয়। নিমন্ত্রিত হইয়া কেশব উক্ত উৎসবে যোগদান করেন। উৎসবে ত্রৈলোক্য সান্ন্যাল প্রভৃতি গান গাহিয়া-ছিলেন। উক্ত বৎসর ডিসেম্বর মাসে ঠন্‌ঠনিয়ায় বেচু চ্যাটার্জী স্ট্রীটে রাজেন্দ্র মিত্রের বাড়ীতে নিমন্ত্রিত হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ গিয়াছিলেন। রাজেন্দ্র ছিলেন রামচন্দ্র ও মনোমোহনের মেসো মহাশয়। রামচন্দ্র, মনোমোহন, ব্রাহ্মভক্ত রাজমোহন প্রভৃতি তথায় উপস্থিত ছিলেন। রাজেন্দ্র কেশবকে উৎসবে যোগদানার্থ নিমন্ত্রণ করেন। কেশব যখন উক্ত সংবাদ পাইলেন তখন তিনি ভাই অঘোরনাথের মৃত্যু শোকে অশৌচ গ্রহণ করিয়াছিলেন। সকলে মনে করিলেন, কেশব হয়ত আসিতে পারিবেন না। কেশব সংবাদ পাইয়া বলিলেন, "সেকি! পরমহংস মহাশয় আসিবেন, আর আমি যাইব না! অবশ্য যাইব। তবে অশৌচ, তাই আমি আলাদা জায়গায় খাব।"

১২৮৮ সালে ১৬ই আশ্বিন তারিখে দৈনিক 'সুলভ সমাচার' পত্রিকায় কেশব পরমহংসদেব সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছিলেন, "এই মহাত্মাকে যতবার দেখিতেছি ততবারই তাঁহার দিব্য জীবন দেখিয়া অবাক্ হইতেছি। আমরা দেখিয়াছি, তিনি একজন প্রকৃত সিদ্ধপুরুষ, যোগবলে তাঁহার মন সর্বদাই ভগবানে সংলগ্ন থাকে। তিনি শিশুর মত সরল এবং ঈশ্বরপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া পাগলপ্রায় হন। তিনি কখনো হরি বলিয়া ভক্তিতে মত্ত হইয়া শ্রীচৈতন্যের ন্যায় নৃত্য

করেন, কখনো বা 'মা কালী' বলিয়া গভীর প্রেমে ভগবানকে ডাকিয়া শাক্ত ধর্মের আদর্শ কি তাহা দেখান। আবার কখনো তিনি নিরাকার ব্রহ্মধ্যানে নিমগ্ন হইয়া যান।"

১২৮৮ সালে ১৮ই পৌষ (১৮৮২ খ্রীঃ ১লা জানুয়ারী) রবিবার বৈকাল পাঁচটায় শ্রীরামকৃষ্ণ সিমুলিয়া ব্রাহ্ম সমাজের বাৎসরিক মহোৎসব উপলক্ষ্যে জ্ঞান চৌধুরীর বাড়ীতে আসিয়াছেন। শ্রীযুক্ত কেশব সেন, রাম দত্ত, মনোমোহন মিত্র, বলরাম বসু, ব্রাহ্ম ভক্ত রাজমোহন, জ্ঞান চৌধুরী, কেদার, নরেন্দ্র, রাখাল প্রভৃতি অনেক ভক্ত উপস্থিত। শ্রীরামকৃষ্ণ সিমুলিয়া ব্রাহ্ম সমাজে মধ্যে মধ্যে যাইয়া সঙ্গীত ও ভগবৎপ্রসঙ্গাদি করিতেন। এবার উপাসনার পূর্বে কিছুক্ষণ পাঠ হইল। অনুরুদ্ধ হইয়া নরেন্দ্রও গান গাহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ব্রাহ্ম ভক্তগণ সহ কেশব আসিয়া শ্রীরামকৃষ্ণকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিলেন। ভক্তমণ্ডলী কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ দালানে উপবিষ্ট। চতুর্দিকে সংসারী ভক্তগণকে দেখিয়া হাসিতে হাসিতে ঠাকুর বলিলেন, "তা সংসারে হবে না কেন? তবে কি জান, মন নিজের কাছে নাই। নিজের কাছে মন থাকলে তবে ত ভগবানকে দেবে। মন বন্ধক দিয়েছ, কামিনীকাঞ্চনে বন্ধক। মন নিজের কাছে এলে তবে সাধন-ভজন হবে। সর্বদা গুরুসঙ্গ, গুরুসেবা, সাধুসঙ্গ প্রয়োজন। হয় নির্জনে রাতদিন তাঁর চিন্তা, নয় সাধু-সঙ্গ। মন একলা থাকলে ক্রমে শুষ্ক হয়ে যায়। এক ভাঁড় জল যদি আলাদা রেখে দাও ক্রমে শুকিয়ে যাবে। কিন্তু গঙ্গা-জলের ভিতর যদি ঐ ভাঁড় ডুবিয়ে রাখ তাহলে শুকুবে না। কামারশালার লোহা আগুনে বেশ লাল হয়ে যায়। কিন্তু আগুন থেকে তুলে রাখলে লোহা যেমন কালো ছিল তেমনি কালো হয়। তাই লোহাকে মধ্যে মধ্যে হাপরে দিতে হয়। আমি কর্তা, আমার গৃহ ও পরিজন—এ ভাব অজ্ঞানজ। আমি তাঁর দাস, তাঁর ভক্ত, তাঁর সন্তান—এ ভাব জ্ঞানজ। 'আমি' একেবারে যায় না। এই বিচার করে উড়িয়ে দিচ্ছ; আবার কোথা থেকে 'আমি' এসে পড়ে, যেমন কাটা ছাগ-মুণ্ড একটু ভ্যা ভ্যা করে হাত পা নড়ে। তাঁকে দর্শন করবার পর তিনি যে আমি রেখে দেন তাকে বলে পাকা

আমি। যেমন তলোয়ার পরশমণি ছুঁলে সোণা হয়ে যায়, তার দ্বারা তখন আর হিংসার কাজ হয় না।”

কেশবাদি ব্রাহ্ম ভক্তগণ নিস্তব্ধ হইয়া ঠাকুরের কথা শুনিলেন। রাত্রি প্রায় আটটা হইয়াছে। উপাসনার জন্য তিন বার ঘণ্টা বাজিল। শ্রীরামকৃষ্ণ কেশবাদিকে বলিলেন, “একি, তোমাদের উপাসনা হচ্ছে না!” কেশব সবিনয়ে উত্তর দিলেন, “আর উপাসনা কি হবে? এই ত সব হচ্ছে।” শ্রীরামকৃষ্ণ—নাগো, যেমন পদ্ধতি সেরকম হোক্। কেশব—কেন এইত সব হচ্ছে। শ্রীরামকৃষ্ণ অনেক বলাতে কেশব উঠিয়া উপাসনা আরম্ভ করিলেন। উপাসনার মধ্যে ঠাকুর হঠাৎ দাঁড়াইয়া সমাধিস্থ হইলেন। তখন ভক্তগণ এই গান গাহিলেন—

মন একবার হরি বল, হরি বল, হরি বল।
হরি হরি হরি বলে ভবসিন্ধুপারে চল॥
জলে হরি স্থলে হরি অনলে অনিলে হরি
চন্দ্রে হরি সূর্য্যে হরি হরিময় এই ভূমণ্ডল॥

শ্রীরামকৃষ্ণ এখনো ভাবাবিষ্ট অবস্থায় দণ্ডায়মান। কেশব অতি সন্তর্পণে তাঁহাকে হাতে ধরিয়া প্রাঙ্গনে নামাইলেন। গান চলিতেছিল। এইবার ঠাকুর ভাবোন্মত্ত হইয়া গানের সঙ্গে নৃত্য আরম্ভ করিলেন। তাঁহার চতুর্দিকে ভক্তগণও নাচিতে লাগিলেন। উপাসনান্তে জ্ঞানবাবুর দ্বিতলস্থ কক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণ ও কেশব প্রভৃতিকে জলযোগ করান হইল। জলযোগান্তে সকলে নীচে আসিয়া বসিলেন। ঠাকুর কথা বলিতে বলিতে আবার দুইটী শ্যামাসঙ্গীত গাহিলেন। কেশবও গানে যোগ দিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ও কেশব উভয়ে ভাবোন্মত্ত হইলেন। আবার সকলে মিলিয়া গান ও নৃত্য করিলেন রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত।

একটু বিশ্রাম করিয়া ঠাকুর কেশবকে বলিলেন, “তোমার ছেলের বিবাহের বিদায় পাঠিয়েছিলে কেন? ফেরৎ এনো। আমি ওসব নিয়ে কি করবো?” কেশব ঈষৎ হাসিলেন। ঠাকুর আবার কেশবকে বলিলেন, “আমার নাম

কাগজে প্রকাশ কর কেন? বই লিখে, খবরের কাগজে লিখে কাউকে বড় করা যায় না। ভগবান যাকে বড় করেন, সে বনে থাকলেও তাকে সকলে জানতে পারে। গভীর অরণ্যে ফুল ফুট্‌লে মৌমাছি তার সন্ধান পায়, অন্য মাছি সন্ধান পায় না। মানুষ কি করবে? মানুষের মুখ চেয়ো না। লোক পোক। যে মুখে ভাল বলছে সেই মুখেই আবার মন্দ বলবে। আমি মান্যগণ্য হতে চাই না; যেন দীনের দীন, হীনের হীন হয়ে থাক্‌তে পারি।"

১২৮৮ সালে ১২ই ফাল্গুন (১৮৮২ খ্রীঃ ২৩শে ফেব্রুয়ারী) বৃহস্পতিবার কেশব ষ্টীমারে ভক্তসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন কারতে দক্ষিণেশ্বরে গিয়াছিলেন। আমেরিকান পাদ্রী জোসেফ কুক এবং মিস পিগট তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। কেশব ঠাকুরকে ষ্টীমারে তুলিয়া লইলেন। কুক সাহেব শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধিস্থ অবস্থা দর্শনে বিস্মিত হইলেন। উক্ত বৎসর ২১শে চৈত্র (২রা এপ্রিল) রবিবার শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত-সঙ্গে কমল কুটীরে যাইয়া কেশবের সহিত মিলিত হন। বৈকাল বেলা পাঁচটার সময় শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত-বেষ্টিত হইয়া কমলকুটীরে বৈঠকখানা ঘরে উপবিষ্ট। কেশব ভিতরের ঘরে ছিলেন, তাঁহাকে সংবাদ দেওয়া হইল। তিনি জামা-চাদর পরিয়া আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন। তাঁহার ভক্ত ও বন্ধু কালীনাথ বসু তখন পীড়িত। অসুস্থ বন্ধুকে দেখিতে যাইবার জন্য তিনি মনঃস্থ করিয়াছিলেন। ঠাকুরের আগমনে বন্ধু-দর্শনে যাওয়া হইল না। ঠাকুর কেশবকে বলিলেন, "তোমার অনেক কাজ, আবার খবর-কাগজ লিখতে হয়। সেখানে (দক্ষিণেশ্বরে) যাবার অবসর নাই। তাই আমিই তোমায় দেখতে এসেছি। তোমার অসুখ শুনে মার কাছে ডাব-চিনি মেনেছিলুম। মাকে বললুম, "মা কেশবের যদি কিছু হয় কলকাতায় গেলে কার সঙ্গে কথা কইব?"

সেদিন প্রতাপ প্রভৃতি ব্রাহ্ম ভক্তদের সহিত ঠাকুর অনেক কথা বলিলেন। সমীপে মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া ঠাকুর কেশবকে বলিলেন, "ইনি কেন ওখানে (দক্ষিণেশ্বরে) যান না জিজ্ঞাসা করত গা? এত ইনি বলেন, মাগ-ছেলেদের উপর মন নাই।" ব্রাহ্ম ভক্তগণ শ্রীযুক্ত সামাধ্যায়ীকে

দেখাইয়া শ্রীরামকৃষ্ণকে বলিলেন, “ইনি পণ্ডিত, বেদাদি শাস্ত্র খুব পড়েছেন।” ঠাকুর বলিলেন, “হাঁ, এঁর চক্ষু দিয়ে এঁর ভিতরটি দেখা যাচ্ছে; যেমন সারসীর দরজার ভিতর দিয়ে ঘরের ভিতরকার জিনিষ দেখা যায়।” ত্রৈলোক্য সান্যাল গান আরম্ভ করিলেন। সন্ধ্যার বাতি জ্বালা হইল। গান শুনিতে শুনিতে ঠাকুর দণ্ডায়মান, এবং জগন্মাতার নাম করিতে করিতে সমাধিস্থ হইলেন। কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া ঠাকুর নিজেই নৃত্য করিতে করিতে গান ধরিলেন—

সুরাপান করি না আমি সুধা খাই জয় কালী বলে।
মন-মাতালে মাতাল করে মদ-মাতালে মাতাল বলে॥
গুরু-দত্ত গুড় লয়ে প্রবৃত্তি তায় মশলা দিয়ে
জ্ঞান-শুঁড়ীতে চোঁয়ায় ভাঁটী পান করে মোর মন-মাতালে॥
মূল মন্ত্র যন্ত্র-ভরা শোধন করি বলে তারা
প্রসাদ বলে এমন সুরা খেলে চতুর্বর্গ মেলে॥

কেশবকে ঠাকুর স্নেহপূর্ণ নয়নে দেখিতেছেন, যেন কত আপনার লোক। আর যেন ভয় করিতেছেন, কেশব পাছে সংসারের হইয়া যান। তাঁহার দিকে তাকাইয়া ঠাকুর আবার গান ধরিলেন—

কথা বলতে ডরাই, না বল্‌লেও ডরাই।
মনে সন্দ হয়, পাছে তোমা-ধনে হারাই, হারাই॥
আমরা জানি যে মনতোর, দিলাম তোরে সেই মন্তোর।
এখন মন তোর, যে মন্ত্রে বিপদেতে তরি তরাই॥

ঠাকুর বলিলেন, “গানের শেষোক্ত দুই চরণের অর্থ এই যে, সব ত্যাগ করে ভগবানকে ডাক। তিনিই সত্য, আর সব অনিত্য। তাঁকে লাভ না করলে কিছুই হলো না। এই মহামন্ত্র।”

আবার ঠাকুর উপবেশনপূর্বক ভক্তদের সহিত কথা বলিলেন। তাঁহাকে জলযোগ করাইবার উদ্যোগ হইল। হল-ঘরের এক পাশে একটী ব্রাহ্ম ভক্ত পিয়ানো বাজাইতেছিলেন। বালকবৎ ঠাকুর পিয়ানোর কাছে যাইয়া দাঁড়াইয়া

বাগু-যন্ত্রটী দেখিলেন। একটু পরেই অন্তঃপুরে তাঁহাকে লইয়া যাওয়া হইল। তথায় তিনি জলযোগ করিলেন এবং মেয়েরাও তাঁহাকে প্রণামাদি করিলেন। তিনি ঘরের বাহিরে আসিয়া ঘোড়া-গাড়ীতে উঠিলেন। কেশবাদি ব্রাহ্ম ভক্তগণ গাড়ীর কাছে দাঁড়াইয়া বিদায় লইলেন। কমলকুটীরে যখন 'নিমাই-সন্ন্যাস' ও 'নব বৃন্দাবন' নাটকদ্বয় অভিনীত হয় তখন ঠাকুর তাহা দেখিতে গিয়াছিলেন। কেশব ঠাকুরকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "ঈশ্বরদর্শন হয় না কেন?" ঠাকুর উত্তর দিয়াছিলেন, "লোকমান্য, বিদ্যা এসব নিয়ে তুমি মেতে আছ কিনা, তাই হয় না। ছেলে চুষী নিয়ে যতক্ষণ চোষে ততক্ষণ মা আসে না। লাল চুষী। কিছুক্ষণ পরে চুষী ফেলে যখন চীৎকার করে তখন মা ভাতের হাঁড়ি নামিয়ে আসেন। তুমি মোড়লী করছ। মা ভাবছে, ছেলে আমার মোড়ল হয়ে বেশ আছে। . আছে ত থাক্।"

১৮৮২ খ্রীঃ ২৭শে অক্টোবর শুক্রবার কোজাগরী পূর্ণিমার দিন শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে নিজ ঘরে বসিয়া বিজয় গোস্বামী প্রভৃতির সহিত কথা বলিতেছেন। একজন তাঁহাকে খবর দিলেন, কেশব সেন জাহাজে চড়িয়া গঙ্গা-ঘাটে উপস্থিত। একটু পরে কেশবের ভক্তগণ আসিয়া ঠাকুরকে প্রণামান্তে জানাইলেন, "মহাশয়, জাহাজ এসেছে, আপনাকে যেতে হবে। চলুন, একটু বেড়িয়ে আসবেন। কেশব বাবু জাহাজে আছেন, আমাদের পাঠালেন।" বৈকাল বেলা ৪টার সময় ঠাকুর বিজয় গোস্বামীর সহিত নৌকায় উঠিলেন জাহাজে যাইবার জন্য। ঠাকুর নৌকায় উঠিয়া সংজ্ঞাশূন্য, সমাধিস্থ! নৌকা আসিয়া জাহাজের কাছে লাগিল। সকলেই ঠাকুরকে দেখিবার জন্য ব্যস্ত। ঠাকুরকে ভীড়ের মধ্যে নিরাপদে জাহাজে উঠাইবার জন্য কেশব স্বয়ং অগ্রসর হইলেন। অনেক কষ্টে ঠাকুরের হুঁস করাইয়া কেবিনের ভিতর লইয়া যাওয়া হইতেছে। এখনো তিনি ভাবস্থ, একটি ভক্তের উপর ভর দিয়া চলিতেছেন। তাঁর পা নড়িতেছে মাত্র, কিন্তু কোন হুঁস নাই। কেবিনে একটি চেয়ারে ঠাকুরকে বসান হইল। কেশবাদি ব্রাহ্মগণ ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন। কেশব ও বিজয় এক একটি চেয়ারে

বসিলেন। ঠাকুর চেয়ারে বসিয়া আবার সমাধিস্থ, সম্পূর্ণ বাহ্যজ্ঞানশূন্য। ঘরের মধ্যে অনেক লোক থাকায় ঠাকুরের কষ্ট হইতেছিল। ইহা দেখিয়া কেশব নিজে উঠিয়া জানালা খুলিয়া দিলেন। ব্রাহ্ম ভক্তগণ একদৃষ্টে ঠাকুরের দিকে চাহিয়া আছেন। ঠাকুরের সমাধিভঙ্গ হইল, এখনো তাঁহার ভাবাবেশ পূর্ণমাত্রায় আছে। ঠাকুর অস্ফুট স্বরে বলিতেছেন, "মা, আমায় এখানে আনলি কেন? আমি কি এদের বেড়ার ভিতর থেকে রক্ষা করতে পারব?" ক্রমে ঠাকুরের বাহ্য জ্ঞান আসিতেছে। গাজীপুরের নীলমাধব বাবু পওহারী বাবার কথা তুলিলেন। জনৈক ব্রাহ্ম ভক্ত ঠাকুরকে বলিলেন, "মহাশয়, ইনি গাজীপুরে থাকেন এবং পওহারী বাবাকে দেখেছেন। পওহারী বাবা আপনার মত আর একজন।" ঠাকুর এখনও কথা বলিতে পারিতেছেন না, ঈষৎ হাস্য করিলেন। ব্রাহ্ম ভক্ত পুনরায় ঠাকুরকে বলিলেন, "মহাশয়, পওহারী বাবা নিজের ঘরে আপনার ফটো রেখে দিয়েছেন।' ঠাকুর ইহা শুনিয়া সহাস্যে নিজের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশপূর্বক বলিলেন, "খোলটা।" ঠাকুর একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া আবার বলিলেন, "দেহী ও তার দেহ, যেমন বালিশ ও তার খোলটা। দেহী নিত্য, দেহ অনিত্য। জ্ঞানীরা যাঁকে ব্রহ্ম বলে, যোগীরা তাঁকেই আত্মা বলে; আর ভক্তেরা তাঁকেই ভগবান বলে।"

"ভক্তের হৃদয় ভগবানের বৈঠকখানা। যদিও তিনি সর্বভূতে আছেন তথাপি ভক্ত-হৃদয়ে তাঁর বিশেষ প্রকাশ। যেমন কোন জমিদার তাঁর জমিদারীর সকল স্থানেই থাকতে পারেন; কিন্তু তিনি তাঁর অমুক বৈঠক-খানায় প্রায়ই থাকেন। ভক্তের ভাব কিরূপ জান? ভক্ত বলে, "হে ভগবান, তুমি প্রভু, আমি দাস। তুমি মা, আমি তোমার সন্তান। তুমি পূর্ণ, আমি তোমার অংশ।"

এদিকে জাহাজ কলিকাতার অভিমুখে চলিল। ব্রাহ্ম ভক্তগণ ঠাকুরের কথামৃত পান করিতে করিতে বুঝিতেই পারিলেন না, জাহাজ চলিতেছে কিনা। ক্রমে আগ্নেয় পোত দক্ষিণেশ্বর ছাড়িয়া অগ্রসর হইল। ঠাকুর অনর্গল ভগবৎপ্রসঙ্গ করিতে লাগিলেন। কেশব সহাস্যে ঠাকুরকে অনুরোধ

করিলেন, "কালী কত ভাবে লীলা করছেন সেই কথাগুলি একবার বলুন।" শ্রীরামকৃষ্ণ সহাস্যে বলিলেন, "তিনি নানা ভাবে লীলা করছেন। তিনিই মহাকালী, নিত্যকালী, শ্মশানকালী, রক্ষাকালী ও শ্যামাকালী। মহাকালী ও নিত্যকালীর কথা তন্ত্রে আছে। যখন সৃষ্টি হয় নাই—চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, পৃথিবী ছিল না, নিবিড় আঁধারে বিশ্ব আবৃত ছিল তখন কেবল মা নিরাকারা মহাকালী মহাকালের সঙ্গে বিরাজ করছিলেন। কালী কি কাল? দূরে, তাই কাল দেখায়, জানতে পারলে কাল নয়। আকাশ দূর থেকে নীলবর্ণ। কাছে গিয়ে দেখ, কোন রং নেই। সমুদ্রের জল দূর থেকে নীল দেখায়। কাছে গিয়ে হাতে তুলে দেখ, রং নেই।" এই কথা বলিয়া প্রেমোন্মত্ত হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ গান ধরিলেন, "মা কি আমার কাল রে। কালরূপ দিগম্বরী, হৃৎপদ্ম করে আলো রে।"

ঠাকুর কেশবপ্রমুখ ব্রাহ্ম ভক্তগণকে বলিলেন, "বন্ধন আর মুক্তি দুইয়ের কর্তাই তিনি। তাঁর মায়াতে জীব সংসারী, কাম-কাঞ্চনে আবদ্ধ। আবার তাঁর দয়া হলেই জীব মুক্ত হয়।" এই বলিয়া ঠাকুর মধুর কণ্ঠে রামপ্রসাদের এই গানটি গাহিলেন. "শ্যামা মা ওড়াচ্ছে ঘুড়ি ভব-সংসার বাজার মাঝে।" গান শেষ হইলে ঠাকুর বলিলেন, "তিনি ইচ্ছাময়ী, লক্ষের মধ্যে দুই একজনকে মুক্তি দেন।" কোন ব্রাহ্ম ভক্তের প্রশ্নের উত্তরে ঠাকুর বলিলেন, "সত্য বলছি, তোমরা সংসার করছ এতে দোষ নাই। তবে ঈশ্বরের দিকে মন রাখতে হবে। তা না হলে হবে না। এক হাতে কর্ম কর, আর এক হাতে ঈশ্বরকে ধরে থাক। কর্ম শেষ হলে দুই হাতে ঈশ্বরকে ধরবে। মন নিয়েই কথা। মনেতেই বদ্ধ, মনেতেই মুক্ত। ভগবানের নাম করলে মানুষের দেহমন সব শুদ্ধ হয়ে যায়।"

কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর একটি কৃষ্ণ-সঙ্গীত গাহিলেন। অশ্রুপূর্ণ নয়নে গানটি গাহিয়া কেশবাদি ব্রাহ্মদিগকে তিনি বলিলেন, "রাধাকৃষ্ণ মান আর নাই মান, এই টানটুকু নাও। ভগবানের জন্য কিসে এইরূপ ব্যাকুলতা হয় চেষ্টা কর। ব্যাকুল হলেই তাঁকে লাভ করা যায়।"

গঙ্গায় ভাঁটা পড়িয়াছে। জাহাজ কলিকাতার দিকে দ্রুতবেগে চলিতেছে। হাওড়ার পুল পার হইয়া কোম্পানীর বাগানের দিকে আরও খানিকটা যাইবার জন্য কাপ্তেনকে হুকুম দেওয়া হইল। এইবার মুড়ি-নারিকেল খাওয়া হইল। প্রত্যেকে কিছু কিছু কোঁচড়ে লইয়া খাইলেন। ঠাকুরকে কেন্দ্র করিয়া আনন্দের হাট বসিয়াছে। বিজয় কেশবের সমাজ ছাড়িয়া যাওয়ায় উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্য হইয়াছে। বিজয় ও কেশবকে সঙ্কুচিত ভাবে উপবিষ্ট দেখিয়া ঠাকুর কেশবকে বলিলেন, "ওগো, এই বিজয় এসেছেন। তোমাদের ঝগড়া-বিবাদ যেন শিব ও রামের যুদ্ধ। রামের গুরু শিব। যুদ্ধও হল, আবার মিটেও গেল। কিন্তু শিবের ভূতপ্রেতগুলো, আর রামের বানরগুলোর মধ্যে ঝগড়া আর থামে না।" ঠাকুরের কথা শুনিয়া সকলে আনন্দিত হইলেন। ঠাকুর কেশবকে বলিলেন, "তুমি প্রকৃতি দেখে শিষ্য কর না, তাই দল ছেড়ে চলে যায়। লোকশিক্ষা দিতে হলে চাপরাশ চাই। চাপরাশ না হলে লোকশিক্ষা নিষ্ফল হয়। চাপরাশ পেলে, ভগবান লাভ হলে, কথার খুব জোর হয়, পর্বত টলে যায়। শুধু লেক্‌চার দিন কতক লোক শুনবে, তারপর ভুলে যাবে। আবার শুনলেও সেই অনুসারে কাজ করবে না।"

শ্রীরামকৃষ্ণ কেশবপ্রমুখ ব্রাহ্ম ভক্তদিগকে আবার বলিলেন, "তোমরা বল, জগতের উপকার করব। জগৎ কি এতটুকু গা! আর তুমি কে যে, এই জগতের উপকার করবে। তাঁকে সাধনের দ্বারা সাক্ষাৎকার কর। তাঁকে লাভ কর। তিনি শক্তি দিলে তবে জগতের উপকার করতে পার, নচেৎ নয়। শম্ভু মল্লিক বলেছিল, হাঁসপাতাল, ডাক্তারখানা, স্কুল, রাস্তা, পুষ্করিণী করার কথা। আমি বললাম, "সম্মুখে যেটা পড়বে, না করলে নয়, সেটাই নিষ্কাম ভাবে করতে হয়। ইচ্ছা করে বেশী কাজ জড়ান ভাল নয়, তাতে ঈশ্বরকে ভুলে যেতে হয়। কালীঘাটে দানই করতে লাগল, কালী দর্শন আর হল না।"

জাহাজ কয়লাঘাটে ফিরিয়া আসিল। সকলে নামিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। ঘরের বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, প্রশান্ত ভাগীরথীবক্ষ জ্যোৎস্নার

অপ্রাকৃত লীলাভূমি হইয়াছে এবং পৃথিবী পূর্ণচন্দ্রের সুস্নিগ্ধ আলোকে উদ্ভাসিত। ঠাকুরের জন্য গাড়ী আনা হইল। কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর শ্রীম ও অন্য দুই একটি ভক্তের সহিত গাড়ীতে উঠিলেন। ঠাকুরের সহিত খানিকটা যাইবার জন্য কেশবের ভ্রাতুষ্পুত্র নন্দলালও গাড়ীতে বসিলেন। গাড়ীতে সকলে উপবিষ্ট হইলে ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কই, তিনি কই (অর্থাৎ কেশব কই) ?" অল্পক্ষণ পরে কেশব একাকী আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে কে এঁর সঙ্গে যাবে ?" কেশব ভূমিষ্ঠ প্রণামান্তে ঠাকুরের পদধূলি লইলেন। ঠাকুর সস্নেহে সম্ভাষণ করিয়া তাঁহাকে বিদায় দিলেন। গাড়ী চলিতে লাগিল। পথে হঠাৎ তিনি বলিলেন, "আমার জল-তেষ্টা পাচ্ছে। কি হবে, কি করা যায়।" নন্দলাল ইণ্ডিয়া ক্লাবের নিকট গাড়ী থামাইয়া ক্লাব হইতে কাঁচের গ্লাসে জল আনিয়া ঠাকুরকে দিলেন। ঠাকুর সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গ্লাসটি ধোয়া ত ?" নন্দলাল উত্তর দিলেন, "হাঁ।" ঠাকুর সেই গ্লাসে জল পান করিলেন। কিছুক্ষণ পরে নন্দলাল কলুটোলায় নামিয়া গেলেন।

১৮৮৩ খ্রীঃ ২৮শে নভেম্বর, বুধবার, বৈকাল পাঁচটার সময় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ঘোড়া-গাড়ীতে চড়িয়া কমল কুটীরে আসিলেন পীড়িত কেশবকে দেখিবার জন্য। তাঁহার সঙ্গে রাখাল, লাটু, মাস্টার প্রভৃতি ভক্তগণ। কেশবের বাড়ীর লোকেরা আসিয়া ঠাকুরকে সঙ্গে করিয়া উপরে লইয়া গেলেন। বৈঠকখানার দক্ষিণ দিকের বারান্দায় একটী তক্তাপোষ পাতা ছিল। উহার উপর ঠাকুরকে বসান হইল। ঠাকুর অনেকক্ষণ বসিয়া আছেন এবং কেশবকে দেখিবার জন্য অধীর হইয়াছেন। কেশবের শিষ্যগণ বিনীত ভাবে বলিতেছেন, তিনি একটু পরেই আসছেন। ঠাকুর কেশবকে দেখিবার জন্য উত্তরোত্তর ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "হ্যাঁ গা! তার আসবার কি দরকার? আমিই ভেতরে যাই না কেন ?" প্রসন্ন সবিনয়ে বলিলেন, "আজ্ঞে, এই তিনি আসছেন।" ঠাকুর অস্থির হইয়া বলিলেন, "যাও, তোমরাই অমন করছো, আমিই ভিতরে যাই।" প্রসন্ন ঠাকুরকে ভুলাইয়া কেশবের সম্বন্ধে নানা কথা বলিলেন। কেশব জগন্মাতার সঙ্গে কথা বলেন, হাসেন ও কাঁদেন শুনিবামাত্র ঠাকুর

ভাবাবিষ্ট হইলেন, এবং কিঞ্চিৎ পরেই সমাধিস্থ। তিনি অনেকক্ষণ সমাধিস্থ রহিলেন, সন্ধ্যা হইয়াছে। ঠাকুর একটু প্রকৃতিস্থ। পার্শ্বস্থ বৈঠকখানায় আলো জ্বলিয়া উঠিল। ঠাকুরকে অনেক কষ্টে সেই ঘরে লইয়া যাওয়া হইল। ঠাকুর একটী কৌচের উপর বসিলেন। কৌচে বসিয়াই আবার ভাবাবিষ্ট। ভাবের ঘোরে জগন্মাতাকে দেখিতেছেন, আর বলিতেছেন, এই যে মা এসেছো! আবার বারানসী শাড়ী পরে কি দেখাও? মা হাঙ্গামা করো না। বোসো গো বোসো!"

ঠাকুরের ভাব-নেশা এখনো আছে। বৈঠকখানা আলোকময়। ঠাকুরের চারিদিকে ব্রাহ্ম ভক্তগণ। ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়া বলিতেছেন, "দেহ আর আত্মা। দেহ হয়েছে, আবার যাবে। কিন্তু আত্মার মৃত্যু নাই। যেমন পাকা সুপারি ছাল থেকে আলাদা হয়ে থাকে। কাঁচা বেলায় ফল থেকে ছাল আলাদা করা বড় শক্ত। তাঁকে দর্শন করলে, তাঁকে লাভ করলে দেহ-বুদ্ধি যায়, আত্ম-বোধ আসে। তখন দেহ থেকে আত্মা পৃথক্ বোধ হয়। কেশব পূর্বদ্বার দিয়া দেওয়াল ধরিয়া বৈঠকখানায় আসিলেন। তাঁর দেহ অস্থিচর্মসার। তিনি দাঁড়াইতে পারিতেছেন না। অনেক কষ্টে কৌচের সম্মুখে আসিয়া বসিলেন। ঠাকুর ইতিমধ্যে কৌচ হইতে নামিয়া নীচে বসিয়াছেন। কেশব ঠাকুরের দর্শন লাভ করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন এবং প্রণামান্তর উঠিয়া বসিলেন। ঠাকুর এখনও ভাবাবিষ্ট। কেশব উচ্চ স্বরে ঠাকুরকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আমি এসেছি, আমি এসেছি!" এই বলিয়া ঠাকুরের বাম হাত ধারণ করিলেন এবং সেই হাতে হাত বুলাইতে লাগিলেন। ঠাকুর মহাভাবে মাতোয়ারা এবং স্বতঃই কথা বলিতেছেন। ব্রাহ্ম ভক্তগণ অবাক হইয়া তাঁহার কথা শুনিতেছেন। তিনি বলিলেন, "যতক্ষণ উপাধি, ততক্ষণ নানাবোধ—যেমন কেশব, প্রসন্ন, অমৃত এই সব। পূর্ণ জ্ঞান হলে এক চৈতন্য-বোধ হয়। আবার পূর্ণ জ্ঞানে দেখে, সেই এক ব্রহ্মচৈতন্যই জীব-জগৎ হয়েছেন। তিনিই সব হয়েছেন বটে, কিন্তু কোথাও তাঁর বেশী শক্তির প্রকাশ, কোনখানে কম শক্তির প্রকাশ। যিনি

ব্রহ্ম তিনিই আগ্যাশক্তি। যখন তিনি নিষ্ক্রিয় তখন তাঁকে ব্রহ্ম বলি। যখন সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করেন তখন তাঁকে আদ্যা শক্তি বলি।"

শ্রীরামকৃষ্ণ প্রকৃতিস্থ হইয়া সহাস্যে কেশবের সহিত কথা বলিতেছেন। এক ঘর লোক উৎকর্ণ হইয়া সমস্ত দেখিতেছেন ও শুনিতেছেন। সকলেই দেখিয়া অবাক্ যে, 'তুমি কেমন আছ' ইত্যাদি লৌকিক আলাপ উভয়ের মধ্যে আদৌ হইতেছে না, কেবল ভগবৎপ্রসঙ্গ। ঠাকুর কেশবকে বলিলেন, "ব্রাহ্মরা ঈশ্বরের অত মহিমা বর্ণন করে কেন? তোমরা কেন এত বল, 'হে ঈশ্বর তুমি চন্দ্র করিয়াছ, সূর্য করিয়াছ, নক্ষত্র করিয়াছ।' এসব কথা এত কী দরকার? অনেকে বাগান দেখিয়া অবাক্। বাবুকে দেখতে চায় ক'জন? বাগান বড়, না বাবু বড়?" শ্রীরামকৃষ্ণ কেশবকে পুনরায় সহাস্যে বলিলেন, "তোমার অসুখ হয়েছে কেন, তার মানে আছে। শরীরের ভিতর দিয়ে অনেক ভাব চলে গেছে, তাই এমন হয়েছে। যখন ভাব হয় তখন কিন্তু বোঝা যায় না, অনেক দিন পরে শরীরে আঘাত লাগে। আমি দেখেছি, বড় জাহাজ যখন গঙ্গা দিয়ে চলে যায় তখন কিছু টের পাওয়া যায় না। ওমা! খানিকক্ষণ পরে দেখি, কিনারার উপরে জল ধপাস্ ধপাস্ করছে, আর তোলপাড় করে দিচ্ছে। হয়ত কিনারা খানিকটা ভেঙ্গে জলে পড়ল। কুঁড়ে ঘরে হাতী ঢুকলে ঘর ভেঙ্গে চুরে দেয়। ভাব-হস্তী দেহ-ঘরে ঢুকলে তোলপাড় করে।"

"তুমি মনে করছ, সব ফুরিয়ে গেল। কিন্তু যতক্ষণ রোগের কিছু বাকী আছে ততক্ষণ তিনি ছাড়বেন না। হাসপাতালে যদি তুমি নাম লেখাও আর চলে আসবার জো নেই। যতক্ষণ রোগের একটু কসুর থাকে ততক্ষণ ডাক্তার সাহেব চলে আসতে দেবে না। তুমি নাম লেখালে কেন?"

হাসপাতালের কথা শুনিয়া সকলে হাসিলেন। কেশবও হাসি সম্বরণ করিতে পারিলেন না। ঠাকুর কেশবকে আবার বলিলেন, "শিশির পাবে বলে মালী বস্‌রাই গোলাপের গাছ শিকড় শুদ্ধ তুলে দেয়। শিশির পেলে গাছ ভাল করে গজাবে। তাই বুঝি তোমার শিকড়শুদ্ধ তুলে দিচ্ছেন।" ঠাকুর ও কেশব উভয়েই হাসিলেন। পুনরায় ঠাকুর কেশবকে বলিলেন

"তোমার অসুখ হলেই আমার প্রাণটা বড় ব্যাকুল হয়। আগের বারে যখন তোমার অসুখ হয় তখন রাত্রি-শেষে আমি কাঁদতুম। মাকে বলতুম, 'মা কেশবের যদি কিছু হয় তবে কার সঙ্গে কথা কইব?' তখন কলকাতায় এলে সিদ্ধেশ্বরীকে ডাব-চিনি দিয়েছিলুম। মার কাছে মেনেছিলুম যাতে তোমার অসুখ ভাল হয়।" কেশবের প্রতি ঠাকুরের এইরূপ অকৃত্রিম ভালবাসা দেখিয়া সকলে অবাক্ হইয়া রহিলেন। ঠাকুর আবার বলিতেছেন, "এবারও তোমার জন্য দুই তিন দিন মন একটু খারাপ হয়েছিল।" কেশবের জননী আসিয়া দ্বারদেশে ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন। তথা হইতে উমানাথ উচ্চ স্বরে ঠাকুরকে বলিলেন, "মা আপনাকে প্রণাম করলেন।"

ইহা শুনিয়া ঠাকুর হাসিতে লাগিলেন। উমানাথ আবার বলিলেন, "মা বলছেন, কেশবের অসুখটি যাতে সারে।" ঠাকুর উত্তর দিলেন, "মা সুবচনী, আনন্দময়ীকে ডাক, তিনিই দুঃখ দূর করবেন।" ঠাকুর কেশবকে গম্ভীরভাবে বলিলেন, "বাড়ীর ভিতরে অত থেকো না। মেয়েছেলেদের মধ্যে থাকলে আরো ডুব্‌বে, ঈশ্বরীয় কথা হলে আরো ভাল থাকবে।" তৎপরেই বালকের ন্যায় হাসিতে হাসিতে কেশবকে বলিলেন, "তোমার হাত দেখি।" এই বলিয়া কেশবের হাত লইয়া ওজন করিলেন এবং শেষে বলিলেন, "না, তোমার হাত হাল্‌কা আছে। খলদের হাত ভারী হয়।" (সকলের হাস্য)। উমানাথ দ্বারদেশ হইতে আবার বলিলেন, "মা বলছেন, কেশবকে আশীর্বাদ করুন।" শ্রীরামকৃষ্ণ গম্ভীর স্বরে উত্তর দিলেন, "আমার কি সাধ্য! তিনিই আশীর্বাদ করবেন। ঈশ্বর একবার হাসেন যখন ছেলের অসুখ সঙ্কটাপন্ন, মা কাঁদছে, এবং বৈদ্য এসে বলছে 'ভয় কি মা! আমি ভাল করে দেব।' বৈদ্য জানে না যে, ঈশ্বর যদি মারেন, কার সাধ্য রক্ষা করে।"

সকলে নিস্তব্ধ। সেই সময় কেশব অনেকক্ষণ ধরিয়া কাশিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পরে কাশি থামিল। কেশব আর বৈঠকখানায় থাকিতে পারিলেন না। তিনি ঠাকুরকে ভূমিষ্ঠ প্রণামান্তে বিদায় লইলেন এবং অনেক কষ্টে দেওয়াল ধরিয়া স্বীয় কক্ষে গেলেন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মিষ্টিমুখ করিবেন। কেশবের বড় ছেলে ঠাকুরের কাছে আসিয়া বসিলেন। অমৃত বলিলেন, "এটি কেশবের বড় ছেলে, আপনি আশীর্বাদ করুন, মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করুন।" ঠাকুর বলিলেন, "আমার আশীর্বাদ করতে নেই।" এই বলিয়া তিনি ছেলেটির গায়ে সহাস্যে হাত বুলাইতে লাগিলেন। ঠাকুর অমৃতাদি ব্রাহ্মগণকে কেশবের কথা বলিলেন, "অসুখ ভাল হোক—এসব কথা আমি বলতে পারি না। কেশব কি কম লোক গা? দয়ানন্দকে দেখেছিলাম, তখন বাগানে ছিল। 'কেশব সেন' 'কেশব সেন' করে ঘর বাহির করছিল, কখন কেশব আসবে। সেদিন বুঝি কেশবের যাবার কথা ছিল।" এইরূপে কেশবের সুখ্যাতি করিয়া ঠাকুর জলযোগান্তে গাড়ীতে উঠিলেন। ব্রাহ্ম ভক্তগণ সঙ্গে আসিয়া তাঁকে গাড়ীতে তুলিয়া দিলেন। সিঁড়ি দিয়া নামিবার সময় ঠাকুর দেখিলেন, নীচে আলো নাই। তখন তিনি অমৃতাদি ব্রাহ্মগণকে বলিলেন, "এসব জায়গায় ভাল করে আলো দিতে হয়। আলো না দিলে দারিদ্র্য হয়। এ রকম যেন আর না হয়।" এই বলিয়া ঠাকুর দুই একটি ভক্তসঙ্গে কালীবাড়ীতে ফিরিলেন। কেশবচন্দ্রের দেহত্যাগের পরও ত্রৈলোক্য সান্যাল ও গিরিশ সেন প্রভৃতি ব্রাহ্ম ভক্তগণ ঠাকুরের নিকট পূর্ববৎ যাইতেন। কেশবের মৃত্যুর প্রায় দুই বৎসর পরে ঠাকুর দেহরক্ষা করেন। ঠাকুরের দেহ যখন কাশীপুর শ্মশান-ঘাটে ভস্মীভূত হয় তখন ত্রৈলোক্য সান্যাল, গিরিশ সেন প্রভৃতি ব্রাহ্ম ভক্তগণ উপস্থিত ছিলেন। তথায় ত্রৈলোক্য সান্যাল যে কয়েকটি সময়োপযোগী সংগীত গাহিয়াছিলেন তন্মধ্যে একটি এখানে উদ্ধৃত হইল।—

"মা তোর রঙ্গ দেখে রঙ্গময়ী অবাক্ হয়েছি।
হাসিব কি কাঁদিব তাই বসে ভাবতেছি॥
এ বিশ্ব ভবের মেলা ভাঙ্গ গড় দুটি বেলা।
ঠিক্ যেন ছেলেখেলা বুঝতে পেরেছি॥
এতকাল রইলাম কাছে বেড়াইলাম পিছে পিছে।
চিনিতে না পেরে এখন হার মেনেছি॥"

ত্রৈলোক্য নাথ লিখিয়াছেন—Many of my most beautiful songs

were inspired by the ecstacies of Sri Ramakrishna. অর্থাৎ আমার সর্বাপেক্ষা সুন্দর সংগীতসমূহের অধিকাংশই শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধিপূত ভাবতরঙ্গ হইতে প্রেরণা-প্রাপ্ত।

কেশবচন্দ্র সুদীর্ঘ নয় বৎসর শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্য সঙ্গ লাভ করেন। সেইজন্য তিনি স্বীয় জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাব এড়াইতে পারেন নাই। ভগবানকে মাতৃভাবে উপাসনা কেশব ঠাকুরের নিকট হইতে শিখিয়া ব্রাহ্ম সমাজে প্রচলিত করেন। ত্রৈলোক্য নাথ লিখিয়াছেন—"The sweet, simple, charming and child-like nature of Ramakrishña coloured the yoga of Keshab and his immaculate conception of religion. অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণের মধুর, সরল, মনোহর ও শিশুস্বভাব দ্বারা কেশবের যোগ এবং অভিনব ধর্মভাব প্রভাবিত হয়। ত্রৈলোক্যনাথের ন্যায় কেশবের অন্যতম শিষ্য গিরিশচন্দ্র সেন শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের বৎসর ১৮৮৬ খ্রীঃ "পরমহংসদেবের জীবনী ও উক্তি" নামক একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। ইহা সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৭৫ খ্রীঃ ক্ষুদ্রতর আকারে। সুরেশ দত্ত ও রাম দত্তের পুস্তকের ন্যায় ইহাও রামকৃষ্ণদেবের অন্যতম প্রথম জীবনী। গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছেন—It was from Ramakrishna that Keshab received the idea of invoking God by the sweet name of Mother with the simplicity of a child. The shadow of Ramakrishna softened the rather hard cult of the Brahmas. অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট হইতে কেশব শিশুসুলভ সারল্যের সহিত মধুর মাতৃনামে ভগবানকে আরাধনার ভাব প্রাপ্ত হন। ব্রাহ্মদের নীরস ধর্ম-সাধনা রামকৃষ্ণের ভক্তি ভাব দ্বারা সরস হইয়া উঠে।

কেশবের জনৈক খ্রীষ্টান শিষ্য মণিলাল পারেক লিখিয়াছেন, "Keshab owed much to Ramakrishna probably more than what Ramakrishna owed to him. অর্থাৎ কেশব বহু বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট ঋণী, সম্ভবতঃ শ্রীরামকৃষ্ণ কেশবের নিকট তত ঋণী ছিলেন না। যে

বৎসর কেশব শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রথম দর্শন করেন সে বৎসর তিনি নববিধান প্রচার করেন।

ব্রাহ্ম সমাজে ধর্ম-সমন্বয়ের বীজ রামমোহন কর্তৃক উপ্ত এবং কেশব কর্তৃক অঙ্কুরিত হইলেও উহা পল্লবিত ও পুষ্পিত হয় শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাবে। মূর্তিপূজার প্রতি কেশবের অবজ্ঞা খানিকটা রামকৃষ্ণের সঙ্গগুণেই দূর হয় এবং তাঁহার নিকটেই কেশব হিন্দুধর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব অবগত হন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ১লা আগষ্ট তারিখের 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রিকায় কেশবচন্দ্র The Philosophy of Idol-Worship (মূর্তি-পূজা-তত্ত্ব) শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—

"Hindu idolatry is nothing but worship of Divine attributes materialized. The believer in the Naba Bidhan or New Dispensation is required to worship God as the possessor of all those attributes, represented by the Hindu as innumerable or three hundred and thirty millions. If we are to worship Him in all His Manifestations we shall name one attribute Lakshmi, another Saraswati, another Mahadev etc."

ঊনবিংশ শতাব্দী একটী age of transition বা যুগসন্ধিক্ষণ। তখন ইস্লামের গৌরব-রবি অস্তমিত এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার যশঃ-রবি উদিতপ্রায়। ঐ জন্য যে সকল মহাপুরুষ এই শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের চরিত্রে changeability (পরিবর্তনীয়তা) ও heterogeneity (বিজাতীয় ভাবরাশি) বর্তমান। বিশেষরূপে কেশবচন্দ্রের চরিত্র বিরোধী ভাবপূর্ণ ও বৈচিত্র্য-সঙ্কুল ছিল। রোমাঁ্যা রোলাঁ বলিয়াছেন—

'Keshab oscillated between the East and the West. His nature was divided between the East and the West and his character was compounded of diverse and incompatible elements of the East and the West".

'রোমঁ্যা রোলাঁ আরও বলেন যে, কেশব-চরিত্রে Intellectual European (ইউরোপীয় বুদ্ধিমত্তা) এবং Inspired Indian (ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা) এই দুই ভাবই সমানভাবে প্রবল ছিল। তাঁহার মধ্যে বিশুদ্ধ ভারতীয় ভাবের অভাব ছিল বলিয়াই মনে হয়। পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন ভারতবাসী ভারতীয় ভাবে উপনীত হইবার জন্য যাহা করে কেশবের জীবন তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। কেশবের জীবনে ধর্মভাবের ক্রমবিকাশ সদাই চলিয়াছিল। তাঁহার মস্তিষ্ক পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন হইলেও তাঁহার অন্তরাত্মা ভারতীয়ভাবে পরিপূর্ণ ছিল। তাই রোম্যাঁ রোলাঁ বলিয়াছেন—Though his spirit like his face was tinged with the tender sun of the West, the depth of his soul ever remained Indian." তিনি আরও বলিয়াছিলেন—"Keshab was the prince of intellectuals but an Anglo-maniac intellectual." মনে হয়, কেশব পাশ্চাত্যের প্রভাব সম্পূর্ণ এড়াইতে পারেন নাই। কেশব ছিলেন hyper-individualist by nature. তাই তিনি জীবনে এত স্বাধীনচেতা ও আত্মনির্ভরশীল ছিলেন। নরওয়ের নাট্যকার ইবসেন সত্যই বলিয়াছিলেন—"Those who have a mission in life must be independent of others." (যাঁহাদের জীবনে বিশেষ উদ্দেশ্য আছে তাঁহারা অবশ্যই স্বাধীন হন।) কেশবচন্দ্র ক্ষমতাশীল সংস্কারক ছিলেন। স্ত্রীশিক্ষা, সুরাপান নিবারণ, শ্রমজীবী বিদ্যালয় স্থাপন, শিক্ষাবিস্তার, ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি নানা সংস্কার তিনি আরম্ভ করেন। এই অদ্ভুতকর্মা মহাপুরুষ একদিকে সমাজ সেবা এবং অন্যদিকে কঠোর তপস্যা করিতেন। তাঁহার স্বদেশানুরাগও অসাধারণ এবং অনুকরণীয়। তিনি বাঙ্গালী জাতি, বাংলা ভাষা এবং বাংলা দেশকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিতেন। তিনি মাতৃভাষার একনিষ্ঠ সেবক ও সাধক ছিলেন। মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন-রূপে প্রচলন করিবার জন্য তিনি বিশেষ প্রয়াসী হন। তাঁহার বহুমুখী প্রতিভা ছিল। এতগুলি সদ্‌গুণ সাধারণতঃ একাধারে দেখা যায় না। কলিকাতায় ১৮৭০ খ্রীঃ তিনি 'সুলভ সমাচার' নামে এক পয়সা মূল্যের প্রথম বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র এবং ১৮৭১ খ্রীঃ 'Indian Mirror' নামক প্রথম ইংরাজী দৈনিক প্রকাশ

করেন। 'সুলভ সমাচার' প্রথম সপ্তাহে ২০০০ সংখ্যা পর সপ্তাহে ৪০০০ ছাপা হয় এবং শেষে উহার বিক্রয় সংখ্যা ৮০৩০ অবধি উঠিয়াছিল। 'Indian Mirror' এর সম্পাদক হন হরীশ মুখার্জি। 'ধর্মতত্ত্ব' নামে যে সাপ্তাহিক গৌরগোবিন্দ রায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় ইহা অদ্যাপি চলিতেছে। কেশবের Religion of Harmony প্রমুখ দশখানি ইংরাজী বই এবং 'জীবনবেদ' প্রমুখ প্রায় ২৫ খানি বাংলা বই আছে। তাঁহার 'সেবকের নিবেদন,' 'আচার্য্যের উপদেশ' প্রভৃতি পুস্তক বাংলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছে।

কেশবের জীবনী-লেখক প্রতাপচন্দ্র মজুমদার বলেন যে, কেশব বাল্যকালেই ভক্তির আতিশয্যে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িতেন। তিনি যৌবনে কার্লাইল ও ইমার্সনের গ্রন্থাবলী ও বাইবেল আগ্রহ সহকারে পাঠ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি খ্রীষ্টেরও পরম ভক্ত ছিলেন। সেণ্ট পল, যিশুখ্রীষ্ট ও জন দি ব্যাপটিষ্টের দর্শন অলৌকিক যৌবনেই সৌভাগ্যক্রমে তিনি পান। তাঁহাকে 'যিশুদাস' নামে ডাকিতে তিনি বন্ধুগণকে বলিতেন। উপবাস দ্বারা তিনি বড়দিন উদ্‌যাপন করিতেন এবং রুটী ও মদের পরিবর্তে ভাত ও জল দিয়া Blessed sacrament সম্পন্ন করিতেন। তিনি বলিয়াছিলেন—

"Christ lodges in my heart. For twenty years have I cherished Him in my miserable heart where his words find lasting lodgement."

তাঁহার ইচ্ছাশক্তি খ্রীষ্ট কর্তৃক পরিচালিত হইত। তিনি বলিয়াছিলেন—

"The Lord Christ is my will, Socrates my head, Chaitanya my heart, the Hindu Rishi my soul and the Philanthropist Howard my right hand."

কেশবচন্দ্র খ্রীষ্টের পরমভক্ত হইলেও তিনি নিজেকে কখনও খ্রীষ্টান বলিতেন না, বা মনে করিতেন না। তিনি বলেন—

"Honour Christ but be not a Christian in the popular acceptation of the term. Christ is not Christianity. We

belong to no Christian sect. We disclaim Christian name. Did the immediate disciples of Christ call themselves Christian ? Is any Christian greater than Christ ?"

লিউক রিভিংটন নামক জনৈক রোমান কাথলিক এংলিকান সাধুকে কেশব খুব শ্রদ্ধা করিতেন এবং তাঁহার নিকট খ্রীষ্টতত্ত্ব শিক্ষা করিতে যাইতেন। কেশবচন্দ্র তাঁহার প্রচারিত নববিধান এবং খ্রীষ্টধর্মের মধ্যে প্রভেদ এইভাবে প্রকাশ করিতেন—

"Christian Europe has not accepted one half of Christ's Gospel. She has comprehended that Christ and God are one but not that Christ and humanity are one. Revelation of Nava Vidhan to the world is not reconciliation of man with God but that of man with man."

খ্রীষ্ট বলিয়াছিলেন—"I and my father are one."

কিন্তু কেশব বলিলেন—"I and my brother are one."

কেশব সর্বধর্মের মহাপুরুষদিগকে শ্রদ্ধা করিতেন এবং বলিতেন—

"I am a born disciple. Honour and love all saints and sages of all religions and all countries. Let their flesh be your flesh, let their blood be your blood. Every good and great man is the personification of some special element of Truth and Divine goodness."

ধর্মমতের এইরূপ সার্বভৌমিকতা অসাধারণ। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মমন্দিরের চূড়া মসজিদ, গির্জা, মন্দির ও বিহারের সংমিশ্রণে উৎপন্ন। নববিধানের প্রতীকে ক্রুশ, ক্রিশেণ্ট, স্বস্তিক ও ত্রিশূলের সমন্বয় হইয়াছে।

কেশবের আদেশ ও অনুপ্রেরণায় অঘোরনাথ বৌদ্ধ শাস্ত্র, গৌরগোবিন্দ হিন্দু শাস্ত্র, প্রতাপচন্দ্র খ্রীষ্টান শাস্ত্র এবং গিরিশচন্দ্র সেন মুসলমান শাস্ত্র অধ্যয়ন ও অনুশীলনে আত্মনিয়োগ করেন। সৌর মণ্ডলে যেমন নানা গ্রহ ও উপগ্রহ

সূর্য্যকে কেন্দ্র করিয়া ঘুরিতে থাকে, কেশবকে কেন্দ্র করিয়া সেইরূপ ত্রৈলোক্যনাথ, অঘোরনাথ, প্রতাপচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র ও গৌরগোবিন্দ প্রভৃতি দিক্‌পাল মহাপুরুষগণের সম্মিলনে একটী কেশব-মণ্ডলী গঠিত হয়। ইহাই কেশবের অসাধারণ ব্যক্তিত্বের নিদর্শন। তিনি ছিলেন প্রাণবন্ত স্পর্শমণি। স্পর্শমণির স্পর্শে যেমন লোহা সোনা হইয়া যায়, তেমনি কেশবের অগ্নিময় ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে বহু সাধারণ ব্যক্তি অসাধারণ হইয়া গিয়াছেন।

কেশবচন্দ্র ও তাঁহার মণ্ডলী সাহিত্য-সেবা, সমাজ-সংস্কার, দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের সেবা এবং ধর্ম্মপ্রচার প্রভৃতি সকল কার্য্যে অগ্রণী ছিলেন। কিন্তু কেশবের সংস্কার ও সেবার মূলমন্ত্র ছিল ধর্ম্ম। ধর্ম্মের ভিতর দিয়াই যে ভারতে সামাজিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি সকল কার্য্য করিতে হইবে কেশব তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। বর্তমান যুগের সংস্কারক ও সেবকগণ কেশবচন্দ্রের এই বাণীর গভীরতা হৃদয়ঙ্গম করিলে দেশের প্রভূত কল্যাণ হইবে। কেশব ছিলেন সংস্কার ও সংগঠনের অগ্রদূত। তাঁহার জীবন ও বাণী শিরে ধারণ করিয়াই আমাদিগকে ভবিষ্যতের পথে চলিতে হইবে। অদূর অতীতের এই আচার্য্য-গণকে উপেক্ষা করিলে আমাদের ভবিষ্যৎ নিশ্চয়ই অন্ধকারময় হইবে।

চল্লিশ

স্বামী রামতীর্থ*

বাংলায় স্বামী বিবেকানন্দের ন্যায় পাঞ্জাবে স্বামী রামতীর্থ সুপরিচিত। স্বামী বিবেকানন্দের ন্যায় তিনিও জাপান ও আমেরিকায় যাইয়া বেদান্ত প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার ইংরাজি জীবন-চরিতের লেখক অধ্যাপক পুরাণ সিংহ বলেন,[১] "স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াই রামতীর্থ সন্ন্যাস

* "ভারতের সাধনা" নামক মাসিকে ১৩৪০ সালে ফাল্গুণ ও চৈত্র সংখ্যাদ্বয়ে প্রকাশিত।

১ The Story of Swami Ramatirtha by Puran Singh (Madras)

জীবন বরণ এবং বিদেশে বেদান্ত প্রচারে গমন করেন।” উভয়েই ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনে বেদান্ত-বাণী প্রয়োগ করিতে সচেষ্ট হন। স্বামী বিবেকানন্দই বর্তমান যুগে সর্বপ্রথম বেদান্তকে ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত মুক্তি-মন্ত্ররূপে প্রচার করেন। স্বামী রামতীর্থ তৎপদানুবর্তী। তৎপরে বালগঙ্গাধর তিলক ও অরবিন্দ ঘোষ বেদান্তের এইরূপ ভাষ্য করিলেও স্বামী বিবেকানন্দের বেদান্ত-বাণীর সহিত উঁহাদের সকলের সিদ্ধান্তগত পার্থক্য আছে।

পাশ্চাত্য বিজয়ান্তে স্বামী বিবেকানন্দ ভারতে প্রত্যাগমন করিয়া যখন ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে প্রচারার্থ লাহোরে যান তখন স্বামী রামতীর্থ স্থানীয় ফোরম্যান খ্রীষ্টান কলেজে গণিতের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি তাঁহার ছাত্রগণের সহায়তায় লাহোরে স্বামিজীর বক্তৃতার সকল আয়োজন করেন। স্বামিজী লাহোরে যাইয়া ধ্যান সিংহের হাভেলিতে অবস্থান করেন। তথায় তৎপ্রদত্ত 'বেদান্ত' শীর্ষক বক্তৃতা তাঁহার উৎকৃষ্ট বক্তৃতাবলীর অন্যতম এবং তেজস্বিতা ও বাগ্মিতায় পূর্ণ। স্বামিজীর অসামান্য বাক্‌শক্তি, জ্বলন্ত বৈরাগ্য ও ত্যাগ, প্রখর ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ ও প্রতিভাদীপ্ত মনীষায় রামতীর্থ মুগ্ধ হইয়া পড়েন। স্বামিজী সেবার গুরু গোবিন্দ সিংহের অমৃত উৎসব পরিদর্শন করেন এবং পঞ্চনদবাসীকে সিংহবিক্রম গুরুগোবিন্দ সিংহের দেশবাসী বলিয়া সম্বোধনপূর্বক সহস্র সহস্র শ্রোতাকে মাতাইয়া তুলেন। গুডউইন প্রভৃতি শিষ্যবর্গ সহ বিবেকানন্দজীকে রামতীর্থ নিজ গৃহে আমন্ত্রণ করেন।: আহারান্তে স্বামিজী 'যাঁহা কাম তাঁহা নাহি রাম, যাঁহা রাম তাঁহা নাহি কাম' এই হিন্দি গানটী ভাবের সহিত গাহিয়া সকলকে মোহিত করেন। স্বামী রামতীর্থ বলেন যে, গান গাহিতে গাহিতে স্বামিজী গানের ভাবার্থ ও স্বীয় অনুভূতি শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ে মুদ্রিত করিয়া দিলেন।

প্রস্থানের পূর্বে রামতার্থ স্বামীজীকে একটী সোনার ঘড়ি উপহার দেন। স্বামীজি উহা সানন্দে গ্রহণ করিলেন ও পরে উহা রামতীর্থের জামার পকেটে রাখিয়া বলিলেন, “আচ্ছা বন্ধু, আমি ঘড়িটী এই পকেটে ব্যবহার করিব।” স্বামীজি রামতীর্থের জীবনে এত গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন যে,

তিনি সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণে কৃতসংকল্প হন ও পরিশেষে ১৯০১ সালে ২৮ বৎসর বয়সে গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হন।

পাঞ্জাব ভক্তিমূলক বেদান্তের দেশ। তাই রামতীর্থ বেদান্তবাদী হইয়াও পরম ভক্ত ও কবি-সাধক ছিলেন। পূর্বাশ্রমে তাঁহার নাম ছিল তীর্থরাম গোস্বামী। তিনি ১৮৭৩ খ্রীঃ গুজরাণওয়ালা জেলার মুরলীওয়ালা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ভূমিষ্ঠ হইবার কয়েক দিন পরে তাঁহার মাতৃবিয়োগ হওয়ায় অগ্রজ গোস্বামী গুরুদাসের ক্রোড়ে তিনি পালিত হন। পাঠশালায় পাঠ শেষ করিয়া তিনি স্বীয় জেলার উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। এই সময়ে তাঁহার পিতা তাঁহাকে ধর্মামল নামক জনৈক অবিবাহিত শিক্ষকের নিকট রাখেন। প্রথম জীবনে ধর্মামল তাঁহাকে জীবন গঠনে কিঞ্চিৎ সাহায্য করিলেও পরে অনর্থক বহু নির্যাতন করিয়াছিলেন। তথাপি তাঁহাকে তিনি পিতার মত শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতেন ও কলেজে অধ্যয়ন কালে বৃত্তির কিয়দংশ ও উপার্জনক্ষম হইয়া আয়ের অধিকাংশ তাঁহাকে প্রদান করিতেন। তিনি ১৮৮৮ খ্রীঃ প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করিয়া লাহোরে মিশন কলেজে ভর্তি হন। কলেজে দারিদ্র্যের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে অতি কষ্টে তাঁহাকে অধ্যয়ন করিতে হইত। তাহা সত্ত্বেও তিনি প্রত্যেক পরীক্ষায় বৃত্তি লাভ করিতে করিতে যথা সময়ে এম. এ. পরীক্ষায় পাশ করেন ও মিশন কলেজে গণিতের অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

বাল্যকাল হইতে তিনি অতিশয় মেধাবী, কষ্টসহিষ্ণু, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, অমায়িক ও চরিত্রবান্ ছিলেন বলিয়া ইংরাজ অধ্যাপকগণও তাঁহাকে অতিশয় স্নেহের চক্ষে দেখিতেন এবং তাঁহাদের কেহ কেহ তাঁহাকে ছাত্রজীবনে অর্থসাহায্যও করিতেন। জ্ঞান-তৃষ্ণা তাঁহার জীবনে এত প্রবল ও তীব্র ছিল যে, অশন-বসনের পরিবর্তে তিনি তৈল কিনিতেন ও ক্ষুধা-তৃষ্ণা, শীত-গ্রীষ্ম, নিদ্রা-বিশ্রাম সমস্ত অগ্রাহ্য করিয়া সূর্যাস্ত হইতে সূর্যোদয় পর্যন্ত সমগ্র রাত্রি অবিরত অধ্যয়নে ডুবিয়া থাকিতেন। ছেলেবেলা হইতেই তাঁহাকে প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। শিক্ষাদান করিতে তিনি এত ভালবাসিতেন যে, একটি উচ্চ

সরকারী চাকুরী প্রত্যাখ্যান করেন। উচ্চ গণিত অধ্যয়ন মানসে বিলাত যাইবার জন্য তিনি সরকারের বৃত্তি প্রার্থনা করেন। কিন্তু সেবার পুণার পরাঞ্জপে সেই বৃত্তি লাভ করেন। কর্মাধিক্যে ধ্যান-ভজনের অবসরের নিমিত্ত তিনি মিশন কলেজ ত্যাগ করেন ও ওরিয়েণ্ট্যাল কলেজে সামান্য কাজের চাকুরী গ্রহণ করেন। পরে তাহা ছাড়িয়া আলিফ নামে একটি পত্রিকা (প্রেসের নাম রাখেন আনন্দ প্রেস) প্রকাশ করেন। কিন্তু সর্বশেষে তিনি ১৯০০ খ্রীঃ চিরতরে লাহোর ত্যাগ করিয়া পর্বতবাসী ও অরণ্যবাসী হইলেন এবং ১৯০১ খ্রীঃ সন্ন্যাস গ্রহন করিলেন।

চিরকাল রামতীর্থ পর্বত, অরণ্য ও নির্জনতা অত্যন্ত ভালবাসিতেন। অধ্যাপক জীবনে ছুটী পাইলেই তিনি কাশ্মীর, অমরনাথ, হরিদ্বার, হৃষীকেশ, গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী ভ্রমণে যাইতেন ও নিঃসঙ্গ হইয়া ধ্যান-ধারণায় কালযাপন করিতেন। ছেলেবেলায় তিনি শঙ্খধ্বনি শুনিতে বড় ভালবাসিতেন ও শিক্ষকের নিকট ছুটী লইয়া মন্দিরে স্তোত্রপাঠাদি শুনিতে যাইতেন। ছাত্রজীবন হইতেই তিনি মুরলী-ধারী শ্রীকৃষ্ণের একান্ত প্রেমিক ভক্ত হইয়া পড়েন। এই সময় একবার তাঁহার দিব্য দর্শনও পান। কবি সুরদাস কৃত 'সুরসাগর' পড়িতে পড়িতে তিনি সেই দর্শন পাইয়া বাহ্যজ্ঞানহীন হইয়া পড়েন। পরদিন ফণাযুক্ত একটি সাপ ঘরের মধ্যে দেখিয়া তাহার ফণার উপর শ্রীকৃষ্ণকে নৃত্য করিতে দেখেন। সমস্ত রাত্রি তিনি শ্রীকৃষ্ণের বিরহে এত কাঁদিতেন যে, তাঁহার পত্নী ভোরে উঠিয়া দেখিতেন তাঁহার সমস্ত বালিশ চোখের জলে ভিজিয়া গিয়াছে।

লাহোরে অবস্থানকালে তিনি দিবারাত্র শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় বিভোর থাকিতেন ও কৃষ্ণ-নাম শ্রবণে ভাবস্থ ও অশ্রুসিক্ত হইতেন। বাঁশির শব্দ শুনিলে তিনি উহা কৃষ্ণের মুরলী ধ্বনি মনে করিতেন। রাবী নদীর তীরে রামতীর্থ তন্ময় হইয়া বেড়াইতেন এবং আকাশে সজল জলধরের কাল বরণকে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গআভা মনে করিয়া আনন্দে নৃত্য করিতেন। "হে কৃষ্ণ, তুমি জলে স্থলে আকাশে ফুলে বাতাসে আছ। তুমি আমায় দর্শন দাও"—এইরূপ তীব্র ব্যাকুল প্রার্থনায় 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলিতে বলিতে তিনি বাহ্যজ্ঞান হারাইতেন। তাঁহার কৃষ্ণোন্মত্ততা দেখিয়া

জনৈক বন্ধু বলেন, "স্বামিজী, কৃষ্ণ তো তোমার হৃদয়ে রহিয়াছে। তুমি অন্যত্র কোথায় তাঁহাকে খুঁজিতেছ ?" তৎশ্রবণে তিনি নিজের জামা ছিঁড়িয়া নখ দ্বারা বুক ছিঁড়িতে আরম্ভ করেন এবং তদবস্থায় অজ্ঞান হইয়া পড়েন। তাঁহার শিষ্য স্বামী নারায়ণ তাঁহাকে একদিন বলিতে শোনেন যে, "আহা! আজ তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) দর্শন পাইলাম। আমার স্নান করিবার কালে তিনি আসিয়া আমাকে পূর্ণ দর্শন দিলেন।"

স্বামী রামতীর্থের একনিষ্ঠতা, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও একাগ্রতার বিষয়ে ছাত্রজীবনের একটা সুন্দর গল্প আছে। গণিতে তাঁহার অতিশয় অনুরাগ ছিল। একদিন রাত্রে উচ্চ গণিতের কয়েকটি গভীর ও জটিল প্রশ্নের সমাধান সূর্যোদয়ের পূর্বে করিবার জন্য পণ করিলেন এবং তাহা না পারিলে নিজের মস্তক ছেদন করিবেন বলিয়া একটা ধারালো ছোরা বিছানায় রাখিয়া দিলেন। রাত্রি শেষ না হইতেই প্রায় সবগুলি প্রশ্নের জবাব মিলিল; কিন্তু একটার সমাধান আর কিছুতেই হইল না। তরুণ রবি কিরণ জানালার ভিতর দিয়া গৃহে প্রবেশ করিল। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ তীর্থরাম সত্যপালন করিবার জন্য ছোরা লইয়া যেই উহা গলায় বসাইতে আরম্ভ করিলেন, তৎক্ষণাৎ গলায় রক্তপাত হওয়ায় সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িলেন ও তদবস্থায় সেই প্রশ্নের সমাধান মানস পটে জ্যোতির অক্ষরে লিখিত দেখিলেন। তৎপরে তিনি তাহা লিখিয়া রাখেন। এই সমাধান এত মৌলিক হইয়াছিল যে, গভর্ণমেণ্ট কলেজের অধ্যাপক মুখার্জী তাহাতে অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হইয়া যান।

তীর্থরাম ছাত্রজীবনে অতি অল্পবয়সে দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার কয়েকটি সন্তানও হইয়াছিল। সন্ন্যাসী হইয়া রামতীর্থ কেদারবদরী প্রভৃতি দুর্গম তীর্থ পর্যটন করেন। তিনি গাড়োয়ালে (Tehri Garhwal) প্রায়ই থাকিতেন। তিনি চিরতুষার পাহাড় চড়াই করিতেন, কখন বা তমসাচ্ছন্ন পর্বতগহ্বরে ধ্যাননিমগ্ন হইতেন। তাঁহার কাগজ, কলম, পেন্সিল, দোয়াত প্রভৃতিকে তিনি জীবন্ত মনে করিয়া স্নেহপূর্ণ নামে ডাকিতেন, শিশুর মত তাহাদের সহিত কথা বলিতেন। তিনি গঙ্গাতীরে আপন মনে বসিয়া এত

বিভোর হইয়া থাকিতেন যে, আনন্দাশ্রুতে তাঁহার বক্ষ ভিজিয়া যাইত। এইরূপে তিনি অজ্ঞাতসারে বহুদিন অনাহারে কাটাইতেন। তিনি হাসি ও আনন্দের প্রতিমূর্তি ছিলেন। যে তিন বৎসর তিনি হিমালয়ে বাস করিয়াছিলেন, মাতৃক্রোড়ে শিশুর ন্যায় প্রকৃতির সহিত একত্বানুভব করিয়া থাকিতেন। তিনি অদ্বৈত ভাবাবেশে বলিতেন, "সমস্ত প্রকৃতি আমার শরীর, নদীগুলি আমার শিরা ও পাহাড়গুলি আমার অস্থি। আমি শিব, মালাবার ও করোমণ্ডল উপকূল আমার দুইটি পা, রাজপুতানার মরুভূমি আমার বুক, বিন্ধ্যাচল আমার কটিবন্ধ। আমি পূর্ব-পশ্চিমে হাত বিস্তার করিয়া আছি। হিমালয় আমার জটাজুটধারী মস্তক, তাহার মধ্য দিয়া গঙ্গা বহিয়া যাইতেছে। আমি ভারতবর্ষ, আমি পক্ষী, পত্রও মানব। আমি ঈশ্বর।"

টেহেরীর মহারাজা তাঁহার অনুরক্ত ভক্ত ও সেবক ছিলেন। তাঁহারই অনুরোধে ও সহায়তায় তিনি জাপানে বিশ্বধর্মসভায় যোগ দিবার জন্য ১৯০২ খ্রীঃ যাত্রা করেন; সঙ্গে শিষ্য স্বামী নারায়ণ ছিলেন। কিন্তু জাপানে সেই ধর্মসভা হয় নাই, তাই তিনি জাপান হইতে আমেরিকায় যান। বিখ্যাত জাপানী পণ্ডিত ওকাকুরা এইরূপ একটি সভা আহ্বান করিবার মানসে কলিকাতায় আসিয়া ভগ্নী নিবেদিতার সহিত পরামর্শ করেন * ও স্বামী বিবেকানন্দকে সভাপতি করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ওকাকুরা স্বামীজির সহিত সেবার বুদ্ধগয়া ও কাশীধাম বেড়াইয়া আসেন। কিন্তু দৈবক্রমে ১৯০২ খ্রীঃ জুলাই মাসে স্বামীজির শরীর ত্যাগ হওয়ায় ওকাকুরা সেই সংকল্প পরিত্যাগ করেন।

১৯০১ সালে রামতীর্থ পাহাড় হইতে মথুরায় নামিয়া আসেন এবং তথায় স্বামী শিবগুণ আচার্য যে ক্ষুদ্র বিশ্বধর্ম সভা আহ্বান করেন তাহার দুইটি অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন। তাঁহার জাপান যাত্রা হয় তাহার পরে। "ওঁ পূর্ণমদঃ

---

* ভগিনী নিবেদিতা ওকাকুরার সহিত অজন্তা দর্শন করেন। ওকাকুরা উক্ত দর্শনে প্রীত হইয়া ভারত ও জাপানের মধ্যে শিল্পকলা, দর্শন ও সাহিত্যাদি আদান প্রদানার্থ সাংস্কৃতিক সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা করেন। তাঁহার প্রসিদ্ধ "Ideals of the East" নামক পুস্তকের একটী সুন্দর ভূমিকা ভগিনী নিবেদিতা কর্তৃক লিখিত।

পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে, পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে”—উপনিষদের এই মহামন্ত্র গান করিতে করিতে রামতীর্থ জাপানে উপস্থিত হন। প্রথমে তিনি এক বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি বক্তৃতা দেন। তাহাতে তাঁহার খুব সুনাম হইয়া যায়। টোকিও রাজকীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসিদ্ধ প্রাচ্যতত্ত্ববিৎ সংস্কৃতজ্ঞ অধ্যাপক তাহা শুনিয়া বলেন, “ইংলণ্ডে মোক্ষমূলরের বাড়ীতে ও অন্যত্র আমি বহু পণ্ডিত ও দার্শনিকের সঙ্গলাভ করিয়াছি। কিন্তু রামতীর্থের মত এমন মহাপুরুষ দেখি নাই, তাঁহার দর্শনের তিনিই মূর্তিমান্ বিগ্রহ। তাঁহার ভিতর বেদান্ত ও বৌদ্ধধর্ম মিলিত হইয়াছে। তিনি প্রকৃতই দার্শনিক ও সুকবি।” জাপানে স্বামী রামতীর্থ আরো কয়েকটি বক্তৃতা দেন।

স্বামী রামতীর্থ বালকের মত অতি শিশুস্বভাব ও সরল প্রকৃতির সাধু ছিলেন। জাপানে একপ্রকার ছাতা পাওয়া যায়, তাহাকে কখনও লাঠি, কখনও বসিবার আসনরূপে ব্যবহার করা যায়। তাহার একটি তিনি ক্রয় করেন এবং খেলনার মত তাহা লইয়া খুব আনন্দ করিতেন। জাপানে মাত্র দুই সপ্তাহ থাকিয়া পুণার প্রোফেসার চিত্রের সার্কাসের সহিত তিনি আমেরিকা যাত্রা করেন। জাপানে তিনি সিদ্ধির কৌশল (Secret of Success) নামক একটি সুন্দর উপদেশপূর্ণ বক্তৃতা দেন। কর্ম, আত্মত্যাগ, আত্মবিস্মৃতি, বিশ্বপ্রেম, প্রফুল্লতা, নির্ভীকতা, আত্মবিশ্বাসই তাঁহার মতে সিদ্ধিলাভের একমাত্র উপায়। আত্মবিস্মৃতির একটি সুন্দর গল্প তিনি বলিতেন। দুইটি রাজপুত একবার মোগলসম্রাট আকবরের নিকট চাকুরী প্রার্থনা করেন। ‘তোমরা কি বিষয়ে অভিজ্ঞ?’—এই প্রশ্ন করিলে তাহারা তাহাদের উজ্জ্বল দুইটি বিদ্যুৎপ্রভ তরোয়াল কোষ হইতে নিষ্কাসিত করিয়া ধরেন। আকবর তাহাদের বীরত্ব প্রকাশ করিতে আদেশ করিলে উভয়ে উভয়ের চক্ষে তাহা প্রবেশ করাইয়া দেন ও মৃত্যু আলিঙ্গন করেন। তিনি বলেন, এইরূপ আত্মবিস্মৃত না হইলে সিদ্ধি করতলগত হয় না। আত্মনির্ভরতা সম্বন্ধে এই গল্পটি তিনি বলিতেন। দুই ভাই পিতার অতুল সম্পত্তি অংশ করিয়া লয় ও পরে একটা উচ্ছন্ন যায়, অপরটী কুবেরসম সমৃদ্ধ হইয়া উঠে। তাহার উন্নতির কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলে,

"আমি চাকরদের সর্বদা বলিতাম, 'এস, এস', আর আমার ভাই বলিতেন 'যাও, যাও'। অর্থাৎ আমি স্বয়ং কর্মক্ষেত্রে থাকিয়া চাকরদের দ্বারা কাজ করাইয়া লইতাম; আর আমার ভাই নিজে বিছানায় শুইয়া তাহাদের কর্মে যাইতে আদেশ করিতেন।" রামতীর্থ বলেন, আত্মবিশ্বাসী ও কর্মঠ হইলে কর্মে সিদ্ধ হওয়া যায়।

আমেরিকার সানফ্রান্‌সিস্‌কো বন্দরে জাহাজ থামিলে তিনি অবতরণ করিলেন; কিন্তু তাঁহার সঙ্গে কোন মালপত্র ছিল না। তাঁহাকে এইরূপ অবস্থায় সদানন্দ দেখিয়া জনৈক উৎসুক আমেরিকান জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, আপনার মালপত্র কই ?" "আমার শরীরে যাহা আছে তাহা ছাড়া আমার কোন মালপত্র নাই,"—উত্তর হইল। "আপনি টাকাকড়ি কোথায় রাখেন ?" "আমার সঙ্গে কোন অর্থ নাই।" "তবে আপনি কিরূপে বাঁচিয়া থাকেন!" "আমি সকলকে ভালবাসিয়া জীবন ধারণ করি। যখন আমি পিপাসার্ত বা ক্ষুধার্ত হই তখন কেহ না কেহ আমাকে জল ও আহার প্রদান করেন।" "কিন্তু আপনার কোন বন্ধু আমেরিকায় নাই ?" "আপনিই একমাত্র আমার বিশ্বাসী আমেরিকান বন্ধু,"—এই বলিয়া রামতীর্থ তাঁহাকে এমন প্রেমালিঙ্গন দিলেন যে, সেই অপরিচিত মার্কিন তাঁহার চিরবন্ধু হইয়া উঠিলেন।

জনৈক বৃদ্ধা মার্কিন মহিলা স্বামী রামতীর্থের সহিত দেখা করেন ও তাঁহার পারিবারিক দুঃখকষ্টের বর্ণনা করিতে করিতে কাঁদিতে থাকেন। তিনি মহিলার সম্মুখে আসনবদ্ধ হইয়া ধ্যানস্তিমিত লোচনে উপবিষ্ট ছিলেন। ভদ্রমহিলা রামতীর্থকে তাঁহার হৃদয়-বিদারক ক্রন্দন সত্ত্বেও নিশ্চল প্রস্তরবৎ উপবিষ্ট দেখিয়া ও তাঁহার নিকট হইতে কোন সমবেদনাব্যঞ্জক কথা বা করুণ দৃষ্টি না পাইয়া ক্রোধে বলিয়া উঠেন, "বাস্তবিকই ভারতবাসীরা অত্যন্ত অসভ্য ও গর্বিত!" ইহাতে রামতীর্থ প্রেমপূর্ণ আরক্ত লোচনে তাঁহাকে 'মা' নামে সম্বোধন করিয়া তাঁহার চিরাভ্যস্ত 'ওঁ' উচ্চারণ করিতে থাকেন। তখন সেই ভদ্র মহিলার জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত হইল এবং তিনি অভিনব আনন্দ-রাজ্যে

উন্নীত হইলেন। তিনি যেন জ্যোতির্ময় শরীরে আকাশে বিচরণ করিতে লাগিলেন এবং নিজেকে জগতের 'মা'রূপে অনুভব করিলেন। তাঁহার সমস্ত দুঃখ তিরোহিত হইল ও তিনি আনন্দে পরিপূর্ণ হইলেন। সেই দিন হইতে তিনি সর্বদা 'ওঁ' উচ্চারণ করিতেন ও নিজেকে 'মা' ভাবিলেই এক দৈবী শক্তি অনুভব করিতেন। এই মহিলা ভারত-তীর্থে পর্যটন করিতে আসিয়া ছিলেন।

স্বামী রামতীর্থের আনন্দ যেন সংক্রামক ছিল। সর্বদা জাগ্রতে ও স্বপ্নে 'ওঁ' জপ তাঁহার স্বভাবের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। ওঁকার গানের আনন্দে তিনি যেন সদা মাতিয়া থাকিতেন এবং যিনি তাঁহার নিকট গিয়াছেন উহা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন ও আনন্দলাভ করিয়াছেন। দেব-সংগীতের ন্যায় উহা অতিশয় সুমিষ্ট এবং আনন্দ ও শান্তির আকর ছিল। জাপানে ট্রামে যাইতে যাইতে তিনি ওঁকার গান করিতেন এবং লোকে তাহা শুনিয়া বিমুগ্ধ হইত। আমেরিকায় কোন স্বাস্থ্যাবাসের নিকট অবস্থানকালে বহু রোগী তাঁহার সেই ওঁকার গান শুনিয়া নীরোগ ও পূর্ণস্বাস্থ্য লাভ করিয়া ছিলেন।

ডাঃ হিলারের অতিথিরূপে শাস্তা স্প্রিং এ অবস্থানকালে তিনি আমেরিকার সাধারণ কুলীর মত দৈহিক পরিশ্রম করিতেন ও জঙ্গল হইতে কাঠ কাটিয়া আনিয়া গৃহপতির জ্বালানী কাষ্ঠ সরবরাহ করিতেন। একবার তিনি উচ্চ শাস্তা পাহাড়ে* আরোহণ করিয়া বহু প্রতিযোগী আমেরিকানকে পরাস্ত করিয়া প্রথম হন। ইহার জন্য পুরস্কার প্রদত্ত হইলে তিনি তাহা গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হন। আর একবার ম্যারাথন দৌড়-প্রতিযোগিতায় ত্রিশ মাইল দৌড়াইয়া তিনি সর্বপ্রথম হন। কিন্তু লাহোরে যখন ছাত্র বা অধ্যাপক ছিলেন তখন তাঁহার স্বাস্থ্য অতিশয় রুগ্ন ও দুর্বল ছিল। কেবল প্রবল ইচ্ছা শক্তির জোরে পরে তিনি স্বাস্থ্যলাভ করেন। রামতীর্থ পাখীর মত স্বাধীন আনন্দে থাকিতেন।

---

* উহা প্রায় দুর্লঙ্ঘ্য ও উচ্চতায় ১৪৫০০ ফিট ছিল। রামকৃষ্ণ-শিষ্য স্বামী অভেদানন্দও আমেরিকার একটি উচ্চতম পাহাড় চড়াই করিয়াছিলেন।

আমেরিকায় স্বামী রামতীর্থ বেদান্ত ও ভারত সম্বন্ধে বহু বক্তৃতা প্রদান করেন। ভারতের পরাধীনতা দূর করিবার জন্য তিনি তথায় একটি সমিতি স্থাপন করিয়াছিলেন। যে দুই বৎসর তিনি আমেরিকায় প্রবাসী ছিলেন, কেবল উপদেশ ও বক্তৃতা দিয়া বেড়াইতেন এবং অবশিষ্ট সময় পাহাড়ে নির্জন আনন্দে প্রকৃতির একটি শিশুর মত প্রকৃতিতে লীন হইয়া থাকিতেন। লালা হরদয়াল এম. এ. আমেরিকা হইতে 'মডার্ণ রিভিউ' পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন যে, বহু কালিফোর্ণিয়াবাসী তাঁহার নিকট নূতন জীবন লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে বহু লোকে উন্নত হিন্দুযোগী ও প্রাজ্ঞ সন্ন্যাসীরূপে শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন।

জনৈক মহিলা স্বীয় অন্তরের দুঃখ প্রকাশ করিয়া তাঁহার নিকট হইতে শান্তি ভিক্ষা করেন এবং তৎপরিবর্তে কি মূল্য দিতে হইবে জানিতে চাহেন। তিনি বলেন, "আনন্দের রাজ্যে তোমার মার্কিন ডলার চলে না। তোমাকে সেই দেশের মুদ্রা দিতে হইবে।" তিনি স্বীকৃত হইলে রামতীর্থ তাঁহাকে একটি নিগ্রো শিশু দেখাইয়া বলেন, "ইহাকে লইয়া সন্তানবৎ প্রতিপালন কর।" ভদ্রমহিলা নিগ্রোদের প্রতি জাতীয় ঘৃণাপ্রযুক্ত স্বভাবে উত্তর করিলেন, "অসম্ভব।" তখন তিনি বলিলেন, "তবে শান্তিলাভ তদপেক্ষা কষ্টকর।" কিন্তু পরে তিনি মহিলার অশান্ত চিত্তকে তাঁহার অমানুষিক প্রেমপ্রবণ শক্তি দ্বারা চিরশান্ত করিয়া দেন।

আমেরিকায় তিনি যে সব বক্তৃতা প্রদান করেন তৎসমুদয় তাঁহার অনুগত শিষ্যা সাঙ্কেতিক লেখনবিৎ পি. হুইটম্যান † নামক ভদ্রমহিলা লিখিয়া রাখিতেন। তৎসমুদয় চারখণ্ডে * তৎশিষ্য স্বামী নারায়ণ কর্তৃক লক্ষ্ণৌ Swami Rama Tirtha Publication League হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। বহু লোকে তাঁহার বক্তৃতায় ভারতের অবস্থার কথা শুনিয়া ভারতের সেবা করিতে আসিবার জন্য সংকল্প করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কেহই

---

* বইর নাম "In Woods of God-realisation."

† তাঁহাকে তিনি 'কমলানন্দ' নাম দিয়াছিলেন। তিনি পরে ভারতে আসিয়াছিলেন।

আসেন নাই। মার্কিন সাধু থোরো * সত্যই বলিয়াছেন যে, "লক্ষ লক্ষ লোকে শারীরিক পরিশ্রম ও বীরত্ব বরণ করে। কিন্তু লক্ষের মধ্যে একটিও আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য অসীম সাহসিকতা আলিঙ্গন করিতে পারে না।" স্বামী রামতীর্থ সর্বদা প্রেমে ও আনন্দে শরীরবোধশূন্য হইয়া অদ্বৈত জ্ঞানে সমাহিত থাকিতেন। তিনি ভাগবত আবেশে গাহিতেন, "সূর্য্য আমার ছবি, মানুষ আমার প্রতিরূপ, তারকামণ্ডল আমার চক্ষের পলক, সুবাসিত কুসুমরাশিই আমার হাসি, নাইটিংগেল পাখী আমার গান, বিশ্বপ্রাণ আমার নিঃশ্বাস, শীতের রাত্রির শিশিরপাত আমার অশ্রু, বহমান নদী আমার গতি, রামধনু আমার ধনুক, এবং জ্যোতি-রাশিতে আমি বাস করি।"

সানফ্রান্‌সিস্‌কোতে বক্তৃতা প্রদান কালে তিনি যখন গর্জিয়া উঠিতেন, "আমিই ঈশ্বর" তখন অনর্গল আনন্দাশ্রুতে তাঁহার বুক ভাসিয়া যাইত, দৈব জ্যোতিতে তাঁহার মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত, বাহুযুগল বিস্তার করিয়া যেন সমস্ত জগৎকে তিনি আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইতেন। সাধারণ সমক্ষে বক্তৃতাকালেও তিনি ভগবান কৃষ্ণের একবার মাত্র নাম শ্রবণে অশ্রুবিসর্জন করিতেন। হরিদ্বারে অবস্থানকালে তিনি একবার কদম্ববৃক্ষমূলে শ্রীকৃষ্ণের দর্শনলাভ করিয়াছিলেন এবং গঙ্গাস্নানকালে তাঁহার বংশীধ্বনি শ্রবণে উন্মত্তবৎ বিচরণ করিতেন। বশিষ্ঠাশ্রমে তিনি কৃষ্ণ-বিরহে আকুলভাবে কাঁদিতেন।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্ববিখ্যাত দর্শনাধ্যাপক উইলিয়ম জেম্‌স (William James) তাঁহার প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়াছিলেন। তিনি স্বামী রামতীর্থের সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, 'ইনি আধ্যাত্মিক রাজ্যের এক অতুল প্রতিভাবান্ মহাপুরুষ, এবং সদা দেহজ্ঞানশূন্য হইয়া উচ্চভাবের রাজ্যে বসবাস করেন।' ১৯০৫ খ্রীঃ তিনি আমেরিকা হইতে প্রত্যাগত হন এবং তেত্রিশ বৎসর বয়সে ১৯০৬ খ্রীঃ দেহত্যাগ করেন।

তাঁহার সেক্রেটারী মিস্ টেলার যখন তাঁহাকে সান্‌ফ্রান্‌সিসকো সহরের গ্রেট

---

* তাঁহার পুস্তকের নাম Walden

প্যাসিফিক রেলরোড কোম্পানীর ম্যানেজারের নিকট কম মূল্যে একখানি টিকিট কিনিতে লইয়া যান, তখন তিনি বলেন, "তাঁহার হাসি এত মধুর ও আনন্দদায়ক যে তাঁহাকে আমি একখানি পুলম্যান গাড়ী বিনা ভাড়ায় দিতে পারি।" পুরাণ সিংহ যখন টোকিওতে তাঁহাকে ব্যারন নাইবো কান্তোর নিকট লইয়া যান তখন বাক্যালাপের মধ্যভাগে তিনি উঠিয়া তাঁহার স্ত্রী ও ছেলেদের সাগ্রহে ডাকিয়া আনিয়া বলেন, "স্বামীজির সঙ্গলাভে এত আনন্দ ও শান্তি পাওয়া যায় যে, আমি একলা তাহা ভোগ করিতে ইচ্ছা করি না।" নাইবো তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি সংসার ত্যাগ করিলেন কেন? তিনি বলিলেন জগৎজোড়া এক সুবৃহৎ প্রেমবদ্ধ পরিবার অন্বেষণ করিতেই আমি গৃহত্যাগ করিয়াছি।

স্বামী রামতীর্থ অতিশয় সুরসিক ছিলেন এবং নানা শব্দের অদ্ভুত অদ্ভুত অর্থ করিতেন। তিনি বলিতেন, আমার নাম রাম টিরথ। I অর্থাৎ আমি হচ্ছে মানুষের অহংরূপ অজ্ঞানান্ধকার। I তুলিয়া দিলে সত্যলাভ হয়, টিরথ এর I তুলিয়া দিলে হয় রাম ট্রথ অর্থাৎ রামই সত্য। তিনি বলিতেন, disease দূর করিতে হইলে Dis ছাড়িয়া at ease হও, অর্থাৎ আনন্দে ঈশ্বরে বিচরণ কর—তাহাই প্রকৃত সুখ। Holy হইতে হইলে whole হইতে হইবে, অর্থাৎ পূর্ণ বা অনন্ত হইতে হইবে। কারণ একমাত্র তিনিই পবিত্র। Atonement অর্থে আর কিছু নয়, at-one-ment, অর্থাৎ ঈশ্বরের সহিত এক হও। Understanding মানে standing under, অর্থাৎ আত্মার সঙ্গে বাস কর, তাহা হইলে প্রকৃত জ্ঞান হইবে। Swami মানে So am I, অর্থাৎ আমি সেই। Om অর্থে oh am অর্থাৎ আমিই সেই। তিনি বলিতেন, ঈশ্বর Mr., Miss. অথবা Mrs. নহেন। তিনি Mystery। 'হিন্দু' কথা তাঁহার কর্ণে যেন কঠিন শ্রুত হইত। তিনি হিন্দুর 'হ' তুলিয়া দিয়া বলিতেন, হিন্দু নয়, ইন্দু অর্থাৎ পূর্ণচন্দ্র। রমজানের পরে মুসলমানদের ঈদ্ উৎসব হয়। মহম্মদ উক্ত দিনে অন্তরের চাঁদ দেখিয়াছিলেন। তাই মুসলমানেরা মহম্মদের সেই শুভদিন স্মরণ করিয়া বাহিরের চাঁদ দেখে। তিনি বলেন, ভিতরের চাঁদ না দেখিলে বাহিরের চাঁদ দেখিয়া কি লাভ?

লাহোরে অধ্যাপনা-সময়ে তিনি তাঁহার ঘড়ির সহিত খেলা করিতেন। যে কেহ সময় জানিতে চাহিলে তিনি বলিতেন, "বন্ধু, সবে একটা বাজিয়াছে।" বিভিন্ন সময়ে একই উত্তর পাইয়া ছাত্ররা অনুসন্ধান করিতেন, কিরূপে উহা সম্ভব? তিনি বলিতেন, "ভাই, আমার ঘড়িতে সব সময় একটা বাজিয়া আছে। কালমাত্র এক।" তিনি পূর্বাশ্রমে, কি সন্ন্যাস জীবনে কখনো 'আমি' শব্দ ব্যবহার করিতেন না। বলিতেন, 'রাম বলছে', 'রাম শুন্‌ছে' ইত্যাদি। ঈশ্বরার্থে রাম শব্দ প্রয়োগ করিতেন এবং পত্র লিখিবার সময় বা বক্তৃতার সময় তিনি শ্রোতৃবর্গকে উপস্থিত নরনারীরূপে—'হে আনন্দময় আত্মা,' বা 'হে চিরসুখী রাম' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। আমেরিকায় দেনভারে বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছিলেন, "প্রত্যেক দিনই নিউইয়ারস্ ডে (বৎসরের প্রথম দিন), প্রত্যেক রাত্রিই এক্‌সমাস নাইট (বড় দিনের রাত্রি)। নিজেকে রাম বাদ্‌শা বলিয়া আনন্দমূর্তি বালকের ন্যায় তিনি বিশ্বাস করিতেন। পোর্ট সৈয়দে তিনি লর্ড কার্জনের সহিত এক জাহাজে চড়িতে অস্বীকার করেন। এক জাহাজে দুইজন রাজা যাইতে পারে না বলিয়া তিনি অন্য জাহাজে উঠেন।

জাহাজে আমেরিকানগণ তাঁহাকে আমেরিকাবাসী ও জাপানীরা তাঁহাকে জাপানবাসী বলিয়া মনে করিতেন। ভারতাভিমুখে আসার সময় তিনি মিশরের কোন মসজিদে ফার্শি ভাষায় এক বক্তৃতা দিয়া সকলকে মুগ্ধ করেন। ওস্তাদের হাতে বেহালার কম্পমান তারের মত তাঁহার শরীরের প্রত্যেক কণা সদা আনন্দময় হাসিতে নৃত্য করিত। লাহোরের তীব্র গ্রীষ্মে যখন তিনি ফুটপাথের উপর দিয়া চলিতেন লোকে তাঁহার পাদ স্পর্শ করিয়া দেখিত, উহা বরফের মত ঠাণ্ডা।[১] কারণ জানিতে চাহিলে তিনি বলিতেন, "আমি তো

১। উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব যখন ইংলণ্ডে যান তখন তাঁহার সঙ্গে একটি লোটা মাত্র সম্বল ছিল। জনৈক সহযাত্রী এই চকচকে লোটার প্রতি লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করায় তিনি তাহাকে উহা সানন্দে প্রদান করিয়া নিঃসম্বল যাত্রা করেন। কথিত আছে যে, তিনি লণ্ডনের টেম্‌স নদীর বরফের মত ঠাণ্ডা জলে প্রত্যহ স্নান করিতেন ও বিলাসভূমি লণ্ডনেও কঠোর সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করিতেন।

গরম লাহোরের পথে চলিতেছি না। আমি যেখানেই চলি ভগবতী গঙ্গার শীতল তরঙ্গ আমার পদ ধৌত করিয়া দেয়। তুমি কি দেখ না, ব্রহ্মময়ী গঙ্গা সর্বত্র বহিতেছে?" আমেরিকা হইতে প্রত্যাগমন করিয়া রামতীর্থ দার্জিলিং পাহাড়ে কিছুকাল বাস করেন। পরে মথুরায়, পুষ্করে ও শেষে হরিদ্বারে শেষ জীবন অতিবাহিত করেন। একদিন খরস্রোতা গঙ্গায় স্নান করিতে যাইলে তাঁহার পা পিছ্‌লাইয়া যায় এবং তিনি ভাবের ঘোরে থাকিতেন বলিয়া আত্মরক্ষা করিতে অসমর্থ হন ও গঙ্গায় ডুবিয়া প্রাণত্যাগ করেন। জীবনের শেষ দিকে তাঁহার হাসি ও আনন্দ হ্রাস-প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং তিনি যেন বিষাদগ্রস্ত হইয়াছিলেন।

লাহোরে মিশন কলেজে ও ওরিয়েণ্ট্যাল কলেজে তাঁহার ক্লাসের প্রত্যেক ছাত্রকে তিনি সম্বোধন করিতেন, "হে প্রিয়তম কৃষ্ণ, তুমিই সব। আমি তোমাকে কি শিখাইব?" কোন ছাত্র অজ্ঞতা নিবেদন করিলে তিনি বলিতেন, "হে প্রেমাস্পদ কৃষ্ণ, তুমি নিশ্চয়ই সব জান।" উহাতে অদ্ভুত ফল ফলিত। অজ্ঞ ছাত্রও সাহসভরে বোর্ডের নিকট জটিল প্রশ্নের সমাধান করিয়া দিত। মিশন কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ডাঃ ইউইং সাহেবকে তিনি বলিতেন, "সাহেব, তুমি জীশুকে পূজা কর, তুমি তাঁহার আঁখি দুইটি দেখিয়াছ কি? না নিশ্চয়ই দেখ নাই। এই দেখ, ঈশ্বর তোমার সম্মুখে দণ্ডায়মান।" এইরূপে তিনি ঈশ্বরোন্মত্ত হইয়াছিলেন অধ্যাপক জীবনেও।

মথুরায় যখন পুরাণ সিংহ তাঁহার সহিত দেখা করেন তিনি বলেন, "দেখ একমাত্র ত্যাগের দ্বারাই ভারতের স্বাধীনতা লাভ হইবে। পুরাণ সিংহ শুনিয়া চমকিত হইলেন; কারণ জাপানে তাঁহার নিকট তিনি ধর্মের কথা ব্যতীত কখনও দেশের কথা শোনেন নাই। তিনি ভাবিলেন, নানা স্বাধীন দেশ ভ্রমণ করিয়া হয়ত স্বামীজির মত পরিবর্তিত হইয়া থাকিবে। পরক্ষণে দুইটি ভদ্রলোক তাঁহার দর্শনাভিলাষী হইয়া আসিলেন। অভিবাদনান্তর তাঁহারা উপবিষ্ট হইলে প্রতিনমস্কার করিয়া স্বামী রামতীর্থ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তোমরা রামের খোঁজ নিতে আসিয়াছ। রাম তাহার হৃদয় তোমাদের

নিকট উন্মুক্ত করিয়া দিতেছে। তাঁহাকেই অন্বেষণ কর। জগৎ তোমাদের পদানত হইবে।" তাহাতে ভদ্রলোক দুইটি অতিশয় লজ্জিত হইয়া তাঁহার পায়ে ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনান্তে বলিলেন, "স্বামীজি আমাদের ক্ষমা করুন, আমরা পাপী। আমরা আপনার ভালবাসায় পরাজিত। কি করিব, পেটের দায়ে আমরা এই সব করি।" তাঁহারা গভর্ণমেণ্টের সি. আই. ডি. পুলিশ ছিলেন।

আজমীরে পুষ্কর হ্রদের উপর তিনি কিষণগড় স্টেটের বাড়ীতে থাকিতেন। তখন একেবারে নিঃসম্বল ছিলেন, সঙ্গে একটি ফাঁপা বংশখণ্ড ছিল ও তাহার ভিতর কাগজ, পেনসিল রাখিতেন। বন্ধুদের উহা দেখাইয়া বলিতেন, "এ বাঁশখানি রামের যাদু। এ দিয়ে স্নানকালে রাম হ্রদের কুম্ভীর তাড়ায়। আর এটি রামের পোটম্যাণ্টো, এর ভিতর রামের সমস্ত সম্পত্তি থাকে।" নিঃসম্বল কৌপীনবন্ত সাধু সত্যই রাজা, একমাত্র তিনিই চিরসুখী। কি শীত, কি গ্রীষ্ম, অধিকাংশ সময়েই তিনি ছাদের উপর থাকিতেন। বলিতেন, রাম গৃহ পছন্দ করে না, সেগুলি যেন তাহার কাছে গোরস্থান মনে হয়।

ভারতের তীর্থস্থানসমূহের মধ্যে একমাত্র পুষ্করে ব্রহ্মার মন্দির আছে। কথিত আছে, এখানে ব্রহ্মা ব্রহ্মযজ্ঞ করিয়াছিলেন। স্বামী রামতীর্থ পুরাণ সিংহ প্রভৃতি বন্ধুভক্তদের পবিত্র যজ্ঞভূমি দেখাইতে লইয়া যান ও যজ্ঞের উপাখ্যান বিবৃত করেন। এইরূপ প্রবাদ ছিল যে, যজ্ঞে পূর্ণ সিদ্ধি হইলে শঙ্খধ্বনি শ্রুত হইবে। দেবতা ও মানুষ সকলে যজ্ঞ করিতেছেন, কিন্তু কিছুতে আর শঙ্খধ্বনি হয় না। এদিকে একটি নিম্নজাতীয় ঘেসেড়ার হৃদয়ে প্রকৃত ব্রহ্মযজ্ঞ চলিতেছিল। সে ঈশ্বরচিন্তায় এত অভিভূত হইয়াছিল যে, ঘাস কাটিতে কাটিতে নিজের আঙ্গুল কাটিয়া ফেলিল; কিন্তু মানুষের রক্তসদৃশ লালরক্ত বহির্গত না হইয়া ঘাসের রক্তহীন রস বাহির হইল। এই আঘাত পাইয়া সে দিব্যোন্মত্ততায় নৃত্য করিতে লাগিল ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়, বৃক্ষলতাও নাচিতে লাগিল। তখন যজ্ঞকর্তা আসিয়া করজোড়ে তাহাকে যজ্ঞের নিকট লইয়া গেলেন। তৎক্ষণেই তথায় শঙ্খ-ধ্বনি শোনা গেল। স্বামী রামতীর্থ বলিলেন, ইহাই প্রকৃত বেদান্ত।

স্বামী বিবেকানন্দের ন্যায় তিনি তাঁহার পত্রাবলীর ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার বহু বক্তৃতা অতি সারগর্ভ, বাগ্মিতাপূর্ণ ও উন্মাদনাকারী। বৈজনাথ রায়ের Hinduism : Ancient and Modern নামক পুস্তকের একটী অতি সুন্দর উপক্রমণিকা তিনি লিখিয়া দিয়াছেন। ভারতে আসিয়া তিনি নানা স্থানে বক্তৃতা ও উপদেশ দিতে এবং নানা সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লিখিতে নিযুক্ত থাকিতেন। তিনি ওমর খায়েম, হাফিজ প্রভৃতি পারস্য-কবিদের সহিত অধিকতর পরিচিত ছিলেন ও ওয়াল্ট হুইটম্যান, কোলেরিজ, শেলী, জর্জ রাসেল, কাণ্ট প্রভৃতি উত্তমরূপে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

হৃষীকেশের কিছু উপরে বদরীনারায়ণের পথে গঙ্গাতীরে ব্যাস আশ্রমে তিনি কিছু কাল ছিলেন। তখন তিনি লম্বা দাড়ি রাখিতেন এবং সমাগত দর্শনার্থীদের বলিতেন, "দেখ, ব্যাসদেবের মত আমার কেমন দাড়ি হয়েছে।" এলাহাবাদ ও কাশীধামে বেদান্তের বক্তৃতা দিবার সময় পণ্ডিতেরা তাঁহাকে চ্যালেঞ্জ করেন যে, তিনি সংস্কৃত না জানিয়া ও বেদান্তের মূল গ্রন্থ না পড়িয়া কিরূপে বেদান্ত বিষয়ে বলিতে পারেন! ইহাতে তিনি মর্মাহত হন; কারণ তিনি সত্যই সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ ছিলেন। তখন হইতে ক্রমে ক্রমে তাঁহার সেই আনন্দময় হাসি হ্রাসপ্রাপ্ত হইল এবং তিনি বিষণ্ণচিত্ত হইয়া পড়িলেন।

তখন তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণ, বেদ ও বেদান্ত পড়িতে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেন। তিনি বৈদিক মন্ত্রের প্রকৃতার্থ নির্দেশ করিবার জন্য গভীর চিন্তা করিতেন ও তদ্‌গত চিন্তায় তন্ময় থাকিতেন। তিনি বেদভাষ্যকার সায়নাচার্যকে বেদের প্রকৃত অর্থজ্ঞ বলিতেন ও বেদের অন্যান্য অর্থ মানিতেন না। একদিন তিনি স্নানান্তে গঙ্গাতীরে প্রস্তরখণ্ডের উপর উপবিষ্ট আছেন। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতেছে। তিনি অনুভব করিলেন, তিনি যেন জগজ্জননী, দেবতা প্রভৃতি যেন তাঁহার সন্তান, তাঁহার শিরার ভিতর দিয়া যেন ঐশী কামকলা প্রবাহিত হইতেছে, এবং সমস্ত প্রকৃতি যেন প্রেমবিলিপ্ত। অনন্তর তাঁহার হৃদয়ে এই বাণী উত্থিত হইল, দেবগণ তোমরা এস, আমি তোমাদের জন্মদান করি। এই ভাব অপসৃত হইলে

তিনি বেদপাঠের নিমিত্ত যেই পাতা খুলিলেন, অমনি দেখিলেন দেবীসূক্ত প্রভৃতি এই ভাবের মন্ত্ররাশি। তিনি বলিতেন, ধ্যান করিয়া বেদার্থ অবগত হওয়া উচিত।

উত্তরাখণ্ডে অবস্থানকালে পাহাড়ীরা তাঁহাকে ফল-দুধ দিত। তাহারা বলিত, "ইনি আমাদের দেবতা, ইনি মানুষ নন।" তাহারা স্বামীজির থাকিবার জন্য একটি কুঠিয়া তৈয়ারী করিয়া দিয়াছিল। তাঁহার এইরূপ মানসিক পরিবর্তনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন, "জগৎ আমার ফল দেখিতে চায়, ফলের পশ্চাতে যে কি সাধনা ও অধ্যবসায় আছে, তপস্যা ও কঠোরতা আছে তাহা দেখিতে চায় না। গৌড়পাদ ও গোবিন্দাচার্যের নীরবতা পশ্চাতে ছিল বলিয়া শংকরাচার্যের সিদ্ধি এত জ্বলন্ত হইয়াছে।" এই সময় তিনি দিনের পর দিন পদ্মাসনে বসিয়া ধ্যানমগ্ন থাকিতেন, শারীরিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য বা শীতগ্রীষ্মের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন না। তিনি বলিতেন, "কে বলে জগৎ আছে? জগৎ ছিল না, থাক্‌বে না এবং নেইও।" শেষে তিনি গেরুয়ার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়েন। তিনি বলিতেন, "এদেশে গেরুয়া স্বাধীনতার চিহ্ন নয়, গোলামেরাও আজকাল গেরুয়া পরিতেছে।" বশিষ্ঠাশ্রমে আসিয়া তিনি গেরুয়া ত্যাগ করেন এবং ধূসর রঙের পট্টু, কাল পাগড়ী, পাজামা, কুর্তা ও ইমাম্‌ পরিতেন। তিনি লোকদিগকে বলিতেন, "দেখ রামকে কেমন মৌলবী দেখাইতেছে।" তখন তিনি হাততালি দিয়া গান গাহিতেন এবং বৈষ্ণবদের মত নাচিতেন ও আর পড়াশুনা করিতে পারিতেন না। যিনি চির প্রফুল্ল ও হাস্যময় থাকিতেন, তিনি নীরব হইলেন, মৌনাবলম্বন করিলেন। স্বশিষ্য স্বামী নারায়ণের সহিত মাঝে মাঝে কথা কাটাকাটি হওয়াতে তিনি তাঁহাকে পৃথক্‌ থাকিতে আদেশ করিলেন। তাঁহার এই বিষাদ ক্রমে খুব বাড়িতে লাগিল ও শেষে দেওয়ালীর দিন তিনি গঙ্গায় ডুবিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

এমার্সন সত্যই বলেন, "প্রকৃত শক্তিশালী মহাপুরুষের একটী চিন্তা বেশী প্রবল। একটি চিন্তাস্রোতের ভিতর দিয়া তাঁহাদের সমস্ত শক্তি প্রবাহিত হয়।" স্বামী রামতীর্থের সমস্ত বক্তৃতা, প্রবন্ধ ও চিঠির মধ্যে যে চিন্তাটী সর্বাপেক্ষা

প্রবল ছিল, তাহা বেদান্তের অদ্বৈতভাব। তিনি যাহা কিছু বলিতেন, লিখিতেন বা করিতেন তাহাতে ঐ এক চিন্তাই কেন্দ্রস্থ থাকিত। জনৈকা শিষ্যা সর্বানন্দ (মিসেস ওয়েলম্যান) কে তিনি কলিকাতার কালীঘাটের কালী এবং অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদকের সহিত দেখা করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। আমেরিকার দেনভার, চিকাগো, মিনিয়াপলিশ সহরে তিনি কয়েকটি বেদান্ত সোসাইটি স্থাপন ও বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে গরীব হিন্দু ছেলেদের জন্য ছাত্রবৃত্তি ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তিনি বহু সুন্দর সুন্দর কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন, কিন্তু কোন আশ্রম বা সংঘ স্থাপন করেন নাই। তাঁহার হস্তাক্ষর অতি সুন্দর ও কণ্ঠস্বর অতি সুমিষ্ট ছিল। তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে কেহ কেহ আশ্রম স্থাপন করিয়াছেন।

গুরু নানক বলিতেন, সুমিরন (ব্রহ্ম স্মরণ) ই ধর্মজীবন। তদনুযায়ী স্বামী রামতীর্থ বলিতেন, "ওঁ জপ ও সর্বদা অদ্বৈতানুভূতির চেষ্টা ও আনন্দে অবস্থানই প্রকৃত ধর্মজীবন। দেহজ্ঞান দূর হইলে ঈশ্বর-জ্ঞান উদিত হয়। দেহই আমাদিগকে জগতের সহিত আবদ্ধ রাখিয়াছে।" বর্তমান পাঞ্জাবের স্রষ্টা গুরু গোবিন্দ সিংহ বলিতেন, "প্রেমই জীবন। অন্য কিছুই জীবন নহে। রামতীর্থ স্বামীজি তেমনি প্রেমের দ্বারা সকলের সহিত ঐক্যানুভব করিতে বলিতেন ও নিজে উহা অভ্যাস করিতেন।

স্বামী রামতীর্থ একটি সুন্দর গল্প বলিতেন। কোন ফকিরের একখানি কম্বল ছিল, সেটি এক চোর চুরি করিয়া লয়। থানায় গিয়া ফকির তাহার অপহৃত দ্রব্যাদির একটি দীর্ঘ তালিকা দিল। সে বালল, আমার লেপ, গদি, ছাতা, পাজামা, কোট প্রভৃতি সবই অপহৃত। চোর ইহা শুনিয়া ক্রোধান্বিত হইয়া থানায় আসিয়া কম্বলটি পুলিশের সম্মুখে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া বলিল, একটা ছেঁড়া কম্বলের জন্য সাধু জগতের সব কিছু মিথ্যা বলিয়াছে। ফকির কম্বলটি পাইয়া চলিয়া যাইতেছিল, এমন সময় পুলিশ তাহাকে মিথ্যা বলার জন্য ভৎ্সনা করিল। তখন ফকির বলিল, আমি সত্যই বলিয়াছি, এক কম্বলই আমার নিকট লেপ, বালিশ, ছাতা প্রভৃতির মত ছিল, ইহাকে এতগুলি কাজে ব্যবহার করিতাম। স্বামী রামতীর্থ বলিতেন, সেইরূপ সাধুর নিকট ঈশ্বরই সর্বস্ব।

তিনি একজন প্রেমিক সাধক ছিলেন এবং ফার্সি ও উর্দু গজল গাহিতে ভালবাসিতেন। "যার জন্য দশদিকে আমি ছুটে বেড়াই তিনি আমার চোখের মধ্যেই আছেন"—এই গজলটি তিনি প্রায়ই গাহিতেন। এই সুগভীর ভাব উপনিষদের মধ্যেও আছে। তিনি পৃথিবীর সর্ব দেশের সাধু, কবি ও ভক্তদের বাণী পাঠ করিতেন। বিশেষতঃ বুল্লা সাহ্, শাম্স্ তাব্রেজ, মৌলানা জালালুদ্দিন রুমী, ইমারসন, থোরো, গ্যেটে, হেগেল, স্পিনোজা, কাণ্ট, ডারউইন, হেকেল প্রভৃতি উত্তমরূপে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। যে সকল সৎবাক্য তিনি অতিশয় ভালবাসিতেন ও সর্বদা বলিতেন বা লিখিতেন তাহার কয়েকটি নিম্নে দেওয়া হইল।—

(১) হে প্রেমিক, যার জন্য তুমি বনে জঙ্গলে ঘুরিয়া মর সে তোমার অন্তরে বিরাজিত। (২) শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়া বুকে হাত দিয়া কাঁদে। জানে না যে, সেই আমি। (৩) প্রভু, তুমি প্রেমিকারূপে, ফুলরূপে ও মৌমাছিরূপে আছ। এ্যাণ্টনি প্রেমে সুখ খুঁজিয়াছিল, ব্রুটাস যশে, সিজার রাজত্বে। কিন্তু প্রথম নৈরাশ্য, দ্বিতীয় নিন্দা ও তৃতীয় ব্যক্তি অকৃতজ্ঞতা লাভ করিয়াছিল, এবং সকলেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। তাহারা লৈলাকে বধ করিল, কিন্তু রক্তপাত হইল তাহার প্রেমিকের। এমনি করিয়াই প্রেমে তাহাতে তদাকারকারিত হইতে হয়। (৫) জলবিন্দু রোদন করিয়া বলিল, আমরা সমুদ্র হইতে পৃথক্, কিন্তু সমুদ্র হাসিয়া উত্তর দিল, আমরা সবই জলবিন্দু। (৬) মলয় আসিয়া কুসুমে আঘাত করিল, কিন্তু ইহাতে মলয়ের চোখে জল আসিল। (৭) যিনি এই নশ্বর জীবন ত্যাগ করিবেন তিনি অমরত্ব লাভ করিবেন এবং যিনি উহা ত্যাগ করিবেন না তাহার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। (৮) আমি চিকিৎসকের নিকট গিয়া আমার অসুখ জানাইলাম, তিনি বলিলেন তুমি মুখ বন্ধ করিয়া তোমার প্রেমাস্পদের নাম কর, ইহাই পরম ঔষধ। নিজেকে আহার কর, ইহাই পথ্য। ইহকালও পরকালের আশা ত্যাগই তোমার নিবৃত্তি। ইহা ভবরোগের চিকিৎসা—বাসনাত্যাগই ত্যাগ, আসক্তি ত্যাগই পবিত্রতা। (৯) হিন্দুদের বেদ-বেদান্ত-দর্শন সমস্তই এই এক ওঁকারের ব্যাখ্যা মাত্র (১০) যখনই অহংনাশ হয়

তখনই দিব্য প্রেরণা অবতরণ করে। প্রেমই সর্বশ্রেষ্ঠ আনন্দ। উহা কামশূন্য হইলেই ভাগবত অনুভূতিতে পরিণত হয়। (১১) জ্ঞানীর নিকট সমস্ত জগৎ অতিসুন্দর, তাঁহার ত্যাজ্য গ্রাহ্য কিছু নাই। (১২) চিরশান্তি অন্বেষণই সর্বধর্মের একমাত্র উদ্দেশ্য, কেবল স্থান কাল ও পাত্রানুযায়ী পথ বিভিন্ন। (১৩) বাসনা দ্বারাই অখণ্ড আত্মা খণ্ডিত হয়, জ্ঞানলাভ করিতে হইলে আমাদের পূর্ণ হইতে হইবে। মহাপুরুষদের শক্তি ও বাণী তাঁহাদের শিষ্যগণের নিকট অতি অল্পই থাকে। (১৪) আকাশ বাতাস প্রকৃতি সেই সমস্ত জ্ঞান ধারণ করে ও প্রার্থীর নিকট প্রদান করে। (১৫) মৃত্যু প্রশ্ন করে না তোমার কি আছে, কিন্তু তুমি কি হইয়াছ। জীবনের উদ্দেশ্যও তাহাই। সর্বদা সর্বাবস্থায় আনন্দে, শান্তিতে ও প্রেমে পূর্ণ থাকাই সমস্ত ধর্মের চরম উদ্দেশ্য।"

পুণার ভি. জি. জোশী প্রভৃতির অনুরোধে স্বামী রামতীর্থ আমেরিকায় ভারতবাসীদের জন্য কাজ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ভারতে আসিয়াও শেষদিন পর্যন্ত সমাজ, ধর্ম, নীতি প্রভৃতি বিষয়ক সমস্ত সমস্যার সমাধান করিতে তিনি বহু প্রবন্ধ রচনা ও বক্তৃতা দান করিয়াছেন। কোন প্রকার বিদ্রোহ প্রভৃতি দ্বারা তিনি ভারত স্বাধীন করিতে নির্দেশ দেন নাই। তিনি বলিতেন, কেবল আত্মানুভূতিমূলক বেদান্ত দ্বারাই ভারত জাগ্রত হইবে।

তিনি বলিতেন, ধর্মের নিগূঢ় রহস্য বিশ্বপ্রেমে আত্মপ্রসার। যে ভালবাসায় পরিবারবর্গের সহিত আত্মানুভূতি হয় তাহা স্বদেশে বিস্তার করিলে দেশপ্রেম হয়। তাহার অধিকতর প্রসার সাধন করিলে সমস্ত জগৎ ছড়াইয়া পড়িবে। বেদান্ত ভাব ব্যতীত প্রকৃত দেশপ্রেম বা বিশ্বপ্রেম হয় না, অর্থাৎ দেশাত্ম-বুদ্ধি ও বিশ্বাত্ম-বুদ্ধিই পর্যায়ক্রমে দেশপ্রেম ও বিশ্বপ্রেম। তিনি বলিতেন, "সমস্ত ভারতভূমি আমার শরীর, কুমারিকা আমার পদদ্বয়, হিমালয় আমার শির ; গঙ্গা, সিন্ধু ও ব্রহ্মপুত্র আমার জটা, বিন্ধ্য আমার কটিদেশ, করোমণ্ডল ও মালাবার পর্বতশ্রেণী আমার বাহুদ্বয়। যখন আমি চলি তখন আমি অনুভব করি, যেন ভারত চল্‌ছে। যখন কথা বলি, তখন যেন ভারত কথা বল্‌ছে। যখন নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ফেলি তখন যেন ভারত নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ফেল্‌ছে। আমি ভারত, আমি বিশ্ব, আমি

শংকর, আমি শিব, আমি বুদ্ধ, আমি যীশু, আমি মহম্মদ। শৈব যেমন শিবকে, বৈষ্ণব যেমন বিষ্ণুকে, বৌদ্ধ যেমন বুদ্ধকে, খ্রীষ্টান যেমন খ্রীষ্টকে, মুসলমান যেমন মহম্মদকে ইষ্টজ্ঞানে পূজা করে, আমিও তেমনি ভারতমাতাকে ব্রহ্মের বিরাট মূর্তি জ্ঞানে পূজা করি শৈবরূপে, বৈষ্ণবরূপে, বৌদ্ধরূপে, খ্রীষ্টানরূপে, মুসলমানরূপে। কারণ ভারতমাতা আমার ইষ্টদেব, আমার শালগ্রাম, আমার কালী। দেশপ্রেম যেমন ঈশ্বরপ্রেমে পরিণত হয় তেমনি ঈশ্বরবুদ্ধি ব্যতীত দেশপ্রেম হয় না। প্রত্যেক ভারতবাসীকে ভারতমাতারূপে আমাদের সেবা করিতে ও ভালবাসিতে হইবে। প্রত্যেক ধর্ম ভারতের কোন অংশকে অর্থাৎ কোন নদী, কোন বৃক্ষ বা পশু বা কোন সহরকে পবিত্র তীর্থ মনে করে। কিন্তু আমি সমগ্র ভারতকে পূণ্য তীর্থভূমি মনে করি ও সকলের উহা মনে করা উচিত। কোন জাপানী যুবক যদি সৈন্যদলে বৃদ্ধা মাতার সেবা ব্যপদেশে যোগ দিতে না চায়, তবে তাহার মাতা আত্মহত্যা করে। আমাদেরও তেমনি সমস্ত স্বার্থ বিসর্জন দিয়া দেশসেবায় জীবন নিয়োগ করিতে হইবে।"

দার্জিলিং পাহাড়ে যখন রামতীর্থ বাস করিতেন তখন একদিন তিনি গভীর সমাধি-মগ্ন হন। ব্যুত্থানকালে মনে সংকল্প উঠিল, "ভারত স্বাধীন হউক। রাম সহস্র সহস্র লোকের ভিতর দিয়া কাজ করিয়া ভারত স্বাধীন করিবে।"

স্বামী বিবেকানন্দ ভারতে ও বিদেশে এক সর্বোচ্চ আদর্শ চিরকুমার সন্ন্যাস বা ত্যাগ মাত্রই প্রচার করিয়াছেন। তিনি সংসার ও সন্ন্যাসের মধ্যে, ত্যাগ ও ভোগের মধ্যে আপোষ করেন নাই। তিনি বলিতেন, spiritual regeneration বা আধ্যাত্মিক পুনর্জাগরণ হইলে অন্য সমস্ত সমস্যার সমাধান আপনা হইতেই হইবে। তাঁহার মত কেহই জাতীয় জীবন সম্বন্ধে এমন অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিতে পারেন নাই। একমাত্র তাঁহারই ভারতেতিহাসের ভূত, ভবিষ্যৎ, ও বর্তমানের এক অখণ্ড জ্ঞান ছিল। তাঁহার পরবর্তী বা সমসাময়িক অন্য সকলে তাঁহারই অপভ্রংশানুকরণ করিয়াছেন। স্বামী রামতীর্থের বেদান্ত ও স্বামী বিবেকানন্দের বেদান্ত এক নহে। সি. এফ. এণ্ড্রুজ বলেন, "রামতীর্থের বক্তৃতাবলী ও কবিতাবলী অত্যধিক ভাবময় কবিত্বে পরিপূর্ণ।" এক কথায়

স্বামী রামতীর্থের বাণী স্বামী বিবেকানন্দের বাণীর জনপ্রিয় সংস্করণ বা সুসদৃশ প্রতিধ্বনি মনে হয়।

স্বামী রামতীর্থ আমেরিকায় বিবাহিত জীবনের খুব প্রশংসা করিতেন, কিন্তু ভারতে আসিয়া আবার কৌমার্য-ব্রতের খুব প্রশংসা করিতেন। তিনি দেশের সমস্যাকে পূর্ণভাবে সমাধান না করিয়া খণ্ড খণ্ড রূপে সমাধান করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, "মানুষ ঈশ্বরের সহিত একাত্মতা অনুভব করিতে পারিবে না, যদি সে তাহার সমগ্র জাতির সহিত নিজের ঐক্য অনুভব করিতে না পারে।" "যজ্ঞে বৃথা ঘি না ঢালিয়া অনশনক্লিষ্ট দরিদ্র ভারতবাসীদের তাহা দাও।" "ভাবী তরুণ সমাজ-সংস্কারক, তুমি জাতির প্রাচীন মহিমা ও প্রথার কখনো নিন্দা করিও না, তাহাতে জাতির শক্তিহ্রাস হয়।" "যখন সমস্ত জাতির সহিত ঐক্য অনুভব করিবে তখন তুমি দেশের কল্যাণকর যাহা কিছু চিন্তা করিবে দেশে তাহাই প্রতিফলিত হইবে।" "আদেশ বা বাধ্যতা নয়, প্রেম ও সেবা উন্নতির প্রধান ক্ষেত্র। "ক্ষুদ্র দৃষ্টিসম্পন্ন বড়লোক দ্বারা জাতি বড় হয় না, উচ্চদৃষ্টিবান্ জনসাধারণ দ্বারাই জাতি বড় হয়।" "শির তোমার যত উচ্চে হউক পাদযুগল যেন মাটীতে সকলের সঙ্গে থাকে। তবেই দেশ-সেবা সম্ভব।" "ইউরোপ বা আমেরিকা ঈশার ব্যক্তিত্বে বড় হয় নাই, অজ্ঞাতসারে বেদান্তকে কর্মজীবনে পরিণত করিয়াছে; কর্মজীবনে বেদান্তের অভাব ভারতের অবনতির প্রধান কারণ।" "সমালোচনা নয়, সহানুভূতিই সেবার প্রথম সোপান।" "যাহাদের তোমরা পতিত বলিতেছ যথার্থতঃ তাহারা উন্নত হইতে পারে নাই, এই মাত্র; আর কিছু নহে।" "আত্ম-জ্ঞানই শক্তি ও বিনয়ের উৎস, দেহ-জ্ঞান (তাহা ব্রাহ্মণ-শরীর-জ্ঞান বা সন্ন্যাসী-শরীর-জ্ঞান হউক) তোমাকে চর্মকার করিয়া ফেলে।" "জড়বাদমূলক সভ্যতার প্রধান দোষ এই যে, উহা নারীজাতিকে যথার্থ শ্রদ্ধা ও সম্মান না দিয়া ব্যবসা-বাণিজ্যের জিনিসপত্রের মত স্বাধিকারে আনে।" ইত্যাদি।

স্বামী রামতীর্থ একজন ভাবুক কবি ও ভক্ত সাধু ছিলেন। তিনি ওয়াল্ট্‌ হুইট্‌ম্যানের ছন্দে উর্দুতে ও ইংরাজীতে অনেক সুন্দর সুন্দর কবিতা লিখিয়া

গিয়াছেন। তাঁহার কয়েকটি ইংরাজী কবিতা আমেরিকায় গীত হইয়াছিল। লাহোরে যখন একবার তিনি পেটের ব্যথায় খুব কষ্ট পাইতেছিলেন, তখন পাঞ্জাবের প্রসিদ্ধ উর্দু কবি ইকবাল তাঁহাকে দেখিতে যান। এত অসুখ সত্ত্বেও তিনি সর্বদা হাসিতেছিলেন, যেন কোন কষ্ট হইতেছে না। তিনি বন্ধু ইকবালকে বলিলেন, "দেখ রামের একটা শরীর ভুগিলে কি হইবে, কোটী শরীরে সে সুস্থ আছে। অসুখ শরীরের, আনন্দ মনের।" মৃত্যুর পূর্বে মাসাধিক তিনি হরিদ্বারে রোগে খুব কষ্ট পাইয়াছিলেন। তখন বিমাতা, স্ত্রী ও পুত্র তাঁহাকে দেখিতে আসেন। তাহার কিছুকাল পরে তাঁহার শরীর ত্যাগ হয়। হরি ওম্ তৎসৎ।

একচল্লিশ

স্বামী আত্মানন্দ

এক

ত্যাগী তপস্বী আত্মানন্দ ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের একজন প্রধান সন্ন্যাসী শিষ্য। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্তরঙ্গ পার্ষদ স্বামী ব্রহ্মানন্দ স্বশিষ্য করুণানন্দকে পুরীধামে বলিয়াছিলেন, "আত্মানন্দের মত মহাপুরুষের সেবা ও সঙ্গ লাভ করা মহাসৌভাগ্য।" ঢাকা রামকৃষ্ণ মঠে গমনোদ্যত কোন ব্রহ্মচারীকে স্বামী শিবানন্দ বিদায়কালীন আশীর্বাদ দানান্তে বলিলেন, "যাও সেখানে শুকুল আছে। সে শিবতুল্য পুরুষ, তার কাছে শান্তিতে থাকবে।" স্বামী আত্মানন্দের নির্লিপ্ত ও নিঃসঙ্গ জীবন, ঐকান্তিক ধ্যাননিষ্ঠা ও গুরুভক্তি, তীব্র তপস্যা ও মুমুক্ষুত্ব ধর্মসাধকমাত্রেরই অনুকরণীয়। তাঁহার জীবন ঘটনাবহুল ছিল না।

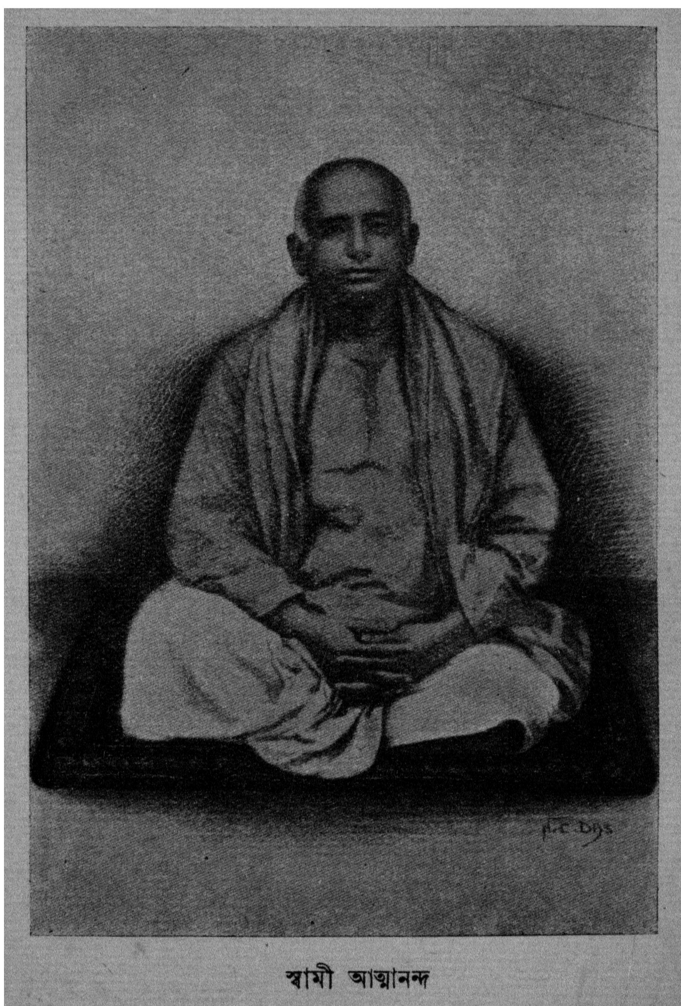
কিন্তু বিবেক-বৈরাগ্য ও ত্যাগ-তপস্যার অপার্থিব আলোকে উহা সদা সমুজ্জ্বল থাকিত। তাঁহাকে দেখিলেই মনে হইত, তাঁহার মন অন্তর্মুখী ও ধ্যানপ্রবণ। তাঁহার পূত জীবনী আলোচনা করিলে দৃঢ় প্রতীতি জন্মে যে, ধর্মজীবন যতই গম্ভীর হয় ততই উহার বহিরাড়ম্বর কমিয়া যায়।

বিহার প্রদেশের পূর্ণিয়া জেলার অন্তর্গত শশা গ্রামে যুগলকিশোর শুকুল * নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি জাতিতে কারযুপারি ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র দুর্গাপ্রসাদ ও গুরুপ্রসাদ। যুগলকিশোর সম্ভবতঃ কার্য্যোপলক্ষ্যে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিহারস্থ আদি বাসস্থান ছাড়িয়া উত্তর বঙ্গে মালদহ জেলার অন্তর্গত খরবা থানায় ডুম্‌রো গ্রামে আসিয়া বাস করেন। দুর্গাপ্রসাদ বয়স্ক ও উপার্জনক্ষম হইয়া উক্ত জেলার রতুয়া থানায় দেবীপুর গ্রামে আসিয়া স্থায়ী গৃহ নির্মাণ করেন। তাঁহার তিন পুত্র গোবিন্দ প্রসাদ, গৌরীপ্রসাদ ও সিদ্ধিপ্রসাদ। জ্যেষ্ঠ গোবিন্দপ্রসাদই রামকৃষ্ণ সংঘে স্বামী আত্মানন্দ নামে প্রসিদ্ধ হন। তাঁহার জন্ম হয় দেবীপুরে স্বীয় পিতৃভবনে, সম্ভবতঃ ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে।

গোবিন্দপ্রসাদের জ্যেষ্ঠতাত গুরুপ্রসাদ মালদহ জেলার অন্তর্গত চাঁচল রাজের ঠাকুর-বাড়ীতে পূজক ছিলেন। বোধ হয়, তাঁহার কোন সন্তান ছিল না। তাই তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র গোবিন্দপ্রসাদকে নিজের কাছে রাখিয়া রাজার অর্থসাহায্যে চাঁচলরাজ হাই স্কুলে পড়াইয়াছিলেন। গোবিন্দপ্রসাদের একটী ভগ্নীও ছিল। তিনি অবিবাহিত অবস্থায় গতাসু হন। গোবিন্দ-প্রসাদের মধ্যম ভ্রাতা গৌরীপ্রসাদ শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘজননী সারদাদেবীর নিকট মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন। তিনি মালদহ জেলায় হরিশ্চন্দ্রপুরে বাস করিতেন। তাঁহার পুত্রগণ উক্ত গ্রামে অদ্যাপি বর্তমান। চাঁচলরাজের ঠাকুর-বাড়ীতে গোবিন্দজী ও অন্নপূর্ণার বিগ্রহ নিত্য পূজিত হইত। বালক গোবিন্দ পূজাকার্য্যে

---

* সম্ভবতঃ শুকুল, 'শুক্ল' শব্দের অপভ্রংশ। বিহারে ও উত্তরপ্রদেশে শুক্লযজুর্বেদীয় ব্রাহ্মণদের এই পদবী থাকে।



স্বামী আত্মানন্দ

সর্বদাই জ্যেষ্ঠতাতকে সাহায্য করিতেন। এইরূপে অজ্ঞাতসারে তিনি যে ধর্মশিক্ষা লাভ করেন তাহাতে তাঁহার জীবন ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়। বাল্যকালে তিনি পড়াশুনার সঙ্গে সঙ্গে পূজাপাঠ এবং জপধ্যানাদি করিতেন। অন্যান্য ছাত্রদের সহিত মেলামেশা করিলেও তিনি সর্বদা নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া চলিতেন। ১২৯৬ সালে চাঁচল রাজার হাই স্কুল হইতে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। রাজার অর্থানুকুল্যে তিনি কলিকাতার কোন কলেজে এফ. এ. পড়িতে আরম্ভ করেন। এফ. এ. পড়িবার সময় মালদহ জেলায় কালিয়াচক থানার অন্তর্গত সুলতানগঞ্জ গ্রামনিবাসী মদন মিশ্রের দ্বিতীয়া কন্যা ব্রহ্মময়ী দেবীর সহিত তিনি বিবাহিত হন। তাঁহাদের যে কন্যা হইয়াছিল, সে আঁতুড় ঘরেই মারা যায়। পতির আগ্রহে ব্রহ্মময়ী দেবী শ্রীশ্রীসারদাদেবীর নিকট মন্ত্রদীক্ষা লাভ করিয়াছিলেন এবং সম্ভবতঃ ১৩৪৪।৪৫ সালে দেহরক্ষা করেন।

এফ. এ. পাশ করিয়া গোবিন্দপ্রসাদ কলিকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন। তখন হইতেই তিনি গৈরিক বসন পরিতে আরম্ভ করেন এবং ধর্মচর্চায় মনোযোগী হন। কেহ কেহ বলেন, তিনি এফ. এ. পাশ করিয়া রিপণ কলেজে বি. এ. পড়িতে আরম্ভ করেন। ছাত্রজীবনে খগেন মহারাজের (স্বামী বিবেকানন্দের সন্ন্যাসী শিষ্য স্বামী বিমলানন্দের) সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। উভয়ে একই কলেজে পড়িতেন এবং বোধ হয়, সহপাঠী ছিলেন। খগেনের সঙ্গেই গোবিন্দ রামকৃষ্ণ মঠের সংস্পর্শে আসেন। কলিকাতায় প্রথমে তিনি জনৈক ভদ্রলোকের বাড়ীতে থাকিতেন, পরে প্রিয়বন্ধু খগেনের বাড়ীতেই অবস্থান করেন। সেই সময় স্বামী শুদ্ধানন্দ ও স্বামী প্রকাশানন্দের সহিত তিনি ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হন। তাঁহারা সকলে বহুবাজারে এক পল্লীতে থাকিতেন। রবিবার চারি বন্ধুতে মিলিয়া প্রথমে কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে এবং পরে বরাহনগর ও আলমবাজার রামকৃষ্ণ মঠে যাইতেন। মাঝে মাঝে তাঁহারা মিলিত লইয়া ধর্মপ্রসঙ্গ ও দার্শনিক বিচারাদি করিতেন। কিন্তু গোবিন্দপ্রসাদ এই সকল যুক্তিতর্কে বিশেষ যোগ দিতেন না। তাঁহার ঈশ্বরবিশ্বাস

শৈশব হইতেই সুদৃঢ় ছিল। সন্ন্যাসীর জীবন যাপনের জন্য তখন তাঁহার আন্তরিক আগ্রহ লক্ষিত হইত।

গোবিন্দপ্রসাদের গৈরিক পরিধান ও ধর্মচর্চার কথা জানিতে পারিয়া চাঁচলের রাজা তাঁহার কলেজে পড়া বন্ধ করিয়া দেন এবং তাঁহাকে নিজ হাই স্কুলে চতুর্থ শিক্ষকপদে নিযুক্ত করেন। উক্ত পদে এক বৎসর কার্য্য করিয়া একদিন গোবিন্দপ্রসাদ সকলের অজ্ঞাতে নৌকাযোগে চাঁচল হইতে মালদহ সহরে উপস্থিত হন এবং তথা হইতে কলিকাতা চলিয়া আসেন। কলেজে পড়িবার সময়ই তিনি শ্রীশ্রীসারদাদেবীর নিকট মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন। আমেরিকা হইতে কলিকাতায় স্বামিজীর প্রত্যাবর্তনের কিছু পূর্বে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে তিনি সংসার ছাড়িয়া আলমবাজার মঠে যোগ দেন। কাহারো মতে তিনি সন্ন্যাসী হইবার পূর্বে চাঁচলরাজার এস্টেটে উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন এবং সত্যনিষ্ঠা দ্বারা রাজার অশেষ বিশ্বাসভাজন হন। তিনি যখন সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী হইলেন তখন তাঁহার পত্নী তাঁহাকে গৃহে ফিরাইয়া আনিবার মানসে চাঁচল রাজের শরণাপন্ন হন। রাজা ব্রহ্মময়ী দেবীকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "আপনি আমার বাড়ীতে কয়েক দিনের জন্য আতিথ্য গ্রহণ করুন। আমি তাঁহাকে চিঠি লিখিয়া আনিবার চেষ্টা করিতেছি।" রাজা গোবিন্দকে এই মর্মে আলমবাজার মঠের ঠিকানায় পত্র দিলেন, "এস্টেটের কোন জরুরী কার্য্যে আপনার সুপরামর্শ আবশ্যক। অনুগ্রহ করিয়া শীঘ্র এখানে একবার আসিবেন।" পত্র পাইয়া গোবিন্দ অবিলম্বে চাঁচল রাজবাড়ীতে উপস্থিত হইলেন; কিন্তু রাজা তাঁহার নিকট বিষয়-সম্পর্কিত কোন ব্যাপারের কথাই উল্লেখ করিলেন না। তিনি সাংসারিক কর্তব্যের দোহাই দিয়া বিবাহিতা পত্নীকে ত্যাগ করিতে নিষেধ করেন, এবং বলপ্রয়োগের ভয় দেখান। তিনি যে ঘরে গোবিন্দের সহিত কথা বলিতেছিলেন সেই ঘরে হঠাৎ ব্রাহ্মণী ব্রহ্মময়ী আসিয়া পতিকে প্রণামান্তে তাঁহার পায়ে পড়িয়া কাঁদিতে আরম্ভ করেন। তখন গোবিন্দ রাজবাড়ী হইতে পলাইয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে রেলওয়ে স্টেশনের দিকে ছুটিয়া যান এবং একবস্ত্রে আলমবাজার মঠে ফিরিয়া আসেন। সন্ন্যাসীর নিকট পত্নী ও গৃহ

অন্ধকূপতুল্য। বুদ্ধিমান রাজা নির্বুদ্ধিতার পথে আর অগ্রসর হইলেন না। গোবিন্দপ্রসাদ ১৮৯৭।৯৮ খ্রীষ্টাব্দে বিবেকানন্দ স্বামিজীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া স্বামী আত্মানন্দ নামে পরিচিত হন।

নিজের সন্ন্যাসের কথা স্বামী আত্মানন্দ এইরূপে বলিয়াছিলেন।— "ছেলেবেলা থেকেই আমার অজীর্ণ রোগ। রোগে ভুগে ভুগে শেষে মনে হল, এই শরীর দ্বারা জীবনে উন্নতির কোন আশা নেই। যদি মহৎ কোন কাজে জীবনটা পাত করে দিতে পারি পরজন্মে হয়ত সাধনার উপযোগী শরীর পাব। তাই রামকৃষ্ণ মঠে চলে এলাম। স্বামিজী জিজ্ঞাসা করলেন, "কি, সাধু হতে এসেছ?" আমি করজোড়ে উত্তর দিলাম, "আজ্ঞে না, সাধু হওয়ার উপযোগী শরীর বা মন কোনটাই আমার নেই। এই পচা শরীরটা আপনাদের একটু সেবায় লাগিয়ে যদি পাত করে দিতে পারি পরজন্মে অবশ্যই আমার ভাল শরীর মন হবে। এই বিশ্বাস নিয়ে এসেছি।" আমার কথা শুনে স্বামীজি বল্লেন, "That's right (তা ঠিক)।" সজোরে দুই তিন বার উচ্চারিত স্বামীজির 'That's right' কথাটি আজো আমার কানে বাজিতেছে। সেই সময়ে কল্যাণানন্দও মঠে আসিয়াছিল। স্বামীজি কালবিলম্ব না করিয়া পরদিনই আমাদের দুইজনকে সন্ন্যাস দিলেন।"

সন্ন্যাস গ্রহণের পর স্বামী আত্মানন্দ বৃন্দাবনে যাইয়া কিছুকাল তপস্যা করেন। তিনি ১৮৯৮ খ্রীঃ মাধুকরী ভিক্ষান্নে উদরপূর্তি করিয়া বৃন্দাবনে তপস্যারত ছিলেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ ২৭।৮।৯৮ তারিখে আলমোড়া হইতে তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন, "প্রিয় শুকুল মহাশয়, তোমার প্রেরিত পোষ্টকার্ডে তোমাদের নির্বিঘ্নে শ্রীবৃন্দাবনে পৌছানোর সংবাদে প্রীত হইলাম। ভিক্ষার কষ্ট শ্রীধামে হইবারই কথা। বর্ষানায় যাইলে অনেক স্বচ্ছন্দ বোধ করিবে। বিশেষতঃ এক্ষণে ঐ অঞ্চলে খুব উৎসব হইতেছে।" প্রথমে আত্মানন্দজীকে আলমবাজার বা বেলুড় মঠে 'শুকুল মহাশয়' বলিয়া সকলে সম্বোধন করিতেন। তৎপরে তিনি 'শুকুল মহারাজ' নামেই পরিচিত হন। তাঁহার গুরুভক্তি এত গভীর ছিল যে, তিনি গুরুর আদেশে জন্মগত অভ্যাস ছাড়িতে ইতস্ততঃ

করেন নাই। তিনি বাল্যকাল হইতেই নিরামিষাশী ছিলেন। একদিন গুরু নিরামিষ আহারে শিষ্যের দৃঢ়তা পরীক্ষার্থ তাঁহার পাতে একটু মাছের তরকারী তুলিয়া দিলেন। গুরুভক্তির প্রগাঢ়তা হেতু শিষ্য গুরুদত্ত প্রসাদ গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলেন, এমন সময় শিষ্যবৎসল গুরু তাঁহাকে নিষ্ঠাভঙ্গ করিতে নিষেধ করিলেন। স্বামী আত্মানন্দ সুনিপুণ তব্‌লা বাদক ছিলেন। শ্রীগুরুর নিকট তিনি উক্ত বাদ্যশিক্ষার প্রেরণা লাভ করেন। একদিন স্বামীজি মঠে গান করিতে করিতে শিষ্যকে বলিলেন, "শুকুল, তব্‌লা বাজা তো।" শিষ্য নম্রভাবে জানাইলেন, "জানি না।" গুরু ধমক দিয়া বলিলেন, "জানিস্ না কি রে; শিখে নে।" তখন হইতে স্বামী আত্মানন্দের তব্‌লাশিক্ষার আগ্রহ জন্মিল এবং তিনি অল্পকালের মধ্যে উক্ত বাদ্য আয়ত্ত করিলেন। স্বামী নির্মলানন্দ তাঁহার তব্‌লা বাদ্য শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া বাঙ্গালোর হইতে এক জোড়া উত্তম তব্‌লা তাঁহাকে উপহার পাঠান।

১৮৯৮ খ্রীঃ কলিকাতায় প্লেগ মহামারীর প্রাদুর্ভাব হয়। রামকৃষ্ণ মিশন মহানগরীর আক্রান্ত পল্লীসমূহে সেবাকার্য্য আরম্ভ করেন। স্বামী বিবেকানন্দের প্রথম শিষ্য সদানন্দজীর উপর এই কার্যের গুরুভার অর্পিত হয়। স্বামী আত্মানন্দ উক্ত সেবাকার্যের অন্যতম প্রধান সেবক ও কর্মী ছিলেন। তাঁহার সুগভীর শাস্ত্রজ্ঞান ছিল বলিয়া স্বামিজী তাঁহার দ্বারা বেলুড় মঠে শাস্ত্রাধ্যাপনা করাইতেন। এই ক্লাশে আত্মানন্দজীর গুরুভ্রাতাগণ উপস্থিত থাকিতেন। তিনি কিছুকাল 'উদ্বোধন' পত্রিকা পরিচালনে স্বামী ত্রিগুণাতীতের সহকারী ছিলেন। শ্রীগুরুর মহাসমাধির পর সঙ্ঘের অপর এক সন্ন্যাসীর সহিত তিনি গাত্রে ভস্ম মাখিয়া ধ্যানজপ ও শাস্ত্রপাঠে কাটাইতেন। বেলুড় মঠে বিবেকানন্দ মন্দির যেস্থানে অবস্থিত উহার অদূরে একটী পর্ণকুটীর বাঁধিয়া উভয়ে তথায় থাকিতেন। তিনি তথায় রাত্রিবাসও করিতেন এবং মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য মঠে আসিতেন। রাত্রিতে তাঁহার জন্য কয়েকখানি রুটি উক্ত কুটীরে প্রেরিত হইত। স্বামী আত্মানন্দ নিয়মিত ভাবে উক্ত ক্লাশে যাইতেন। ১৯০৪ খ্রীঃ স্বামী আত্মানন্দ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের আহ্বানে মান্দ্রাজ মঠে গমন করেন।

তথায় কিছুকাল থাকিবার পর স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ তাঁহাকে বাঙ্গালোরে নব-প্রতিষ্ঠিত মঠের কার্য্যভার অর্পণ করেন। বাঙ্গালোর সহরের চামরাজ পেট পল্লীতে একটী ভাড়াটিয়া বাড়ীতে তখন আশ্রম অবস্থিত ছিল। তিনি তথায় ভক্তদিগকে শাস্ত্রাদি শুনাইতেন এবং ধ্যানধারণা শিক্ষা দিতেন। তিনি প্রায় ছয় বৎসর বাঙ্গালোর আশ্রমে থাকিয়া ঠাকুর-স্বামিজীর ভাব প্রচার করেন এবং নানা বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও আশ্রমটীকে স্থায়ী করেন। আশ্রমের বর্তমান নিজস্ব জমি ও বাড়ী তাঁহারই সময়ে সংলব্ধ হয়। আশ্রম-গৃহ নির্মাণের জন্য তাঁহাকে অর্থসংগ্রহ করিতে হইয়াছিল। তথায় স্বামী বিমলানন্দ ও স্বামী বোধানন্দ কিছুকাল তাঁহার সহকর্মী ছিলেন। তিনি বক্তৃতাদি বেশী দিতেন না। কিন্তু একনিষ্ঠ ধর্মজীবন যাপন দ্বারা ভক্তমণ্ডলীর উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করিতেন। তাঁহার কয়েকটী ইংরাজি বক্তৃতা 'ব্রহ্মবাদিন্' * ও 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার শিশুসুলভ সারল্য, আন্তরিক সহানুভূতি, কঠোর বৈরাগ্য ও ধনী-নির্ধনের প্রতি সমান প্রীতির জন্য তাঁহাকে এখনও তথাকার অনেকে ভক্তিভরে স্মরণ করেন।

তিনি যখন বাঙ্গালোরে ছিলেন তখন আমেরিকায় বেদান্ত প্রচারার্থ যাইবার জন্য সংঘ-সম্পাদক স্বামী সারদানন্দের এক তার পাইলেন। কিন্তু তিনি বিলাস-ভূমি আমেরিকায় যাইতে স্বীকৃত হইলেন না, যদিও উক্ত কার্য্যের জন্য তাঁহার যথেষ্ট যোগ্যতা ছিল। স্বাস্থ্যভঙ্গের জন্য তিনি ১৯১০ খ্রীঃ বাঙ্গালোর ত্যাগ করেন। সেই বৎসর শ্রীসারদাদেবীর সহিত তিনি রামেশ্বর তীর্থে যান। স্বামী ব্রহ্মানন্দ, প্রেমানন্দ, সারদানন্দ, রামকৃষ্ণানন্দ প্রভৃতি মহাপুরুষগণের প্রতি

---

* 1. Good and Bad (January, 1905). 2. The Personal and the Impersonal (May, 1905). 3. How to realise God (June, 1904). 4. One and Many (August, 1904). 5. What is God (July, 1904). 6. The Aim of our Mission (October, 1904). 7. What is Religion (June, 1906). এই প্রবন্ধ-সপ্তক সংগৃহীত হইয়াছে এবং প্রকাশার্থ অনূদিত হইতেছে।

তাঁহার অগাধ শ্রদ্ধা শিক্ষণীয়। তাঁহাদের বাক্যকে তিনি বেদবাক্যতুল্য অভ্রান্ত জ্ঞান করিতেন। তাঁহার কোন সন্ন্যাসী গুরুভ্রাতা স্বামী সারদানন্দের রচনার সমালোচনা করিলে তিনি কটুক্তি দ্বারা তাঁহাকে নিরস্ত করেন। যে ব্রহ্মচারী বা সন্ন্যাসী বেলুড় মঠে ঠাকুরের পূজা করিতেন তাঁহাকে তিনি পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিতে দিতেন না। তিনি বলিতেন, "তোমরা কত ভাগ্যবান্ যে, ঠাকুর-সেবার অধিকার পেয়েছ। যে হাতে তোমরা সাক্ষাৎ ভগবানের পূজা-সেবা কর সে হাত কি আমাদের পায়ে লাগাতে আছে? তা করা উচিত নয়।"

স্বামী আত্মানন্দ নাট্যাচার্য্য গিরিশ ঘোষের 'পূর্ণচন্দ্র', 'বিল্বমঙ্গল', 'কালাপাহাড়', 'নসীরাম', 'রূপসনাতন', 'নিমাই সন্ন্যাস', 'পাণ্ডবগৌরব', 'শঙ্করাচার্য্য', 'চৈতন্য-লীলা', প্রভৃতি ধর্মমূলক নাটকসমূহ নিজে বার বার পড়িতেন এবং অন্যকে পড়িতে বলিতেন। তাঁহার মতে এই সকল নাটকে যে সব সুমহৎ চরিত্র চিত্রিত সেইগুলির মত উচ্চাদর্শ খুব কম গ্রন্থেই দেখা যায়। বেলুড় মঠের সাধু-ব্রহ্মচারীদের লইয়া তিনি এই সকল নাটকের ক্লাশ করিতেন। শেষ বয়সে কাশীধামে অবস্থানকালেও দুই একজন ব্রহ্মচারী তাঁহাকে এই সকল পড়িয়া শুনাইতেন। নাটকোক্ত ধর্মতত্ত্ব ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে তিনি পাঠককে সদুপদেশ দিতেন। 'বিল্বমঙ্গল' নাটকের নিম্নোক্ত গানটী তিনি নিভৃতে বিভোর হইয়া গাইতেন—

জয় বৃন্দাবন, জয় নরলীলা জয় গোবর্ধন চেতনশীলা
নারায়ণ, নারায়ণ, নারায়ণ।
চেতন যমুনা, চেতন রেণু গহন কুঞ্জবন ব্যাপিত বেণু
নারায়ণ, নারায়ণ, নারায়ণ।
খেলা খেলা. খেলা মেলা নিরঞ্জন নির্মল ভাবুক ভেলা
নারায়ণ, নারায়ণ, নারায়ণ।

ঈশ্বর দর্শনার্থ ব্যাকুলতার আধিক্যে গভীর নিশীথে স্বীয় শয্যায় তিনি ক্রন্দন করিতেন। স্বামী মহাদেবানন্দ ঢাকা মঠে একাধিক বার তাঁহার এরূপ

ক্রন্দন শুনিয়াছেন। স্বামী আত্মানন্দ স্বীয় গুরুভ্রাতা শুদ্ধানন্দজীকে একদিন কথাপ্রসঙ্গে তৎদৃষ্ট এই স্বপ্ন-বৃত্তান্তটী বলিয়াছিলেন। শ্রীসারদাদেবীর ক্রোড়ে বসিয়া তিনি অতল অপার সমুদ্রে ভাসিতেছেন। শেষে তিনি এক অনির্বচনীয় আনন্দ অনুভব করিলেন, যেন আনন্দের স্রোত সর্বত্র প্রবহমান। তিনি বাহ্য সংজ্ঞা সম্পূর্ণরূপে হারাইলেন। অনেকক্ষণ পরে তিনি যখন সংজ্ঞা লাভ করিলেন তখন দেখিলেন তিনি মাতৃক্রোড়ে মহানন্দে নৃত্যরত শিশু। স্বামী আত্মানন্দ বলিতেন, "সমাধি যদি এইরূপ আনন্দের অবস্থা হয় তবে সুস্বপ্নে মাত্র ইহা অনুভব করেছি, জাগ্রতে কখনো করি নি।"* উক্ত সুস্বপ্ন দর্শনের পর তিনি বহু বৎসর তপস্যা করেন। শেষ জীবনে নিশ্চয়ই তিনি সমাধিবান্ হইয়াছিলেন। তাঁহার বাক্যে ও ব্যবহারে ইহাই নিঃসন্দেহে প্রতীত হইত।

স্বামী আত্মানন্দ স্বীয় গুরু বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী চব্বিশ বার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছিলেন। শুধু পাঠমাত্র নহে, স্বামিজীর সারগর্ভ বাণীগুলির উপর তিনি গভীর ধ্যান করিতেন। মঠের নবীন সন্ন্যাসীদিগকে তিনি বলিতেন, "পূর্বাশ্রমের জীবন একবারে ভুলে যাও। মনে কর, মঠে নূতন জন্ম হয়েছে। সন্ন্যাসের মন্ত্রগুলি বার বার পড়বে এবং মর্মার্থ মনে জাগিয়ে রাখবে। সন্ন্যাসী স্বগৃহে যাবে কেন? বার বৎসর পরে স্বগৃহে একবার যাবার কথা থাকলেও ইহা সকলের পক্ষে প্রযোজ্য নয়। হরি মহারাজকে দেখ। সংযত সাধুর শরীর ভাঙ্গে, কিন্তু মুখ ভাঙ্গে না। সংযমের অভাব হলে চোখ বসে যায়।" স্বামী বিবেকানন্দ আত্মানন্দজীপ্রমুখ শিষ্যদিগকে একদিন বলিয়াছিলেন, "ভক্তের বাড়ীতে গিয়ে স্ত্রীভক্তের হাতের রান্না খেও না। এরূপ করলে মন নীচু ও শরীর ভগ্ন হবে। তবে এতে আমার মনের কিছু অনিষ্ট হবে না। কারণ, আমার মন সিদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত; কিন্তু শরীরে আমার ব্যাধি আসবে।" একবার স্বামিজী (বিবেকানন্দ) কোন গৃহী গুরুভ্রাতৃদ্বয়ের বাড়ীতে আহারের আমন্ত্রণ পান। কার্য্যব্যপদেশে তথায় যাইতে তাঁহার একটু বিলম্ব হয়। তিনি যাইয়া দেখেন, বয়োবৃদ্ধ গুরুভ্রাতৃদ্বয় ইতোপূর্বেই আহার শেষ করিয়াছেন।

* 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকার ১৯২৩ নভেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধে ঘটনাটি উল্লিখিত।

তিনি ক্ষুণ্ণ মনে আহার সমাপনান্তে মঠে ফিরিয়া আত্মানন্দপ্রমুখ শিষ্যদিগকে এই শ্লোকটী বলিলেন—

সরিৎসাগরয়োর্যদ্বৎ মেরু-সর্ষপয়োরিব।
সূর্য্য-খদ্যোতয়োর্যদ্বৎ তথা ভিক্ষু-গৃহস্থয়োঃ॥

সাগর ও নদী, মেরু ও সর্ষপ সূর্য্য ও খদ্যোতের (জোনাকীর) মধ্যে যে অলঙ্ঘনীয় পার্থক্য আছে সন্ন্যাসী ও গৃহীর মধ্যেও তদ্রূপ পার্থক্য বিদ্যমান। স্বামী আত্মানন্দ রামকৃষ্ণ সংঘের সাধুদিগকে ত্যাগের ভাবে উদ্দীপিত করিবার জন্য বলিতেন, "বাড়ীতে চিঠি লিখবে না। বাড়ীর চিঠি এলে না পড়ে ছিঁড়ে ফেলবে। তবে যদি মা থাকেন তাঁর চিঠি পড়বে এবং তাঁকে চিঠি দিবে।" সাধুর জামাকাপড় এবং জিনিষপত্র বেশী থাকা অনুচিত। এই বিষয়ে স্বামী আত্মানন্দ আদর্শস্থল ছিলেন। তিনি স্বীয় বিছানাদি বাঁধিয়া লাঠিতে ঝুলাইয়া কখনো কখনো দেখিতেন, আবশ্যক হইলে একা তাহা বহন করিতে পারেন কিনা। তিনি যখন যে আশ্রমে বাস করিতেন তখন তথায় অত্যন্ত আসক্ত ভাবে থাকিতেন এবং সংঘাধ্যক্ষের আদেশমাত্র অন্যত্র যাইতে নিজেকে সদা প্রস্তুত রাখিতেন। তিনি অক্ষরে অক্ষরে সংঘাধ্যক্ষের আদেশ মানিয়া চলিতেন। তিনি যখন রামকৃষ্ণ সংঘে যোগদান করেন তখন মঠস্থ প্রায় সকল সাধুই তাঁহার বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। তথায় তাঁহাকে সকলের আদেশ পালন করিতে হইত। এমন কেহ বিশেষ কনিষ্ঠ ছিলেন না যাঁহাকে তিনি কোন কাজের জন্য আদেশ করিতে পারেন। সেইজন্য তিনি স্বয়ং সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী হইয়াছিলেন, নিজের সব কাজ নিজেই করিতেন। এই অভ্যাসটী তাঁহার জীবনে আমরণ ক্রিয়াশীল ছিল। সমগ্র জীবনে এমন কি বৃদ্ধ বয়সে এবং রুগ্ন অবস্থায়ও স্বাবলম্বন তাঁহার স্বভাবগত ছিল। কোন যুবক সাধু জড়সড় হইয়া বসিলে বা অলস ভাবে চলিলে তিনি বিরক্তির সুরে বলিতেন, "একি রে! বীর সৈনিকের মত চল্‌বি, কথা বলবি ও কাজ করবি। রজোগুণের আশ্রয় না নিলে তমোগুণে ডুবে যাবি।"

স্বামী আত্মানন্দ বলিতেন, "স্বামিজী শিবাংশে, মহারাজ কৃষ্ণাংশে এবং নিরঞ্জন স্বামী রামাংশে জাত। নিরঞ্জন স্বামীর পূর্ব জন্মের স্মৃতি ছিল, তিনি

শৈশবে তাঁর ধনু লইয়া খেলা করিতেন। ঠাকুর যখন কাশীপুর উদ্যান-বাটীতে অসুস্থ তখন নিরঞ্জনানন্দজী শ্রীগুরুর সেবা করিতেন এবং তাঁহার আরোগ্যের জন্য চিন্তিত হইতেন। ঠাকুর একদিন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি সেরে গেলে তুই কি করবি নিরঞ্জন?" শিষ্য আনন্দোন্মত্ত হইয়া উত্তর দিলেন, "বাগানে এই যে খেজুর গাছটা আছে সেটা উপড়ে ফেলবো।" ঠাকুর বলিলেন, "তা তুই পারবি।" স্বামী আত্মানন্দ বলিতেন, "যাদের ভক্তিভাব বেশী উপনিষদাদি বেদান্তগ্রন্থ পড়লে তাদের অনিষ্ট হয়, তাদের ভক্তিভাব কমে যায়।" ঢাকা সহরের যে অংশে রামকৃষ্ণ মঠ অবস্থিত উহা তখন শিক্ষিত ভদ্রপল্লী ছিল। সন্ধ্যাকালে বহু শিক্ষিতা মহিলা উক্ত মঠে বেড়াইতে আসিতেন। স্বামী আত্মানন্দ তাঁহাদের সহিত আদৌ কথাবার্তা বলিতেন না। মঠের জনৈক সাধু তাঁহাকে প্রার্থনা জানাইলেন, "যে সব মহিলা এখানে আসেন তাঁহার অনেকেই মঠে অর্থ সাহায্য করেন। আপনি তাঁদের সঙ্গে অন্ততঃ দুই একটা কথা বলবেন, নচেৎ তাঁরা দুঃখিত হবেন।" তখন স্বামী আত্মানন্দ কর্তব্যানুরোধে তাঁহাদের সঙ্গে দুই একটা কথা বলিতেন, তাহাও জিজ্ঞাসিত হইলে। কামিনীকাঞ্চন-ত্যাগরূপ কঠোর যতিবিধি তিনি জীবনে কখনো ভঙ্গ করেন নাই। এরূপ আদর্শনিষ্ঠ সাধন-সর্বস্ব সন্ন্যাসী আধুনিক যুগে অতিবিরল দৃষ্টিগোচর হয়। চোরকে চোরই চেনে—ইহা বুঝাইবার জন্য স্বামী আত্মানন্দ এই গল্পটী বলিতেন। এক রাত্রিতে চারটি চোর থালা ঘটি বাটী গাড়ু প্রভৃতি বাসন কোন বাড়ী হইতে চুরি করে। স্বস্থানে ফিরিতে তাহাদের ভোর হইয়া যায়। পথে ধরা না পড়িবার জন্য তারা এই কৌশল অবলম্বন করে। শবকে চার জনে যেমন খাটিয়ায় কাঁধে করিয়া লইয়া যায় তেমনি তারা বাসনকোসন বাঁধিয়া কাপড় ঢাকা দিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। পাছে লোকে সন্দেহ করে সেইজন্য তারা বলিতে বলিতে চলিল, 'বাপ মলরে বাপ। বাপ মলরে বাপ।' আর একটী চোর সেই পথ দিয়া আসিতেছিল। সে অনায়াসে ইহাদিগকে চিনিতে পারিয়া বলিল, 'গাড়ুর নল ঢাক।' কারণ, একটা গাড়ুর নল বাহির হইয়াছিল। ইহা বলিয়া সে তাহাদিগকে সাবধান করিয়া দিল। কথায় বলে, 'চোরে চোরে মাসতুত

ভাই।' পঞ্চম চোরও তাহাদের কথায় সায় দিয়া বলিল, 'কবে মলোরে মেসো।' পূর্ব চোরগুলি যখন বুঝিতে পারিল নূতন চোরও তাহাদের চিনিয়া ফেলিয়াছে তখন বিপদ এড়াইবার জন্য নবাগতকে উত্তর দিল, 'ভাগ নেবে ত এস।' সেইরূপ, সাধুকে সাধুই চিনিতে পারেন, অন্যে নহে।

স্বামী আত্মানন্দের strong common sense (জোরালো সাধারণ বুদ্ধি) ছিল। ঢাকা মঠে একদিন পিঠে হইয়াছিল। আহারকালে সকলকে পিঠে ও ভাত দুইই পরিবেশন করা হইল। তখন তিনি বলিয়াছিলেন, 'পিঠে আগে খাও পরে ভাত খাবে।' যে চীজ্‌টি নিত্য হয় না, সেটি আগে খাও, পরে ভাত খাও, আর নাই খাও। তিনি এ কথাটি খুব বলিতেন, 'আপ্ রুচিসে খানা, পর্ রুচিসে পর্‌না।' তিনি পাকা পূজারী ছিলেন এবং পূজা ও আরাত্রিক ভালভাবে করিতে পারিতেন। ঢাকা মঠে পূজারীকে একদিন তিনি দেখাইলেন, কি ভাবে আরাত্রিক করিতে হয়। একবার বেলুড় মঠে স্বামিজীর উৎসবের সময় তিনি পূজক ও সুধীর মহারাজ তন্ত্রধারক ছিলেন। এই প্রসঙ্গে বিনয় প্রকাশপূর্বক তিনি বলিতেন, 'আমরা আর কি পূজা করব? পূজক ল্যাংড়া আর তন্ত্রধারক কানা। উৎসবাদি উপলক্ষে শশী মহারাজ বা বাবুরাম মহারাজ যখন পূজা করতেন তখন পূজা কি জম্‌ত! যে দেখত তার ভক্তি-বিশ্বাস হত।' কোন বিশেষ পূজা উপলক্ষে মঠের দুইটি সাধু পূজক ও তন্ত্রধারক ছিলেন। বাবুরাম মহারাজ তাঁহাকে বলিলেন, 'শুকুল গিয়ে দেখত ছেলেরা কেমন পূজো করছে।' শুকুল মহারাজ পূজাস্থলে যাইয়া দেখেন, পূজক ও তন্ত্রধারক বিবদমান। তাহা দেখিয়া তিনি দুঃখ করিয়া বলেন, 'আজকাল আর বিশেষ পূজাদি তেমন জমে না।' স্বামিজী তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, আমার জন্মোৎসবে মহাশক্তি ও মহাবীরের যেন পূজা হয়।' শুকুল মহারাজ বলিতেন, 'মহারাজ পায়ের ঠোক্করে মুক্তি দিতে পারতেন।' ঠাকুরের এই কথাটি শুকুল মহারাজের মুখে প্রায়ই শুনা যাইত। ঠাকুর তাঁহার সেবকদের বলিয়াছিলেন, 'তোরা আমার কি সেবা করিস্? তোরা তো আমার খোসামোদ করিস। সেবা করেছে হৃদু। আমার পেটের অসুখের সময় যদি

মুখে একটা রসগোল্লা দিতাম, সে মুখ টিপে রসগোল্লা বার করে ফেল্‌তো, পাছে অসুখ বাড়ে।' শুকুল মহারাজ বলিতেন, "যদি কেহ তোমার নিন্দা করে, ভেবে দেখবে সে দোষটি তোমার আছে কিনা। যদি দোষ থাকে, দোষটি ছাড়বার প্রাণপণ চেষ্টা করবে। আর যদি দোষ না থাকে, কোন ভাবনার কারণ নেই।"

স্বামী আত্মানন্দ যখন বলরাম মন্দিরে ছিলেন তখন বলরাম বাবুর এক শিশু প্রপৌত্রীর অসুখ হয়। একবার সেই অসুস্থা শিশুকন্যা শয্যাশায়িত অবস্থায় থুথু ফেলিতে ও বমি করিতে চাহিল। তখন রোগীর কাছে আত্মানন্দজী ব্যতীত অন্য কেহ ছিলেন না। নিকটে থুথুপাত্র না থাকায় তিনি স্বীয় যুক্ত কর পাতিয়া দিলেন। উহাতেই অসুস্থা বালিকা থুথু ফেলিল ও বমি করিল। বাঙ্গালোরে অবস্থানকালে তিনি ভক্ত শ্রীনিবাস আয়েঙ্গারের বাড়ীতে কখনো কখনো থাকিতেন। শ্রীনিবাসের শিশুপুত্রগণ বারান্দায় মুত্র ত্যাগ করিয়া ফেলিলে তিনি তৎক্ষণাৎ উহা পরিষ্কার করিয়া ফেলিতেন। আত্মানন্দজী যে কত ঘৃণাহীন ও সেবাপরায়ণ ছিলেন তাহা উপরোক্ত ঘটনাদ্বয় হইতে নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়। তিনি যখন যেখানে থাকিতেন তখন তত্রস্থ অবস্থার সহিত সংশ্লিষ্ট হইতেন। যখন যেমন তখন তেমন, যেখানে যেমন সেখানে তেমন হইতে না পারিলে সুখী হওয়া যায় না।

স্বামী বিবেকানন্দ ও গিরিশ ঘোষের সম্বন্ধে স্বামী আত্মানন্দ বলিতেন, "অত বড় আচার্য, অত বড় কবি আর আসে নি। গিরিশ বাবুর অধিকাংশ নাটক 'ভাবমুখে' লেখা। ভাবের তোড় এলে তিনি বলে যেতেন, আর দুই তিনটী লেখক তা লিখতেন। তিনি নিজে লিখতে পারতেন না। সেক্ষপিয়রের 'ম্যাকবেথ' নাটকে একটু দার্শনিক ভাব দেখা যায়, আর গিরিশ বাবুর নাটকের ছত্রে ছত্রে গভীর দার্শনিক ভাব আছে।" রামকৃষ্ণ সংঘের সাধুদের জীবনে অন্ততঃ কি কি বই পড়া উচিত এই প্রশ্নের উত্তরে স্বামী আত্মানন্দ বলিয়াছিলেন, "খুব কমপক্ষে বেলুড় মঠের নিয়মাবলী, আরাত্রিক স্তোত্রত্রয়, 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' এবং গীতা।"

স্বামী আত্মানন্দের বিছানা সামান্য হইলেও খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিত। তিনি সব সময় বিছানাটী পাতিয়া রাখিতেন। ইহার কারণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিয়াছিলেন, "বেলুড় মঠে দুপুর-বেলার স্বামিজী মাঝে মাঝে এসে আমার বিছানায় গড়াগড়ি দিতেন।" গুরু-বেদান্তবাক্যে স্বামী আত্মানন্দের অগাধ বিশ্বাস ছিল। তিনি বলিতেন, "গুরুবাক্যে ও বেদান্তবাক্যে বিশ্বাস সাধু-জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্বল। এই উভয়ের মধ্যে গুরুবাক্যে বিশ্বাস অধিকতর প্রয়োজন।" স্বামিজী এক বার তাঁহার তরুণ শিষ্যদের জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "ভক্তি, জ্ঞান, কর্ম ও যোগের কোন্‌টায় কে অনার্স নেবে?" কেহ বলিলেন ভক্তিতে, কেহ বলিলেন ভক্তি ও জ্ঞানে ডবল অনার্স, কেহ বলিলেন, ভক্তি, জ্ঞান ও কর্মে ট্রিপল্ অনার্স। শুকুল মহারাজ চিরকালই গম্ভীর ও অল্পভাষী ছিলেন। তিনি নীরব রহিলেন। অন্য এক গুরুভ্রাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "শুকুল মহারাজ, কিসে অনার্স নেবে?" এই প্রশ্নের উত্তরে স্বামীজী স্বয়ং বলিলেন, "ও সবটাতেই আছে।" তিনি যথার্থই বলিয়াছিলেন। কারণ স্বামী আত্মানন্দ ছিলেন একাধারে ভক্ত, জ্ঞানী, কর্ম্মী ও যোগী—স্বীয় গুরুর অবিকল প্রতিবিম্ব।*

স্বামী আত্মানন্দ একটী পয়সাও সম্বল রাখিতেন না। এমন নিঃসম্বল সাধু বিরল দেখা যায়। একটী জামা, দুইখানি কাপড় ও একটী গেঞ্জী—এই কয়টী পরিধেয় বস্ত্র রাখিতেন। তাঁহার মতে সাধুর আসবাবপত্র যত কম হয় ততই ভাল। ঢাকা হইতে কাশী যাইবার সময় সামান্য চেষ্টায় তাঁহার পাথেয় সংগৃহীত হয়। দুর্গম বদ্রীনারায়ণ তীর্থযাত্রাও তিনি সামান্য সম্বলে সারিয়া আসেন। তিনি বলিতেন, "ঈশ্বরে সম্পূর্ণ নির্ভর ও বিশ্বাস থাকিলে সাধুর অর্থাভাবাদি অনায়াসে বিদূরিত হয়।" এক বার একজন হিন্দুস্থানী ঢাকা মঠে তাঁহার পায়ের কাছে একটী টাকা রাখিয়া প্রণাম করিল। শুকুল মহারাজ জনৈক সাধুকে বলিলেন, "টাকাটা ঠাকুর-ঘরে রেখে দাও।" উক্ত সাধু তাঁহাকে বলিলেন, "মহারাজ, টাকাটী ত আপনাকেই দিয়েছে, ঠাকুরকে নয়। এটী আপনি রাখুন।

* উপরোক্ত ঘটনা স্বামী যোগীশ্বরানন্দ এবং স্বামী ব্রহ্মেশ্বরানন্দ কর্তৃক কথিত।

এক সময় কাজে লাগবে।" স্বামী আত্মানন্দ সেই টাকাটী কোথায় রাখিবেন এবং কি ভাবে খরচ করিবেন এই ভাবিয়া বিব্রত হইয়া পড়িলেন। শঙ্করভাষ্য, সংস্কৃত সাহিত্য ও ব্যাকরণে তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি বলিতেন, অধিকাংশ সাধু শাস্ত্রজ্ঞানে 'অলকটপ্পা' অর্থাৎ পল্লবগ্রাহী। তিনি এক সাধুর কথা বলিতেন, যিনি ত্রিশ চল্লিশ বৎসর শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ভিক্ষাটন ও নিদ্রাদিতে যে সময় ব্যয়িত হইত তদ্ব্যতিরিক্ত সকল সময় উক্ত সাধু শাস্ত্রপাঠে কাটাইতেন।

সাধুজীবনের প্রথম ভাগে স্বামী আত্মানন্দ যখন বেলুড় মঠে ছিলেন তখন তাঁহাকে মঠের নানা কাজ করিতে হইত। কখনো শাস্ত্রাধ্যাপনা, কখনো ঠাকুর-পূজা, কখনো বা অন্যান্য শ্রমসাধ্য কর্ম। কিছুকাল রাত্রে তিনি কয়েক সের আটা মাখিতেন, ডলিতেন এবং রুটী বেলিতেন। আটার পরিমাণ অধিক হওয়ায় পরে উক্ত কর্মে ভৃত্য নিযুক্ত হয়। স্নানান্তে তিনি রোজ এক অধ্যায় চণ্ডীপাঠ করিতেন। তিনি বলিতেন, "শুদ্ধাচারে পৃথক্ আসনে একান্ত মনে শাস্ত্রপাঠ করলে মনে অধিক ছাপ পড়ে। স্নান না করে, মলমূত্র-ত্যাগান্তে কাপড় না ছেড়ে, বা বিছানায় বসে অশুদ্ধ ভাবে শাস্ত্র পড়লে পূর্ণ ফল লাভ হয় না।" তিনি স্বীয় ব্যবহৃত বস্ত্রাদির গেরুয়া রঙটী নিজেই করিতেন। ভক্তদের সহিত সাধুদের অবাধ মেলামেশা তিনি আদৌ পছন্দ করিতেন না। তিনি বলিতেন, "ওতে সাধুভাব কমে যায়। ভক্তরাই সাধুদের দফা রফা করে দেয়।" ঢাকায় ঝুলনের সময় স্থানীয় ধনী ব্যবসায়িগণ কলিকাতা হইতে ঢপালী বায়না করিয়া লইয়া যাইতেন এবং নিজ নিজ বাড়ীতে গান করাইতেন। ব্যবসায়ীরা অধিকাংশই বৈষ্ণব। সুতরাং তাঁহারা ঢপালীদের কৃষ্ণ-কীর্তন শুনিতে ভালবাসেন। ঢাকা মঠের কোন কোন সাধু মঠে ভক্তদের জন্য ঢপালীদের গান করাইতে চাহিলেন, কিন্তু স্বামী আত্মানন্দ ঐ মঠে তাহা হইতে দিলেন না।

স্বামী প্রেমানন্দ কার্যোপলক্ষে অন্যত্র যাওয়ায় বেলুড় মঠের কার্যভার কিছু দিন সুকুল মহারাজের উপর পড়ে। এক বার কোন সাধু মঠের একটী ঘরে (যেখানে সাধুরা থাকেন) স্ত্রীভক্তদিগকে লইয়া বসান ও আলাপ করেন। সুকুল

মহারাজ তাহাতে অত্যন্ত চটিয়া যান এবং সাধুটীকে বলেন, "তুমি আজ একটী গর্হিত কাজ করলে, মঠের একটী নিয়ম ভাঙ্গলে।" গুরুভ্রাতাদের কোন অন্যায় দেখিলে তিনি সত্যের অনুরোধে প্রতিবাদ করিতেন। পরোপকার সম্পর্কে তাঁহাকে বলিতে শোনা যাইত, "কারো ভাল করতে পার আর নাই পার, কারো মন্দ করো না। অপরের ভাল করবার শক্তি বা সুযোগ সকলের থাকে না। কিন্তু অনিষ্ট করার শক্তি বা সুযোগ অনেকেই পায়।" তিনি সাধুদের মেয়েলী ভাব আদৌ পছন্দ করিতেন না, manly (পুরুষ) ভাব খুব প্রশংসা করিতেন। তিনি স্বয়ং ছিলেন পুরুষভাবের, বীরভাবের ঘনীভূত মূর্তি। তিনি যখন স্বামিজীর ইংরাজী বক্তৃতাবলী পড়িতেন বা পড়াইতেন তাহা শ্রবণযোগ্য ছিল। তাঁহার ইংরাজী উচ্চারণ খুব বিশুদ্ধ ও সুস্পষ্ট ছিল। তিনি বেলুড় মঠের কোন কোন সাধুকে স্বামিজীর ইংরাজী বইগুলি ভাল করিয়া পড়িতে শিখাইতেন। তিনি নানা পূজায় অভিজ্ঞ ছিলেন। বেলুড় মঠে ঠাকুরের জন্মোৎসবে বা বিশেষ পূজা উপলক্ষ্যে তিনি পূজক ও স্বামী শুদ্ধানন্দ তন্ত্রধারক হইতেন। বেলুড় মঠে দীর্ঘকাল তিনি ঠাকুরের নিত্য পূজা করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ স্বামী প্রেমানন্দ তাঁহাকে পূজাকার্যে নিযুক্ত করেন। তাই তিনি বলিতেন, "আমি কি আর ঠাকুরের পূজা করতে পারি? ঠাকুরের এক পার্ষদ আমার হাত ধরে পূজায় বসিয়ে দেন। তাই করছি। ঠাকুরের পূজা করা খুব শক্ত।" ঠাকুরের সন্ন্যাসী শিষ্যদের বিরুদ্ধে কোন কথা বলা তিনি মহাপাপ জ্ঞান করিতেন। তিনি সংঘের সাধুদের বলিতেন, "তাঁরা ঠাকুরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গস্বরূপ, তাঁদের নিন্দা করলে ঠাকুরকেই নিন্দা করা হয়।"

ঢাকা মঠে স্বামী আত্মানন্দ শুধু যে অধ্যক্ষ ছিলেন তাহা নহে, তিনি স্থানীয় সাধু-ভক্তদের একজন অভিভাবকও ছিলেন। তাঁহাদের কর্তব্যে শিথিলতা ও অনবধানতা দেখিলে মৃদু ভর্ৎসনা দ্বারা তিনি ঐ সকল দূরীকরণের চেষ্টা করিতেন। সাধুভক্তগণ বৃথা আড্ডা দিলে তিনি খুব বিরক্ত হইতেন। ঢাকা মঠের সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারিগণকে লক্ষ্য করিয়া তিনি একদিন বলিলেন, "স্বামী ব্রহ্মানন্দ বলতেন, আড্ডা মানুষকে ruin (ধ্বংস) করে দেয়। সুতরাং ঐ থেকে

সাবধান থাকবে। কিছু কাজ না থাকে নিজের ঘরে ঘুমিয়ে কাটাবে, তবু আড্ডায় যাবে না। যদি কেহ তোমার কাছে আড্ডা দিতে আসে, একখানা বই নিয়ে পড়তে থাকবে। দেখবে, সে ধীরে ধীরে সরে পড়বে; তারপরে সে আর আসবে না। শ্রীশ্রীঠাকুর-স্বামীজীর বই, রামায়ণ, মহাভারত—ঐসব অল্প অল্প করে রোজ পড়বে। কিছুদিন পরে দেখবে, অনেক পড়া হয়ে যাবে। এখন অন্য বই পড়বে না। এমন কি, একটা ভাবে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত অন্য সম্প্রদায়ের ধর্মগ্রন্থও পড়বে না।" সাধনজীবনে সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারিদের সংবাদপত্র পড়াও তিনি খুব অপছন্দ করিতেন। কেহ সংবাদপত্র মঠের গ্রন্থাগার হইতে নিজের ঘরে আনিলে তিনি বিরক্ত হইতেন। সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারিদের রাজনীতি আলোচনাও তিনি আদৌ পছন্দ করিতেন না। তাঁহার মতে উহা সাধকের মনকে বিক্ষিপ্ত ও বিষয়াভিমুখী করে। সেইজন্য উহা হইতে দূরে থাকিতে তিনি উপদেশ দিতেন। বলিতেন, "যে সংস্কারগুলি মাথার মধ্যে ঢুকে আছে, সেগুলিই তাড়ান যাচ্ছে না। আবার নূতন সংস্কার ঢোকান কেন? সাধুজীবনে এটা জানবো, ওটা দেখবো, ইত্যাদি ভাব ভাল নয়।"

একদিন ব্রহ্মেশ্বরানন্দ স্বামীকে বলিলেন, "অধ্যক্ষের নির্দেশ না পেলে ঠাকুর-পূজার কাজটি ছেড়ো না।" তিনি প্রশ্ন করিলেন, "পূজা কিরূপে করতে হয়, জানি না। বলে দিন।" শুকুল মহারাজ উত্তরে বলিলেন, "পূজা মানে সেবা। তিনি সাক্ষাৎ রয়েছেন, এইটি মনে করে তাঁকে নাওয়ান, খাওয়ান, ইত্যাদি।" পূজা এবং পূজার কাজ করিতে করিতে কেহ গল্প করিলে তিনি বিরক্ত হইতেন। ঠাকুরের ভাবে ভাবিত হইয়া সকল কাজ করা তাঁহার অভিপ্রেত ছিল। একদিন স—মহারাজ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় বন্যা, কোথায় দুর্ভিক্ষ, এসব খবর সংবাদপত্র না পড়লে কি করে জানব?" তিনি উত্তরে বলিলেন, "তুমি ত' আর অধ্যক্ষ নও। অধ্যক্ষ ঐসব দেখে যেমন বলবেন তেমন করবে। ভগবান লাভ জীবনের উদ্দেশ্য, ঐ নিমিত্ত ব্রহ্মচর্য-সন্ন্যাসের কঠোর ব্রত গ্রহণ। এই কঠোর সাধনার যা' পরিপন্থী, যা' চিত্তবিক্ষেপকারক, তা' নির্মমভাবে ত্যাগ করতে হবে!" স্বামী আত্মানন্দ কঠোর নিয়মনিষ্ঠ হইলেও অবস্থাবিশেষে নরম

ব্যবস্থাও দিতেন। একদিন জনৈক সাধু জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্বামীজী আহারের পর দুই ঘণ্টা বিশ্রাম করতে বলেছেন। এখানে বিশ্রাম অর্থে কি নিদ্রা বুঝায়?" উত্তরে তিনি মৃদুহাস্যে বলিলেন, "তোমাদের মত রোগা পট্‌কার জন্য ত' স্বামীজী নিয়ম করেন নি। কি আর করবে? না পারলে একটু ঘুমিয়ে নেবে।" শুকুল মহারাজ চট্‌পটে চন্‌মনে ভাব ভালবাসিতেন, ম্যাদাটে মেয়েলি ভাব আদৌ সহ্য করিতে পারিতেন না। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের সাহচর্য তাঁহার চরিত্রে উক্ত বীরভাব সুদৃঢ় করিয়াছিল।

অমূল্য জীবনের এক মুহূর্তও যাহাতে বৃথা বিনষ্ট না হয়, তজ্জন্য তিনি routine life (নিয়মিত জীবন) পালন করিতে উৎসাহ দিতেন। জনৈক সাধুকে অনেক বার বলিয়াছিলেন, "একটা routine (দৈনিক কার্যসূচী) করে চলবে। অবশ্য তাতে আহারের পর একটু গল্প করবার এবং বৈকালে একটু বেড়াবার সময়ও থাকবে।" শরীর ও মনের জড়তা দূর করবার জন্য একজন সাধুকে একদিন তিনি বলিলেন, "সকাল-বিকাল মঠের এই lawn (প্রাঙ্গন) এর চারদিকে দৌড়াবে।" আর একজন সাধু তাঁহার এই উপদেশটি কিছুদিন পালন করিয়া সুফল পাইয়াছিলেন। জীবনের সমুচ্চ উদ্দেশ্য ও কর্তব্য বিষয়ে অনবধান থাকিয়া প্রয়োজনাতিরিক্ত সময়ে তৈলমাখা, স্নানের ঘাটে বসিয়া গল্প করা ইত্যাদি সাধুজীবনের শৈথিল্য লক্ষ্য করিয়া একদিন তিরস্কারের সুরে তিনি বলিলেন, "এই ভাবে সময় নষ্ট করলে জীবনের চরম উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। সময়টা সচ্চিন্তা বা সৎকার্যে কাটাতে হবে। অল্প হলেও নিয়মিত ভাবে রোজ জপ-ধ্যান করে যাবে। ভগবানকে ত' আর দেখ নি। শ্রীশ্রীঠাকুর, মা ও স্বামীজী— এঁরাই ভগবান, এঁদের কাছে প্রার্থনা করবে।"

একদিন শুকুল মহারাজ বলিয়াছিলেন, "বুড়ো হলে যখন কাজ-কর্ম করবার সামর্থ্য থাকবে না, তখন কি নিয়ে থাকবে? তাই এই বয়সে কতকগুলি সদভ্যাস স্বভাবগত করে নিতে হয়—যেমন, জপধ্যান, শাস্ত্রপাঠ ও সদালোচনা। এখন আড্ডা দিয়ে কাটালে তখনও তাই করতে হবে।" যে মন ভগবানের পাদপদ্মে রাখিতে হইবে, সেই মন পাছে জামা-কাপড়ে ও আসবাবপত্রে পড়িয়া

যায়, সেইজন্য তিনি নিজে খুব সাবধান থাকিতেন। তাঁহার ঘরের আসবাবপত্র এমন পরিপাটী ভাবে সাজান থাকিত যে, ঝাড়ুটি দেখিলেও মনে হইত, ইহা সযত্নে রক্ষিত। নিজের ঘরটি তিনি নিজেই ঝাঁট দিতেন। কুয়া হইতে জল তুলিবার জন্য একটি ঘটি ও দড়ি তিনি নিজের কাছে রাখিতেন। পাছে অপরকে কষ্ট দিতে বা কাহারো সেবা লইতে হয়, সেজন্য নিজের সকল কাজ তিনি নিজেই করিতেন। জামা-কাপড় ও ঘরের জিনিষ-পত্র সাজাইয়া গুছাইয়া রাখা সম্বন্ধে একদিন বলিয়াছিলেন, "উহা মনঃসংযমের পরিচায়ক। যারা বাইরে এলোমেলো, তারা ভিতরেও সেরূপ। যে ভাল শিল্পী সে ভাল সাধু হতে পারে। শিল্পী হতে গেলে মনঃসংযোগ দরকার, আর মনঃসংযোগ না হলে ধর্মসাধনা অসম্ভব।"

স্বামী আত্মানন্দ অতি প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগ করিয়া শৌচাদি ক্রিয়া খুব অল্প সময়ে সমাপনপূর্বক নিজ বিছানায় চুপচাপ বসিয়া থাকিতেন। বলিতেন, "স্নান-শৌচাদিতে বেশী সময় দিতে নেই। কারণ ঐ সময়টায় বড় একটা ঈশ্বর-চিন্তা হয় না। প্রাতে তিনি নিয়মিত ভাবে ঠাকুরমন্দিরে যাইয়া প্রণামান্তে কিছুক্ষণ মঠ-প্রাঙ্গনে দ্রুত পাদচারণ করিতেন। শীতকালে কখনও বা রৌদ্রে কিছু সময় একলা বসিয়া কাটাইতেন। জলখাবারের জন্য তিনি মুড়ি খাইতে ভালবাসিতেন। স্নানান্তে নিজ ঘরে ধুনা জ্বালিয়া সামনে একটি ছোট আসনে ঠাকুর ও মার ছবি বসাইয়া কিছুক্ষণ জপের পর শ্রীশ্রীচণ্ডীর কয়েকটি স্তব পাঠ করিতেন। তিনি বেশী সময় নিজের খাটে চুপচাপ বসিয়া থাকিতেন। তখন তাঁহার মুখমণ্ডল এত সমুজ্জ্বল ও প্রশান্ত দেখাইত যে কাছে যাইতে কেহ সাহস করিত না। বৈকালে মঠের উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে বসিয়া পাঁচ ছয় জন ব্রহ্মচারী ও বাহিরের যুবকদের লইয়া তিনি স্বামীজীর বই পড়াইতেন। একজন পাঠ করিতেন, আর যেখানে প্রয়োজন হইত সেখানে দুই একটি কথায় তিনি বুঝাইয়া দিতেন। অল্প কথায় অধিক ভাব প্রকাশ করিবার অসাধারণ ক্ষমতা তাঁহার আয়ত্ত ছিল।

বেদান্তদর্শনের একটি সূত্র আলোচনাকালে নিজের মাথায় অঙ্গুলি ঠেকাইয়া বলিয়াছিলেন, "স্বামীজীর কৃপায় এর মধ্যে কিছু আছে।" ঈশ্বরের বাণী মনে করিয়া ঠাকুর-স্বামীজীর গ্রন্থাবলী শ্রদ্ধার সহিত তিনি পাঠ করিতেন।

সন্ধ্যাসমাগমে স্বামী আত্মানন্দ নিজের ঘরে যাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতেন। গিরিশ ঘোষের নাটকাবলী সম্বন্ধে একদিন বলিয়াছিলেন, "ঠাকুরের ভাবরাশি যত প্রচারিত হবে, লোকে ততই গিরিশ বাবুর বই বুঝতে পারবে ও আদর করবে। এখনও সে সব লোক জন্মায় নি।" সংঘগুরু এবং স্বামীজীর গুরুভ্রাতাদের প্রতি তাঁহার কি অগাধ শ্রদ্ধা ছিল, তাঁহাকে না দেখিলে তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। জনৈক যুবক একদিন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্বামীজী বলেছিলেন, মেয়েদের পৃথক্ মঠ হবে। তা হলো কৈ?" শুকুল মহারাজ দৃঢ়তার সহিত বলিলেন, "শিববাক্য একটীও মিথ্যা হবার নয়। তিনি যা যা বলে গেছেন সব কালে সত্যি হবে। স্বামীজী বৃথা বাক্য ব্যবহার করেন নি। তাঁর কথা হতে একটী কমা (,) ও বাদ দেবার নয়।" স্বামীজী মঠের নিয়মাবলীতে লিখিয়াছেন, অধ্যক্ষের আদেশ পালনে প্রাণপণে তৎপর হইবে। শুকুল মহারাজ এই 'প্রাণপণ' কথাটীর উপর জোর দিয়া বলিতেন, "এই কথাটীও স্বামীজী বৃথা ব্যবহার করেন নি। এরও তাৎপর্য আছে।" একদিন স— মহারাজকে বলিয়াছিলেন, "মঠের নিয়মাবলী মুখস্থ করে ফেলবে, এবং যেখানে থাকবে আশ্রমের সকলকে নিয়ে মাঝে মাঝে ঐগুলি পড়বে।"

শুকুল মহারাজ স্বামী ব্রহ্মানন্দের কথায় প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিলেন, এবং তাঁহাকে ও ঠাকুরকে অভিন্ন দৃষ্টিতেই দেখিতেন। একদিন বলিয়াছিলেন, "খুব সাধন-ভজন না থাকলে মহারাজের সঙ্গ করে তাঁকে বোঝা যায় না। অর্থাৎ সাধনরাজ্যের এত উচ্চ স্তরে মহারাজ অবস্থান করেন যে, সাধারণ মন তাঁকে ধরতে পারে না।" মহারাজের দেওয়া একখানি চাদর অতি যত্নে তিনি নিজের বাক্সে রাখিতেন, উহা কখনো ব্যবহার করিতেন না। ঠাকুরের শিষ্যদের সম্বন্ধে কেহ কোনরূপ অশ্রদ্ধাসূচক বাক্য ব্যবহার করিলে তিনি এত উত্তেজিত হইতেন যে, নিজেকে কিছুক্ষণ সামলাইতে পারিতেন না। যে দিন শ্রীশ্রীমায়ের পূতাস্থি ঢাকা মঠে আনীত হইল, সেদিন শুকুল মহারাজের এক অপূর্ব ভাব! বালকের মত মায়ের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন, বেলা দুইটা আড়াইটা পর্যন্ত উপবাসী রহিলেন, মায়ের পূজাভোগ শেষ হইলে প্রসাদ গ্রহণ করিলেন।

তিনি মঠের মন্দিরে ঠাকুরের জীবন্ত অস্তিত্ব সর্বদা অনুভব করিতেন। রাত্রে ঠাকুরের শয়ন হইলে পর মন্দিরের কাছে কেহ কথা বলিলে তিনি বিরক্ত হইতেন।

ঠাকুরের পূজাসেবার ন্যায় সংঘের কাজকর্মকে তিনি সমান শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। একদিন ঢাকা মঠের সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারিগণ প্রসাদ গ্রহণ করিতে বসিয়াছিলেন। কিন্তু তখনো মঠস্থ হাসপাতালের রোগীদের পথ্য দেওয়া হয় নাই। ইহা জানিতে পারিয়া তিনি বিশেষ বিরক্ত ও দুঃখিত হইয়াছিলেন। মিশন স্কুলের ছাত্রপড়ান কাজটিও সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারিগণ যাহাতে নিয়মিত ভাবে শ্রদ্ধার সহিত করেন সেদিকে তিনি লক্ষ্য রাখিতেন। তিনি কার্যক্ষেত্রে সামরিক নিয়মানুবর্তিতা খুব পছন্দ করিতেন। তিনি বলিতেন, ঠাকুরের কাজে ব্যক্তিগত রুচিবৈচিত্র্য, ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে বিসর্জন দিয়া আনন্দের সহিত কর্মাধ্যক্ষের আদেশ পালনে প্রস্তুত থাকা উত্তমাধিকারীর লক্ষণ। তাঁহার মতে যে অধ্যক্ষের আদেশের সহিত নিজের সুখসুবিধা দেখে সে মধ্যম অধিকারী, এবং যে নিজের সুবিধা আগে দেখে সে অধম অধিকারী। একদিন সতীশ মহারাজকে বলিলেন, "এমন ভাবে নিজেকে সর্বদা প্রস্তুত রাখবে যে, অধ্যক্ষ অন্যত্র যেতে বললে পাঁচ মিনিটের মধ্যে প্রস্তুত হতে পার।" আবার বলিতেন, "যে (কর্মাধ্যক্ষ) কাজ করবে তাকে স্বাধীনতা দিতে হয়। নইলে সকলে মিলে তার পেছনে লাগলে কি কাজ চলে?" 'আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শেখায়।' তাঁহার প্রত্যেকটী উপদেশ তিনি নিজে সর্বাগ্রে পালন করিতেন। তিনি ছিলেন আচার্যশ্রেণীর সন্ন্যাসী।

শুকুল মহারাজ খুব অল্পভাষী ছিলেন। অধিকাংশ সময় তিনি নিজের ঘরে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতেন, কখনো বা আপন মনে পায়চারী করিতেন। সর্বদা একটানা তন্ময় ভাব তাঁহাতে লক্ষিত হইত। কখনো বৃথা উল্লাস-আমোদে মত্ত হইতেন না, অথচ তাঁহাতে রসিকতার অভাব ছিল না! তাঁহার ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলিটী অপর চারিটী অঙ্গুলির উপর দিয়া সর্বদা চালিত হইতেছে দেখা যাইত। অজ্ঞতাবশতঃ কোন কোন সাধুর ধারণা ছিল, উহা তাঁহার একটি মুদ্রাদোষ মাত্র। পরে তাঁহারা বুঝিলেন, সর্বদাই তাঁহার জপ চলিতেছে। দীর্ঘ সময় বসিয়া

জপ-ধ্যান না করিলেও সর্বদাই তিনি যে ধ্যানভাব রাখিতেন এবং স্মরণমনন করিতেন, তাহা বেশ বুঝা যাইত। একদিন তাঁহাকে প্রশ্ন করা হইল, "আপনার ঈশ্বরদর্শন হয়েছে কি?" উত্তরে তিনি বলিলেন, "যদি একটা ভূতও দেখতাম, তবুও বুঝতাম একটা কিছু দেখেছি।" তারপর একটু গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "তবে মনে কোন বাসনা নেই।" ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন সম্বন্ধে একদিন বলিলেন, "রূপদর্শনাদি সাধনরাজ্যের খুব উচ্চ স্তরের কথা নয়। উপলব্ধির জগৎ দর্শনাদির ঊর্ধ্বেই অবস্থিত। সকল সাধকের প্রকৃতিতে রূপদর্শনাদি হয় না।" তাঁহার সৌম্য উজ্জ্বল মুখ এবং সদানন্দ মূর্তি দেখিলে মনে হইত, অমৃতের সন্ধান কিছু না পাইলে এমন মাধুর্য ও গাম্ভীর্যের সমাবেশ হইতে পারে না। বালকের মত সরল, মধুর হাসি সদাই তাঁহার মুখে লাগিয়া থাকিত এবং তাঁহার ব্যবহারও ভদ্র ও শিষ্ট ছিল।

শুকুল মহারাজের কাছে টাকা পয়সা থাকিত না। তাঁহার সেবার জন্য কেহ কিছু দিলে মঠের হিসাবরক্ষকের নিকট তাহা দিয়া দিতেন এবং কিছু জমা হইলে তদ্দ্বারা সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারিদের জামাকাপড় প্রভৃতির অভাব পূরণ করিতেন। বিছানাপত্রাদি সম্বন্ধে বলিতেন, "আমাদের সময় personal (ব্যক্তিগত) বলে কিছু ছিল না। সবই মঠের বলে ধরা হত। মঠ হতে অন্যত্র যাবার সময় কেউ ঐসব নিয়ে যেত না।" একদিন একজন মহিলা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, আপনি কি ব্রাহ্মণ?" তিনি উত্তরে বলিলেন, "আমি সন্ন্যাসী।" দুই তিন বার জিজ্ঞাসার পর একই উত্তর পাইয়া মহিলাটি নিরস্ত হইলেন। স্ত্রীভক্তেরা আসিলে তিনি তাঁহাদের যথাযথ আদরযত্ন করিতেন। কিন্তু প্রয়োজনাতিরিক্ত সময় তাঁহাদের কাছে থাকিতেন না, কৌশলে বিদায় দিতেন। একদিন বলিয়াছিলেন, "এমন একটি আশ্রম থাকবে যেখানে নারী মেথর পর্যন্ত ঢুকতে পারবে না।" তিনি কঠোর সন্ন্যাসী হইলেও হাস্যরসিকতা ছাড়িতেন না। একদিন রৌদ্রে বসিয়া চোখের চশমাটি মেঝের কাছে ধরিলেন। চশমার ভিতর দিয়া ঘনীভূত সূর্যালোক দেখাইয়া বলিলেন, "এই দেখ, নিরাকার ব্রহ্ম কিরূপে সাকার হন।"

অতিরিক্ত ও বৃথা বাক্যালাপীদের লক্ষ্য করিয়া একদিন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যায়াম কয় প্রকার বলত।" ব্রহ্মেশ্বরানন্দ মহারাজ বলিলেন, "শারীরিক ও মানসিক এই দুই প্রকার।" তিনি বলিলেন, "না, আর এক প্রকার আছে, vocal exercise (বাক্য-ব্যায়াম)! অর্থাৎ অযথা বাক্যব্যয় এক প্রকার ব্যায়াম মাত্র।" নিজে তেমন গাহিতে না পারিলেও তিনি সঙ্গীত খুব ভালবাসিতেন। এই গান দুইটি প্রায়ই তিনি আপন মনে গাহিতেন—

(১) কি ছার আর কেন মায়া, কাঞ্চন কায়া ত রবে না।

দিন যাবে দিন রবে নাত,
কি হবে তোর তবে?
আজ পোহালে কাল কি হবে?
দিন পাবি তুই কবে?
সাধ কখন মেটে না ভাই, সাধে পড়ুক বাজ।
বেলাবেলি চলরে চলি, সাধি আপন কাজ॥
কেউ কারু নয়, ত্থাখ্ না চেয়ে
কবে ফুটবে আঁখি।
আপন রতন বেছে নে চল, হরি বলে ডাকি॥

(২) অখিল ব্রহ্মাণ্ড-পতি, চরণে প্রণমি তব
প্রেম ভক্তিভরে শরণ লাগি।
দুর্মতি দূর করি শুভ মতি দাও হে
এই বরদান ভগবান্ মাগি॥
ঘোর নিষ্ঠুর রিপু অন্তরে বাহিরে
ভীত অতি আমি এই অন্ধকারে।
দীন বৎসল তুমি তার নিজ সেবকে
তব অভয় মূরতি ভয় নিবারে॥
বিষয়-মোহার্ণবে মগন হয়ে ডাকি হে
দীনহীনে প্রভু রাখ রাখ।

তব কৃপা যে লভে কি ভয় ভবসঙ্কটে
কাটি যাবে বিপদ লাখ॥

প্রথমটী গিরিশ ঘোষের 'বিল্বমঙ্গল' নাটকে আছে, দ্বিতীয় গানটী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক রচিত।

গানের আসরে তিনি আনন্দে যোগদান করিতেন। ঢাকা শক্তি ঔষধালয়ের অধ্যক্ষ মথুর বাবু তাঁহার বাড়ীতে যাত্রা-গানের সময় শুকুল মহারাজকে গাড়ি করিয়া লইয়া যাইতেন। এক দোলপূর্ণিমার দিনে তিনি সব সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারির কাপড় চাদর বাসন্তী রঙে ছোপাইয়া বৈকালে মঠপ্রাঙ্গনে বসিয়া গান ও আনন্দ করিয়াছিলেন। শুকুল মহারাজকে কখনও বিষাদগ্রস্ত দেখা যাইত না। বেলুড় মঠের আদি গৃহদ্বয় যখন প্রথম নির্মিত হইল তখন নূতন বাড়ীর দেওয়ালে কেহ পেরেক মারিলে শুকুল মহারাজ স্বামীজীকে (স্বামী বিবেকানন্দকে) বলিতে শুনিয়াছিলেন, "পেরেকটা যেন আমার গায়ে মারছে। এই বাড়ীর প্রত্যেক ইঁটটির জন্য আমার গায়ের এক এক আউন্স রক্ত দিতে হয়েছে।"

দুই

সম্বলপুরের ভক্ত শ্রীসুশীলকুমার সরকার মাঝে মাঝে বেলুড় মঠে আসিতেন। স্বামী শুদ্ধানন্দজী তাঁহাকে অতিশয় স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। একবার বেলুড় মঠে কথাপ্রসঙ্গে তিনি জানিতে পারেন যে, স্বামী শুদ্ধানন্দের শরীর ভাল যাইতেছে না। তিনি শুদ্ধানন্দজীকে স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য সম্বলপুরে যাইতে অনুরোধ করেন। শুদ্ধানন্দজী সম্বলপুর স্বাস্থ্যকর স্থান জানিয়া তথায় সুবিধামত একবার যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তিনি ১৮।৮।১৬ তারিখে সুশীলবাবুকে এই পত্র দেন, "সম্বলপুর জায়গা কেমন? ওখানকার জলবায়ু যদি ম্যালেরিয়ামুক্ত হয় তবে আমি না যাই, আমাদের মঠ হইতে শুকুল মহারাজ প্রভৃতি কেহ কেহ বর্ষাকালে তথায় যাইতে পারেন। অতএব, ওখানকার সমুদয় অবস্থা এবং কোন দিক দিয়া যাইতে হয় ইত্যাদি খবর বিস্তারিত ভাবে জানাবেন। আর এখানে যদি আসেন সামনেই সব কথাবার্ত্তা হবে।" ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে শারদীয়া

দুর্গাপূজার সময় সুশীল বাবু কলিকাতায় আসেন। তিনি মহাসপ্তমী দিবসে বেলুড় মঠে আসিয়া শুদ্ধানন্দজীর সহিত আলাপনান্তে তাঁহার সম্বলপুর যাইবার কথা উত্থাপন করেন। শুদ্ধানন্দজী কিছুক্ষণ স্থির থাকিয়া একজনকে বলিলেন, "ওহে শুকুল মহারাজকে ডাকত?" একটু পরে আত্মানন্দজী আসিয়া শুদ্ধানন্দজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি সুধীর মহারাজ, ব্যাপার কি?" তিনি আসিয়া একটি খাটে বসিয়াছেন, তাঁহার শরীর অতিশয় রুগ্ন ও দুর্বল। স্বামী শুদ্ধানন্দ একটু নীরব থাকিয়া উপবিষ্ট ভক্তটিকে বলিলেন, "সুশীল, his necessity is greater than mine (তাঁর প্রয়োজন আমার চেয়ে বেশী)। তুমি শুকুল মহারাজকে নিয়ে যাও।" স্বামী আত্মানন্দ পুনরায় সহাস্যে গুরুভ্রাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বলি, ব্যাপারটা কি?" তখন স্বামী শুদ্ধানন্দ তাঁহাকে সুশীল বাবুর সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন এবং সম্বলপুরে স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য যাইতে অনুরোধ করিলেন এবং বলিলেন, "আমারই যাবার কথা ছিল। তবে আপনার ত শরীর খুব খারাপ যাচ্ছে, একবার বেড়িয়ে আসুন।" তদুত্তরে স্বামী আত্মানন্দ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আমি ত হাগা রোগী, রোজ বিশ বার পায়খানায় যাই ও বার্লি খাই। ইনি আমার ঝামেলা সামলাতে পারবেন কি?"

তখন সুশীলবাবু সবিনয়ে বলিলেন, "তবে মশায়, একজন সেবককে নিয়ে যেতে পারেন।" তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, "না মশায়, সেবকের সেবা করতে পারব না। এই চেহারা দেখে যদি সাহস করেন তবে চেষ্টা দেখি।" ইহাতে সুশীলবাবু সানন্দে সম্মত হইলেন এবং সত্বর যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতে বলিলেন। রুগ্ন স্বামী আত্মানন্দকে দেখিয়া সুশীলবাবু চিনিতে পারেন নাই, একটু পরেই তাঁহার পূর্বস্মৃতি জাগ্রত হইল। স্বামী বিবেকানন্দের দেহত্যাগের পর আত্মানন্দজী ও সুরেন মহারাজ বেলুড় মঠে বেলতলায় ধুনী জ্বালিয়া, গায়ে ভস্ম মাখিয়া, মৌনী হইয়া ধুনীর সামনে প্রায় সব সময় বসিয়া থাকিতেন। তিনি চোখ মেলিয়াই ধ্যানস্থ হইতেন, কাহারো সহিত কথা বলিতেন না, বা কাহারো দিকে তাকাইতেন না। তিনি স্থানত্যাগ করিয়া

বাহিরে কোথাও, এমন কি, খাইতেও যাইতেন না। সুশীলবাবু তখন মঠবাস করিতেছিলেন। তিনি আত্মানন্দজীকে তপোনিরত দেখিয়াছিলেন এবং তাঁহার উপর সর্বদা সশ্রদ্ধ দৃষ্টি রাখিতেন। তিনি গভীর রাত্রে উঠিয়াও দেখিয়াছেন, আত্মানন্দজী উক্ত প্রকারে ধুনীর সম্মুখে সমাসীন ও ধ্যানমগ্ন। পূর্ব পরিচয় দিতেই আত্মানন্দজী সুশীলবাবুকে চিনিতে পারিলেন এবং আনন্দিত হইলেন।

স্বামী আত্মানন্দের সম্বলপুর যাত্রা স্থির হইল। বিজয়াদশমীর দুই তিন পরে সুশীলবাবুর সঙ্গে হাওড়া হইতে তিনি ট্রেণে উঠিলেন। ট্রেণে উঠিবার কিছুক্ষণ পরে তাঁহার অসুখ বাড়িতে লাগিল, তিনি বারবার পায়খানায় যাইতে আরম্ভ করিলেন। হাওড়া হইতে সম্বলপুর যাইতে ট্রেনে তিনি প্রায় বিশবার পায়খানায় যাইলেন। সুশীলবাবু ইহাতে অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। আত্মানন্দজী বলিলেন, "মশায়, এখনই এই। পরে আরও কত কষ্টভোগ আছে কে জানে?" সম্বলপুরে যাইয়া আত্মানন্দজীর অসুখ আরও বাড়িল। দিবারাত্রে তিনি পঁচিশ ত্রিশবার পায়খানায় যাইতে লাগিলেন এবং এমন দুর্বল হইয়া পড়িলেন যে, আর পায়খানায় যাইতে পারিলেন না। তিনি সুশীলবাবুকে বলিলেন, "খানকয়েক মাটির সরা এনে দিন; তাইতে পায়খানা যাব। সরা আনা হইলে তাহাতে তিনি পায়খানা করিতে লাগিলেন। সামান্য একটু জলবার্লি ছাড়া আর কিছু খাইতে পারিতেন না। ক্রমে তাঁহার হাঁপানী আরম্ভ হইল। সর্বদাই হাঁপানী চলিত। তাঁহার শ্বাসকষ্ট দেখিয়া অপরে অশ্রুপাত করিতেন। কিন্তু তিনি এই অসুস্থ অবস্থাতেও নির্বিকার ছিলেন। একদিন বলিলেন, "মঠ ছেড়ে এসে এখানেই দেহত্যাগ হবে না কি?" বেলুড় মঠে টেলিগ্রাম করিবার প্রস্তাব করা হইলে তিনি নিষেধ করিলেন। স্থানীয় সিভিল সার্জন ডাঃ তারকনাথ মিত্রকে ডাকা হইল। তাঁহার চিকিৎসাধীনে থাকিয়া ক্রমশঃ তাঁহার হাঁপানী ও উদরাময় সারিয়া গেল। এই অসুখের সময় একদিন তিনি সুশীলবাবুকে বলিয়াছিলেন, "শরীরের ধর্ম শরীর পালন করবেই। স্বামিজীর দেহত্যাগের পর আর সংসারে থাকার মোহ রইল না। শরীর থাক

আর যাক এই সঙ্কল্প নিয়ে, আহার নিদ্রা ত্যাগ করে যেখানে সেখানে পড়ে থাকতাম। ঘরে ঢুকতাম না, কারো সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছা হতো না, খাওয়া দাওয়ার কথা মনে উঠত না। ক্রমে মঠের কেহ কেহ খবর পেয়ে আমাকে নিয়ে আসেন।"

সম্বলপুরে পণ্টন কুঁয়া নামে একটি বিখ্যাত কূপ ছিল। উহার জল বিশেষ হজ্‌মী ও কোষ্ঠপরিষ্কারক। এই কুয়ার জলপান, সুচিকিৎসা ও সুপথ্যাদির দ্বারা তিনি ধীরে ধীরে সুস্থ হইলেন এবং তাঁহার স্বাস্থ্য এত উন্নত হইল যে, লোকে তাঁহাকে দেখিয়া অবাক হইত। দুধ ও আল্‌তা মিশাইলে যেরূপ সোনার রঙ্‌ হয় সেইরূপ সুন্দর রঙ্‌ তাঁহার গায়ে ফুটিয়া উঠিল। মঠের ভক্তগণ ও ভদ্রলোক আসিলে তিনি তাঁহাদের সহিত সৎপ্রসঙ্গ আরম্ভ করিতেন এবং তাঁহার জপ-ধ্যান, পূজা-পাঠ নিয়মমত চলিতে লাগিল। তাঁহাকে সর্বদা সহাস্য ও প্রফুল্ল দেখা যাইত। তিনি কখন কখন নানারূপ রসিকতাও করিতেন। একদিন কোন ভক্তকে বলিলেন, "এক জোড়া ডাম্বেল আমাকে এনে দিন।" তিনি নিজ ঘরে দরজা জানালাদি বন্ধ করিয়া ডন-বৈঠকাদি করিতে আরম্ভ করিলেন। সম্বলপুরের জলবায়ুতে তাঁহার শরীর সুস্থ হওয়ায় তিনি এক সময়ে বলিয়াছিলেন, "বেলুড় মঠে তো সব পেট-রোগা সাধুব্রহ্মচারী। এখানে ঠাকুরের নামে একটা আস্তানা হলে বেশ হয়। অসুস্থ সাধুরা স্বাস্থ্যলাভের জন্য এখানে আসতে পারবে।"

তাঁহার ঘরের দেওয়ালে ঠাকুর ও মায়ের ছোট ছোট ছবি ছিল। উহাই তিনি প্রথমে পূজা করিতেন। পরে দেওয়ালে একটা র‍্যাক টাঙ্গাইয়া উহাতে ঠাকুর ও মায়ের ছবি দুইটির সহিত স্বামিজীর ও মহারাজের ছবি সংগ্রহ করিয়া রাখেন। সুশীল বাবুর ছুতারের কারখানা ছিল। আত্মানন্দজী তথায় নিজে বসিয়া উক্ত ছবি চারখানির মাপে একটি সুন্দর সিংহাসন বানাইয়া লইলেন। সিংহাসনটি তাঁহার ক্ষুদ্র কক্ষেই থাকিত। তথায় তিনি নিত্য ঠাকুর পূজা করিতেন। তাঁহার ঘরটি পূর্বমুখী ও বড় রাস্তার উপরে ছিল। ক্ষুদ্র ঘরটিতে খাট, বিছানা, সিংহাসনাদি জিনিষপত্র অতি সুশৃঙ্খলভাবে সাজাইয়া রাখিতেন।

খোলা ছুরী খানি কিরূপে রাখা উচিত তাহা তিনি একটি ছোট ছেলেকে একদিন শিখাইয়া দিলেন। তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যে ও আচারে অপূর্ব্ব পারিপাট্য ও শৃঙ্খলা দেখা যাইত। যেখানে যেটি রাখা উচিত সেখানে সেটি থাকিত। উহা স্থানান্তরিত হইলে তিনি বিরক্ত হইতেন। যে ছেলেটিকে তিনি খোলা ছুরী কি ভাবে রাখিতে হয় শিখাইয়া ছিলেন তাহাকে বলিয়া ছিলেন, "দেখ, রাতে অন্ধকারে টেবিলের উপর থেকে তুমি হয়ত ছুরীটা আনতে গেলে, বা তার পাশের কোন জিনিষ নেবার জন্য হাত বাড়ালে। ছুরীর ধারের দিকটা যদি ঠিক ভাবে না থাকে তাহলে অসাবধানতায় বা তাড়াতাড়িতে হাত কেটে যাবে। আর যদি ধারের দিকটা দেওয়ালের দিকে রাখ তাহলে কোন ভয় থাকে না। আর শৃঙ্খলা করে জিনিষ রাখার অভ্যাসও হয়, যাতে প্রয়োজনের সময় কোন জিনিষ হাতড়াতে না হয়।" এই কথা বালকটিকে বলিয়া তিনি স্বগতোক্তি করিলেন, Every thing must be in its proper place. (প্রত্যেক জিনিষটি যথাস্থানেই থাকবে)।

এই শৃঙ্খলার ভাবটী অনেকে স্বামী আত্মানন্দের নিকট শিখিয়া স্ব স্ব জীবনে কার্য্যকরী করিয়াছেন। এরূপ সদ্‌গুণ তাঁহার বহু ছিল এবং যাঁহারা তাঁহার সংস্পর্শে আসিতেন তাঁহারাই সেইগুলি শিক্ষা করিতে স্বতঃপ্রণোদিত হইতেন। কোন বালক তাঁহার বহু গুণ স্বতঃই শিক্ষা করিত এবং বাড়ীতে কাজে লাগাইত। এই জন্য তিনি বালকটীকে অতিশয় স্নেহ করিতেন এবং প্রায় প্রত্যহ সঙ্গে করিয়া বেড়াইতে যাইতেন। শেষে তিনি অনুগত বালকের পূর্ব্ব নাম বদলাইয়া অন্য নামে তাহাকে ডাকিতেন। তিনি সম্বলপুর ত্যাগের কিছু দিন পরেই বালকটী হঠাৎ মারা যায় চব্বিশ ঘণ্টার জ্বরে। এই মৃত্যু-সংবাদ তাঁহার নিকট প্রেরিত হইলে তিনি পত্রে লিখিয়াছিলেন, "ফণীর মৃত্যু-সংবাদে বিশেষ বিহ্বল হলাম। এক হাতে চোখের জল মুচ্‌ছি, আর এক হাতে এই চিঠি লিখছি। ছেলেটী সত্য সত্যই আমাকে স্নেহে আবদ্ধ করেছিল এবং বেঁচে থাকলে মানুষ হতো।" ভাবুক সত্যই বলিয়াছেন, Those who are beloved of God die young. অর্থাৎ যাহারা ঈশ্বরের প্রিয় তাহারা অল্প বয়সেই দেহত্যাগ করে।

স্বামী আত্মানন্দ অত্যন্ত চাপা সাধু ছিলেন। তিনি যে ইংরাজি জানিতেন ইহা প্রকাশ করেন নাই, একটী ইংরাজি কথাও বলেন নাই। কেহ কেহ ভাবিয়াছিলেন, তিনি ইংরাজি জানিতেন না। একটু সুস্থ হইয়াই তিনি রোজ বারান্দায় চেয়ারে বসিতে লাগিলেন এবং লোকজন আসিলে কথাবার্তা বলিতেন। স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটীর সেক্রেটারি জনৈক মারাঠি ভদ্রলোক একদিন আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "I do not know Bengali. May I speak with you in English?" (আমি বাংলা জানি না। আপনার সঙ্গে আমি ইংরাজিতে কথা বলিতে পারি কি?) তদুত্তরে আত্মানন্দজী বলিলেন, "yes" (হাঁ)। মারাঠী ব্যক্তির সহিত ২০।২৫ মিনিট ইংরাজিতে কথা হইল। তাঁহার শুদ্ধ, fluent (দ্রুত) ও উচ্চ ধরণের ইংরাজি শুনিয়া ভক্তগণ অবাক্ হইলেন। কোন ভক্ত তাঁহাকে বলিয়া ফেলিলেন, "মহারাজ, আমার বিশ্বাস ছিল আপনি ইংরাজি জানেন না। আপনি যে এত সুন্দর ইংরাজি বলতে পারেন তা ভাবতেই পারিনি।" স্বামী আত্মানন্দ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আরে মশায়! সাধুর ঝুলিতে কত রকম জিনিষ থাকে। দরকার না হলে কি বার করে।" কলিকাতার মদন বড়াল লেনের ৺বিপিন বিহারী দে * তাঁহার সহপাঠী ছিলেন। তিনি একদা বলিয়াছিলেন, "শুকুল মহারাজ এণ্ট্রান্স ও এফ. এ. পরীক্ষায় compete (প্রতিযোগিতা) করেছিলেন। তিনি রিপণ (বর্তমান সুরেন্দ্রনাথ) কলেজে পড়িতেন। কলেজে পড়িবার সময় তিনি মঠের সাধুদের সংস্পর্শে এসে বৈরাগ্যবান্ হন এবং চতুর্থ শ্রেণীতেই সাধু হয়ে যান। স্বামী বিরজানন্দ, বোধানন্দ ও প্রকাশানন্দ প্রভৃতি সম্ভবতঃ তাঁহার সহপাঠী ছিলেন, তা না হলে একটু আগে কি পাছে।"

কটকের ভক্ত কৃষ্ণচন্দ্র সেনগুপ্ত ১৯১৬ খ্রীঃ সম্বলপুর হাই স্কুলে শিক্ষক ছিলেন। তিনি সুশীলকুমার সরকারের বাড়ীতে যাইয়া স্বামী আত্মানন্দকে প্রায়ই

---

* ইঁহার কনিষ্ঠ সহোদর বিনোদ বিহারী দে বেলুড় মঠে সন্ন্যাসী হইয়া স্বামী ব্রহ্মস্বরূপানন্দ নামে পরিচিত হন।

দর্শন করিতেন। স্বামী আত্মানন্দ বাল্যকালে চাঁচল রাজবাড়ীর বিশাল মন্দিরের পূজক স্বীয় পিতৃব্যের নিকট থাকিয়া লেখাপড়া করিতেন। সেই কথা উল্লেখ করিয়া উক্ত ভক্তকে তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি ছেলেবেলায় এক মঠে থাকিয়া লেখাপড়া করিতাম। তারপর স্বামিজীর আকর্ষণে রামকৃষ্ণ মঠে চলিয়া আসিলাম। সুতরাং আমাকে বেশী কিছু ত্যাগ করিতে হয় নাই। এক মঠ হইতে অন্য মঠে আসিলাম মাত্র।" অন্যদিন তাঁহার কাছে উক্ত ভক্ত এবং অন্যান্য দুই তিন জন ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে একজন প্রশ্ন করিলেন, কি করে কাম দমন করা যায়? তদুত্তরে স্বামী আত্মানন্দ বলিলেন, "কাম কী জিনিষ আমি জানি না। জীবনে কখনও আমি কামের তাড়না অনুভব করি নাই।" এই কথা শুনিয়া সমবেত ভক্তগণ বিস্মিত হইয়াছিলেন এবং বুঝিয়াছিলেন, স্বামী আত্মানন্দ কত বিশুদ্ধ ও কত বিমল। লোকজনের সমক্ষে তিনি স্বামী বিবেকানন্দের কথাই বলিতেন এবং স্বামীজীর বইই পড়িতেন বা শুনিতেন। ঠাকুরের কথা তিনি বিশেষ বলিতেন না এবং তৎসম্বন্ধীয় বই কচিৎ পড়িতেন বা শুনিতেন। কিছুদিন ইহা লক্ষ্য করিয়া উল্লিখিত ভদ্রলোক একদিন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, আপনি ঠাকুরের কথা বলেন না কেন? সর্বদাই প্রায় আপনি স্বামিজীর কথাই বলিয়া থাকেন।" ইহাতে তিনি উত্তর দিলেন, "যে ঠাকুর অনবরত সমাধিস্থ থাকিতেন এবং যাঁহাকে আমাদের plane এ (ভূমিতে) আসিবার জন্য সমাধিস্থ হইবার আগে একটা বাসনা রাখিতে হইত সে ঠাকুরের কথা আমি কী বলব? তাঁকে ধরতে পারলে তো তাঁর কথা বলব। স্বামিজী সাধারণ plane এর (ভূমির) কতকটা উপরে; তাঁকে বুঝবার ধরবার চেষ্টা করা যেতে পারে। সেইজন্য তাঁর কথা বলতে বা তাঁকে ধরবার চেষ্টা করতে তেমন কষ্টকর মনে হয় না।" উল্লিখিত কৃষ্ণচন্দ্র বাবু বলেন, "স্বামী আত্মানন্দের মত শুদ্ধস্বভাব, অমায়িক, অন্তর্মুখ ও সাধননিষ্ঠ সাধু জীবনে খুব অল্পই দেখিয়াছি। তাঁর শরীর রুগ্ন ও সুস্থ হইত, কিন্তু তাঁহার মন সর্বদা সুস্থ থাকিত।"

সম্বলপুরের অবাঙ্গালী ভদ্রলোক গোপীনাথ গারতিয়া স্বামী আত্মানন্দের

পূত সঙ্গলাভে ধন্য হইয়াছিলেন। তিনি বর্তমান লেখককে লিখিয়াছেন, "স্বামী আত্মানন্দ সুশীলকুমার সরকারের গৃহে একটি ক্ষুদ্র কক্ষে পরমানন্দে বাস করিতেন। যদিও তিনি তথায় দুই বৎসরাধিক ছিলেন তথাপি তিনি উক্ত গৃহের কোন বস্তু বা ব্যক্তির প্রতি কিঞ্চিৎ মাত্র অনুরক্ত হন নাই। তিনি সকালে ও সন্ধ্যায় অনেক দূর বেড়াইতে যাইতেন। বেড়াইবার সময় তাঁহার কোন সঙ্গীর প্রয়োজন হইত না। নূতন নূতন রাস্তায় ও প্রান্তরে তিনি একাকী বেড়াইতে ভালবাসিতেন। সহরের বহিঃপ্রান্তে অবস্থিত পুরান পরিত্যক্ত জীর্ণ মন্দিরাদি তিনি দেখিতেন। ঐ সকল মন্দিরে যাইবার ভাল পথ না থাকিলেও কষ্ট স্বীকার করিয়া তিনি যাইতেন এবং ঐ সকলের তথ্য সংগ্রহ করিতেন। গ্রামের বা সহরের উপকণ্ঠে নির্জন স্থানে বা মন্দিরে বাস করিবার ইচ্ছা কখন কখন তিনি প্রকাশ করিতেন। তাঁহার অভ্যাসগুলি নিয়মবদ্ধ ছিল। তিনি সর্বদা অত্যন্ত গম্ভীর ও অন্তর্মুখী থাকিতেন। জিজ্ঞাসিত না হইলে তিনি কদাচিৎ কথা বলিতেন না। আন্তরিক আগ্রহ সহকারে কোন প্রশ্ন না করিলে তাঁহার চিত্ত-দ্বার উন্মুক্ত হইত না। তিনি স্বাধীন, সরল, অগ্রবর্তী, সাহসী ও নির্ভীক সন্ন্যাসী ছিলেন। তাঁহাকে দেখিলে তৎগুরুর অবিকল প্রতিচ্ছবি বলিয়াই মনে হইত। প্রষ্টার প্রশ্ন আন্তরিক হইলে তাঁহার নিকট হইতে সন্তোষজনক ও সন্দেহভঞ্জক উত্তর আসিত। বস্তুতঃ যাঁহারা তাঁহার সান্নিধ্যে বসিবার সৌভাগ্যলাভ করিতেন তাঁহারা পবিত্র দেব-সান্নিধ্যের প্রেরণা পাইতেন। সম্বলপুরে তাঁহার অবস্থানকালে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের যে জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয় তাহাতে দরিদ্র-নারায়ণ সেবায় বিশেষতঃ তিনি পরম আনন্দ ও আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। উৎসবের এই অঙ্গ তাঁহার নিকট যে বাস্তবতা সৃষ্টি করিত তাহা প্রাকৃত বুদ্ধির অগোচর।"

রাচীর ভক্ত শ্রীগৌরীকান্ত বিশ্বাস ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে অক্টোবর হইতে ডিসেম্বর পর্যন্ত তিন মাস কাল সম্বলপুরে স্বামী আত্মানন্দের পূত সঙ্গলাভে ধন্য হন। যখন আত্মানন্দজী সম্বলপুরে যান তখন তাঁহার শরীর সুস্থ ছিল না। কয়েকদিন পরে তিনি একদিন সুস্থ হইলে গৌরীকান্ত বাবু তাঁহার নিকট যাইয়া কুশল প্রশ্নাদি করিতেন। একদিন আত্মানন্দজী তাঁহাকে কথাপ্রসঙ্গে

জিজ্ঞাসা করিলেন, "অফিসের এবং সংসারের কাজকর্ম ছাড়া আপনার অন্য সময় কি ভাবে কাটে ?" গৌরীকান্ত বাবু উত্তর দিলেন, "একটু একটু 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত' পাঠ করি।" আত্মানন্দজী ভক্তটিকে পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, "পূজ্যপাদ স্বামিজী মহারাজের বইগুলি পড়েছেন কি ?" তদুত্তরে ভক্তটি 'না' বলায় আত্মানন্দজী বলিলেন, "স্বামিজীর বইগুলি না পড়িয়া এবং উহাদের মর্মার্থ হৃদয়ঙ্গম না করিয়া 'কথামৃত' পড়িলে কি বুঝিবেন ? 'কথামৃত' নবযুগের বেদ এবং স্বামিজীর রচনাবলী সেই বেদের ভাষ্য। ভাষ্য না পড়িলে বেদ বোঝা যায় না। কাজেই ভাষ্য পাঠ করিয়া বেদপাঠ করিলে বেদের ভাবার্থ হৃদ্‌গত হয়।' এই বিষয়টি ভক্তের হৃদয়ে দৃঢ় ভাবে মুদ্রিত করিবার জন্য তিনি দুই একটি উদাহরণ দিলেন এবং স্বামিজীর মৌলিক রচনাবলী পড়িতে ভক্তটিকে বলিলেন।

ইহার কয়েকদিন পরেই ভক্তটি স্বামী বিবেকানন্দের My Master (মদীয় আচার্য্যদেব) নামক ইংরাজী বইখানি পড়িতে আরম্ভ করিলেন। বলা বাহুল্য, ভক্তটি পাঠক এবং শ্রোতা স্বয়ং স্বামী আত্মানন্দ। কোন কোন দিন সুশীলবাবু এবং অন্যান্য দুই একটি ভদ্রলোক আসিয়া জুটিতেন। আত্মানন্দজী অধিকাংশ স্থলে পঠিত বিষয়ের ভাবার্থ বুঝাইয়া দিতেন। ভক্তটি সহরপ্রান্তে ব্রুক্‌স হিল পাহাড়ের উপর সরকারী কোয়ার্টারে থাকিতেন এবং সন্ধ্যায় আসিয়া উক্ত গ্রন্থ পড়িতেন। পাঠ সন্ধ্যা হইতে সাড়ে আট নয় ঘটিকা পর্য্যন্ত দুই তিন ঘণ্টা ধরিয়া চলিত। আত্মানন্দজী প্রত্যহ প্রাতে ব্রুক্‌স হিলের রাস্তায় বেড়াইতে যাইতেন এবং কোন কোন দিন পাহাড়ের চারিদিক ঘুরিয়া আসিতেন। কিছুদিন পরে তিনি বৈকালেও প্রায়ই উক্ত পাহাড়ের দিকে বেড়াইতে যাইতেন। একদিন এই পাহাড়ের গায়ে একটি ভগ্ন মন্দির দেখিয়া তিনি সঙ্গী ভক্তটিকে প্রশ্ন করিলেন, "দেখুন তো, উহার ভিতরে কোন বিগ্রহ আছে কিনা। ভক্তটি ভিতরে যাইয়া কোন মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন না। ইহাতে আত্মানন্দজী বলিলেন, "সম্ভবতঃ এটা শিবমন্দির।' পরে অনুসন্ধানে জানা গেল, সত্যই সেটা শিব মন্দির। স্থানটি নির্জন ও সুন্দর দেখিয়া তিনি মন্তব্য করিলেন, "এখানে সাধুদের একটি আস্তানা হইলে মন্দ হয় না।"

একদিন ভক্তগণের ধর্মালোচনা সম্বন্ধে কথা উঠিল। কেহ কেহ বলিলেন, সঙ্ঘবদ্ধভাবে ধর্মচর্চা করিলে ভাব প্রচার ভাল হয়। এই প্রসঙ্গে স্বামী আত্মানন্দ বলিলেন, "এইরূপ ধর্মসংঘ সভা ডাকিয়া বা লোক জুটাইয়া গঠন করা যায় না, এইরূপ করিলে উহা স্থায়ীও হয় না। চরিত্রবলে দুই একজন কাজ করিলে সাধারণ লোক আপনা হইতেই আকৃষ্ট হয়, লোক ডাকিবার দরকার হয় না।" ইহা কিরূপে সম্ভব জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, "কোন সৎকাজ, বিশেষতঃ ধর্মবিষয়ক কাজ করিতে গেলে প্রথম দরকার আন্তরিকতা ও নিয়মানুবর্তিতা। কোথাও আশ্রম বা ধর্মসঙ্ঘ বা হরিসভা প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে প্রথমে বিজ্ঞাপন দিয়া বা জনসাধারণকে অনুরোধ করিয়া একত্রিত করা অপেক্ষা নিয়মিত ভাবে কোন সাধারণ স্থানে একটু ভক্তি ভাবে ধূপদীপ সহকারে সমভাবাপন্ন দুই একটি বন্ধুকে লইয়া, অভাবে একাকী কোন ধর্মপুস্তক পাঠ করিতে হয়, যাহাতে পাঠ অন্যের শ্রুতিগোচর হয়। প্রথমতঃ পাঁচ সাত দিন কোন শ্রোতা না আসিতে পারে। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ে প্রত্যহ পাঠ হইতেছে দেখিয়া কোন পথিক হয়ত রাস্তা হইতে দুই একটি কথা শুনিয়া দেখিয়া যাইবে। কিন্তু ধর্মভাবের এমনই মহিমা যে, অচিরেই দুই এক জন করিয়া লোক আসিয়া বসিবে এবং পাঠ শুনিবে। পয়সা খরচ করিতে হয় না, অথচ ধর্মকথা শোনা যায় দেখিয়া ক্রমে বহু লোক জুটিয়া যাইবে। যদি কৃত্রিমতা না থাকে এবং যথাসময়ে ভক্তিভরে পাঠ চলিতে থাকে তাহা হইলে কালক্রমে উহার একটি উত্তম ধর্মসংঘে পরিণত হওয়া বিচিত্র কিছু নহে। ক্রমশঃ শ্রোতাদের মধ্যে হইতেই এমন সব কর্মী আসিয়া জুটিতে পারে যাহারা আশ্রমকে সর্ব বিষয়ে উন্নত করিতে চেষ্টা করিবে এবং উহার তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ সমর্থ হইবে।" স্বামী আত্মানন্দের এই উক্তির সার্থকতা স্ব স্ব কর্মক্ষেত্রে অনেকেই উপলব্ধি করিয়াছেন।

স্বামী আত্মানন্দের অন্তর্দৃষ্টি কত গভীর ছিল তাহা নিম্নোক্ত ঘটনা হইতে বুঝা যায়। রাঁচীর উল্লিখিত ভক্ত সম্বলপুরে অবস্থানকালে কোন বন্ধুর বাটীতে প্রতি শনিবার 'কথামৃত' পাঠান্তে ভজন করিতেন। উক্ত সাপ্তাহিক

অধিবেশন এক শনিবার সুশীলবাবুর বাড়ীতেই করা হইল আত্মানন্দজীকে ভজন শুনাইবার জন্য। তিনি আন্তরিক আগ্রহ প্রকাশ করিয়া পাঠ ও ভজন শুনিতে আসিলেন। পাঠের পূর্বে ও পরে তিন চার খানি গান গাওয়া হ ইল। ভজনান্তে যথারীতি প্রসাদ বিতরিত হইল। সকলে প্রসাদ লইয়া চলিয় গেলে আত্মানন্দজী গায়ককে ডাকিয়া বলিলেন, "গান তো বেশ হইল, কিন্তু ভিতরের ভাব তো সে রকম গভীর বোধ করিলাম না।" উক্ত মন্তব্য শ্রবণে গায়ক দমিয়া গেলেন, কিন্তু পরে বুঝিলেন যে, মন্তব্য যথার্থ হইয়াছে। কারণ গানের সুর ও তাল ইত্যাদির দিকে গায়কের নজর বেশী থাকায় ভাবের ঘরে চুরি হইয়াছিল।

কিসে গৃহী ভক্তের কল্যাণ হয় অসুস্থ শরীরেও স্বামী আত্মানন্দ তাহা ভাবিতেন। কখনও কখনও তিনি ভক্তদের নিকট হইতে সামান্য সেবা চাহিয়া লইয়া তাহাদের কৃতার্থ করিতেন। উল্লিখিত গৌরীবাবু হোমিওপ্যাথিক ঔষধের একটি বাক্স রাখিতেন এবং স্বগৃহের বা বন্ধু-বাড়ীর কেহ অসুস্থ হইলে তাহাকে ঔষধ দিতেন। একবার স্বামী আত্মানন্দের একটু সর্দি-কাশী হয়। তখন তিনি উক্ত ভক্তকে বলিলেন, "আপনি তো ভক্ত এবং হোমিওপ্যাথিক ঔষধ রাখেন। আমার এ কাশীটার জন্য একটা ঔষধ দিবেন।" ভক্তটি ভাবিয়া চিন্তিয়া একটি ঔষধ দিলেন এবং উহাতে আত্মানন্দজীর কিছু উপকারও হইয়াছিল। আর একটি ঘটনা। উক্ত ভক্ত ছুটিতে দেশে যাইতে মনস্থ করিলেন। যাইবার পূর্বে আত্মানন্দজী তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি আমাকে একটা কিছু দিও। আচ্ছা, কি আর দিবে। তবে বসিবার জন্য একটা আসন এবং জলখাবার জন্য একটি জলপাত্র দিও।" একটু পরে আবার বলিলেন, "যে কম্বল খানায় তোমার বাসায় গেলে বসি ঐটা এবং যে মাঝারি বালতিতে হাত পা ধোয়ার জল রাখা হয় ঐটা দিও।" ভক্তের কল্যাণ কামনায় একটি পুরাতন বালতি ও একটি পুরাতন কম্বল তিনি চাহিলেন। অথচ তিনি সঞ্চয়ী সাধু ছিলেন না, অথবা তনি যথায় ছিলেন তথায় তাঁহার উক্ত দ্রব্যদ্বয়ের অভাবও ছিল না। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনেও দেখা যায়, কোন কোন ভক্তের বাড়ীতে যাইয়া জল

বা পান চাহিয়া তিনি খাইতেন, যদি উক্ত ভক্ত তাঁহার কোন প্রকার সৎকার বা সমাদর না করিতেন।

কোন ভক্ত ভাবিতেন গান গাহিয়া বা সামান্য জপধ্যান করিয়া যে তন্ময়তা আসে তাহার দ্বারা সাধন-পথে অনেক দূর অগ্রসর হওয়া যায়। কথাপ্রসঙ্গে উক্ত ভাব ব্যক্ত হওয়ায় আত্মানন্দজী তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "ঐরূপ তন্ময়তা স্থায়ী হইয়া যখন জ্যোতিঃদর্শনাদি হইবে তখনই বুঝিবেন, একটা অবস্থা লাভ হয়েছে।" ভক্তদের প্রাত্যহিক পাঠ নিয়মিত ভাবে চলিতেছিল। My Master শেষ হইলে স্বামিজীর বাংলা মৌলিক রচনাগুলি পড়া আরম্ভ হইল এবং ক্রমশঃ "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য," 'পরিব্রাজক' ও 'বীরবাণী' পড়া হইল। পরে স্বামিজীর ইংরাজী রচনা 'কর্মযোগ' ও 'ভক্তিযোগ' আরম্ভ হইল। পাঠের গতি অতি মন্থর ছিল, কারণ আলোচনাই বেশী হইত।

স্বামী আত্মানন্দ একজন ভাল শিল্পী ছিলেন। উপরোক্ত সিংহাসনটি তিনি এমন নূতন design (রকম)এ নির্মাণ করাইয়াছিলেন যাহা সাধারণতঃ অন্যত্র দেখা যায় না। বেলুড় মঠের বহু সাধু ইহা দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইয়াছেন। উক্ত সিংহাসনে তৎপ্রতিষ্ঠিত আলেখ্যচতুষ্টয় এখনো পূজিত হইতেছে। তিনি যে ঘরে থাকিতেন সেই ঘরেই সিংহাসনটি ছিল ও পূজা হইত। তাঁহার ঘরটি ঠাকুর-ঘরের মত পবিত্র ও সুন্দর দেখাইত। সুস্থ হইয়া যখন তিনি ধর্মগ্রন্থাদি পাঠ আরম্ভ করিলেন তখন প্রথমে চেয়ার ও টেবিল ব্যবহৃত হইত। শ্রোতার সংখ্যা যখন বাড়িয়া উঠিল তখন নীচে বসিয়া পাঠের প্রয়োজন হইল। উক্ত পাঠে ব্যবহারের জন্য দুই তিন দিন ভাবিয়া তিনি উপরোক্ত combined desk-table (সংযুক্ত ডেস্ক-টেবিল) করাইলেন যাহাকে ইচ্ছামত টেবিল করা যায়, আবার মুহূর্তমধ্যে ডেস্কে পরিণত করা সম্ভব। উহার নির্মাণ-কৌশল দেখিয়া উচ্চপদস্থ ইঞ্জিনীয়ার এবং প্রবীণ ছুতার প্রভৃতি সকলেই অবাক হইয়া গেলেন। সেটি এখনও পূর্বাবস্থায় সংরক্ষিত আছে।

স্বামী আত্মানন্দ আলোচনা সভায় নিজে গ্রন্থপাঠ করিতেন না, ঠাকুরের

কোন ভক্তকে দিয়া উহা করাইতেন। স্বামিজীর কোন বই পড়িবার সময় একদিন স্থানীয় জনৈক উকিল পাঠ করেন। পাঠক উচ্চারণাদির দিকে অধিক মনোযোগী ছিলেন, আন্তরিক ভাবগ্রাহী ছিলেন না। সেইজন্য সেদিনকার পাঠ পূর্ববৎ জমিল না। পাঠান্তে উকিলটি চলিয়া গেলে আত্মানন্দজী নিত্য পাঠক সুশীলবাবুকে বলিলেন, "আজকের পাঠটাই নষ্ট করে দিয়েছেন উকিল বাবু। আপনি আগের থেকে আসনে বসে যাবেন ও পড়তে আরম্ভ করবেন। ঠাকুর স্বামিজীর ভাব না পেলে কি কেউ এসব বই ঠিক্ ঠিক্ পড়তে পারে? খালি পাশ করলে বা ইংরাজী জানলে কী হবে?" পাঠের সময় আত্মানন্দজী চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতেন। কোন শ্রোতা কিছু বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলে তাহা বুঝাইয়া দিতেন। একদিন একটি বই অনেকখানি পড়া হইল। আত্মানন্দজী পাঠের পরে বলিলেন, "স্বামিজীর বই এক সঙ্গে এতখানি পড়ে কেউ কি কিছু হৃদয়ংগম করতে পারে? আমি তো অনেক সময় তাঁহার একটা বাক্যের ভাব বুঝবার জন্য পনের দিন চিন্তা করেছি।"

সুস্থ হইবার পর স্বামী আত্মানন্দের দৈনিক কার্যক্রম এইরূপ ছিল। তিনি প্রত্যুষে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে প্রায় এক মাইল বেড়াইতেন। ভ্রমণান্তে একটু বিশ্রাম, কিছুক্ষণ স্বামিজীর বই পাঠ, স্নান, পূজা, আহার ও মধ্যাহ্ন বিশ্রাম।. বিশ্রামান্তে নিত্য গিরিশ গ্রন্থাবলী পাঠ। সন্ধ্যার পূর্বে পুনরায় ভ্রমণ। ভ্রমণান্তে সমাগত ভক্তদের সহিত কথাবার্তা ও ধর্মালোচনা ও গ্রন্থ পাঠ। সন্ধ্যার পর জপ-ধ্যান, আহার ও শয়ন। এইভাবে তাঁহার জীবন ঘড়ির কাঁটার মত প্রায় আড়াই বৎসর সম্বলপুরে কাটিয়াছিল।

স্বামী আত্মানন্দ কাহারও নিকট হইতে কিছুই চাহিতেন না, আবশ্যকীয় দ্রব্যের অভাব হইলেও। একদিন তিনি স্নান করিয়া আসিবার পর কোন ভক্ত লক্ষ্য করিলেন, তিনি যে কাপড়খানি পরিয়াছেন তাহা বহু স্থানে ছিন্ন। তিনি হাসিতে হাসিতে আত্মানন্দজীকে বলিলেন, "মহারাজ, আপনি যে কাপড়খানি পরেছেন সেটিত একেবারে ছেঁড়া। ওকি আর পরা যায়?" আত্মানন্দজীও সহাস্যে উত্তর দিলেন, "আর থাকলে ত পরব!" ভক্তটি এই উত্তর

শুনিয়া লজ্জায় মস্তক অবনত করিলেন এবং বাজার হইতে অবিলম্বে নূতন কাপড় কিনিয়া আনিয়া তাঁহাকে দিলেন। ভক্তটি যখন নূতন কাপড়খানির গেরুয়া রং করিয়া দিতে চাহিলেন তাহাতে সন্ন্যাসী আপত্তি করিয়া বলিলেন, "আপনি পারবেন না।" সন্ন্যাসী স্বয়ং ভাল গেরুয়া-মাটি আনাইয়া কাহারো সাহায্যে কাপড় রং করাইলেন। উক্ত ভক্ত তাঁহাকে বলিলেন, "আপনার বাক্সে কাপড় আছে। সেদিন রৌদ্রে দিয়েছিলেন দেখলাম। তাই আর কাপড়ের কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করিনি!" তিনি উত্তর দিলেন, "আরে মশায়, ও কাপড় কি আমার ব্যবহারের জন্য? উহার কোন খানি দিয়েছেন মা ঠাকুরুণ, কোনখানা স্বামিজী এবং কোনখানা মহারাজ। ও সব কাপড় কি ব্যবহার করা যায়। ওগুলি যত্ন করে রেখে দিয়েছি এবং মাঝে মাঝে মাথায় ঠেকাই; আর কখনো কখনো রৌদ্রে দেই, যাতে নষ্ট না হয়।" এইরূপে প্রাপ্ত কয়েকখানি ভাল কাপড় ও চাদর তাঁহার সুটকেশে ছিল। ভক্তটি বিশ্বাস করিতেন, উক্ত চামড়ার বাক্সে সন্ন্যাসী কিছু পয়সা-কড়ি রাখেন। একদিন কাপড়গুলি রৌদ্রে দিবার সময় যখন বাক্সটিও খালি করিয়া রৌদ্রে রাখা হইল তখন বাক্সে টাকা নাই দেখিয়া ভক্তটি অবাক হইলেন। তিনি আত্মানন্দজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, আপনার টাকা-পয়সা কোথায় থাকে?" তিনি স্বভাবসিদ্ধ হাস্যমুখে উত্তর দিলেন, "সাধুর আবার টাকাকড়ি কিসের? সাধুর কি টাকা-পয়সা রাখতে আছে?" পরে ভক্তটি জানিলেন যে, তিনি একটি পয়সা কখনো কাছে রাখেন না।

তাঁহার কাছে যে চার পাঁচ জন ভদ্রলোক প্রায় রোজই আসিতেন তাঁহাদের মধ্যে একজন উকিল, একজন ইঞ্জিনিয়ার এবং আর একজন ডিষ্ট্রীক্ট্ বোর্ডের হেডক্লার্ক ছিলেন। তাঁহাদের কাহারো নিকট তিনি কখনো টাকা-পয়সা চান নাই। প্রত্যহ তাঁহার নিকট ধর্মপুস্তকপাঠ ও ধর্মালোচনা হইত। একবার তিনি ইচ্ছা করিলেন, রবিবারে সহরের বাহিরে কোন নির্জন প্রান্তরে যাইয়া শাস্ত্র পাঠ ও আলোচনাদি করা হউক। সম্বলপুরে তখন গরু-চালিত টাঙ্গাই বেশী প্রচলিত ছিল। উপরোক্ত হেডক্লার্ক একটি টাঙ্গা এইজন্য দিলেন। সুশীল

বাবুর বলদ দ্বারা সেই টাঙ্গা চালিত হইল। উক্ত টাঙ্গায় চড়িয়া সহরের বাহিরে কোন স্থানে যাইয়া প্রত্যেক রবিবার পাঠ হইতে লাগিল। এইরূপ পাঠের সময় অনেকে পাঁচ রকম কথাবার্তা বলিতে ও আলোচনা করিতে চাহিতেন। তিনি ইহাতে আপত্তি করিয়া বলিতেন, "মহাপুরুষদের কথা বা তাঁদের মুখ-নিঃসৃত বাক্য বা কোন ভাব নিয়ে আলোচনা করলে বিশেষ ফলপ্রদ হয়। স্বামিজীর সারগর্ভ উক্তিসমূহ আমি দিনের পর দিন ধ্যান করেছি। এরূপ করলেই কিছু উপলব্ধির সম্ভাবনা হয়। ঠিক ঠিক ভাব গ্রহণ না করে পাতার পর পাতা পড়লে কি লাভ ?"

ঐ সকল পাঠে অনেকেই 'কথামৃত' পড়িবার পরামর্শ দিতেন। তদনুযায়ী কিছুদিন 'কথামৃত' পড়া হইল। কয়েকদিন পরে তিনি কোন ভক্তকে বলিলেন, "সকলে আসবার পূর্বেই আপনি স্বামিজীর বই খুলে বসবেন।" অতিশয় উচ্চ অবস্থা লাভ না হলে 'কথামৃতে'র সারগর্ভ উপদেশ উপলব্ধি করা যায় না। দেশকালপাত্র অনুসারে ঠাকুর নানা কথা বলে গেছেন। সকলের পক্ষে সেগুলি প্রযোজ্য নয়। স্বামিজীর বইগুলি man-making ideas এ (মানুষ-গড়ার ভাবরাশিতে) পরিপূর্ণ। সেগুলি উৎসাহী মানবকে জীবন গঠনে বিশেষ সাহায্য করবে!" স্বামী আত্মানন্দ যখন রাস্তায় বেড়াইতেন তখন কোন দিকে তাকাইতেন না। তাঁহার দৃষ্টি কেবলমাত্র সামনের দিকে থাকিত, আর তিনি হন্ হন্ করিয়া চলিতেন। সম্বলপুরে কোন তীর্থস্থান না থাকায় আত্মানন্দজী উহাকে পাণ্ডব-বর্জিত দেশ বলিতেন।

উপরোক্ত ইঞ্জিনিয়ার কাশীতীর্থে গিয়াছিলেন এবং তথা হইতে ফিরিয়া উক্ত ধর্মক্ষেত্রের বর্ণনা-প্রসঙ্গে পতিতা ও বিধবাদের কুৎসিতভাবে উপবেশন ও আচরণের কথা উল্লেখ করিলেন। অবিলম্বে স্বামী আত্মানন্দ উত্তর দিলেন, "দেখুন, মশায়, ও বিষয়ে যারা expert (অভিজ্ঞ) তারাই সমালোচনা করে ও বোঝে। আমিও কাশী গিয়েছি। আমি ত দেখলাম, সব সাক্ষাৎ মহামায়ার মূর্তি।" এই বলিয়া তিনি গম্ভীরাননে নির্বাক্ হইয়া রহিলেন। সম্বলপুরের হাকিম, অফিসার, উকিল, ডাক্তার প্রভৃতির একটি ক্লাব ছিল। উল্লিখিত

ইঞ্জিনিয়ারও উহার সভ্য ছিলেন এবং মাঝে মাঝে তথায় যাইতেন। একদিন তিনি ক্লাব হইতে সরাসরি আত্মানন্দজীর কাছে আসিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আমাদের ক্লাবের কয়েকজন ভদ্রলোক আপনার বিষয়ে শ্লেষপূর্ণ মন্তব্য করে আমাকে উপহাস করলেন এবং বললেন, "এই যে গেরুয়া-পরা ভদ্রলোকটি সুশীলবাবুর বারান্দায় বসে থাকেন এবং সকালে বিকালে বেড়াতে যান। তাঁর সঙ্গে আপনারা ক'জন বেশ আড্ডা জমান দেখছি। কি সব গল্পগুজব করেন? তাঁর কোন কাজকর্ম নেই। একজন ভদ্রলোকের ঘাড়ে চেপে খাওয়া থাকা ও গল্পগুজব করা মন্দ নয়।" স্বামী আত্মানন্দ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি ত এখানে যাওয়া আসা করেন ও আমাদের সব খবর জানেন। আপনি ঐ সব মিথ্যা মন্তব্যের প্রতিবাদ করে তাদের বুঝিয়ে দিলেন না কেন?" ইঞ্জিনিয়ারটি উত্তর দিলেন, "আমাকে সকলে এমন ভাবে আক্রমণ করলেন যে আমি একা তাদের সঙ্গে পেরে উঠলাম না।" ইহা শুনিয়া বিরক্ত হইয়া আত্মানন্দজী বলিলেন, "আপনি পুনরায় এখনই তাঁদের কাছে যান এবং যদি নিজে কিছু বলতে না পারেন তবে আমার এ কথাগুলি তাঁদের বলে আসুন—আপনারা সব ভদ্র সন্তান ও শিক্ষিত। আপনাদের এমন হীনবুদ্ধি কেন? আপনাদের যদি আত্ম-সম্মান থাকে, সৎসাহস থাকে তবে পিছন থেকে আক্রমণ না করে প্রকাশ্যভাবে আমাকে আহ্বান করুন এবং ভদ্রভাবে এক এক করিয়া যাঁর যা প্রশ্ন আছে বলুন। আর তাদের যদি সে সৎসাহস না থাকে তাদের এখানে আহ্বান করছি। তাদের যা বক্তব্য আমাকে বলুক। আমি স্বামিজীর সন্তান, আমি bull dog (শিকারী কুকুর) এর মত এক এক জনের গলার টুঁটি ধরে নামিয়ে দেব।" তারপর নিজে নিজে বলতে লাগলেন, "এরা কাপুরুষ। এদের সাধ্য কি যে আমাকে ডাকে বা আমার সামনে আসে। আপনি এখানে যাওয়া আসা করেন। আপনি যদি কিছু লাভ করে থাকেন তাহলে এখনই গিয়ে আমার এই সব কথা তাঁদের বলে আসুন এবং এখানে কি সব হয় তাও তাঁদের বলুন এবং তাঁরা কি জবাব দেন আমাকে জানান।" উক্ত ভদ্রলোক পুনরায় ক্লাবে যাইয়া স্বামী আত্মানন্দের সকল কথা তাঁহাদিগকে বলিলেন।

ইহা শুনিয়া কেহ কোন উত্তর দিলেন না। সকলে পরস্পরের দিকে তাকাইতে লাগিলেন। প্রত্যাগত ভদ্রলোকের মুখে ইহা শুনিয়া আত্মানন্দজী বলিলেন, "দেখুন, এদের মধ্যে কেউ হয়ত উকিল, কেউ হাকিম। ইংরাজের গোলামী করে করে এদের শিরদাঁড়া ভেঙে গেছে। এরা দরিদ্রের যমস্বরূপ, বলবানের পদলেহক। এরা ক্ষুদ্র স্বার্থের গণ্ডীতে এত আবদ্ধ যে, দেশের বা দশের কোন উপকার করতে পারে না। তারা আদালতে বা অফিসে সারাদিন যা করে বা বলে তারই চর্বিত চর্বণ করে থাকে ক্লাবে এসে। যা দ্বারা নিজের বা দেশের বা সমাজের কল্যাণ হবে সে কথা বা চিন্তার বালাই নেই। সাহেব কাকে হেসে দুটো কথা বলেছে, বা কার কর্ণমর্দন করেছে তারই আলোচনা করছে। কি আর হবে? শাপগ্রস্ত পরাধীন এই দেশ!" বলা বাহুল্য, ইহার পরে তাঁহাদের মুখে স্বামী আত্মানন্দের কোন সমালোচনা আর শুনা যায় নাই, কিংবা তন্মধ্যে কেহ তাঁহার কাছে আসেন নাই।

সম্বলপুরে সরকারী উকিল ও জেলা বোর্ডের সভাপতি ছিলেন যোগেন্দ্রনাথ সেন। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ শিষ্য কথামৃতকার মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের সম্পর্কীয় ভগ্নীপতি ছিলেন এবং কেশব সেনের বাড়ীতে ঠাকুরকে বহুবার দর্শন করেন। যোগেন্দ্রনাথের কথা শুনিয়া আত্মানন্দজী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছুক হন এবং সুশীল বাবুকে বলেন, "আপনি তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর সুবিধামত দিন ও সময় স্থির করে আসুন।" তদনুযায়ী সুশীল বাবু তাঁহার কাছে যাইয়া দিন স্থির করেন এবং নির্দিষ্ট দিবসে স্বামী আত্মানন্দ যোগেন্দ্র বাবুর সহিত দেখা করেন। যোগেন্দ্র বাবু আত্মানন্দজীকে ঠাকুরের সম্বন্ধে স্বীয় স্মৃতি ব্যক্ত করেন। পরে সুশীল বাবুর বাড়ীতে আসিয়া আত্মানন্দজীকে মাত্র দুই বার দেখিয়াই যোগেন্দ্র বাবু তাঁহার প্রতি এত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হন যে, সুশীল বাবুর সঙ্গে পথে দেখা হইলেই তাঁহার খবর লইতেন। যোগেন্দ্র বাবু আত্মানন্দজীকে ঠাকুর সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা তাঁহার একটি প্রবন্ধে পাওয়া যায়।

স্বামী আত্মানন্দ সম্বলপুরে যাইবার পূর্বে সুশীল বাবু, কটকের কৃষ্ণ বাবু

প্রভৃতি ভক্তগণ মিলিয়া পরমহংসদেবের জন্মতিথি উপলক্ষে একটী ধর্ম-সভার আয়োজন করেন। উহাতে উপরোক্ত যোগেন্দ্রনাথ সেন সভাপতি ছিলেন এবং একটী লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করেন। উক্ত প্রবন্ধে তিনি বলেন, "স্বামী বিবেকানন্দ স্কুলে ও কলেজে আমার এক ক্লাস উপরে পড়তেন।....পরমহংস কেশব বাবুর কাছে যেতেন কিছু জ্ঞান লাভার্থে।" ইত্যাদি। এই ভ্রান্ত উক্তির প্রতিবাদ প্রকাশ্য সভায় কিছু হয় নাই শুনিয়া স্বামী আত্মানন্দ অতিশয় দুঃখিত হন এবং উত্তেজিত ভাবে সুশীল বাবুকে বলেন, "ঠাকুর আপনাকে এখানে (জেলা বোর্ডের) কণ্ট্রাক্টারী করতে পাঠিয়েছেন অমুককে অমুককে খোসামুদি করিতে নয়, তাঁর ভাব প্রচার করতে। এই পাণ্ডব-বর্জিত দেশে ঠাকুরের ভাব প্রচারই আপনার প্রধান কাজ। অসত্য ও অন্যায়ের প্রশ্রয় দেওয়া অন্যায় আচরণ ও মিথ্যাকথনের সমান। আপনি যোগেন্দ্র বাবুর মিথ্যা উক্তির প্রতিবাদ না করে দুর্বলতার পরিচয় দিয়েছেন।" আত্মানন্দজী পদস্থতাকে মনুষ্যত্বের মাপকাঠি বলিয়া কখনো মনে করিতেন না। চারিত্রিক উৎকর্ষই ছিল তাঁহার মতে ব্যক্তির মহত্ত্ব। যোগেন্দ্রনাথ পূর্বে হিন্দু ছিলেন এবং সম্বলপুরে যাইয়া ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ করেন। সেই জন্য অন্যান্য ব্রাহ্মদের ন্যায় তাঁহারও ঠাকুর সম্বন্ধে উক্তরূপ ভ্রান্ত ধারণা ছিল। স্বামী আত্মানন্দের তেজোদ্দীপ্ত বাক্য হইতে সুশীল বাবু আজীবন স্পষ্টবাদিতা শিক্ষা করেন। ১৯৩১ খ্রীঃ সম্বলপুরের ডেপুটী কমিশনার ছিলেন এন. সেনাপতি * আই. সি. এস। সেই বৎসর পূর্ব বঙ্গের বন্যাপীড়িতদের সেবার্থে যে অর্থ তথায় সংগৃহীত হয় তাহা তিনি ঢাকার কমিশনারের নিকট পাঠাইতে ইচ্ছা করেন সিভিল সার্জনের পরামর্শে। উক্ত প্রস্তাবের পরে সভায় তিনি এই মিথ্যা মন্তব্য করেন যে, রামকৃষ্ণ মিশন সাম্প্রদায়িক বলিয়া উহাতে টাকা পাঠাইবেন না। সভায় সুশীল বাবু উক্ত মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ করায় শ্রীযুক্ত সেনাপতি স্বীয় মন্তব্য প্রত্যাহার করেন। ইহা হইতে প্রমাণিত হয়, সাধননিষ্ঠ আত্মানন্দের বাক্যে শ্রোতার দৃষ্টিভঙ্গী ও স্বভাব পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইত।

* ইনি এখন উড়িষ্যা প্রদেশের চিফ কমিশনার হইয়াছেন।

সম্বলপুর জেলাবোর্ডের একটি বৃদ্ধ কণ্ট্রাক্টর সুশীলবাবুর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। তিনি বৈকালের দিকে সুশীলবাবুর বাড়ীতে আসিয়া তাঁহার কাজকর্মের খবর লইতেন। তিনি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেন সুশীলবাবু সরলভাবে তাহার উত্তর দিতেন। স্বামী আত্মানন্দ ঐসব কথাবার্তা কিছু কিছু শুনিতে পাইতেন। একদিন উক্ত ভদ্রলোক চলিয়া যাইবার পর তিনি সুশীলবাবুকে বলিলেন, "দেখুন এ লোকটি সুবিধার নয়। মুখে ভালমানুষী দেখিয়ে আপনার পেটের কথা নিতে আসেন।" ইহাতে সুশীলবাবু জানাইলেন, "আমি যদিও এটা ধরতে পারিনি তথাপি অফিসে কাজের সময় তিনি এসে আমায় খুব বিরক্ত ও বিব্রত করেন। এঁকে কি করে এড়াতে পারি ভাবতে পারছি না।" স্বামী আত্মানন্দ সহাস্যে বলিলেন, "আমি আপনাকে উহা বলে দিচ্ছি। উক্ত ভদ্রলোক যখন কোন কিছু আড়ম্বর করে বলবেন তখন আপনি অন্যমনস্ক ভাবে 'শিব শিব', 'জয় গুরুদেব', 'শ্রীগুরুদেব' প্রভৃতি নামগুলি স্পষ্টভাবে নিজে নিজে উচ্চারণ করবেন। তখন দেখবেন তিনি পালিয়ে যাবেন। রাম নামে ভূত পালায়, জানেন তো।" তাঁহার পরামর্শ অনুসারে কাজ করিয়া সুশীলবাবু উক্ত ব্যক্তির হাত হইতে রক্ষা পাইলেন। সেই লোকটি আসিয়া কোন কথা পাড়িলেই সুশীলবাবু 'শিব শিব' ইত্যাদি উচ্চারণ করিতেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, উক্ত ব্যক্তি ঈশ্বরের নাম শুনিয়া চমকিত হইতেন, স্বীয় বক্তব্য ভুলিয়া যাইতেন এবং 'আজ আসি' বলিয়া স্থান ত্যাগ করিতেন। এইরূপ দুই তিন বার করাতেই সেই লোকটি আসা বন্ধ করিলেন।

একদিন সুশীলবাবুর বাড়ীর সম্মুখস্থ বড় রাস্তা দিয়া দশ এগার বৎসরের একটি কাল মেয়ে চলিয়া যাইতেছিল। স্বামী আত্মানন্দ তাহাকে দেখিয়া সুশীলবাবুকে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখুন, এই মেয়েটিকে ডেকে বাড়ীর ভিতর পাঠিয়ে দিন এবং বাড়ীতে বলে দিন একে ভাল করে খাইয়ে দিতে।" সুশীলবাবু তদনুযায়ী কার্য্য কবিলেন এবং তদন্তে উহার কারণ জানিতে চাহিলেন। তখন স্বামী আত্মানন্দ বরিলেন, "এ মেয়েটির জন্ম সাক্ষাৎ শ্যামাংশে। একে খাইয়ে সন্তুষ্ট করলে আপনার কল্যাণ হবে।" তিনি জানিতেন না যে, সেটি ধোপার মেয়ে এবং তার মার সঙ্গে প্রায়ই সুশীলবাবুর বাড়ীতে আসে ও কাপড়

চোপড় কাচে। সে যাহাই হউক, সুশীলবাবু আত্মানন্দজীর নির্দেশ দীর্ঘ কাল পালন করেন।

একদিন স্বামী আত্মানন্দ পরিচিত ভক্তদিগকে লইয়া সম্বলপুরে কোন মন্দির প্রাঙ্গনে সমবেত হইয়াছেন ঠাকুরের জন্মোৎসব পালনার্থ। সভার প্রারম্ভে সঙ্গীত আরম্ভ হইল। তৎসঙ্গে একজন তবলা বাজাইতে লাগিলেন। তিনি প্রথম হইতেই তাল কাটিতে শুরু করেন। ইহাতে বিরক্ত হইয়া স্বামী আত্মানন্দ বলিয়া উঠিলেন, "আরে! গানটা নষ্ট করে দিল" এবং তড়াক করিয়া উঠিয়া বাদকের কাছে যাইয়া তাঁহার হাত হইতে তবলা কাড়িয়া লইয়া নিজে বাজাইতে আরম্ভ করিলেন। তিনি এমন তালে তবলা বাজাইলেন যে, সকলে শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন এবং পূর্ববাদকটি আত্মানন্দজীকে গড় হইয়া প্রণাম করিলেন। স্বামী আত্মানন্দ নিজ কক্ষে বসিয়া আপন মনে গিরিশ ঘোষ রচিত গান মাঝে মাঝে গাইতেন।

সুশীলবাবুর প্রতিবেশী মারাঠী ভদ্রলোকের দশ এগার বৎসরের ছেলেটি আসিয়া স্বামী আত্মানন্দকে একদিন বলিল, "মহারাজ, ওখানে তেঁতুল গাছের তলায় একটী সাধু থাকেন। তিনি কারুর সঙ্গে কথা বলেন না ও আপন মনে ঘুরে বেড়ান। কেউ তাঁর হাত ধরে টেনে নিয়ে খাওয়ালে তিনি খান। নিজে কাহারো কাছে কিছু চান না, বা কারো বাড়ী যান না। তাঁহার পরণে একটি ছোট কৌপীন মাত্র এবং মাথায় বড় বড় জটা। তিনি স্নান করেন না এবং সন্ধ্যার পূর্বে শহরের মধ্যস্থ একটি তেঁতুল গাছে উঠিয়া বসিয়া থাকেন। তিনি সমস্ত দিন ঘুরিয়া বেড়ান এবং কখন কখন একাকী মাঠে বা গাছতলায় বসিয়া থাকেন।" ইহা শুনিয়া স্বামী আত্মানন্দ অতিশয় আগ্রহের সহিত ছেলেটিকে বলিলেন, "তুমি তাঁকে একবার এখানে আনতে পারো?" ছেলেটি সানন্দে উত্তর দিল, "তাঁহার সঙ্গে দেখা হলে নিশ্চয়ই ডেকে আনব।" ইহার পর প্রতিদিন আত্মানন্দজী উক্ত সাধু সম্বন্ধে ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করিতেন। প্রায় দশ বার দিন পরে ছেলেটি সেই সাধুটিকে হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে লইয়া আসিল। সাধুর বয়স প্রায় পঁয়তাল্লিশ বৎসর উন্মাদের মত চেহারা এবং উলঙ্গ।

আত্মানন্দজী খবর পাইয়া রাস্তায় যাইয়া সাধুর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সাধুটি নিকটস্থ হইবামাত্র তিনি তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন এবং সাধুও সঙ্গে সঙ্গে মস্তক অবনত করিয়া প্রত্যভিবাদন জানাইলেন। সাধুটিকে হাত ধরিয়া আনিয়া চেয়ারে বসানো হইল। তখন বেলা প্রায় নয়টা। আত্মানন্দজী সুশীলবাবুকে কানে কানে বলিয়া দিলেন, "লুচি, তরকারী ও পায়স প্রস্তুত করতে বলে আসুন বাড়ীতে সাধুটির জন্য।" পার্শ্বে বসিয়া আত্মানন্দজী সাধুটিকে দুই একটি প্রশ্ন করিলেন, কিন্তু কোন জবাব পাইলেন না। সাধুটি মৌন হইয়া রহিলেন। আহার প্রস্তুত হইলে তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া আসনে বসানো হইল। কিন্তু তিনি আসনে বসিয়া চুপ করিয়া রহিলেন, লইয়া খাইলেন না। পার্শ্ববর্তী ঘরে একটি শিশু কাঁদিয়া উঠিল। তখন সাধুটি বলিলেন, "আগাড়ি বাচ্চাকে খিলাও।" তৎক্ষণাৎ শিশুটিকে কিছু খাইতে দিতে সে চুপ করিল। সুশীলবাবু সাধুটির ডান হাত লুচির উপরে লাগাইয়া দিতে তিনি একটু লুচি মুখে দিলেন। পরে লুচির সহিত তরকারী মাখাইয়া তাঁহার হাতে দিতে তিনি মাত্র দেড় খানা লুচি খাইলেন এবং উঠিতে উদ্যত হইলেন। তখন তাঁহাকে পুনরায় হাত ধরিয়া বসান হইল। তখন তিনি সামান্য একটু পায়স খাইলেন এবং তৎপরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাকে বাহিরে আনিয়া তাঁহার হাত ধোয়ানো ও চেয়ারে বসানো হইল। তখনও তিনি একেবারে মৌন ও অন্তর্মুখীন। স্বামী আত্মানন্দ তাঁহাকে স্বীয় ঘরে লইয়া গেলেন এবং দরজা বন্ধ করিয়া প্রায় পনের মিনিট রহিলেন। আত্মানন্দজী তাঁহাকে হিন্দীতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি উপায়ে আপনার মত অবস্থা আমার লাভ হতে পারে?" সাধুটি ইঙ্গিতে উত্তর দিলেন, কিন্তু কথা বলিলেন না। তিনি ঊর্ধ্ব দিকে তাকাইয়া দক্ষিণ হস্তের তর্জনী উপরে তুলিলেন। উক্ত ইঙ্গিতের অর্থ এই যে, ঈশ্বর-কৃপায় এই অবস্থা লাভ হইতে পারে, অন্য উপায়ে নহে। ইহার পরে সাধুটি ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন। তাঁহাকে যতক্ষণ দেখা গেল ততক্ষণ আত্মানন্দজী তাঁহার দিকে তাকাইয়া রহিলেন এবং শেষে সুশীলবাবুকে বলিলেন, "এই সাধুটির পূর্ণ পরমহংস অবস্থা। তাঁর দর্শন পেয়ে

আমি আজ ধন্য হলাম। আর আপনারও সৌভাগ্য যে, আপনি এই পরমহংসের সেবাধিকার পেলেন।”

স্বামী আত্মানন্দ যখন সম্বলপুরে ছিলেন তখন ঠাকুরের ঈশ্বর-কোটী অন্তরঙ্গ শিষ্য স্বামী প্রেমানন্দ কলিকাতায় বলরাম মন্দিরে দেহরক্ষা করেন। প্রেমানন্দজী যখন অন্তিম শয্যায় শায়িত তখন সুশীল বাবু সম্বলপুর হইতে কার্য্যোপলক্ষে কলিকাতায় আসেন। সুশীলবাবু বলরাম মন্দিরে যাইয়া স্বামী প্রেমানন্দজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। প্রেমানন্দজী জিজ্ঞাসা করিলেন, “সুশীল, কবে এসেছ?” সুশীলবাবু ভূমিষ্ঠ অভিবাদনান্তে উত্তর দিলেন, “মহারাজ, কাল এসেছি।” এই কথা বলা মাত্র তিনি বলিলেন, “শুকুল মশায় কেমন আছে? তাঁকে আমার প্রণাম দিও।” ইহা শুনিয়া শ্রোতা অবাক্ হইলেন এবং বুঝিলেন, ঠাকুরের শিষ্যগণ স্বামী আত্মানন্দকে কি চক্ষে দেখিতেন। সুশীলবাবু সম্বলপুরে ফিরিয়া যখন এই কথা আত্মানন্দজীকে জানাইলেন তখন তিনি গম্ভীর হইয়া পূজনীয় প্রেমানন্দজীর উদ্দেশ্যে দুই হাত মাথায় লাগাইয়া প্রণামপূর্বক বলিলেন, “জয় প্রভু! জয় মা!! জয় গুরু!!!” তুরীয়ানন্দজী এবং প্রেমানন্দজী প্রভৃতি অনেকে তাঁহাকে ‘শুকুল মশায়’ বলিয়া ডাকিতেন। বেলুড় মঠে একদা কয়েকজন নবাগত ব্রহ্মচারী একত্রে বসিয়া গল্প-গুজব করিতেছিলেন। স্বামী প্রেমানন্দ তথায় হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাদিগকে বলিলেন, “তোরা যখন মঠে এসেছিস তখন শুকুল মশায়ের সহিত ওঠা বসা কর, কথাবার্তা বল। তার কাছে ত্যাগ তপস্যা শেখ। তোদের কল্যাণ হবে। বৃথা সময় নষ্ট করিস্ নি।”

একদিন স্বামী বিবেকানন্দ বেলুড় মঠের পশ্চিম দিকস্থ ঘরে বসিয়া যুবক সাধুদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “বল ত মাইকেল মধুসূদন দত্তের কোন বইখানা শ্রেষ্ঠ?” কোন সাধু উত্তর দিলেন, “মেঘনাদ বধ।” ইহা শুনিয়া স্বামিজী বলিলেন “ঠিক্ বলেছিস্।” স্বামিজী পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, “মেঘনাদ বধ কাব্যের কোন অংশটি শ্রেষ্ঠ?” কেহই ইহার যথার্থ উত্তর দিতে পারিলেন না। তখন স্বামিজী গম্ভীর উচ্ছ্বাসের সহিত ভাবে গদ্‌গদ হইয়া বলিলেন, “মেঘনাদের

মৃত্যু হয়েছে। রাবণ ও মন্দোদরী পুত্রশোকে বিহ্বল। উভয়ে নানা ভাবে শোক প্রকাশে নিরত। এমন সময় দৌবারিক আসিয়া সংবাদ দিল, দ্বারদেশে শত্রু উপস্থিত। তৎক্ষণাৎ রাবণ মন্দোদরীকে বলিলেন, "দেখ রাণী, এখন আর শোক প্রকাশের সময় নয়। আমাকে অবিলম্বে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হতে হবে। শোক পরিত্যাগ করে আমাকে যুদ্ধ-ক্ষেত্রে যেতে বিদায় দাও।" এই বলিয়া স্বামীজী আত্মানন্দজীকে মেঘনাদবধ কাব্য খানা আনিয়া সেই অংশ বাহির করিয়া পড়িতে নির্দেশ দিলেন। একজন বইখানির কয়েক চরণ পড়িতেই তিনি বলিলেন, "না, হলো না।" তখন আর একজন পড়িতে আদিষ্ট হইলেন। অনেকেই পড়িলেন, কিন্তু কাহারো পড়া তাঁহার মনঃপূত হইল না। তিনি তখন বইখানি চাহিয়া লইয়া নিজেই পড়িতে লাগিলেন। তিনি উক্ত কাব্য এমন ভাবে পড়িলেন যে, তাহা শুনিয়া সকলে স্তব্ধ হইলেন এবং সেই সময়ের জন্য সকল পারিপার্শ্বিক অবস্থা ভুলিলেন। সকলের মনে হইল, যেন রাবণ স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া বীরদর্পে সেই কথাগুলি বলিতেছেন। স্বামিজী যখন যাহা ভাবিতেন বা বলিতেন তৎকালে তাহাই হইয়া যাইতেন। উক্ত অংশ পাঠের পর তিনি কিছুক্ষণ ভাব-মগ্ন হইয়া রহিলেন এবং তদন্তে কর্তব্য-তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিলেন। তিনি বলিলেন, কর্তব্য-নিষ্ঠাই জীবনকে সাফল্য-মণ্ডিত করে।

স্বামী আত্মানন্দ একদিন সুশীল বাবুকে বলিলেন, "দেখুন, ঠিক্ ঠিক্ সাধু যদি কোন গৃহস্থের বাড়ীতে বাস করেন তাঁহাকে সেই গৃহস্থের এক রকম চৌকিদারী করিতে হয়, বাড়ীর লোকজনের ভাল মন্দ সব সাধুর দৃষ্টিতে পড়ে এবং সেগুলি ধরিয়া দেওয়ায় গৃহের প্রভূত কল্যাণ হয়। তবে ইহাও ঠিক যে, সাধুর উচ্চাবস্থা না হইলে গৃহস্থের বাড়ীতে থাকিলে তাহার অনিষ্ট হয়। আর গৃহস্থের বাড়ীতে প্রবর্তক সাধুর থাকাই উচিত নয়।" সুশীলবাবুর প্রতিবেশী ছিলেন জনৈক নিষ্ঠাবান্ উৎকল-বাসী ব্রাহ্মণ। তিনি প্রায় প্রত্যহ স্বামী আত্মানন্দের নিকট আসিতেন এবং তাঁহার পূত সঙ্গলাভে ধন্য হইতেন। তিনি ভক্তিপূর্বক মাঝে মাঝে ভাল চাউল এবং অন্যান্য খাদ্য দ্রব্য কিছু কিছু আত্মানন্দজীর জন্য

পাঠাইতেন। একদিন তিনি শ্রদ্ধার্হ সাধুর নিকট প্রস্তাব করিলেন, মধ্যাহ্ন ভোজনটী তাঁহার গৃহে করিবার জন্য। আত্মানন্দজী বলিলেন, "আমি সুশীল-বাবুর অতিথি। তাঁহার মত হইলে আমার আর আপত্তি কি?" সুশীলবাবুর সম্মতিক্রমে তিনি উক্ত ব্রাহ্মণের বাড়ীতে প্রত্যহ মধ্যাহ্নে ভোজন করিতেন। শ্রদ্ধাসম্পন্ন ভগবদ্‌ভক্তকে তিনি পরমাত্মীয় জ্ঞান করিতেন এবং তাঁহার অনুরোধ রক্ষার্থে সচেষ্ট হইতেন।

সম্বলপুরে সুশীলবাবুর গৃহে প্রায় দেড় বৎসর থাকার পর তাঁহার ইচ্ছা হইল যে, তিনি আর সম্বলপুর ছাড়িয়া যাইবেন না, শেষ জীবনটা তথায় কাটাইয়া দিবেন। তাঁহার নির্দেশে নির্জন স্থানের অনুসন্ধান চলিল। সহর হইতে আধ মাইল দূরে পাহাড়ের উপর একটী মনোরম স্থান পাওয়া গেল। উহার পার্শ্বে বিগ্রহবিহীন দেবমন্দির ছিল। তিনি সুশীলবাবু প্রভৃতি ভক্তদিগকে বলিলেন, "আমার জন্য একটা কুঁড়ে ঘর এখানে করে দিন। আমি এখানে নির্জনে একাকী থাকবো। আমার গায় এখন জোর হয়েছে, নিজেই রান্না-বান্না করে নিব। পাহাড়ের নীচে যে গ্রাম আছে তথাকার কৃষক-মজুরদের সঙ্গে ভাব হয়ে যাবে। তারাই আমার জলাদি এনে দেবে। ওরা খুব সরল। ওদের সঙ্গে বেশ আনন্দে থাকবো। আপনারাও মাঝে মাঝে আসবেন।" বলা বাহুল্য, তাঁহার সেই শুভেচ্ছা পূর্ণ হয় নাই।

স্বামী আত্মানন্দ আজন্ম নিরামিষাশী ছিলেন। বেলুড় মঠের সন্ন্যাসী হইয়াও তিনি নিরামিষ আহারই করিতেন। একদিন মঠে কোন ভক্ত একটী বড় রুই মাছ লইয়া আসেন। স্বামী বিবেকানন্দ মাছ দেখিয়া বালকবৎ আনন্দিত হইলেন এবং ভাণ্ডারীকে বলিলেন, "এই রকম করে মাছটা শীঘ্র কুটে ফেল ত? আর এই এই সব মসলা জোগাড় কর। ওদেশে (আমেরিকায়) যে রকম মাছ রাঁধে, আজ আমি সেই রকম রাঁধবো।" যথাসময়ে মাছ কুটা ও মসলা বাটা হইল। সাধুদের স্নানের পূর্বেই স্বামিজী তরকারী রাঁধিলেন এবং ঠাকুরকে ভোগ দিলেন। আহারকালে সাধু-ব্রহ্মচারীরা সব এক পংক্তিতে বসিয়া গেলেন এবং স্বামিজী স্বয়ং মাছের তরকারী পরিবেশন করিতে লাগিলেন।

এমন সময় তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "শুকুল কোথায়?" একজন উত্তর দিলেন, "ঐ যে পঙ্গতের মাঝখানে।" শুক্‌নো শুক্‌নো মাছরান্না হইয়াছিল। স্বামিজী একটা বড় চামচে করিয়া প্রত্যেকের পাতে দুই তিন টুকরা করিয়া দিতে লাগিলেন এবং একজন তরকারীর গামলাটা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে লইয়া গেলেন। স্বামী আত্মানন্দ ভাবিতে লাগিলেন, "তাইত! আজ মাছ খেতে হবে দেখছি। তা স্বয়ং গুরুদেব নিজ হাতে যখন দিতেছেন তখন মাছ ত মাছ, বিষ দিলেও নির্বিকারে খেয়ে ফেলবো।" ক্রমে তাঁহার সম্মুখে স্বামিজী আসিলেন এবং এক চামচে মাছ তুলিলেন। তখন আত্মানন্দজী অন্যান্যের ন্যায় হাত বাড়াইলেন মাছ লইবার জন্য। স্বামিজী একটু থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "আচ্ছা, তোকে মাছ খেতে হবে না।" অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন গুরু মুমুক্ষু শিষ্যের মনোভাব বুঝিয়াই তাঁহার জন্মগত নিষ্ঠা ভঙ্গ করিতে চাহিলেন না।

স্বামী আত্মানন্দ বিশেষ বিদ্বান ও শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন। তাহা সত্বেও তিনি ধর্ম-কথা নিজে বেশী বলিতে চাহিতেন না। তিনি ধর্মপ্রসঙ্গ করিতে অনুরুদ্ধ হইলে বলিতেন, "আমরা কি জানি! কি বল্‌তে গিয়ে কি বলবো? তার চেয়ে ঠাকুর-স্বামিজীর উক্তি থেকে প্রসঙ্গ করুন, যার উপর আর কথাই চলে না এবং যা থেকে সহজে প্রকৃত তত্ত্ব উপলব্ধি করতে পারবেন।" তিনি কত সুরসিক ছিলেন সে সম্বন্ধে দুই একটী ঘটনা এখানে উল্লিখিত হইল। তিনি যাহার গৃহে অতিথি ছিলেন তিনি কণ্ট্রাক্‌টারী করিতেন। সেইজন্য তিনি ঘরে বাহিরে সর্বদা ব্যস্ত থাকিতেন। তিনি ঘরে আসিলেও লোকজনের ভিড় হইত, দেনাপাওনা, কথাবার্তা প্রভৃতি চলিত নানা ব্যক্তির সঙ্গে। তিনি স্বামী আত্মানন্দের ঘরের পার্শ্ববর্তী ঘরেই থাকিতেন। সুতরাং তাঁহার কর্মব্যস্ততা সন্ন্যাসী অতিথির নজরে পড়িত। আত্মানন্দজী এক বৈকালে তাঁহার ঘরে যাইয়া হাতজোড় করিয়া বলিলেন, "ধন্য আপনি। আপনাকে শত নমস্কার! দিন রাত এই চৌদ্দ রকমের কাজ ও সংসার। আমার ত সাধ্য ছিল না এর এক আনাও করি। প্রভু আমাকে সংসার থেকে বাঁচিয়েছেন! নইলে প্রাণটা বেরিয়ে যেত আর কি! জয় রামকৃষ্ণ! জয় প্রভু! জয় মা!"

এই কথাগুলি বলিয়া তিনি অভিনয়ের মত করিয়া স্বীয় কক্ষে চলিয়া গেলেন। তিনি নানা রকম রসিকতাও করিতেন। তিনি নিরামিষাশী ছিলেন বলিয়া তাঁহার জন্য ছানার ডালনা হইত। উক্ত তরকারী দেখিয়া তিনি কৌতুকচ্ছলে ছোটদের বলিতেন, "আজ আমাদের ছানা মাছের ডালনা হয়েছে।" কি নির্দোষ ও সরল আমোদ-প্রিয়তা!

একবার ঠাকুরের পরম ভক্ত বলরাম বসুর পুত্র রামকৃষ্ণ বসু ডাকযোগে স্বামী আত্মানন্দের জন্য একজোড়া চটিজুতা এবং কটকে প্রস্তুত একটি গামছা পাঠাইয়াছিলেন। উহা পাইয়া তিনি রামকৃষ্ণবাবুকে এই পত্র লিখেন। —"প্রিয় রামবাবু, আপনার সাদরে প্রেরিত পার্শ্বেল পাইয়া খুলিয়াই প্রথমে মস্তকে ধারণ করিতে গেলাম। হঠাৎ মনে পড়িল মস্তকে তো গঙ্গা আছেন, জুতা কি করিয়া মস্তকে ধারণ করি। পরে উহা বক্ষে রাখিতে চাহিলাম। তখন মনে পড়িল, সেখানে তো সাক্ষাৎ নারায়ণ আছেন। এইরূপে কোথাও রাখিবার স্থান খুঁজিয়া পাইলাম না। অথচ আপনার প্রেরিত দ্রব্য পাদদেশে লাগাইতেও সংকোচ এবং উপহারের অপমান হয়। তাই আপাততঃ সামনে একটি আসনে সসম্মানে উহা রাখিয়া আপনাকে এই চিঠি লিখিতেছি। পরে ভাব প্রশমিত হইলে যথাবিহিত করিব।" রহস্যচ্ছলে শ্রদ্ধা ও প্রীতির এরূপ অপূর্ব প্রকাশ কচিৎ দৃষ্ট হয়।

স্বামী আত্মানন্দ আর একদিন অন্য প্রকার কৌতুকের অবতারণা করিলেন। তিনি সুশীলবাবুকে গম্ভীরভাবে বলিলেন, "দেখুন আপনি তো টাকার জন্য দিনরাত খেটে খেটে গলদ্‌ঘর্ম হচ্ছেন। আর আমারও সামান্য ভিক্ষের জন্য আজ সম্বলপুর, কাল ভুবনেশ্বর, পরদিন ঢাকা প্রভৃতি স্থানে ঘুরতে হচ্ছে। আমি এক সহজ উপায় স্থির করেছি। তাতে আপনি সহজেই অনেক টাকা পাবেন এবং আমারও পেটটা চলে যাবে। যেখানে আমাদিগকে কেউ চেনে না এমন এক জায়গায় যাই চলুন। যেখানে দিনের বেলায় অনেক শেঠ ঘুরে বেড়ায় তার নিকটস্থ গাছতলায় রাত্রে একটা আস্তানা করব। আমি গুরু হব, আর সর্বাঙ্গে ভস্ম মেখে মৌনী হয়ে ব্যাঘ্র-চর্মের আসনে বসে

মাটির দিকে তাকিয়ে থাকব। আপনি চেলা হয়ে আমার পাশে বসে থাকবেন এবং লোকজন এলে বলবেন, 'বাবা কারুর সাথে কথা বলেন না বা অন্য কিছু খান না, রাত্রে একটি মাত্র ফল খান। কারুর বিপদ বা রোগ হলে বাবা যার উপর প্রসন্ন হন তাকে একটু বিভূতি দেন। তাতেই লোকের বিপদ কাটে ও রোগ সারে ও বাসনা সিদ্ধ হয়। আমি এঁর জন্য একটি আশ্রম নির্মাণের চেষ্টা করছি।' দেখবেন এতে বহু অর্থ অনায়াসে আসবে। এরূপ সহজ ব্যবসা আর নেই আমাদের এই ভারতবর্ষে।"

এই রসিক সন্ন্যাসী প্রয়োজনমত কত কঠোর হইতেন তাহার পরিচয় বহুবার পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার জীবনে কঠোরতা ও কোমলতার অদ্ভুত সমাবেশ ছিল। সাধু বজ্রাদপি কঠোর এবং কুসুমাদপি কোমল কিরূপে হন তাহা স্বামী আত্মানন্দের সঙ্গ করিলে বেশ বুঝা যাইত। একবার তিনি সুশীলবাবুর বাড়ীর এক চাকরকে কোন জরুরী কাজ করিতে বলেন। সেই উড়িয়া চাকরটি অত্যন্ত অবাধ্য ছিল। সে তৎক্ষণাৎ উদ্ধতভাবে বলিল, 'মু ন পারিবি', অর্থাৎ আমি পারিব না। এইরূপ ঔদ্ধত্য ও অবাধ্যতার জন্য স্বামী আত্মানন্দ ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে একটী চড় মারেন ও বলেন, "তোর বাবুকে বললে এখনই নিজে হাতে তিনি এই কাজ করবেন, আর তুই করতে পারবি না।" চাকরটী চড় খাইয়া গম্ভীর ভাবে চলিয়া গেল। সুশীলবাবু বাড়ী ফিরিয়া আসিলে তিনি তাঁহাকে এই ঘটনাটী বলেন। সেই সময়ে চাকরটী বাহির হইতে জল লইয়া ঘরের দিকে আসিতেছিল। তিনি তাহাকে ডাকিলেন এবং দুইটী কলা আনিতে বলিলেন। কলা দুইটী আনা হইলে তিনি স্নেহের সুরে বলিলেন, "ও মার খেয়েছে, ওকে দুটো কলা খাওয়াতে হবে।" চাকরটী তাঁহার কাছে আসিতেই তিনি কলাদুটী খাইতে দিলেন এবং মিষ্টবাক্যে তাহাকে শান্ত করিলেন।

স্বামী আত্মানন্দ প্রত্যহ বৈকাল দুই তিনটার সময় গিরিশ গ্রন্থাবলী নিজে পড়িতেন এবং উহার গানগুলি আপন মনে সন্ধ্যাকালে গাহিতেন। তিনি এই প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, "মানুষ কত নিম্ন থেকে কত উচ্চে উঠতে পারে,

কত অসৎভাব থেকে কত সৎভাবে যেতে পারে তাহার দৃষ্টান্ত যেমন সহজ সরল মর্মস্পর্শী ভাষায় গিরিশবাবুর নাটকে লিখিত, তেমনটী অন্য কোন পুস্তক পাই নি।" ব্রাহ্ম সমাজের এই গানটী তিনি প্রায়ই গাহিতেন। তাঁহার গুরু শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট এই গানটী গাহিয়াছিলেন বলিয়াই বোধ হয় ইহা তাঁহার আমরণ প্রিয় ছিল।—

মন চল নিজ নিকেতনে।
সংসার-বিদেশে বিদেশীর বেশে মিছে ভ্রম অকারণে॥
সত্য পথে মন কর আরোহণ, প্রেমের আলো জ্বালি চল অনুক্ষণ
সঙ্গেতে সম্বল রাখ পুণ্য ধন, গোপনে অতি যতনে॥
সাধুসঙ্গ নামে আছে পান্থধাম, শ্রান্ত হলে তথা করিও বিশ্রাম
পথভ্রান্ত হলে শুধাইও পথ, সে পান্থনিবাসী জনে॥
যদি দেখ পথে ভয়েরি আকার, প্রাণপণে দিও দোহাই রাজার
সে পথে রাজার প্রবল প্রতাপ, শমন ডরে যার শাসনে॥

একদিন 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত' পড়া হইতেছিল। পাঠান্তে তিনি যে মন্তব্য করিলেন তাহা হইতে বুঝা যায়, ঠাকুরের কথামৃতকে তিনি কি শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। তিনি বলিলেন, "কথামৃতে লিখিত ঠাকুরের উপদেশ তাঁরাই ধারণা করতে পারেন যাঁদের পরমহংস অবস্থা হয়েছে। তাঁর কথা জীবনে প্রতিফলিত করতে মুমুক্ষুরাই পারেন। অনেক শ্রোতা বলেন, 'ঠাকুর এটা বেশ বলেছেন', 'আহা এটী কী প্রাণের কথা!' কিন্তু তাঁর উপদেশ পালন করতে পারেন এমন লোক কোথায়? তাঁর উপদেশ বুঝতে হলে স্বামিজীর জীবনী ও বাণী পড়া, সাধুসঙ্গ করা এবং সাধন ভজন করা দরকার। ঠাকুরকে বুঝতে হলে আগে স্বামিজীকে বুঝতে হবে। আধুনিক মানুষের ধর্মজীবন গঠনের মূল সূত্রগুলি স্বামিজীর গ্রন্থাবলীতে পাওয়া যায়।

দরিদ্রের প্রতি স্বামী বিবেকানন্দের যে দরদ ছিল তৎশিষ্য স্বামী আত্মানন্দের জীবনে তাহা লক্ষিত হইত। একদিন মধ্যাহ্নে একটি কুলী রৌদ্রে কাজ করিয়া অত্যন্ত ক্লান্ত ও ঘর্মাক্ত হইয়া স্বামী আত্মানন্দের ঘরের বারান্দায়

আসিয়া বসিয়া পড়িল। কুলিটিকে তদবস্থায় দেখিয়া স্বামী আত্মানন্দ ব্যথিত হইলেন এবং নিজ ঘর হইতে পাখা হাতে বাহিরে আসিয়া তাহাকে হাওয়া করিতে করিতে বলিলেন, "এই রকম করে মানুষকে খাটাতে হয়!" সেখানে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা ইহা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং গৃহকর্তাও লজ্জায় মস্তক অবনত করিলেন। কুলীটির গায়ের ঘাম শুকাইয়া গেলে ও তাহার একটু বিশ্রাম হইলে আত্মানন্দজী নিরস্ত হইলেন। দরিদ্রে নারায়ণ-বুদ্ধি না আসিলে বা একাত্মবোধ না হইলে এরূপ প্রীতিপূর্ণ সেবা সম্ভব হয় না।

কথামৃতকার মাস্টার মশায়ের জীবনের নিম্নোক্ত ঘটনাটি স্বামী আত্মানন্দ এই ভাবে বিবৃত করিয়াছিলেন। একদিন বৈকালে তিনি মাস্টার মশায়ের বাড়ীতে বেড়াইতে যান। মাস্টার মশায়ের নিকট খবর পৌঁছিলে তিনি বাহিরে আসিলেন এবং আত্মানন্দজীকে বসিতে বলিয়া চাকরকে কোন নির্দেশ দিলেন। চাকরটি বাড়ীর বাহিরে যাইয়া জলখাবার আনিয়া সন্ন্যাসী অতিথিকে খাইতে দিল। আত্মানন্দজী খাইতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং মাস্টার মশায় তাঁহার পাশে বসিয়া কথাবার্তা বলিতেছেন। এমন সময় এক এক জন করিয়া অনেকগুলি ভদ্রলোক খালি গায়ে গামছা কাঁধে বাড়ীর ভিতর ঢুকিলেন। যখন একে একে এতগুলি লোক বাড়ীর ভিতরে গেলেন তখন স্বামী আত্মানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ব্যাপার মাস্টার মশায়?" মাস্টার মশায় শান্ত ভাবে উত্তর দিলেন, "ও কিছু নয়, আপনি খান।" স্বামী আত্মানন্দ ইতঃপূর্বেই মাস্টার মশায়কে একটু গম্ভীর লক্ষ্য করিয়াছিলেন। আর স্থির থাকিতে না পারিয়া তিনি তাঁহাকে ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাস্টার মশায়, ব্যাপারটা কি একটু খুলে বলুন ত।" উত্তর আসিল, "আপনি খেতে থাকুন, আমি বলছি।" ইতোমধ্যে স্বামী আত্মানন্দের জলযোগ শেষ হইল। তখন মাস্টার মশায় বলিলেন, "এই বাড়ীর একটি ছেলে আজ মারা গেছে। তাই এঁরাই সব এসেছেন এর শব নিয়ে যাবার জন্য।" স্বামী আত্মানন্দ ইহা শুনিয়া অতিশয় আশ্চর্যান্বিত হইলেন এবং বলিলেন, "ধন্য আপনি! বাড়ীতে এই বিপদ ও শোক, আর আপনি তাতে অবিচলিত থেকে সাধুসেবা করছেন। ধন্য

আপনি। জয় প্রভু।" কিছুক্ষণ থাকিয়া স্বামী আত্মানন্দ বেলুড় মঠে ফিরিলেন এবং ঘটনাটি সাধুদিগকে বলিলেন। সেদিন মাস্টার মশায়ের একটি পুত্র দেহত্যাগ করিয়াছিল।

স্বামী আত্মানন্দের পূত স্পর্শে আসিয়া সম্বলপুরের বহু ভদ্রলোকের জীবন পরিবর্তিত হইয়াছিল। যাঁহার বাড়ীতে তিনি মধ্যাহ্ন ভিক্ষা করিতেন তিনি স্থানীয় সহরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, সম্ভ্রান্ত ও অবস্থাপন্ন ব্যক্তি। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সম্বলপুরে গৌড়ীয় মঠ স্থাপন করেন এবং পরম বৈষ্ণব ছিলেন। উক্ত মঠে চৈতন্য মহাপ্রভুর মূর্তি পূজিত হইত এবং ভোগরাগাদি চলিত। একদিন স্বামী আত্মানন্দ উক্ত মঠে প্রসাদ পাইতে নিমন্ত্রিত হন। তখন মঠগৃহ মেরামত হইতেছিল। প্রসাদ দিবার সময় মঠাধিকারী বলিলেন, "সাধুদিগকে ও ব্রাহ্মণগণকে বারান্দায় এবং অন্যান্য সকলকে উঠানে বসান হউক।" ইহা শুনিয়া ভক্তটি একটু ক্ষুণ্ণ হইলেন এবং গৃহে ফিরিবার সময় আত্মানন্দজীর নিকট বিরক্ত মনোভাব ব্যক্ত করিলেন। প্রসাদে বিশ্বাসী স্বামী আত্মানন্দ উত্তর দিলেন, "আমাকে যেখানে বসাইয়া প্রসাদ দেওয়া হউক না কেন আমি ভক্তির সহিত উহা গ্রহণ করিয়া আসিব।" প্রসাদে এইরূপ ভক্তি ও বিশ্বাস থাকিলে প্রসাদ গ্রহণে দেহমন শুদ্ধ হয়। মঠাধিকারীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে বেলুড় মঠের ধর্মসম্মেলন দেখিতে আসেন এবং সকলের সহিত একত্রে বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। তিনি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং জাতিভেদ মানিয়া চলিতেন। ব্রাহ্মণেতর জাতির সহিত এক সঙ্গে বসিয়া আহার তিনি কখনো করেন নাই। জগন্নাথক্ষেত্রের মত বেলুড় মঠে প্রসাদ গ্রহণকালে জাতিভেদ মানা হয় না দেখিয়া তিনি আনন্দিত হইলেন। স্বামী আত্মানন্দের সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার মনের সঙ্কীর্ণতা কমিল এবং উদারতা বাড়িল। কালীপূজায় বলিদান দেখিয়া তিনি আত্মানন্দজীর নিকটে প্রথমে বহু বিরুদ্ধ যুক্তি দিয়াছিলেন। পরে তাঁহার সেই সঙ্কীর্ণ মনোভাব দূরীভূত হয় এবং শ্রীরামকৃষ্ণের পরম ভক্ত হইয়া পড়েন। তিনি সম্বলপুরে একটি রামকৃষ্ণ মঠ স্থাপনের জন্য আবশ্যকীয় জমি ও অর্থ দিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু বেলুড়

মঠের কর্তৃপক্ষ লোকাভাবে উক্ত দান গ্রহণ করেন নাই। স্বামী আত্মানন্দ নিজের কাজকর্ম যথাসাধ্য নিজেই করিতেন, পারত-পক্ষে কাহারো সেবা লইতে চাহিতেন না। তাঁহার শয্যা অতি সামান্য ছিল, শয়নের স্থানটি প্রায় দুই ফুট মাত্র চওড়া হইত এবং উহাতে একটি ভাঁজ-করা কম্বল পাতা থাকিত। একদিন তিনি কোনও ভক্তকে বলিয়াছিলেন, "অনেকে বাহাদুরী দেখিয়ে বলে 'স্বামিজীর অমুক বইখানা আমি একদিনে পড়ে শেষ করেছি।' আমিত স্বামিজীর বইর কোন কোন অংশ তিন দিন ধরে ধ্যান করতাম। ইহাতে উহার ভাব সম্যক্ উপলব্ধি হত। এক নিশ্বাসে ঐসব বই পড়ে কি লাভ ?"

সম্বলপুরে যাইয়া সুস্থ হইবার পর স্বামী আত্মানন্দ সহর হইতে এক মাইল দূরে পাহাড়ের উপরে প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দিরে বেড়াইতে যাইতেন। পাহাড়ের পাদদেশ হইতে শীর্ষদেশে মন্দিরে উঠিবার জন্য প্রায় দুই শত সোপান আছে। স্থানটি জনশূন্য ও শ্বাপদ-সঙ্কুল। দ্বিপ্রহরে ও সন্ধ্যায় পূজারী মন্দিরে আসিতেন পূজা ও আরতি করিতে এবং কচিৎ কেহ তথায় যাইতেন দেবদর্শনে। প্রথমতঃ তিনি একাকীই তথায় বেড়াইতে যাইতেন, পরে একটি ভক্ত তাঁহার সঙ্গে যোগ দিলেন। আত্মানন্দজী নিম্ন দিকে একটী সোপানে বসিয়া থাকিতেন নিস্তব্ধ ও গম্ভীর ভাবে। উচ্চ দিকে একটী সোপানে তাঁহার সঙ্গী ভক্তটী বসিতেন। উভয়ের মধ্যে শতাধিক সোপানের ব্যবধান থাকিত। একদিন স্বামী আত্মানন্দ যে সোপানে উপবিষ্ট ছিলেন উহার ৪।৫ হাত অর্থাৎ ৮।১০টী সোপানের উপর দিয়া একটী বৃহৎ ব্যাঘ্র একদিক হইতে অন্য দিকে চলিয়া গেল। ব্যাঘ্রটীকে আসিতে এবং আত্মানন্দজীর পার্শ্ব দিয়া যাইতে দেখিয়া ভক্তটী বিপদ গণিলেন; কিন্তু তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া স্থাণুবৎ বসিয়া রহিলেন। ব্যাঘ্রটী স্বামী আত্মানন্দের দিকে একটু তাকাইল মাত্র, কিন্তু ওটী প্রস্তর, কি পুরুষ, সে যেন বুঝিতেই পারিল না। সে বীরদর্পে এদিক ওদিক একটু দেখিয়া চলিয়া গেল ও পার্শ্ববর্তী জঙ্গলে প্রবেশ করিল। ধ্যানমগ্ন আত্মানন্দ এই ঘটনার কিছুই জানিতে পারিলেন না। ব্যাঘ্রটী দূরে চলিয়া যাইবার পর সঙ্গী পায়ের জুতা খুলিয়া নিঃশব্দে দ্রুতপদে বাহ্যজ্ঞানশূন্য

আত্মানন্দজীর নিকটে যাইয়া ধীরে ধীরে ইহা ব্যক্ত করিলেন এবং অবিলম্বে স্থানত্যাগের আগ্রহ জানাইলেন। আত্মানন্দজী যেন অন্য জগতে ছিলেন, বাহ্য জগতে মন আনিতে তাঁহার কিছু সময় লাগিল। তিনি যখন সব শুনিলেন তখন সেই স্থান ত্যাগ করিলেন। ইহা তাঁহাকে পূর্বে জানান হইয়াছিল যে, মধ্যে মধ্যে উক্ত পাহাড়ে ব্যাঘ্র আসে। এই সংবাদ পাইয়াও তিনি তত ভ্রূক্ষেপ করেন নাই। উক্ত ঘটনার পর হইতে তিনি আর কখনো ঐ ভাবে উক্ত শিবমন্দিরে বসিতেন না। তবে এই স্থানটী তাঁহার এত প্রিয় ছিল যে, তিনি প্রায়ই সেই পাহাড়ের পাদদেশ পর্যন্ত যাইতেন এবং কিছুক্ষণ তথায় অপেক্ষা করিয়া চলিয়া আসিতেন।

স্বামী আত্মানন্দ সর্বদা নিজেকে অপ্রকাশিত রাখিতে চেষ্টা করিতেন। লোক দেখিলে অন্তদৃষ্টি সহায়ে তাহার প্রকৃতি বুঝিয়া ব্যবহার করিতেন। ভিন্ন প্রকৃতির লোক আসিলে তাহাকে এড়াইয়া চলিতেন। ঢাকা হইতে ফিরিয়া যখন ভুবনেশ্বরে নবপ্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মঠে তিনি ছিলেন তখন সম্বলপুরের এক ভক্ত আসিয়া একদিন তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিতে থাকেন। এমন সময় একজন ভদ্রলোক আসিয়া তাঁহাকে কিছু বলিতে চাহিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ অভ্যাগতকে বলিলেন, "ঐদিকে মঠাধ্যক্ষ আছেন। আপনি তাঁকে আপনার বক্তব্য বলুন।" পরে পার্শ্ববর্তী ভক্তটীকে বলিলেন, "এই রকম অনেকে মিছামিছি বকাতে আসে। তাদের সঙ্গে বাক্যব্যয় ও কালক্ষয় করে কি লাভ?"

পূর্বোক্ত বিপিনবিহারী দে সংঘ-জননী সারদাদেবীর মন্ত্র-শিষ্য ও চিরকুমার ছিলেন। তাঁহার সহিত স্বামী আত্মানন্দের গভীর হৃদ্যতা ছিল। আত্মানন্দজী তাঁহার উক্ত সহপাঠীর সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন এবং বলিতেন, "Bepin is living in a higher sphere than we. (বিপিন আমাদের চেয়ে উচ্চতর ভাবভূমিতে বাস করে)। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ সাধু হয়ে গেছে, বিপিন সাধু না হলেও সাধুর মত থাকে। আমরা যখন একসঙ্গে রিপন কলেজে পড়তাম তখন অবকাশ সময়ে নিকটস্থ ময়দানে বসে গল্প-গুজব

করতাম। কেউ কেউ বিবাহিতদের স্ত্রীর চিঠি সম্বন্ধে অনেক হাসি-ঠাট্টা করত! বিপিন এমনভাবে নির্বিকার থাকত যে, সে যেন এসব বিষয়ে একেবারে বোকা এবং তার মন যেন অন্য রাজ্যে আছে।" সহপাঠী বিপিনবিহারী সম্বন্ধে উপরোক্ত প্রশংসাসূচক মন্তব্য করিবার পর মুমুক্ষু আত্মানন্দ বলিতেন, "এই ভাবে একটানা গৃহে কুমড়ো-কাটা বড় ঠাকুর হয়ে বসে থাকাও ভাল নয়। এরূপভাবে থাকলে অনেক সময় পতন হয়, যদি তীব্র বিবেক-বৈরাগ্য না থাকে।" বিপিনবাবু সুশীলবাবুকে স্বামী আত্মানন্দ সম্বন্ধে এই ঘটনাটি বলিয়াছিলেন। স্বামী আত্মানন্দের পূর্বাশ্রমীয় কোন আত্মীয়ের বাসা ছিল কলিকাতায়। উক্ত বাড়ীর কোন আত্মীয় অনেক অনুরোধ উপরোধ করিয়া আত্মানন্দজীকে তথায় লইয়া যান এবং একটি ঘরে বসিতে দেন। কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ সেই ঘরে তাঁহার পত্নী ব্রহ্মময়ী, যিনি শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্যা ছিলেন, প্রবেশ করেন। আত্মানন্দজী তাঁহাকে দেখিয়া একেবারে চমকিত ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া জিজ্ঞাসা করেন, "তুমি এখানে? কি দরকার?" ব্রহ্মময়ী দেবীও স্বীয় সন্ন্যাসী পতির প্রশ্নে স্তব্ধীভূত হইয়া বলেন, "আমার মশারি নেই, মশার কামড়ে রাত্রে ঘুম হচ্ছে না।" আত্মানন্দজী উত্তর দিলেন, "তা আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি।" এই বলিয়া তিনি দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া সহপাঠী বিপিন বাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হন এবং তাঁহাকে পত্নীর ঠিকানায় একখানা মশারি পাঠাইয়া দিতে অনুরোধ করেন। বিপিনবাবুও অবিলম্বে সন্ন্যাসী সহপাঠীর অনুরোধ রক্ষা করিয়া স্বীয় কর্তব্য পালন করেন। স্বামী আত্মানন্দের আচরণে প্রমাণিত হয়, সন্ন্যাসী আত্মীয়-স্বজনের সহিতও কোন সম্বন্ধ রাখিবেন না। সন্ন্যাসীর পক্ষে পৃথিবীর প্রত্যেক গৃহই স্বগৃহতুল্য এবং 'বসুধৈব কুটুম্বকম্।'

স্বামী আত্মানন্দ যখন সম্বলপুরে ছিলেন তখন তথায় পুরী হইতে একটি থিয়েটার দল গিয়াছিল। উহার ম্যানেজার ছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। কৃষ্ণবাবু রাস্তায় যাইতে যাইতে একদিন স্বামী আত্মানন্দকে সুশীলবাবুর বাড়ীর বারান্দায় উপবিষ্ট দেখেন এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার সহিত

আলাপ করেন এবং বলেন যে, তিনি পূজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দের বিশেষ পরিচিত এবং তাঁহার স্নেহপ্রাপ্ত। আত্মানন্দজী সেইজন্য কৃষ্ণবাবুর সহিত প্রীতিপূর্বক আলাপ করেন। থিয়েটারের মঞ্চ বাঁধা হইতে লাগিল এবং কৃষ্ণবাবু আসিয়া প্রায়ই আত্মানন্দজীর সহিত কথাবার্তা বলিতেন। প্রথম দিন উক্ত রঙ্গমঞ্চে 'জয়দেব' নাটক অভিনীত হয়। প্রথম অভিনয়ের পূর্বদিন কৃষ্ণবাবু আসিয়া আত্মানন্দজীকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করেন, অভিনয়ের পূর্বে রঙ্গমঞ্চে পদার্পণ ও অভিনেতাদিগকে আশীর্বাদ করিতে। কৃষ্ণবাবুর সপ্রেম অনুরোধ রক্ষা করিতে আত্মানন্দজী সম্মত হন। যথাসময়ে কৃষ্ণবাবু আসিয়া আত্মানন্দজীকে রঙ্গালয়ে লইয়া যান এবং রঙ্গমঞ্চের উপর তাঁহাকে বসাইয়া নিজে তাঁহার পদধূলি নেন এবং প্রত্যেক অভিনেতাকেও তদ্রূপ করান। পরে দর্শকমণ্ডলীর প্রথম শ্রেণীর মধ্যস্থলে তাঁহাকে একটি সুসজ্জিত চেয়ারে বসান হয়। সেদিন 'জয়দেব' অভিনয় সর্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল এবং দর্শকবৃন্দও অভিনয় দর্শন করিয়া পরম প্রীতি লাভ করেন। স্বামী আত্মানন্দের উপস্থিতিতে রঙ্গালয়ে এমন ধর্মভাব সৃষ্ট হয় যে, উহাকে দর্শকমণ্ডলীর অনেকে সেদিন ধর্মালয় মনে করিয়াছিলেন। আমরা পাশ্চাত্য মোহে ভুলিয়া গিয়াছি যে, রঙ্গমঞ্চের উদ্দেশ্যও এইরূপ। কৃষ্ণবাবু মধ্যে মধ্যে আত্মানন্দজীকে স্বীয় রঙ্গালয়ে লইয়া যাইতেন। আত্মানন্দজী যেদিন রঙ্গালয়ে যাইতেন সেদিনই রঙ্গালয়ে ধর্মভাবের অপূর্ব স্রোত প্রবাহিত হইত এবং দর্শকমণ্ডলীও তাহা অনুভব করিতেন।

সম্বলপুর সহরের এক প্রান্তে কোন বিচ্ছিন্ন স্থানে সরকারী বয়ন বিদ্যালয় ছিল। উক্ত বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধায়ক সুরেনবাবুর সহিত আত্মানন্দজী পরিচিত হন। সেইজন্য আত্মানন্দজী বৈকালে উক্ত বিদ্যালয়ের দিকে বেড়াইতে যাইতেন। স্থানটি অত্যন্ত নির্জন বলিয়া তাঁহার খুব ভাল লাগিত। তিনি সান্ধ্য ভ্রমণান্তে উক্ত বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে বসিয়া বিশ্রাম করিতেন এবং সুরেনবাবু সশ্রদ্ধভাবে তাঁহার কাছে বসিয়া সদালাপে নিযুক্ত হইতেন। তখন স্থানীয় ডেপুটি কমিশনার ছিলেন জনৈক ইংরাজ। একদিন সুরেনবাবু যখন আত্মানন্দজীর সঙ্গে বিদ্যালয়-প্রাঙ্গনে সৎপ্রসঙ্গে ব্যাপৃত ছিলেন তখন উক্ত ডেপুটি কমিশনার

তথায় যান এবং আত্মানন্দজীর একটু দূরে দাঁড়াইয়া সুরেনবাবুকে ডাকিয়া তাঁহার সহিত আলাপ করেন। চলিয়া যাইবার পূর্বে সাহেব সুরেমবাবুকে জিজ্ঞাসা করেন, "রঙ্গীন কাপড় পরে যিনি বসে আছেন তিনি কে?" সুরেনবাবু সাহেবকে আত্মানন্দজীর যথাযথ পরিচয় দিলেন। তখন সাহেব সুরেনবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাকে তিনি সম্মান দেখালেন না কেন? আমাকে তিনি স্যালিউট করলেন না কেন? এখানে তাঁর আসার কারণ কি?" ইত্যাদি। সুরেনবাবু এই সকল প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিতে না পারিয়া অপ্রস্তুত হইলেন। তাঁহার মনে ভাবী অনিষ্টের আশঙ্কাও উদিত হইল। স্বামী আত্মানন্দ সমস্ত শুনিয়া সুরেনবাবুকে বলিলেন, "কাল থেকে আপনার এখানে আর আসব না। কারণ তাতে সাহেব আপনার উপর অসন্তুষ্ট হবেন এবং আপনার কাজেরও ক্ষতি হবে।" ফিরিবার সময় স্বামী আত্মানন্দ সঙ্গী ভক্তকে বলিয়াছিলেন, "এই দেশ পরাধীন বলে ইংরেজ জাত সকলের কাছ থেকে উচ্চ সম্মান দাবী করে। চাকরির এমন মহিমা যে সুরেনবাবুর সহিত সাহেব যে অমর্যাদাপূর্ণ ব্যবহার করিল তাহা তাঁহাকে হজম করিতে হইল। আত্মমর্যাদা-সম্পন্ন লোক হইলে তিনি নিশ্চয়ই প্রতিবাদ করিতেন। সরকারী চাকুরি করিলে আত্মসম্মান-জ্ঞান ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়।"

স্বামী আত্মানন্দ সম্বলপুরে যাইবার কিছুদিন পরেই একজন কনস্টেবল আসিয়া তাঁহাকে নিকটবর্তী থানায় ডাকিয়া লইয়া যান। সুশীলবাবুও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থানায় গেলেন। দারোগা আত্মানন্দজীকে নিম্নোক্ত প্রকারে প্রশ্ন করিলেন, "আপনার নাম কি, কোথায় থাকেন, এখানে কেন এসেছেন, আপনার বাপের নাম কি, আর কোথায় গিয়েছেন, কতদিন থেকে এরূপ ঘুরে বেড়াচ্ছেন, কেন এরূপ ঘুরে বেড়ান, সাধারণতঃ আপনার কাজ কি," ইত্যাদি। দারোগা প্রথম হইতেই তাঁহার সঙ্গে উদ্ধতভাবে কথা কহিতে আরম্ভ করেন। সুশীলবাবু এরূপ ব্যবহারের প্রতিবাদপূর্বক দারোগাকে ভদ্রভাবে কথা বলিতে অনুরোধ করেন। ইহার ফলে দারোগা সংযত ও শিষ্টভাবে জিজ্ঞাসাদি করেন। পিতার নামাদি বিষয়ের প্রশ্নের উত্তর দানকালে স্বামী আত্মানন্দ বলেন, পূর্বাশ্রম সম্পর্কীয় কোন

প্রশ্নের জবাব আমি দিতে পারিব না। কারণ আমরা সন্ন্যাসীরা পূর্বাশ্রমের সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছি।" ইহাতে দারোগা একটু বিরক্তির ভাব প্রকাশ করেন। তখন সুশীলবাবু দারোগাকে বুঝাইয়া বলেন যে, সন্ন্যাসীর পক্ষে পূর্বাশ্রমের স্মৃতিরক্ষা মহাপাপ। দারোগা বিহারপ্রদেশবাসী ছিলেন এবং ইহা বুঝিতে পারিলেন। তৎপরে স্বামী আত্মানন্দ থানা হইতে বাসায় ফিরিলেন এবং পথে সঙ্গীকে বলিলেন, "নানা জায়গা থেকে এখানে নানা রকম লোক আসছে। তাদের খবর রাখা এদের কর্তব্য। তবে অসৎ লোকের সংস্পর্শে থেকে থেকে ওদেরও স্বভাব বদলে যায়। ওদের সৎ শিক্ষাদীক্ষা নেই, ওরা গোলামী চাকরি করছে। তাই ওদের কাছ থেকে ভাল ব্যবহার আশা করা যায় না।" সুশীলবাবু পরে দারোগার সহিত দেখা করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ ও রামকৃষ্ণ মিশন প্রভৃতি সম্বন্ধে সব বুঝাইয়া বলেন। ইহাতে হিন্দু বিহারীর ধারণা পরিবর্তিত হয়। তিনি সুশীলবাবুর বাড়ীতে আসিয়া আত্মানন্দজীকে প্রণাম ও তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তৎপরে সাক্ষাৎ হইলেই দারোগা তাঁহাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা-ভক্তি জানাইতেন।

এইরূপে প্রায় আড়াই বৎসর সম্বলপুরে থাকিয়া এবং পূর্বস্বাস্থ্য লাভ করিয়া স্বামী আত্মানন্দ ১৯১৯ খ্রীঃ মার্চ বা এপ্রিল মাসে বেলুড় মঠে ফিরিয়া আসেন। ইহার কিছুদিন পরে সংঘাধ্যক্ষের নির্দেশে তিনি ঢাকা রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষরূপে প্রেরিত হন।

তিন

১৯১৯ সাল হইতে ১৯২১ সাল পর্যন্ত প্রায় তিন বৎসর স্বামী আত্মানন্দ ঢাকা রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি ঢাকা মঠের কাজকর্ম বিশেষ কিছু করিতেন না, ধ্যানভজন ও শাস্ত্রচর্চা লইয়া থাকিতেন। জনৈক সাধু ঢাকা মঠ হইতে বেলুড় মঠে আসিলে তাঁহাকে স্বামী ব্রহ্মানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিরে শুকুল কেমন আছে এবং কি করে?" সাধুটি উত্তর দিলেন, "তিনি ভাল আছেন, তবে কিছু করেন না।" তখন স্বামী ব্রহ্মানন্দ

বলিলেন, "ও বসে থাকলেই কাজ হবে।" উক্ত বাক্যের তাৎপর্য এই যে, সাধু কোন সেবাদি কর্ম না করিলেও তিনি যে ভাগবত জীবন যাপন করেন তাহাতেই আশ্রমের ও সমাজের পরম কল্যাণ হয়।

স্বামী আত্মানন্দ যখন ঢাকা মঠের অধ্যক্ষ নির্বাচিত হন তখন মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দজী ঢাকা কেন্দ্রের তদানীন্তন সম্পাদক শ্রীঠাকুরচরণ মুখোপাধ্যায়কে পত্রে লিখিয়াছিলেন, "স্বামীজি মহারাজের অন্যতম প্রিয় শিষ্য মহাত্যাগী মহাভক্ত ও মহাতপস্বী এবং সংঘের একজন প্রাচীন সাধু আত্মানন্দ তোমাদের ওখানে যাইতেছেন। তাঁহার উপস্থিতিতে ঐ অঞ্চলের অশেষ কল্যাণ হইবে। শুকুল মহারাজের উপর শ্রীশ্রীমহারাজেরও উচ্চ ধারণা জানিবে।" এই পরিচয় পত্র পাইবার কয়েকদিন পরেই স্বামী আত্মানন্দ ঢাকায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন। ঢাকা মঠের সাধু এবং ভক্তগণ স্টেশনে যাইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া মঠে লইয়া যান। তাঁহার সঙ্গে একটি ছোট বিছানা, একটি ছোট বাক্স, একটি ছাতা, লাঠি ও কমণ্ডলু ছিল। তাঁহার শান্ত সৌম্য চিন্তাশীল মূর্তি দেখিয়া সকলে তৎপ্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হন। তাঁহার জীবনের লক্ষ্যনীয় বিশেষত্ব ছিল তাঁহার দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবন। তাঁহার দিবারাত্রি চব্বিশ ঘণ্টা নির্দিষ্ট কর্মে বিভক্ত ছিল। প্রতিদিন তিনি ঘড়ির কাঁটার মত নির্দিষ্ট সময়ে ধ্যান-জপ, স্নানাহার, ভ্রমণ ও বিশ্রামাদি করিতেন। তাঁহার অন্তর্জীবনও বহির্জীবনের মতই সুশান্ত ও সংযত ছিল।

নানা শাস্ত্র এবং স্বামীজির গ্রন্থাবলী বার বার পড়িয়া তিনি বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার পাণ্ডিত্য প্রকাশের ভাব আদৌ ছিল না। তিনি অত্যন্ত অল্পভাষী ছিলেন এবং বলিতেন, "শাস্ত্রবাক্য কিংবা ঠাকুর স্বামীজির কথা সাধারণতঃ অতি সূক্ষ্ম ও অতীন্দ্রিয় জগতের বিষয়, ধ্যান ও উপলব্ধির বিষয়, অলকটপ্পা মারবার বিষয় নয়।" তিনি সংযতবাক্ ছিলেন বলিয়া যে সর্বদা বিমর্ষ থাকিতেন তাহা নয়, সময় মত মাঝে মাঝে হাসি-তামাসাও করিতেন। সেবাধর্ম সম্বন্ধে তাঁহার উচ্চ ধারণা থাকা সত্ত্বেও তিনি বার বার বলিতেন, "সাধু জীবনের উদ্দেশ্য মনকে একাগ্র ও অন্তর্মুখীন

করা। স্বামীজি ছোট ছোট কাজের মধ্য দিয়াই কর্মযোগের সাধনা করতেন। তাঁর মতে যে ভাল করে ঝাঁট দিতে পারে সে তন্ময় হয়ে ধ্যানও করতে পারে। নিবৃত্তিমূলক কর্মযোগই সাধুজীবনের লক্ষ্য। সকাম কর্ম সাধু জীবনের উদ্দেশ্য হতে পারে না। কর্ম যদি কর্মীর অন্তরে অহং-ভাবকে নাশ করিয়া নিবৃত্তি ও অনাসক্তির দিকে না নিয়ে যায় তাহা হইলে তাহা অন্তর্জীবন গঠনের সহায়ক হয় না। 'যন্ সাধন্ তন্ সিদ্ধি।' উপায় বা সাধনা ঠিকমত হলে সিদ্ধি স্বতঃই আসে। ইহাই প্রকৃতির নিয়ম ও সৃষ্টির রহস্য। ইহাই কর্মযোগীর আদর্শ।"

স্বামী আত্মানন্দ নিজ জীবনে ছোট ছোট কাজের মধ্যে দিয়া কর্মযোগের আদর্শটি বিশেষভাবে প্রকাশ করিতেন। কোন দিন অযথা কাজে বা বাজে কথায় তাঁহাকে সময় কাটাইতে দেখা যাইত না। তিনি সংবাদপত্র পড়িতেন না, কিংবা রাষ্ট্রনীতি, অথবা সমাজ ও দেশের বর্তমান পরিস্থিতি লইয়া আলোচনাদি করিতেন না। এক কথায়, যাহা কিছু মনকে বহির্মুখ করে তাহাই তিনি বিষবৎ বর্জন করিতেন। তিনি অবসর সময় স্বামীজি ও গিরিশবাবুর গ্রন্থ পড়িয়া কাটাইতেন। তাঁহার মনে কোন বাসনা ছিল না এবং চিত্ত ইন্দ্রিয়-বিষয়ে ধাবমান হইত না। ইহা তাঁহার কথায় ও আচরণে স্পষ্ট প্রকাশ পাইত। শ্রীশ্রীঠাকুর ও শিষ্যগণের প্রতি তাঁহার অসাধারণ শ্রদ্ধা ছিল। ঠাকুরের সন্ন্যাসী শিষ্য ও পার্ষদদের প্রতি তো কথাই নাই, এমন কি গৃহস্থ শিষ্যদের প্রতিও তিনি বিশেষ শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন। একদিন তিনি ঢাকায় শ্রীনিত্যগোপাল গোস্বামীকে দেখিতে গিয়াছেন। তিনি গোস্বামী মহাশয়ের কাছে যাইয়া তাঁহার পাদস্পর্শপূর্বক প্রণাম করিতে উদ্যত হইলে গোস্বামিজী দাঁড়াইয়া উঠিয়া তাঁহাকে নিরস্ত করেন।*

ঢাকা মঠে ফিরিয়া আসিবার পর তাঁহাকে প্রশ্ন করা হইল, "আপনি সন্ন্যাসী হইয়া কেন গৃহস্থ ভক্তের পাদস্পর্শ করিতে গেলেন?" তদুত্তরে

---

* এই অংশ স্বামী আত্মানন্দ কথিত।

তিনি বলিয়াছিলেন, "দেখ, যিনি শ্রীশ্রীঠাকুরকে একবার মাত্র দর্শন করেছেন তিনিই মুক্ত হয়ে গেছেন। আর বল কি হে, এঁকে তো শ্রীশ্রীঠাকুর স্বয়ং কৃপা করেছেন। ইনি তো দেবতা হয়ে গেছেন!" ঠাকুরের প্রতি কী জলন্ত বিশ্বাস! শুধু যে শ্রীশ্রীঠাকুরের শিষ্যদের প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা ছিল তাহা নহে, স্বামীজির শিষ্যবর্গ তদীয় গুরুভ্রাতাদের প্রতিও তাঁহার শ্রদ্ধা এবং প্রীতি বিদ্যমান ছিল। ব্যবহারিক জীবনের কয়েকটি লক্ষণ তাঁহার চরিত্রে দেখা যাইত না। তাঁহার মধ্যে প্রভুত্বপ্রিয়তাদি দোষ আদৌ ছিল না। তবে অসংযত আচরণ বা আলাপন তিনি মোটেই সহ্য করিতে পারিতেন না, বিশেষতঃ সাধু-ব্রহ্মচারীদের। আশ্রমের জিনিষ কোন সাধু ব্রহ্মচারী যদি নির্দিষ্ট জায়গায় না রাখিয়া অবহেলাপূর্বক যেখানে সেখানে রাখিয়া দিতেন তাহা হইলে তিনি অত্যন্ত উত্তেজিত হইতেন এবং বলিতেন, "সমস্ত জিনিষ যথাস্থানে সুশৃঙ্খলভাবে রাখাই সংযত মনের পরিচয়।"

তাঁহার নিজের জীবন অতি সহজ সরল ও সুশৃঙ্খল ছিল। নিজের ব্যবহারের জন্য কয়েকটি মাত্র জামা ও কাপড় তিনি রাখিতেন। তিনি টাকাপয়সা কাছে রাখিতেন না এবং কেহ দিতে আসিলে লইতেন না, ঠাকুর ঘরে পাঠাইয়া দিতেন। তাঁহার সঙ্গে থাকিলে বুঝা যাইত, তিনি বাসনারহিত এবং ভগবানে অনুরক্ত ও আদর্শনিষ্ঠ সাধু। একদিন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, "আপনার দিব্য দর্শনাদির কথা কিছু বলুন।" তদুত্তরে তিনি বলিলেন, "আমি একটি ভূতও দেখি নাই। তবে স্বামীজি মহারাজের কৃপা পেয়েছি, তাঁকে দর্শন করেছি, আর অন্য দর্শনের প্রয়োজন নাই। তিনি কৃপা করে বলেছেন, তাঁর আশ্রিত সন্তান নরকে গেলেও তিনি তাহাকে তথা হইতে উদ্ধার করিবেন।"

১৯২৭ সালের আষাঢ় মাসে ঢাকা মঠে কয়েকটী সাধু ও ভক্ত তাঁহার কাছে স্বামী বিবেকানন্দ প্রণীত 'রাজযোগ' পড়িতেন। সেই সময় কথা প্রসঙ্গে একদিন তিনি বলিয়াছেন, "সন্ন্যাস কি জান? যাদের অন্ন খেয়ে ধর্ম জীবন লাভ করা সম্ভব হয়েছে তাদের কল্যাণে, লোকের কল্যাণে, জগতের

কল্যাণে শরীরটা পাত করে দেওয়া। একদা ঢাকা মঠে স্থানীয় ইডেন বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীবৃন্দ ও ছাত্রীগণ আসেন। মঠাধ্যক্ষ আত্মানন্দজী ব্রহ্মচারীদিগকে নির্দেশ দিলেন, "এদের প্রসাদ দাও।" এতগুলি বালিকার জন্য প্রসাদ প্রস্তুত করিয়া দিতে দেরী হওয়ায় তিনি অতিশয় বিরক্তির ভাব প্রকাশ করিলেন এবং ছাত্রীরা প্রসাদ পাইয়া চলিয়া গেলে বলিলেন, "অনূঢ়া মেয়েদের হাওয়ায় বেশী ক্ষণ থাকবে না। তারা আভাঙ্গা সাপের মত। বেশী ক্ষণ তাদের সাথে তোমাদের থাকা অনুচিত।" সাধুদিগকে সাবধান করিবার জন্য তিনি বলিতেন, "সন্ধ্যার পর শহরে থেকো না। রাত্রিকালে শহরের মনোহর চাকচিক্য ও সৌন্দর্য্য দেখলে জগতে মন আটকে পড়বে। সন্ধ্যার পূর্বেই কাজকর্ম সেরে নিয়ে আশ্রমে ফিরবে। আসন সাধুকে বাঁচায়। রাস্তায় চলবার সময় ডাঁয়ে-বাঁয়ে তাকাবে না। তাকালে কুদৃশ্য ও সুদৃশ্য দুইই চোখে পড়বে। কুদৃশ্য দেখা সাধুর পক্ষে মহাপাপ। পায়ের সামনে দৃষ্টি রেখে চলবে। মঠে আশ্রমে এমন ভাবে থাকবে যেন দরকার হলে পাঁচ মিনিটের মধ্যে অন্যত্র যেতে ready (প্রস্তুত) হতে পার। সাধু সর্বত্র এইরূপ অনাসক্ত থাকবে। যেন যমের ডাক এলেও যেতে দেরী না হয়। বীরের মত চলা ফেরা করবে। সাহেবরা কেমন বীরবৎ চলে দেখ নি? বীর ভাব মনে জাগ্রত রাখলে অসদ্‌ভাব আসতে পারে না। কীর্তনে কাঁদা ও ভূত দেখা প্রভৃতি মেয়েলী ভাবের লক্ষণ। মেয়েলী ভাব মন থেকে মুছে ফেল যদি ধর্মপথে এগুতে চাও। অবতার অবতার কর, অবতার কি জান? যাঁর ইঙ্গিতে সৌর জগতের সৃষ্টি ও প্রলয় হচ্ছে তিনি এই সাড়ে তিন হাত দীর্ঘ রক্তমাংসময় শরীর ধরে এসেছেন। অবতারে বিশ্বাস শুদ্ধা ভক্তির লক্ষণ।"

ঢাকা মঠে স্বামী আত্মানন্দ ব্রহ্মেশ্বরানন্দজীকে সমগ্র গীতা মুখস্থ করাইয়াছিলেন। ব্রহ্মেশ্বরানন্দজীকে রোজ পাঁচটী শ্লোক মুখস্থ করিতে হইত। এইরূপে একাদশ অধ্যায় পর্যন্ত তাঁহার কণ্ঠস্থ হয় আত্মানন্দজীর নিকটে। ব্রহ্মেশ্বরানন্দজীকে স্বামী আত্মানন্দ বলিয়াছিলেন, আমি অন্যত্র চলে গেলে তুমি

যথাসময়ে এসে ঠাকুরের ছবির সামনে পড়া দিয়ে যাবে। তাহলেই হবে।” বাকী সাত অধ্যায় ব্রহ্মেশ্বরানন্দজী এই ভাবে কণ্ঠস্থ করেন। আত্মানন্দজীর মতে উপনিষদ ও গীতাদি শাস্ত্র সাধু-ব্রহ্মচারীর কণ্ঠস্থ রাখা উচিত।

সম্ভবতঃ ১৯০৫ খ্রীঃ স্বামী আত্মানন্দ ভুবনেশ্বরে যাইয়া স্বর্গত ইঞ্জিনীয়ার প্রসন্নবাবুর অতিথিরূপে কিছুকাল বাস করেন। একদিন কোন ভক্ত ট্রেণ হইতে নামিয়া প্রসন্নবাবুর গৃহ-প্রাঙ্গনে একটি কুটীরে উপস্থিত হন। সেই কুটীরেই স্বামী আত্মানন্দ অবস্থান করিতেন। ভক্তটি যখন তথায় পৌছিলেন তখন পূর্বাহ্ন প্রায় দশটা। উক্ত কুটীরের দ্বার বন্ধ ছিল। সেখানকার মালীকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল, আত্মানন্দজী রাত্রি চারটা হইতে ধ্যানে বসিয়াছেন, তখনো দ্বার খোলেন নাই। ভক্তটি ইহা শুনিয়া ভুবনেশ্বরাদি দেবতাদর্শনে চলিয়া গেলেন। ঘণ্টাখানেক পরে ফিরিয়া দেখিলেন, তখনো কুটিরের দ্বার রুদ্ধ এবং জানিলেন তন্মধ্যে আত্মানন্দজী ধ্যানস্থ। প্রায় আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করিবার পর সাড়ে এগারটার সময় কুটীরের দ্বার খোলা হইল। আত্মানন্দজী দ্বার খুলিয়াই ভক্তদ্বয়কে দেখিতে পাইলেন এবং তাঁহাদিগকে সাদরে কুটীরের মধ্যে ডাকিয়া লইলেন। কালবিলম্ব না করিয়া তিনি একটি জলচৌকির উপর একখণ্ড গেরুয়া কাপড় পাতিয়া তদুপরি একখানি ‘কথামৃত’ রাখিলেন এবং সমাগত ভক্ত কৃষ্ণচন্দ্র সেনগুপ্তকে উহা পড়িতে আদেশ করিলেন। আধ ঘণ্টার অধিক ‘কথামৃত’ পড়া হইলে তিনি অন্য কথা বলিলেন। এতক্ষণ একটি মাত্র অন্যকথা তাঁহার মুখ হইতে বাহির হয় নাই। ধ্যানান্তে তাঁহার চক্ষুদ্বয় আরক্তিম ছিল পাঠসমাপ্তি পর্যন্ত।

একবার স্বামী আত্মানন্দ ভুবনেশ্বরে চাতুর্মাস্য করিয়া ছিলেন। স্বামী করুণানন্দ তখন তাঁহার সেবক। তখনো সেখানে রামকৃষ্ণ মঠ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। সেইজন্য সাধুদ্বয় উপরোক্ত ভক্তের বাড়ীতে পূর্ব কুটীরেই ছিলেন। সেই সময় আত্মানন্দজী সর্বদাই ধ্যান-জপ ও শাস্ত্রপাঠাদিতে তন্ময় হইয়া থাকিতেন। প্রত্যহ তিনি দীর্ঘকাল গভীর ধ্যানে নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার ন্যায় নিস্পন্দভাবে অবস্থান করিতেন। ধ্যানকালে তাঁহার বাহ্যজ্ঞান সম্পূর্ণ

বিলুপ্ত হইত। একদিন তিনি গভীর ধ্যানে নিমগ্ন। এমন সময় একটি ভুজঙ্গ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। স্বামী করুণানন্দের দৃষ্টি সর্পের উপর পড়িলে তিনি অতি মৃদুস্বরে ধ্যানস্থ সন্ন্যাসীকে বলিলেন, 'সাপ এসেছে'। এই বাক্যে ধ্যানীর মন বহির্জগতে ফিরিল না। পুনরায় সতর্কবাণী উচ্চারিত হইলে তিনি কেবলমাত্র নেত্রোন্মীলন করিলেন, কিন্তু গাত্রোত্থান করিলেন না। সাপটি ঘরের মধ্যে এদিক ওদিক ঘুরিয়া জানালার মধ্য দিয়া পুনরায় বাহিরে চলিয়া গেল। যোগীবরের ধ্যানপ্রভাবে ঘরের মধ্যে নির্বৈর ভাব এমন জমাট বাঁধিয়াছিল যে, হিংস্র জন্তুটির স্বাভাবিক হিংসাকার্যে প্রবৃত্তি হইল না। যোগী আবার ধ্যানস্থ হইলেন। এই সময়ে তাঁহার মনে অহর্নিশ ধ্যান-প্রবাহ চলিত এবং তিনি এমন একটি আনন্দ-রাজ্যে সদা বিচরণ করিতেন যে, তাঁহাকে দেখিলে মনে হইত, তিনি সর্বৈষণাবর্জিত হইয়া চিদানন্দের সন্ধান পাইয়াছেন এবং অমৃতের অধিকারী হইয়াছেন। তাঁহার চোখে মুখে বাক্যে পরমানন্দ ফুটিয়া উঠিত। মহাষ্টমীর রাত্রিতে শ্রীশ্রীমাকে পায়স নিবেদন করিতে করিতে বালকের ন্যায় অশ্রুজলে সিক্ত হইয়া তিনি বলিলেন, "মা করেছ সন্ন্যাসী, আর কি দিয়ে তোমার পূজা করি!" কঠোর তপস্যার ফলে তাঁহার শরীর কিঞ্চিৎ অসুস্থ হইয়া পড়িল এবং প্রত্যহ একটু জ্বর হইতে লাগিল। সেজন্য তাঁহাকে ভুবনেশ্বর ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে হইল। ঢাকা হইতে আসিয়া তিনি শেষ বার যখন ভুবনেশ্বরে যান তখন নব-প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মঠে থাকেন। মঠে বাজে কথা ও বিষয়-চর্চা হইত বলিয়া তিনি জঙ্গলের মধ্যে যাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতেন। জাগতিক ঘটনায় তাঁহার মন আদৌ আকৃষ্ট বা বিচলিত হইত না। বেলুড় মঠে একদিন ঝড়বৃষ্টি হওয়ায় যে সকল কাপড় বাহিরে শুকাইতে দেওয়া হইয়াছিল সেগুলি কোন সাধু আনিয়া তাঁহার ঘরে রাখিলেন। কেহ কেহ সেই ঘরে আসিয়া স্ব স্ব কাপড় লইয়া গেলেন এবং ঝড়-বৃষ্টির কথা বলিতে লাগিলেন। কিন্তু আত্মানন্দজী বৈষয়িক প্রসঙ্গে এতই উদাসীন ছিলেন যে, এই বিষয়ে একটী কথা কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিলেন না, আপন মনে ইষ্ট-চিন্তায় বিভোর রহিলেন।

১৩২৯ সালে স্বামী তুরীয়ানন্দ কাশীধামে মহাসমাধি লাভ করেন। তৎপরে মঠাধ্যক্ষের আদেশে স্বামী আত্মানন্দ কাশী সেবাশ্রমে যাইয়া বাস করেন। তিনি কাশী যাইবার উদ্দেশ্যে ভুবনেশ্বর হইতে বেলুড় মঠে আসেন এবং জ্ঞান মহারাজের ঘরে বাস করেন। সেই ঘরে তিনি যখন ধ্যান করিতেন তখন তাঁহাকে দেখিলে মনে হইত, যেন নিশ্চল নিষ্পন্দ প্রস্তরমূর্তি উপবিষ্ট। কাশীযাত্রার দুই এক দিন পূর্বে তিনি স্বামী শিবানন্দের কাছে যাইয়া করযোড়ে নিবেদন করিলেন, "মহারাজ, আমি তবে কাশী যাই।" মহাপুরুষজী অনেকক্ষণ তাঁহার দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া সম্মতি দিলেন। মঠের পুরাণ ঘাট হইতে নৌকায় উঠিয়া আত্মানন্দজী মঠের দিকে হাত যোড় করিয়া তাকাইয়া রহিলেন। মহাপুরুষজী গঙ্গার দিকে দোতলার বারান্দায় দাঁড়াইয়া তাঁহাকে দেখিতেছিলেন। যতক্ষণ মঠ দেখা গেল ততক্ষণ আত্মানন্দজী পূর্ববৎ মঠের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। তিনি উদ্বোধন মঠে স্বামী সারদানন্দকে প্রণামান্তে কাশীযাত্রা করিলেন। তিনি কখনো কখনো বলিতেন, "গঙ্গাতীরে শরীর ছাড়ব। যেন কাউকে ভোগাতে না হয়।" সন্ধ্যার সময় তিনি রোজ একটু বেড়াইতেন। তখন তিনি কাহারো সহিত কথা বলিতেন না।

সম্ভবতঃ ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে তিনি বেলুড় মঠ হইতে কাশীযাত্রা করেন। পথে পাটনায় তিনি কয়েকদিন ছিলেন। সম্বলপুরে তাঁহার সঙ্গে যে সকল ভক্তের পরিচয় হইয়াছিল তন্মধ্যে একজন তখন পাটনায় ছিলেন। ভক্তটি আত্মানন্দজীর আগমন সংবাদ পাইয়া তাঁহার দর্শনমানসে তৎসমীপে উপস্থিত হইলেন। আত্মানন্দজী ভক্তটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন আছেন?" তিনি ভক্তটির বাড়ীর অন্য কাহারো কুশল প্রশ্ন করিলেন না। অথচ তিনি জানিতেন, সম্বলপুরে উক্ত ভক্তের স্ত্রী, একটি পুত্র, একটি কন্যা একটি ভ্রাতা ও একটি শ্যালক থাকিতেন এবং তাঁহাদের দুই একজনকে তিনি স্নেহও করিতেন। তাঁহাদের সম্বন্ধে তিনি কোন প্রশ্ন না করায় ভক্তটি একটু বিস্মিত হইলেন; কিন্তু স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কোন কথা

বলিলেন না। তিনি প্রণামান্তে কুশল প্রশ্নাদির পর পরদিন তাঁহার বাসায় ভিক্ষা গ্রহণের জন্য আত্মানন্দজীকে প্রার্থনা জানাইলেন। তিনি তখনই সম্মতি দিলেন এবং যথাসময়ে ভক্তগৃহে উপস্থিত হইলেন। কথাপ্রসঙ্গে আত্মানন্দজী জানিলেন, ভক্তটির ভ্রাতা দেহত্যাগ করিয়াছেন। আত্মানন্দজী ইহা শুনিয়া বলিলেন, "দেখলে! এইজন্যই তোমার আত্মীয়-বন্ধু কাহারও কোন কুশল প্রশ্ন করি নাই! এই সকল প্রশ্নে প্রায়ই কোন না কোন দুর্ঘটনার বিষয় শুনিতে হয়। তাহা চিত্তচাঞ্চল্যের কারণ। এমন কি, সুসংবাদেও চিত্ত চঞ্চল হয়, অথচ এ সকল সংবাদ শুনে কোন ফল নাই। বিনা কারণে চিত্তস্থৈর্য্য নষ্ট করে লাভ কি?" স্বামী আত্মানন্দের ন্যায় ত্রিগুণাতীত মহাপুরুষের উপযুক্ত উক্তিই বটে। তখন তাঁহার অঙ্গকান্তিও দেবতুল্য হইয়াছিল। দুধে আলতা মিশাইলে যেমন রং হয় তাঁহার দেহের বর্ণ তখন সেইরূপ সুশ্রী ছিল এবং জ্যোতিঃ যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। তাঁহার কথাগুলি কি সুমিষ্ট! কর্ণে যেন সুধাবর্ষণ করিত! গীতায় আছে সত্ত্বগুণাধিক্যে সর্বেন্দ্রিয়দ্বারে জ্ঞান প্রকাশ উপজাত হয়। গীতোক্ত বাক্য যে বর্ণে বর্ণে সত্য তাহা তখন আত্মানন্দজীকে দেখিলে স্বতঃই প্রতীত হইত।

১৩৩০ সালে ভাদ্র মাসের শেষে স্বামী শুদ্ধানন্দ কাশীধামে যান। তৎপূর্বেই স্বামী আত্মানন্দ কাশীধামে উপস্থিত হইয়াছিলেন। শেষজীবন মোক্ষতীর্থ কাশীধামে অতিবাহিত করিবার আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা তাঁহার হৃদয়ে বলবতী ছিল। ঠাকুর তাই তাঁহার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিলেন। শ্রাবণ মাসে স্বামী করুণানন্দকে আত্মানন্দজী বলিয়াছিলেন, "খেলাধূলা ঢের হল, চল এখন একান্ত স্থানে, গঙ্গাতীরে বসে যাই। গোলমাল, লোকালয় আর ভাল লাগে না।" তিনি যখন ভুবনেশ্বরে ছিলেন তখন করুণানন্দজী তাঁহার সেবা করিতেন। সেইজন্য তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়াই তিনি এই উক্তি করেন। যখন তিনি কাশীতে গেলেন তখন তাঁহার শরীর বেশ সুস্থ ছিল। গুরুভ্রাতা স্বামী শুদ্ধানন্দের সঙ্গে তিনি একদিন পদব্রজে স্বামী অখণ্ডানন্দকে সহরের সুদূর প্রান্তে যাইয়া দেখিয়া আসেন। স্বামী আত্মানন্দকে তখন অত্যন্ত নির্লিপ্ত,

অন্তর্মুখী ও নির্জনতাপ্রিয় দেখা যাইত। তিনি ইহধাম হইতে চিরবিদায় গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন।

স্বামী শুদ্ধানন্দের নিকট তিনি প্রায়ই বলিতেন, "মিশনের কর্মকেন্দ্রে থাকতে আমার আর ইচ্ছা হয় না। এখানে মন চঞ্চল হয়, কেবল মঠাধ্যক্ষ মহাপুরুষজীর আদেশে আছি। যদি তিনি অনুমতি করেন তবে হরিদ্বার বা ঐরূপ কোন নিভৃত স্থানে গিয়ে গঙ্গাতীরে পড়ে থাকি। তবে এখন একলা থাকবার ক্ষমতা নেই। কেউ সঙ্গে থাকলে সুবিধা হয়। কারণ জল-তোলা প্রভৃতি কাজ এখন আমার অসাধ্য হয়ে পড়েছে। বসে বসে রান্নাবান্না একরকম করে নিতে পারি।" স্বামী শুদ্ধানন্দ কাশীতে যাইবার পরই স্বামী আত্মানন্দ স্বীয় পুরাতন ট্রাঙ্কটি চাবী সহ স্বীয় গুরুভ্রাতাকে দিয়া বলিলেন, "এর ভিতরে দুখানি গরম চাদর আছে। আমি এটা আর রাখবার ব্যবস্থা করতে পারবো না। তুমি এটা নিয়ে মঠাধ্যক্ষকে পাঠিয়ে দাও। তিনি এগুলি যাকে ইচ্ছা হয় দিবেন। আমি একটা সস্তা বালাপোষ যোগাড় করে আগামী শীতে ব্যবহার করব। স্বামিজী কি মঠের এই নিয়ম করে যাননি যে, সংঘের প্রত্যেক সাধু অধ্যক্ষকে তাঁর সর্বস্ব দিয়ে যাবেন?" ট্রাঙ্কটি খুলিয়া দেখা গেল, উহার মধ্যে দুইটি গরম কাপড় এবং একটি ফ্লানেলের জামা আছে। গরম কাপড় দুইখানি শ্রীশ্রীমা এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দ তাঁহাকে উপহার দিয়াছিলেন। সেইজন্য তিনি উক্ত চাদরদ্বয় সযত্নে রাখিয়াছিলেন, কখনো ব্যবহার করেন নাই।

কাশীতে বৈকাল ৪টা হইতে ৫টা পর্যন্ত তাঁহার কাছে প্রত্যহ কোন না কোন ধর্মগ্রন্থ পড়া হইত। কাহারো কোন অংশ শক্ত লাগিলে তিনি সামান্য কিছু বলিয়া দিতেন। কিন্তু পাঠকালে কোন অপ্রাসঙ্গিক কথা উঠিলে বিরক্তি প্রকাশ করিতেন। দেখা যাইত, স্বামিজীর গ্রন্থাবলীর অধিকাংশ তাঁহার মুখস্থ ছিল। অশুদ্ধ পাঠ শুনিলেই তিনি তৎক্ষণাৎ সংশোধন করিয়া দিতেন। কেহ কেহ বলিতেন, "না মহারাজ, এরূপ ছাপা আছে।" তাহাতে তিনি বলিতেন, "না ইহা ভুল। তোমরা পুরানো সংস্করণ মিলাইয়া দেখ।" তাঁহার নির্দেশ

অনুসারে মিলাইয়া দেখা যাইত, তাঁহার কথাই ঠিক এবং পুরানো সংস্করণে তদুক্ত পাঠই আছে। তাঁহার শিক্ষাদান প্রণালী ছিল অতি অদ্ভুত। দুইটি ঘটনার কথা এখানে বিবৃত হইল। একদিন তিনি এবং তাঁহার সেবক সেবাশ্রমের রান্নাঘরে পাশাপাশি বসিয়া আহার করিতেছিলেন। তখন রোগীদের এবং সাধুদের রান্না একই ঘরে হইত। সাধুরা সেই ঘরেই বসিয়া আহার করিতেন। শরীর বিশেষ অসুস্থ না থাকিলে স্বামী আত্মানন্দ রান্নাঘরে যাইয়া সকলের সঙ্গে আহারে বসিতেন।

সেদিন তিনি একটু আগেই খাইতে বসিয়াছেন এবং তাঁহার সেবক কিঞ্চিৎ পরে যাইয়া তাঁহার পাশে খাইতে বসিলেন। পাচকের নাম ছিল কেদার। সেবক আসনে বসিয়াই ডাক দিলেন, "কেদার, খানা লে আও।" সকলেই এরূপ বলিতেন। প্রত্যহ এই ডাক শুনিয়া সেবকও এরূপ করিতেন। সেদিন ঐরূপ বলায় স্বামী আত্মানন্দ তাহা শুনিয়া একটু পরে সেবককে বলিলেন, "রামগতি, যদি কিছু মনে না কর তোমাকে একটা কথা বলতে চাই।" সেবক তৎক্ষণাৎ সবিনয়ে নিবেদন করিলেন, "মহারাজ, আপনি কিছু বলবেন আমার মত লোককে, সেজন্য আবার অনুমতির অপেক্ষা কেন? আপনি কিছু বললে আমি ধন্য হব।" ধীর গম্ভীর স্বরে আত্মানন্দজী তখন তাঁহাকে বলিলেন, "দেখ এরা ব্যাস-বশিষ্ঠের বংশধর। কালপ্রভাবে অবস্থাবিপর্যয়ে এই অবস্থায় তারা নেমে এসেছে। তা ছাড়া এরা তোমা আমা অপেক্ষা অনেক বড়। সুতরাং তুমি একে 'পণ্ডিতজী' বলিয়া সম্বোধন করিও। আর এ দেশে সকলে ব্রাহ্মণদিগকে 'পণ্ডিতজী বলিয়াই থাকে।" বলা বাহুল্য, আত্মানন্দজীর নির্দেশ সেবক শিরোধার্য করিলেন। আত্মানন্দজী চাহিতেন, যেন সাধুদের আস্তানায় শিষ্টাচার ও সদাচার পূর্ণমাত্রায় পালিত হয়।

আর একদিন কাশীতে তাঁহার শরীর একটু অসুস্থ সম্ভবতঃ পেট-খারাপ হয়। নিজেই তিনি স্নানান্তে কাপড় কাচিয়া ছাদে শুকাইতে দিলেন। দুইটার সময় সেবক আসিতেই তাঁহাকে বলিলেন, "ছাদে আমার কাপড় কৌপীন আছে, তুলে নিয়ে আসতে পারবে কি?" সেবক সানন্দে সম্মতি

জানাইয়া অবিলম্বে ছাদে ছুটিলেন এবং কাপড় কৌপীন আনিয়া অগোছালো ভাবে ভাঁজ করিয়া আল্‌নাতে রাখিতে যাইতেছিলেন। এমন সময় স্বামী আত্মানন্দ তাঁহাকে বলিলেন, "রামগতি, একটা কথা বলিতে চাই, যদি কিছু মনে না কর।" সেবক সসম্ভ্রমে সম্মতি জানাইলেন। তখন তিনি বলিলেন, "কাপড় কৌপীন আমার হাতে দাও।" সেবক তাহাই করিলেন। স্বামী আত্মানন্দ বলিলেন, "শ্রীশ্রীস্বামিজী আমাদিগকে এইভাবে কাপড় এবং এইভাবে কৌপীন ভাঁজ করিয়া রাখিতে শিখাইয়াছিলেন।" এই বলিয়া তিনি কাপড় ও কৌপীন ভাঁজ করিবার সহজ কৌশলটি সেবককে শিখাইয়া দিলেন। এই ঘটনাদ্বয় হইতে বুঝা যায়, তিনি আদর্শ নীতিশিক্ষক ছিলেন।

কোন সেবক তাঁহার দর্শনাদি সম্বন্ধে জানিবার জন্য মাঝে মাঝে আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। কিন্তু আত্মানন্দজী উক্ত প্রশ্নের কোন উত্তর দিতেন না, চুপচাপ থাকিতেন। একদিন পুনরায় উক্ত প্রশ্ন শুনিয়া তিনি সেবককে বলিলেন, "দেখ তোমরা দর্শন বলতে যা বোঝ আমার তেমন কিছু হয়নি। তবে একদিন একটী দিব্য স্বপ্ন, হাঁ, স্বপ্নই বটে, দেখিয়াছিলাম। তা শোন। একে যদি তোমরা দর্শন বলতে চাও বল। আমার কিন্তু এর চেয়ে বেশী কিছু হয়নি। একদিন রাত্রে শুয়ে শুয়ে ভাবছি 'কিছুই তো হল না, জন্মটা বৃথাই গেল।' এরূপ ভাবতে ভাবতে বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু ঠিক ঘুমিয়েছিলাম কিনা মনে নাই। হঠাৎ দেখি সামনে দুটী জ্যোতির্ময় পদচিহ্ন। কাহার পায়ের ছাপ তা তখন বুঝতে পারিনি। এখন মনে হয়, শ্রীশ্রীমারই পদচিহ্ন হবে। দেখিতে দেখিতে উক্ত চরণচিহ্নযুগল হইতে অসীম জ্যোতিঃ নির্গত হইয়া আমাকে ঘিরিয়া ফেলিল এবং আমি তাহাতে ডুবিয়া গেলাম। কতক্ষণ এইভাবে ছিলাম জানি না, কিন্তু পরম আনন্দ হইতেছিল। মায়ের কোলে শিশু যেমন নিশ্চিন্ত ও আনন্দিত থাকে সেইরূপ একটা বোধ আসিয়াছিল। মনে হইতে লাগিল যেন দূরদূরান্তরে চলিয়া যাইতেছি। তখন 'আমি'-টাও ছিল কিনা বলতে পারছি না, সব যেন একাকার হয়ে গিয়েছিল। অনেকক্ষণ পরে যখন স্বপ্নটা ভেঙ্গে গেল তখনো আনন্দের নেশা কাটে নি। বিছানাতে বসিয়া চক্ষু রগড়াইয়া ভাবিতে লাগিলাম, 'ইহা সত্য না স্বপ্ন?' আজ পর্যন্তও

ইহা ঠিক করিতে পারি নাই। হয়ত স্বপ্নই, কিন্তু সেই পরমানন্দের আস্বাদ এখনো পাই। তার জন্যই মনটা ব্যাকুল হয়। ইহাই আমার দর্শন। ইহাকে সত্য বলিতে হয় বল, স্বপ্ন বলিতে হয় বল। আমার বাবা এর চেয়ে বেশী কিছু অনুভব হয় নাই।”

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ শিষ্যদের উপর তাঁহার কী অগাধ বিশ্বাস ছিল সেই সম্বন্ধে একটী ঘটনা এখানে উল্লিখিত হইল। সেই বৎসর স্বামী নিখিলানন্দ, সম্বিদানন্দ, সম্ভবানন্দ, প্রজ্ঞানানন্দ প্রভৃতির সন্ন্যাস হইবার কথা ছিল পূজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দের নিকট। অদ্বৈতাশ্রমের প্রাঙ্গনস্থ জামতলায় স্বামী সারদানন্দ, বুড়ো বাবা (সচ্চিদানন্দ) এবং শুকুল মহারাজ বসিয়া আছেন। সন্ন্যাসপ্রার্থিগণ দাঁড়াইয়া সন্ন্যাসের অনুমতি ভিক্ষা করিতেছেন স্বামী সারদানন্দের নিকট। স্বামী সারদানন্দ তাঁহাদিগকে বলিলেন, “আমাকে বল্‌ছ কেন ? (শুকুল মহারাজ প্রভৃতিকে দেখাইয়া) এ'দের সকলের অনুমতি লও। এঁরা যদি বলেন আমার আপত্তি নেই।” একথা শুনিয়াই স্বামী আত্মানন্দ জোড়-হাত করিয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন এবং পরম ভক্তিভরে নিবেদন করিলেন, “মহারাজ, আপনি এদের মাথায় চাঁটি মেরে দিলে এদের মুক্তি হয়ে যাবে। আপনি দয়া করে এদের সন্ন্যাস দিবেন তাতে আমাদের আবার মতামত কি ? এরা ভাগ্যবান্ যে, আপনার কৃপা পাবে। আপনার কৃপায় এদের জীবন ধন্য হয়ে যাবে। আমরা এবিষয়ে কি বলব ?” ইহার পরই স্বামী সারদানন্দকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া ধীরে ধীরে তিনি সেবাশ্রমের দিকে চলিয়া গেলেন।*

কাশী সেবাশ্রমে এখন যেখানে মহুয়া গাছটী আছে সেখানে একদিন শাস্ত্র-পাঠ হইতেছিল। গাছটী তখন ছোট ছিল। গ্রীষ্মকাল। সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্বে একটী ভক্ত আসিলেন। তিনি এক সের বা তদপেক্ষা কিছু বেশী মিছ্‌রী আনিয়া স্বামী আত্মানন্দের পদপ্রান্তে রাখিয়া বলিলেন, “আপনি মাঝে মাঝে একটু মিছ্‌রীর সরবৎ খাবেন”। ইহাতে আত্মানন্দজী উত্তর দিলেন, “আমার

* ইহা এবং আরো কয়েকটী ঘটনা স্বামী বিশ্বরূপানন্দ কথিত।

যাহা দরকার তাহা ত সেবাশ্রমই দিচ্ছে। আমার এসব দরকার নেই!” ভক্তটী পুনঃ পুনঃ জিদ্ করাতে আত্মানন্দজী সেবককে বলিলেন, “রামগতি, ভাণ্ডারীর নিকট এটা দিয়ে এস।” সেবক তৎক্ষণাৎ তাঁহার আদেশ পালন করিলেন। ইহাতে ভক্তটী অতিশয় মনঃক্ষুণ্ণ হইলেন। কিন্তু সেবক উক্ত মিছ্রী হইতে সরবৎ তৈয়ার করিয়া একদিনের বেশী তাঁহাকে খাওয়াইতে পারেন নাই।

আর এক দিন কথাপ্রসঙ্গে স্বামী আত্মানন্দ তাঁহার সেবককে বলিয়াছিলেন, “তখন মঠের কি সুন্দর নিয়ম ছিল। স্বামিজী নিয়ম করিলেন সাধুদের ব্যক্তিগত জিনিষ কিছু থাকিবে না। তদনুযায়ী আমরা যখন যাহা কিছু পাইতাম সব মঠের ম্যানেজারের নিকট জমা দিতাম। একবার হৃষীকেশ হইতে ফিরিবার সময় কোন শেঠ আমাকে একটি ছোট লোটা (ঘটি) এবং একটি কম্বল দিয়াছিলেন। আমি মঠে পেঁৗছিয়াই দ্রব্য দুটি ম্যানেজারের নিকট দিয়াছিলাম।” এই প্রসঙ্গে স্বামী আত্মানন্দ নিম্নোক্ত ঘটনার উল্লেখ করিয়াছিলেন। কোন সময় মঠে তাঁহার অসুখ হয়, তাঁহার গায়ে কম্বলাদি গরম কাপড় তেমন ছিল না। প্রথমতঃ ইহা কেহ নজর করেন নাই। পরে ইহা স্বামিজীর নজরে পড়ায় তিনি খুব দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, “আমি নিয়ম করেছিলাম, তাই এরা যে যা পেয়েছে মঠে এনে দিয়েছে আর এখন কেউ এদের দেখছে না! কি আশ্চর্য্য!” তারপর তিনি নিজের একখানা ভাল কম্বল ও একটা বালিশ আনিয়া আত্মানন্দজীর বিছানায় স্বহস্তে পাতিয়া দিয়া যান। ইহার পর স্বামিজী আবশ্যকীয় জিনিষ মঠে জমা দিতে নিষেধ করেন।

স্বামী আত্মানন্দ বলিতেন, সাধুজীবনে ভ্রমণকালে দুই জনের একসঙ্গে যাওয়া উচিত। এই প্রসঙ্গে তিনি নিম্নোক্ত ঘটনাটি উল্লেখ করেন। একদা তিনি অন্য কোন সাধুর সহিত দিল্লী সহর দেখিতে যান। উভয়ে একত্রে মাঝে মাঝে কোন পরিচিত ব্যক্তির সহিত দেখা করিতে যাইতেন। একদিন উক্ত সাধু সঙ্গীটি দ্বিপ্রহরের সময় কোন কাজে উল্লিখিত ভদ্রলোকটির বাটীতে

গমন করেন। দ্বারে দাঁড়াইয়া কড়া নাড়িতেই ভদ্রলোকের স্ত্রী আসিয়া কপাট খুলিয়া দেন এবং বলেন, "তিনি ভিতরেই আছেন। আপনি আসুন।" ইহাতে সাধুটি ভিতরে গেলেন। কিন্তু সেই স্ত্রীলোকটি দুশ্চরিত্রা ছিলেন এবং তাঁহার পতিও বাড়ীতে ছিলেন না। তখন সেই দুষ্টা নারী সদর দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া তাঁহার সহিত ব্যভিচার করিতে চাহিল এবং সাধুটি রাজী না হওয়াতে চীৎকার করিয়া লোক ডাকিবার ভয় দেখাইল। ইহার পর সাধুটির কি পরিণাম হইল তাহা তিনি আর বলেন নাই। তবে কোন গৃহস্থ বা ভক্তের বাড়ীতে সাধুর একক যাওয়া অত্যন্ত অনুচিত। একথা তিনি জোর দিয়া বার বার বলিতেন।

স্ত্রীলোকদের সম্বন্ধে স্বামী আত্মানন্দ অত্যন্ত হুঁশিয়ার ছিলেন এবং তৎপরিচিত সাধুদিগকে স্ত্রীলোকদিগের নিকট হইতে দূরে থাকিতে বলিতেন। এই প্রসঙ্গে তিনি নিম্নোক্ত প্রাচীন কাহিনী বিবৃতি করেন। একদা কোন সাধু নির্জন জঙ্গলে কুটির বাঁধিয়া তপস্যা করিতেন। কোন জরুরী কাজ না পড়িলে তিনি লোকালয়ে যাইতেন না। কোন লোক তাঁহার কুটিরে আসিলে তাঁহাকে আমল দিতেন না, স্ত্রীলোক ত দূরের কথা। এক রাত্রে প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হইল। এমন সময় কুটির দ্বারে পুনঃ পুনঃ করাঘাত শোনা গেল। সাধুটি দ্বার খুলিয়া দেখিলেন, আশ্রয়প্রার্থিনী একটি স্ত্রীলোক। অত্যন্ত বিব্রত হইয়া তিনি তাহাকে তাড়াইয়া দিতে চাহিলেন। কিন্তু স্ত্রীলোকটি অশেষ কাকুতি মিনতি করায় তিনি তাহাকে এই প্রতিশ্রুতিতে তথায় আশ্রয় দিতে রাজী হন যে, তিনি বারবার ডাকিলেও এমন কি, বাহিরে আত্মহত্যা করিলেও প্রভাত হইবার পূর্বে স্ত্রীলোকটি দ্বার খুলিবে না। স্ত্রীলোকটি ইহাতেই সম্মতা হইয়া সাধুর কুটির মধ্যে আশ্রয় লইল এবং সাধুটি একখানা কম্বল গায়ে জড়াইয়া কুটীরের বারান্দায় বসিয়া রাত কাটাইতে লাগিলেন। গভীর রাত্রে কুটীরে নারী সমাগমে অমন বিরক্ত সাধুরও মনোবিকার উপস্থিত হইল। তিনি দ্বার খুলিবার জন্য স্ত্রীলোকটিকে বার বার ডাকিলেন! কিন্তু স্ত্রীলোকটি পূর্ব প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিল, কিছুতেই দ্বার খুলিল না। কাম-রিপুর এমনি দুর্দমনীয়

বেগ যে, সাধুটি শেষে কুটীরের চালের উপর উঠিয়া ঘরের মধ্যে লাফাইয়া পড়িল। অতঃপর আত্মানন্দজী আর কিছু বলিলেন না। গম্ভীরভাবে মন্তব্য করিলেন, "বোঝ কামদমন কি কঠিন ব্যাপার। মা বাপের শরীরে কামের উদ্রেক হেতু আমাদের শরীর উৎপন্ন হয়। সুতরাং দেহটা কামজাত। সেইজন্য কামের হাত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে সর্বদা সতর্ক থাকিবে, কদাপি স্ত্রীলোকের সংস্পর্শে যাইবে না। দেখলে না, অমন বিরক্ত সাধুও কামের বেগ দমন করিতে পারিলেন না। যদি বাঁচিতে চাও, খুব হুঁশিয়ার থাকিবে এবং মোটেই কাম-ভাবকে প্রশ্রয় দিবে না।"

স্বামী আত্মানন্দ সর্বদা ঈশ্বরের স্মরণ মনন লইয়া থাকিতেন, অন্য সব বিষয় তাঁহার নিকট আলুনি লাগিত। তিনি স্বীয় মনের একাংশ লৌকিক ব্যবহারে দিতেন এবং অধিকাংশ মন ঈশ্বরচিন্তায় নিমগ্ন রাখিতেন। তিনি নিরামিষাশী ছিলেন। আহারের সময় দেখা যাইত, তিনি খুব তন্ময় হইয়া খাইতেন কাশী সেবাশ্রমে একদিন তিনি খাইতেছিলেন। গদাই মহারাজ তাঁহাকে দুই তিন বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তরকারি কেমন হয়েছে মহারাজ?" দুই তিন বার জিজ্ঞাসার পর তিনি উত্তর দিলেন "ভাল হয়েছে।" নিদ্রার পূর্বে বা পরে তন্দ্রার ঘোরে মানুষ যেরূপ কথা বলে উত্তরটি ঠিক সেইরূপই হইল। স্বামিজীর 'ভক্তিযোগ' পড়াইবার সময় তিনি আহার প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, "খাওয়ার সময় কোন কোন ভক্তের হুঁস থাকে না—নিজে খাচ্ছি কি ভিতরে যিনি আছেন তাঁকে খাওয়াচ্ছি।" স্বীয় উক্তির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ছিলেন তিনি স্বয়ং। স্বামী আত্মানন্দ পূর্বাশ্রমে বিবাহিত ছিলেন, স্ত্রীলোক হইতে সর্বদা ব্যবধান রাখিয়া চলিতেন। দায়ে না ঠেকিলে স্ত্রীলোকের সঙ্গে কথা বলিতে তাঁহাকে দেখা যায় নাই। কাশীতে বাঙ্গাল মায়ি নামে এক ভক্ত স্ত্রীলোক ছিলেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ তাঁহাকে আদর করিয়া উক্ত নামে ডাকিতেন। তিনি এত ভক্তি-মতী ও মাতৃভাবাপন্ন ছিলেন যে, তাঁহার সহিত কথা বলিবার সময় আমাদেরও মনে হইত না যে, স্ত্রীলোকের সহিত আলাপ করিতেছি। স্বামী আত্মানন্দ কেবল ইঁহার সঙ্গে মাঝে মাঝে নিঃসঙ্কোচে ধর্মকথা বলিতেন।

স্বামী আত্মানন্দ একটি পয়সাও নিজের কাছে রাখিতেন না। একদা কোন ভক্ত তাঁহার সেবার জন্য দশটি টাকা পাঠাইয়াছিলেন। আত্মানন্দজী প্রাপ্ত অর্থ তৎক্ষণাৎ সেবাশ্রমে দিয়া রিক্তহস্ত হইলেন। কিন্তু ইহাও দেখা গিয়াছে যে, ঢাকা মঠের ভক্ত প্রফুল্ল বন্দোপাধ্যায় একটি টাকা পাঠাইলে তিনি ভক্তের প্রীতির দান উপেক্ষা করেন নাই। তথাপি উক্ত টাকা তিনি নিজের কাছে না রাখিয়া সেবাশ্রমের অফিসে জমা দিলেন। তিনি পেট-রোগা ছিলেন বলিয়া নিত্য এক প্রকার খাদ্য হজম করিতে পারিতেন না। একদিন কোন ব্রহ্মচারী তাঁহার সেবকের হাতে কয়েক আনা পয়সা দিলেন এবং উহার পছন্দ মত খাবার আনিয়া তাঁহাকে দিতে বলিলেন। সেই রাত্রে একটু নূতন খাবার খাইয়া আত্মানন্দজী বালকবৎ আনন্দিত হইলেন এবং বার বার জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া লইলেন, এই পয়সা কে দিয়াছে। উক্ত অর্থের উদ্বৃত্ত এক আনা পয়সা দিয়া স্বামিজীর একটী ছবি কিনিয়া তিনি শিয়রের কাছে রাখিলেন। আহারান্তে তিনি পান খাইতে ভালবাসিতেন। সেইজন্য কোন ব্রহ্মচারী মাঝে মাঝে বৈকালের দিকে দুইটী পান কিনিয়া লইয়া তাঁহার নিকট যাইতেন। একটী পান তিনি তখনই খাইতেন এবং আর একটী পান নৈশ আহারের পর খাইবেন বলিয়া রাখিয়া দিতে বলিতেন। পান খাইয়া ঠোঁট দুইটী লাল করিয়া বালকবৎ আনন্দে বলিতেন, "ঠাকুর নাকি পান খেয়ে ঠোঁট লাল করে থাকতেন।"

স্বামী আত্মানন্দের জীবন-যাত্রা অতি সরল ও অনাড়ম্বর ছিল। প্রয়োজনাতিরিক্ত একটী ক্ষুদ্র দ্রব্যও তিনি কাছে রাখিতে কষ্টবোধ করিতেন এবং উহার প্রয়োজন কাহারো থাকিলে তাহাকে দিয়া নিশ্চিন্ত হইতেন। তদ্ব্যবহার্য্য বস্ত্রাদির সংখ্যাও অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। তাঁহার সৌন্দর্য্য-জ্ঞান এমনি প্রখর ছিল যে, যাহা ব্যবহার করিতেন তাহা মানানসইভাবে রাখিতেন। গ্রীষ্মকালে তাঁহার বিছানা একটী সতরঞ্চ, একটী বালিশ ও একটী গামুছার সমষ্টিমাত্র ছিল। কিন্তু সেই সামান্য বিছানার পারিপাট্যের দিকে তাকাইলে চক্ষু জুড়াইত। তাঁহার ভিতরটি যেমন পরিষ্কার ও সুন্দর ছিল বাহিরটাও তেমনি পরিষ্কার ও সুন্দর

রাখিতেন। সত্য ও সরলতা তাঁহার মজ্জাগত ছিল, মিথ্যা ও কপটতা তিনি আদৌ সহ্য করিতে পারিতেন না। তিনি ভাবিয়া ঠিক্ পাইতেন না, সাধু হইয়া লোকে কিরূপে মিথ্যা কথা বলে। সেবাশ্রমের কোন পুরানো সেবক সাধু সামান্য ব্যাপারে স্বীয় দোষ ঢাকিবার জন্য সত্যের অপলাপ করেন। স্বামী আত্মানন্দ ইহা জানিতে পারিয়া এতই মর্মাহত হন যে, তিনি হাঁফাইতে হাঁফাইতে উত্তেজিত ভাবে কোন ব্রহ্মচারীকে বলিয়াছিলেন, "কর্ম সাধুকেও hypocrite (কপট) করে দেয়। এতকালের পুরানো সাধুর মুখে মিথ্যা কথাটা আটকাল না! যদি পার কর্ম ছেড়ে সারা জীবন ঈশ্বরের চিন্তা নিয়ে থাকবে।"

স্বামী আত্মানন্দকে প্রায়ই জপপরায়ণ ও অন্তর্মুখীন দেখা যাইত। শেষ বয়সে এই ভাবটি তাঁহার জীবনে বিশেষ ভাবে গভীর হইয়াছিল। যখনই একটু চুপচাপ থাকিতেন তখনই দেখা যাইত তাঁহার করজপ চলিতেছে। অন্যান্য সময়ে তিনি মনোমালায় অজপা জপ করিতেন। কাশী সেবাশ্রমে অম্বিকা ধামের দক্ষিণে যেখানে একটী অশ্বত্থ গাছ আছে এবং এখন যেখানে গোশালা নির্মিত সেস্থানটি তখন জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। তিনি প্রায়ই উক্ত জঙ্গলের মধ্যে যাইয়া অশ্বথতলায় চুপচাপ বসিয়া থাকিতেন। নিত্য তথায় বসিতেন বলিয়া ইঁট ও পাথর দিয়া একটি অস্থায়ী আসন তিনি বৃক্ষতলে প্রস্তুত করেন। সেবাশ্রমের অনেকে টের পাইতেন না, হঠাৎ তিনি কোথায় সরিয়া পড়িলেন। বহু দিন পরে কেহ কেহ তাঁহার সেই নির্জন সাধনস্থান আবিষ্কারে সমর্থ হন। লক্ষ্য করা যাইত, তিনি অধিক লোকসঙ্গ পরিহার করিতেন। বেশী লোকজনের আসা-যাওয়া শুরু হইলে বা উহার সম্ভাবনা দেখিলে তিনি উক্ত স্থান হইতে সরিয়া পড়িতেন। তবে তিনি যে লোকসঙ্গে একেবারে বীতরাগ ছিলেন তাহা মনে হয় না। কারণ প্রায়ই সমাগত লোকদিগকে তিনি উপদেশ দিতেন বা তাঁহাদিগের সহিত কথাবার্তা বলিতেন। অবশ্য তাঁহার উপদেশ বা আলাপ অল্প কথায় হইত। আবার সব সময় লোকসমাগম তিনি পছন্দ করিতেন না।

একটি নির্দিষ্ট সময়ে লোকজন আসিলে তাঁহার আপত্তি হইত না। যখন ক্রমশঃ অশ্বত্থতলার আসনটি সম্বন্ধে অনেকে জানিলেন তখন তিনি তথায়

আর যাইতেন না। সেবাশ্রমের দশম সংখ্যক ওয়ার্ডের উত্তর-পশ্চিম কোণে যে প্রকাণ্ড বট গাছ আছে উহার তলায় তিনি আসন নির্দিষ্ট করিলেন। ঐ স্থানটি দুর্গম হইয়া ছিল। আবার তথায় গোখুরা সাপের ভয়ও তৎকালে খুব বেশী ছিল। সেজন্য সাধুব্রহ্মচারীরা সাধারণতঃ ঐদিকটা মাড়াইতেন না। দশম সংখ্যক ওয়ার্ডে তখন মাত্র কয়েকখানি ঘর ছিল, পুরা বাড়ী হয় নাই। তাঁহার শরীর-ত্যাগের পূর্ব পর্যন্ত সেই বটতলায় উক্ত নিভৃত আসন ছিল। প্রায়ই সকালে ৮টা হইতে ১০।১০॥ টা পর্যন্ত এবং বৈকালে ২।২॥ টা হইতে ৪টা পর্যন্ত, আবার সন্ধ্যার প্রাক্কালে এমন কি কখনো কখনো সন্ধ্যার একটু পরেও তাঁহাকে তথায় বসিয়া থাকিতে দেখা যাইত। তথায় অধিক যাইলেও অশ্বত্থতলার পূর্বাসনও তিনি একেবারে ছাড়েন নাই। সেখানেও তিনি মাঝে মাঝে যাইয়া বসিতেন।

বৈকাল ৪টা হইতে ৫টা পর্যন্ত প্রায় প্রত্যহই তাঁহার কাছে স্বামিজীর গ্রন্থাবলী এবং গিরিশচন্দ্রের নাটকাবলী পড়া হইত। প্রথমে দুই তিন জন লোক তাঁহার কাছে স্বামিজীর 'কর্মযোগ' ও 'ভক্তিযোগ' পড়িতেন। পার্শ্ববর্তী অদ্বৈতাশ্রমের কোন ব্রহ্মচারী উহাতে যোগদান করেন। আত্মানন্দজী যেন ব্রহ্মচারীকে লক্ষ্য করিয়া মাঝে মাঝে বলিতেন, "একে রুণু ঝুণু, দুয়ে পাঠ, তিনে গণ্ডগোল, চারে হাট।" ক্রমাগত কয়েকদিন এই কথা শুনিয়া ব্রহ্মচারী তাঁহাকে বলিলেন, "সকালে আপনার কাছে একলা এসে পড়ব।" ইহার পরে কথা রক্ষা করিতে ব্রহ্মচারী বিলম্ব করিতেছেন দেখিয়া তিনি একদিন স্মরণ করাইয়া দিলেন, "সকাল বেলা এসে পড়বে বলেছিলে, কই এলে না তো?" তাঁহারই আগ্রহ অধিক দেখিয়া পরদিন সকালে ব্রহ্মচারী 'বীরবাণী' লইয়া হাজির হইলেন। স্বামিজীর 'সন্ন্যাসীর গীতি' পাঠের সময় প্রত্যেকটি কলির ব্যাখ্যা তিনি অনেকক্ষণ ধরিয়া করিতেন এবং বলিতেন, "যদি প্রকৃত সাধু হতে চাও, আজ থেকে এর প্রত্যেকটি কথা নিয়ে ধ্যান কর।" 'বীরবাণী' শেষ হইলে 'দেববাণী' পাঠ আরম্ভ হইল। এই বই যখন অর্ধেক পড়া হইয়া গেল তখন আত্মানন্দজী উপরোক্ত ব্রহ্মচারীর তর্ক-প্রবৃত্তির উপর কটাক্ষ করিয়া বলিয়া

ছিলেন, "এ তোমার intellectual gymnastics (বুদ্ধির কসরৎ)," ইত্যাদি। দুই তিন দিন এইরূপ তিরস্কারের পর ব্রহ্মচারী পাঠ বন্ধ করিয়া দিলেন। উক্ত ব্রহ্মচারী তাঁহাকে অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন। তিনি স্থির করিলেন, তর্ক দ্বারা যখন ব্রহ্মলাভ অসম্ভব তখন জপ-ধ্যানের মাত্রা বাড়ানো উচিত। তিনি পাঠ বন্ধ করিয়া অধিকতর জপ-ধ্যানের চেষ্টা করিলেন।

দুই তিন দিন ব্রহ্মচারী পড়িতে যান না দেখিয়া আত্মানন্দজী তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "সত্যই কি পড়া বন্ধ করে দিলে? এটা ঠিক নয়। প্রথম প্রথম সব শাস্ত্রই দেখে নিতে হয়। তা না হলে মন বুদ্ধি গোলমাল সৃষ্টি করে। একবার সব দেখে নিয়ে পরে স্বীয় ভাবের অনুকূল শাস্ত্র স্মরণ মননের সুবিধার জন্য নিয়ে পড়ে থাকতে হয়। তুমি এক কাজ কর। গিরিশ বাবুর নাটক পড়। তুমি ভক্ত লোক। তাঁর নাটক তোমার ভাল লাগবে। গিরিশবাবুর নাটক ভক্তিরসে টস্ টস্ করছে। কাল গিরিশবাবুর 'পূর্ণচন্দ্র' নিয়ে আসবে।" স্বামী আত্মানন্দ বলিতেন, "আগে গীতা, উপনিষৎ ও ব্রহ্মসূত্র—এই প্রস্থান ত্রয় খুব পড়তাম। এখন 'কথামৃত', স্বামিজীর গ্রন্থাবলী ও গিরিশবাবুর নাটক গুলি আমার প্রস্থানত্রয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আগে আগে মনে হত 'কথামৃত' কঠিন ও দুর্বোধ্য। স্বামিজীর গ্রন্থাবলী যুক্তি-বিচারপূর্ণ বলে এই বুড়ো বয়সে আর পড়তে পারি না। এখন সব চেয়ে ভাল লাগে গিরিশবাবুর নাটকাবলী। সেগুলিতে জীবন্ত চরিত্রের মধ্য দিয়ে তত্ত্বসমূহ প্রতিফলিত হওয়ায় কোন তত্ত্বই ধারণা করতে কষ্ট হয় না।" গিরিশচন্দ্রের নাটকাবলীর মধ্যেও 'পূর্ণচন্দ্র' আত্মানন্দজীর সর্বাপেক্ষা প্রিয় ছিল। তিনি বলিতেন, "পূর্ণচন্দ্র সন্ন্যাসীর আদর্শ, ঠিক স্বামিজীর ভাবের সন্ন্যাসী।"*

'পূর্ণচন্দ্র' বইখানি সেই সময় পাওয়া গেল না বলিয়া 'চৈতন্য লীলা', 'নিমাই সন্ন্যাস' ও 'পাণ্ডব-গৌরব' নাটকত্রয় পর পর পড়া হইল। 'পাণ্ডব-গৌরব' এর প্রথম বাক্য "পশ্চিমে আরক্ত ভানু অস্তাচলগামী, আসে ছায়া বিকশিয়া কায়া"

* ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য লিখিত এবং 'বিশ্ববাণী'র ১৩৪৯ মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত 'স্বামী আত্মানন্দের স্মৃতি' শীর্ষক প্রবন্ধে বিবৃত।

পড়িতেই আত্মানন্দজী ব্রহ্মচারীকে বলিলেন, "তোমার পড়া ঠিক হচ্ছে না। পাঠ শুনে মনে হচ্ছে না যে, চিত্রটি ঠিক ঠিক বুঝতে পেরেছ। নিবিড় বনের পিছনে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। এ দৃশ্য কখনো দেখেছ কি? ধ্যান যত গভীর হবে সকল বিষয়ই তত ঠিক ঠিক ধারণা করতে পারবে, তোমার পাঠও তত সুন্দর হবে। এই অল্প কয়টি কথায় যে অনুপম চিত্র আঁকা হয়েছে তা নিয়ে অন্ততঃ দশ মিনিট ধ্যান কর।" 'পাণ্ডব-গৌরব' পাঠ শেষ হইবার পর তাঁহার সঙ্গে ঈশ্বরতত্ত্ব লইয়া ব্রহ্মচারীর তর্ক উপস্থিত হয়। ব্রহ্মচারীর সন্দেহ দূরীকরণার্থ এক ঘণ্টারও অধিক কাল তিনি তাঁহাকে বিষয়টি বুঝাইলেন। সাধারণতঃ তিনি বেশী কথা বলিতেন না। পরদিন তাঁহার শরীরে সামান্য জ্বর দেখা দেয়। দুর্বল শরীরে পূর্বদিনের অধিক কথাবার্তার প্রতিক্রিয়া হইয়াছে বুঝিয়া ব্রহ্মচারী দুঃখিত হইয়া বলিলেন, "আমিই আপনার এই অসুখের কারণ।" এই কথায় তিনি উত্তেজিত হইয়া উত্তর দিলেন, "না না। ঈশ্বরীয় কথা আমি সারা দিন বলতে পারি।" কিন্তু তাঁহার জ্বর আর ছাড়িল না। অতি ধীরে ধীরে প্রতিদিন অল্প অল্প বাড়িয়া অবশেষে উহা কাল ব্যাধিতে পরিণত হইল। তাঁহার জ্বর যখন প্রত্যহ একটু একটু বাড়িতেছিল সেই সময়ে 'পূর্ণচন্দ্র' নাটকখানি পাওয়া গেল। উহা পড়িতে আরম্ভ করিতেই তিনি বিছানা হইতে উঠিয়া নীচে নামিয়া বসিলেন। উহাতে আপত্তি করায় বলিলেন, "ভাগবত্ পাঠ হচ্ছে। সাধু জীবনের পতন তখনই হয় যখন বাসনার ছলনায় গুরুর উপর শিষ্যের সংশয় আসে। 'পূর্ণচন্দ্রে' তাহার দৃষ্টান্ত দামোদর ও সেবাদাস। কাহারো সাধ্য নাই গুরুবিশ্বাসীর পতন ঘটাইতে পারে।" ১০২° জ্বর লইয়া বিছানায় শুইয়া শুইয়া অসুস্থ আত্মানন্দ এই ভাবটি ব্রহ্মচারীর হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে মুদ্রিত করিবার জন্য কতই না চেষ্টা করিতেছিলেন! তাঁহার বক্তব্যের সারমর্ম ছিল, গুরুভক্তিই সাধক শিষ্যের শ্রেষ্ঠ ধর্ম। ব্রহ্মচারী শ্রদ্ধাভরে শায়িত আত্মানন্দজীর পায়ে হাত বুলাইতেছিলেন, আর তিনি হাসিয়া বলিলেন, "দামোদরের মত্ এমনি বাসনা জাগে, একটা চেলা টেলা দেখে নেব যে পাটা টিপ্‌বে।" 'পূর্ণচন্দ্র' শুনিয়া হার ভাগবত শোনা পূর্ণ হইল। যাহাতে ভাগবত চিন্তার ব্যাঘাত না ঘটে

সেজন্য তিনি শেষের কয়েক দিন কথা বলা বন্ধ করিয়া দিলেন। লোক কাছে নেই ভাবিয়া একবার তিনি 'নারায়ণ' উচ্চারণ করিয়াছিলেন। অদূরে দণ্ডায়মান কোন সাধু সেই উচ্চারণ শুনিতে পান।

স্বামী আত্মানন্দ যখন শেষ অসুখে পড়েন তখন স্বামী শুদ্ধানন্দও জ্বরাক্রান্ত হন। উভয়ে অম্বিকাধামেই থাকিতেন। স্বামিজীর এই দুই সন্ন্যাসী শিষ্যের সেবার ভার পড়িল কোন ব্রহ্মচারীর উপর। ব্রহ্মচারী উভয়ের জন্য দুধ-সাগু লইয়া আসিলেন এবং আসন পাতিয়া জলপাত্র দিয়া সাগুর বাটি দুইটি যথাস্থানে রাখিলেন। উভয়ে সাগু খাইতে বসিলেন। একটু সাগু খাইয়াই স্বামী আত্মানন্দ হঠাৎ সেবককে বলিলেন "রামগতি, এবার স্বামিজীর ডাক এসেছে। তাঁর পাঁঠা এবার তিনি বলিদান দেবেন। আমার এ জ্বর সামান্য জ্বর নয়। ইহা হয় টাইফয়েড, না হয় নিউমোনিয়া।" ইহা শুনিয়া সেবক উত্তর দিলেন, "মহারাজ, আপনার সামান্য জ্বর হয়েছে, হয়ত ইনফ্লুয়েঞ্জা। আপনি এত চিন্তিত হয়েছেন কেন? দু তিন দিনেই সেরে যাবেন।" স্বামী শুদ্ধানন্দও সেবকের উক্তির সমর্থন করিলেন। কিন্তু আত্মানন্দজী বলিলেন, "আচ্ছা, দেখে নিও, তোমার কথা ঠিক কি আমার কথা ঠিক। স্বামিজীর পাঁঠার বলি এবার নিশ্চয়ই হবে।" এই ভাবে দুই তিন দিন কাটিল। ইতোমধ্যে স্বামী শুদ্ধানন্দের ইনফ্লুয়েঞ্জা সারিয়া গেল। কিন্তু আত্মানন্দজীর জ্বর বাড়িয়াই চলিল। তিনি সাধারণতঃ একটু পেটরোগা ছিলেন। এবার জ্বরের পর উদরাময় দেখা দিল। ক্রমে রোজ পনের কুড়ি বার করিয়া দাস্ত আরম্ভ হইল। কিন্তু কিছুতেই তিনি ঘরের মধ্যে বেডপ্যানে বা কমোডে বাহ্যে করিতেন না। এই বিষয়ে সেবকদের সমস্ত অনুরোধ ব্যর্থ হইল। সেবাশ্রমের তদানীন্তন অধ্যক্ষ স্বামী কালিকানন্দ তাঁহাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইলেন। তখন আত্মানন্দজী বলিলেন, "আমার তো কোন কষ্ট হচ্ছে না। যখন না পারব তখন ঘরেই বাহ্যে যেতে হবে।" অথচ তিনি উঠিয়া দাঁড়াইতে গেলে কাঁপিতেন। সেবকের কাঁধে ভর দিয়া অতি কষ্টে তিনি পায়খানায় যাইতেন। তথাপি কক্ষমধ্যে মলত্যাগ করিতে সম্মত হইলেন না।

তাঁহার বিছানায় মাত্র একখানি সতরঞ্চি, তদুপরি একটি তোয়ালে, একটি বালিশ এবং গায়ে দিবার একখানি বোম্বাই চাদর ছিল। সেবক স্বামী কালিকানন্দের নিকট হইতে একটি নূতন তোষক চাহিয়া আনিলেন এবং রোগীকে পায়খানায় বসাইয়া আসিয়া তোষকটি বিছানায় পাতিয়া দিলেন। একখানা বিছানার চাদরও তদুপরি পাতা হইল। রোগী পায়খানা হইতে আসিয়া বিছানায় শুইয়াই তৎক্ষণাৎ উঠিয়া বসিলেন এবং দুঃখিত হইয়া বলিলেন, "রামগতি, আমায় শান্তিতে মরতে দেবে না? ইহাই যদি তোমার ইচ্ছা হয় তবে তুমি এখান থেকে চলে যাও। তোমার সেবা আমি চাই না।" তখনও সেবক বুঝিতে পারেন নাই তাঁহার কি দোষ হইয়াছে। তিনি করজোড়ে আত্মানন্দজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, আমার কি অপরাধ হয়েছে?" তখন তিনি তোষকের দিকে হাত বাড়াইয়া বলিলেন, "সাধুর মৃত্যুশয্যায় এসব কেন? তুমি দয়া করে এটা বিছানা থেকে তুলে নেবে কি?" এই বলিয়া তিনি খাট হইতে নামিয়া মেজেতে শুইয়া পড়িলেন। কারণ, বসিবার সামর্থ্য তখন তাঁহার ছিল না। সেবক তৎক্ষণাৎ ক্ষমা চাহিয়া তোষকটি তুলিয়া লইলেন এবং পূর্ববৎ রোগশয্যা করিয়া দিলেন। তখন রোগী শান্ত হইয়া সেই বিছানায় শয়ন করিলেন। বোধ হয়, ইহা তাঁহার অসুখের পঞ্চম দিনের ঘটনা। ষষ্ঠ বা সপ্তম দিনে পূজ্যপাদ স্বামী অখণ্ডানন্দ সেবাশ্রমে বেড়াইতে আসিলেন। তিনি কাশীধামে পুঁটিয়া রাজবাড়ীতে উঠিয়াছিলেন। স্বামী আত্মানন্দ অসুস্থ শুনিয়া তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। স্বামী অখণ্ডানন্দ ও স্বামী কালিকানন্দের মিলিত অনুরোধে আত্মানন্দজী তোষকে শুইতে রাজী হইলেন। কিন্তু কিছুতেই ঘরের মধ্যে কমোডে বাহ্যে যাইতে স্বীকার করিলেন না।

এই সময় স্বামী নারায়ণানন্দ, স্বামী অনন্তানন্দ এবং স্বামী স্বপ্রকাশানন্দ আসিয়া পড়িলেন এবং তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হইলেন। তখনও তিনি ঘরের মধ্যে বাহ্যে যাইতে নারাজ। স্বামী অখণ্ডানন্দ পুনঃ পুনঃ উচ্চৈঃস্বরে অনুরোধ করাতে তিনি উত্তর দিলেন, "আপনি কি বলছেন আমি শুনতে পাচ্ছি না।"

তখন সেবকত্রয় নিরুপায় হইয়া স্থির করিলেন, তিনি যখন আমাদের সাহায্য ছাড়া পায়খানায় যাইতে পারেন না, তিনি উঠিলেই একটু জোর করিয়া বিছানার পাশে কমোডে বসাইয়া দিব। সেবকদের কথা তিনি শুনিতে না পাইলেও তাঁহাদের সঙ্কল্প রোগীর অবিদিত রহিল না। শেষ মুহূর্ত পর্য্যন্ত তাঁহার পূর্ণ জ্ঞান ছিল। সেবকদের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া তিনি দিনের বেলায় দুই একবার কমোডে বসিতে আপত্তি করিলেন না। সেবকত্রয় রাত্রে পালা করিয়া জাগিতেন। যে সেবকের পালা রাত্রি নয়টা হইতে একটা পর্য্যন্ত ছিল তিনি মেজেতে দরজার কাছে বসিয়াছিলেন একটী কপাটে পিঠ এবং অন্য কপাটে পা লাগাইয়া। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল রোগী যেন হঠাৎ উঠিয়া পায়খানায় চলিয়া না যান। অন্য দুই সেবকও অন্য দুই দরজার পাশে বসিয়াছিলেন। রোগী অসুখের ঘোরে বিছানায় পড়িয়া আছেন। এমন সময় সেবকদের তন্দ্রা আসিল। হঠাৎ একটা ভীষণ শব্দে তাঁহারা জাগ্রত হইলেন। দুইজন সেবক উঠিয়া দেখিলেন, রোগী বিছানায় নাই। একজন সেবক পায়খানার দিকে ছুটিয়া গেলেন এবং দেখিলেন, রোগী অন্যতম নিদ্রিত সেবকের বুকের উপর পড়িয়া গিয়াছেন। ইহাতে আহত সেবকের ঠোঁট কাটিয়া রক্ত পড়িতেছে। তখন একজন সেবক রোগীকে সন্তর্পণে ধরিয়া পায়খানায় বসাইয়া দিলেন।

উক্ত ব্যাপারটি এইরূপ ঘটিয়াছিল। একজন সেবককে নিদ্রিত দেখিয়া রোগী তাঁহাকে ডিঙাইয়া বারান্দায় যান। তথায় দরজার সম্মুখে শায়িত দ্বিতীয় সেবককে ডিঙাইয়া হলঘরে ঢোকেন। তৃতীয় সেবককে ডিঙাইয়া যাইবার সময় তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইয়া যায়। রোগী অত্যন্ত দুর্বল বলিয়া টলিতেছিলেন। তৃতীয় সেবক তাঁহাকে ধরিয়া ফেলেন, কিন্তু টাল সামলাইতে না পারিয়া পড়িয়া যান। রোগীও তদুপরি পতিত হন। ইহাতে আঘাত লাগিয়া সেবকের ঠোঁট কাটিয়া রক্ত পড়িতে থাকে। সৌভাগ্যের বিষয়, রোগীর কোন চোট লাগে নাই। আত্মানন্দজী পায়খানা হইতে আসিয়া দুঃখ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "দেখ দেখি! অমুকের ঠোঁট হইতে রক্ত পড়িল। আমার নির্বুদ্ধিতার জন্য এরূপ হইল। আচ্ছা, এখন হতে তোমরা যেমন বলবে

তেমন করব। কমোডেই পায়খানা যাব। কি আর করি বল, এখন এরূপই মার ইচ্ছা বুঝতে হবে।” ইহা বোধ হয় তাঁহার অসুখের সপ্তম বা অষ্টম দিনের ঘটনা।

ইহার পর আর কোন দিনই তিনি পায়খানায় যান নাই, নিজ ঘরে কমোডেই বসিতেন। তাঁহার অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হইতে লাগিল। মাঝে মাঝে তিনি কাপড়েও বাহ্যে করিয়া ফেলিতেন। কিন্তু তখন তাঁহার আর দুঃখ প্রকাশের শক্তি ছিল না। তবুও আকার-ইঙ্গিতে বিমর্ষমলিন মুখে তাহা জানাইতেন। তাঁহার জ্বর হইবার কয়েকদিন পর হইতেই তাঁহাকে ডাঃ ভবানী সেনের চিকিৎসাধীনে রাখা হয়। জ্বরের বিরাম আদৌ না হওয়ায় এবং জ্বর ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রসিদ্ধ ডাঃ অমর বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখান হয়। অমরবাবু পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, “ইহা পালা জ্বর” এবং তদনুযায়ী চিকিৎসা হইতে থাকে। রবিবার হইতে একটু নিউমোনিয়ার ভাব দেখা দেয়। পুনরায় অমরবাবুকে ডাকা হইল। ইনজেক্‌সন দিবার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করায় তিনি রোগীকে ভালরূপে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, “এ সামান্য ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া, ঔষধেই সারবে।” ব্যস্ততাসত্ত্বেও ডাক্তারবাবু নিয়মিত ভাবে আসিয়া সযত্নে আত্মানন্দজীর চিকিৎসা করেন। ক্রমে স্বামী আত্মানন্দ কানে কম শুনিতে থাকেন, খুব চীৎকার করিয়া বলিয়া তাঁহাকে ঔষধপত্র খাওয়ান হইত। কাহারো মুখ-নাড়া দেখিলে বলিতেন, ‘আমি কিছুই শুনতে পাচ্ছি না।’ এই বলিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া থাকিতেন। সেই অবস্থাতেও কোন কোন সেবক তাঁহার কর-জপ লক্ষ্য করিয়াছিলেন। স্বামী স্বপ্রকাশানন্দ প্রভৃতি সাধুগণ সর্বদা কাছে থাকিয়া ও রাত্রি জাগিয়া প্রাণপণে রোগীর সেবা করিলেন। শেষে দাস্ত বন্ধ হইল এবং ছানার জল, বেদানার রস, হর্লিক দুধ প্রভৃতি পথ্য চলিল। বৃহস্পতিবার হইতে অতিরিক্ত দুর্বলতা দেখা দিল। শুক্রবার প্রাতে ডাঃ অমরবাবু রোগীকে দেখিয়া বলিলেন, “অন্য সব লক্ষণ ভাল, কিন্তু অতিরিক্ত দৌর্বল্য।” তিনি উত্তেজক ঔষধের ব্যবস্থা দিলেন। উহার ২।৩ দাগ খাওয়ান হইয়াছিল। বেলা ২।২॥টা হইতে

আত্মানন্দজীর বাক্য বন্ধ হইল এবং আন্দাজ ৪টা হইতে ঘাম আরম্ভ হইল। ডাঃ ভবানী সেন এবং ডাঃ এস. কে. চৌধুরী আসিয়া শেষাবস্থা বলিয়া গেলেন। ডাঃ অমরবাবু যখন আসিলেন তখন সকলে স্বামী অখণ্ডানন্দের আদেশে মুমূর্ষু সন্ন্যাসীকে উচ্চৈঃস্বরে 'হরি ওঁ রামকৃষ্ণ' মহানাম শুনাইতেছেন। স্বামী অখণ্ডানন্দই সর্বপ্রথম এই নাম শুনাইতে আরম্ভ করেন। তিনি এবং অন্যান্য বহু সাধু তাঁহার শয্যাপার্শ্বে এবং প্রায় শতাধিক ভক্ত বারান্দায় ও বাহিরে দাঁড়াইয়াছিলেন শেষ সময়ে। ১৩৩০ সালের ২৫শে আশ্বিন (১৯২৩ খ্রীঃ ১২ই অক্টোবর) শুক্রবার, সন্ধ্যা ৭টা ২৫ মিনিটের সময় প্রায় দুই সপ্তাহ রোগে ভুগিয়া স্বামী আত্মানন্দ প্রায় ৫৫ বৎসর বয়সে সজ্ঞানে দেহত্যাগ পূর্বক সাধনোচিত ধামে চলিয়া গেলেন। পরম শান্তিতে তাঁহার দেহত্যাগ হয়। শনিবার প্রাতে তাঁহার পূতদেহ পুষ্পমাল্যাদিতে বিভূষিত করিয়া মণি-মর্ণিকা ঘাটে গঙ্গায় জল-সমাধি দেওয়া হয়। পরবর্তী কোজাগরী পূর্ণিমার দিন কাশী রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে তাঁহার পুণ্য স্মৃতিতে ভাণ্ডারা হয়।*

স্বামী আত্মানন্দের মহাপ্রয়াণ সম্বন্ধে পূজনীয় স্বামী সুবোধানন্দ বেলুড় মঠ হইতে ২৮।১০।২৩ তারিখে রাঁচির কোন ভক্তকে লিখিয়াছিলেন, "আত্মানন্দ স্বামী দেবীপক্ষে তৃতীয় সন্ধ্যায় ঠাকুরের কাছে গিয়াছেন। ঠাকুর বলিতেন, যার হেথায় আছে তার সেথায় আছে; যার হেথায় নাই, তার সেথায়ও নাই। শুকুল মহারাজ সারা জীবন সৎচর্চা ও সৎচিন্তায় রত ছিল। সেখানে তিনি শান্তিতে আছেন।" সাধুদের দেহত্যাগের ত্রয়োদশ দিবসে মহোৎসব হয়। স্বামী আত্মানন্দ অকিঞ্চন সাধু ছিলেন। কিন্তু কাশী সেবাশ্রমে ও বেলুড় মঠে আশ্চর্য্য রূপে তাঁহার ভাণ্ডারার টাকা জুটিয়া গেল। উভয় স্থানের ভাণ্ডারায় সাধু, ব্রহ্মচারী ও ভক্ত সকলেই পরম তৃপ্তিলাভ করিলেন। বেলুড় মঠে স্বামী শিবানন্দ বলিয়াছিলেন, "শুকুল মহারাজ মহাপুরুষ ছিল। তোমরা ত কিছু করবে না! তাই ঠাকুর নিজেই তার ভাণ্ডারার সুব্যবস্থা

---

* 'উদ্বোধন' পত্রিকার ১৩৩০ অগ্রহায়ণ সংখ্যায় বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত।

করলেন।” কাশীতে ভাণ্ডারার দিন স্বামী শুদ্ধানন্দ উপস্থিত ছিলেন। যে ব্রহ্মচারী স্বর্গগত আত্মানন্দজীর কাছে গিরিশবাবুর নাটকাবলী পড়িতেন তিনি তাঁহাকে সেদিন বলিলেন, “শুকুল মহারাজ গিরিশবাবুর নাটক শুনতে ভালবাসতেন, তুমি ত পড়ে শোনাতে। তিনি যে ঘরে ছিলেন সে ঘরে বসে আজ তাঁকে একটু পড়ে শোনাও।” ব্রহ্মচারী শুদ্ধানন্দজীর আদেশ পালন করিলেন।

স্বামী আত্মানন্দ ছিলেন কঠোর সন্ন্যাসী, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের হাতে-গড়া তপস্বী সাধু। তাই তাঁহার জীবনে ত্যাগতপস্যার হোমানল সদা প্রদীপ্ত ছিল। শশী মহারাজের সঙ্গে তাঁহাকে সর্বদা কত সতর্ক থাকিতে হইত সেই সম্বন্ধে তিনি বলিতেন, “তোমরা যেরূপ কাপড় পর আলগা করে আমরা সেরূপ পরতুম না। সকাল থেকে বারটা পর্য্যন্ত মালকোঁচা মেরে থাকতে হতো। তাঁর কখন কি আদেশ আসে? যখন যেটা বলতেন সেটা অবিলম্বে করতে হতো। একটু দেরী বা এদিক ওদিক হলে আর রক্ষা ছিল না! “সন্ন্যাসীর পক্ষে সঞ্চয় নিষিদ্ধ। শেষ অসুখের সময় দেখা গেল, স্বামী আত্মানন্দের কাছে একটীও পয়সা নাই। একখানা অতিরিক্ত কাপড়ও তিনি রাখিতেন না। কিন্তু কঠোর হইলেও তিনি নীরস ছিলেন না। নির্দোষ রসিকতা তিনি পছন্দ করিতেন। একবার তিনি বাংলা পদ্যে একটী লম্বা ছড়া রচনা করিয়া গুরুভ্রাতা স্বামী শুদ্ধানন্দকে পাঠান। শেষ জীবনে শ্রীশ্রীমার প্রতি তাঁহার ভক্তিবিশ্বাস শতগুণে বৃদ্ধি পায়। পূর্বোক্ত স্বপ্ন-বৃত্তান্ত হইতে ইহা বোঝা যায়। ধ্রুপদ গানের সঙ্গে পাখোয়াজ বাজাইতে তিনি ভালবাসিতেন। তিনি সঙ্গীতানুরাগী ছিলেন এবং শেষ অসুখের সময় সংঘের কোন সাধুর গান মাঝে মাঝে শুনিতেন। তখন সুগায়ক স্বামী অম্বিকানন্দের আগমনের সম্ভাবনা জানিয়া তিনি উল্লসিত হন। কিন্তু অম্বিকানন্দজীর সঙ্গীত শ্রবণেচ্ছা তাঁহার পূর্ণ হয় নাই। তিনি সন্ন্যাসীর কঠোর নিয়ম নির্মমভাবে পালন করিতেন। একবার কাশী অদ্বৈতাশ্রমে স্বামী প্রশান্তানন্দ ভাগবত ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। স্বামী প্রেমানন্দ ও স্বামী তুরীয়ানন্দ প্রভৃতি প্রাচীন সাধুগণ এবং স্বামী

আত্মানন্দ প্রমুখ নবীন সন্ন্যাসীগণ বহু পুরুষ ভক্তসহ ব্যাখ্যা শ্রবণে সমবেত। একটী বড় ফরাসের উপর সকলে উপবিষ্ট। এমন সময় হরিমতি নাম্নী পরিচিতা জনৈকা স্ত্রীভক্ত শাস্ত্রব্যাখ্যা শুনিতে আসিয়া ফরাসের এক কোণে সকলের পশ্চাতে বসিলেন। তৎক্ষণাৎ স্বামী আত্মানন্দ পাঠশ্রবণ ছাড়িয়া উঠিয়া গেলেন। কোন প্রাচীন সন্ন্যাসী কর্তৃক স্থানত্যাগের কারণ জিজ্ঞাসিত হইয়া তিনি বলিলেন, "নারীর সহিত একাসনে সন্ন্যাসীর উপবেশন নিষিদ্ধ।"

স্বামী আত্মানন্দের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে যাঁহারা মিশিতেন তাঁহারাই তাঁহার সমুচ্চ আধ্যাত্মিকতার প্রবল প্রভাব অনুভব করিতেন। গুরুস্থানীয় সন্ন্যাসিগণ এবং গুরু-ভ্রাতাগণও তাঁহাকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। যোগীর ধ্যানপ্রিয়তা এবং সাধুর ত্যাগময়তায় তাঁহার জীবন অলঙ্কৃত ছিল। তিনি ছিলেন নির্লিপ্ত কর্মী। প্রত্যেক কাজটী পূজার মত তিনি নিখুঁত ভাবে করিতেন সমগ্র মন দিয়া। তিনি ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের সুযোগ্য শিষ্য এবং রামকৃষ্ণ সংঘের সমুজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম, ও যোগের সমবায়ে সুগঠিত চরিত্রই বর্তমান যুগাদর্শ। যুগপ্রবর্তক বিবেকানন্দের মর্মবাণী ছিল ইহাই। তৎশিষ্য স্বামী আত্মানন্দের জীবনে উক্ত যুগাদর্শ বিমূর্ত হইয়াছিল। স্বামী ব্রহ্মানন্দ কোন সন্ন্যাসী শিষ্যকে বলিয়াছিলেন, "শুকুল যোগভ্রষ্ট মহাপুরুষ।" স্বামী আত্মানন্দের সমগ্র সন্ন্যাস-জীবন সমাধিলাভের নিরন্তর সাধনায় পরিপূর্ণ ছিল।

বিয়াল্লিশ

স্বামী নির্মলানন্দ*

স্বামী নির্মলানন্দের মহাসমাধি সম্বন্ধে 'উদ্বোধন' পত্রিকায় (১৩৪৫, জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায়) নিম্নোক্ত সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল।—"গত ২৬শে এপ্রিল মঙ্গলবার স্বামী নির্মলানন্দ মহারাজ মালাবার প্রদেশে ওট্টাপালম্ নামক স্থানে ৭৩ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। স্বামী নির্মলানন্দ বাগবাজার বসুপাড়ার বিখ্যাত দত্তবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্বাশ্রমের নাম ছিল তুলসীচরণ দত্ত এবং পিতার নাম দেবনাথ দত্ত। তিনি বাগবাজারে বলরাম বসু মহাশয়ের বাটীতে অল্প বয়সেই শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দর্শন করিবার সৌভাগ্য লাভ করেন। তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের তিরোধানের পর বরাহনগর মঠে যোগদান করেন এবং স্বামী নির্মলানন্দ নামে পরিচিত হন। ইনি স্বামী বিবেকানন্দের বিশেষ স্নেহের পাত্র ছিলেন। ১৯০৩ খ্রীঃ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজকে সহায়তা করিবার জন্য তাঁহাকে আমেরিকায় প্রেরণ করা হয় এবং ১৯০৬ খ্রীঃ তথা হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি কয়েক বৎসর উত্তর ভারতে নানা তীর্থ পর্য্যটনে ও তপস্যায় অতিবাহিত করেন। দক্ষিণ ভারতে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ মহারাজের প্রতিষ্ঠিত বাঙ্গালোর আশ্রমের কার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য তিনি ১৯০৯ খ্রীঃ বেলুড় মঠ হইতে প্রেরিত হন এবং বিশ বৎসরের উপর উক্ত আশ্রমের অধ্যক্ষপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া দক্ষিণ ভারতের নানা স্থানে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাণী প্রচার ও মালাবার অঞ্চলে কয়েকটী আশ্রম স্থাপন করেন। তাঁহার তেজস্বিতা ও বাগ্মিতা ছিল

---

* দক্ষিণ মালাবারের ওট্টাপালমস্থ শ্রীনিরঞ্জন আশ্রম হইতে প্রকাশিত স্বামী নির্মলানন্দের বিস্তৃত ইংরাজি জীবনী অবলম্বনে স্বামী শিবশরণ পুরী কর্তৃক রচিত। ইহার প্রথমাংশ 'বিশ্ববাণী'র ১৩৫৭ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত।

অনন্যসাধারণ। তিনি বহু ভক্ত ও শিষ্য রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার দেহাবসানে সকলেই শোকসন্তপ্ত।"

ওট্টাপালমে স্বামী নির্মলানন্দের স্মৃতি-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাঁহার গৃহী ও সন্ন্যাসী শিষ্যগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টায়। স্মৃতিমন্দিরটী নাতিক্ষুদ্র, অষ্টকোণযুক্ত ও কারুকার্য্যশোভিত। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে ডিসেম্বর বড়দিনে স্বামী নির্মলানন্দের ভস্মাস্থি তথায় প্রোথিত হয়। সেইদিন হইতে তথায় তাঁহার নিত্যপূজা অনুষ্ঠিত হইতেছে। তাঁহার মহাসমাধির পরে প্রায় দেড় বৎসরের মধ্যেই উক্ত মন্দির নির্মিত এবং উহাতে তাঁহার বৃহৎ প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বাংলায় এই সন্ন্যাসী কর্মবীরের জীবনকাহিনী এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারার সাধক ও প্রচারকরূপে তাঁহার নাম ইতিহাসে চিরস্মরণীয় থাকিবে।

পশ্চিম বঙ্গের হুগলী জেলায় বিঘাতি গ্রামে ভৈরবচন্দ্র দত্ত নামে এক ব্যক্তি বাস করিতেন। তিনি কায়স্থ বংশধর ভরদ্বাজ গোত্রজাত ধর্মপরায়ণ হিন্দু ছিলেন। তাঁহার গৃহদেবতা ছিল রাধাকান্ত ও রাধারাণী। এই দেবতাযুগলের মূর্তিদ্বয় ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত এবং অদ্যাপি পূজিত। ভৈরবচন্দ্রের গৃহে শালগ্রাম এবং বাণলিঙ্গের পূজাও হইত। তিনি শাক্ত উপাসক ছিলেন। তাঁহাদের গৃহে শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রার সহিত দুর্গাপূজা ও জগদ্ধাত্রীপূজা সমারোহে অনুষ্ঠিত হইত। কোন পারিবারিক কারণে তিনি পৈত্রিক বাসভবন পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিয়া বাগবাজার পল্লীতে ২২ সংখ্যক বোসপাড়া গলিতে বৃহৎ গৃহ নির্মাণ করেন। তাঁহার দুই পুত্র ছিল। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র কোন এক ইংরাজ কোম্পানীতে কর্ম করিতেন। কনিষ্ঠ পুত্র দেবনাথ দত্ত বুদ্ধিমান ও সাহসী ছিলেন। দেবনাথ ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রভূত অর্থোপার্জন করেন। নাড়ীবিজ্ঞানে তাঁহার অসাধারণ অভিজ্ঞতা ছিল। রুগ্ন ব্যক্তির নাড়ী দেখিয়া তিনি উহার মৃত্যুকাল বলিয়া দিতে পারিতেন। সেইজন্য বাগবাজার পল্লীতে তাঁহাকে অনেকে 'গঙ্গাদত্ত' বলিয়া ডাকিত। কাশীধামে গণেশ মহল্লায় তাঁহার একটি নিজস্ব বাড়ী ছিল। কাশীর ভক্তিমতী থাকমণি দেবীর সহিত তাঁহার

বিবাহ হয়। ভাগ্যবতী থাকমণি পর পর পাঁচটি সন্তানের জননী হন। তিনি তুলসীভক্ত ছিলেন এবং নিত্য তুলসীপূজা করিতেন। তাঁহার ষষ্ঠ পুত্রের নাম তুলসীদাস বা তুলসীচরণ। তুলসীচরণই রামকৃষ্ণ সংঘে 'স্বামী নির্মলানন্দ' নামে পরিচিত। তুলসীচরণ বাগবাজারস্থ পিতৃগৃহে ১৮৬৩ খ্রীঃ ২৩শে ডিসেম্বর বুধবার শুক্লা চতুর্দশী তিথিতে জন্মগ্রহণ করেন। তুলসী আরাধনার ফলে এই পুত্রলাভ হওয়ায় জননী তাঁহার উক্ত নামকরণ করেন। তুলসীচরণই মাতাপিতার শেষ পুত্র। তাঁহার এক কনিষ্ঠা ভগিনী ছিল। শিশু তুলসীচরণের সুন্দর মুখশ্রী, উজ্জ্বল নয়ন, গম্ভীর কণ্ঠস্বর ও তীক্ষ্ণ মেধা থাকিলেও তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল ছিল না। বহু চিকিৎসায়ও শৈশবে তাঁহার স্বাস্থ্যোন্নতি হয় নাই। তথাপি বালক এত তেজস্বী ছিলেন যে, কেহ তাঁহার কথার প্রতিবাদ করিতে সাহসী হইত না।

রুগ্ন স্বাস্থ্যের জন্য তুলসীচরণকে যথাসময়ে স্কুলে পাঠান হয় নাই। মাতা-পিতা সন্তানগণকে লইয়া বৎসরের কয়েক মাস কাশীধামে নিজ বাটীতে থাকিতেন। কাশীতে অবস্থানকালে জননী থাকমণি ১৮৭৩ খ্রীঃ ৩০শে ডিসেম্বর দেহরক্ষা করেন। তখন তুলসীচরণের বয়স মাত্র দশ বৎসর। পিতা তখন কনিষ্ঠ পুত্রকে স্কুলে পাঠাইতে স্থির করিলেন। এগার বৎসর বয়সে তুলসী কাশী বাঙ্গালীটোলা হাই স্কুলে ভর্তি হইলেন। কাশীবাসী মাতুল তাঁহার অভিভাবক। তীক্ষ্ণবুদ্ধি বালক প্রায় প্রত্যেক বৎসর দুই শ্রেণী উত্তীর্ণ হইতেন। এই স্কুলে তাঁহার সহপাঠী ছিলেন হরিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, যিনি পরে রামকৃষ্ণ সংঘে 'স্বামী বিজ্ঞানানন্দ' নামে পরিচিত হন। গৃহে তুলসীচরণকে সংস্কৃত পড়ান হইত। ভারতের এই প্রাচীন সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে সংস্কৃত শিক্ষার ফলে উক্ত দেবভাষায় তিনি অসামান্য পারদর্শিতা লাভ করেন। ইহার ফলে তিনি পরে বেলুড় প্রভৃতি স্থানের মঠে ও আশ্রমে ব্রহ্মচারিগণকে গীতা, উপনিষৎ ও বেদান্ত দর্শন পড়াইতে পারিতেন। পরবর্তী জীবনে দক্ষিণ ভারতে বেদান্ত প্রচারকালে স্থানীয় পণ্ডিতগণের সহিত সংস্কৃত ভাষায় তিনি অনর্গল কথা বলিতেন। কাশীতে স্কুলে পড়িবার সময় তিনি হিন্দী ভাষাও আয়ত্ত করিয়াছিলেন।

কাশীধামে তখন বিখ্যাত সাধু ত্রৈলিঙ্গ স্বামী থাকিতেন। ঠাকুর বলিতেন, ত্রৈলিঙ্গ স্বামী জীবন্ত শিব। তুলসী উক্ত সাধুকে কয়েকবার দর্শন করিয়াছিলেন। তখন ত্রৈলিঙ্গ স্বামী মৌনী ছিলেন। তুলসী অন্যান্য বালকের সহিত এই মহাপুরুষের কাছে যাইয়া খেলাধূলায় প্রমত্ত হইতেন। একদিন মৌনী সাধু বিরক্ত হইয়া বালকগণকে তাড়াইয়া দেন। আর একদিন তিনি তুলসীকে ডাকিয়া একটু প্রসাদ খাওয়ান। তুলসীর নিকট সেই প্রসাদ সুমিষ্ট লাগিল। সন্ন্যাস জীবনে তুলসী বলিতেন, "দীক্ষা নানা রকমের হয়, উদরের মাধ্যমেও একপ্রকার দীক্ষা হয়।" তুলসী সম্ভবতঃ এই মৌনী মহাত্মার নিকট উদর-মাধ্যমে প্রথম দীক্ষা লাভ করেন। তিনি যখন কাশীতে ছিলেন তখন তাঁহার পিতা ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ২৩শে নভেম্বর শুক্রবার কলিকাতাস্থ বাসভবনে দেহত্যাগ করেন। তখন তুলসীর বয়স চৌদ্দ বৎসর মাত্র। ইহার পর তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য পড়িতে কলিকাতায় আসিলেন। ছাত্রজীবনে তিনি বুঝিলেন, স্বাস্থ্য কত অমূল্য সম্পদ। ঔষধ-চিকিৎসায় আশানুরূপ ফল না হওয়ায় তিনি ব্যায়ামের দ্বারা স্বাস্থ্যোন্নতি করিতে সচেষ্ট হইলেন। ব্যায়াম-বিদ্যা অধ্যয়ন ও অভ্যাসের দ্বারা তিনি অভিজ্ঞ ব্যায়ামবিৎ, ক্রীড়াকুশলী এবং কুস্তিগীর হইলেন। কিছুকাল নিয়মিতভাবে ব্যায়াম অভ্যাসের ফলে তাঁহার স্বাস্থ্যও আশাতীতভাবে উন্নত হইল। তিনি স্বয়ং স্বাস্থ্য লাভ করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন না। কলিকাতার বিভিন্ন স্থানে তিনি সতেরটি অবৈতনিক ব্যায়াম-শিক্ষাগার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করিতে লাগিলেন। ব্যায়ামে মনোযোগী হইলেও তাঁহার বিদ্যানুরাগ হ্রাস পায় নাই। তিনি ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন এবং সাধারণ জ্ঞানের জন্য উড়িষ্যা প্রদেশের অন্তর্গত তালচরের রাজা কর্তৃক প্রদত্ত একটি পদক পাইলেন।

বাগবাজারে তুলসীর গৃহ হরিনাথের গৃহের সম্মুখে অবস্থিত ছিল। হরিনাথ পরে রামকৃষ্ণ সংঘে 'স্বামী তুরীয়ানন্দ' নামে পরিচিত হন। তুলসীর গৃহের একাংশে গঙ্গাধর স্বীয় পিতার সহিত বাস করিতেন। গঙ্গাধর পরে

রামকৃষ্ণ সংঘে 'স্বামী অখণ্ডানন্দ' নামে বিখ্যাত হন। তুলসী, গঙ্গাধর ও হরিনাথের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব ছিল। বন্ধুত্রয় অন্যান্য যুবকের সহিত তুলসীর গৃহে মিলিত হইতেন। ঠাকুরের শিষ্য বৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যাল তুলসীর গৃহের একাংশে বাস করিতেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তুলসী কলেজে ভর্ত্তি হইলেন। পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে দেশে তখন যে জড়বাদ ও নাস্তিকতার প্রবাহ চলিতেছিল তাহা তুলসীকে স্পর্শ করে নাই। বাল্যকাল হইতেই তুলসী আস্তিক ও ধর্মভীরু ছিলেন এবং ঈশ্বরচিন্তা করিতেন। তাঁহার পিতামহ পল্লীগৃহ ছাড়িয়া যে কারণে বাগবাজারে উঠিয়া আসিলেন তাহা অর্থহীন মনে হয় না। বাগবাজারের গলিসমূহ ও রাস্তাগুলি যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের পূত পদধূলিতে তীর্থীকৃত হইয়াছে। তুলসীচরণ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দর্শন কিরূপে লাভ করেন তাহা তিনি নিজে একটি পত্রে বিবৃত করিয়াছেন। পত্রখানি মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমের তৎকালীন অধ্যক্ষকে ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে নভেম্বর ত্রিবান্দ্রম 'প্রবুদ্ধ কেরালম্' কার্যালয় হইতে লিখিত। উক্ত আশ্রমাধ্যক্ষ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ইংরাজী জীবনী প্রকাশের সময় তুলসী মহারাজকে লিখিয়াছিলেন ঠাকুরের সহিত তাঁহার সাক্ষাতের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠাইতে। এই অনুরোধের ফলে তুলসী মহারাজ যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার সারাংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

"একদিন অপরাহ্নশেষে প্রায় সাড়ে পাঁচটার সময় যখন আমাদের পাড়ার কয়েকটি ছেলের সহিত আমি গল্পগুজব করিতেছিলাম তখন হঠাৎ সংবাদ রটিল যে, প্রতিবাসী বলরাম বসুর বাটীতে এক পরমহংস আসিয়াছেন। কিছুক্ষণ পরে আমার মনে হইল, "আমি যাই না কেন? ইনি কি রকম পরমহংস দেখা যাক্।" আমাদের বাড়ী হইতে বলরাম বসুর বাটী মাত্র দুই মিনিটের রাস্তা। আমি গলায় একটি চাদর দিয়া তথায় ছুটিলাম। বলরাম বসুর বাড়ীর দোতলায় উঠিয়া দেখিলাম, বৈঠকখানা ও বারান্দা দর্শকবৃন্দে পরিপূর্ণ। বৈঠকখানায় আর জায়গা ছিল না। উঁকি মারিয়া দেখিলাম, বৈঠকখানার মধ্যে একটি গদির উপরে কার্পেট পাতা ও একটি মোটা বালিশ রাখা আছে। কিন্তু পরমহংস তথায় নাই। আসনটি শূন্য। আমার বয়স তখন আঠার কি উনিশ বৎসর।

আমি তরুণ এবং অপরিচিত বলিয়া কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিলাম না যে, পরমহংস কোথায়। আমি পশ্চিম বারান্দায় যাইয়া দেওয়ালে ঠেস দিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। পাচ সাত মিনিট পরে দেখিলাম, মাতালের মত টলিতে টলিতে একটি লোক গৃহমধ্য হইতে পশ্চিমের বারান্দা দিয়া আসিতেছেন। তাঁহাকে পাঁড় মাতাল বলিয়া মনে হইল। কাহারো দিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিল না। তিনি আত্মভাবে বিভোর ছিলেন। আমি যেখানে দাঁড়াইয়াছিলাম সেখানে আসিয়া তিনি আমার দিকে প্রায় আধ মিনিট তাকাইয়া ধীরে ধীরে টলিতে টলিতে বৈঠকখানায় গেলেন। তিনি আমার সঙ্গে একটি কথাও বলিলেন না। আমি অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম এবং তাঁহাকে প্রণাম করিতেও ভুলিয়া গেলাম। যখন তিনি বৈঠকখানায় ঢুকিলেন তখন আমার হৃদয়ে কি যেন একটা সুড় সুড় করিয়া উঠিবার মত বোধ হইল এবং আমার আপাদ-মস্তক শরীর অসাড় হইয়া গেল। যখন আমার এই অদ্ভুত অনুভবটি কমিল তখন আমি ছুটিয়া নিজ গৃহে গেলাম এবং কিঞ্চিৎ বিশ্রামের পর সুস্থ হইলাম। ইহাই শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ।”

“কিন্তু তখন আমি জানিতাম না যে, তিনি দক্ষিণেশ্বরে থাকিতেন এবং তাঁহার নাম শ্রীরামকৃষ্ণ। এই সাক্ষাতের ফলে আমি অনুসন্ধান করি নাই, তিনি কে এবং কোথায় থাকেন। আমার মনে হয়, শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত গিরীশবাবুর সাক্ষাতের এক বৎসর বা কিঞ্চিৎ অল্প কাল পূর্বে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল।....এই ঘটনার কয়েক দিন পরে মধ্যাহ্নের আহারান্তে আমি হরি মহারাজের বাড়ীতে গিয়াছিলাম! তিনি বাল্যকাল হইতেই আমার পরম বন্ধু এবং তাঁহার গৃহ আমাদের গৃহের সন্নিকটে ছিল। তখন প্রায়ই পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎ হইত। সেদিন তিনি বলিলেন, “দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে পরমহংসদেবকে দেখি চল।” আমি, হরিনাথ ও গঙ্গাধর এবং আরো দুই একটি সঙ্গী রাণী রাসমণির কালীবাড়ীতে বেড়াইতে যাইতাম। সেদিন আমরা বাগবাজার ঘাট হইতে নৌকায় চড়িয়া দক্ষিণেশ্বরে গেলাম। আমি ভাবিয়াছিলাম, ইনি অন্য কোন পরমহংস হইবেন এবং যাঁহাকে আমি বলরাম-

বাবুর বাড়ীতে দেখিয়াছিলাম তিনি ভিন্ন ব্যক্তি। কারণ, ইতিপূর্বে তাঁহাকে আমি কখনো কালীবাড়ীতে দেখি নাই। আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ পরমহংসদেব সেদিন তথায় ছিলেন না, তিনি কলিকাতায় গিয়াছিলেন।"

তাঁহার ঘরের দেওয়ালে যে সব দেবদেবীর ছবি ছিল সেগুলি আমরা দেখিতে লাগিলাম। তাঁহার একটি ফটোও দেওয়ালে ঝুলান ছিল। হঠাৎ আমার দৃষ্টি উহার উপর পড়িল এবং আমি উহা দেখিয়া চমৎকৃত হইলাম। আমার দ্বারা জিজ্ঞাসিত হইয়া হরি মহারাজ বলিলেন, ইহা পরমহংসদেবের ফটো। আমি উত্তর দিলাম, 'আমি এঁকে দেখেছি।' হরি মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কোথায়?' আমি বলিলাম, 'বলরাম বসুর বাটীতে।' তিনি বলিলেন, 'বেশ'।

"উক্ত দিবসের অল্পকাল পরে আমি একাকী পদব্রজে দক্ষিণেশ্বরে গিয়াছিলাম। তখন প্রায় সাড়ে এগারটা বা বারটা হইবে। আমি বাহিরে অপেক্ষা না করিয়া সোজা পরমহংসদেবের ঘরে ঢুকিয়া দেখিলাম, তিনি আহার করিতেছেন। আমি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া তাঁহার সামনে মেজের উপর বসিলাম। ইহাই তাঁহাকে আমার প্রথম প্রণাম। আমি এত অজ্ঞ ছিলাম যে, তিনি যখন খাইতেছেন তখন তাঁহাকে প্রণাম করা বা তাঁহার পাশে বসা অনুচিত—ইহা বুঝি নাই। সে যাহাই হউক, তিনি শিষ্টাচারের এই সকল ব্যতিক্রম লক্ষ্য করিলেন না। আহার সমাপনান্তে তিনি মুখ হাত ধুইয়া খাটে বসিয়া প্রশান্ত বদনে পান-তামাক খাইতে খাইতে আমার সঙ্গে সহাস্যে কথা বলিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার ঘরে অন্য কেহ ছিল না। কেবলমাত্র শ্রীশ্রীমা উত্তর বারান্দায় অপেক্ষা করিতেছিলেন তাঁহাকে খাওয়াইবার এবং তাঁহার অন্যান্য সেবা করিবার জন্য। উত্তর বারান্দা তখন বাঁশের টাটিতে ঘেরা ছিল। কয়েকটি প্রাথমিক প্রশ্নের পরে তিনি আমাকে হঠাৎ অদ্ভুত কিছু বলিলেন যাহাতে আমি বিস্মিত হইলাম। তিনি বলিলেন, "সেদিন তোমার মত একটি ছেলে এসে জিজ্ঞাসা করলে, আমি তার মধ্যস্থ হতে পারি কিনা।" আমি তাঁহার কথা বুঝিতে না পারিয়া আশ্চর্যান্বিত হইয়া ভাবিলাম, কেন তিনি এরূপ

বাজে কথা বলিলেন। আমি নীরব থাকায় তৎক্ষণাৎ তিনি আমার মনোভাব বুঝিয়া বলিলেন, "না না, মধ্যস্থ শব্দের দ্বারা প্রেমস্বরূপ ভগবানের সহিত ভক্তের মিলনকারীকে আমি উদ্দেশ করিয়াছিলাম। তিনিই গুরু, তিনিই সব। ঈশ্বরের সহিত তাঁহার কোন প্রভেদ নাই।" আমি বুঝিলাম, ইহা তাঁহাকে গুরুরূপে গ্রহণ করার ইঙ্গিত মাত্র। কিছুক্ষণ পরে তিনি খাট হইতে নামিয়া কৃপার নিদর্শনস্বরূপ তাঁহার বাম হস্ত আমার কাঁধে রাখিয়া ঘরের বাহিরে আসিলেন এবং আমাকে লইয়া ধীরে ধীরে পঞ্চবটীর দিকে চলিলেন। যাইতে যাইতে আমাকে গভীর স্নেহভরে বলিলেন, "এখানে মাঝে মাঝে এস।" তখন আমার হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইল। পঞ্চবটীতে যাইয়া তিনি যেস্থানে তপস্যা করিয়াছিলেন তথায় প্রণামপূর্বক নিম্ন সিঁড়িতে বসিলেন এবং ভাবাবিষ্ট হইয়া জগন্মাতার সহিত কথা বলিতে লাগিলেন। তাঁহার অর্ধস্ফুট কথা কিছুই আমি বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু মাঝে মাঝে তিনি যে 'মা মা' বলিতেছিলেন তাহা আমার কর্ণগোচর হইল এবং জানিলাম, তিনি জগদম্বার সঙ্গে কথা বলিতেছেন। একটু পরে তিনি পঞ্চবটী হইতে নিজ ঘরে ফিরিলেন। তখন আমি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইলাম।"

"এই ঘটনার পরে আমি মাঝে মাঝে কালীমন্দিরে যাইতাম, কখনো হরি মহারাজের সঙ্গে, কখনো বা একাকী। এতদ্ব্যতীত ঠাকুর যখন বলরাম বসুর বাটীতে যাইতেন তখনো তাঁহাকে দেখিতে যাইতাম। ১৮৮৬ খ্রীঃ জুলাই মাসে একদিন সংবাদ পাইলাম, পূর্বরাত্রে তাঁহার মহাসমাধি হইয়াছে। আমি তখনি কাশীপুর বাগানে যাইয়া তাঁহার স্থূল দেহকে শেষ দর্শন করিলাম এবং তাঁহার পদদ্বয় মাথায় ঠেকাইলাম ও তদন্তে কাশীপুর শ্মশানে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপনান্তে রাত্রি দশটায় বাড়ী ফিরিলাম। ঠাকুরের মহাসমাধির পর তাঁহার অভাব গভীর ভাবে বোধ করিতাম এবং তাঁহাকে অন্তরে প্রার্থনা জানাইতাম। তিনি কৃপাপূর্বক আমার প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া আর একরূপে আমার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তিনি স্বামী বিবেকানন্দ ব্যতীত আর কেহ নহেন। সেই স্বামিজীই আমার জীবনসর্বস্ব, আমার জীবনদেবতা। সন্ন্যাস,

বৈরাগ্য, ত্যাগ, আধ্যাত্মিকতা প্রভৃতি যাহা কিছু পাইয়াছি সেই সব তাঁহারই কৃপায়। আমি ঠাকুর ও স্বামিজীকে অভিন্ন জ্ঞান করি। যখন আমি ঠাকুরের কাছে যাইতাম তখন স্বামিজীর সহিত পরিচিত হই নাই! আমি তাঁহার নাম শুনিয়াছিলাম এবং তাঁহাকে কয়েক বার মাত্র দূর হইতে দেখিয়াছিলাম। এই প্রেমমূর্তি করুণাময় মহাপুরুষের কৃপালাভের সৌভাগ্য আমার কিরূপে হইয়াছিল তাহা এক সুদীর্ঘ কাহিনী। যদি সুযোগ পাই অন্য সময়ে তাহা বিবৃত করিব। ....বরাহনগর মঠ স্থাপিত হইবার দুই তিন মাস পরে তিনি আমাকে গৃহ হইতে টানিয়া আনিয়া উক্ত মঠে স্থান দিলেন।"

উক্ত পত্রে স্বামী নির্মলানন্দ এই সকল কথা ঠাকুরের নূতন জীবনীর অন্তর্ভুক্ত করিতে নিষেধ করিয়া সামান্য ভাবে উল্লেখ করিতে বলিয়াছেন। এই পত্রের সারাংশ মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রম হইতে ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী' নামক ইংরাজি পুস্তকের চতুর্থ সংস্করণের ৪৮৩-৪৮৪ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত। ১৯২৮ খ্রীঃ ২৫শে ফেব্রুয়ারী কাশী রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে অবস্থানকালে স্বামী নির্মলানন্দ সমবেত সাধুগণকে ঠাকুর ও স্বামিজীর সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল। স্বামী অতুলানন্দ, স্বামী জগদানন্দ, স্বামী বিশ্বরূপানন্দ প্রভৃতি সন্ন্যাসিগণ তাঁহাকে প্রণামপূর্বক উপবেশন করেন। ঠাকুরের সহিত তাঁহার কি কথা হইয়াছিল এবিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইয়া তিনি তখন বলিয়াছিলেন, "সে সকল ব্যক্তিগত ব্যাপার। 'মানুষ গুরু মন্ত্র দেন কানে, জগৎগুরু মন্ত্র দেন প্রাণে'। অনেক কথার মধ্যে একটিও তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন। কিন্তু সে সকল নিগূঢ় রহস্য জানবার কি অধিকার আছে জগতের? আর সে সকল জেনে তোমাদের লাভই বা কি? তোমরা সে সব জানতে চাও কেন?" এই বলিয়া ভাবাবেগে তুলসী মহারাজ আলোচ্য বিষয়ে নীরব রহিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের প্রসঙ্গে সেদিন তিনি বলিয়াছিলেন, "তোমরা কি মনে কর, আমরা তাঁহার গুরুভাই? যদি স্বামিজী ইচ্ছা করতেন, তিনি আমার মত শত শত সাধু সৃষ্টি করিতে পারতেন। ঠাকুর ও স্বামিজী সাক্ষাৎ শিব, জীবন্ত দেবতা। আর আমরা জীব। স্বামিজী আমাকে

বলেছিলেন, "দেখ ঠাকুরের মধ্যে যে ভূতটা ছিল সেটা আমার মধ্যে ঢুকেছে।" আমরা সকলে ঠাকুর-স্বামিজীর শক্তিতে শক্তিমান্।"

১৯৩১ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী মাসে 'নিখিল বঙ্গ রামকৃষ্ণ মহোৎসব' উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় পৌরোহিত্য করিবার সময় স্বামী নির্মলানন্দ বলিয়াছিলেন, "অনেক সময় ঠাকুর কৃপাপ্রার্থীর সম্মুখে নীরব থাকিয়া কৃপা-কটাক্ষ দ্বারা শক্তি সঞ্চারিত করিতেন। তাঁহার এই দিব্য স্পর্শ অনুভব করিবার সৌভাগ্য আমারো হইয়াছিল।" ঠাকুরের নিকট কয়েকবার যাইবার পর ঠাকুর তাঁহাকে দীক্ষা ও উপদেশ দিয়াছিলেন—ইহা তিনি স্বমুখে বহুবার ব্যক্ত করিয়াছেন। এইরূপে ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে তুলসীচরণ যখন আঠার বৎসরের তরুণ, তখন হইতে ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ঠাকুরের মহাসমাধিকাল পর্য্যন্ত প্রায় পাচ বৎসর তিনি তাঁহার দিব্য সঙ্গ লাভ করিয়াছিলেন। স্বামী অভেদানন্দ "শ্রীরামকৃষ্ণ স্মৃতি" নামক ইংরাজি পুস্তকে লিখিয়াছিলেন, "সারদা, হরি, গঙ্গাধর, তুলসী প্রভৃতি যুবকগণ বরাহনগর মঠে সন্ন্যাস গ্রহণপূর্বক যথাক্রমে ত্রিগুণাতীত, তুরীয়ানন্দ, অখণ্ডানন্দ, নির্মলানন্দ প্রভৃতি নামে অভিহিত হন। ভগবান রামকৃষ্ণ তাঁহাদের সকলের প্রতি সমান কৃপা প্রদর্শন করেন এবং তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতে সদা প্রস্তুত ছিলেন।"

ঠাকুরের দেহত্যাগের পর নরেন্দ্রনাথ প্রমুখ তাঁহার সন্ন্যাসী শিষ্যগণ তুলসী চরণের বাড়ীতে মিলিত হইয়া ভজনাদি করিতেন। ভজনের সময় নরেন্দ্রনাথ গান গাহিতেন এবং তুলসীচরণ পাখোয়াজ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র বাজাইতেন। বেলা বেশী হইলে নরেন্দ্রাদি ভক্তগণ তুলসীর বাড়ীতে আহারাদি করিতেন। স্বামী সারদানন্দ বলেন, "ঠাকুরের মহাসমাধির পর একদিন তুলসীর বাড়ীতে স্বামীজি গায়ত্রী-আবাহনের এই শ্লোকটী সুর করিয়া গাহিতেছিলেন, ধ্যানদৃষ্ট প্রাচীন ঋষির সুরে—

"আয়াহি বরদে দেবি ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনি।
গায়ত্রী ছন্দসাং মাতঃ ব্রহ্মযোনি নমোঽস্তুতে॥"

তিনি (স্বামিজী) সেদিন ইহাতে এত তন্ময় হইয়া গিয়াছিলেন যে, পূর্বাহ্ণ

দশটা হইতে অপরাহ্ণ চারিটা পর্য্যন্ত এই শ্লোকটী বার বার গাহিলেন। চারটার পরে তিনি স্নানাদি সারিয়া আহার করিলেন। বেলুড় মঠেও তিনি বহু বার উক্ত আবাহন-মন্ত্র বাহ্য সংজ্ঞা হারাইয়া গাহিয়াছেন। কিন্তু সেদিন তুলসী মহারাজের বাড়ীতে তিনি যত বিভোর হইয়াছিলেন ততটা বিভোর হইতে আর কখনো তাঁহাকে দেখি নাই।" *

আর একদিন গুরুভ্রাতাগণ তুলসীর গৃহে অনেকক্ষণ ধরিয়া ধর্মপ্রসঙ্গ করিলেন। তৎপরে নরেন্দ্র ভজন গাহিতে এবং তুলসী পাখোয়াজ বাজাইতে লাগিলেন। ভজনে সকলে এত মাতোয়ারা হইলেন যে, কিছুক্ষণ পরে তাঁহারা একটী দারুময় মঞ্চের উপর নাচিতে লাগিলেন এবং প্রেমানন্দে আত্মহারা হইলেন। অন্তঃপুরবাসীরা সুমধুর গীতবাদ্যে আকৃষ্ট হইলেন এবং সেই দিব্য দৃশ্য দেখিতে আসিলেন। পার্শ্ববর্তী কোন কক্ষের ছাদে একটী ছোট প্রাচীর ও জলের চৌবাচ্চা ছিল। তুলসীর কোন শ্যালিকা উক্ত প্রাচীরে উঠিয়া জানালার মধ্য দিয়া উঁকি মারিয়া নৃত্যাদি দেখিতেছিলেন। দৈবাৎ কাষ্ঠ মঞ্চটীর একটী পা ভাঙ্গিয়া গেল এবং তজ্জন্য সহসা নৃত্য বন্ধ হইল। তুলসী তৎক্ষণাৎ জলখাবার চাহিলেন। উক্ত মহিলা তাড়াতাড়ি প্রাচীর হইতে লাফ দিয়া পড়িলেন। কিন্তু ছাদের উপর একটী ভাঙ্গা কাঁচের বোতল পড়িয়াছিল। উহাতে তাঁহার পা লাগিয়া গভীর ভাবে কাটিয়া গেল এবং প্রচুর রক্ত পড়িতে লাগিল। আহত অবস্থায় তিনি অস্থির না হইয়া, বা কোন চীৎকার না করিয়া দ্রুত পদে রান্নাঘরে ছুটিলেন। অন্যান্য মহিলারা তাঁহার পা হইতে প্রচুর রক্ত পড়িতে দেখিয়া ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। গুরুভ্রাতৃগণ সহ নরেন্দ্র শীঘ্র অন্তঃপুরে যাইয়া 'কাটা' পা দেখিলেন এবং চিকিৎসার্থ ডাক্তার ডাকিয়া আনিলেন। ঔষধ প্রয়োগপূর্বক কাটা জায়গাটি বাঁধিয়া দেওয়া হইলে তাঁহারা জলযোগান্তে বিদায় লইলেন।

কয়েক দিন পূর্বে ঠাকুরের পূত ভস্মাস্থি বরাহনগর মঠে আনীত হয়। বুড়ো

* ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য প্রণীত 'শ্রীশ্রীসারদানন্দ প্রসঙ্গ' পুস্তকে ১৪১ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত।

গোপাল ঠাকুরের শয্যাদি কাশীপুর বাগানবাটী হইতে সদ্যঃস্থাপিত বরাহনগর মঠে আনিয়া রাখিলেন। শরৎ রাত্রিকালে আসিয়া তাঁহার সঙ্গে যোগ দিলেন। বুড়ো গোপাল স্থায়ী মঠবাসী ছিলেন। নরেন, শশী, শরৎ, বাবুরাম ও নিরঞ্জন প্রায় নিত্যই উক্ত মঠে আসিতেন। তুলসীর মামা নিত্যগোপাল ঠাকুরের পরম ভক্ত হইলেও একটী স্বতন্ত্র দল গড়িয়াছিলেন। তিনি স্বীয় ভাগিনেয় তুলসীকে তাঁহার দলভুক্ত করিতে চাহিলেন। কিন্তু নরেন্দ্রের প্রভাব বলবান হইল। একদিন তুলসী স্বগৃহ, আত্মীয় স্বজন ও কলেজাদি ছাড়িয়া বরাহনগর মঠে যোগ দিলেন। তাঁহার সংসার-ত্যাগে আত্মীয়-স্বজনগণ অশেষ দুঃখে অশ্রুপাত করিলেন। পুরুষ ও নারী পরিজনবর্গ মঠে যাইয়া তাঁহাকে বাড়ী ফিরাইয়া আনিবার জন্য খুব চেষ্টা করিলেন। তাঁহারা তাঁহার সম্মুখে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন এবং সেই 'ভুতুড়ে বাড়ী' ছাড়িয়া স্বগৃহে ফিরিবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ করিলেন। কিন্তু ইহাতে কোন ফলোদয় হইল না। বার বার উক্ত চেষ্টায় আত্মীয়-স্বজনগণ বিফল-মনোরথ হইলেন।

অবশেষে তাঁহারা তাঁহাকে সপ্তাহে একবার বাড়ী যাইবার জন্য নির্বন্ধাতিশয় করিলেন। কিন্তু তাহাতেও তুলসী স্বীকৃত হইলেন না। তুলসীর প্রতি তাঁহাদের এত প্রাণের টান ছিল যে, তাঁহাকে দেখিবার জন্য মহিলাগণ স্বগৃহ হইতে মঠ পর্যন্ত তিন মাইল হাঁটিয়া মধ্যে মধ্যে যাইতেন এবং তাঁহার জন্য বিবিধ খাবার সঙ্গে লইতেন। প্রায় দুই বৎসর পরে তুলসী একবার স্বগৃহে গিয়াছিলেন। কিন্তু তখন তিনি গেরুয়া-পরিহিত, দীর্ঘকেশী ও শ্মশ্রুধারী সন্ন্যাসী। তিনি পরিজনবর্গের সহিত প্রীতিভরে আলাপ করিলেন এবং তাঁহাদিগকে ধর্মজীবন যাপন করিতে উপদেশ দিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে জানাইলেন যে, তিনি শীঘ্র সুদীর্ঘ তীর্থভ্রমণে বহির্গত হইবেন এবং তাঁহাদিগের নিকট হইতে সেইজন্য দুইটী কম্বল চাহিয়া লইলেন। তাঁহারা যে অর্থ-বস্ত্রাদি দিতে চাহিলেন তাহা তিনি লইলেন না। ১৮৮৬ খ্রীঃ ডিসেম্বর মাসের শেষার্ধে বরাহনগর মঠের অধিবাসীবৃন্দ বাবুরামের মাতার নিমন্ত্রণে আঁটপুরে গিয়াছিলেন। তথায় বড়দিনের পূর্বদিবস নরেন্দ্র গুরুভ্রাতৃবৃন্দকে একত্রিত করিয়া প্রজ্জ্বলিত হোমাগ্নির

সম্মুখে সন্ন্যাস গ্রহণের শুভ সংকল্প সুদৃঢ় করেন। বরাহনগর মঠে ফিরিবার পথে তাঁহারা তারকেশ্বরে শিবদর্শন করিয়া আসেন।

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে'র দ্বিতীয় ভাগে শ্রীম লিখিয়াছেন যে, ঠাকুর তাঁহার শিষ্যদের কাহাকেও আনুষ্ঠানিক সন্ন্যাস দেন নাই। তিনি স্বশিষ্যগণকে গেরুয়া দিয়াছিলেন মাত্র, কিন্তু আনুষ্ঠানিক সন্ন্যাস দানের ভার দলপতি নরেন্দ্রের হাতে দিয়া যান। শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যগণের মধ্যে কে কবে বা কোথায় সন্ন্যাস লইয়াছিলেন তাহা নির্দেশ করা এখন অসম্ভব। শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী তাঁহার 'স্বামী শিষ্য-সংবাদ' পুস্তকের প্রথম ভাগে লিখিয়াছেন, "আমরা শুনেছি, ঠাকুরের মহাসমাধির পর স্বামীজি সন্ন্যাসগ্রহণের নিয়মাদি সম্বন্ধে শ্রুতিবাক্যগুলি সংগ্রহপূর্বক ঠাকুরের ছবির সম্মুখে বৈদিক বিধানে গুরুভ্রাতাদের সহিত সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।" 'কালী তপস্বী' নামক গ্রন্থে আছে, "ক্রমশঃ নরেন্দ্র বরাহনগর মঠে রাখাল, বাবুরাম, নিরঞ্জন, শরৎ, শশী, হরি, সারদা, তুলসী প্রভৃতি গুরুভ্রাতাগণকে ডাকিয়া আনেন। একদিন তিনি বৈদিকমতে গুরুভাইদের সহিত সন্ন্যাস লইতে চাহিলেন। শাস্ত্রবিধি অনুসারে কালী বিরজা হোমের সকল ব্যবস্থা করিলেন এবং ঠাকুরের পাদুকাদ্বয় সম্মুখে রাখিয়া সকলে হোম করিয়া সন্ন্যাস লইলেন। নরেন 'বিবিদিষানন্দ' নাম লইলেন এবং অন্যান্য গুরুভ্রাতাগণকে প্রত্যেকের বিশেষ গুণ অনুসারে সন্ন্যাস নাম দিলেন। যোগীন ও লাটু বৃন্দাবন হইতে আসিয়া পূর্ববৎ বিরজা হোম করিয়া সন্ন্যাস লইলেন এবং কয়েকদিন পরে উক্ত প্রকারে হরি ও তুলসী সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন।' ঠাকুরের সাক্ষাৎ শিষ্য বৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যাল তাঁহার পুস্তকে বলেন, "নরেন্দ্র স্বয়ং সন্ন্যাস লইয়া রাখাল, শশী, কালী, লাটু, হরি, ও তুলসী প্রভৃতিকে ঠাকুরের ছবির সম্মুখে সন্ন্যাস দেন।"

স্বামী নির্মলানন্দ কাশীধামে কথাপ্রসঙ্গে একবার বলিয়াছিলেন, "স্বামীজি মহানির্বাণতন্ত্র থেকে সন্ন্যাসের মন্ত্রগুলি সংগ্রহ করে আমাদের সকলকে সন্ন্যাস দেন। শরৎ, শশী, কালী, লাটু, বুড়ো গোপাল, রাখাল, বাবুরাম প্রভৃতি আমরা সকলেই স্বামীজির কাছ থেকেই সন্ন্যাস নিয়েছিলাম। পরে মহাপুরুষজী,

বিজ্ঞানানন্দজী, নিরঞ্জনানন্দজী ও ত্রিগুণাতীতজী নিজেরাই সন্ন্যাস নেন। স্বামীজি আমাদের সকলকে সন্ন্যাস-নাম দেন।”

১৯১১ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী মাসে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ মাদ্রাজ মঠের অধ্যক্ষরূপে হরিপাদ সমিতির সম্পাদককে স্বামী নির্মলানন্দ সম্বন্ধে এই পরিচয় পত্র দিয়াছিলেন।—“স্বামী নির্মলানন্দজী শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ শিষ্য; কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। অসাধারণ চারিত্রিক নির্মলতার জন্য স্বামিজী তাঁহার নাম রাখেন ‘নির্মলানন্দ’।” ১৯০৬ খ্রীঃ ১৩ই মে শালকিয়া রামকৃষ্ণ অনাথবন্ধু সমিতি আমেরিকা হইতে প্রত্যাগত স্বামী নির্মলানন্দকে সাদর অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। উক্ত অভিনন্দন-পত্রের উত্তরে স্বামী নির্মলানন্দ বলেন, “আমি নিউইয়র্কে আড়াই বৎসর অবস্থান কালে কেবলমাত্র মদীয় গুরুদেব স্বর্গগত বিশ্ববরেণ্য স্বামী বিবেকানন্দের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছি।” * সুতরাং দেখা যাইতেছে, স্বামী নির্মলানন্দ ঠাকুরের শিষ্য, কি স্বামীজির শিষ্য, সে বিষয়ে মত-ভেদ আছে। এক দলের মতে তিনি ঠাকুরের সাক্ষাৎ শিষ্য। তাঁহার জীবনে যে অসামান্য অলৌকিকত্ব প্রকটিত তাহা চিন্তা করিলে তাঁহাকে ঠাকুরের শিষ্য বলিয়াই মনে হয়। অন্য দলের মতে তিনি স্বামিজীরই শিষ্য। স্বামী নির্মলানন্দ নিজ মুখে বহুবার বলিয়াছিলেন যে, তিনি স্বামিজীরই শিষ্য। উপরোক্ত উদ্ধৃতির দ্বারা তাহা নিঃসন্দেহে সমর্থিত হয়। কিন্তু তিনি ঠাকুরের পূত সঙ্গলাভে ধন্য হইয়াছিলেন ইহাও অবিসংবাদিত সত্য। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যের একাধিক প্রামাণ্য গ্রন্থে ইহা স্পষ্টভাবে উল্লিখিত। তবে তিনি ঠাকুরের শিষ্য, কি স্বামিজীর শিষ্য, তাহার নির্ধারণ আমাদের উদ্দেশ্য নহে। বিশ্বব্যাপী রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলনের জন্য তিনি কিভাবে প্রাণপাত করিয়াছেন তাহাই আমরা এখানে বর্ণনা করিতে চাই। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারার অন্যতম অগ্রগণ্য ধারক ও বাহক রূপে তাঁহাকে চিত্রিত করাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য। স্বামী নির্মলানন্দের

---

* ১৯০৬ খ্রীঃ জুলাই মাসে ‘প্রবুদ্ধ ভারত’ পত্রিকায় প্রকাশিত বক্তৃতা হইতে উদ্ধৃত।

জীবন-বৃত্তান্ত রামকৃষ্ণ সংঘের সুদীর্ঘ ইতিবৃত্তের এক অপরিহার্য্য ও অবিচ্ছেদ্য অধ্যায়।

স্বামিজীর মধ্যম সহোদর শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত "স্বামী শিবানন্দের অনুধ্যান" শীর্ষক গ্রন্থে স্বামী নির্মলানন্দ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "তরুণ তুলসী শীর্ণ হইলেও খুব কঠোর, মিষ্টভাষী ও প্রফুল্ল ছিলেন। বরাহনগর মঠের অক্লান্ত কর্মীরূপে তিনি স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের দক্ষিণ হস্তরূপে কাজ করিতেন। বাসনকোসন মাজা, পুকুর হইতে জল আনা বা মঠের যে কোন কাজে স্বামী নির্মলানন্দ সর্বাগ্রে অগ্রসর হইতেন। দীর্ঘকাল ধরিয়া তিনি বরাহনগর মঠে রাত্রে রুটী তৈয়ারী করিতেন। রুটী তৈয়ারী করা মঠে একটী আনন্দজনক ব্যাপার ছিল। দুই তিনজন গুরুভাই মিলিয়া জাঁতায় গমচূর্ণ করিতেন এবং আটায় জল দিয়া রাখিতেন। তুলসী একটি কেরোসিন তেলের টিনের উপর বসিয়া গরম গরম রুটী তৈয়ারী করিয়া গুরুভাইদিগকে দিতেন। বরাহনগর মঠের ন্যায় আলমবাজার মঠেও স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী এবং স্বামী নির্মলানন্দজী কঠোর কর্মী ছিলেন। মঠের সব কাজ তাঁহাদের তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হইত।

যদিও স্বামী নির্মলানন্দের জীবনের এই সকল বৎসর একদিক দিয়া অতিশয় কঠোর ও কষ্টকর ছিল অন্য দিক দিয়া পরম সুখকর ও সেবাময় ছিল। এই সময়কে তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ কাল বলা চলে। কাজকর্ম্মের অবসরে তিনি জপধ্যান এবং শাস্ত্রাধ্যয়ন করিতেন। আবশ্যক হইলে তিনি সমগ্র মঠবাড়িটি ঝাঁট দিয়া পরিষ্কার করিতেন এবং বাজারে যাইয়া শাকসব্জী প্রভৃতি কিনিয়া একটি ঝুড়িতে করিয়া স্বহস্তে মঠে আনিতেন। অবশ্য অন্যান্য গুরুভ্রাতাগণ তাঁহাকে এই সকল কার্য্যে যথেষ্ট সাহায্য করিতেন। মঠবাড়ির পশ্চাতে একটি পুকুর ছিল। স্বামী নির্মলানন্দ এক কলসী জল কাঁধে করিয়া এবং আর এক কলসী জল হাতে ঝুলাইয়া ঘাটের সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতেন এবং পায়খানায় যাইয়া উহা পরিষ্কার করিতেন। বড় বড় জালাগুলিও তিনি জলপূর্ণ করিয়া রাখিতেন। দীর্ঘকাল প্রত্যহ জলের কলসী কাঁধে বহন করার ফলে তাঁহার বাম কাঁধে দাগ পড়িয়া গিয়াছিল। এতদ্ব্যতীত

তাঁহাকে রান্নাঘরের কাজও করিতে হইত। মঠে কেহ রুগ্ন হইলে রোগীসেবার ভার তাঁহার উপর পড়িত। তিনি সারাদিন কাজ করিয়াও আদৌ বিরক্তি বা ক্লান্তি বোধ করিতেন না। তিনি সর্ব্বদা প্রফুল্ল ও সহাস্য বদনে থাকিতেন। বস্তুতঃ স্বামী নির্মলানন্দ বরাহনগর ও আলমবাজার মঠ পরিচালনা ও তত্ত্বাবধানের জন্য বুকের রক্তপাত করিয়াছিলেন।"

মহেন্দ্রনাথ দত্ত কর্তৃক প্রদত্ত চিত্রে আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাই, স্বামী নির্মলানন্দ বরাহনগর ও আলমবাজার মঠে কি ভাবে জীবন যাপন করিতেন। তিনি তৎপ্রণীত 'স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের ঘটনাবলী' পুস্তকের প্রথম ভাগে নিম্নোক্ত ঘটনাটি বিবৃত করিয়াছেন। ১৮৯৭ সালের গ্রীষ্মকালের এক মধ্যাহ্নে মঠবাসিগণ লোচন ঘোষের ঘাটে গঙ্গাস্নানে গিয়াছেন। ভগবৎপ্রসঙ্গে সকলে এত প্রমত্ত হইলেন যে, মঠে ফিরিয়া আসিতে অনেক দেরী হইল। রাস্তা বালুকাময় এবং অত্যন্ত উত্তপ্ত। সকলেই নগ্ন পদে ছিলেন এবং উত্তাপও অসহ্য ছিল। সকলে অনুভব করিলেন, যেন তাঁহাদের পা পুড়িয়া যাইতেছে। বাজারের পূর্ব্ব প্রান্তে আসিতেই মহেন্দ্রনাথ দত্তের পা ফুলিয়া উঠিল এবং পায়ের তলায় ফোস্কা পড়িল। স্বামী নির্মলানন্দজীও নগ্ন পদে ছিলেন। তিনি মহেন্দ্রনাথকে কাঁধে করিয়া মঠ পর্যন্ত লইয়া আসিলেন, নিজের সর্ব্বপ্রকার কষ্ট অগ্রাহ্য করিয়া। তাঁহার জীবনে এইরূপ ঘটনা অনেক পাওয়া যায়। স্বামী নির্মলানন্দ সংস্কৃত ব্যাকরণে সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি বাংলায় ও হিন্দিতে যেমন অনর্গল কথা বলিতেন তেমনি সংস্কৃতেও বলিতে পারিতেন। তিনি নবাগত ব্রহ্মচারীদিগকে মঠে বেদান্ত পড়াইতেন। রান্নাদি কার্য্যেও তিনি বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ তুলসী মহারাজ সম্বন্ধে সমুচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন। তিনি একদা বরাহনগর মঠবাসীদের নিকট স্বামী নির্মলানন্দকে আদর্শ সন্ন্যাসীরূপে নির্দেশপূর্বক বলিয়াছিলেন, "তুলসীকে দেখ। মঠের প্রত্যেক সাধুর তার মতই কর্মঠ হওয়া উচিত। তার সতেজ মস্তিষ্ক ও সবল দেহ আছে। দিবারাত্রি সে অক্লান্ত পরিশ্রম করে, আবার যথাসময়ে দীর্ঘকাল

ধ্যানমগ্ন থাকে। সে গান গাইতে পারে এবং পাখোয়াজ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রও বাজাতে জানে। শাস্ত্রব্যাখ্যা, ধর্ম্মালোচনা, বক্তৃতাদান, এবং রান্নার কাজেও সে সুনিপুণ। তার মত তোমাদের প্রত্যেককে সব কাজে সুদক্ষ হতে হবে।"

বরাহনগর মঠে প্রায় দুই বৎসর বাসের পর স্বামী নির্মলানন্দ সুদীর্ঘ তীর্থ-যাত্রায় বাহির হইলেন ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষে। প্রথমে তিনি স্বামী অভেদানন্দ প্রভৃতির সহিত শ্রীসারদাদেবীর পূত সঙ্গে জয়রামবাটীতে ও কামারপুকুরে গমন করেন। তথায় শ্রীশ্রীমার শুভাশীষ লইয়া তিনি কেবলমাত্র অভেদানন্দজীর সমভিব্যাহারে হরিদ্বারের অভিমুখে রিক্ত হস্তে যাত্রা করিলেন। গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডে আসিয়া পরিব্রাজকদ্বয় সেই রাস্তা ধরিয়া পদব্রজে চলিতে লাগিলেন। তাঁহারা পাদুকা বা জামা ব্যবহার করিতেন না, কাঞ্চন স্পর্শ করিতেন না, বৃক্ষতলে শয়ন করিতেন এবং মাধুকরী ভিক্ষা দ্বারা উদর পূর্তি করিতেন। কোন কোন দিন তাঁহারা ত্রিশ মাইল পর্য্যন্ত হাঁটিতেন। এইরূপে তাঁহারা গাজিপুরে উপস্থিত হইলেন। তথায় পওহাবী বাবা থাকিতেন। পরিব্রাজকদ্বয় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপ করিলেন। তখন তথায় ঠাকুরের শিষ্য হরিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। হরিপ্রসন্নই পরে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ নামে প্রসিদ্ধ হন। তিনি সমাগত সাধুদ্বয়কে স্বীয় গাড়ীতে করিয়া নিজের বাসায় লইয়া গেলেন এবং পরম সমাদরে রাখিলেন। তথা হইতে তাঁহারা পদব্রজে কাশী ও অযোধ্যা দেখিয়া লক্ষ্ণৌতে উপস্থিত হইলেন।

লক্ষ্ণৌতে কোন হিন্দুস্থানী ভক্ত তাঁহাদিগকে রেলভাড়া দিতে চাহিলেন। কিন্তু কাঞ্চনত্যাগী সন্ন্যাসীদ্বয় অর্থগ্রহণ করিলেন না। ভক্তটী তখন তাঁহা-দিগকে হরিদ্বার পর্য্যন্ত দুই খানি টিকিট কিনিয়া দিলেন এবং ট্রেনে খাইবার জন্য কিছু আহার্য্যও সঙ্গে দিলেন। হরিদ্বার হইতে তাঁহারা হৃষিকেশে হাঁটিয়া গেলেন। হৃষিকেশে তাঁহারা কিছু কাল তপস্যা করেন। গঙ্গাতীরে তপস্যা-কালে তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হয় এই আধ্যাত্মিক প্রেরণাপ্রদ মর্ম্মস্পর্শী ঘটনাটী। গঙ্গার অন্য পার্শ্বে জলের ধারে প্রস্তরখণ্ডের উপর বসিয়া কোন ব্রহ্মজ্ঞ মহাত্মা তন্ময়

হইয়া এই মহাবাক্য উচ্চারণ করিতেছিলেন, 'শিবোঽহম্', 'শিবোঽহম্'। উক্ত গঙ্গাতীর শ্বাপদসঙ্কুল সুগহন অরণ্যে সমাবৃত। অরণ্য হইতে একটী বৃহৎ ব্যাঘ্র আহারান্বেষণে আসিয়া ব্রহ্মচিন্তামগ্ন সাধুটীকে মুখে করিয়া লইয়া ছুটিল। তিনি একেবারে বাহ্যজ্ঞানশূন্য ছিলেন। তাই তিনি বুঝিতে পারেন নাই যে, তিনি ব্যাঘ্রের মুখগহ্বরে পড়িয়াছেন। পূর্ববৎ তাঁহার মুখে সেই মহাবাক্য উদাত্ত স্বরে ঝঙ্কৃত হইতেছিল। যতক্ষণ ব্যাঘ্রটী দেখা যাইতেছিল ততক্ষণ উহার মুখগহ্বরস্থ মহাত্মা কর্তৃক উচ্চারিত 'শিবোঽহম্' ধ্বনি গঙ্গার অপর তীরে উপবিষ্ট স্বামী নির্মলানন্দ ও স্বামী অভেদানন্দের কর্ণগোচর হইল। পরে তাঁহারা স্বামী বিবেকানন্দকে এই ঘটনাটী সবিস্তারে বলেন এবং স্বামিজী আমেরিকায় কোন বক্তৃতায় উক্ত ঘটনার উল্লেখ করেন।

হৃষিকেশ হইতে গুরুভ্রাতৃদ্বয় লক্ষ্মণঝুলার দড়ির পুল নির্ভয়ে পার হইয়া দেবপ্রয়াগ, ও উত্তর কাশী প্রভৃতি পার্বত্য তীর্থদর্শন করেন। অবশেষে তাঁহারা বদ্রীনাথে উপনীত হন। তথায় উভয়ে কিছুকাল তপস্যা করেন। বদ্রীনাথ হইতে কেদারনাথ দেখিয়া তাঁহারা গঙ্গোত্রী দর্শনের সংকল্প করিলেন। দীর্ঘ পথ, হিংস্র জন্তু, দুর্লঙ্ঘ্য তুষার ও রিক্তহস্ততায় তাঁহারা আদৌ পশ্চাৎপদ হইলেন না। কেদারনাথ পর্য্যন্ত অত্যুচ্চ হিমাবৃত পার্বত্য পথে তাঁহারা নগ্ন পদে চলিলেন। কেদারনাথে একটি পর্বত-গুহায় উভয়ে কিছুদিন কঠোর তপস্যা করেন। তথা হইয়া গোমুখী যাইয়া গঙ্গার উৎপত্তিস্থান দেখিলেন। গঙ্গোত্রী হইতে উত্তর কাশীর গহন অরণ্যের মধ্য দিয়া তাঁহারা যমুনোত্রীতে গেলেন। যমুনোত্রী হইতে দেরাদুন হইয়া তাঁহারা হৃষীকেশে ফিরিলেন। তথায় স্বামী অভেদানন্দ অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। স্বামী নির্মলানন্দ অসুস্থ সঙ্গীকে গরুর গাড়ীতে হরিদ্বারে লইয়া গেলেন এবং তথায় তাঁহাকে টিকিট কিনিয়া ট্রেনে তুলিয়া দিলেন। হরিদ্বার হইতে তিনি পুনরায় হৃষীকেশে আসিলেন। এই সুদীর্ঘ তীর্থভ্রমণে নিত্যগোপাল কিছুকাল তাঁহাদের সহযাত্রী ছিলেন। তিনিও তৎপূর্বে সন্ন্যাস গ্রহণান্তে জ্ঞানানন্দ অবধূত নামে পরিচিত হইয়াছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁহার গুরুভ্রাতাদের সহিত স্বামী নির্মলানন্দ হৃষীকেশে মিলিত হন। তাঁহারা স্বহস্তে কয়েকটী কুঠিয়া বাঁধিয়া এবং মাধুকরী ভিক্ষায় উদরপূর্তি করিয়া তপস্যারত হইলেন। হৃষীকেশে স্বামী বিবেকানন্দ কঠিন রোগে আক্রান্ত হন। তাঁহারা নূতন কুঠিয়া নির্মাণের জন্য জঙ্গলে বাঁশ কাটিতে গিয়াছিলেন। জঙ্গল হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, স্বামীজী অধিক জ্বরে শয্যাগত। ক্রমে স্বামিজীর অবস্থা অতিশয় সংকটজনক হইল। তিনি সংজ্ঞাশূন্য হইয়া শয্যায় পড়িয়া রহিলেন। গুরুভ্রাতৃগণ দুশ্চিন্তায় অভিভূত। এমন সময় কুঠিয়ার বাহিরে একটী অপরিচিত সাধুকে দেখা গেল। সেই সাধুটী স্বীয় থলি হইতে মধু ও ঔষধচূর্ণ বাহির করিয়া রুগ্ন স্বামীজীর মুখে দিলেন। সেই ঔষধ সেবনের ফলে একটু পরে স্বামীজী চক্ষু মেলিলেন ও কথা কহিতে চেষ্টা করিলেন। স্বামী নির্মলানন্দ স্বামিজীর মুখের কাছে স্বীয় কর্ণ ধরিতেই অস্পষ্ট ক্ষীণ স্বরে শুনিতে পাইলেন, "তোমরা ভয় পেও না, আমি এখন মরবো না।" ক্রমশঃ স্বামিজী সুস্থ হইলেন ও হরিদ্বারে চলিয়া গেলেন। কিন্তু স্বামী নির্মলানন্দ হৃষীকেশেই রহিলেন এবং তপশ্চর্য্যা করিতে লাগিলেন।

কিছুকাল পরে স্বামী নির্মলানন্দ বাংলায় ফিরিয়া আসেন এবং শ্রীমার সঙ্গে শোণ নদীর তীরে কৈলোয়ার নামক স্থানে যান। শ্রীমার সঙ্গে স্বামী যোগানন্দ ও স্বামী সারদানন্দ ছিলেন। কৈলোয়ার হইতে সাধুত্রয় বরাহনগর মঠে ফিরিয়া আসেন। যখন বৈরাগ্যের ভাব প্রবল হইত তখনই স্বামী নির্মলানন্দ তপস্যায় ও তীর্থভ্রমণে বহির্গত হইতেন। আবার তাঁহারা শ্রীশ্রীঠাকুরের পুণ্যস্মৃতির আকর্ষণে মঠে ফিরিয়া আসিতেন। তীর্থভ্রমণান্তে সন্ন্যাসিগণ মঠে আসিয়া পরস্পরের নিকট স্বীয় অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করিতেন। এইরূপে সন্ন্যাসিগণের জ্ঞান-ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হইত। ১৮৯২ খ্রীঃ বরাহনগর হইতে আলমবাজারে মঠ উঠিয়া যায়। বরাহনগরের ন্যায় এখানেও তপস্যার হোমানল নিরন্তর জ্বলিতেছিল। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের সহকারীরূপে স্বামী নির্মলানন্দ নানা কর্মে ব্যস্ত থাকিতেন। কালী তপস্বীর ন্যায় তুলসী মহারাজেরও তথায় একটি কুটীর ছিল। উভয় মঠে তাঁহাদের নিকট গৃহী ভক্ত, পণ্ডিত,

দর্শক এবং বহু আগন্তুক আসিতেন। স্বামী নির্মলানন্দ বলিতেন, "পাগলেরাও আমাদিগকে তাহাদের সমবস্থাপন্ন মনে করে আমাদের কাছে আসত।"

স্বামী নির্মলানন্দ তাঁহার তীর্থভ্রমণের কোন দিনলিপি রাখিতেন না কিংবা তীর্থভ্রমণকাহিনী তাঁহার গুরুভ্রাতৃগণ বা শিষ্যদের নিকট বলিতেন না। সেইজন্য তাঁহার ভ্রমণ-কাহিনীর ধারাবাহিক বর্ণনা পাওয়া যায় না। কোন কোন গ্রন্থে দেখা যায়, বৃন্দাবনে স্বামী অখণ্ডানন্দের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। উভয়ে তথা হইতে এটাওয়া পর্যন্ত একত্রে যান। তথায় স্বামী অখণ্ডানন্দ রোগাক্রান্ত হন এবং স্বামী নির্মলানন্দ তাঁহার শুশ্রূষা করেন। তথায় স্বামী ত্রিগুণাতীত আসিয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত হন। স্বামী ত্রিগুণাতীত ও স্বামী অখণ্ডানন্দ একত্রে আগ্রায় যান। স্বামী অভেদানন্দ স্বামী নির্মলানন্দের সহিত জয়পুরে যান এবং তথায় চারিজনে পুনরায় মিলিত হন।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁহার পুস্তকে বিবৃত করিয়াছেন, স্বামী নির্মলানন্দ রোগীসেবায় কত প্রীতিপরায়ণ ছিলেন। বলরাম বসুর কোন আত্মীয় আলমবাজার মঠে বাসকালে যক্ষ্মারোগে ভীষণ ভাবে আক্রান্ত হন। সপ্রেম নিষ্ঠার সহিত নির্মলানন্দজী উক্ত যক্ষ্মারোগীর সেবা করেন। কিন্তু রোগী সেই রোগেই প্রাণ হারাইলেন। সেবক তুলসী মহারাজ উক্ত সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপে পড়িলেন এবং তাঁহার থুথুতেও রক্ত পড়িতে লাগিল। পাছে তাঁহার নিকট হইতে অন্য কেহ কষ্টভোগ করেন সেইজন্য তিনি বেলুচিস্থানে অবস্থিত হিংলাজ তীর্থে গমন করেন। কিছুকাল পরে তিনি নীরোগ ও স্বাস্থ্যবান হইয়া সেই দুর্গম তীর্থ হইতে প্রত্যাগত হন। হিমালয়ে সুদীর্ঘ প্রবাসের ফলে চম্বার রাজা এবং রাজপরিবার তাঁহার প্রতি বিশেষ ভাবে অনুরক্ত হন। নির্মলানন্দজীর প্রতি চম্বারাজের এই প্রগাঢ় অনুরক্তি আজীবন স্থায়ী হইয়াছিল। আলমবাজার মঠে থাকিলে সাধুভ্রাতাদের সেবা লইতে হইবে ভাবিয়া তিনি তীর্থযাত্রার উদ্দেশ্যে হিমালয়বাসী হইয়াছিলেন।

হিমালয়ে এবং অন্যত্র তীর্থভ্রমণ কালে তাঁহার অসংখ্য বিচিত্র অভিজ্ঞতা হইয়াছিল। কখনো কখনো তিনি স্বীয় অভিজ্ঞতার দুই একটি কথা-প্রসঙ্গে

উল্লেখ করিতেন। অতিথি-সৎকারে স্বয়ং অনুকরণীয় ছিলেন বলিয়া হিমালয়ে একদা একদল বানরের হাতে তিনি যে অদ্ভুত আতিথ্য প্রাপ্ত হন তাহা বলিতেন। হিমালয়ের গ্রামগুলিতে লোকসংখ্যা অত্যল্প। গ্রামগুলি দূরে দূরে অবস্থিত এবং একটি হইতে অন্যটি যাইবার পথ জঙ্গলাকীর্ণ। পথে মানুষের মুখ কদাচিৎ দেখা যায়; কিন্তু পশুর মুখ প্রায়ই দৃষ্টিপথে পড়ে। স্বামী নির্মলানন্দ এক অপরাহ্নে গ্রামান্তরে গমনার্থ যাত্রা করেন। পথে সূর্য্য অস্তমিত হইলেন। চারিদিক অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইল। কোন গ্রাম দৃষ্টিগোচর, বা মানবকণ্ঠ কর্ণগোচর হইল না। আর অগ্রসর হইতে না পারিয়া তিনি গভীর জঙ্গলের মধ্যে বৃক্ষতলে অন্ধকারে বসিয়া পড়িলেন। কয়েক মিনিট পরে তিনি দেখিলেন, একটি প্রকাণ্ড বানর কোথা হইতে আসিয়া সেই গাছে উঠিল। তাঁহার হাতে একটি লাঠি ছিল। তিনি ভাবিলেন, বানরটি তাঁহাকে আক্রমণ করিতে আসিয়াছে। কিন্তু শীঘ্রই বানরটি অন্তর্হিত হইল, কিছুক্ষণ পরে তিনি অসংখ্য বানরের চীৎকার শুনিলেন। সেই চীৎকারে জঙ্গল মুখরিত হইয়া উঠিল। পূর্বোক্ত প্রকাণ্ড বানরটি পুনরায় আবির্ভূত হইল। এইবার উহার সঙ্গে অন্যান্য বানর এবং একটি জ্বলন্ত কাষ্ঠখণ্ড ছিল। দলপতির ইঙ্গিতে অসংখ্য বানর নিঃসঙ্গ সন্ন্যাসীর কিঞ্চিৎ দূরে চারিদিকে বৃত্তাকারে দাঁড়াইল। ছোট ছোট বানরগুলি দল-পতির আদেশে শুষ্ক বৃক্ষের শাখাখণ্ডসমূহ আনিয়া সন্ন্যাসীর কাছে রাখিল। সন্ন্যাসী বানরদের অব্যক্ত ইঙ্গিত বুঝিলেন এবং আগুন জ্বালিয়া বন্য পশুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার সুযোগ পাইলেন। তিনি তখন বুঝিলেন, বানরেরা তাঁহার অনিষ্ট করিতে আসে নাই। কিন্তু নির্জন অরণ্যে তাহারাই সেই পথহারা পথিকের প্রকৃত মিত্র। তিনি ইহাতে অতিশয় আশ্চর্যান্বিত হইলেন। কিন্তু পরক্ষণে বানরদের নিকট আবার যে আতিথ্য পাইলেন তাহাতে তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না। পুনরায় দলপতির ইঙ্গিতে কয়েকটি বানর কিছু ফল আনিয়া তাঁহার সম্মুখে রাখিল। ফলগুলি ভক্ষ্য কিনা না জানিয়া তিনি সেগুলি খাইলেন না। তাঁহার মনোভাব বুঝিয়া বানরদের দলপতি তৎসম্মুখে দুই একটি ফল নিজেই খাইল। তখন স্বামী নির্মলানন্দের আর

তিলমাত্র সন্দেহ রহিল না। তিনি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপনান্তে বানর-প্রদত্ত ফলগুলি নীরবে আহার করিলেন। তাঁহার সত্য সত্যই বিশ্বাস হইল, ফলগুলি ঈশ্বর-প্রেরিত। বানরেরা সারারাত্রি তাঁহার চতুর্দিকে বসিয়া পাহারা দিল এবং প্রভাতে অন্যত্র চলিয়া গেল।

একদা স্বামী নির্মলানন্দ শীতকালে পাহাড় হইতে সমতল ভূমিতে নামিতে পারেন নাই। সমুচ্চ পর্বতের একটি গুহায় পাহাড়ীদের সহিত তাঁহাকে থাকিতে হয়। পাহাড়ীরা শীতকালের জন্য আহার সংগ্রহ করিয়া রাখে। আহার্যের মধ্যে বাঙ্গালীর প্রিয় খাদ্য চাউল ছিল না। কিন্তু সামান্য আটা ও প্রচুর মাংস ছিল। ঐ মাংস শুষ্ক নহে। পশুগুলিকে বধ করিয়া গুহার মধ্যে টাঙাইয়া রাখা হইত। বরফ ও শৈত্যের প্রকোপে মাংস পচিয়া যাইত না। ঝুলান মাংস হইতে কিছু অংশ কাটিয়া রোজ রান্না করা হইত। গুহার চারিদিকে সাত আট ফুট গভীর বরফ জমিয়া থাকিত। সেই বরফেরই একখণ্ড গুহার মধ্যে আনিলে গরমে গলিয়া যাইত। উক্ত জলই তাহাদের একমাত্র পানীয় ছিল, অন্য জল পাওয়া যাইত না। পাহাড়ীরা তাঁহাকে বলিয়াছিল শীতকালে গৃহপালিত পশুদের খাদ্য যোগান সম্ভব নয় বলিয়া তাহারা সেই সকল পশু বধ করিয়া আহার করিত। আর একবার স্বামী নির্মলানন্দ তিব্বতীয় পর্বতে তিন দিন কোন গ্রামের সন্ধান পান নাই। সেই তিন দিন তিনি পাহাড়ীদের সঙ্গে বাস এবং তাহাদের খাদ্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হন।

আর একবার প্রায় ছয় মাস তিনি কোন পার্বত্য অঞ্চলে ছিলেন এবং রাগি শস্যের রুটি খাইয়া জীবন ধারণ করিতেন। সেই ছয় মাস তিনি কোন তরকারী বা অন্য আহার্য মুখে দিতে পারেন নাই। পরিব্রাজক জীবনে তাঁহার অসীম সহ্য শক্তি নানা ভাবে পরীক্ষিত হয়। একদা তিনি কোন তীর্থস্থানে যাইয়া ক্ষেত্রোপবাস করেন। তথায় তিনি দিনে অল্পাহার করিতেন এবং রাত্রে উপবাসী থাকিয়া চিৎ হইয়া শুইতেন। উহাই ছিল স্থানীয় তীর্থকৃত্য। তথায় প্রচণ্ড শীতের প্রভাবে তাঁহার পদদ্বয় অসাড়প্রায় এবং নীলাভ হইয়া যায়। তীব্র শীতে ও গরমে খালি পায়ে পথ চলার জন্য তাঁহার পা ফোলা, পায়ে ফোস্কা

পড়া বা রক্তপাত হওয়া বা মোচকে যাওয়া প্রভৃতি প্রায়ই হইত। ফোস্কার ক্ষতের জন্য কখনো কখনো তিনি পায়ের তলায় চট বা কাপড় বাঁধিয়া চলিতেন। কয়েক বার তিনি দুরারোগ্য ব্যাধিতেও আক্রান্ত হন। একবার তাঁহার দেহস্থ থোরাক্স নামক মাংসগ্রন্থিগুলি ফুলিয়াও বাড়িয়া যায়। পাহাড়ে থাকিতে তিনি ইহা বুঝিতেই পারেন নাই। সমতল ভূমিতে নামিয়া একদিন স্বচ্ছ জলে স্বদেহের প্রতিবিম্ব দেখিয়া তিনি ইহা বুঝিতে পারেন। উক্ত মাংসগ্রন্থির স্ফীতাবস্থা প্রায় এক বৎসর স্থায়ী হয়। কিন্তু ঠাকুরের কৃপায় বিনা চিকিৎসায় উহা সারিয়া যায়। পাহাড়ে থাকিতে একবার তাঁহার মাথায় দুষ্টব্রণ হয়। সমতল ভূমিতে আসিয়া তিনি উহার অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থা করেন। অস্ত্রোপচারের পূর্বে ডাক্তার তাঁহাকে ক্লোরোফর্ম দ্বারা সংজ্ঞাশূন্য করিতে চাহিলেন। কিন্তু স্বামী নির্মলানন্দ বলিলেন, "ইহা তাঁহার পক্ষে অনাবশ্যক। অস্ত্রোপচারকালে ব্যথার জন্য পাছে তিনি হাত পা ছোঁড়েন সেইজন্য ডাক্তার যখন তাঁহার হাত পা বাঁধিয়া রাখিতে চাহিলেন তখন তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "ইহাও নিষ্প্রয়োজন।" স্বামী নির্মলানন্দ নিশ্চল নিষ্কম্প দেহে উপবিষ্ট হইলেন। অস্ত্রোপচার সময়ে তাঁহার দেহের একটি পেশী বা একটি স্নায়ু ও কম্পিত হইল না। সুসংযত সন্ন্যাসীর শরীরে নির্বিঘ্নে কঠিন অস্ত্রোপচার সম্পন্ন হইল।

পরিব্রজ্যাকালে স্বামী নির্মলানন্দ বহুবার হরিপ্রসন্ন মহারাজের সহিত মিলিত হন। উভয়ে মিলিত হইলেই ঠাকুরের অপূর্ব ত্যাগ ও দর্শনাদির কথা আলোচনা করিতেন। স্বামী নির্মলানন্দই হরিপ্রসন্ন মহারাজকে সরকারী চাকুরী ছাড়িয়া মঠে যোগদানের জন্য বারংবার অনুরোধ করেন। স্বামী বিজ্ঞানানন্দ যখন বাঙ্গালোরে যান তখন কোন ভক্তকে স্বামী নির্মলানন্দ সম্বন্ধে এই সকল কথা বলিয়াছিলেন, "আমি তুলসী মহারাজের নিকট কত ঋণী তা তোমরা জান না। আমরা কাশীতে বাঙ্গালীটোলা হাই স্কুলে সহপাঠী ছিলাম। শুধু তাহাই নহে, ঠাকুরের কাছে আমার যাতাযাতের সব কথা একমাত্র তুলসী মহারাজই জানতেন। আমি যখন এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার ছিলাম তখন তিনি আমার কাছে প্রায়ই আসতেন এবং অনেক দিন. ধরে থাকতেন। চাকরী

ছেড়ে ঠাকুরের কাজ করবার জন্য তিনি আমাকে গভীর প্রেরণা, এমন কি, খুব চাপও দেন। আমি অবিবাহিত ছিলাম এবং জীবনে কোন পথে চলব তা গভীর ভাবে ভাবতে ছিলাম। যখন আমি এই বিষয়ে অতিশয় চিন্তাকুল তখন শ্রীশ্রীঠাকুর একদিন আমাকে কৃপাপূর্বক দর্শন দিয়া বলিলেন, চাকরী ছেড়ে আমার পতাকা বহন কর। পরদিন প্রাতে তারযোগে আমি পদত্যাগ করি এবং আমার অধীনস্থ কর্মচারীকে কাজের ভার বুঝাইয়া দিয়া আলমবাজার মঠে ছুটিয়া যাই এবং সন্ন্যাসী হই। আমাদের উভয়ের মধ্যে এরূপ সুগভীর সম্বন্ধ ছিল।"

স্বামী নির্মলানন্দ যৌবন হইতেই দলপতি স্বামী বিবেকানন্দকে স্বীয় আদর্শ রূপে গণ্য করিতেন। ঠাকুরের অদর্শনের পর তিনি সত্য সত্যই বুঝিলেন, ঠাকুরই একরূপে স্বামিজী। সেইজন্যই স্বামিজীকে তিনি গুরুবৎ শ্রদ্ধা ও সেবা করিতেন। স্বামিজী তাঁহার রান্না খাইতে পছন্দ করিতেন বলিয়া তুলসী মহারাজ পরবর্তী জীবনে নিজেকে 'স্বামিজীর পাচক' রূপে পরিচয় দিতে আনন্দিত হইতেন। স্বামিজী যখন বিশ্ববরেণ্য হইয়া ভারতে ফিরিলেন তখন নির্মলানন্দজী তাঁহার সেবায় পুনরায় নিযুক্ত হইলেন। একদা স্বামিজী চিকিৎসকের নির্দেশে পরিমিত ও নির্বাচিত পথ্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। সম্ভবতঃ তখন তিনি বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত। নির্দিষ্ট পরিমাণে মাংসাহার তাঁহাকে করিতে হইত, অন্য কোন পথ্য তাঁহাকে খাইতে দেওয়া হইত না।

একদিন যথাসময়ে পরিমিত পথ্য প্রস্তুত ও পরিবেশিত হইল। কিন্তু পাক এত সুন্দর ও সুস্বাদু হইয়াছিল যে, স্বামিজী বালকবৎ বলিলেন, "আর এক টুকরো মাংস দেবে কি?" স্বামিজী এমন ভাবে চাহিলেন যে, নির্মলানন্দজী অস্বীকার করিতে পারিলেন না এবং আরো দুই এক টুকরা মাংস তাঁহাকে দিলেন। যখন উহা খাওয়া হইল তখন স্বামিজী আজন্ম অভিনেতার মত বলিলেন, "ডাক্তার যখন পরিমিত পথ্যের ব্যবস্থা দিয়েছেন তখন সেই নিয়মভঙ্গ করে তুমি আমাকে বেশী মাংস খাওয়ালে কেন?" ইহাতে ভীত না হইয়া

প্রত্যুৎপন্নমতি স্বামী নির্মলানন্দ প্রত্যুত্তর দিলেন, "বিশ্বজগৎ যাঁর মুষ্টির মধ্যে রয়েছে তিনি যদি এক টুকরা মাংসের প্রার্থী হন কে তাঁকে তাদিতে অস্বীকার করবে?" ইহাতে উভয়ের মধ্যে হাস্যের রোল উঠিল। আর একদিন স্বামিজী তাঁহার প্রিয় সেবক তুলসী মহারাজকে সকাল বেলা নয়টার সময় বলিলেন, "আমরা আজ নয় দশ জন দশটার সময় দার্জিলিং যাত্রা করবো। আমাদের সকলের জন্য খাবার প্রস্তুত করে দাও।" এতগুলি লোকের জন্য এক ঘণ্টার মধ্যে কিরূপে খাবার প্রস্তুত করিবেন, ইহা ভাবিয়া স্বামী নির্মলানন্দ অস্থির হইলেন। কিন্তু তিনি ইতস্ততঃ না করিয়া স্বামিজীর আদেশ পালনে অগ্রসর হইলেন। অবিলম্বে নয় দশটি স্টোভ জ্বালান হইল এবং বিবিধ খাদ্য প্রস্তুত করিয়া স্বামিজী প্রভৃতিকে খাওয়ান হইল।

মিশনের প্রচলিত প্রতীক যখন স্বামিজীর নির্দেশে অঙ্কিত হয় তখন স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ও নির্মলানন্দ উহার ভাবার্থ স্বামিজীকে জিজ্ঞাসা করেন। বেলুড় মঠের পঞ্চম অধ্যক্ষ স্বামী শুদ্ধানন্দকে দীক্ষাদানের জন্য স্বামিজীকে নির্মলানন্দজীই অনুরোধ করেন। স্বামী শুদ্ধানন্দ 'স্বামিজীর অস্ফুট স্মৃতি'তে লিখিয়াছেন, "১৮৯৭ খ্রীঃ এপ্রিল মাসে আমি আলমবাজার মঠে যোগদান করি। তখন তথায় প্রবীণ সন্ন্যাসীদের মধ্যে কেবলমাত্র স্বামী প্রেমানন্দ, নির্মলানন্দ ও সুবোধানন্দ ছিলেন। স্বামিজী দার্জিলিং হইতে কয়েকজন গুরুভ্রাতা ও শিষ্য সহিত ফিরিয়া আসিলেন। এক পূর্বাহ্নে আমি নিজের ঘরে ব্যাপৃত আছি। হঠাৎ তুলসী মহারাজ আমার ঘরে আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এখন স্বামিজীর কাছে দীক্ষা নেবে কি?" আমি উত্তর দিলাম, 'হাঁ'!....আমি ইতস্ততঃ না করিয়া সোজা তাঁহার সঙ্গে ঠাকুর-ঘরে গেলাম। আমি জানিতাম না যে, তখন শরৎচন্দ্র চক্রবর্তীর দীক্ষা হইতেছিল। কিছুক্ষণ পরে শরৎবাবু বাহিরে আসিতেই স্বামী নির্মলানন্দ আমাকে ঠাকুর-ঘরে লইয়া যাইয়া স্বামিজীকে বলিলেন, "একে দীক্ষা দিন।" স্বামিজী দীক্ষার্থীকে বসিতে বলিলেন এবং দীক্ষা দিলেন। দীক্ষান্তে স্বামিজী নির্মলানন্দজীকে সহাস্যে বলিলেন, "তুলসী, আজ দু'জনের বলি হল।"

স্বামী নির্মলানন্দ যে শুধু রন্ধনপটু ছিলেন তাহা নহে, তিনি বড় পণ্ডিতও ছিলেন। স্বামী তুরীয়ানন্দের মত তিনিও মঠবাসীদিগকে ব্রহ্মসূত্রাদি বেদান্ত-গ্রন্থ পড়াইতেন। একদিন বেদান্ত অধ্যাপনার সময় স্বামিজী দ্বিতল হইতে নীচে নামিয়া আসিলেন এবং দেখিলেন, স্বামী নির্মলানন্দ অধ্যাপনায় নিযুক্ত। তিনি নবীন শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "নির্মলানন্দের সঙ্গে তোমরা কি আলোচনা করছিলে?" শিষ্য সবিনয়ে উত্তর দিলেন, "মহারাজ, ইনি বলছেন, বেদান্তের ব্রহ্মকে তুমি বোঝ এবং তোমার স্বামিজী বোঝেন। আমরা কিন্তু জানি, 'কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং।'

স্বামিজী—তুমি কি বললে?

শিষ্য—আমি বললাম, আত্মাই পরম সত্তা এবং কৃষ্ণ কেবল মাত্র সেই আত্মাকেই জেনেছেন। স্বামী নির্মলানন্দজী অন্তরে বেদান্ত-বিশ্বাসী; কিন্তু বাইরে তিনি দ্বৈতবাদীর পক্ষ নিয়ে যুক্তি দিচ্ছেন। তিনি চান, আমরা প্রথমে দ্বৈতবাদ ভাল করে বুঝে পরে অদ্বৈত বেদান্তে আস্থা রাখি। কিন্তু যখন তিনি আমাকে বৈষ্ণব বলেন, তখন আমি তাঁর প্রকৃত উদ্দেশ্য ভুলে গিয়ে সমুষ্ণ আলোচনা আরম্ভ করি।

স্বামিজী—নির্মলানন্দ তোমাদিগকে ভালবাসে। তাই তোমাদের সঙ্গে রঙ্গ করে। কিন্তু তোমরা তার কথায় উত্তেজিত হবে কেন? তোমরা তাকে উত্তর দেবে, মশায় আপনি তবে শূন্যবাদী নাস্তিক।

স্বামী বিবেকানন্দের ইংরাজী গ্রন্থাবলীর সপ্তম খণ্ডে উপরোক্ত কথোপকথন প্রকাশিত। স্বামিজীর যে শিষ্যকে নির্মলানন্দজী বেদান্ত পড়াইতেছিলেন তিনি শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী ব্যতীত অন্য কেহ নহেন। শরৎচন্দ্র স্বামিজীর নিকট যে সকল কথা শুনিতেন সেগুলি লিপিবদ্ধ করিবার জন্য নির্মলানন্দজী তাঁহাকে পুনঃপুনঃ প্রেরণা দেন। শরৎচন্দ্র প্রণীত 'স্বামী-শিষ্য সংবাদে'র পরিশিষ্টে গ্রন্থকার উক্ত ঋণ স্বীকারপূর্বক লিখিয়াছিলেন, "এখানে ইহা উল্লিখিত হইতে পারে যে, বেলুড় মঠের স্বামী নির্মলানন্দই আমাকে স্বামিজীর সহিত কথোপকথনগুলি লিপিবদ্ধ করিতে প্রধানতঃ উৎসাহ দেন। মাস্টার

মহাশয় এবং স্বামী নির্মলানন্দ—এই দুই মহাপুরুষকে আমি কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।"

স্বামী নির্মলানন্দ কথোপকথনে সুনিপুণ ছিলেন। সেজন্য স্বামিজী তাঁহাকে বেদান্তের প্রচারকরূপে দেখিতে ইচ্ছা করেন। স্বামিজী যখন কলিকাতায় ছিলেন তখন তিনি কোন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বক্তৃতাদানার্থ আহূত হন। তিনি আমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন, কিন্তু নির্দিষ্ট দিবসে অসুস্থ হইয়া পড়ায় বক্তৃতাদানার্থ নির্মলানন্দজীকে যাইতে নির্দেশ দেন। নির্মলানন্দজী স্বীয় অক্ষমতা জ্ঞাপন করিলে স্বামিজী বলিলেন, "বেশ, তবে আমি কিছুই খাবো না, এমনকি জল গ্রহণও করব না।" নির্মলানন্দজী যখন স্বামিজীর সম্মুখে প্রাতরাশ রাখিলেন স্বামিজী তখন তাহা স্পর্শ করিলেন না। পরবর্তী কালে তুলসী মহারাজ বলিয়াছিলেন, "যদি তিনি আমাকে অবাধ্যতার জন্য মঠ হইতে চলিয়া যাইতে আদেশ দিতেন তাহাতে আমি দুঃখিত হইতাম না। কিন্তু তাঁহার উপবাসের কথা আমার অসহ্য হইল। তাঁহাকে খাওয়াইবার জন্য আমি সব কিছু করিতে প্রস্তুত ছিলাম। সুতরাং তৎপ্রীত্যর্থে বক্তৃতা দিতে যাইতে তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলাম।" স্বামী নির্মলানন্দ উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানে যাইয়া জ্বালাময়ী ও বাগ্মিতাপূর্ণ ভাষণ দিলেন। তিনি বেলুড় মঠে ফিরিবার পূর্বেই তাঁহার সাফল্যের সংবাদ স্বামিজীর সমীপে বিদ্যুদ্বেগে পৌছিল। ইহা শুনিয়া স্বামিজী যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইলেন এবং নির্মলানন্দজী আসিলে তাঁহার পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন, "সাবাস্! তুলসী, তোমার মধ্যে বিপুল শক্তি আছে।"

আলমবাজার হইতে ১৮৯৮ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী মাসে মঠ বেলুড় গ্রামে এক ভাড়া-বাড়ীতে উঠিয়া আসিল। বরাহনগর বা আলমবাজারের ন্যায় এখানেও সাধনভজন ও শাস্ত্রালোচনা পূর্ববৎ চলিতে লাগিল। স্বামী নির্মলানন্দের যথার্থ সত্বর ও সরল উত্তর এই সকল আলোচনায় উচ্চ প্রশংসিত হইত। স্বামিজীর জনৈক ব্রহ্মচারী শিষ্য বলিয়াছিলেন, "তুলসী মহারাজ তখন খুব স্বাস্থ্যবান্ ছিলেন। তিনি নিজে ব্যায়াম করিতেন এবং অপরকে ব্যায়াম শিখাইতেন। তিনি ডুগি-তবলা ও পাখোয়াজ ভালভাবে বাজাইতেন, বিশেষতঃ যখন স্বামিজী

তাঁহাকে খুব ভালবাসিতেন এবং তাঁহার সহিত বন্ধুবৎ ব্যবহার করিতেন। কেহ কোন ভুলভ্রান্তি করিলে স্বামিজী তুলসী মহারাজের নিকট অভিযোগ করিতেন। তুলসী মহারাজ স্বামিজীর সঙ্গে এবং আমাদের সঙ্গেও খেলা করিতেন। আমরা তাঁহার সঙ্গে হাডুডু, ফুটবল, ব্যাডমিণ্টন প্রভৃতি খেলা খেলিতাম।"

বেলুড়ে যখন ভাড়া-বাড়ীতে মঠ ছিল তখন স্বামিজী ব্রাহ্মণেতর ভক্তগণকে উপবীত ও গায়ত্রী মন্ত্র দিয়া শুদ্ধ করিবার শুভ সংকল্প ব্যক্ত করেন। স্বামিজীর উক্ত সংকল্প. নির্মলানন্দজীর মনে গভীর রেখাপাত করিল। স্বামী নির্মলানন্দ যখন মালাবারে ও ওট্টাপালমে বেদান্ত প্রচারে নিযুক্ত ছিলেন তখন তিনি স্বামিজীর সংকল্প ব্যাপকভাবে কার্যে পরিণত করেন। বেলুড় গ্রামের ভাড়া-বাড়ীতে যখন মঠ ছিল তখন স্বামিজী স্বশিষ্যা কুমারী মার্গারেট নোবলকে ঠাকুর-ঘরে লইয়া যাইয়া ব্রহ্মচর্য-ব্রতে দীক্ষিতা করেন। বেলুড় মঠে নির্মলানন্দজী সংস্কৃত ভাষা এবং পাশ্চাত্য দর্শনাদি পড়াইতেন। স্বামী সারদানন্দের দিনলিপি হইতে জানা যায়, স্বামিজী কলিকাতা হইতে বেলুড় মঠে ফিরিলেন শিবানন্দজীর সঙ্গে ১৮৯০ খ্রীঃ ৪ঠা ফেব্রুয়ারী। তিনি আসিয়াই স্বামী নির্মলানন্দকে মঠের কর্মভার গ্রহণ করিতে নির্দেশ দিলেন। ইহার দুই দিন পরে স্বামিজীর নির্দেশে স্বামী সারদানন্দ ও স্বামী তুরীয়ানন্দ গুজরাটে ও কাথিয়াবাড়ে বেদান্ত প্রচারার্থ প্রেরিত হন।

১৮৯৯ খ্রীঃ স্বামী নির্মলানন্দ রাজপুতানায় দুর্ভিক্ষপীড়িতদের সেবাকার্য ব্যপদেশে গমন করেন। সেই বৎসরই স্বামিজী দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্যে যাত্রা করেন এবং ১৯০০ খ্রীঃ ৯ই ডিসেম্বর বেলুড় মঠে ফিরিয়া আসেন। স্বামিজীর অপ্রত্যাশিত আগমনে মঠে আনন্দের স্রোত প্রবাহিত হইল। তিনি যখন আসিলেন তখন সকলের নৈশ আহার শেষ হইয়াছে। তখন হইতে প্রভাত পর্যন্ত প্রায় সমগ্র রাত্রি গুরুভ্রাতৃগণ স্বামিজীর সহিত আলাপ করিয়া কাটাইলেন। স্বামিজী নির্মলানন্দজীর সহিত বসিয়া তামাক খাইতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ গল্পগুজবের পর স্বামিজী গান ধরিলেন এবং তুলসী মহারাজ পাখোয়াজ

বাজাইলেন। ১৯০১ খ্রীঃ ১০ই ফেব্রুয়ারী বেলুড় মঠের ট্রাষ্টীগণ স্বামিজীর পৌরোহিত্যে প্রথম অধিবেশন করেন। উহাতে যথাক্রমে স্বামী সারদানন্দ এবং নির্মলানন্দ সর্বসম্মতিক্রমে মঠ ও মিশনের সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন। স্বামী নির্মলানন্দ সাধ্যমত তাঁহার গুরুদায়িত্ব বহন করেন। পরবর্তী বৎসরে স্বামিজী মায়াবতী গিয়াছিলেন কাপ্তেন সেভিয়ারের মৃত্যুতে মিসেস সেভিয়ারকে সান্ত্বনাদানের জন্য।

এই সুযোগে স্বামী নির্মলানন্দ তাঁহার প্রিয় তপঃক্ষেত্র হিমালয়ে প্রস্থান করেন। স্বামিজী বেলুড় মঠে ফিরিয়া তাঁহাকে পত্র দেন এবং প্রচার কার্য্যের ভার লইতে অনুরোধ করেন। নির্মলানন্দজী উত্তর দিলেন, 'আরো কিছুদিন তপস্যা করিবার ইচ্ছা।' স্বামিজী পুনরায় লিখিলেন, "ভারতে ভ্রাম্যমান সন্ন্যাসীর অভাব নাই। আমি চাই না, তুমি তদ্রূপ একজন হও।" ইহার কিছুদিন পরে সহসা স্বামী নির্মলানন্দের নিকট টেলিগ্রাম আসিল স্বামিজীর মহাসমাধির দুঃসংবাদ লইয়া। তুলসী মহারাজ টেলিগ্রাম পড়িয়া বজ্রাহতবৎ স্তম্ভিত হইলেন। এই মর্মন্তুদ আঘাতে তিনি শয্যাগ্রহণ করিলেন। গভীর রাত্রে তিনি এই দর্শন পাইলেন। স্বর্গত শিবতুল্য স্বামিজী আসিয়া তাঁহার পার্শ্বে বিছানায় বসিলেন এবং পূর্বপরিচিত সুমিষ্ট স্বরে প্রীতিভরে বলিলেন, "তুলসী, তুমি ভাবছ আমি তোমাদিগকে ছেড়ে গেছি। না, আমি তোমাদের সঙ্গেই আছি। তুমি প্রফুল্ল থাক।'

উক্ত স্বপ্নদর্শনে শোক-সন্তপ্ত নির্মলানন্দজী পরম সান্ত্বনা পাইলেন এবং অচিরে সুস্থ হইয়া উঠিলেন। কিন্তু তিনি বেলুড় মঠে না আসিয়া কাশ্মীরে গমন করিলেন। তথায় যাইয়া তিনি দারুণ নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হইলেন। কাশ্মীরের তৎকালীন দেওয়ান ছিলেন নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়। বেলুড় গ্রামে তাঁহার বাগানবাড়ীতে রামকৃষ্ণ মঠ কিছুকাল অবস্থিত ছিল। নীলাম্বর বাবুর পত্নী তুলসী মহারাজের চিকিৎসার সুব্যবস্থা করিলেন এবং বেলুড় মঠে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে তাঁহার অসুখের কথা লিখিলেন। এই সংবাদ পাইয়া স্বামী ব্রহ্মানন্দ তুলসী মহারাজকে নব্বই টাকা তারযোগে প্রেরণ করিলেন এবং তাঁহাকে

কলিকাতা আসিতে লিখিলেন। উক্ত টাকা পাইয়া স্বামী নির্মলানন্দ কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। কয়েক মাস পরে স্বামী নির্মলানন্দ সকল ট্রাষ্টীর সম্মতি অনুসারে বেলুড় মঠের অন্যতম ট্রাষ্টী নির্বাচিত হন। কিন্তু তিনি উক্ত গুরুভার গ্রহণ করেন নাই। নিউইয়র্ক বেদান্ত সমিতির অধ্যক্ষ স্বামী অভেদানন্দের অনুরোধে ১৯০৩ খ্রীঃ ১৩ই অক্টোবর স্বামী নির্মলানন্দ বেলুড় মঠ হইতে আমেরিকা যাত্রা করেন।

স্বামী নির্মলানন্দ কলিকাতা হইতে বোম্বাইতে যাইয়া তথা হইতে ১৫ই অক্টোবর জাহাজে উঠেন। তিনি পথে ইটালী দেশে নেপল্স দেখিয়া ২৫শে নভেম্বর বুধবার নিউইয়র্কে উপস্থিত হন। সাত বৎসর ধরিয়া স্বামী অভেদানন্দ নিউইয়র্কে বেদান্ত-প্রচার করিতেছিলেন। স্থানীয় বেদান্ত সমিতির কার্য বহুমুখে প্রসারিত হইয়াছিল। সর্ববিষয়ে তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য স্বামী নির্মলানন্দ সচেষ্ট হইলেন। স্বামী অভেদানন্দের অনুপস্থিতিতে স্বামী নির্মলানন্দই বেদান্ত সমিতির সমস্ত কার্য চালাইতেন। অচিরে তিনি স্থানীয় ভক্তগণের শ্রদ্ধাভাজন হইয়া উঠিলেন। তিনি সমিতির সভ্যগণকে দৈনিক ধ্যানশিক্ষা দিতেন এবং অনেককে নিয়মিত ভাবে সংস্কৃত পড়াইতেন। ১৯০৪ খ্রীঃ জানুয়ারী মাসে উক্ত সমিতি কর্তৃক স্বামী বিবেকানন্দ স্মৃতিসভা আহূত হয়। 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকায় (৯ম বর্ষ, ৩৪ পৃষ্ঠা) সেই উৎসবের সংবাদ এই ভাবে প্রকাশিত হয়।—

"স্মৃতিসভায় স্বামী নির্মলানন্দ একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন। মনোযোগ সহকারে শ্রবণকারী শ্রোতাদের নিকট ইহা বিশেষভাবে চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। তিনি স্বামিজীর জীবনের যে সকল ঘটনা উক্ত প্রবন্ধে বিবৃত করেন সেগুলি আমেরিকান শ্রোতাদের নিকট অজ্ঞাত ছিল। স্বামিজী পরবর্তী জীবনে সন্ন্যাসীরূপে যে যুগ-প্রয়োজন সিদ্ধ করেন তাহা তাঁহার বাল্যজীবনে কিভাবে অঙ্কুরিত হয় উহার বিচিত্র বর্ণনা শুনিয়া শ্রোতাগণ বিমুগ্ধ হন।" স্বামিজী যে বেদ-বাক্যাবলী আবৃত্তি করিতেন সেগুলিও তিনি মধুর স্বরে উচ্চারণপূর্বক সভায় ব্যাখ্যা করিতেন। স্বামী অভেদানন্দ সর্বশেষে স্বামী নির্মলানন্দের সহযোগিতা ও

ও সাফল্যের প্রশংসাবাদান্তে ধর্মসভা সমাপ্ত করেন। উক্ত বৎসর ঠাকুরের উৎসবের দিনে তুলসী মহারাজ বৈকালে প্রায় দেড় ঘণ্টা ভজন সঙ্গীত গাহিয়াছিলেন। স্বামী নির্মলানন্দের উপস্থিতিতে স্বামী অভেদানন্দ মার্কিন যুক্তরাজ্যের নানা স্থানে যাইয়া বেদান্ত প্রচার করেন। তুলসী মহারাজ নিয়মিত ভাবে যোগশিক্ষা দিতেন। বেদান্ত সমিতি স্থাপিত হইবার পর কোন বৎসর গ্রীষ্মকালে সমিতির কার্য লোকাভাবে অব্যাহত ছিল না। স্বামী নির্মলানন্দের উপস্থিতিতে ১৯০৪ খ্রীঃ গ্রীষ্মকালে সমিতির কার্য্য সর্বপ্রথম অব্যাহত ভাবে চলিয়াছিল। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে স্বামী অভেদানন্দ বেদান্ত প্রচারার্থ কানাডায় গমন করেন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে স্বামী নির্মলানন্দ বেদান্ত সমিতির কার্যভার গ্রহণ করেন।

এই সময় স্বামী নির্মলানন্দ প্রথম রবিবাসরীয় বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতার বিষয় ছিল "বেদে ঈশ্বরবাদ"। তাঁহার স্ফটিকবৎ ভাবস্বচ্ছতা এবং সাবলীল প্রকাশ-ভঙ্গী সকলকে বিমুগ্ধ করিল। তিনি নম্রভাবে এত দিন বলিয়া আসিতেছিলেন যে, তিনি সুবক্তা নহেন। এই বক্তৃতা শুনিয়া কেহই আর সে কথা বিশ্বাস করিলেন না। নিউইয়র্কের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক পার্কার প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে আসিতেন। অধ্যাপক পার্কার ভারতীয় দার্শনিক কপিলের প্রতি অশেষ শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন। তিনি পরমোৎসাহে স্বামী নির্মলানন্দকে বলিয়াছিলেন, "স্বামিজী, আপনাদের কপিল কি অদ্ভুত দার্শনিকও ছিলেন। বস্তুতঃ তিনি বিজ্ঞান ও দর্শনের আদি জনক।" নির্মলানন্দজীর অদম্য প্রেরণায় ব্রুকলিনে একটি নতুন বেদান্ত কেন্দ্র স্থাপিত হইল। তাঁহার নির্দেশে নব কেন্দ্রের কার্যও অচিরে প্রসারিত হইল। স্থানীয় ঐতিহাসিক সমিতি ভবনের একটী কক্ষে উক্ত কেন্দ্রের সাপ্তাহিক অধিবেশন ও যোগসাধনা চলিত। কেন্দ্রের সকল সভ্য, সুহৃদ্ ও সত্যান্বেষীকে ধর্মজীবনে সাহায্য করিতে তিনি সদা তৎপর ছিলেন। যাঁহারা তাঁহার পূত স্পর্শে আসিতেন তাঁহারাই ধর্মভাবে অনুপ্রাণিত ও উপকৃত হইতেন। তিনি যোগ ও সংস্কৃত শিক্ষা এবং নিয়মিত বক্তৃতা দান ব্যতীত বহু শিক্ষার্থীকে উপনিষদাবলীও পড়াইতেন।

স্বামী নির্মলানন্দ আমেরিকানদিগকে ঠাকুর রামকৃষ্ণ এবং তৎশিষ্যদের জীবন-কথা এবং ভারতের চিন্তাধারা এমন ভাবে বলিতেন যে তাঁহারা মন্ত্রমুগ্ধবৎ নিবিষ্ট মনে সেই সব শুনিতেন। জনৈক মার্কিন সংবাদ-দাতা বলেন, "স্বামী নির্মলানন্দ এমন আন্তরিক আবেগে এই সকল কথা আমাদিগকে বলিতেন যে, উহা আমাদের প্রাণস্পর্শ করিত এবং আমরা মনে মনে ভারতে উপস্থিত হইতাম। শ্রোতাদের হৃদয়ে তাঁহার কথা এমন গভীর রেখাপাত করিয়াছিল যে, সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসর পরে মিঃ চার্লস এফ. গ্রে এ. আই. ই. ই. স্বামী নির্মলানন্দকে পত্রে আধ্যাত্মিক উপদেশ প্রার্থনা করেন। যেমন তিনি শিখাইতে প্রস্তুত থাকিতেন তেমনি তিনি শিখিতেও উৎসুক ছিলেন। একদা কোন মার্কিন মহিলা নির্মলানন্দকে খাবার আনিয়া দিলেন। তিনি বলিলেন, "আমি এই খাবার পছন্দ করি না।" মহিলা জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্বামিজী, তবে কি আপনি বলছেন, এই খাবার চান না?" তীক্ষ্মবুদ্ধি নির্মলানন্দজী ভাব-প্রকাশের পার্থক্য বুঝিলেন এবং স্বীয় ভ্রম সংশোধনান্তে তাঁহাকে ধন্যবাদ দিলেন। বেদান্ত-প্রচারকে বা যোগ-শিক্ষকরূপে তাঁহার কোন অস্বাভাবিক হাবভাব ছিল না। সরল প্রফুল্ল স্বাধীন বালকবৎ তিনি যেখানে যাইতেন সেখানেই আনন্দ বিকীরণ করিতেন। তাঁহার সাধারণ বহিরাবরণের আড়ালে সুসূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি লুক্কায়িত থাকিত। একটিমাত্র দৃষ্টিপাতেই তিনি উপরের স্থূল আবরণ ভেদ করিয়া মহাধূর্তের মনোভাব বুঝিতে পারিতেন।

নিউইয়র্কে একটী সাইকিক গবেষণা সমিতি (ভূত-তত্ত্বগবেষণাগার) ছিল। উক্ত সমিতি ভূতগুলিকে ডাকিয়া আনিত। কতিপয় বন্ধুর সহিত তিনি উক্ত সমিতিতে গিয়াছিলেন। সমিতির সত্ত্বাধিকারিণী ছিলেন কুমারী মিলার, যাঁহার মুখাকৃতি ভূতের মত ভীষণ ছিল। মুলার নির্মলানন্দজী প্রমুখ দর্শকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা কি ভূত দেখতে চান?" নির্মলানন্দজী উত্তর দিলেন, আমি কোন রেড ইণ্ডিয়ানের ভূত দেখতে ইচ্ছা করি। মুলার তাঁহাদিগকে একটী কক্ষে লইয়া গেলেন, যেখানে একটী ক্ষীণ নীলাভ আলোক জ্বলিতে ছিল। তথায় সহসা একটী ভূত আবির্ভূত হইল। অসম সাহসিক

নির্মলানন্দজী লাফাইয়া উঠিয়া সেই ভূতের হাত ধরিয়া নাড়িতে লাগিলেন। উক্ত হস্ত বায়বীয় ও অস্পর্শনীয় বোধ হইল না, উহা লোহার মত শক্ত প্রতীত হইল। তিনি ভূতেয় হাত ধরিয়া তিন বার ঘরের মধ্যে চার দিকে ঘুরিয়া আসিলেন। লৌহময় ভূতটীর নড়িবার শক্তি ছিল না। তখন এই কৃত্রিম ব্যাপারটী ধরা পড়িল। বৈজ্ঞানিক বন্ধু সঙ্গীটী কোন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের প্রেত মূর্তি দেখিতে চাহিলেন। তদনুযায়ী আর একটী ভূত আসিল। তাহাকে যখন কোন প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক তথ্য জিজ্ঞাসা করা হইল সে নিরুত্তর রহিল। সকলই বুঝিলেন, ইহা মিথ্যা প্রবঞ্চনার ব্যাপার। আমেরিকায় নির্মলানন্দজীর এইরূপ অনেক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হইয়াছিল। উক্তদেশে প্রায় তিন বৎসর থাকিবার পর তিনি ভারতে প্রত্যাগমন করেন। আমেরিকা-প্রবাসে তাঁহার স্বাস্থ্যোন্নতি এবং দৃষ্টিভঙ্গীর প্রসারতা ও অভিজ্ঞতার সমৃদ্ধি হইয়াছিল।

আমেরিকা হইতে ফিরিয়া স্বামী নির্মলানন্দ বেলুড় মঠে কিছু-দিন অবস্থান করেন। তখন তিনি একবার স্বামী প্রেমানন্দের সহিত পূর্ববঙ্গ ও আসামে ঠাকুরের ভাবপ্রচার করিতে যান। তথা হইতে ফিরিয়া তিনি হিমালয়ে তপস্যার্থ গমন করেন। বিলাসভূমি আমেরিকায় প্রবাস সত্ত্বেও তাঁহার তপস্যার ভাব তিরোহিত হয় নাই। তিনি সেই সময়ে একবার কাশ্মীরেও গিয়াছিলেন। এইরূপে দুই তিন বৎসর অতিবাহিত হয়। তিনি যখন তাঁহার পরম ভক্ত চম্বারাজের অতিথিরূপে বিশ্রাম লইতে ছিলেন তখন তিনি মাদ্রাজ হইতে সংঘাধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দের পত্র পাইলেন। উক্ত পত্রে সংঘগুরু তাঁহাকে বাঙ্গালোরে যাইবার জন্য নির্দেশ দেন। চম্বায় কোন গণক তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, তথায় তাঁহার অবস্থান সমাপ্তপ্রায় এবং তিনি অচিরে দক্ষিণ ভারতে যাইবেন। উক্ত পত্র পাইয়া তিনি বুঝিলেন, গণকের ভবিষ্যদ্বাণী কত সত্য। তিনি কলিকাতায় আসিয়া শ্রীশ্রীমায়ের শুভাশিস গ্রহণান্তে মাদ্রাজ যাত্রা করেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ তখন বাঙ্গালোর আশ্রমের * দ্বারোদ্ঘাটন সমাপনান্তে মাদ্রাজ মঠে অবস্থিতি করিতেছিলেন। মাদ্রাজ হইতে স্বামী নির্মলানন্দ স্বামী

---

* ইহা স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ কর্তৃক ১৯০৪ খ্রীঃ প্রতিষ্ঠিত হয়।

রামকৃষ্ণানন্দের সহিত বাঙ্গালোরে গমনপূর্বক ১৯০৯ খ্রীঃ এপ্রিল মাসে স্থানীয় আশ্রমের কার্যভার গ্রহণ করেন। বাঙ্গালোরে তিনি যে প্রথম বক্তৃতা হিন্দীতে দেন তাহা শিক্ষিত শ্রোতৃ-মণ্ডলীকর্তৃক বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়। বাঙ্গালোর আশ্রমে তিনি প্রত্যেক রবিবার রাজযোগের ব্যাখ্যা আরম্ভ করেন।

সহরের নানা প্রতিষ্ঠানে শাস্ত্রব্যাখ্যাদি দ্বারা তিনি আশ্রমটীকে অনতিবিলম্বে জনপ্রিয় করিয়া তুলিলেন। প্রথমতঃ অর্থাভাবে আশ্রমে পাচক বা ভৃত্য প্রভৃতি সম্ভব হইত না। সেইজন্য কিছুকাল তাঁহাকে রান্না, বাসনকোসন মাজাদ প্রভৃতি কার্য্য করিতে হইয়াছিল। অবিলম্বে স্বামী বিশুদ্ধানন্দ তাঁহার সহকারীরূপে তথায় উপস্থিত হন। একটী সহকারী পাইয়া তিনি স্বাধীন ভাবে মালাবার ও দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য স্থানে বক্তৃতা দিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এই রূপে তাঁহার দ্বারা মহীশূর, কোচিন ও ত্রিবাঙ্কুরাদি রাজ্যে ঠাকুর-স্বামিজীর ভাব-ধারা সম্যক্ প্রচারিত হয়। মহীশূর রাজ্যের উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী, ছাত্রবৃন্দ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নরনারী সকলে তাঁহার নিকট সমান সমাদর পাইতেন। তাঁহার প্রেরণায় বাঙ্গালোর আশ্রমে রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের জন্মতিথি, নবরাত্রি, শিবরাত্রি প্রভৃতি উৎসব মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইল। এইরূপে স্থানীয় হিন্দু সমাজে অপূর্ব ধর্মজাগরণ আসিল। স্থানীয় কথ্যভাষা কানাড়ায় রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সাহিত্য তাঁহার প্রচেষ্টায় অনূদিত ও প্রকাশিত হইল। প্রধানতঃ তিনি ধর্মপ্রচারক হইলেও প্রকারান্তরে শক্তিশালী সমাজ-সংস্কারকও ছিলেন। দক্ষিণ ভারতে অস্পৃশ্যতারূপ জগদ্দল পাথরের চাপে হিন্দু সমাজ নিষ্পেষিত হইয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের উদার ভাবধারার প্লাবনে ধীরে ধীরে উক্ত কুসংস্কার অন্তর্হিত হইল। উৎসব উপলক্ষ্যে আশ্রমে উচ্চতম ও নিম্নতম শ্রেণীর নরনারীগণকে একত্রে নিঃসঙ্কোচে মেলামেশা ও আহারাদি করিতে দেখিয়া সকলে আনন্দিত হইতেন। আধুনিক দক্ষিণ ভারতে এইরূপ ব্যাপার অভূতপূর্ব।

তখন বাঙ্গালোর আশ্রম-ভূমির পরিমাণ ছিল সাড়ে তিন একর। ইহার অধিকাংশ তখন বন্য বৃক্ষে ও অন্যান্য কাঁটা গাছের দ্বারা জঙ্গলে পরিণত

হইয়াছিল। স্বামী নির্মলানন্দ জঙ্গল পরিষ্কার করাইয়া স্বহস্তে ফল ও ফুলের বাগান প্রস্তুত করেন। বাগানটি বিচিত্র বর্ণ ও গন্ধের ফুলে এবং নানা প্রকার ফলে এরূপ সুশোভিত হইয়াছিল যে, শহরের বিভিন্ন পল্লী হইতে নরনারীগণ উহা দেখিতে আশ্রমে আসিতেন। যখন শহরে সরকারী পুষ্প-প্রদর্শনী হইত তখন আশ্রমের ফুল তথায় প্রদর্শিত হইত। এমন কি, ইউরোপীয়গণও উক্ত উদ্যানের প্রশংসা করিতেন। আশ্রমের গ্রন্থাগারটিও স্বামী নির্মলানন্দের প্রচেষ্টায় বিভিন্ন ভাষায় লিখিত শত শত গ্রন্থে পরিপূর্ণ হইল। স্বামী নির্মলানন্দের অক্ষয় কীর্তি কেরল প্রদেশের অসংখ্য স্থানে অদ্যাপি সগৌরবে বিদ্যমান। ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য কেরল প্রদেশের অন্তর্গত। উক্ত রাজ্যে ভারত-বিখ্যাত কন্যাকুমারী মন্দির বিদ্যমান। স্বামী বিবেকানন্দ পরিব্রজ্যাকালে এই মন্দির দর্শন করেন। তিনি এই মন্দিরে যে পাহাড়ে বসিয়া ধ্যানমগ্ন হইয়াছিলেন তাহা 'বিবেকানন্দ রক" নামে পরিচিত। মন্দিরটি দক্ষিণ ভারতের শেষ প্রান্তে ভারত মহাসাগরে নিমজ্জিত পর্বতোপরি প্রতিষ্ঠিত। স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতি-জড়িত হওয়ায় এই মন্দির রামকৃষ্ণ সংঘের সাধু-ভক্তগণের নিকট পুণ্য তীর্থরূপে পরিগণিত।

কেরলের সহিত বাংলার সম্বন্ধ সুপ্রাচীন। ত্রিবাঙ্কুরের অন্যতম রাজা কুলশেখর পেরুমল পরম বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি চৈতন্যদেবের সমসাময়িক এবং দ্বাদশ আলোয়ারের অন্যতমরূপে পূজিত। বৈষ্ণব মহলে তদ্রচিত 'মুকুন্দ মালা স্তোত্র' সুপরিচিত। দক্ষিণ ভারত ভ্রমণকালে চৈতন্যদেব রাজা কুলশেখরের সহিত সাক্ষাৎ ও আলিঙ্গন করেন। উভয়ে শ্রীকৃষ্ণ-প্রসঙ্গে প্রেমাশ্রুপাত করিয়াছিলেন। পুনরায় বর্তমান যুগে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারাও কেরলে ব্যাপক ভাবে প্রচারিত। ১৯০৪ খ্রীঃ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ তথায় সর্বপ্রথম ঠাকুরের ভাবগঙ্গা লইয়া যান। তৎকর্তৃক ১৯১১ খ্রীঃ স্বামী নির্মলানন্দ তথায় প্রেরিত হন। উক্ত রাজ্যের অন্তর্গত হরিপাদ নামক স্থানে নির্মলানন্দজী বক্তৃতা দিতে আহূত হন। তথায় বক্তৃতা দানান্তে তিনি আলেপ্পি যান এবং কুইলোন হইয়া বাঙ্গালোরে ফিরিয়া আসেন। তথায় একটী ভক্ত তাঁহার পূতস্পর্শে আসিয়া এমন প্রেরণা পান যে সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হন। হরিপাদে

তিনি একটী আশ্রম স্থাপন করেন। উহাই কেরল প্রদেশে প্রথম রামকৃষ্ণ আশ্রম। শ্রীশ্রীঠাকুরের পাঁচটী সন্ন্যাসী শিষ্য ঈশ্বরকোটী ছিলেন। তাঁহাদের নাম—স্বামী বিবেকানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, যোগানন্দ, নিরঞ্জনানন্দ ও প্রেমানন্দ। এই পাঁচজন মহাপুরুষের নামে স্বামী নির্মলানন্দ পাঁচটী আশ্রম কেরল প্রদেশে স্থাপন করেন।

হরিপাদে আশ্রম স্থাপিত হয় ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে। তিনি উহার নাম রাখেন রামকৃষ্ণ আশ্রম। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘ-জননী রামকৃষ্ণানন্দ ও নির্মালানন্দের আগ্রহাতিশয্যে উক্ত বৎসর ২৪শে মার্চ শুক্রবার প্রাতে বাঙ্গালোরে উপস্থিত হন। তাঁহার শুভাগমনে স্টেশন হইতে আশ্রম পর্যন্ত প্রশস্ত পথ সুন্দরভাবে সজ্জিত এবং ভক্ত-সমাকীর্ণ হইয়াছিল। স্বামী নির্মলানন্দ শ্রীশ্রীমার পুজার বাক্সটি পরম ভক্তিভরে মাথায় করিয়া আশ্রমে লইয়া যান। তিনি শ্রীশ্রীমার সঙ্গে ১লা এপ্রিল মাদ্রাজ হইয়া কলিকাতায় উপস্থিত হন। কলিকাতা হইতে ফিরিয়া সেই বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে তিনি পুনরায় ত্রিবান্দ্রমে যান স্থানীয় বেদান্ত সমিতির আমন্ত্রণে। সেখানে তিনি যে কয়েকদিন ছিলেন গীতাদি শাস্ত্রব্যাখ্যা এবং বক্তৃতাদি দ্বারা অভূতপূর্ব ধর্মজাগরণ সৃষ্টি করেন। ত্রিবান্দ্রমে তিনি যে ধর্মালোড়ন আনিলেন তাহার দ্বারা সমগ্র ত্রিবাঙ্কুর এবং সমগ্র কেরল দেশ আলোড়িত হইল। তথায় তিনি যে সুবৃহৎ আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করেন তাহা স্বামী ব্রহ্মানন্দের নামে উৎসর্গীকৃত হয়। ত্রিবান্দ্রম হইতে কন্যাকুমারী যাইয়া সেবারও তিনি দেবী দর্শন করেন। ত্রিবান্দ্রম হইতে স্বামী নির্মলানন্দ তিরুবেলা যাইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করেন।

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমভাগে স্বামী নির্মলানন্দ নীলগিরি পাহাড়ে উতকামন্দ সহরে গমন করেন স্থানীয় বিবেকানন্দ সমিতির বাৎসরিক উৎসবে। তথায় তিনি যে দুইটি বক্তৃতা দেন তাহা শ্রোতৃমণ্ডলীকে ধর্মভাবে উদ্দীপিত করে। উতকামন্দের ফার্ণহিল নামক পাহাড়ে বরোদার গায়কোয়াড়ের গ্রীষ্মাবাস অবস্থিত। নির্মলানন্দজী যখন মধ্য ভারতে পরিব্রাজক ছিলেন তখন

গায়কোয়াড় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু নানা কারণে সে সাক্ষাৎ হয় নাই। সেজন্য উতকামন্দে তিনি গায়কোয়াড়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। গায়কোয়াড় তাঁহাকে শ্রদ্ধানত হইয়া সম্বর্ধনা করেন এবং তাঁহার সহিত ধর্মালাপ করিয়া সন্তুষ্ট হন। স্বামী নির্মলানন্দ মালাবারের নানা স্থানে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারা প্রচার এবং আশ্রম স্থাপন করেন। উতকামন্দ হইতে তিনি কালিকট, তেলিচেরী প্রভৃতি স্থানে যাইয়া বক্তৃতা দেন। মালাবারে তিনি যে সকল আশ্রম স্থাপন করেন সে সকল আশ্রমে সামাজিক বৈষম্য, কুসংস্কার বা দুর্নীতি স্থান পাইত না।

স্বামী নির্মলানন্দের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব অসাধারণ ছিল। একদা নিম্নজাতীয় কোন ছুতার তাঁহাকে প্রশ্ন করেন, "আমরা বিশ্বকর্মার বংশধর হয়ে নিম্নশ্রেণীতে স্থান পেয়েছি কেন?" নির্মলানন্দজী উত্তর দিলেন, "একদা একটী বানর এরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিল, 'আমরা রাক্ষসনাশক, রাম-ভক্ত, বীরপূজ্য ও মহাবীর হনুমানের বংশধর। মানুষেরা হনুমানকে পূজো করে, কিন্তু আমাদিগকে দুর্ব্যবহার ও অবজ্ঞা করে কেন?' তাহাদিগকে বলা হল, তোমরা প্রত্যেকে হনুমানতুল্য মহাবীর ও মহাভক্ত হও। তাহা হইলে মানুষের পূজা পাবে। পূর্বপুরুষের গৌরব নিয়ে গর্ব করলে কেউ বড় হতে পারে না। যে গুণ দ্বারা বিশ্বকর্মা বড় হয়েছিলেন সেই গুণ লাভ কর। তা হলে তুমিও সকলের সম্মান ও শ্রদ্ধা পাবে।"

১৯১৪ খ্রীঃ বাঙ্গালোর আশ্রমে অনুষ্ঠিত বিবেকানন্দ উৎসবে মহীশূরের যুবরাজ ও দেওয়ান উপস্থিত ছিলেন। যুবরাজ আশ্রম দর্শনে এত প্রীত হন যে, তিনি স্বামী নির্মলানন্দজীকে উহার উন্নতির জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। মার্চ মাসে ঠাকুরের উৎসবের পর নির্মলানন্দজী ত্রিবাঙ্কুর যাইবার পথে ওট্টাপালমে যাত্রা-ভঙ্গ করেন। ধন্য ওট্টাপালম! কারণ উক্ত স্থানেই স্বামী নির্মলানন্দের শেষ জীবন অতিবাহিত এবং স্মৃতি মন্দির স্থাপিত হয়। তথায় একটী ক্ষুদ্র বেদান্ত সমিতি ছিল। উহা ১৯২৬ খ্রীঃ একটি আশ্রমে পরিণত হয়। স্বামী নির্মলানন্দ ত্রিবান্দ্রমে যাতায়াত করিবার পথে বহুবার ওট্টাপালমে

বিশ্রাম করেন। ১৯১৪ খ্রীঃ পূজার পূর্বে তিনি সংঘকার্যের অনুরোধে বেলুড় মঠে উপস্থিত হন। সেই বৎসর বেলুড় মঠে প্রতিমায় দুর্গাপূজা হয়। বিজয়া দশমীর দিন প্রতিমা-বিসর্জনান্তে গুরুভ্রাতাগণ প্রেমানন্দে নৃত্য করেন। প্রথমে ইহা প্রস্তাবিত হয় যে, স্বামী প্রেমানন্দ শিব সাজিবেন। কিন্তু প্রেমানন্দজী নির্মলানন্দজীকে শিব সাজিতে অনুরোধ করেন। সকলের অনুরোধে স্বামী নির্মলানন্দ শিব সাজিয়া মঠ-প্রাঙ্গনে উচ্চাসনে বসিলেন এবং স্বামী প্রেমানন্দ তাঁহাকে পুষ্পমাল্যে ভূষিত করিলেন। তখন প্রাচীন ও নবীন সন্ন্যাসিগণ মিলিত হইয়া শিবের চতুর্দিকে প্রেমানন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। এই স্বর্গীয় দৃশ্য দর্শনে সমবেত ভক্তগণ আনন্দে আপ্লুত হইলেন।

স্বামী প্রেমানন্দ এবং তাঁহার ঈশ্বরকোটি গুরুভ্রাতাদের সম্বন্ধে স্বামী নির্মলানদ একদা বলিয়াছিলেন, "ও! তাঁরা ত সাক্ষাৎ দেবতা এবং জগতের কল্যাণার্থ মানব দেহ ধারণ করেছেন।" ইহা বিশ্বাস না করে কোন তরুণ তাঁকে বলেছিল যে, তাঁরা সাধারণ লোকের মত থাকেন। প্রেমানন্দজী উক্ত তরুণ প্রভৃতি কয়েকজন যুবককে ঢাকায় তাঁহার ঘরে নিয়ে গিয়ে দ্বার বন্ধ করে তাদের বোঝাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তারা কিছুতেই বিশ্বাস করলে না এবং তাঁর সঙ্গে তর্ক করতে লাগল। তখন প্রেমানন্দজী তাঁহাদিগকে বলিলেন, "তোমরা ইংরাজী পড়ে সবজান্তা হয়ে গেছ না?" এই বলে তিনি সর্বাপেক্ষা অবিশ্বাসী তরুণের কাঁধ ধরে সামান্য চাপ দিলেন। তৎক্ষণাৎ তাহার তর্কপ্রবণ মনোভাব চলে গেল এবং তার জীবন সম্পূর্ণ পরিবর্তিত, রূপান্তরিত হয়ে গেল। একি সাধারণ মানুষের কাজ?" স্বামী প্রেমানন্দকে নির্মলানন্দজী কত ভক্তি করিতেন তাহা নিম্নোক্ত ঘটনা হইতে উপলব্ধ হয়। বেলুড় মঠ হইতে বিদায় গ্রহণ কালে নির্মলানন্দজী আরক্তিম বদনে এবং সজল নয়নে স্বামী প্রেমানন্দকে সাষ্টাঙ্গ প্রণতি জানাইলেন। প্রণামান্তে দণ্ডায়মান হইলে উভয়ের মধ্যে কয়েকটি প্রীতিপূর্ণ বাক্য-বিনিময় হইল। তদন্তে নির্মলানন্দজী প্রেমানন্দজীকে পুনরায় সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন; যেন

প্রীতিবদ্ধ ভ্রাতৃদ্বয় পরস্পরের নিকট বিদায় লইতে অনিচ্ছুক। এইরূপে ছয় বার ভূমিষ্ঠ প্রণামান্তে স্বামী নির্মলানন্দ সেবার প্রস্থান করিলেন।

কলিকাতা হইতে কাশী যাইয়া স্বামী নির্মলানন্দ স্বামী ব্রহ্মানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করেন। বাঙ্গালোর আশ্রমের অধ্যক্ষরূপে নির্মলানন্দজীকে নূতন নূতন ভূসম্পত্তি গ্রহণ করিতে হইত। আশ্রম-ভূমি বাঙ্গালোর রামকৃষ্ণ মিশন ইনষ্টীটিউটের অধ্যক্ষের নামে রেজিষ্টার্ড ছিল। কিন্তু নির্মলানন্দজী সংঘাধ্যক্ষের নিকট হইতে কোন আইন-সঙ্গত নিয়োগ-পত্র এতদিন পান নাই। সেই জন্য বৈষয়িক কাজকর্মে বিশেষ অসুবিধা হইত। ১৯১৪ খ্রীঃ অক্টোবর মাসে ব্রহ্মানন্দজী নির্মলানন্দজীকে যে নিয়োগ-পত্র লিখিয়া দেন তাহাতে নির্মলানন্দজী ঠাকুর পরমহংস রামকৃষ্ণের শিষ্যরূপে উল্লিখিত। ১৯১৫ খ্রীঃ মার্চ মাসে স্বামী নির্মলানন্দ মালাবারে কুইলাণ্ডি সহরে যাইয়া একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। কেরল দেশে স্থানীয় ভাষায় ভাব প্রচারার্থ ১৯১৫ খ্রীঃ বিজয়া দশমী দিবসে 'প্রবুদ্ধ কেরলম্' নামক মালয়ালয়ম মাসিক পত্রিকা তৎকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। উক্ত মাসিক অদ্যাপি প্রচলিত। ইহার দ্বারা সমগ্র কেরলের জনসাধারণের মধ্যে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাব-ধারা ব্যাপকভাবে প্রচারিত হইয়াছে। এইবার তিনি কোট্টায়াম্ গিয়াছিলেন। তথায় বহু দেশীয় খ্রীষ্টানদের নিবাস ছিল। তথায় তিনি বেদান্ত প্রচার দ্বারা খ্রীষ্টানদিগকে হিন্দুভাবে উদ্বুদ্ধ করেন।

দক্ষিণ কানাড়ায় যাইয়া তিনি কয়েকটি দেশীয় খ্রীষ্টানকে বৈদিক অনুষ্ঠান দ্বারা পুনরায় হিন্দু সমাজে স্থান দেন। ত্রিবান্দ্রম্ সহরের পাঁচ মাইল দূরে পার্বত্য জঙ্গলে ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে পাঁচ একর ভূমি সংগৃহীত হয়। সুদীর্ঘ সাত বৎসর চেষ্টার ফলে তথায় যে আশ্রম-গৃহ নির্মিত হয় উহার দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন তদানীন্তন সংঘগুরু স্বামী ব্রহ্মানন্দ ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে। আশ্রমগৃহের দেওয়ালাদি প্রস্তর নির্মিত। বহু পরিশ্রমে এবং বহু সহস্র টাকা ব্যয়ে স্বামী নির্মলানন্দ উক্ত আশ্রম নির্মাণ করেন এবং সংঘগুরুর স্মৃতিরক্ষার্থ উহার নাম রাখেন ব্রহ্মানন্দ আশ্রম। এরূপ কারুকার্য্য খচিত সুদৃশ্য সুবৃহৎ

আশ্রম রামকৃষ্ণ সংঘে অতি অল্পই আছে। স্বামী ব্রহ্মানন্দ এবং স্বামী বিজ্ঞানানন্দ সংঘাধ্যক্ষরূপে তথায় কয়েকবার পদার্পণ করেন। স্বামী নির্মলানন্দ কেরল দেশে যত্র যত্র আশ্রম স্থাপন করেন তত্র তত্র শত শত নরনারী তাঁহার পরম ভক্ত হইয়াছিলেন। ভক্তদিগকে তিনি পরম স্নেহে ও সমাদরে আপ্যায়িত করিতেন। তাঁহারা যে সব খাদ্য খাইতে ভালবাসিতেন সেই সমস্ত অন্নব্যঞ্জন, বিশেষতঃ কফি, স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়া তিনি তাঁহাদিগকে খাওয়াইতেন। সপ্রেম আতিথেয়তা তাঁহার জন্মগত ছিল। রামকৃষ্ণ সংঘের বহু সাধু তাঁহার নিকট আতিথেয়তা শিক্ষা করিয়াছেন।

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে সংঘজননী কলিকাতায় অন্তিম শয্যায় শায়িত হন। এই সংবাদ পাইয়া নির্মলানন্দজী কলিকাতায় সত্বর উপস্থিত হন এবং শ্রীমাকে শেষ দর্শন করেন। শ্রীমা যখন বাঙ্গালোরে পদার্পণ করেন তখন নির্মলানন্দজী সদানন্দ ও সমুৎফুল্ল হন। শ্রীমা যখন বাঙ্গালোর সহরের রাজপথে গাড়ীতে বেড়াইতে বাহির হইতেন তখন নির্মলানন্দজী লাঠি হাতে করিয়া শ্রীমার দেহরক্ষীর মত গাড়ীর পাশে পাশে চলিতেন। তিনি শ্রীমাকে স্বীয় গর্ভ-ধারিণীর ন্যায় ভক্তি করিতেন। মাতার অদর্শনে মাতৃগতপ্রাণ সন্তান চারিদিক অন্ধকার দেখিলেন। সংঘগুরু ব্রহ্মানন্দজীর প্রতিও নির্মলানন্দজীর শ্রদ্ধাভক্তি অতুলনীয় ছিল। স্বামী ব্রহ্মানন্দ যখন ১৯২১ খ্রীঃ বাঙ্গালোর আশ্রমে অবস্থান করেন তখন নির্মলানন্দজী স্বয়ং বাজারে যাইয়া তাঁহার জন্য ভাল ভাল জিনিষ কিনিয়া আনিতেন এবং তাঁহার আহারাদির তত্ত্বাবধান করিতেন। ইহা জানিতে পারিয়া ব্রহ্মানন্দজী তাঁহাকে একদিন বলিলেন, "ভাই, আমি শুনেছি যে, তুমি নিজে বাজারে গিয়ে আমার জন্য জিনিষ পত্র কিনে এই রৌদ্রে আশ্রমে বয়ে আন। শুধু আমাকে নয়, আমার সঙ্গে যারা এসেছে তাদের প্রত্যেককেই তুমি এইরূপ সপ্রেম যত্ন কর। বিনা প্রয়োজনে তুমি আমাদের জন্য কেন অত কষ্ট স্বীকার কর?" স্বামী নির্মলানন্দ সবিনয়ে উত্তর দিলেন, "মহারাজ, একি কষ্ট! আমার পরম সৌভাগ্য যে, আপনাকে সেবা করবার এই

সামান্য সুযোগ পেয়েছি। দয়া করে আপনি বিরক্ত হবেন না। এই শুভ সুযোগের সদ্ব্যবহার করে আমাকে ধন্য হতে দিন।"

১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী নির্মলানন্দ স্থানীয় ভক্তদের অনুরোধে কোয়েম্বাতুর গমন করেন। কোয়েম্বাতুর হইতে তিনি নীলগিরি পাহাড়ে কুন্নুরে যান। স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া স্বামী ব্রহ্মানন্দ তাঁহাকে দীক্ষাদি দানের অনুমতি ইতোপূর্বেই দিয়াছিলেন। তাঁহার অন্তর্ধানের পর স্বামী নির্মলানন্দ ১৯২৩ খ্রীঃ ডিসেম্বর মাসে হরিপাদ আশ্রমে অনেকগুলি গৃহত্যাগী শিষ্যকে ব্রহ্মচর্য্য ও সন্ন্যাস ব্রতে দীক্ষিত করেন। একদিন নূতন সন্ন্যাসী শিষ্যগণ পরস্পরের মধ্যে আলোচনা করিতে ছিলেন কি ভাবে তাঁহারা এখন জগতে বাস করিবেন। দূর হইতে ইহা শুনিয়া তাঁহাদিগকে ডাকিয়া তিনি বলিলেন, "তোমরা পোষ্টম্যানদের মত হও। পোষ্টম্যানরা কিরূপে চিঠিপত্র বিলি করে দেখনি? চিঠি যতই জরুরী বা দরকারী হোক না কেন, যে পোষ্টম্যান তাহা বিলি করে সে বিশিষ্ট ব্যক্তি বলে বিবেচিত হয় না। ঠাকুর ও স্বামিজীর ভাব তোমরা সেইভাবে প্রচার কর, শিক্ষকরূপে নয়, বাহকরূপে।" কেরল দেশে স্বামী নির্মলানন্দের অসংখ্য গৃহী ও সন্ন্যাসী শিষ্য আছেন। তিনি যখন মন্ত্রদীক্ষা, ব্রহ্মচর্য্য ও সন্ন্যাস দিতেন তখন বিবেকানন্দ স্বামিজীর কোন শিষ্য তদ্রূপ করিতেন না; কেবলমাত্র ঠাকুরের শিষ্যগণেরই সেই অধিকার ছিল। সম্ভবতঃ ১৯২৫ খ্রীঃ প্রবুদ্ধ কেরলম্ কার্য্যালয়ের জন্য এলেপ্পিতে স্থায়ী গৃহ পাওয়া যায়। উক্ত গৃহে পূর্বস্থান হইতে প্রবুদ্ধ কেরলম্ কার্য্যালয় আনিয়া স্থাপিত হয়। যে আশ্রমে কার্য্যালয় অবস্থিত তাহার নাম রাখা হয় যোগানন্দ আশ্রম। ১৯২৫ খ্রীঃ অক্টোবর মাসে পূর্ণিমা দিবসে ঠাকুরের ঈশ্বরকোটি শিষ্য স্বামী প্রেমানন্দের নামে মুটমে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয় স্বামী নির্মলানন্দের অলৌকিক প্রেরণায়।

স্বামী ব্রহ্মানন্দের দেহত্যাগের পর স্বামী শিবানন্দ বেলুড় মঠের দ্বিতীয় অধ্যক্ষপদে আরূঢ় হন। ১৯১৪ খ্রীঃ জুলাই মাসে স্বামী শিবানন্দ দক্ষিণ ভারত ভ্রমণের উদ্দেশ্যে বাঙ্গালোরে উপস্থিত হন। তিনি কেরলদেশস্থ

কয়েকটি আশ্রম দেখিয়া প্রীতি লাভ করেন। ১৯২৪ খ্রীঃ আগস্ট মাসে সংঘ-সম্পাদক স্বামী সারদানন্দের নির্দেশে নির্মলানন্দজী কলিকাতায় উপস্থিত হন এবং তখন হইতে প্রায় দশ মাস উত্তর ভারত ভ্রমণ করেন। এই সময় তিনি পাটনা, কাশী, ঢাকা, কুমিল্লা, দিনাজপুর প্রভৃতি স্থানে গিয়াছিলেন। তিনি যেখানেই যাইতেন সেখানেই স্থানীয় ভক্তবৃন্দ ও জনসাধারণ তাঁহার পূত স্পর্শে অপূর্ব প্রেরণা পাইতেন এবং ধর্মভাবের ব্যাপক ও গভীর প্লাবন আসিত।

বোম্বাইর প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী স্যার ঈশ্বরদাস লক্ষ্মীদাস এবং তৎপুত্র শেঠ পুরুষোত্তমদাস ঈশ্বরদাস ১৯২২ খ্রীঃ বাঙ্গালোরে আসিয়া প্রায় দেড় বৎসর অবস্থান করেন স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য। তাঁহারা যে বাড়ীতে থাকিতেন তাহা স্থানীয় রামকৃষ্ণ আশ্রমের সম্মুখে অবস্থিত ছিল। তখন স্বামী নির্মলানন্দের সহিত তাঁহাদের যে ঘনিষ্ঠ পরিচয় তাহা অচিরে সুগভীর সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতিতে পরিণত হইয়াছিল। নির্মলানন্দজী তাঁহাদের ধর্মগুরু, পরামর্শদাতা ও পরমাত্মীয়-রূপে শ্রদ্ধা পাইতেন। তাঁহাদের অনুরোধে তিনি ১৯২৫ খ্রীঃ বোম্বাইতে যান। ১৯২৬ খ্রীঃ বেলুড় মঠে রামকৃষ্ণ সংঘের যে সাধুসম্মেলন হয় তাহাতে তিনি উপস্থিত ছিলেন এবং বক্তৃতাদি দেন। উক্ত বৎসর ডিসেম্বর মাসে তিনি কেরলদেশে ওট্টাপালমে যাইয়া নিরঞ্জন আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত আশ্রম ভারত নদীর পূর্ব তীরে নির্জন প্রান্তরে অবস্থিত। ১৯২৭ খ্রীঃ কুর্গ প্রদেশে পোনাম্পেট নামক গ্রামে তৎকর্তৃক একটী আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। উহাতে মৌমাছির চাষ হইয়া থাকে। ১৯২৭ খ্রীঃ স্বামী সারদানন্দ কলিকাতায় শেষ অসুখে শয্যাশায়ী হন। তাঁহাকে দেখিবার জন্য নির্মলানন্দজী মান্দ্রাজ ও বোম্বাই হইয়া কলিকাতায় যান। সন্ন্যাস-রোগের আক্রমণে বাক্‌শক্তিহীন হইয়া সারদানন্দজী শরশয্যাশায়ী ভীষ্মবৎ শায়িত ছিলেন। নির্মলানন্দজী তাঁহার পার্শ্বে উপস্থিত হইতেই সারদানন্দজী স্তিমিত নয়ন মেলিয়া চাহিলেন এবং উভয়ের চক্ষু দিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল। স্বামী সারদানন্দের মহাপ্রয়াণে নির্মলানন্দজীর বুক ভাঙ্গিয়া গেল।

১৯২৭ খ্রীঃ উত্তর ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ ভ্রমণান্তে নির্মলানন্দজী ডিসেম্বর মাসে রেঙ্গুনে উপস্থিত হন। রেঙ্গুন হইতে তিনি মান্দালয়, আকিয়াব প্রভৃতি স্থানে যান। তিনি যখন কাশী হইতে ব্রহ্মদেশে যাইতেছিলেন তখন তাঁহার মূত্রে শতকরা ২৮ অংশ শর্করা ছিল। ডাক্তার তাঁহাকে সুদীর্ঘ ভ্রমণে যাইতে নিষেধ করায় তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের যন্ত্র-মাত্র। যতদিন দেহ থাকবে ততদিন তাঁর সেবা হতে বিরত হবো না। আমি বহুমূত্র বা অন্য রোগ গ্রাহ্য করি না।" রেঙ্গুনের সর্বশ্রেণীর নাগরিকগণ মিলিত ভাবে তাঁহাকে একটী অভিনন্দন-পত্র দেন। রেঙ্গুন সেবাশ্রমের তদানীন্তন অধ্যক্ষ স্বামী শ্যামানন্দের সহিত তিনি ব্রহ্মদেশের নানা প্রসিদ্ধ স্থান পরিদর্শন করেন। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের শেষে তিনি দ্বিতীয় বার রেঙ্গুন গিয়াছিলেন। ১৯৩৩ খ্রীঃ তিনি তৃতীয় বার রেঙ্গুন যান হিন্দু সভায় পৌরোহিত্য করিবার জন্য। ইতো-পূর্বেই বিবেকানন্দ মিশন প্রতিষ্ঠিত হয় কলিকাতায়। উক্ত মিশন রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। স্বামী নির্মলানন্দ বেলুড় মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন পরিত্যাগপূর্বক বিবেকানন্দ মিশনের অধ্যক্ষপদে আরূঢ় হন এবং জীবনের অবশিষ্ট কাল উক্তপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

১৯৩৫ খ্রীঃ জুন মাসে তিনি বাঙ্গালোর আশ্রম চিরতরে ত্যাগ করিয়া ত্রিবান্দ্রম ব্রহ্মানন্দ আশ্রমে উপস্থিত হন। তথায় সেবার তিনি ছয়টী শিষ্যকে সন্ন্যাস-ব্রতে দীক্ষিত করেন। তিনি এই বৎসর বোম্বাই হইয়া কলিকাতায় যান এবং বাংলায় সুদীর্ঘ ভ্রমণান্তে কলিকাতায় ফিরিয়া অসুস্থ হইয়া পড়েন। তাঁহার অবস্থা অতিশয় আশঙ্কাজনক হইয়া উঠিল। কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক স্যার নীলরতন সরকার এবং ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় উভয়ে তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়া একমত হইয়া বলিলেন, "এই অসুখ মারাত্মক।" তিনি এত দুর্বল হইয়াছিলেন যে, নড়াচড় ত দূরের কথা, কথা বলিতেও পারিতেন না।" উপরোক্ত ডাক্তারদ্বয়ের অভিমত তাঁহার কর্ণগোচর হইলে তিনি কোন ভক্ত চিকিৎসককে ডাকিয়া বলিলেন, "তোমরা ভেবো না। আমি এখন মরবো না! ঠাকুরের আর কিছু কাজ বাকী আছে। তা শেষ করে যাবোত

বড় বড় ডাক্তাররা যা বলে বলুক। আমি তাদের চিকিৎসা চাই না, আমি সামান্য সাধু। তুমিই আমার চিকিৎসা কর। দরকার হলে ইনজেক্সন দাও। ভয় পেয়ো না।” সম্ভবতঃ কোন দিব্যাদেশে তিনি স্বীয় আরোগ্যের নিশ্চয়তা জানিতে পারেন। তাঁহার কথাই সত্য হইল। কিছুদিনের মধ্যে তিনি সুস্থ হইয়া উঠিলেন। অনন্তর তিনি ত্রিবান্দ্রম আশ্রমে যাইয়া পাঁচ মাস বিশ্রাম করেন। তথা হইতে ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে তিনি ওট্টাপালমে উপস্থিত হন।

ওট্টাপালমে স্বামী নির্মলানন্দের অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত হয়। তিনি তথায় স্থানীয় বালকদের জন্য নিরঞ্জন বিদ্যালয় এবং বালিকাদের জন্য সারদা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। সেই সময় কুমারী-পূজা তাঁহার অন্তিম জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তিনি বিশজন কুমারীকে সর্বোপচারে পূজা এবং সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করেন। পূজিতা কুমারীদের মধ্যে নয়জন বাকী জীবনে তাঁহার সঙ্গিনী ও সেবিকা হইয়াছিল। ঠাকুরের জীবন ও বাণী অশিক্ষিত আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাদের মধ্যে প্রচারার্থ তিনি কথকতা বা কালক্ষেপের ব্যবস্থা করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি ঠাকুরের জীবনীর বিশিষ্ট অংশগুলি মালয়ালম ভাষায় লিখিত এবং আশ্রমে দুইবার ব্যাখ্যাত করেন। কুমারীপূজার দিন হইতে ভক্তবৃন্দ ও শিষ্যগণ বুঝিলেন, তিনি মহাপ্রয়াণের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। ওট্টা-পালম আশ্রমের দক্ষিণে অবস্থিত শিবমন্দির ও তৎসংলগ্ন নাট্যমন্দির মেরামত হইতেছিল। সন্ন্যাসী শিষ্যদ্বয় দেওয়াল-গাঁথা ও কাঠের কাজ প্রভৃতি তাঁহার নির্দেশে করিতেছিলেন। আশ্রমের কোন ভক্ত অতিথি পার্শ্বে দাঁড়াইয়া উহা দেখিতেছিলেন। তিনি মনে মনে ভাবিলেন, 'কেন স্বামিজী সন্ন্যাসী শিষ্যদের দ্বারা এই সকল কাজ করাইতেছেন।' তাঁহার ভাবনা শেষ হইতে না হইতে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন স্বামিজী তাঁহার মনোভাব জানিতে পারিয়া বলিলেন, “দেখ, প্রত্যেক শিল্পকলা মঠে ও আশ্রমে সন্ন্যাসীদের দ্বারাই পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়। রোমে মদ-তৈরী করার কাজ পূর্ণতালাভ করেছিল। রোমে সেই প্রাচীন প্রথা অদ্যাপি প্রচলিত। সেইজন্য আমি আমার তরুণ শিষ্যগণের দ্বারা কাঠের কাজ,

ছবি আঁকা, দেওয়াল গাঁথা প্রভৃতি করাইতেছি।" ভক্তগণের অনুরোধে স্বামী নির্মলানন্দ ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমাংশে বোম্বাইতে যান এবং ওট্টাপালমে ফিরিবার পথে সালেম আশ্রম পরিদর্শন করেন। তাঁহার শরীর জীর্ণ শীর্ণ হইয়াছিল কঠোর পরিশ্রম, কঠিন অসুখ এবং সুদীর্ঘ ভ্রমণ দ্বারা এবং তাঁহার বয়স তখন ৭৪ বৎসর হইয়াছিল। ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেসের সংবাদদাতা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া লিখিয়াছিলেন, "এই বৃদ্ধ বয়সে তাঁহাকে গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটলের মত মহামনীষি দেখাইতেছিল।"

কলিকাতায় কঠিন অসুখের পর স্বামী নির্মলানন্দ পূর্ব স্বাস্থ্য আর কখনো ফিরিয়া পান নাই। তিনি জীর্ণ শীর্ণ দেহ লইয়া ওট্টাপালমে প্রত্যাগত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার বাক্যে, কণ্ঠস্বরে ও কর্মে পূর্ব শক্তি ও তেজ অক্ষুণ্ণভাবে প্রকাশিত হইত। তিনি বুঝিলেন যে, তাঁহার জীবন-প্রদীপ নির্বাণোন্মুখ। কখনো কখনো বিরক্ত হইয়া তাঁহার বয়স্ক সন্ন্যাসী শিষ্যগণকে তিনি বলিতেন, "আমি শীঘ্রই চলে যাবো। তখন তোমরা স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারবে।" ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসী শিষ্যদের প্রতি স্নেহ ও মমতায় তাঁহার হৃদয় পরিপূর্ণ ছিল। তাঁহাদের দিকে সস্নেহ দৃষ্টিতে তাকাইয়া একদিন তিনি কোন বৃদ্ধ বন্ধুকে বলিয়াছিলেন, "আমি চলে গেলে কে এদের দেখবে?" আর একদিন তিনি প্রধান সন্ন্যাসী শিষ্যদিগকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মৎপ্রতিষ্ঠিত আশ্রমগুলি সম্বন্ধে কি করা উচিত তোমরা প্রত্যেকে পৃথক্ ভাবে আমাকে জানাবে। কাহারো সহিত পরামর্শ করিও না। আমি চিরপ্রয়াণের জন্য প্রস্তুত।" শিষ্যবৃন্দ এই ভাবে আদিষ্ট হইয়া স্ব স্ব অভিমত মহাপ্রয়াণোন্মুখ শ্রীগুরুদেবকে জানাইলেন। ১৯৩৮ খ্রীঃ ৫ই মার্চ মহাপ্রয়াণের পাঁচ সপ্তাহ পূর্বে তিনি 'বিবেকবাণী' পত্রিকার সম্পাদকের সহিত আলাপ করিবার সময়ও বলিয়াছিলেন, "আমি শীঘ্রই দেহরক্ষা করবো। কবে করবো, কে জানে?" এই ভাবে স্বামী নির্মলানন্দ মহাপ্রয়াণের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত বহুবার দিয়াছিলেন।

মহাপ্রয়াণের কয়েক দিন পূর্বে একটী আশ্রম-ভৃত্য আকস্মিক দুর্ঘটনায় দেহত্যাগ করে। উহাতে নির্মলানন্দজী মর্মাহত হন এবং উহার শোকসন্তপ্তা

জননীকে প্রচুর অর্থ দিয়া সান্ত্বনা দেন। ইহার পরেই নির্মলানন্দজী অসুস্থ হইয়া পড়েন। ২০শে এপ্রিল প্রাতে তিনি জোলাপ লইলেন, কিন্তু কোষ্ঠ পরিষ্কার হইল না। বৈকাল চারটায় ডাক্তার ডাকা হইল। ডাক্তার আসিয়া তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়া ড্রুস দিলেন। দেহের উত্তাপ কমাইবার জন্য তিনি একটী কুইনাইন ইনজেকসন দিতে চাহিলেন। কিন্তু বৃদ্ধ রোগীর কষ্ট হইবে ভাবিয়া তিনি ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। তৎক্ষণাৎ ডাক্তারের মনোভাব বুঝিয়া নির্মলানন্দজী বলিলেন. "ডাক্তার আপনি ভয় পাবেন না। আপনি এই দেহে যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন। এটা আমিও নয়, আমারও নয়।" তখন ডাক্তার তাঁহাকে কুইনাইন ইনজেক্সন দিতে সাহসী হইলেন। পরদিন ২১শে এপ্রিল তাঁহার জ্বর ১০৩ ডিগ্রী হইতে ৯৯° ৫ ডিগ্রীতে নামিয়া আসিল। কিন্তু তাঁহার যে বাহুতে ইনজেকসন দেওয়া হইয়াছিল তাহা ফুলিয়া উঠিল। অন্য এক পরিচিত ডাক্তারকে আনা হইল। তিনি বাহ্য প্রয়োগার্থ ঔষধের ব্যবস্থা দিলেন। কিন্তু তাঁহার বাহুতে যে ব্যাথা বা ফোলা ছিল তাহা আদৌ কমিল না। অসুস্থ সন্ন্যাসী ডাক্তারকে বলিলেন, "আমার কাছে কতকগুলি দামী প্রলেপ এবং ঔষধ আছে। আপনি সেগুলি নিয়ে যান এবং গরীব রোগীদের দান করবেন।" বিছানায় শুইয়াই তখনো তিনি আশ্রমের অতিথিশালা ও অন্যান্য কাজের খবর লইতেছিলেন।

২২শে এপ্রিল পালাই আশ্রম হইতে একটি চিঠি আসিল। পত্রের কয়েকটি কথা স্বামিজীকে জ্ঞাপনার্থ লিখিত ছিল। যখন পত্রখানি তাঁহার নিকট আনা হইল তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "এটি কি আমাকে লেখা ?" শিষ্য উত্তর দিলেন, "আজ্ঞে না।" গুরু—তবে কেন এটী আমার কাছে এনেছ ? শিষ্য—আশ্রম-সংক্রান্ত কয়েকটি জরুরী ব্যাপার আপনাকে জানান দরকার। গুরু—"আশ্রম বা তৎসংক্রান্ত কোন ব্যাপারের সহিত আমার এখন আর কিঞ্চিৎমাত্র সম্বন্ধ নাই। প্রত্যেক আশ্রমের সাধুরাই স্ব স্ব আশ্রমের ভার গ্রহণ করুক। আমি পরম শান্তিতে ইহধাম ত্যাগ করতে চাই।" তিনি পত্রোক্ত ব্যাপার শুনিলেন না। ২৩শে তারিখে তাঁহার পায়ে ফোলা দেখা

গেল। শিষ্যগণ ইহাকে শোথ ভাবিয়া চিন্তিত হইলেন। সেবককে তিনি বলিলেন, "আমাকে কাল থেকে আর কোন ঔষধ বা পথ্য দিও না। আমাকে শান্তিতে চলে যেতে দাও।" পূর্ব্ববৎ শিশুগণ তাঁহার কাছে আসিত এবং তিনি তাঁহাদের সহিত পরমানন্দে থাকিতেন। কখনো তিনি তাহাদের লইয়া খেলা করিতেন, কখনো তাহাদিগকে গান শিখাইতেন, কখনো বা হাস্যকৌতুক করিতেন। সেদিন তাঁহাদিগকে তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি চলে গেলে তোদের আদর করে কে প্রসাদ খাওয়াবে রে!" অবোধ শিশুগণ বুঝিতে পারে নাই যে, অচিরে তাহারা তাহাদের পিতৃতুল্য স্নেহশীল স্বামিজীকে হারাইবে। ২৪শে রবিবার ত্রিবান্দ্রমের ডাঃ টাম্পিকে তার করা হইল। স্বামিজী একাধিকবার খবর লইলেন, ডাকে নূতন বাংলা পঞ্জিকা এসেছে কিনা। পঞ্জিকা আসে নাই জানিয়া তিনি পুরান ও নূতন মালয়ালম পঞ্জিকা আনাইয়া একজনের দ্বারা আসন্ন শুভ দিন দেখিলেন।

সেই রাত্রে তাঁহার মুখ-নিঃসৃত স্বগতোক্তি শোনা গেল, "কাল আর একজন ঠাকুরের কাছে চলে যাবেন।" পরদিন বেলুড় মঠের চতুর্থ অধ্যক্ষ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহাসমাধি লাভ করেন। যথাসময়ে উক্ত দুঃসংবাদ তাঁহার কাছে তারে আসিল। এই তার পাইয়া তিনি মর্ম্মাহত হইলেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ তাঁহাকে ত্রিবান্দ্রম আশ্রমের কার্য্যভার দিয়াছিলেন। ব্রহ্মানন্দজীর মহাসমাধির সংবাদ যখন বহু পূর্বে তাঁহার নিকট আসিয়াছিল তখন তিনি বলিয়াছিলেন, "জীবনে আর আমার কোন টান নাই। তবে তাঁর কাজ শেষ করে যাব। তাঁর সামান্য শুভেচ্ছা আমার কাছে দেবাদেশতুল্য।" ১৪শে তারিখে তিনি বলিয়াছিলেন, "হাঁ, ত্রিবান্দ্রমের কাজও সমাপ্ত। আমি এখন নিশ্চিন্ত।" রবিবার রাত্রি কোন রকমে অতিবাহিত হইল। ২৫শে তারিখে তাঁহাকে সতেজ, সতর্ক, সজ্ঞান ও গম্ভীর দেখা গেল। সেদিন কিঞ্চিৎ সোডা ওয়াটার বা কমলা লেবুর রস ব্যতীত কোন ঔষধ বা পথ্য খাইলেন না। সেবক সোডা ওয়াটারের সহিত একটু ঔষধ দিতে চাহিলে তিনি তাঁহাকে তিরস্কার করিলেন। দেহ-দৌর্বল্য সত্ত্বেও তিনি অন্তিমকালে ধ্যানমগ্ন ছিলেন। সোমবার সকাল

দশটায় ডাক্তার টাম্পি আসিলেন ও স্বামিজীকে পরীক্ষা করিলেন এবং মহাসমাধির আসন্নতা বুঝিলেন।

সোমবার রাত্রিশেষে সেবক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্বামিজী, একটু সোডা ওয়াটার খাবেন ?" স্বামিজী জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন ক'টা বাজে ?' সেবক উত্তর দিলেন, "এখন চারটা।" ইহা শুনিয়া স্বামিজী নীরব রহিলেন। মঙ্গলবার একাদশী, হরিবাসর। সকালে বালকবালিকাগণ স্নানান্তে আসিয়া মুমূর্ষু সন্ন্যাসীর কাছে বসিয়া পূর্ববৎ ভজন ও কীর্তন গাহিতে লাগিল। ডাঃ টাম্পি আসিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন মহাপ্রয়াণ সমাসন্ন। সকাল সাতটায় তিনি একটু উঠিয়া বসিতে চেষ্টা করিলেন। জনৈক শিষ্য তাঁহাকে ধীরে ধীরে উঠাইলেন এবং ধরিয়া বসাইলেন। তখন স্বামিজী ক্ষীণকণ্ঠে তিনবার বলিলেন, "হাঁ হাঁ হাঁ তা সত্য।" ইহাই তাঁহার মুখ-নিঃসৃত শেষ উক্তি। যে মুখ হইতে বিগত সুদীর্ঘ অর্ধ শতাব্দী যাবৎ জ্ঞান-গর্ভ উপদেশ অনর্গল বাহির হইয়াছিল তাহা চিরতরে বন্ধ হইল। একটু পরে তিনি পুনরায় শুইয়া পড়িলেন। গঙ্গাজল ও চরণামৃত তাঁহার মুখে দেওয়া হইল। পরম প্রশান্তি ও দিব্যজ্ঞানে তাঁহার মুখমণ্ডল সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। স্বামী নির্মলানন্দ পঁচাত্তর বৎসর বয়সে মহাসমাধিতে নিমগ্ন হইলেন।

বালকবালিকাগণ তাঁহাকে শেষ প্রণতি জানাইল।—

"নির্মলং হৃদয়ং যস্য গুরোরাজ্ঞানুবর্তিনে।
নির্মলানন্দপাদায় তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥"

সমবেত সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও গৃহী শিষ্যগণের মুখে বার বার উচ্চারিত হইল, "জয় শ্রীগুরু মহারাজজী কি জয়। জয় শ্রীস্বামিজী মহারাজজীকি জয়।" জয়ধ্বনি ও কীর্তনে আশ্রম-প্রাঙ্গন মুখরিত হইল। বৈকাল তিনটায় একাদশী অতীত হইলে মৃতদেহ সুস্নাত এবং নব বস্ত্রে ও মাল্যে সুভূষিত হইল। শোকমগ্ন শিষ্যগণ গুরুদেবকে পূজা, আরাত্রিক ও প্রণাম করিলেন। পুণ্যতোয়া ভারত নদীর তীরে চন্দন কাষ্ঠের চিতা সজ্জিত ও তদুপরি শবদেহ প্রজ্জ্বলিত হইল। সন্ধ্যার মধ্যেই স্বামী নির্মলানন্দের স্থূল দেহ পঞ্চভূতে বিলীন হইয়া গেল।

মহাপ্রয়াণের সপ্তম দিবসে ২রা মে তাঁহার শিষ্য ও ভক্তগণ গুরুর পূত ভস্মাস্থি আশ্রম-প্রাঙ্গনে প্রোথিত করিলেন। ত্রয়োদশ দিবসে উক্ত আশ্রমে ঠাকুরের বিশেষ পূজা ও দরিদ্র নারায়ণ সেবা হইল। ওট্টাপালম আশ্রমে স্বামী নির্মলানন্দের স্মৃতি-মন্দির নির্মিত হইয়াছে। দক্ষিণ ভারতের সুদূর প্রান্তে বাঙ্গালী সন্ন্যাসীর এই স্মৃতি মন্দিরটি বাঙ্গালীর পুণ্য তীর্থ।

তেতাল্লিশ

উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব

বাংলায়, তথা ভারতে যাঁহারা নবযুগের প্রবর্তকরূপে অমর হইয়াছেন উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব তাঁহাদের অন্যতম। স্বামী রামতীর্থের ন্যায় তিনিও যুগাচার্য বিবেকানন্দের পদাঙ্ক অনুসরণপূর্বক বিদেশে যাইয়া বেদান্ত প্রচার করিয়াছিলেন। জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন, এবং 'সন্ধ্যা' প্রভৃতি পত্রিকা পরিচালনাদি কার্য্য দ্বারা বাংলায় তিনি নবযুগ প্রবর্তনের উদ্‌যোগ করেন। জার্মান ও ইংরাজি ভাষায় ব্রহ্মবান্ধবের বিস্তৃত জীবনী প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি বিবেকানন্দের বাল্যবন্ধু ও প্রিয়তম সহপাঠী ছিলেন। উভয়ের সঙ্গে সম্ভবতঃ ১৮৮০ খ্রীঃ প্রথম সাক্ষাৎ হয়। অচিরে তাঁহাদের পরিচয় ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বে পরিণত হয়। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত উভয়ে পরস্পরকে পূর্ব নাম ধরিয়া ডাকিতেন। উভয়ে বাল্যে ব্যায়াম-প্রিয় ছিলেন। বিবেকানন্দ লাঠি খেলিতে এবং ব্রহ্মবান্ধব কুস্তি করিতে ভালবাসিতেন। সেই যুগের যুক্তিবাদ ও সন্দেহবাদ উভয়কেই প্রভাবিত করে।

কিন্তু গভীর ধর্মভাবের ফলে উভয়েই উক্ত প্রভাব হইতে অচিরে মুক্ত হন। কলিকাতার সহরতলীতে কোন বাগানবাটীতে যাইয়া বন্ধুদের সঙ্গে উভয়ে চড়ুইভাতি করিতেন। উভয়ে মিলিত হইলে ধর্ম, সমাজ, রাষ্ট্রনীতি, দর্শন প্রভৃতি বিষয় আলোচনা করিতেন। উভয়ে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন এবং তথায় প্রিয়নাথ মল্লিকের মাধ্যমে কেশবচন্দ্র সেনের সহিত পরিচিত হন। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে যখন কেশবচন্দ্র কর্তৃক কমল কুটীরে 'নব বৃন্দাবন' নাটক অভিনীত হয় তখন বিবেকানন্দ ওরফে নরেন্দ্রনাথ যোগীর অভিনয় করেন এবং ব্রহ্মবান্ধব ওরফে ভবানী অভিনয়ের জন্য টিকিট বিক্রয় করেন। ভবানী কেশবচন্দ্রের প্রতি অনুরক্ত রহিলেন, কিন্তু নরেন্দ্রনাথ রামকৃষ্ণ পরমহংসকে গুরুরূপে বরণ করেন। স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকায় বেদান্ত প্রচারান্তে স্বদেশে ফিরিয়া আসিলে ব্রহ্মবান্ধব তাঁহার সহিত আলমবাজার ও বেলুড় মঠে এবং কলিকাতায় বহুবার সাক্ষাৎ করেন। কর্মপ্রণালী সম্বন্ধে মতভেদ হওয়ায় ব্রহ্মবান্ধব তাঁহার সঙ্গে কর্মক্ষেত্রে নামিতে সমর্থ হন নাই।

কেশবের সংস্পর্শে থাকিয়া ব্রহ্মবান্ধব শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত পরিচিত এবং তৎপ্রতি ভক্তিমান্ হন। কেশবের সহিত তিনি বহুবার পরমহংসদেবকে দর্শন এবং তাঁহার সমাধি দর্শনে ও উপদেশ শ্রবণে গভীর ভাবে প্রভাবিত হন। পরবর্তী জীবনে ব্রহ্মবান্ধব লিখিয়াছিলেন, "রামকৃষ্ণ কে? তিনি কে তাই জানি না। এই পর্য্যন্ত জানি যে, এই সোনার বাংলায় এমন সোনার চাঁদ গোরাচাঁদের পর আর উদয় হয় নাই! চাঁদেও কলঙ্ক আছে, কিন্তু রামকৃষ্ণ-চাঁদে কলঙ্করেখাটুকুও নাই। আহা! তাঁহার ভাগবতী তনু পাবকের ন্যায় পবিত্র ও নির্মল ছিল।....রামকৃষ্ণ ব্রহ্মবিজ্ঞানী। তিনি সাধকচূড়ামণি। উচ্ছাসময়ী, আবেগময়ী, ভাবময়ী, সাধনার বলে তিনি সকল সম্প্রদায়ের বিশেষ বিশেষ ভাব আহরণ করিয়া তাঁহার ব্রহ্মবিজ্ঞানের পূর্ণতা প্রকট করিয়াছিলেন। ভগবান রামকৃষ্ণ নিজ জীবনে অচল অটল ব্রহ্মবিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া সনাতন আর্য্যধর্মের পারম্পর্য্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সকল ভেদভাবকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। তিনি নবাগত শক্তির খেলাকে অদ্বৈতবিলাসিনী করিয়া ভারতকে ধন্য

করিয়াছেন। রামকৃষ্ণ কামিনী-কাঞ্চন বিজয়ী, ব্রহ্মবিজ্ঞানী, ভক্তচূড়ামণি, লোকরক্ষার সেতু এবং ভাবসমন্বয়ের মহাসাগর। নমস্তে রামকৃষ্ণায়।"

শোনা যায়, বালক ব্রহ্মবান্ধবের পিঠের উপর শ্রীরামকৃষ্ণ ক্রীড়াচ্ছলে ঘোড়ায় চড়ার মত বসিয়াছিলেন এবং খেলা করিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সমন্বয়-ভাব বালকের পরবর্তী জীবনে অশেষ প্রকারে প্রভাবশালী হয়। উপাধ্যায়ের জীবনী বাংলায় প্রবোধ চন্দ্র সিংহ, ইংরাজিতে বি. অনিমানন্দ এবং জার্মান ভাষায় এ. ভাথ লিখিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা বাঙ্গালীরা তাঁহাকে ভুলিয়া গিয়াছি বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কই, নবযুগের এই মহাপুরুষের কোন স্মৃতি-সভা বা স্মৃতি-চিহ্ন ত কোথাও দেখা যায় না।

পশ্চিম বঙ্গে হুগলী জেলার অন্তর্গত খন্যান একটী গণ্ডগ্রাম। কলিকাতা হইতে ৩৬ মাইল উত্তরে ব্যাণ্ডেল জংশনের দুই স্টেশনের পরে খন্যান স্টেশন ইস্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে লাইনে অবস্থিত। উক্ত গ্রামে দেবীচরণ বন্দোপাধ্যায় নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার পিতা জব্বলপুরে পুলিস অফিসার শ্লীমান সাহেবের অধীনে চাকুরী করিতেন। ঠগ দমনে শ্লীমান সুনাম অর্জন করেন। ঠগ ও ডাকাত ধরিতে দেবীচরণও সুদক্ষ ছিলেন। তিনি পরে বাংলার পুলিশ বিভাগে বদ্‌লী হইয়া আসেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিখ্যাত খ্রীষ্টান প্রচারক ও সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। খন্যানে নয়া পুকুরের পার্শ্বে তাঁহাদের দোতলা পাকা বাড়ী ছিল। কিন্তু সেই বাড়ী এখন বিলুপ্ত। শোনা যায়, উহার ইঁট দিয়া খন্যান স্টেশনের কতকাংশ নির্মিত হইয়াছে। হরি-চরণ, পার্বতীচরণ ও ভবানীচরণ নামে তাঁহার তিন পুত্র ছিলেন। গৃহদেবতা কালীর নামানুসারে সম্ভবতঃ দুই পুত্রের নামকরণ হয়। কনিষ্ঠ ভবানীচরণই কালে উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব নামে প্রসিদ্ধ হন। ১৮৬১ খ্রীঃ ১১ই ফেব্রুয়ারী খন্যান গ্রামে পিতৃগৃহে ভবানী ভূমিষ্ঠ হন। ভবানীর বয়স এক বৎসর পূর্ণ হইতে না হইতেই জননী রাধাকুমারী স্বর্গতা হন। পিতামহী চন্দ্রামণির ক্রোড়েই মাতৃহীন ভবানীচরণ লালিত পালিত হন এবং ধর্মভাব শিক্ষা করেন। পিতামহী নপ্তীকে আদর করিয়া 'ভেদো' বলিয়া ডাকিতেন। মহাভারতের গল্পগুলি

শুনিতে বালক ভবানী খুব ভালবাসিতেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের বর্ণনা তাঁহার খুব মনঃপূত হইত। গ্রামের অদূরে ক্ষীণকায়া সরস্বতী নদীর তীরেই যেন তাঁহার কুরুক্ষেত্র বিরাজিত ছিল। কাকা কালীচরণ শনিবার কলিকাতা হইতে আসিতেন এবং ভ্রাতুষ্পুত্র ভবানীকে পড়াইতেন। ভবানী বুদ্ধিমান ছাত্র ছিলেন এবং বিদ্যালয়ে প্রত্যেক শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিতেন। দুরন্ত বালক দুই বড় ভাই এবং গ্রামবাসী অন্যান্য বালকদের লইয়া অপরদের বাগানের পেয়ারা, খেজুর, আম, নারিকেল প্রভৃতি ফল পাড়িয়া খাইতেন। দুরন্তপনার জন্য কখনো কখনো তাঁহাকে পিতার হাতে বেত্রাঘাত খাইতে হইত। শৈশবে কোন রবিবার বৈকালে তিনি কাকার পুরাতন ইউক্লিড জ্যামিতি দেখিয়া শ্লেটে সুন্দর চিত্র অঙ্কন করিয়াছিলেন। লেখাপড়ায়, খেলাধূলায়, বাগানের কাজে, সন্তরণে বা কুস্তীতে বা গরুর গাড়ী চালনে—সর্ব বিষয়ে তাঁহার অদম্য উৎসাহ ছিল।

কিছুদিন তিনি চুঁচুড়া হিন্দু স্কুলে অধ্যয়ন করেন। তৎপরে তাঁহার পিতা হুগলীতে বদলী হইয়া যাওয়ায় তিনি হুগলী শাখা স্কুলে ভর্তি হন। অচিরে তাঁহার বুদ্ধিমত্তা স্কুলের প্রধান শিক্ষকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যথাসময়ে তাঁহার পিতা কলিকাতায় আসেন এবং তিনি তখন জেনারেল এসেমব্লিজ ইনষ্টিটিউসনে ভর্তি হন। কিছুকাল পরে তিনি পুনরায় চুঁচুড়ায় ফিরিয়া যান এবং হুগলী কলেজিয়েট স্কুলে প্রবিষ্ট হন। উক্ত স্কুল হইতে পনের বৎসর বয়সে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তের বৎসর বয়সে উপনয়নান্তে তিনি যজ্ঞসূত্র লাভ করেন। স্কুলে পড়িবার সময় তিনি নৌকাযোগে গঙ্গা পার হইয়া ভাটপাড়ায় যাইয়া কোন পণ্ডিতের নিকট সংস্কৃত ব্যাকরণ ও সংস্কৃত সাহিত্য পড়িতেন। বাল্যে বহু বৎসর রামায়ণ ও মহাভারত মহাকাব্যদ্বয় তাঁহার অতি প্রিয় পাঠ্য পুস্তক ছিল। তের বৎসর বয়সের মধ্যে তিনি রামায়ণটি তের বার এবং মহাভারতটি সাত বার পড়িয়াছিলেন। সংস্কৃত গ্রন্থপাঠে তাঁহার অসীম অনুরাগ আজন্ম বিদ্যমান ছিল। ষোল বৎসর বয়সে তিনি হুগলী কলেজে আর্টস বিভাগে ভর্তি হন।

ভবানী যখন স্কুল ও কলেজের ছাত্র তখন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু এবং কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বক্তৃতা দ্বারা সমাজে আন্দোলন সৃষ্টি করিয়াছেন। ভবানী তাঁহাদের বহু বক্তৃতা শুনিয়াছিলেন, কিন্তু তৃপ্ত হন নাই। তিনি কলিকাতায় একদিন সুরেন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কথাপ্রসঙ্গে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, 'কলমের দ্বারা নহে, অস্ত্রের দ্বারাই স্বাধীনতা লাভ হইবে।' তেজোদ্দীপ্ত বালকের বাক্যে সুরেন্দ্রনাথ স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে যখন ভবানীর বয়স ষোল বৎসর মাত্র তখন তিনি জুলু যুদ্ধে সৈন্য হইবার জন্য চেষ্টা করেন। তিনি কমিশারী অফিসে দরখাস্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু উক্ত অফিসে তাঁহার বৈমাত্রেয় খুল্লতাত নবগোপাল কাজ করিতেন। তিনি দরখাস্ত-কারীকে নাবালক বলিয়া দরখাস্ত মঞ্জুর হইতে দেন নাই। অবশেষে ভবানী দুই তিনটি সহপাঠীকে লইয়া যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষার্থ গোয়ালিয়রে যাইতে মনস্থ করেন। উদ্দেশ্য ছিল, উক্ত বিদ্যা শিখিয়া যুদ্ধ করিয়া ইংরাজকে ভারত হইতে তাড়াইবেন।

সামান্য পাথেয় সঙ্গে লইয়া পথে নানা কষ্ট স্বীকার এবং অনাহার ও অনিদ্রা বরণ করিয়া তিনি গোয়ালিয়রে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু কোন আত্মীয় গোয়ালিয়রে যাইয়া তাঁহাদিগকে ধরিয়া বাড়ী ফিরাইয়া আনেন। তাঁহাকে কলিকাতা বিদ্যাসাগর কলেজে ভর্তি করিয়া দেওয়া হয়। উক্ত কলেজে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইংরাজীর অধ্যাপক ছিলেন। তাঁহার ইংরাজী বক্তৃতা শুনিবার জন্য ক্লাসে ছাত্রদের ভিড় হইত। কিন্তু সেই সব বক্তৃতা ভবানীর আদৌ ভাল লাগিত না। উদ্দেশ্য ব্যর্থ হওয়ায় তিনি নৈরাশ্যে অভিভূত হন এবং সিদ্ধি খাইতে আরম্ভ করেন, কিন্তু উহার অপকারিতা বুঝিতে পারিয়া অচিরে উহা ছাড়িয়া দেন। শক্তি-চঞ্চল তরুণ উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য কি করিবেন বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না।

পুনরায় গোয়ালিয়রে যাইয়া সৈন্য হইবার ইচ্ছা তাঁহার মনে জাগিল। তিনি ভাবিলেন, "সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত আইন-সঙ্গত আন্দোলন করিব না। তরোয়ালের ঝনৎকারে জগৎকে চমৎকৃত এবং ব্রিটিশ সরকারকে

স্তম্ভিত করিয়া দিব।" তখন ভবানী তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র হরিচরণের কাছে থাকিতেন। যখন হরিচরণ কনিষ্ঠের মন লেখাপড়ায় বসাইতে চেষ্টা করিলেন তখন উত্তর পাইলেন, "আমার মন লেখাপড়া হইতে উঠিয়া গিয়াছে। অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতাবলী আমাকে দেশের কথা ভাবিতে শিখাইয়াছে। নিজের কথা ভুলিয়া দেশের কথা ভাবাই এখন বড় মনে হইতেছে।" সুরেন্দ্রনাথ বক্তৃতাবলীর মধ্যে ছাত্রদিগকে প্রায়ই জিজ্ঞাসা করিতেন, "তোমাদের মধ্যে কে ম্যাট্সিনি বা গ্যারিবল্ডি হবে?" ভবানীপ্রমুখ ছাত্রগণ সোৎসাহে সমস্বরে চীৎকার করিয়া বলিতেন, "আমরা সকলেই হব। আমরা সকলেই হব।" উক্ত ভাবে ভবানী এত অভিভূত হইলেন যে, তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, "আমি বিয়ে করবো না, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দেবো না। আমার জীবন স্বদেশকে স্বাধীন করবার জন্য আমি উৎসর্গ করবো।" তখন তাঁহার বয়স মাত্র আঠার বৎসর। তিনি যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষার্থ পুনরায় গোয়ালিয়রে গেলেন, কিন্তু সৈন্যদলভুক্ত হইতে না পারিয়া ক্ষুণ্ণ মনে ফিরিয়া আসিলেন।

গোয়ালিয়র হইতে ফিরিয়া তিনি খন্যানের অদূরে মেমারীতে কিছুকাল শিক্ষকতা করেন। তথায় ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হওয়ায় তিনি বায়ু-পরিবর্তনার্থ জব্বলপুরে যান। তথায় এক সময় তাঁহার পিতামহ পুলিশ ইনস্পেক্টার ছিলেন। জব্বলপুরে কিঞ্চিৎ স্বাস্থ্যোন্নতি হইলে তিনি হরিদ্বার ও হিমালয় পরিদর্শন করেন। ভবানী ও তৎসঙ্গিগণ কর্তৃক ১৮৮৬ খ্রীঃ কলিকাতা কংকর্ড ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়। উহা হইতে 'কংকর্ড' নামে একটী পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হইত। কেশব সেনের পুত্র নন্দলাল সেন, সিন্ধুর হীরানন্দ ও ভবানী প্রভৃতি উহার প্রধান কর্মী ছিলেন। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষে উক্ত ক্লাব উঠিয়া যায়। ১৮৮১ খ্রীঃ হইতে ভবানী কেশব সেনের সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁহার মৃত্যুর প্রায় তিন বৎসর পরে ১৮৮৭ খ্রীঃ ৬ই জানুয়ারী রবিবার কমলকুটীরে নববিধান ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম আচার্য্য গৌরগোবিন্দ রায়ের নিকট ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন। ভবানী

ও **নন্দলাল** ১৮৮৮ খ্রীঃ জুলাই মাসে হীরানন্দের আহ্বানে সিন্ধুদেশে যাইয়া হায়দরাবাদে 'ইউনিয়ান একাডেমি' নামে একটী স্কুল স্থাপন করেন। বন্ধুত্রয়ের পরিচালনায় উক্ত স্কুল অল্পকালের মধ্যে সিন্ধু প্রদেশের শ্রেষ্ঠ স্কুলরূপে বিবেচিত হয়। সেই বৎসর ভবানীর পিতা মূলতানে সাংঘাতিক ভাবে অসুস্থ হন। ভবানী মূলতানে যাইয়া দিবারাত্রি রুগ্ন পিতার সেবাশুশ্রূষা করেন। পিতা তথায় লোকান্তরিত হইবার পর হরিচরণ বিধবা জননীকে লইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন এবং ভবানী হায়দরাবাদে স্বীয় কর্ম্মস্থলে ফিরিয়া যান। তথায় অবস্থান কালে তিনি গুরুদ্বারায় যাইয়া শিখধর্ম শিক্ষা করিতেন এবং সিন্ধী সুফী-কবি শাহ্ আবদুল লতিফের দরগায় যাইয়া সুফীদের গান শুনিতেন।

খ্রীষ্টান সাধু ব্রুণো ধর্মবিশ্বাসের জন্য জীবন্ত অবস্থায় দগ্ধীভূত হন। ব্রুণোর একখানি বই পড়িয়া ভবানী খ্রীষ্টান ধর্মে বিশ্বাসী হন এবং ১৮৯০ খ্রীঃ মে মাসে সিন্ধুদেশে অবস্থানকালে উক্ত ধর্মে দীক্ষিত হন। ইহার পর ইউনিয়ান একাডেমী ত্যাগ করিয়া করাচী সেণ্ট প্যাট্রিক হাই স্কুলে তিনি গণিত-শিক্ষক পদে নিযুক্ত হন। ১৮৯৪ খ্রীঃ জানুয়ারী মাসে তৎকর্তৃক 'সোফিয়া' নামক ইংরাজী মাসিক স্থাপিত হয়। এই মাসিক ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাস পর্যন্ত চলিয়ছিল। ১৮৯৪ খ্রীঃ নভেম্বর মাসে তিনি লাহোরে যাইয়া 'মানুষের শেষ' শীর্ষক একটি বক্তৃতা দেন। উহাতে আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী দয়ানন্দের ধর্মমত সমালোচিত হয়। এইজন্য আর্য সমাজের নেতৃবৃন্দ তাঁহার সহিত প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হন। ১৮৯৪ খৃঃ ডিসেম্বর মাসে তাঁহার জীবনে মহা পরিবর্তন উপস্থিত হইল। বাল্যকাল হইতে সাধুসন্তদের প্রতি তাঁহার আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল। সেই শ্রদ্ধা এখন তাঁহার জীবনে বিমূর্ত হইয়া উঠিল। তিনি সন্ন্যাসী হইয়া গেরুয়া পরিলেন এবং 'উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব' নাম লইলেন। 'সোফিয়া' মাসিকে স্বীয় নামকরণ সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছিলেন, "আমার পারিবারিক পদবী 'বন্দ্যোপাধ্যায়' এবং দীক্ষিত নাম 'ব্রহ্মবন্ধু।' পদবীর প্রথম অংশ 'বন্দ্য' বাদ দিয়া 'উপাধ্যায়' রাখিলাম। এখন আমার নাম হইল 'উপাধ্যায় ব্রহ্মবন্ধু।" পরে তিনি ব্রহ্মবন্ধুর স্থলে ব্রহ্মবান্ধব লিখিতেন। ১৮৯৫ খৃঃ সেপ্টেম্বর মাসে আজমীরে একটি ধর্ম

মহাসভা অনুষ্ঠিত হয়। তথায় আহূত হইয়া ব্রহ্মবান্ধব কয়েকটি বক্তৃতা দেন। আজমীর হইতে অমৃতসর গমনার্থ তিনি একটি টিকিট কিনিলেন। কিন্তু তিনি গেরুয়াধারী সন্ন্যাসী বলিয়া মেল ট্রেণে উঠিতে পারিলেন না। যখন তিনি মেল ট্রেণে উঠিতেছিলেন তখন পুলিশ তাঁহাকে চাবুক মারিয়া নামাইয়া দেয়। তিনি ইহা নীরবে সহ্য করিলেন এবং অশিক্ষিত স্বদেশবাসী পুলিশকে বিপদে ফেলিতে চাহিলেন না। কোন প্রভাবশালী পাঞ্জাবীর সাহায্যে তিনি কোন ক্রমে উক্ত ট্রেণে উঠিয়া বসিলেন। অমৃতসরে গমন করিয়া তিনি স্বুবর্ণ মন্দির দর্শনে আনন্দিত হন। উপাধ্যায় থিয়োজফিক্যাল সোসাইটির বিরোধী ছিলেন। ইহার বিরুদ্ধে তিনি মাদ্রাজ, বোম্বাই, লাহোর, করাচী প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করিয়া বক্তৃতা দেন।

১৮৯৬ খ্রীঃ উপাধ্যায় প্রথম বক্তৃতা-ভ্রমণে বহির্গত হন এবং বোম্বাইতে যাইয়া যে চারিটি বক্তৃতা দেন তন্মধ্যে একটির বিষয় ছিল 'সনাতন নীতি' বোম্বাই শহরের টাউন হলে জাষ্টিস রাণাডের পৌরোহিত্যে ১লা এপ্রিল তিনি যে বক্তৃতা দেন তাহার বিষয় ছিল 'অসীম ও সসীম'। ৮ই জুলাই করাচী শহরে ম্যাক্স ডেস্সো হলে প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় ছিল 'জাতীয় মহত্ব'। তিনি সুবক্তা ও সুলেখক ছিলেন। তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া ও রচনা পড়িয়া শ্রোতৃবৃন্দ ও পাঠক-পাঠিকা মুগ্ধ হইতেন। উক্ত বৎসর নভেম্বর মাসে তিনি লাহোর যাইয়া টাউন হলে যে বক্তৃতা দেন তাহাতে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় চীফ কোর্টের জজ রায় বাহাদুর পি. সি. চট্টোপাধ্যায়। মান্দ্রাজে স্বামী বিবেকানন্দ সমুদ্রতীরস্থ কার্ণন ক্যাসেলে অবস্থান করেন। উপাধ্যায় মাদ্রাজে যাইয়া উক্ত প্রাসাদে আতিথ্য স্বীকার করেন। ১৮৯৭ খ্রীঃ ডিসেম্বর মাসে তিনি বোম্বাইতে 'হিন্দুধর্ম ও খ্রীষ্টান ধর্ম' নামে একটি বক্তৃতা দেন। বোম্বাই হইতে তিনি কলিকাতায় আসিয়া স্থায়ী কর্মক্ষেত্রের অনুকূল পরিস্থিতি দেখিতে পান। এবার কলিকাতায় আসিয়া তিনি দীর্ঘকাল বাস করেন এবং সন্ন্যাসীর মত জীবন যাপন করেন।

কলিকাতায় তৎপ্রদত্ত প্রথম বক্তৃতা হয় আলবার্ট হলে। উহার বিষয়

ছিল 'বেদান্তের সিদ্ধান্ত' এবং উহাতে পৌরোহিত্য করেন তাঁহার খুল্লতাত খ্রীষ্টান মিশনারী কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। কলিকাতায় প্রদত্ত দ্বিতীয় বক্তৃতার বিষয় ছিল 'কর্মবাদ ও জাতীয় চরিত্রে উহার প্রভাব'। কলিকাতায় সকলের সঙ্গে তিনি মুক্ত ভাবে মিশিতেন এবং ধর্মার্থীদের সহিত ধর্মপ্রসঙ্গ করিতেন। ১৮৯৮ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী মাসে তাঁহার সিন্ধী শিষ্য ও সহকর্মী সন্ন্যাসী অনিমানন্দ কলিকাতায় আসেন। অনিমানন্দই তাঁহার বিস্তৃত জীবনী ইংরাজীতে প্রকাশ করিয়াছেন। গুরুশিষ্য উভয়ে খঞ্জনী বাজাইয়া এবং বাংলা ও সংস্কৃত গান গাহিয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতেন। এই সময়ে একটি মঠ স্থাপনের সঙ্কল্প তাঁহার হৃদয়ে প্রবল হয়। তিনি জব্বলপুরে যাইয়া উক্ত মঠ স্থাপনে সচেষ্ট হন। ১৮৯৯ খ্রীঃ তিনি স্বশিষ্য অনিমানন্দের সহিত মুণ্ডিত মস্তকে ও নগ্ন পদে ভিক্ষা করিয়া খাইতেন! স্বজাতির নিয়মাবলী তিনি শেষ পর্যন্ত মানিয়া চলিতেন। উক্ত বৎসর জব্বলপুরের পার্শ্ববর্তী কোন পাহাড়ে যাইয়া প্রায় চল্লিশ দিন একাহারী হইয়া ও স্বপাক খাইয়া তিনি কঠোর তপস্যা করেন। মঠ স্থাপনের অনুমতি লাভার্থ জেরুজালেম দর্শনান্তে রোমে পোপের সহিত সাক্ষাৎ করিতে তিনি ইচ্ছা করেন। মহীশূরের কোন দানশীল বন্ধু তাঁহার ইউরোপে যাত্রার ব্যয়ভার বহন করিতে স্বীকৃত হন। কিন্তু তিনি বোম্বাই যাইয়া প্রায় এক পক্ষকাল জ্বরাক্রান্ত হওয়ায় এত দুর্বল হইয়া পড়েন যে, সমুদ্র-যাত্রায় অসমর্থ হন।

১৯০০ খ্রীঃ প্রথম ভাগে উপাধ্যায় চিরতরে সিন্ধু প্রদেশ ছাড়িয়া কলিকাতায় স্থায়ীভাবে সেবা শিবির স্থাপন করেন। উক্ত বৎসর জুন মাসে তিনি 'সোফিয়া সাপ্তাহিক' নামক একটি নূতন পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করেন। কলিকাতায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। কবির পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বোলপুরে একটি নূতন বিদ্যালয় স্থাপন করিতে ইচ্ছুক হন। রবীন্দ্রনাথ ও ব্রহ্মবান্ধবের মধ্যে বিদ্যালয় সম্বন্ধে মতৈক্য হওয়ায় উপাধ্যায়ের স্কুল বোলপুরে লইয়া যাইবার কথা স্থির হয়। তাঁহারা উভয়ে বোলপুরে যাইয়া বিদ্যালয়ের জন্য উপযুক্ত স্থান দেখিয়া আসেন। ১৯০১ খ্রীঃ ডিসেম্বর মাসে উপাধ্যায়ের খ্রীষ্টান সহকর্মী রেওয়াচাঁদ ছাত্রদলকে লইয়া বোলপুরে গমন করেন। এইরূপে শান্তি

নিকেতন প্রতিষ্ঠিত হয়। শান্তিনিকেতনের নির্জন উন্মুক্ত প্রান্তরে বসিয়া রবীন্দ্রনাথ ও ব্রহ্মবান্ধব উপনিষৎ পাঠ ও আলোচনা করিতেন। রেওয়াচাঁদ কোন ছাত্রকে একটী চিত্রিত বাইবেল উপহার দেন। বালক বাইবেলের সুন্দর ছবিগুলি বারবার দেখিয়া উহার অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করে। ইহাতে গুজব রটিয়া যায় যে, রেওয়াচাঁদ ছাত্রদিগকে খ্রীষ্টান ভাবে ভাবিত করিবার জন্য সচেষ্ট। উক্ত গুজব উপাধ্যায়ের কর্ণগোচর হইলে তিনি উহা নিষেধ করিয়া রেওয়াচাঁদকে খোলা চিঠি লিখেন। ইহাতে রেওয়াচাঁদ দুঃখিত হইয়া শান্তিনিকেতন ত্যাগ করেন এবং ১৯০২ খ্রীঃ আগষ্ট মাসে স্বীয় ছাত্রদল লইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন।

১৯০১ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে উপাধ্যায়ের মনে সেবাধর্মের ভাব জাগ্রত হয়। তিনি অন্য এক বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া দ্বারে দ্বারে অর্থ ভিক্ষা করিয়া কলিকাতার অসহায়, রোগী, পঙ্গু ও বৃদ্ধদের সেবায় নিযুক্ত হন। ছিদাম মুদীর লেনে একটি ঘর ভাড়া করিয়া প্রায় বারজন আতুরকে আশ্রয় ও আহারাদি দেওয়া হয়। ইহার নাম রাখা হয় আতুর আশ্রম। দিনের পর দিন দুই বন্ধু অনাহারে থাকিতেন। একবার সাত দিন ব্রহ্মবান্ধব অন্ন গ্রহণ করিতে পারেন নাই এবং বাজার হইতে রোজ এক পয়সার মুড়ি কিনিয়া ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতেন। উক্ত বন্ধুর সহিত মতভেদ হওয়ায় উপাধ্যায় আতুরাশ্রমের সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করেন। ১৯০১ খ্রীঃ জানুয়ারী মাসে উপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 'বিংশ শতাব্দী' নামক ইংরাজী মাসিকের প্রথম সংখ্যা কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়। হিন্দু প্রজ্ঞার আলোকে বর্তমান ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার সমাধান ছিল উক্ত মাসিকের মুখ্য উদ্দেশ্য। উহার জুলাই সংখ্যায় উপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের 'নৈবেদ্য' সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ইহা পড়িয়া রবীন্দ্রনাথ অতিশয় আনন্দিত হন। উক্ত প্রবন্ধে উপাধ্যায় লিখিয়াছিলেন, "যদিও উহাতে ধর্মতত্ত্ব নাই, তথাপি তাত্ত্বিকগণের নিকট ইহা আনন্দের খনিতুল্য। ইহার ভাব এত গভীর ও উদার যে হিন্দু বা মুসলমান বা খ্রীষ্টান সকলেই ইহা পাঠে উপকৃত হইবেন।" রমেশচন্দ্র দত্ত, জার্মান পণ্ডিত- উইণ্টারনিজ, সীতানাথ তত্ত্বভূষণ,

মার্ভিন মেরীমেল প্রভৃতি ইহার লেখক ও লেখিকা ছিলেন। ইউরোপীয় ভাব-প্রবাহ প্রতিরোধ করা এবং হিন্দু ভাবধারাকে যুগোপযোগী ভাবে সবল ও প্রচার করাই উপাধ্যায়ের জীবন-ব্রত ছিল। কিন্তু নানা কারণে 'বিংশ শতাব্দীর' পরিচালনা বন্ধ হইয়া যায় এবং উপাধ্যায় স্বীয় কর্মোদ্যম অন্য দিকে চালিত করেন। তাঁহার মত কর্মযোগী ও সেবাব্রতী সন্ন্যাসী আধুনিক বঙ্গে অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার জীবন-নদীতে সেবা-স্রোত অবিরা' গতিতে প্রবাহিত হইয়াছিল।

ইংলণ্ড-যাত্রার সঙ্কল্প উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবের মনে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় জাগ্রত হয়। ব্রহ্মবান্ধব লিখিয়াছিলেন, "হাওড়া স্টেশনে জুলাই মাসে বিবেকানন্দের মৃত্যু-সংবাদ শুনিয়া তথায় ও তখনই সুদৃঢ় সঙ্কল্প করিলাম, ইংলণ্ডে যাইয়া তৎকর্তৃক আরব্ধ মহৎ কার্য চালাইব।" উক্ত বৎসর সেপ্টেম্বর মাসের শেষে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে যাইয়া কোন ভারতীয় বন্ধুর নিকট তিনি ইউরোপ-যাত্রার পাথেয় সংগ্রহ করেন এবং সেই উদ্দেশ্যে বোম্বাই সহরে উপস্থিত হন। ৫ই অক্টোবর বোম্বাই হইতে জেনোয়া যাত্রার জন্য তিনি একটী ইতালীয় জাহাজে উঠিলেন। বন্দরের ডাক্তার এই অদ্ভুত নিঃসম্বল যাত্রীকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। কারণ, ব্রহ্মবান্ধবের সঙ্গে একখানি কম্বল ও একটি তাম্রময় কমণ্ডলু ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। তিনি যে জাহাজে উঠিয়াছিলেন তাহাতে বহু সিন্ধী হিন্দু ব্যবসায়ী জিব্রাল্টার যাইতেছিলেন। তাঁহারা একটি হিন্দু পাচক সঙ্গে লইয়াছিলেন। সিন্ধী হিন্দুগণ সাধুভক্ত। তাঁহারা সাধু ব্রহ্মবান্ধবের নিকট ধর্মপ্রসঙ্গ শুনিতেন এবং সশ্রদ্ধভাবে তাঁহাকে খাওয়াইতেন। তন্মধ্যে একজন করাচীওয়ালা পূর্বেই ব্রহ্মবান্ধবের নাম শুনিয়াছিলেন। সেইজন্য জাহাজে ব্রহ্মবান্ধবকে আহারের জন্য কষ্ট পাইতে বা একটি পয়সাও খরচ করিতে হয় নাই। জেনোয়া পর্য্যন্ত জাহাজ-ভাড়া মাত্র এক শত টাকা লাগিল।*

---

* বি. অণিমানন্দ প্রণীত The Blade নামক পুস্তকে বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত।

উক্ত জাহাজে ট্রান্সভাল-যাত্রী তিনটি বোয়ার বন্দী ছিল। তন্মধ্যে একজন সম্ভবতঃ সৈন্য। তিনি উপাধ্যায়ের তাম্রময় কমণ্ডলুটি লোলুপ দৃষ্টিতে দেখিয়া খুব পছন্দ করিলেন। তৎক্ষণাৎ উপাধ্যায় কমণ্ডলুটি তাঁহাকে উপহার দিলেন। উহা পাইয়া বোয়ার বন্দী পরম আনন্দিত হইলেন। কিন্তু উহার অভাবে নিঃসম্বল সন্ন্যাসী এই সুদীর্ঘ জল-যাত্রায় কি অসুবিধায় পড়িবেন তাহা ভাবিতে পারেন নাই। জাহাজ যখন নেপলসে পৌছিল তখন রোমে যাইবার জন্য ব্রহ্মবান্ধব অতিশয় আগ্রহান্বিত হইলেন। তিনি জেনোয়া পর্য্যন্ত টিকিট কিনিয়াছিলেন। কিন্তু রোমে যাইবার জন্য নেপলসেই নামিয়া পড়িলেন। তিনি নেপলস হইতে ট্রেনে রোম নগরীতে উপস্থিত হন। পথে দুইটি ইতালীয় তাঁহার সঙ্গে বন্ধুভাবে পরিচিত হন এবং নিজেদের খরচে তাঁহাকে এক রাত্রি হোটেলে রাখেন। ১৯০২ খ্রীঃ ১লা নভেম্বর রাত্রিতে তিনি খ্রীষ্টান জগতের ধর্মপুরী রোমনগরীতে পৌছিলেন। পরদিন প্রাতে তিনি বিখ্যাত গীর্জা সেণ্ট পিটারস ক্যাথেড্রাল দর্শন করেন। শীতপ্রধান দেশের উপযোগী গরম জামা-কাপড় তাঁহার সঙ্গে কিছুই ছিল না। জাহাজের ঠাণ্ডা লাগিয়া তাঁহার কোমরে ব্যথা হয় এবং সেই ব্যথায় বহু দিন কষ্ট পান।

উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব ৪ঠা নভেম্বর লণ্ডনে গমন করেন এবং তথায় যাইয়া জ্বরে আক্রান্ত হন। তিনি ভাবিয়াছিলেন, ভারতের ন্যায় ইংলণ্ডেও ধর্মপ্রতিষ্ঠানগুলিতে আশ্রয় ও আতিথ্য পাইবেন। কলিকাতার আর্চ-বিশপ তাঁহাকে এই মর্মে পরিচয়-পত্রও দিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাতে কোন ফল হইল না। কারণ ইংলণ্ডের প্রথা সম্পূর্ণ ভিন্ন। অর্থাভাবে তিনি খাদ্য বা ঔষধ কিছুই সংগ্রহ করিতে পারিলেন না এবং অনশনে পতিত হইলেন। তিনি শ্রম-কেন্দ্রে যাইয়া জীবিকা অর্জনের কথা ভাবিলেন। ইহা ব্যতীত অন্য উপায় তখন ছিল না। কোন ক্রমে তিনি কার্ডিনাল ভঘ্যানের সহিত সাক্ষাৎলাভে সমর্থ হন এবং তাঁহার সাহায্য ও সহানুভূতি লাভ করেন। ডিসেম্বর মাসে তিনি লণ্ডন হইতে অক্সফোর্ড যাইয়া চারিটি বক্তৃতা দেন। প্রথম বক্তৃতার বিষয় ছিল 'হিন্দু ভাবধারা'। উক্ত সভায় স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বোডেন সংস্কৃতাধ্যাপক

ম্যাকডোনেল সভাপতি ছিলেন। ইংলণ্ডের "টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি" (বিংশ শতাব্দী) নামক ইংরাজী মাসিকে প্রকাশিত ব্রহ্মবান্ধবের রচনাবলী তিনি পূর্বেই পড়িয়াছিলেন। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ বক্তৃতার বিষয় ছিল হিন্দু আস্তিক্যবাদ ও হিন্দু নীতিধর্ম এবং হিন্দু সমাজ বিজ্ঞান। এই তিনটি বক্তৃতায় সভাপতিত্ব করেন বেলিয়ল কলেজের দর্শনাধ্যাপক ডাঃ কেয়ার্ড। কাণ্টের দর্শন এবং ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে ডাঃ কেয়ার্ডের গ্রন্থাবলী বিশেষ বিখ্যাত। ব্রহ্মবান্ধবের বক্তৃতাচতুষ্টয় শ্রোতৃমণ্ডলী কর্তৃক অশেষ প্রশংসিত হয়।

অক্সফোর্ডের পার্শ্ববর্তী স্থানে বেড়াইতে বেড়াইতে পথিপার্শ্বে তিনি দুইটি গৃহহীনা ইংরাজ ভগিনীকে পড়িয়া থাকিতে দেখেন। শীতের রাত্রে, উন্মুক্ত প্রান্তরে অনাথা ভগিনীদ্বয় পড়িয়াছিল। তীব্র শীতের প্রকোপে একজনের প্রাণবায়ু বহির্গত হয় এবং অন্যজন পাগলপ্রায় হইয়া যায়। উপাধ্যায় বুঝিলেন, এই আশ্রয়হীনা নারীদ্বয়ের মত কত নরনারী দারিদ্র্যের তাড়নায় ইংলণ্ডেও প্রাণত্যাগ করে! অসংযত প্রতিযোগিতার ফলে পাশ্চাত্য সমাজেও দারিদ্র্য প্রবল প্রভাব বিস্তার করিতেছে। আর একদিন ব্রহ্মবান্ধব একটি দরিদ্রা মহিলার সঙ্গে পরিচিত হন। উক্ত মহিলা পুষ্প-বিক্রেতার ছদ্মবেশে রাস্তায় ঘুরিতেছিল। তখন ব্রহ্মবান্ধবের নিকট কেবলমাত্র এক শিলিং সম্বল ছিল। সেই শিলিংটি দরিদ্রা নারীর হাতে দিয়া ব্রহ্মবান্ধব তাহাকে বলিলেন, "ভগিনি, তোমার প্রয়োজন আমার চেয়ে অনেক বেশী।" অক্সফোর্ডের বডলিয়ান লাইব্রেরীতে ব্রহ্মবান্ধব পাঁচ লক্ষ পুস্তক সংরক্ষিত দেখিয়া মহানন্দে বলিয়াছিলেন, "ইহা সরস্বতী দেবীর পীঠস্থান।"

ব্রহ্মবান্ধব অক্সফোর্ডে যে দ্বিতীয় বক্তৃতা দেন তাহা তিনি প্রবন্ধাকারে লিখিয়া রাখেন। 'মাইণ্ড' পত্রিকার সম্পাদক ডাঃ স্টাউট ইহা পড়িয়া পরম পরিতুষ্ট হন এবং বলেন, "হেগেলের দর্শন অপেক্ষা ভারতীয় বেদান্ত আরো যুক্তিসঙ্গত।" তিনি ব্রহ্মবান্ধবকে নিরামিষ ভোজনে পরিতৃপ্ত করেন এবং প্রায় দুই ঘণ্টা তাঁহার সঙ্গে দার্শনিক প্রসঙ্গে প্রবৃত্ত হন। উক্ত প্রবন্ধ পাঠান্তে তিনি উহা 'মাইণ্ড' পত্রিকায় প্রকাশের প্রতিশ্রুতি দেন। ব্রহ্মবান্ধব বলিতেন, "আমাদের দার্শনিক

সিদ্ধান্তগুলি আধুনিক জ্ঞানালোকে বিশ্লেষিত এবং বিস্তারিত হইলে অধিকতর সুবোধ্য হইবে। এইভাবে মায়াবাদকে সামাজিক জীবনে অদ্ভুতভাবে ক্রিয়াশীল করা যায়।" এই উক্তিকে স্বামী বিবেকানন্দের বাণীর প্রতিধ্বনি বলা যাইতে পারে। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের বড়দিন ব্রহ্মবান্ধব লণ্ডনে অতিবাহিত করেন। লণ্ডনের 'ট্যাবলেট' নামক পত্রিকায় (১৯০৩ খ্রীঃ ৩রা এবং ৩১শে জানুয়ারী) 'ভারতে খ্রীষ্টান ধর্ম' শীর্ষক তাঁহার দুইটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তিনি উত্তর লণ্ডন থিয়োজফিক্যাল সোসাইটীর উদ্যোগে হাইবেরী নর্দ্যাম্পটন হাউসে যে বক্তৃতা দেন তাহার বিষয় ছিল 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবধারা'। উক্ত বক্তৃতায় তিনি বলেন, "হিন্দুর দৃষ্টি কেন্দ্র হইতে পরিধিতে বিস্তৃত, কিন্তু ইউরোপের দৃষ্টি পরিধি হইতে কেন্দ্রমুখে প্রসারিত। উভয় দৃষ্টিই আংশিক ভাবে অপূর্ণ বলিয়া উহাদের সমন্বয় বর্তমান যুগে আবশ্যক। প্রাচীন ভারত অত্যদ্ভুত ভাবধারা সৃষ্টি করিয়াছে। উক্ত ভাবধারা পূর্ণাঙ্গ এবং বহুশতাব্দী যাবৎ পরীক্ষিত। ইউরোপের তদ্রূপ ভাবধারা কোথায়? উহা বিশৃঙ্খল এবং স্ববিরোধী।"

তিনি উক্ত বক্তৃতায় হিন্দু সমাজ-ভিত্তির সুদৃঢ়তা এবং হিন্দু সভ্যতার আধ্যাত্মিকতা সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেন। তিনি ইংলণ্ড ও ভারতের আদর্শ তুলনা করিয়া বলেন, "ঐহিক সম্পদ বা বিদ্যাই ইংলণ্ডে মহত্ত্বের মাপকাঠি। কিন্তু ভারতে চারিত্রিক উৎকর্ষই মানুষকে মহৎ করে। সেইজন্য তথায় নির্ধন নিরক্ষর যোগী পূজিত হয়।" ইংলণ্ডে ব্রহ্মবান্ধবের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। তিনি তথায় কোন ভদ্রলোকের বাড়ীতে অতিথি ছিলেন। তথায় আহারের জন্য তাঁহার মাসে অন্ততঃ ৭০৲ খরচ হইত। তিনি ভারতের বন্ধুগণকে অর্থ প্রেরণের জন্য বারবার পত্র লিখিয়াছিলেন। অর্থাভাবের জন্য তিনি অতিশয় বিপন্ন হইয়া পড়েন। কিন্তু ঈশ্বরের উপর তিনি সম্পূর্ণ নির্ভরশীল থাকায় বিপদ হইতে উদ্ধার পান। তাঁহার মন কত অন্তর্মুখীন ছিল নিম্নোক্ত ঘটনা হইতে তাহা উপলব্ধ হয়। একদিন লণ্ডন নগরীর রাজপথে তিনি একটী সাধারণ মোটর গাড়ীতে যাইতেছিলেন। তখন তিনি শুনিলেন, রাজা সপ্তম এডওয়ার্ড সেই পথ দিয়া যাইবেন। এই সংবাদ শুনিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া

উপাধ্যায় ইংরাজ যাত্রীদের সম্মুখে বলিয়া উঠিলেন, "আমি খুব ভাগ্যবান যে, আজ রাজাকে দেখতে পাব। রাজদর্শন আমাদের নিকট পুণ্যকর্ম।' জনৈক ইংরাজ সহযাত্রী ইহা শুনিয়া মন্তব্য করিলেন, "বস্তুতঃ আপনার অদ্ভুত রাজভক্তি।" উভয়ে যখন এইরূপ কথোপকথনে প্রবৃত্ত তখন রাজা এডওয়ার্ড তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। চক্ষের নিমেষে রাজার গাড়ী দৃষ্টির বহির্ভূত হইল। কিন্তু সেই দৃশ্য তাঁহার হৃদয়কে আনন্দপূর্ণ করিল। তিনি বলিলেন, "মহামায়ার বিদ্যুৎতুল্য মৃদু হাস্য অন্তর্হিত হইল। মহাশক্তি হিমালয়ের সিংহ ছাড়িয়া ব্রিটিশ সিংহোপরি আরূঢ়া হইলেন। মাহেশ্বরীর মায়ার ক্রীড়া কে বুঝিতে পারে?" ব্রহ্মবান্ধবের চিত্ত কত গভীর ভাবে হিন্দু ভাবাপন্ন ছিল উক্ত ঘটনা হইতে তাহা অনুমিত হয়। তাঁহার নিকট কালী বা দুর্গা মায়ার প্রতীক, ঈশ্বরের শক্তি। তিনি বলেন, "যেখানে ইউরোপীয়রা পার্থিব সুষমা দর্শন করে সেখানে হিন্দুরা দিব্য সত্তা অনুভব করে।"

লণ্ডনে একদল শিক্ষিতা মহিলা হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা দানের জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করেন। কিন্তু তিনি উক্ত প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। ১৯০৩ খ্রীঃ মার্চ মাসে অক্‌সফোর্ড হইতে কেম্‌ব্রিজ যাইয়া তিনি তত্রস্থ ট্রিনিটি কলেজে তিনটি বক্তৃতা দেন। বক্তৃতাত্রয়ের বিষয় ছিল যথাক্রমে—নির্গুণ ব্রহ্ম, হিন্দু ধর্ম-নীতি এবং হিন্দু ভক্তি। বক্তৃতা তিনটিতে সভাপতি ছিলেন বিখ্যাত দার্শনিক ডাঃ ম্যাকট্যাগার্ট। বক্তৃতার পরে জনৈক শ্রোতা তাঁহাকে স্বগৃহে আহারার্থ নিমন্ত্রণ করেন এবং ১০৫৲ টাকা দক্ষিণাস্বরূপ তাঁহাকে দেন। ইংলণ্ডে অবস্থানকালে যদিও ব্রহ্মবান্ধব বহুবার ভীষণ অর্থকষ্টে পড়িয়াছিলেন তথাপি তিনি বেদান্ত বিক্রয় করেন নাই। বন্ধুগণ তাঁহাকে পরামর্শ দিলেন, তাঁহার বক্তৃতাসমূহে টিকিট বিক্রয়ের ব্যবস্থা রাখিতে। কিন্তু তিনি ইহাতে সম্মতি দেন নাই। ইহার দ্বারা নিশ্চয়ই তাঁহার অর্থকষ্ট দূরীভূত হইত। কিন্তু প্রাচীন প্রথার প্রতি আন্তরিক অনুরাগ হেতু তিনি উহাতে সম্মত না হইয়া অনশন বরণ করিলেন। তাঁহার বক্তৃতাবলী শ্রবণে কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দুদর্শন অধ্যাপনার ব্যবস্থা হইতে লাগিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্যদের লইয়া উক্ত

উদ্দেশ্যে একটি কমিটি গঠিত হয়। প্রথম কেম্‌ব্রিজ কমিটির সদস্য ছিলেন অধ্যাপক র‍্যাশ্‌ড্যাল (নীতি বিজ্ঞান সম্বন্ধে যাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ আছে), ডাঃ জে. এলিস ম্যাকৃট্যাগার্ট, মিঃ জে. লোয়েস ডিকিন্‌সন, ডাঃ টি পাইলে, ডাঃ ডবলিউ. এইচ. ডি. রাউস, অধ্যাপক সোর্লে এবং অধ্যাপক জি. এফ. স্টাউট। ভারতে উহার যে সহকারী কমিটি গঠিত হয় তাহার সম্পাদক ছিলেন উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব।*

কেম্‌ব্রিজ কমিটিতে স্থিরীকৃত হয় যে,ভারতের কোন সুযোগ্য ব্যক্তি তিন বৎসর ইংলণ্ডে থাকিয়া কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতা দান করিবেন। উক্ত ব্যক্তির নির্বাচন এবং উহার জন্য এক হাজার পাউণ্ড মূলধন সংগ্রহের ভার পড়িল ব্রহ্মবান্ধবের উপর। ব্রহ্মবান্ধব অক্‌সফোর্ড এবং এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে বেদান্ত অধ্যাপনার্থ অধ্যাপক নিয়োগের আশা করিয়াছিলেন। তাঁহার বুকভরা আশা ছিল যে, এইরূপে ব্রিটেন ভারতীয় দর্শনের উৎকর্ষে বিশ্বাসী হইবে এবং গ্রীস যেমন পরাধীন অবস্থাতেও তাহার রোমান বিজেতাকে পরাজিত করিয়াছিল সেইরূপ ভারতও স্বীয় ধর্ম ও দর্শন দ্বারা ব্রিটেনকে অভিভূত করিবে। কেম্‌ব্রিজে ব্রহ্মবান্ধব টি. ডবলিউ. ষ্টেড সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করেন। স্টেড ছিলেন 'রিভিউ অব রিভিউজ' পত্রিকার সুপরিচিত সম্পাদক। ইনি ব্রহ্মবান্ধবের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া লেখেন, "অসীম প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত আন্তরিকতার বলে অবিরাম সংগ্রামের ফলে সংলব্ধ সাফল্যের অসামান্য উদাহরণ এই কপর্দকহীন ব্রাহ্মণ।" উপাধ্যায় মিঃ স্টেডের সহিত একদিন মাত্র ছিলেন। মিঃ স্টেড ভূতপ্রেতের সহিত যোগাযোগ রাখিতেন বলিয়া তিনি অবিলম্বে তাঁহার সংস্রব ত্যাগ করেন। ম্যাঞ্চেষ্টার কলেজে তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া ফাদার জোসেফ রেকাবি প্রভৃতি জেসুটগণ অতিশয় সন্তুষ্ট হন। ব্রহ্মবান্ধব কোন খ্রীষ্টান পাদ্রীর সহিত কথা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, "গঙ্গাস্রোত যেমন বহু শতাব্দী ধরিয়া ভারতে প্রবাহিতা

---

* অধুনালুপ্ত 'এথেনিউয়াম' সংবাদ পত্রে ১৯০৩ খ্রীঃ ১১ই জুলাই এই সংবাদ প্রকাশিত।

তেমনি ধর্মভাব হিন্দু পরিবারে ও হিন্দু সমাজে অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীবৎ মজ্জাগত। ভারতীয় পাতলা পোষাক পরিয়া ইংলণ্ডে তিনি শীতকালেও থাকিতেন এবং দারুণ শীতে রাত্রিতে কাঁপিতেন। তাঁহার ভারতীয় বন্ধুগণ ভাবিয়াছিলেন, ইংলণ্ডে প্রবাসের ফলে তিনি পাশ্চাত্য সভ্যতার সমালোচনা হইতে নিশ্চয়ই বিরত হইবেন। কিন্তু ফল হইল সম্পূর্ণ বিপরীত। নয় দশ মাস ইউরোপে অবস্থানান্তে তিনি যখন ভারতে ফিরিলেন তখন তিনি নিরীশ্বর ও জড়বাদী পাশ্চাত্য সভ্যতার চিরশত্রুরূপে দেখা দিলেন। ইংলণ্ডে প্রবাসের ফলে তাঁহার সুদৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল যে, ভারত তাহার প্রাচীন প্রজ্ঞা এবং বহু যুগ পরীক্ষিত সামাজিক প্রথাগুলি যেন কখনও পরিত্যাগ না করে।

ভারতে ফিরিবার পথে রোমে যাইয়া পোপের সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা তাঁহার ছিল। কিন্তু ইংলণ্ডে কর্মব্যস্ততার ফলে তিনি সে কথা একেবারে ভুলিয়া যান। তিনি ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে ভারতে প্রত্যাগত হন। কেম্ব্রিজে বেদান্তের অধ্যাপক নির্বাচনের কথা উঠিল। উপাধ্যায় একজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ চাহিলেন। ইহাতে ব্রজেন্দ্রনাথ শীল এবং বিপিনচন্দ্র পাল আপত্তি করিলেন। এই মর্মে মাসের পর মাস পত্রবিনিময় চলিল। অবশেষে উপাধ্যায় ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের মনোনয়নে সম্মতি দিলেন। কিন্তু এইবার কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় রাজী হইলেন না। সুতরাং কেম্‌ব্রিজে অধ্যাপক প্রেরণের সঙ্কল্প কার্যে পরিণত হয় নাই। ইংলণ্ড যাইবার পূর্বে তিনি যে বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন তাহার পরিচালনায় এবং 'সন্ধ্যা' পত্রিকা সম্পাদনায় নিযুক্ত হইলেন। তিনি ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ এবং ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় ক্যাম্বেল হাসপাতালে প্রায় সাড়ে পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। ইংলণ্ড হইতে ফিরিয়া তিনি কিঞ্চিদধিক মাত্র চারি বৎসর জীবিত ছিলেন। এই চারি বৎসর জাতীয় শিক্ষা প্রচারে এবং ভারতীয় সংস্কৃতির পুনর্জাগরণে তিনি অত্যন্ত ব্যাপৃত ছিলেন।. ভারতের স্বাধীনতার অন্যতম অগ্রদূত রূপে তিনি ইতিহাসে চিরস্মরণীয় থাকিবেন।

১৯০১ খ্রীঃ সারস্বত আয়তন স্থাপিত হয় কলিকাতায় সিমলা স্ট্রীটে।

উপাধ্যায় ইংলণ্ড হইতে ফিরিয়া দেখিলেন, আয়তনে মাত্র আটটী ছাত্র আছে। এখন তিনি আয়তনের উন্নতি সাধনে মনোযোগী হইলেন। ফেব্রুয়ারী মাসে সরস্বতী পূজা আসিল। নন্দকে সরস্বতীর মূর্তি আনিতে পাঠান হইল। গোরা সুকণ্ঠ ছিল। তাহাকে সঙ্গীত প্রস্তুত করিতে বলায় সে অস্বীকার করিল। শিষ্যতুল্য সিন্ধী সহকর্মী অণিমানন্দের খৃষ্টান শিক্ষায় সে মূর্তিপূজায় যোগ দিতে চাহিল না। উপাধ্যায় বিরক্ত হইয়া তাহাকে ছাদের উপরে 'চিলা-ঘরে' লইয়া যাইয়া বলিলেন, 'এখানে তুই চুপ করে বসে থাক্, পূজা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত।' পূজান্তে সরস্বতী সম্বন্ধে তিনি আলোচনা করিলেন ছাত্রদের নিকট। বিদ্যালয়ে মূর্তিপূজা অনুষ্ঠিত হওয়ায় খৃষ্টান অনিমানন্দ (ওরফে রেওয়াচাঁদ) আয়তন ত্যাগ করিলেন। তিনি তৎপরে 'বয়েজ ওন হোম' (Boys' Own Home বা বালকদের নিজস্ব গৃহ) নামক যে বিদ্যালয় স্থাপন করেন তাহা কাশীপুরে বহু বৎসর চলিয়াছিল। আয়তনে অণিমানন্দের স্থান লইলেন প্রবোধচন্দ্র সিংহ এবং মোক্ষদাচরণ সমাধ্যায়ী। ১৯০৬ খ্রীঃ আয়তন কলিকাতায় ছিল এবং ১৯০৬ খ্রীঃ ইহা শ্রীরামপুরে উঠিয়া যায়। উপাধ্যায় নানা কাজে ব্যাপৃত থাকায় আয়তন বন্ধ হইয়া গেল।

স্কটিশ মিশনারী জে. এন. ফার্কুহার "গীতা ও বাইবেল" নামক পুস্তকে শ্রীকৃষ্ণকে সমালোচনা করেন। শোভাবাজারের রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর উহার প্রতিবাদ চাহিলেন। যথাযোগ্য প্রতিবাদ করিবার জন্য উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব অনুরুদ্ধ হন। ১৯০৪ খ্রীঃ ২৫শে জুলাই সোমবার আলবার্ট হলে যে প্রতিবাদ সভা আহূত হয় তাহাতে উপাধ্যায় 'শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব' সম্বন্ধে ইংরাজিতে একটী সারগর্ভ বক্তৃতা দেন। উক্ত বক্তৃতা 'সাহিত্য সংহিতা'য় প্রকাশিত। ইহাতে তিনি প্রমাণ করেন যে, শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের অবতার। তিনি নিজেও ঈশ্বরাবতারে বিশ্বাসী ছিলেন। ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগমনের পর তিনি 'বঙ্গ দর্শনে' অনেকগুলি সুচিন্তিত প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। ১৯০৪ খৃঃ তিনি এক পয়সা মূল্যের একটী দৈনিক সংবাদ-পত্র প্রকাশ করেন এবং উহার নাম রাখেন 'সন্ধ্যা'। উক্ত দৈনিকের উদ্দেশ্য ছিল তাঁহার ভাবায় এইরূপ।—কোন আকস্মিক

বিপদ এলে মানুষ বলে থাকে, 'আ! এ কি কলির সন্ধ্যা। চারটী সন্ধ্যা বা যুগ-সঙ্কট পূর্বে অতীত। পঞ্চম সন্ধ্যা সমাসন্ন। শ্রীকৃষ্ণের সময় প্রথম সন্ধ্যা, বুদ্ধের সময় দ্বিতীয় সন্ধ্যা ও শঙ্করাচার্য্যের সময় তৃতীয় সন্ধ্যা নেমেছিল। ম্লেচ্ছদের আগমনে চতুর্থ সন্ধ্যা এসেছিল। তখন ভারতের অধঃপতন সম্পূর্ণ হলো। অভূতপূর্ব অরাজকতা ও অত্যাচার, বিশৃঙ্খলা ও অনৈতিকতা দেশে ব্যাপক হলো মহামারীবৎ। জীবন্ত শববৎ ভারত পদানত, পরাধীন। বেদোক্ত প্রাচীন আদর্শ পুনঃপ্রচার দ্বারা কলিযুগের বর্তমান সন্ধ্যা অতিক্রম করাই আমাদের উদ্দেশ্য।"

লর্ড কার্জনের দ্বারা ১৯০৫ খৃঃ ২০শে অক্টোবর বঙ্গ-ভঙ্গ ঘটে। ফেব্রুয়ারী মাস হইতেই উক্ত গুজব রটিয়াছিল। বঙ্গ-ভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গেই অবিলম্বে প্রতিক্রিয়া আসিল। বিপিন পাল ও অরবিন্দ ঘোষের সহিত যোগ দিয়া উপাধ্যায় বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলন চালাইলেন। প্রদেশের নানা স্থানে প্রতিবাদ সভা আয়োজিত হইল এবং স্বদেশী আন্দোলন গড়িয়া উঠিল। উপাধ্যায় জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়া ঘুমন্ত বাংলাকে জাগাইতে লাগিলেন। 'সন্ধ্যা' দৈনিকে ইংরাজ অর্থে 'ফিরিঙ্গি' শব্দটি সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইত। তিনি একবার লিখিলেন, "তিনটি জিনিস ভুলবেন না—(১) ফিরিঙ্গির কাছ থেকে কিছু কিনবেন না (২) ফিরিঙ্গির দোকানে যাবেন না ( ) ফিরিঙ্গির স্কুল-কলেজে পড়বেন না।" সন্ধ্যায় প্রায়ই তিনি লিখিতেন. "পুলিশ জুলুমে দমে যেও না, বা লাল পাগড়ী দেখে ভয় পেও না।" উপাধ্যায়ের রচনা ও ভাষণে অগ্নিময়ী উত্তেজনা সারা বাংলায় ছড়াইয়া পড়িল। তিনি লিখিলেন, "ইংরাজ শাসনে ভারত আদর্শচ্যুত হয়েছে, ভারতের মন পাশ্চাত্য মোহে ডুবেছে। আমরা গোলাম হয়ে গেছি। যেদিন ভারত আত্মবিশ্বাস ফিরে পাবে সেদিন স্বরাজ আসবে। রামকৃষ্ণ সেইপথে গিয়েছেন, বঙ্কিম ও বিবেকানন্দও সেই পথে চলেছেন। সমগ্র ভারতকে প্রাচীন আদর্শে পুনরায় অনুপ্রাণিত করতে হবে। তখনই স্বদেশে স্বরাজ আসবে, স্বদেশে স্বরাজ-গড় প্রতিষ্ঠিত হবে। সেই স্বরাজ-গড়ে ফিরিঙ্গিদের বা বিদেশীদের প্রভাব থাকবে না। এখন স্বদেশ

বিদেশে পরিণত। আমরা চাই সুমহৎ ভারত, সুবর্ণ ভারত। আমরা চাই কপিল ও গৌতমের ভারত, ব্যাস ও বশিষ্ঠের ভারত, রঘু ও দিলীপের ভারত, রামচন্দ্র ও যুধিষ্ঠিরের ভারত। সেরূপ ভারত সৃষ্টি করতে হলে সর্বপ্রথমে আবশ্যক দাস-মনোভাব বর্জন। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা আমাদের চাই, কিন্তু পাশ্চাত্য মোহ বা দাস মনোভাব থাকলে সে স্বাধীনতা আসল স্বাধীনতা হবে না।”

নবসৃষ্ট প্রদেশ পূর্ব বঙ্গের প্রথম গভর্ণর স্যার বামফিল্ড ফুলার এবং বড়লাট লর্ড কার্জন এবং কলিকাতার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কিংসফোর্ড প্রভৃতি ‘সন্ধ্যা’য় তীব্রভাবে সমালোচিত হইলেন। উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব বাঙ্গালী জাতিকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য লিখিলেন, “হিন্দু কখনো মরে না, বন্দুকের গুলীতেও নয়, রোগ-শোকেও নয়, দুঃখ-কষ্টেও নয়। আমার তোমার মতো কয়েকটা কীট মরতে পারে, কিন্তু হিন্দু জাতি অমর। জগতের কোন শক্তি হিন্দু জাতিকে বিনাশ করতে পারবে না। কারণ হিন্দুজাতি ধর্মপ্রাণ।” তিনি বিশ্ববিদ্যালয়কে গোলামখানা বলিয়া সমালোচনা করিলেন। ‘বন্দেমাতরম্’ পত্রিকার তদানীন্তন সম্পাদক বলেন, “ব্রহ্মবান্ধব ছিলেন স্বদেশী আন্দোলনের অন্যতম নায়ক। বিপিন পাল ও অরবিন্দ ঘোষের ন্যায় তিনি আন্দোলনের একজন প্রধান সর্দার ছিলেন।” বিদেশী দ্রব্যবর্জনও ‘সন্ধ্যায়’ পূর্ণভাবে সমর্থিত হইল। ১৯০৬ খ্রীঃ এপ্রেল মাসে বরিশালে স্মরণীয় প্রাদেশিক মহাসভায় ব্রহ্মবান্ধব অগ্নিময় ভাষণ দিলেন। ‘সন্ধ্যা’ কার্যালয়ে স্বদেশী কর্মীগণ ও নেতাগণ বসিয়া আলাপ আলোচনা করিতেন। উহাই তাঁহাদের প্রিয় আড্ডা ছিল। শিবাজী জয়ন্তী ও বঙ্কিম উৎসবের আয়োজন করিলেন উপাধ্যায় নিজেই। ১৯০৭ খৃঃ ৮ই এপ্রিল বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মস্থান কাঁঠালপাড়ায় বঙ্কিম উৎসব অনুষ্ঠিত হইল। উপাধ্যায় একটি ষ্টীমার ভাড়া করিয়া জাতীয় নেতৃবৃন্দ ও স্বেচ্ছাসেবকগণকে তথায় লইয়া গেলেন।

১৯০৬ খৃঃ বড়দিনের সময় কলিকাতায় দাদাভাই নৌরজীর পৌরোহিত্যে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। সেই সময় ‘সন্ধ্যায়’ উপাধ্যায় সম্পূর্ণ স্বাধীনতার

দাবী করেন। উক্ত বৎসরের শেষে জাতীয় নেতৃবৃন্দ একে একে কারারুদ্ধ হইলেন। 'যুগান্তর', 'বন্দেমাতরম্‌' ও 'সন্ধ্যা' ব্রিটিশ সরকারের কুনজরে পড়িল। 'সন্ধ্যা'র শিক্ষিত পাঠক-পাঠিকাগণ উপাধ্যায়ের নিকট বিশুদ্ধ বাংলা রচনা দাবী করিলেন। তাঁহাদের অনুরোধে ১৯০৭ খ্রীঃ 'স্বরাজ সাপ্তাহিক' ও 'করালী পাক্ষিক' প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু 'সন্ধ্যা'য় চল্‌তি ভাষা ব্যবহৃত হওয়ায় উহার জনপ্রিয়তা সর্বাপেক্ষা অধিক হইল। ফেরীওয়ালা ডালহাউসী স্কোয়ারে বা এসপ্লানেডে যখন 'সন্ধ্যা' পত্রিকা বিক্রয় করিত তখন ট্রামযাত্রীরা সরকারের ভয়ে বলিত, "যাও যাও, চাই না।" কিন্তু ট্রাম যখন ধর্মতলা ও ওয়েলেস্‌লী স্ট্রীটের মোড়ে আসিত তখন যাত্রীরা পকেট হইতে এক এক পয়সা বাহির করিয়া এক একখানি 'সন্ধ্যা' কিনিতেন। কারণ কলেজ স্ট্রীটে বা কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটে যখন ট্রাম যাইবে তখন 'সন্ধ্যা'র সব সংখ্যাই নিঃশেষিত হইবে। 'সন্ধ্যা' যাহা জনসাধারণের জন্য করিয়াছিল তাহা 'স্বরাজ' বাংলার শিক্ষিত শ্রেণীর জন্য সম্পন্ন করে। 'সন্ধ্যা' প্রত্যহ প্রায় বারো হাজার কপি মুদ্রিত হইত এবং আরও অধিক সংখ্যক কপির চাহিদা ছিল। কিন্তু অর্থাভাবে তাহা সম্ভব হয় নাই। সময়াভাবে তাহাতে বিজ্ঞাপনও ছাপা হইত না। পত্রিকার এক পৃষ্ঠায় প্রবন্ধ ছাপা হইত এবং অন্য পৃষ্ঠা সাদা থাকিত। 'সন্ধ্যা'র দ্বারা সমগ্র প্রদেশে অদ্ভুত পরিবর্তন আসিল। এমন কি, অশিক্ষিত নরনারীগণের মনেও রাষ্ট্রীয় চেতনা উদিত হইল। 'সন্ধ্যা'র ভাব ও ভাষা, বাক্য ও কৌতুক লোকমুখে দেশময় বিস্তৃত হইল। বাংলা ভাষা যে এরূপ ভাব-প্রকাশক পূর্বে তাহা সাধারণের ধারণা ছিল না। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে জুন মাসে যে শিবাজী জয়ন্তী হয় তাহার সম্পূর্ণ দায়িত্ব উপাধ্যায়ের স্কন্ধে অর্পিত হয়। তিলক, খপর্দে, মুঞ্জে প্রভৃতি মারাঠী দেশনায়কগণকে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য হাওড়া ষ্টেশনে পনের হাজার নরনারী সমবেত হন উপাধ্যায়ের প্রচেষ্টায়। এই উপলক্ষ্যে যে জনসভা হয় তাহাতে প্রায় দশ হাজার নরনারী উপস্থিত ছিলেন। উপাধ্যায় প্রায় একষট্টি প্রকার ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া মারাঠী নেতৃবৃন্দকে ভোজন করান।

তৎসম্পাদিত 'স্বরাজ' সাপ্তাহিক ১২।১৪ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত হইত। ১৯০৭ খ্রীঃ মার্চ হইতে জুলাইয়ের মধ্যে উহার মাত্র বার সংখ্যা প্রকাশিত হয়, পরে উহা বন্ধ হইয়া যায়। প্রত্যেক পৃষ্ঠার প্রথম পৃষ্ঠায় শিবাজী, বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণ, শিবচন্দ্র সার্বভৌম, বিষ্ণুপুর দুর্গ প্রভৃতির চিত্র থাকিত। প্রথম হইতে 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রের ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রকে প্রত্যেক সংখ্যায় শ্রদ্ধাঞ্জলি দেওয়া হইত। হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতির নূতন সম্বিৎ প্রচারপূর্বক হিন্দু সমাজের পূর্ব গৌরব পুনরুদ্ধার করাই ছিল উক্ত সাপ্তাহিকের মূলমন্ত্র। বঙ্কিম-প্রণীত 'আনন্দমঠে'র আদর্শ উপাধ্যায়ের জীবনে প্রভাবশালী ছিল। শিবাজী জয়ন্তী সভায় জাতীয় শিক্ষা সম্বন্ধে যে সারগর্ভ প্রবন্ধ তিনি পাঠ করেন উহাতে জাতীয় শিক্ষালয়ের একটী সুচিন্তিত পরিকল্পনা পাওয়া যায়। প্রকৃত ভারতের ধর্মভাবরাশি পুনঃপ্রচারের জন্য রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ তাঁহার শ্রদ্ধার্হ ছিল। রামকৃষ্ণকে তিনি বর্তমান যুগের 'লোক-রক্ষা সেতু' বলিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দের মৃত্যু-সংবাদ শুনিয়াই তিনি ইংলণ্ড যাইতে সংকল্প করেন। তিনি স্বীয় ভাবে স্বামী বিবেকানন্দের মিশন চালাইতে প্রবৃত্ত হন।

'বাঙ্গালীর নিজস্ব' শীর্ষক প্রবন্ধে উপাধ্যায় 'কালীতত্ত্ব' সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তাঁহার পৈতৃক ভবনে কালী ছিলেন গৃহদেবতা। কালী-ভাব তাঁহার জীবনে প্রবল ছিল। ছাত্রজীবনে তিনি এক সময় চুঁচুঁড়ায় ছিলেন। তখন তাঁহাকে প্রায়ই চুঁচুঁড়া হইতে ভাটপাড়া যাইতে হইত সংস্কৃত অধ্যয়নার্থ। চুচুঁড়া গঙ্গার এপারে এবং ভাটপাড়া গঙ্গার ওপারে। নৌকায় গঙ্গা পার হইতে হয়।

একদিন গঙ্গাপার হইবার সময় ক্ষুদ্র নৌকা বাত্যাহত হইয়া গঙ্গাবক্ষে উত্তাল তরঙ্গরাশি দ্বারা নাচিতে থাকে। যাত্রিগণ সন্ত্রস্ত ও নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। তন্মধ্যে এক বৃদ্ধা তাঁহার ঝুড়িটী হাতে লইয়া নির্ভয় চিত্তে বসিয়া ছিল। সে যেন বিধাত্রীর এই কৌতুক উপভোগ করিতে লাগিল এবং বলিল, "আহা! মা আমাদের সঙ্গে খেল্‌ছেন। জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু, নৈসর্গিক দুর্ঘটনা এবং জীবনের দুঃখ কষ্ট মায়ের খেলা ব্যতীত অন্য কিছু নহে।

মানব সন্তানের সহিত জগন্মাতার এই সস্নেহ খেলা বাঙ্গালী বুঝিয়াছে। তাই বাঙ্গালী মাতৃ পূজায় এত প্রমত্ত হয়।" এই ঘটনা উপাধ্যায়ের জীবনে গভীর রেখাপাত করে। তাঁহার জীবন উল্লিখিত বৃদ্ধার উক্তির প্রকৃষ্ট উদাহরণ বলা যাইতে পারে।

১৯০৩ খ্রীঃ ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগমনের পর ব্রহ্মবান্ধব প্রায়শ্চিত্ত করিবার পর হিন্দু সমাজে স্থান পাইবার জন্য প্রয়াসী হন। ১৯০৭ খ্রীঃ দেহত্যাগের দুই মাসের পূর্বে তিনি পূর্বকল্পিত প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠান করেন। ১৯০১ খ্রীঃ জুন মাসে শান্ত সহাস্য বদনে তিনি বন্ধুদের নিকট প্রকাশ করেন, "আমাদিগকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে, একটু গোবর-জল খাইতে হইবে।" খ্রীষ্টান বন্ধুগণ উপহাসপূর্বক উত্তর দিলেন, "ইহাই বুঝি তোমার বেদান্তের পরিণতি।" উপাধ্যায় এই উত্তরে বিচলিত না হইয়া বন্ধুর সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হন। ১৯০১ খ্রীঃ আগস্ট মাসে "বিংশ শতাব্দী" নামক ইংরাজি মাসিকে 'প্রায়শ্চিত্ত' শীর্ষক যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় তাহাতে ব্রহ্মবান্ধবের মনোভাব স্পষ্টরূপে প্রকটিত। ইউরোপে প্রবাস এবং ইউরোপীয় ধর্মগ্রহণ ও শিক্ষালাভ দ্বারা আমাদের ভাবগত অশুদ্ধি আসিয়াছে তাহা দূরীকরণার্থ তিনি প্রায়শ্চিত্ত করেন। ভাটপাড়ার প্রসিদ্ধ পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন তাঁহাকে মিতাক্ষরা-মতে প্রায়শ্চিত্ত করিতে ব্যবস্থা দেন। 'স্বরাজ' সাপ্তাহিকে তিনি লিখিতেন, "বাঙ্গালী! খাটি হিন্দু হও, বাংলাকে ভালবাস এবং বাঙ্গালী বলিয়া গর্ব অনুভব কর। বাঙ্গালীর আচার-ব্যবহার, পাল-পার্বণ ও পোষাক-পরিচ্ছদ ছাড়িও না।" ইত্যাদি। তিনি যাহা লিখিতেন তাহা নিজে হইবার জন্য আপ্রাণ প্রচেষ্টা করিতেন। ইহাই ছিল উপাধ্যায়ের অনুকরণীয় বৈশিষ্ট্য।

১৯০৭ খ্রীঃ 'সন্ধ্যা' কার্যালয়ে খানাতল্লাসী হইল। পুলিশ উপাধ্যায়ের কাগজ-পত্র ও রচনাবলী লইয়া গেল এবং নিমতলা ঘাটে ভস্মীভূত করিল। ভাবী ঐতিহাসিকের পক্ষে ইহা দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই। রবীন্দ্রনাথ উপাধ্যায়কে যে পত্রাবলী লিখিয়াছিলেন সেগুলিও তৎসঙ্গে দগ্ধীভূত হয়। ইহার কয়েকদিন পূর্বে সরকারের পক্ষ হইতে কোন ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট

আসিয়া তাঁহাকে অর্থসাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন; কারণ তখন 'সন্ধ্যা' পরিচালনায় অর্থাভাব ঘটিয়াছিল। উপরোক্ত প্রতিশ্রুতির মূলে ছিল 'সন্ধ্যা'র সুর নরম করিবার অনুরোধ। তেজোদ্দীপ্ত উপাধ্যায় উত্তর দিলেন, " 'সন্ধ্যা'র সুর পরিবর্তন করা যাইবে না। বাংলার সামাজিক জীবনে পাশ্চাত্য মোহের যে কুজ্ঝটিকা পড়িয়াছে তাহা দূর করিতেই হইবে। শিক্ষিত শ্রেণী ও জনসাধারণকে স্বদেশীয় ভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা দরকার। প্রাচীন আদর্শে ফিরিয়া যাইতে হইবে। বানরবৎ পাশ্চাত্যানুকরণ বন্ধ করা প্রয়োজন।" আর্থিক প্রলোভনে আদর্শনিষ্ঠ উপাধ্যায়ের মন টলিল না। তাঁহার জীবনাকাশে বিপদের কালমেঘ ঘনাইয়া আসিল।

১০ই সেপ্টেম্বর 'সন্ধ্যা'র সম্পাদক উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব, ম্যানেজার সারদা সেন ও মুদ্রাকর সতীশ দাস গ্রেপ্তার হইলেন। জামিনে তাঁহারা মুক্তি পাইলেন এবং প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডের আদালতে মোকদ্দমা চলিতে লাগিল। উপাধ্যায় সন্ন্যাস গ্রহণের পর সর্বদা গেরুয়া কাপড় পরিতেন। কিন্তু মুক্তির নিশান গেরুয়া পরিয়া তিনি আদালতে যাইতে চাহিলেন না। ব্রাহ্মণ বাঙ্গালীর মত তিনি উপবীত ধারণ ও ধুতিচাদর পরিধান করিয়া আদালতে হাজির হইতেন দিনের পর দিন। ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাশ ব্রহ্মবান্ধবের পক্ষ সমর্থন করেন। উপাধ্যায় যে সকল প্রবন্ধের জন্য অভিযুক্ত হন তন্মধ্যে একটীর নাম 'এখন ঠেকে গেছি প্রেমের দায়।' উহা ১৯০৭ খ্রীঃ ১৭ই আগস্ট 'সন্ধ্যা'য় প্রকাশিত হয়। স্কুলের বালক সুশীল সেনকে নগণ্য রাজদ্রোহের অপরাধে পনের ঘা বেত মারার আদেশ দেওয়ায় উপাধ্যায় কিংসফোর্ডকে 'কসাই কাজী' ও 'পাজীর পাজী' বলিয়া সমালোচনা করেন।

আদালতে প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কিংসফোর্ডের সম্মুখে উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব বলিলেন, "এই বিচারে আমি কোন অংশ গ্রহণ করিতে চাই না। কারণ আমি বিশ্বাস করি না যে, ঈশ্বরাভিপ্রেত স্বরাজ লাভার্থ আমার সামান্য কর্তব্য পালন দ্বারা আমি কোন অপরাধ করিয়াছি। সেইজন্য বিদেশী জাতির নিকট আমি কোন কৈফিয়ৎ দিতে প্রস্তুত নহি। এই বিদেশী জাতি

ঘটনাক্রমে আমাদের উপর রাজত্ব করিতেছেন এবং আমাদের প্রকৃত জাতীয় সমৃদ্ধি সাধন তাঁহাদের অবশ্য কর্তব্য।" এই বিখ্যাত বিবৃতি সম্বন্ধে 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকা মন্তব্য করেন, "ভারতের রাজদ্রোহ বিচারের ইতিহাসে এরূপ নির্ভীক, এরূপ অকপট, এবং এরূপ আত্মমর্য্যাদাসূচক বিবৃতি আর কখনও লিপিবদ্ধ হয় নাই। উক্ত বিবৃতি সর্বপ্রকারে সন্ধ্যা' সম্পাদকের যথোচিত হইয়াছে।" দিনের পর দিন আদালতে আসামীর জেহারা চলিল। আত্মমর্য্যাদা হানি করিয়া উপাধ্যায় উপবেশনার্থ চেয়ার চাহিলেন না। দিনের পর দিন প্রত্যহ বহু ঘণ্টা আদালতে দাঁড়াইয়া থাকিবার ফলে তাঁহার একশিরা বৃদ্ধি হইল। পূজার ছুটীতে তিনি জেলের বাহিরে থাকিতে ইচ্ছা করিলেন। ইহার একমাত্র উপায় ছিল জেহারায় দীর্ঘসূত্রিতা অবলম্বন। কিন্তু কিংসফোর্ড বিচার শেষ করিয়া রায় দিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। সেইজন্য তিনি ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জনকে ৫টা পর্য্যন্ত আদালতে থাকিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু চিত্তরঞ্জন অস্বীকার করিয়া বলিলেন, আর একজন ব্যারিষ্টার সেজন্য নিযুক্ত করিতে হইবে। ইতিমধ্যে চিত্তরঞ্জন হাইকোর্টে দরখাস্ত করিলেন, কোন পক্ষপাতশূন্য জজের নিকট ব্রহ্মবান্ধবের বিচার হইবার জন্য। কিন্তু সেই দরখাস্তে কোন ফল হইল না। অতি কষ্টে অন্য একজন ব্যারিষ্টার নিযুক্ত হইলেন।

পূজার ছুটীর পরে বিচারের দিন পড়িল। বাহ্যতঃ উপাধ্যায় জয়লাভ করিলেন। তখন. তিনি নিজ একশিরায় অস্ত্রোপচারার্থ চিন্তিত হইলেন। ১৯০৭ খ্রীঃ ২১শে অক্টোবর সোমবার সন্ধ্যায় তিনি ক্যাম্বেল হাসপাতালে ভর্তি হইলেন। উপবীত ও বাঙ্গালী পোষাক পরিয়া তিনি হাসপাতালে নগ্নপদে গেলেন! হাসপাতালে তাঁহার শয্যাপার্শ্বে লালপাগ্ড়ী পুলিশ পাহারা দিতে লাগিল। হাসপাতালের রেজিষ্ট্রারে তিনি স্বীয় জাতি লিখিলেন 'ব্রাহ্মণ'। সাধারণ ওয়ার্ডের এক কোণে তাঁহাকে একটী বেড্ দেওয়া হইল। মঙ্গলবার একশিরায় অস্ত্রোপচার করা হইল। কিংসফোর্ডের আদালতে প্রত্যহ দশটা হইতে চারটা পর্যন্ত ছয় ঘণ্টা দাঁড়াইয়া থাকার ফলে তাঁহার এই অসুখ বৃদ্ধি হয়। তাঁহার বন্ধু ডাঃ মৃগেন্দ্রলাল মিত্র—ক্যাম্বেল হাসপাতালে

সিনিয়র সার্জন ছিলেন। তিনি ২২শে অক্টোবর উপাধ্যায়ের অস্ত্রোপচার করেন। অস্ত্রোপচারের সম্যক্ সাফল্য সকলেই আশা করিলেন। বুধবার, বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার রোগী অনেক সুস্থ বোধ করিলেন। তিনি বা তাঁহার বন্ধুগণ বা ডাক্তারগণ কেহই ভাবিতে পারেন নাই যে, রোগীর অন্তকাল সমাসন্ন। শনিবার তিনি স্বাভাবিকভাবে বন্ধুদের সহিত কথাবার্তা বলিলেন। কিন্তু সেদিন তাঁহার মধ্যে বিষাদ ও দুর্বলতা দেখা দিল। 'সন্ধ্যা' মামলার কথায় তাঁহার মনে গভীর চাপ সৃষ্টি করিল। তিনি তৎসঙ্গে অভিযুক্ত ম্যানেজার ও মুদ্রাকরের কথা ভাবিতেছিলেন, নিজের জন্য নহে। সেদিন দ্বিতীয় রাজদ্রোহের অভিযোগ তাঁহাদের বিরুদ্ধে উপস্থিত হইল। করাচীর সাধু টি. এল. ভাস্বানী বুধবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অনেকক্ষণ আলাপ করেন। শনিবার সন্ধ্যায় প্রায় পঞ্চাশজন বন্ধু ও সহকর্মী তাঁহাকে দেখিতে আসেন। তিনি সংবাদপত্র পড়িয়া 'সন্ধ্যা'য় কি কি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবে তাহা বলিয়া দিলেন। সেদিন তিনি অন্যমনস্ক হইয়া স্বগতোক্তি করিলেন, "আমার জীবনের উত্থান ও পতন অদ্ভুত হয়েছে। আমার ধর্মবিশ্বাসও ছিল অদ্ভুত।" শনিবার বৈকাল ৪টা হইতে মৃত্যু পর্যন্ত ডাঃ সতীশচন্দ্র দাশ তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা করেন। সেদিন বৈকাল ৪টায় ঘাড়ে অসুস্থতা বোধ করিয়া তিনি বালিশ ঠিক করিয়া দিতে বলেন। বালিশ ঠিক করিয়া দিতেই তিনি একটু সুস্থ বোধ করেন। একটু পরেই তিনি পূর্ববৎ বলেন, "ঘাড়ে ব্যথা আবার হচ্ছে।" বালিশ ঠিক করিয়া দিতেই তিনি পুনরায় ক্ষণিক সুস্থতা অনুভব করিলেন। এইরূপে রাত ৮টা পর্যন্ত চলিল। তখন প্রথম খিঁচুনি (spasm) আরম্ভ হইল। কোন ব্রাহ্মণ বাড়ী হইতে তাঁহার জন্য খাবার আনা হইত। বৈকাল বেলা ৫টায় খাবার আসিল। দার্জিলিং হইতে কোন বন্ধু কলাইশুঁটী পাঠাইয়া ছিলেন। কলাইশুঁটীর তরকারী করা হইল। তিনি উক্ত তরকারী খাইতে চাহিলেন। কিন্তু তরকারী মুখে দিয়া গিলিতে পারিলেন না। পরে তরকারী হইতে তিনি শুধু কলাইশুঁটী চাহিলেন। দুই তিনটী কলাইশুঁটী তাঁহার মুখে দেওয়া হইল। কিন্তু উহা গিলিতে চেষ্টা করায় তাঁহার শ্বাসরোধের উপক্রম হইল। সেবক তাঁহার

মুখ হইতে আঙ্গুল দিয়া কলাইশুঁটী টানিয়া লইলেন। আবার তিনি কলাইশুঁটী খাইতে ইচ্ছা করিলেন। সেজন্য একটিমাত্র কলাইশুঁটী থেঁতো করিয়া তাঁহার মুখে দেওয়া হইল। তিনি উহা অতিকষ্টে গিলিয়া ফেলিলেন, কিন্তু আর কিছু খাইতে পারিলেন না। রাত্রি ৮টার সময় ১২।১৫ মিনিট অন্তর তাঁহার খিঁচুনি আরম্ভ হইল। তিনি অত্যন্ত ক্লান্ত ও শ্রান্ত বোধ করিলেন। গভীর যন্ত্রণার মুহূর্তে তিনি বলিয়া উঠিতেন, "হে ঠাকুর!" মধ্যরাত্রে ডাঃ মৃগেন্দ্রলাল মিত্রকে খবর দেওয়া হইল। তিনি তখনই থিয়েটার হইতে ফিরিয়াছিলেন, সুতরাং আসিতে পারিলেন না। প্রত্যূষে আসিবেন বলিয়া তিনি খবর পাঠাইলেন এবং ঔষধের ব্যবস্থা দিলেন।

রাত্রি একটায় নির্দিষ্ট ঔষধ খাওয়ান হইল। তৎক্ষণাৎ খিঁচুনী দেখা দিল, দাঁতপাটি দুইটী দৃঢ়বদ্ধ হইল। অতিকষ্টে মুখ খোলা গেল। এইরূপ ৩।৪ বার করা হইল। প্রত্যেক বার তাঁহার মুখে দুই চাবি ফোঁটা জল বা দুধ দেওয়া হইল। ইহার পরে প্রায় ত্রিশ বার খিঁচুনী দেখা গেল। দাঁতপাটী দুইটী এবং মুষ্টিদ্বয় পুনরায় দৃঢ়বদ্ধ হইল। তিনি ভয়ঙ্কর মুখ-বিকৃতি করিলেন। এইরূপ দুই মিনিট চলিল। তৎপরে আর খিঁচুনি হইল না। তিনি সংজ্ঞাশূন্য ও মূর্চ্ছিতবৎ পড়িয়া রহিলেন। ভোর চারটার সময় ডাঃ সতীশ দাশ বিশ্রাম করিতে গেলেন। একটী ভৃত্য রোগীকে বাতাস করিতে নিযুক্ত হইল। ভৃত্যটী ভাল ভাবে বাতাস করিতে ছিলনা বলিয়া উপাধ্যায় স্বহস্ত দ্বারা তাহাকে আঘাত করিলেন। তাঁহার শ্বাস-কষ্ট হইতেছিল। ডাঃ সতীশ দাস অবিলম্বে আসিয়া দুই হাতে পাখা ধরিয়া বাতাস করিতে লাগিলেন। সকাল আটটায় ডাঃ মৃগেন্দ্র মিত্র আসিলেন। রোগী ডাক্তারকে বলিলেন, "আমার যন্ত্রণা দূর করে দাও।" ডাক্তার রোগীকে এই বলিয়া সান্ত্বনা দিলেন যে, তিনি অবিলম্বে যন্ত্রণা দূর করিবেন। পৃথক্ কক্ষে ডাঃ কেদার দাস, ডাঃ মৃগেন্দ্র মিত্র ও ডাঃ এস. কে. বসু প্রভৃতি নয়জন অভিজ্ঞ ডাক্তার মিলিয়া পরামর্শ করিলেন এবং ইহা ধনুষ্টঙ্কার রোগ বলিয়া নির্ণীত হইল। মুখ দিয়া ঔষধ খাওয়ান যাইতেছিল না বলিয়া কাথিটার নলের দ্বারা ঔষধ গলাধঃকৃত করিবার চেষ্টা

হইল। যন্ত্রের সাহায্যে জোর করিয়া দাঁতের পাটী দুইটী খুলিতে যাওয়ায় দুইটী দাঁত ভাঙ্গিয়া গেল! রোগীর মুখ ও হস্তদ্বয় রক্তাক্ত হইল। ইহাতে আর একবার খিঁচুনি হইল। ডাক্তাররা ক্লোরোফর্ম ব্যবহারের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু মুমূর্ষু রোগী বলিলেন, "আম কে সম্পূর্ণ সজ্ঞানে মরিতে দাও।" রোগীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে ডাক্তারগণ তাঁহাকে ক্লোরোফর্ম দিতে আরম্ভ করিলেন। মাত্র দুই তিন মিনিট ক্লোরোফর্ম দিবার পর ডাঃ কেদার দাস বলিয়া উঠিলেন, থাম! রোগীকে ভূমিতে শোয়ান হইল এবং প্রায় আট মিনিট ধরিয়া কৃত্রিম উপায়ে নিশ্বাস-প্রশ্বাস বহাইবার চেষ্টা চলিল। বৈদ্যুতিক ব্যাটারী প্রয়োগেও কোন ফল হইল না। সব চেষ্টা ব্যর্থ হইল। রোগীর প্রাণ-পক্ষী দেহপিঞ্জর ছাড়িয়া মহাকাশে উড়িয়া গেল। তখন বেলা সাড়ে আটটা। সেদিন ১৯০৭ খ্রীঃ ২৭শে অক্টোবর, রবিবার। উপাধ্যায় প্রায় সাতচল্লিশ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন।

হাসপাতালে সাধু ভাস্বানী প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি মৃতদেহ দর্শনে আসিলেন। মৃতদেহ উত্তম খাটে স্থাপিত এবং প্রচুর পুষ্পে শোভিত হইল। স্বদেশী সেবকগণ শবদেহ বহন করিয়া নিমতলা শ্মশান ঘাটের দিকে চলিলেন। পাঁচ হাজারের অধিক নরনারী শবদেহের অনুগমন করিলেন। মৃতদেহের মুখমণ্ডল জীবন্ত দেহবৎ শান্ত ও সৌম্য ছিল, যেন কর্মক্লান্ত মহাপুরুষ ধ্যানমগ্ন! শবদেহ গঙ্গাস্নানান্তে চিতায় স্থাপিত হইল। শবদাহান্তে শত শত শবযাত্রী গঙ্গাস্নান করিয়া ধন্য হইলেন। রাজদ্রোহে অভিযুক্ত হইবার পর উপাধ্যায় সহকর্মীদিগকে বলিয়াছিলেন, "আমি ফিরিঙ্গীর জেলে বন্দী হয়ে নরকভোগ করবো না। আমি কখনো কাহারো অধীনে থাকি নাই, কাহারো বশ্যতা স্বীকার করি নাই। এই জীবন-সন্ধ্যায় তারা আমাকে জেলে পাঠাতে চায় আইনানুরোধে। আমি জেলে যাব না। আমি পরলোকে আহূত হয়েছি।" এই ভবিষ্যদ্বাণী বর্ণে বর্ণে সত্য হইল। শিশিরকুমার ঘোষ উপাধ্যায়ের মৃত্যু-সংবাদ শুনিয়া বলিয়াছিলেন, "আমাদের স্বরাজের শত্রুদিগকে তিনি উত্তম শিক্ষা দিয়েছেন, তিনি জয়লাভ করেছেন।" উপাধ্যায় স্বরাজের যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন তাহা চল্লিশ বৎসর পরে সত্য হইয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসবের সময় উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব লিখিয়াছিলেন, "চল, চল আজ দক্ষিণেশ্বরে যাই। আকাশে পূর্ণচন্দ্র দেখিয়া চক্ষু পরিতৃপ্ত করিয়াছ, চল আজ রামকৃষ্ণ-চন্দ্রকে দেখিয়া জড় ইন্দ্রিয়ের সহিত জীবন-মনকে সার্থক করি! বড় ভাগ্য না হইলে মর্ত্যলোকে এমন অপূর্ব রূপ, অমন আবির্ভাব দেখা যায় না। চল, চল বাঙ্গালী, আজ তোমার জাতীয় জীবনের নব জাগরণের শুভ মুহূর্তক্ষণে ঐ নরদেবতাকে দেখিয়া ধন্য হইয়া আসি! জান কি, শ্রীরামকৃষ্ণ কে?

"রামকৃষ্ণকে চিনিতে হইলে হিন্দু সাধনার গোড়ার কথা একটু বুঝিতে হয়। বিংশতি কোটী হিন্দু সন্তান জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ ঈশ্বরভাবের ভাবুক। প্রায় চারি সহস্র বৎসর পূর্বে কৃষ্ণবেদন-কমল হইতে যে গীতামৃত বিনিঃসৃত হইয়াছে, উহাই এই ঘোর কলিযুগে হিন্দু জাতিকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। আমাদিগের আচার, ব্যবহার, পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন, আদান-প্রদান সমস্তই কৃষ্ণ-প্রচারিত নিবৃত্তি-মার্গে চালিত ও নিয়মিত হইতেছে। কত বিপদ-বিপ্লব, কত ঘাত-প্রতিঘাত; কিন্তু হিন্দু জাতি কিছুতেই বিনষ্ট হয় নাই। কৃষ্ণ-প্রভাবে হিন্দু অমরত্ব লাভ করিয়াছে। বসুদেব-নন্দন, কংস-কেশী-চানুর মর্দন যে অমৃতত্ব প্রচার করেন তাহা জীবনের সকল বিভাগে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া হিন্দু জাতির জ্ঞান, ভক্তি, ধর্ম, কর্ম ও সমাজকে নূতন তেজ, নূতন শক্তি এবং নূতন গৌরব প্রদান করিয়াছে। চারি সহস্র বৎসর ধরিয়া যত ধর্মান্দোলন হইয়াছে সমস্তই সেই কৃষ্ণ-পদ্ম-নিঃসৃত জ্ঞান-গঙ্গার বীচি-বিক্ষোভ মাত্র। এইরূপ সুদূরব্যাপী যুগ-প্রলয় সাধন বা সিদ্ধির বলে হইতে পারে না!

"পুরাতন যুগের অন্তিমকালে নূতন যুগের প্রারম্ভে স্বয়ং বিষ্ণু আবির্ভূত হন। এই সনাতন সত্যটী শ্রীকৃষ্ণ দ্বাপরের অন্তে কলিযুগ প্রারম্ভে আমাদের শুনাইয়াছিলেন—

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

আজ যিনি রামকৃষ্ণরূপে তিনি সেই যুগ-সম্ভাবনা! যাহা আমরা আমাদের

সাধনা ও শক্তিবলে পারি না তাহাই তিনি কৃপা করিয়া সিদ্ধ করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি কি করিতে আসিয়াছেন ? হিন্দুর জীবন্ত বহু ইতিহাস তাঁহার শ্রীচরণ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। সেই হিন্দুর আদর্শ, হিন্দুর জ্ঞান ও শিক্ষাকে পুনরায় তিনি জীবনে পরিস্ফুট, বেগবন্ত করিতে আসিয়াছিলেন। কথাটাকে মান্য করিতে ভুলিও না। তাই আমেরিকায় তোমার বেদান্তের ধ্বজা উঠিয়াছে! ইংলণ্ডে তোমার শাস্ত্রের মর্য্যাদা বাড়িয়াছে! তোমার সামাজের ছায়া অনুসরণ করিবার জন্য সেই ফিরিঙ্গী নরনারীগুলির কি প্রাণপণ আকিঞ্চন, তাহা জান কি ? কাহার কৃপায় হইয়াছে ? তোমার গোলামখানার বিদ্যার নহে। ঐ ব্রাহ্মণের কৃপায়! রামকৃষ্ণরূপী ব্রহ্মণ্য শক্তিকে যদি আবার বরণ করিতে পার, তবে তোমার বিজয়-নিশান আবার জগৎ জুড়িয়া উড্ডীন হইবে, তোমার স্বদেশী ও স্বদেশীয়ানা ধন্য হইবে!

"আমাদের হীনতা দূর করিবার এক প্রশস্ত উপায় আছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অহং-বিন্দুগুলিকে ভগবৎচরণ-বিনির্গত জাতীয় জীবন-জাহ্নবীতে নিমজ্জিত করিতে হইবে। এস, এই জন্মোৎসবের দিনে হিন্দুর সেই ঐতিহাসিক পারম্পর্য্যকে অঙ্গীকার করি। মূল-ভ্রষ্ট হইলে বিনাশ অপরিহার্য্য। এস, আজ সমগ্র দেশের সহিত, অতীতের সুখ-দুঃখ, উত্থান-পতনের অনুভূতির সহিত, স্বদেশানুরাগের মত্ততার সহিত এক বিরাট অভেদ প্রাণ-নৈবেদ্য উৎসর্গ করি। কোটী বিবেকানন্দের আবির্ভাব হইবে, আমাদের মহাব্রত উদ্‌যাপিত হইবে। এই জন্মোৎসব দিনে রামকৃষ্ণকে সেই পারম্পর্য্যের সূত্র ধরিয়া পর্য্যবেক্ষণ কর, ধন্য হও।"

চুয়াল্লিশ

স্বামী বিরজানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দের যে দুই সন্ন্যাসী শিষ্য বেলুড় মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ হইয়ছিলেন তন্মধ্যে স্বামী বিরজানন্দ অন্যতম। অন্য একজন ছিলেন স্বামী শুদ্ধানন্দ। স্বামী শুদ্ধানন্দ ও স্বামী বিরজানন্দ ছিলেন যথাক্রমে বেলুড় মঠের পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যক্ষ। শুদ্ধানন্দজী মাত্র ছয় মাস এবং বিরজানন্দজী প্রায় তের বৎসর অধ্যক্ষ পদ অলংকৃত করিয়া ছিলেন। প্রথম অধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দের পরে অন্য কেহ এত দীর্ঘকাল অধ্যক্ষতা করেন নাই। রামকৃষ্ণ সংঘ প্রতিষ্ঠিত হইবার আনুমানিক পাঁচ বৎসর পরে তিনি সংঘে যোগদান করিয়া ১৮৯১ হইতে ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় ষাট বৎসর সংঘ-সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। এত দীর্ঘকাল কোন সন্ন্যাসী সংঘ-সেবার সৌভাগ্য লাভ করেন নাই। বর্তমান শতাব্দীর প্রথমার্ধে যে ধর্মাচার্যগণ দেশের ধর্মভাব সংরক্ষণার্থ জীবনোৎসর্গ করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে স্বামী বিরজানন্দের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

পূর্বাশ্রমে স্বামী বিরজানন্দের নাম ছিল কালীকৃষ্ণ বসু। তাঁহার পিতা ত্রৈলোক্য নাথ বসু তদানীন্তন পূর্ব কলিকাতার অন্যতম সুপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক ছিলেন। তিনি সত্যনিষ্ঠ, পরোপকারী ও অমায়িক ব্যক্তিরূপে সকলের শ্রদ্ধালাভ করেন। সত্য-ন্যায়ের জন্য তিনি জীবনে বহুবার ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন। কিছুকাল তিনি ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের গৃহচিকিৎসক ছিলেন এবং সম্ভবতঃ তথায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দর্শনলাভ করেন। তাঁহার সহধর্মিনী নিষাদকালী ধর্মপরায়ণা ও সৎগুণমণ্ডিতা ছিলেন। পতিবিয়োগের পর তিনি বৃন্দাবনে বাস করেন এবং প্রায় পঁচাশী বৎসর বয়সে লোকান্তরিতা হন। ত্রৈলোক্যনাথের চার পুত্র ছিলেন। তন্মধ্যে বিজয়কৃষ্ণ আলিপুর আদালতের প্রসিদ্ধ

এ্যাড্‌ভোকেট ছিলেন। কালীকৃষ্ণ ১৮৭৩ খ্রীঃ ১০ই জুন মঙ্গলবার পূর্ণিমা তিথিতে জগন্নাথদেবের শুভ স্নানযাত্রার দিন ভূমিষ্ঠ হন। পিতা পুত্রকে পল্লীর ছেলেদের সহিত বেশী মিশিতে দিতেন না। সেইজন্য কালীকৃষ্ণ মাতার নিকট অনেক সময়ই থাকিতেন এবং তাঁহার আদেশ পালন করিতেন।

কালীকৃষ্ণ ট্রেণিং একাডেমীতে প্রথমে অধ্যয়ন করেন। পরে যখন তাঁহার পিতা নারিকেলডাঙ্গায় স্বগৃহ নির্মাণ করেন তখন পুত্রকে রিপণ স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি করিয়া দেন। সেই সময় পুত্রের বয়স মাত্র নয় বৎসর ছিল। উক্ত বিদ্যালয় হইতে তিনি ১৮৯০ খ্রীঃ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া রিপণ কলেজে এফ. এ. ক্লাশে ভর্ত্তি হন। বৈঠকখানায় তাঁহার পিতা যে সকল ধর্মগ্রন্থ রাখিতেন তন্মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে তৎকালে প্রকাশিত দুই একখানি বই ছিল। ১৮৯০ খ্রীঃ সেইগুলি পড়িয়া তিনি সর্বপ্রথম শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে অবগত হন। লেখাপড়া ব্যতীত রান্না করা, বাগান করা, ছবি আঁকা এবং অন্যান্য হাতের কাজেও তিনি মনোযোগী ছিলেন। তাঁহার ভদ্র ব্যবহার ও মিষ্ট বাক্যের জন্য সহপাঠিগণ তাঁহাকে অতিশয় ভালবাসিতেন। স্বামী বোধানন্দ, স্বামী প্রকাশানন্দ, স্বামী বিমলানন্দ ও স্বামী আত্মানন্দ প্রভৃতি সন্ন্যাসী গুরুভ্রাতাগণ তাঁহার সহাধ্যায়ী ছিলেন। সকলে মিলিয়া ধর্মগ্রন্থ পাঠ ও ধর্মালোচনা নিয়মিতভাবে করিতেন। কলেজে পড়িবার সময় কালীকৃষ্ণের অন্তর্নিহিত ধর্মভাব সমধিক স্ফুরিত হয় এবং তিনি ধর্মজীবন গঠনে বিশেষ মনোযোগী হন। একদিন রাস্তায় কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানের উৎসব-বিজ্ঞপ্তি দেখিয়া বন্ধুগণের সহিত কালীকৃষ্ণ উৎসবে যাইতে মনস্থ করেন। ঠাকুরের পরম ভক্ত রাম দত্তের বাড়ী হইতে যোগোদ্যান পর্যন্ত কীর্তনদল উৎসব-দিবসে যাইত। কালীকৃষ্ণ প্রমুখ তরুণদল কীর্তনদলের সহিত যোগোদ্যানে যাইয়া উৎসবদর্শনে আনন্দিত হন। যোগোদ্যানে তাঁহারা রামচন্দ্র দত্তের সহিত পরিচিত হন এবং তৎপরে প্রায়ই তাঁহার নিকট যাইয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা ও ধর্মপ্রসঙ্গ শুনিতেন। রামবাবু এই সকল ধর্ম-পিপাসু তরুণগণকে অতিশয় স্নেহ করিতেন এবং ঠাকুরের কথা বলিতেন। তখন রিপণ কলেজে ইংরাজীর অন্যতম অধ্যাপক ছিলেন

রামকৃষ্ণ-শিষ্য এবং কথামৃতকার শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত। তাঁহার নিকট কালীকৃষ্ণ প্রভৃতি ছাত্রগণ শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্ন্যাসী-শিষ্যদের কথা এবং বরাহনগর মঠের কথা শুনিতে পান। বরাহনগর মঠে যাইতে উৎসাহ দিয়া মহেন্দ্রনাথ তাঁহাদিগকে বলিলেন, "ঠাকুর ছিলেন কামিনীকাঞ্চনত্যাগী। তাঁকে ঠিক ঠিক বুঝতে হলে তাঁর যে শিষ্যগণ কামিনীকাঞ্চনত্যাগী হয়েছেন তাঁদের পূত সঙ্গ করতে হয়। বরাহনগর মঠে যাবে। দেখবে, সেখানে তাঁর সন্ন্যাসী-শিষ্যরা সংসার ত্যাগ করে কীভাবে জীবনযাপন করছেন। গৃহস্থ যতই ভক্ত হোক না কেন, ঠাকুরের পুরো ভাব নিতে পারে না। সাধুর কাছে খালি হাতে যেও না। অন্ততঃ এক পয়সার কিছু হাতে নিয়ে যেও।"

অধ্যাপক মহেন্দ্রনাথের নিকট বরাহনগর মঠের কথা শুনিয়া কালীকৃষ্ণ প্রভৃতি ছাত্রগণ তথায় যাইবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইলেন। ১৮৯১ খ্রীঃ একদিন বেলা সাড়ে দশটার সময় কলেজ হইতে পলাইয়া তিনি সহপাঠী খগেন ও কাঁকুড়গাছির কুঞ্জের সহিত বরাহনগরের দিকে যাত্রা করিলেন। তখন গ্রীষ্মকাল এবং বরাহনগর যাইবার পথও তাঁহাদের জানা ছিল না। রিপণ কলেজ হইতে বরাহনগর মঠে আসিতে প্রায় একটা বাজিয়া গেল। তখন মঠে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ, নিরঞ্জনানন্দ, অদ্বৈতানন্দ, শিবানন্দ, যোগানন্দ, ত্রিগুণাতীতানন্দ, অদ্ভুতানন্দ ও সুবোধানন্দ প্রভৃতি প্রাচীন সন্ন্যাসিগণ বিশ্রামরত ছিলেন। তরুণগণ যাইয়া তাঁহাদিগকে ভূমিষ্ঠ প্রণামান্তে উপবেশন করিলেন। মঠ ও তত্রস্থ সন্ন্যাসিগণকে দেখিয়া কালীকৃষ্ণের মনে হইল, 'এখানে যেন জমাট আধ্যাত্মিক ভাব গম্‌গম্ করছে এবং সন্ন্যাসিগণ যেন এক একটি জ্বলন্ত পাবক।' উহার কয়েক মাস পূর্বে স্বামী বিবেকানন্দ পরিব্রজ্যায় ও তীর্থ-ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছেন। বৈকাল চারিটার সময় ঠাকুরঘর খোলা হইলে তরুণগণ ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন এবং তদন্তে প্রসাদ লইয়া বাড়ী ফিরিলেন। ইহার পর হইতে সুযোগ পাইলেই বরাহনগর মঠে যাইয়া তাঁহারা কয়েক ঘণ্টা কাটাইতেন ঠাকুরের ত্যাগী শিষ্যদের পূত সঙ্গে। অচিরে ঠাকুরের শিষ্যগণের দিব্যভাব সরল তরুণগণের হৃদয় অধিকার করিল। গৃহত্যাগপূর্বক হিমালয়ে যাইয়া

তপস্যা করিবার সংকল্প কালীকৃষ্ণ ও খগেনের মধ্যে উদিত হইল। কিন্তু তাঁহারা ভাবিলেন, গৃহত্যাগের পূর্বে শরীরটা আরো ভাল করা দরকার। নচেৎ তপস্যার কঠোরতা ত সহ্য হইবে না। সেইজন্য কালীকৃষ্ণ ও খগেন ডায়মণ্ডহারবারে খগেনের এক আত্মীয়ের বাড়ীতে যাইয়া দুই সপ্তাহ কাটাইলেন। তথা হইতে ফিরিয়া উভয়ে স্টার থিয়েটারে চৈতন্যলীলা অভিনয় দেখিলেন ত্যাগবৈরাগের প্রেরণালাভার্থে। গৃহত্যাগের দিন স্থির হইল। যে রাত্রি প্রভাত হইলে তাঁহারা গৃহত্যাগের উদ্যোগ করিবেন সেই রাত্রে উভয়ে সুনিদ্রায় অভিভূত আছেন; এমন সময় বয়োবৃদ্ধ ধর্মপ্রাণ সাধনশীল পরিচিত পল্লীবাসী আসিয়া গভীর রাত্রে তাঁহাদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, "শুনলাম, তোমরা গৃহত্যাগের সংকল্প করেছ। কিন্তু এখন আমি দেখলাম যে, তাতে তোমাদের অনিষ্ট হবে। তোমরা যেও না।" ইহা শুনিয়া উভয়ে বিস্মিত হইলেন এবং বৃদ্ধের বচনকে দেবাদেশরূপে লইয়া গৃহত্যাগের সংকল্প পরিত্যাগ করিলেন। যুগ-প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য যাঁহারা স্বামী বিবেকানন্দের চিহ্নিত শিষ্য হইবেন তাঁহারা অন্যত্র যাইবেন কেন ?

কালীকৃষ্ণ অধ্যয়নপ্রিয়, অনলস ও অধ্যবসায়ী ছাত্র ছিলেন এবং স্কুল-কলেজে সচ্চরিত্রের জন্য পুরস্কার পাইতেন। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ গণিতজ্ঞ ছিলেন কালীকৃষ্ণ অন্যান্য বিষয়ে ভাল হইলেও গণিতে একটু পশ্চাৎপদ ছিলেন। সেই জন্য রামকৃষ্ণানন্দজী তাঁহাকে বলিলেন, "গ্রীষ্মের ছুটীর সময় তুমি মঠে এসে থাকলে তোমায় ভাল করে অঙ্ক শিখিয়ে দেব।" গ্রীষ্মের ছুটীর জন্য যখন কলেজ বন্ধ হইল তখন কালীকৃষ্ণ মাতাপিতার অনুমতি লইয়া বরাহনগর মঠে আসিলেন। কিন্তু মঠে যাইয়া কলেজের বই পড়ায় তাঁহার মন বসিল না; ঠাকুর ঘরের কাজ ও সাধুসেবায় তাঁহার সারাদিন চলিয়া যাইত। ঠাকুরের ভোগ রান্নার জন্য পুকুর হইতে জল আনা এবং ঠাকুর-পূজার জন্য ফুল তোলা, বাসন মাজা প্রভৃতি কাজে সারাদিন কাটিয়া যাইত। গ্রীষ্মের ছুটীর দেড় মাস এইরূপে অতীত হইল। মঠবাসে কলেজের পাঠ্য গণিত আর শেখা হইল না, লেখাপড়ায় মন বসিল না। সাধুসঙ্গে তিনি ত্যাগ ও সেবার গণিতই শিখিলেন।

কলেজ খুলিবার সময় হইলে ঠাকুরের ত্যাগী শিষ্যদের সংস্পর্শে থাকিয়া তাঁহার মনে বিবেক-বৈরাগ্য উদ্দীপিত হইয়াছিল। তখন তিনি শাস্ত্রপাঠ ও সাধন ভজন করিবার জন্য মনস্থ করিলেন। যে সময় কলেজের পাঠ্য পুস্তক অধ্যয়নে অতিবাহিত হইত সেই সময় সাধনভজনাদিতে নিয়োজিত হইল। তাঁহার বাড়ীর সম্মুখে শিখদের একটি বাগান ছিল। তিনি বৈকালে প্রায়ই তথায় যাইয়া পুকুরের বাঁধা ঘাটে একাকী আপন মনে বসিয়া থাকিতেন। এই কালে স্বামী সুবোধানন্দ তাঁহার বাড়ীতে মাঝে মাঝে যাইয়া তাঁহাকে উৎসাহ দিতেন।

পুত্রের ভাবান্তর দর্শনে পিতামাতা চিন্তিত হইলেন। পিতা পুত্রকে একদিন একান্তে ডাকিয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। পুত্র পিতার নিকট সরলভাবে ব্যক্ত করিলেন যে, তিনি সংসার ছাড়িয়া বরাহনগর মঠে যোগদান করিতে ইচ্ছুক। পুত্রের শুভ সংকল্প শুনিয়া ধর্মপ্রাণ পিতা বলিলেন, "সে ত বেশ কথা। আমার তো চার ছেলে আছে, তার মধ্যে যদি একজন সন্ন্যাসী হয় সে তো আনন্দের বিষয়। তোর মা যদি অনুমতি দেন তো আমার অমত নেই।" এই বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করিয়া স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার জন্য পিতা পুত্রকে তিন দিন সময় দেন। তদন্তে পুত্র পিতার নিকট যাইয়া স্বমত ব্যক্ত করেন এবং মাতার নিকট যাইয়া সংসার-ত্যাগের অনুমতি চাহিলেন। ধর্মশীলা জননী বলিলেন, "আমি কেন তোমার ধর্মপথে বাধা দেব? আমার কোন আপত্তি নেই। তবে চলে যাবার পূর্বে আমার কাছে আর তিনটী দিন থেকে যাও, বাবা।" ত্রৈলোক্যনাথের মত পিতা এবং নিষাদকালীর মত মাতা সমাজে খুবই দুর্লভ। ধর্মপ্রাণ না হইলে ধর্মার্থে পুত্রদান করিতে মাতাপিতা সম্মত হন না। ইহার কয়েকদিন পরে কালীকৃষ্ণ পিতামাতার আশীর্বাদ লইয়া পদব্রজে বরাহনগর মঠে উপস্থিত হইলেন। ভক্তিমতী নিষাদকালী বরাহনগর মঠে ঠাকুর-ভোগ ও সাধুসেবার জন্য কিছু মিষ্টান্ন পুত্রের সহিত পাঠাইলেন। তিনি স্বহস্তে পুত্রের জন্য একখানি কাপড় হলুদ রঙে রঙাইয়া দিলেন। তৎকালে রামকৃষ্ণ মঠের ব্রহ্মচারীগণ এইরূপ রঙের কাপড় ব্যবহার করিতেন। তখন কালীকৃষ্ণের বয়স মাত্র সতের

বৎসর, তাঁহাকে অত্যন্ত তরুণ দেখাইত। বরাহনগর মঠে ঠাকুরের সাক্ষাৎ শিষ্যগণের পূতসঙ্গে থাকিয়া ধর্মসাধনের সুযোগলাভে কালীকৃষ্ণ নিজেকে ধন্যজ্ঞান করিলেন।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ঠাকুর-সেবার সব কাজ এবং মঠের অন্যান্য কাজ করিতেন। কালীকৃষ্ণ তাঁহার আদেশ পালন করিবার জন্য সকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত সর্বদা সতর্ক থাকিতেন। নানাভাবে ঠাকুরের শিষ্যগণের সঙ্গ ও সেবা করিয়া তিনি জীবন সার্থক করিলেন। স্বামী সারদানন্দ দীর্ঘ কাল রক্তামাশয়ে ভুগিয়া বরাহনগর মঠে আসিলেন। কালীকৃষ্ণ কর্মব্যস্ত থাকা সত্বেও মাঝে মাঝে তাঁহার কাছে যাইয়া ভক্তিভরে সামান্য সেবাশুশ্রূষা করিতেন। তরুণ সেবকের সশ্রদ্ধ সেবায় মুগ্ধ হইয়া স্বামী সারদানন্দ মন্তব্য করেন, "এ ছেলেটি কে? মায়ের মত এ আমার যত্ন নিচ্ছে।" এইরূপে কালীকৃষ্ণ শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী সন্তানগণের শুভাশীষ লাভ করিয়া কৃতকৃত্য হন।*

১৮৯২ খৃঃ অক্টোবর মাসে সংঘ-জননী সারদা দেবী জয়রামবাটী গ্রামে স্বীয় পিত্রালয়ে দেবী জগদ্ধাত্রী পূজার সংকল্প করেন। স্বামী সারদানন্দ কলিকাতা হইতে পূজার জন্য জিনিষপত্র লইয়া কয়েকটি ভক্তের সহিত তথায় গমন করেন। তিনি কালীকৃষ্ণকে সঙ্গে লইয়া যান। তাঁহারা হাওড়া হইতে বর্ধমান পর্য্যন্ত ট্রেণে যাইয়া তথা হইতে গরুর গাড়ীতে কামারপুকুরে উপস্থিত হন এবং তথা হইতে পদব্রজে জয়রামবাটীতে যান। জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমা কালী-কৃষ্ণকে চিবুক ধরিয়া আদর করেন। তাঁহার দিব্য স্নেহে তরুণ তাপস অভিভূত হইলেন। কালীকৃষ্ণ অল্পবয়স্ক ছিলেন বলিয়া লজ্জাশীলা সারদা দেবী তাঁহার নিকট লজ্জা করিতেন না। মায়ের আদেশ পালনের জন্য নিত্যই তিনি বহুবার মায়ের দর্শনলাভের সুযোগ পাইতেন। মাসাধিক মায়ের বাড়ীতে থাকিয়া সকলে বরাহনগর মঠে ফিরিলেন। এই সম্বন্ধে কালীকৃষ্ণ পরবর্তী জীবনে

---

* ১৯৫১ খ্রীঃ "প্রবুদ্ধ ভারত" পত্রিকার জুলাই ও আগষ্ট সংখ্যাদ্বয়ে স্বামী আত্মস্থানন্দের প্রবন্ধ দেখুন।

বলিয়াছিলেন, "মায়ের অপার্থিব ভালবাসায় ভরা হৃদয় নিয়ে ফিরে এলুম। মার কথা যা সামান্য শুনেছিলুম তাতে কে জানত যে মা এরকম মা! কে জানত যে, এরকম করে মন-প্রাণ কেড়ে নিয়ে আপনার হতেও আপনার করে নেবেন! বাড়ীর মাকে তো খুব ভালবাসতুম এবং তিনিও খুব ভালবাসতেন। কিন্তু এযে জন্মজন্মান্তরের, চিরকালের আপনার মা!"

জয়রামবাটী গ্রাম ম্যালেরিয়ার ডিপো। জগদ্ধাত্রী পূজার পরে কালীকৃষ্ণ প্রভৃতি যখন জ্বরে আক্রান্ত হইলেন তখন শ্রীমা গ্রামের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া পথ্যাদির জন্য দুগ্ধ সংগ্রহ করিতেন। তথা হইতে ম্যালেরিয়া লইয়া কালীকৃষ্ণ ফিরিলেন এবং বরাহনগর মঠে বারবার জ্বরে পড়িলেন। যে দিন তাঁহারা জয়রামবাটী ত্যাগ করিলেন সেদিন স্নেহময়ী শ্রীমা তাঁহাদের গরু-গাড়ীর সহিত অনেক দূর পর্য্যন্ত আসিলেন। স্বামী নিরঞ্জনানন্দ কালীকৃষ্ণকে কলিকাতায় বলরাম মন্দিরে রাখিয়া ঠাকুরের পরম ভক্ত ডাঃ বিপিনবিহারী ঘোষের দ্বারা চিকিৎসা করাইলেন। তিনি কালীকৃষ্ণকে বরাবর স্নেহের চক্ষে দেখিতেন এবং অসুখের সময় সেবা-শুশ্রূষার ব্যবস্থা করিতেন। তাঁহার সহিত কালীকৃষ্ণ মধ্যে মধ্যে গিরিশচন্দ্র ঘোষের বাড়ীতে যাইয়া রামকৃষ্ণ-প্রসংগ শুনিতেন। ইতোমধ্যে মঠ বরাহনগর হইতে আলমবাজারে উঠিয়া যায়। সুচিকিৎসার ফলে কালীকৃষ্ণ একটু সুস্থ হইয়া আলমবাজার মঠে ফিরিয়া গেলেন। স্বামী সারদানন্দ সুস্থ হইয়াই একটী যক্ষ্মারোগীকে সেবা করিতে লাগিলেন এবং কালীকৃষ্ণ উক্ত কার্য্যে তাঁহার সহকারী হইলেন। আলমবাজারে অবস্থানকালে তিনি প্রত্যহ মধ্যাহ্নে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর বাগান হইতে যুঁই ফুলের ফুটন্ত কুঁড়ি তুলিয়া আনিয়া ঠাকুরের জন্য মোটা মালা গাঁথিতেন। ফুল তুলিতে ও মালা গাঁথিতে প্রায় দুই তিন ঘণ্টা সময় লাগিত। দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী, কাশীপুর শ্মশান প্রভৃতি যে স্থানসমূহ শ্রীশ্রীঠাকুরের পুণ্যস্মৃতি বিজড়িত সেই সকল স্থানে মাঝে মাঝে স্বামী নিরঞ্জনানন্দের সঙ্গে যাইয়া কালীকৃষ্ণ জপধ্যান করিতেন। আলমবাজার মঠেও তাঁহার মধ্যে মধ্যে ম্যালেরিয়া জ্বর হইতে লাগিল। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের শেষার্ধে সংঘ-জননী বেলুড় গ্রামে

নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাগানবাটীতে কিছুকাল অবস্থান করেন। তখন কালীকৃষ্ণ একদিন তাঁহাকে দর্শন ও প্রণাম করিতে যান। শ্রীমা একদিন তাঁহাকে স্বীয় সন্নিধানে ডাকিয়া স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য স্বগৃহে কিছুদিন থাকিতে পরামর্শ দেন। দীর্ঘকাল ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া কালীকৃষ্ণের সুগঠিত শরীর তখন অত্যন্ত জীর্ণশীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। সেইজন্য স্নেহশীল সংঘ-জননী কালীকৃষ্ণকে উক্ত নির্দেশ দেন।

প্রথমে কালীকৃষ্ণ সুচিকিৎসা ও স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য স্বগৃহে যাইতে অসম্মত হন। কিন্তু শ্রীমা তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়া অভয় দিয়া সম্মত করিলেন এবং মন্ত্রদীক্ষা দিলেন। স্বামী যোগানন্দের পরামর্শেই তিনি শ্রীমার নিকট মান্ত্রী দীক্ষা লইতে যান। তরুণ সন্তান সাষ্টাঙ্গ প্রণামপূর্বক ভারাক্রান্ত মনে শ্রীমার নিকট বিদায় লইয়া নৌকায় উঠিলেন। তখন বর্ষাকাল, জুলাই মাস। গঙ্গা জলপূর্ণ। গঙ্গাবক্ষে ভাসমান নৌকা হইতে সন্ধ্যার ক্ষীণালোকে সন্তান শ্রীমার ঘরের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, সন্তান-বৎসলা জননী গৃহের ছাদ হইতে নৌকার দিকে তাকাইয়া আছেন। যতক্ষণ নৌকা দেখা যাইতেছিল ততক্ষণ শ্রীমা এইভাবে দাঁড়াইয়াছিলেন।

স্বগৃহে ঔষধ-পথ্যাদির সুব্যবস্থার ফলে কালীকৃষ্ণ শীঘ্র পূর্ব স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইলেন। স্বাস্থ্যলাভের পর তিনি একটি কক্ষে দরজা বন্ধ করিয়া জপ-ধ্যান করিতেন। জপ-সংখ্যা প্রত্যহ দশ হাজার হইতে ক্রমশঃ পঁচিশ হাজার পর্যন্ত বাড়িয়া গেল। উহা কোন দিন এক লক্ষ, এবং কোনদিন এক লক্ষ আট হাজার পর্যন্ত উঠিত। জপ-ধ্যানান্তে তিনি মাতৃ-সংগীত রচনা করিতেন ও গাহিতেন। বাড়ীতে তিনি সাধুর মতই থাকিতেন, কাহারো সহিত মিশিতেন না, বা কোন কথায় কান দিতেন না। খগেন, হরিপদ, সুশীল, শুকুল, সুধীর, প্রভৃতি ধর্মবন্ধুগণ আসিলে তাঁহাদের সহিত ধর্মপ্রসংগ করিতেন এবং অবসর সময়ে ভাগবত, রামায়ণ ও মহাভারতাদি ধর্মগ্রন্থ পড়িতেন। এই সময়ে তাঁহার পিতা ত্রৈলোক্যনাথ স্বগৃহের অনতিদূরে একটি বাগান ক্রয় করেন শাকসবজী চাষের জন্য। কালীকৃষ্ণ উক্ত বাগানে সমগ্র অপরাহ্ন নির্জনে থাকিয়া জপধ্যান

ও শাস্ত্রপাঠাদি করিতেন। এইরূপে প্রায় দেড় বৎসর পিত্রালয়ে অতিবাহিত হইল। তৎপরে তিনি জয়রামবাটীতে যাইয়া শ্রীশ্রীমার অনুমতি লইয়া বৃন্দাবনে স্বামী প্রেমানন্দের নিকট গমন করেন এবং মাধুকরী ভিক্ষায় উদর পূর্তি করিয়া তপস্যারত থাকেন। বৃন্দাবন যাইবার পথে কালীকৃষ্ণ কাশী ও অযোধ্যাদি তীর্থ দর্শন করিয়া যান। কাশীতে বাঙ্গালীটোলায় বংশী দত্তের বাগানবাটীতে স্বামী অদ্বৈতানন্দের সহিত কয়েক দিন বাস করেন। তখন স্বামী যোগানন্দ ও স্বামী অভেদানন্দ প্রভৃতি প্রাচীন সাধুগণ তথায় প্রমদাদাস মিত্রের বাগান বাটীতে থাকিয়া তপস্যা করিতেন। স্বামী অদ্বৈতানন্দের সঙ্গে কালীকৃষ্ণ প্রমদাদাস মিত্রের সহিত সাক্ষাৎ এবং মন্দিরাদি দর্শন করেন। অদ্বৈতানন্দজী তাঁহাকে স্নেহ করিতেন এবং কাশীধামে থাকিয়া তপস্যা করিতে বলেন। কিন্তু তিনি মায়ের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া বৃন্দাবনেই গমন করেন। ঠাকুরের ঈশ্বরকোটী পার্ষদের পূত সঙ্গে সাধনভজন করিয়া তিনি আধ্যাত্মিক জীবনে অসাধারণ উন্নতি লাভ করেন। উভয়ে ব্রজমণ্ডল পরিভ্রমণেও পরম আনন্দিত হন।

সম্ভবতঃ তখন ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দ। বৃন্দাবনে উভয়ে কালাবাবুর কুঞ্জে থাকিতেন। তথায় মাধুকরী ভিক্ষার জন্য তাঁহাকে দ্বারে দ্বারে ফিরিতে হইত এবং সেই জন্য বৃষ্টিতে ভিজিয়া উক্ত বৎসর অক্টোবর মাসে তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন। স্বামী প্রেমানন্দ তাঁহার জন্য বিশেষ পথ্যাদি এবং মথুরার সিভিল সার্জন কর্তৃক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা সত্ত্বেও তাঁহার শরীর সারিতে ছিল না। সেইজন্য প্রেমানন্দজী কালীকৃষ্ণকে এটাওয়াতে ঠাকুরের শিষ্য হরিপ্রসন্নের নিকট লইয়া যান। হরিপ্রসন্ন তখন উক্ত স্থানের সরকারী ইঞ্জিনীয়ার। হরিপ্রসন্ন স্থানীয় সিভিল সার্জনকে দিয়া কালীকৃষ্ণের চিকিৎসা, উৎকৃষ্ট ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করেন। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই কালীকৃষ্ণ সুস্থ ও সবল হইয়া উঠিলেন। হরিপ্রসন্নের একটি বড় ঘোড়া ছিল। তাহাতে চড়িয়া তিনি রাস্তা পরিদর্শন করিতে যাইতেন। হরিপ্রসন্নের নির্দেশে কালীকৃষ্ণ উক্ত ঘোড়ায় চড়িয়া সকালে দুই চার মাইল বেড়াইয়া আসিতেন। তিনি তৎপূর্বে ঘোড়ায় চড়িতে

জানিতেন না। কিন্তু তথায় সহিসের সাহায্যে ঘোড়ায় চড়া শীঘ্র শিখিয়া ফেলিলেন। তাঁহার নষ্ট স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করিয়া তিনি স্বামী প্রেমানন্দের সহিত বৃন্দাবনে ফিরিয়া আসিলেন।

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমেই কালীকৃষ্ণ স্বামী প্রেমানন্দের সহিত বৃন্দাবন হইতে আলমবাজার মঠে ফিরিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য হইতে উক্ত বৎসর ফেব্রুয়ারী মাসে কলিকাতায় আসিলেন। কালীকৃষ্ণ বেদান্ত-কেশরী বিবেকানন্দকে দেখিয়া যারপরনাই আনন্দিত হইলেন। স্বামিজীকে প্রথম দর্শনের কথা তিনি পরে এইরূপে ব্যক্ত করিয়াছিলেন, "স্বামিজীর শরীর উজ্জ্বল গৌর বর্ণ। তাঁর চক্ষুর মোহিনী শক্তির কথা শুনেছিলুম এবং আমেরিকার কাগজে পড়েছিলুম। তা দেখে অবাক্ হয়ে গেলাম। সমস্ত শরীর দিয়ে যেন একটা জ্যোতি বেরুচ্ছে। কি অপরূপ মূর্তি! একাধারে সৌন্দর্য্য ও মহাশক্তির খেলা। আমার প্রথম ধারণা ভালবাসা, ভক্তি, ও ভয়মিশ্রিত ভাব। ভোর বেলা ভিতরের বাড়ীর ছাদের উপর যখন কৌপিন মাত্র পরে তিনি আপনার ভাবে তন্ময় হয়ে পায়চারী করতেন বীরদর্পে সিংহের মত, সেকি অপূর্ব দৃশ্য! মনে হত, যেন দুনিয়াটা প্রতি পদবিক্ষেপে সরে সরে যাচ্ছে। তাঁর মুখখানা সর্বদাই লাল হয়ে থাকতো। চোখাচোখি হলে চোখ যেন ঝলসে যেত, চাওয়া যেত না।" স্বামিজীর দর্শন ও সঙ্গলাভে কালীকৃষ্ণ নবজীবন লাভ করিলেন।

আমেরিকা হইতে প্রত্যাগমনের পর স্বামিজী যে চারিজনকে আলমবাজার মঠে সন্ন্যাস-দীক্ষা দান করেন কালীকৃষ্ণ তন্মধ্যে অন্যতম।* কালীকৃষ্ণ স্বামীজির নিকট সন্ন্যাস গ্রহণান্তে গুরুদত্ত বিরজানন্দ নামে অভিহিত হইলেন। এই সময় রামকৃষ্ণ সংঘে সুপরিচিতা গোপালের মা আলমবাজার মঠে

* শ্রীশরৎচন্দ্র চক্রবর্তী প্রণীত "স্বামী-শিষ্য সংবাদ" হইতে জানা যায়, অন্য তিন জনের নাম স্বামী নির্ভয়ানন্দ, প্রকাশানন্দ ও নিত্যানন্দ। স্বামী নিত্যানন্দ স্বামীজির তিরোভাবের পরে বেলুড় মঠ ছাড়িয়া বরিশালে নরোত্তমপুর গ্রামে যাইয়া আশ্রম স্থাপনপূর্বক স্বতন্ত্র সম্প্রদায় গঠন করেন। তাঁহার সন্ন্যাসী শিষ্যগণ অদ্যাপি বিদ্যমান।

আসিয়াছিলেন। তিনি স্নেহভরে নবীন সন্ন্যাসীদের কাহার কি নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। কালীকৃষ্ণের নাম বিরজানন্দ হইয়াছে শুনিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "আহা বেশ নামটী হয়েছে। বেজার নাই, বিরজানন্দ।" সিদ্ধা সাধিকার ব্যাখ্যাটী বিরজানন্দের জীবনে অক্ষরে অক্ষরে সার্থক হইয়াছিল। তখন দেশের কয়েকটি স্থানে দুর্ভিক্ষ ও মহামারী চলিতেছিল। স্বামিজী সন্ন্যাসী শিষ্যগণকে সেবাকার্য্যে প্রেরণ করিলেন। স্বামী বিরজানন্দ প্রেরিত হইলেন দেওঘরে দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের সেবায়। তিনি স্বীয় কর্তব্য অতি সন্তোষজনক ভাবে পালনপূর্বক গুরুর প্রশংসা লাভ করেন। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষে ঢাকার ভক্তগণ বেদান্তের বার্তাবহরূপে কোন সন্ন্যাসী প্রচারককে পাঠাইতে অনুরোধ জানান। স্বামী বিরজানন্দ ও স্বামী প্রকাশানন্দকে ঢাকায় প্রচার করিতে যাইবার জন্য স্বামিজী নির্দেশ দিলেন। স্বামী বিরজানন্দ প্রচারার্থ যাইতে অসম্মত হওয়ায় স্বামিজী তাঁহাকে অনেক বুঝাইলেন। ইহাতেও যখন শিষ্য অসম্মতি প্রকাশ করিলেন তখন স্বামিজী গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "দেখ, নিজের মুক্তি যদি চাস ত জাহান্নামে যাবি। আর যদি অন্যের মুক্তির জন্য কাজ করিস্ তো এখনি মুক্ত হয়ে যাবি।" গুরুমুখে যুগবাণী শুনিয়া শিষ্যের সকল অনিচ্ছা অন্তর্হিত হইল এবং তিনি ঢাকা যাত্রা করিলেন।

শ্রীগুরুর শুভাশীষ মাথায় লইয়া শিষ্য সর্বপ্রথম বেদান্ত প্রচারে বহির্গত হইলেন। তিনি ঢাকায় এবং অন্যান্য কয়েকটি স্থানে যে বক্তৃতাবলী দিয়াছিলেন সেগুলি শ্রোতৃমণ্ডলী কর্তৃক প্রশংসিত হয়। পূর্ববঙ্গ হইতে বেলুড় মঠে ফিরিয়া তিনি শ্রীগুরুর সেবায় নিযুক্ত হইলেন। বহুমূত্র-রোগে এবং অত্যধিক পরিশ্রমে স্বামিজীর স্বাস্থ্য তখন ভগ্নপ্রায় হইয়াছিল। গুরুভক্ত শিষ্য শ্রীগুরুর সেবায় সারাদিন পরিশ্রম ও রাত্রিজাগরণ সত্ত্বেও সেবানন্দে ভরপুর থাকায় ক্লান্ত বা অসুস্থ হইয়া পড়েন নাই। ত্রুটীবিচ্যুতির ভয়ে প্রথমে শিষ্য গুরু-সেবায় ব্রতী হইতে সাহস পান নাই। স্বামী সারদানন্দের আশ্বাস পাইয়া সমস্ত মনঃপ্রাণ দিয়া তিনি গুরুসেবায় নিযুক্ত হইলেন এবং তজ্জন্য একাদিক্রমে তিন মাস বিনিদ্র রজনী

যাপন করিলেন। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে স্বামিজী দ্বিতীয় বার পাশ্চাত্য যাত্রা করিবার সময় বিরজানন্দজীকে হিমালয়ে নবপ্রতিষ্ঠিত অদ্বৈতাশ্রমের কর্মীরূপে পাঠাইলেন। উক্ত আশ্রম স্বামিজীর ইংরাজ শিষ্য-শিষ্যা ক্যাপ্টেন ও মিসেস সেভিয়ারের অর্থানুকূল্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। উভয়ে উক্ত আশ্রমে বাস করিতেন। মিসেস সেভিয়ার স্বামী বিরজানন্দকে গভীর স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। স্বামিজী পাশ্চাত্য দেশ হইতে ফিরিয়া বেলুড় মঠ হইতে মায়াবতী গমন করেন। তৎপূর্বে ক্যাপ্টেন সেভিয়ার মায়াবতীতে দেহরক্ষা করিয়াছিলেন। মাদার সেভিয়ারকে সান্ত্বনাদানের জন্য স্বামিজী মায়াবতীতে দুই সপ্তাহ অবস্থান করেন ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের শেষ হইতে ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভ পর্যন্ত। তারযোগে সংবাদ পাইয়া বিরজানন্দজী স্বামিজীর জন্য আবশ্যকীয় ঘোড়া ও ডাণ্ডী প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া মায়াবতী হইতে কাঠগোদাম স্টেশন পর্যন্ত প্রায় পঁয়ষট্টি মাইল তুষারাচ্ছন্ন পার্বত্য পথ দুই দিনে হাঁটিয়া আসেন। গন্তব্য স্থানে সন্ধ্যার পূর্বে যাইতে না পারিয়া রাত্রিতে পথিমধ্যে একটী দোকান-ঘরে গুরু ও শিষ্য আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। ১৯০০ খ্রীঃ ৩০শে ডিসেম্বর উনবিংশ শতাব্দীর শেষ রাত্রি গুরু-শিষ্য পরমানন্দে ও ধর্মপ্রসঙ্গে কাটাইলেন বিনিদ্র অবস্থায়।

শ্রীগুরু শিষ্যের এই কর্মোদ্যম দর্শনে আনন্দিত হইয়া বলিয়াছিলেন, "বাঃ! এই তো আমার ঠিক চেলা।" মায়াবতীতে শিষ্য একপক্ষ কাল শ্রীগুরুর সেবা করিবার সুযোগ পাইয়া ধন্য হইলেন। নির্জন আশ্রমে শিষ্য যুগাচার্য গুরুর মুখে অনেক উদ্দীপনাময়ী বাণী শুনিলেন। শ্রীগুরুকে পিলিভিট স্টেশনে ট্রেণে তুলিয়া দিবার জন্য শিষ্য প্রায় সত্তর মাইল পথ পুনরায় পদব্রজে আসিলেন। গুরুর সহিত শিষ্যের ইহাই শেষ সাক্ষাৎ। শ্রীগুরু যখন ১৯০২ খ্রীঃ জুলাই মাসে বেলুড় মঠে দেহরক্ষা করেন তখন প্রিয় শিষ্য পশ্চিম ভারতে আমেদাবাদ সহরে 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকার গ্রাহক-সংগ্রহ কার্যে ব্যাপৃত ছিলেন। শ্রীগুরুর আকস্মিক তিরোধানের দুঃসংবাদে শিষ্য মর্মাহত হইলেন। তাঁহার নিকট জগৎ শূন্য বোধ হইতে লাগিল। অবিলম্বে মায়াবতী ফিরিয়া যাইয়া কার্য হইতে অবসর গ্রহণ-পূর্বক তিনি তপস্যা করিবার সংকল্প করিলেন। অদ্বৈতাশ্রম

হইতে অল্প দূরে একটি কুটীরে থাকিয়া তিনি কঠোর তপস্যায় মগ্ন হইলেন। তখন প্রত্যহ তিনি ১৫।১৬ ঘণ্টা জপ-ধ্যান করিতেন। এইরূপে সাত আট মাস কঠোর তপস্যা করিবার ফলে তিনি ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। তখন হইতে জপ-ধ্যান কিঞ্চিৎ কমাইয়া শাস্ত্রাদি পাঠে নিযুক্ত হইলেন। এইরূপে আরো ছয় সাত মাস অতিবাহিত হইল। প্রায় সওয়া বৎসর কঠোর তপস্যায় তাঁহার মস্তিষ্ক দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। গুরুভ্রাতাগণের পরামর্শে চিকিৎসার্থ তিনি বেলুড় মঠে আসিলেন। তদানীন্তন সংঘাধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দ কলিকাতার প্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্যামাদাস বাচস্পতির দ্বারা তাঁহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করিলেন। তিন চার মাস সুচিকিৎসা ও সুপথ্য করিয়াও তিনি কোন উপকার পাইলেন না। এই সময়ে তিনি জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করিতে যান এবং পাচ বৎসর পরে তাঁহার দর্শন লাভ পূর্বক পরম প্রীতি লাভ করেন। শ্রীমা তাঁহার অসুখের সব কথা শুনিয়া ধ্যানের একটি কৌশল বলিয়া দিলেন। সেই ভাবে কিছুদিন চলিবার পর স্বামী বিরজানন্দ সম্পূর্ণ সুস্থ বোধ করিলেন। কঠোর তপশ্চর্যায় তাঁহার যে স্নায়বিক দুর্বলতা আসিয়াছিল তাহা শ্রীমার উপদেশে অচিরে দূরীভূত হইল। তিনি বেলুড় মঠে ফিরিয়া স্বামী তুরীয়ানন্দের সঙ্গলাভ ও তপস্যার জন্য কনখলে গমন করিলেন। তথায় প্রায় ছয় মাস মাধুকরী ভিক্ষান্নে জীবনধারণ ও প্রাণপণ তপস্যায় কাটিয়া গেল। স্বামী তুরীয়ানন্দ তাঁহাকে শাস্ত্র পড়াইতেন এবং তপস্যার প্রেরণা দিতেন। এই সময়ে একদিন তিনি ধ্যানতত্ত্ব বর্ণনাপ্রসঙ্গে বিরজানন্দজীকে বলিয়াছিলেন, "যখন আমি ধ্যান করিতে বসি তখন আমার ইন্দ্রিয়-দ্বারসমূহ রুদ্ধ করি এবং তৎপরে বাহ্য জগতের কোন কিছু আমার মনে প্রবেশ করিতে পারে না। যখন আমি ইন্দ্রিয়-দ্বার উন্মুক্ত করি কেবল তখনই মন বাহ্য জগতের সংস্পর্শে আসিতে পারে।" গভীর ধ্যানের সময় স্বামী তুরীয়ানন্দের মন কিরূপে বাহ্য জগৎ বিস্মৃত হইত ইহা বুঝাইবার জন্যই তিনি এই কথা তরুণ তপস্বী বিরজানন্দকে বলিয়াছিলেন। কিছুকাল কাশীধামে স্বামী অদ্বৈতানন্দের সঙ্গে একান্ত বাস এবং তপস্যার সুযোগও বিরজানন্দজী এক সময় লাভ করেন।

এই সময়ে অদ্বৈতাশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী স্বরূপানন্দ হঠাৎ নৈনীতালে দেহত্যাগ করেন। সংঘাধ্যক্ষের নির্দেশে বিরজানন্দজী অবিলম্বে মায়াবতী ফিরিয়া অদ্বৈতাশ্রমের কর্মভার গ্রহণ করেন। স্বামী বিরজানন্দ অদ্বৈতাশ্রমের দ্বিতীয় অধ্যক্ষ ছিলেন। উক্ত অধ্যক্ষতার কাল ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯১৩ খ্রীঃ পর্যন্ত প্রায় সাত বৎসর স্থায়ী হয়। ইহা তাঁহার কর্মজীবনের একটি উৎকৃষ্ট অধ্যায়। অদ্বৈতাশ্রমের মুখপত্র 'প্রবুদ্ধ ভারত' পরিচালনা, স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলী সংগ্রহ ও গ্রন্থাবলী প্রকাশ এবং স্বামিজীর বিস্তৃত ইংরাজী জীবনী সম্পাদনাদি কার্য স্বামী বিরজানন্দের অক্ষয় কীর্তি। এই সকল কার্যের জন্য তাঁহাকে প্রাতঃকাল হইতে গভীর রাত্রি পর্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে হইত। 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকার সম্পাদকরূপে তিনি কয়েকটি সারগর্ভ প্রবন্ধ উক্ত মাসিকে লিখিয়াছিলেন। তন্মধ্যে 'প্রাচীন ভারতে নারী' শীর্ষক সুদীর্ঘ প্রবন্ধটি ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হয়। ১৯০২ খ্রীঃ সেপ্টেম্বরে এবং ১৯০৩ খ্রীঃ জুন মাসে 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকায় তিনি যে প্রবন্ধ লিখেন তাহার নাম 'শ্রীরামকৃষ্ণ এবং জগতের প্রতি তাঁহার বাণী।' উক্ত প্রবন্ধে তাঁহার নিম্নোক্ত মন্তব্য সুচিন্তিত ও সারগর্ভ। "শ্রীরামকৃষ্ণের অদ্ভুত জীবন মর্ত্যধামরূপ মরুভূমিতে দিব্য পুষ্পবৎ বিকশিত হয়। মর্ত্যবাসী উহার সৌন্দর্যে ও সুগন্ধে বিমুগ্ধ হইতেছে। প্রাকৃতিক নিয়মে কাল শিশুর শৈশব হরণ করেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে উক্ত প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘিত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন যাবজ্জীবন সহজ সরল শিশু বয়স্ক মানবের বেশে। আস্তিক ও নাস্তিক দর্শক এই দেবশিশুকে দর্শন করিয়া তাঁহার শিশুসুলভ স্বভাব ও সারল্যে অভিভূত হইতেন। ধনীর প্রাসাদে বা দরিদ্রের কুটীরে কোথাও কোন স্থানে তাঁহার এই শিশুভাব ব্যাহত হইত না।"

সাত বৎসর অধ্যক্ষতা করিবার পর ১৯১৪ খ্রীঃ স্বামী বিরজানন্দ অদ্বৈতাশ্রম হইতে অবসর লইয়া মাদার সেভিয়ারের সহিত শ্যামলাতালে আসিয়া তাঁহারই অর্থানুকূল্যে নিবিড় জঙ্গলে বিবেকানন্দ আশ্রম স্থাপন করেন এবং তথায় প্রায় এগার বৎসর তপস্যাদিতে নিযুক্ত থাকেন। উক্ত আশ্রম

এবং উহার হাসপাতাল গড়িয়া তুলিবার জন্য তাঁহাকে কঠোর পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। ১৯১৯ খ্রীঃ পাঁচ মাস ধরিয়া তিনি দক্ষিণ ভারতে ও সিংহলে নানা তীর্থে ভ্রমণ করেন। ১৯২৬ খ্রীঃ বেলুড় মঠে রামকৃষ্ণ সংঘের সাধুসম্মেলন হয়। উহাতে যোগদান করিতে আসিয়া তিনি সংঘের কার্যকরী সমিতির সম্পাদক নিযুক্ত হন। তখন হইতে তাঁহার জীবনের অবশিষ্ট পঁচিশ বৎসর তিনি সংঘের নানা গুরু দায়িত্ব বহন করেন। ১৯৩৪ খ্রীঃ তিনি সমগ্র সংঘের সাধারণ সম্পাদক ও তৎপরে সহকারী অধ্যক্ষ এবং অবশেষে ১৯৩৮ খ্রীঃ অধ্যক্ষ-পদে অধিষ্ঠিত হন। বেলুড় মঠে অবস্থানকালে তীব্র কর্মব্যস্ততার মধ্যে তাঁহাকে সকালে মঠের পুরানো ঠাকুর-ঘরে ধ্যানমগ্ন এবং সন্ধ্যায় গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডে ভ্রমণরত দেখা যাইত। তাঁহার কর্মময় জীবন ঘড়ির কাঁটার মত নিয়মিত ভাবে চালিত হইত। তাঁহার জীবনে সেবা ও সাধনার যুগোচিত সমন্বয় দেখা যায়। প্রায় সাড়ে বারো বৎসর তিনি সুবিশাল সংঘের ধর্মগুরু ছিলেন। তিনি অতি মিষ্টভাষী, সুশান্ত ও অল্পবাক্ ছিলেন। তাঁহার শিষ্য-শিষ্যার সংখ্যা প্রায় দশ সহস্র হইবে। তন্মধ্যে অধিকাংশই গৃহী এবং অবশিষ্ট অংশ সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী। ধর্মগুরুরূপে তিনি বর্তমান ভারতে অশেষ শ্রদ্ধালাভ করিয়াছেন। তিনি একাধিক বার নাগপুর, বোম্বাই, দিল্লী প্রভৃতি স্থানে সংঘ-কার্য্য ব্যপদেশে ভ্রমণ করেন।

তিনি গ্রীষ্মকালের কয়েক মাস বেলুড় মঠে এবং বৎসরের বাকী ভাগ শ্যামলাতাল আশ্রমে কাটাইতেন। বর্ষাকালে তিনি কয়েক বৎসর দেরাদূনে ও ভিজাগাপট্টমে বিশ্রাম করিয়াছিলেন। তাঁহার অসংখ্য শিষ্যের অনুরোধে তাঁহার উপদেশাবলী তিনি 'পরমার্থ-প্রসঙ্গ' নামক পুস্তকে প্রকাশিত করিয়াছেন। উক্ত ধর্মগ্রন্থ ৩৫২টি সারগর্ভ উপদেশে সম্পূর্ণ। ইহার বাংলা সংস্করণ কলিকাতা উদ্বোধন কার্য্যালয় এবং হিন্দি সংস্করণ নাগপুর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম হইতে প্রকাশিত। উহার ইংরাজি সংস্করণ কলিকাতা অদ্বৈত আশ্রম এবং নিউইয়র্কের হার্পার এ্যাণ্ড কোম্পানি কর্তৃক পৃথক্ ভাবে প্রকাশিত। ইংরাজি সংস্করণে পাশ্চাত্য মনীষি জেরাল্ড হার্ড এবং ক্রীষ্টোফার ঈশারউডের ভূমিকা ও মুখবন্ধ আছে। জেরাল্ড হার্ড তাঁহার সংক্ষিপ্ত অথচ সারগর্ভ

ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "সমগ্র বইখানি অতি প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য তথ্য, অসীম অন্তর্দৃষ্টি ও গভীর জ্ঞানালোকে পরিপূর্ণ। তবুও ইহাতে চমকপ্রদ বা অদ্ভুত কিছু নাই। ইহাতে আছে নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে বিশুদ্ধ সনাতন ভাবধারার স্ফুরণ। ইহাই রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ ও ব্রহ্মানন্দের বাণী। শুধু তাহাই কেন, অনাদি কাল ধরিয়া সকল ঈশ্বরাদিষ্ট মহাপুরুষদের ইহাই বাণী।" "পরমার্থ প্রসঙ্গ" মুখ্যতঃ হিন্দু নরনারীদের জন্য লিখিত হইলেও উহা পাশ্চাত্যে উচ্চ প্রশংসা লাভ করিয়াছে। ক্রীস্টোফার ঈশারউঠ তাঁহার বিস্তৃত মুখবন্ধে লিখিয়াছেন, "ইহা একখানি সাধারণ পুস্তক মাত্র নয়, উহা আরও কিছু। ইহাতে আমরা পাই, একজন ধর্মগুরুর সাক্ষাৎ সংস্পর্শ, এমন একজন আচার্য্যের, বাণী, যাঁহার জীবনে এই উপদেশগুলি রূপায়িত হইয়াছিল।" সাধু জীবনের প্রথম ভাগে স্বামী বিরজানন্দ তূণক ছন্দে 'শ্রীরামকৃষ্ণ দশক' নামক একটী সংস্কৃত স্তোত্র রচনা করিয়াছিলেন। উক্ত স্তোত্র 'পরমার্থ প্রসঙ্গে' মঙ্গলাচরণরূপে প্রদত্ত। উক্ত স্তোত্রের প্রথম শ্লোকটী এইরূপ—

ব্রহ্মরূপমাদি-মধ্যশেষসর্বভাসকং
ভাবষট্‌কহীনরূপনিত্যসত্যমদ্বয়ম্।
বাঙমনোঽতিগোচরঞ্চ নেতি নেতি ভাবিতং
তং নমামি দেবদেব রামকৃষ্ণমীশ্বরম্॥

সঙ্ঘগুরুরূপে স্বামী বিরজানন্দ ১৯৪৭ খ্রীঃ শেষে বোম্বাই ও পুনাতে যান। তখন বোম্বাইর নাগরিকগণ তাঁহাকে একটী অভিনন্দন-পত্র দান করেন। ১৯৪৬ খ্রীঃ বেলুড় মঠে রামকৃষ্ণ সংঘের যে ত্রৈবার্ষিক সাধুসম্মেলন হয় তাহাতে তিনি পৌরোহিত্য করেন। উহাতে তিনি যে অভিভাষণ দেন তাহাতে তিনি স্বামিজী পরিকল্পিত নারী মঠ স্থাপনের ইঙ্গিত দেন। তাঁহার অধ্যক্ষতা-কালে আমেরিকার হলিউড সহরে স্বামী প্রভবানন্দ কর্তৃক নারী মঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাহাতে পাশ্চাত্য নারীগণ সংসারত্যাগপূর্বক ব্রহ্মচারিণী ও সন্ন্যাসিনীরূপে শ্রীসারদাদেবীর আদর্শে জীবন গঠনে নিযুক্ত। রামকৃষ্ণ সংঘের ইতিহাসে নারী মঠ স্থাপন একটী নূতন অধ্যায় বলিতে হইবে। দক্ষিণেশ্বর

গ্রামে কালীবাড়ীর অদূরে গঙ্গাতীরে অনুরূপ নারী মঠ বেলুড় মঠ কর্তৃক স্থাপিত হইতেছে।

১৩৫১ সালে অগ্রহায়ণ মাসে স্বামী বিরজানন্দ শ্যামলাতাল আশ্রম হইতে বাহির হইয়া দিনাজপুর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে উপস্থিত হন। তথায় তিনি আটদিন মাত্র অবস্থান করেন। এই সময়ে উত্তর বঙ্গের বিভিন্ন জেলার বহু নরনারী তাঁহার পুণ্য দর্শন ও আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হন। তাঁহার শুভাগমনে শহরের সুধীবৃন্দ ও ভক্তগণের মধ্যে প্রবল ধর্মভাব প্রবাহিত হয়। দিনাজপুর হইতে তিনি গৌহাটি যাইয়া কামাখ্যা তীর্থে অধিষ্ঠাত্রী দেবীর দর্শন করেন। গৌহাটিতেও বহু ভক্ত তাঁহার দর্শন ও কৃপা লাভে ধন্য হন। গৌহাটি হইতে তিনি শিলং রামকৃষ্ণ আশ্রমে যাইয়া সাতদিন বিশ্রাম করেন এবং ৮ই পৌষ সন্ধ্যায় শ্রীহট্ট রামকৃষ্ণ আশ্রমে উপস্থিত হন। তিনি যখন আশ্রমে আসিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্মুখে প্রণত হইলেন তখন শত শত ভক্তের মস্তক ভক্তিভরে প্রণত হইল। শিলং আশ্রমে অসংখ্য নরনারী তাঁহার পূত সঙ্গ লাভার্থ প্রত্যহ সমবেত হইতেন। শ্রীহট্টে তিনি যে দুই সপ্তাহ অবস্থান করেন তাহাতে আশ্রমে নিত্য উৎসব চলিয়াছিল এবং আনন্দের হাট বসিয়াছিল। শ্রীহট্ট, ডিব্রুগড়, ডিগ্‌বয়, কাছাড়, শিবসাগর, গোয়ালপাড়া, ত্রিপুরা, খাসিয়া, পার্বত্য ত্রিপুরা প্রভৃতি স্থান হইতে ভক্তগণ দলে দলে তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিতেন। প্রত্যহ ভজন, কীর্তন ও পূজা, হোম ও ধর্মালোচনায় সকলে এক অপার্থিব আনন্দ অনুভব করিতেন। সুদূর খাসিয়া পাহাড় হইতে অনেক খাসিয়া নরনারী এবং অত্যন্ত নিম্নবর্ণের ভক্তগণ তথায় তাঁহার কৃপা লাভ করিয়া কৃতার্থ হন। তিনি যে চৌদ্দ দিন শ্রীহট্ট আশ্রমে ছিলেন প্রত্যহ তিন চারি শত নরনারী সেখানে ভোজন করিতেন। সেখানে অবস্থান কালে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি উদ্‌যাপিত হয়। শ্রীহট্ট হইতে ২৩শে পৌষ তিনি ঢাকা শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে আসেন এবং ষোল দিন তথায় অবস্থান করেন। তথায় ঢাকা, ময়মনসিং ও পার্শ্ববর্তী জেলাসমূহের বহু ভক্ত এবং পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন আশ্রমের সাধুমণ্ডলী সমবেত হইয়া সংঘ-গুরুর সান্নিধ্য লাভ করেন। তাঁহার

অবস্থান কালে প্রত্যহ কয়েক শত নরনারী বিস্তৃত মঠ-প্রাঙ্গনে একত্রিত হইয়া তাঁহার পুণ্য দর্শন ও আশীর্বাদ লাভ করিতেন। ঢাকা হইতে তিনি নারায়ণগঞ্জ রামকৃষ্ণ আশ্রমে যান এবং তথায় দুই দিন থাকিয়া বেলুড় মঠে উপস্থিত হন। বেলুড় মঠে কিছুদিন বিশ্রাম করিবার পর তিনি তমলুক রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে গমনপূর্বক তথায় সপ্তাহকাল অবস্থান করেন। তথাকার তিন শতাধিক নরনারী তাঁহার কৃপা প্রাপ্ত হন।

এইরূপে স্বামী বিরজানন্দ বেলুড় মঠের অধ্যক্ষরূপে রামকৃষ্ণ সংঘের বিভিন্ন কেন্দ্রে গমন করিয়া স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে ধর্মজাগরণ সৃষ্টি করেন। রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাবধারা তাঁহার মাধ্যমে সহস্র সহস্র নরনারীর প্রাণে অমৃত সিঞ্চন করিয়াছে। সংঘ গুরুর-পদে অধিষ্ঠিত হইবার কিছুকাল পরেই তাঁহার হৃদ্‌রোগ ও যকৃতের পীড়া দেখা দেয়। কিন্তু তিনি দৈহিক অসুস্থতা অগ্রাহ্য করিয়া স্বীয় ব্রত সাধনে প্রাণপণ করেন। ইহার ফলে তাঁহার সুদৃঢ় স্বাস্থ্য ক্রমে ভাঙ্গিয়া যায়। তাঁহার ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসী শিষ্যগণকে উপদেশ দিবার সময় সংঘ-গুরু বিরজানন্দ স্বামী বিবেকানন্দের এই বাণী তাঁহাদের মনে মুদ্রিত করিয়া দিতেন—

"নিজের মুক্তি তুচ্ছ করিয়া অপরের মুক্তি সাধনে ব্রতী হও।"

জীবনের শেষ বৎসর স্বামী বিরজানন্দ যকৃৎ রোগ, মূত্রকৃচ্ছ্রতা ও হৃদ্‌রোগে শয্যাশায়ী ছিলেন। কলিকাতা প্রসিদ্ধ সার্জন ললিত মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতার মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপ্যাল মণি সরকার, ডাঃ ইন্দুভূষণ বসু প্রভৃতি প্রসিদ্ধ চিকিৎসকগণ তাঁহাকে চিকিৎসা করেন। শয্যাশায়ী রোগাক্রান্ত সন্ন্যাসীকে দেখিয়া অসুস্থ বলিয়া মনেই হইত না। তাঁহার প্রশান্ত বদনে মধুর হাসি লাগিয়াই থাকিত। ১৯৫১ খ্রীঃ ১লা জানুয়ারী স্বীয় কক্ষে খাটে বসিয়া মাইক্রোফোনে মঠপ্রাঙ্গনে সমবেত ভক্তমণ্ডলীকে তিনি অভিনন্দিত করিয়া বলিলেন, "তোমাদের সকলকে নববর্ষের শুভাশীর্ব্বাদ জানাচ্ছি। ঠাকুর তোমাদের মঙ্গল করুন।" মাতৃক্রোড়ে চিরবিশ্রাম লাভার্থ শ্রমক্লান্ত শিশুর ন্যায় তাঁহার মুখ হইতে এই স্বগতোক্তি মধ্যে মধ্যে নির্গত হইত—"মা ডেকে নাও, ডেকে

নাও।" শ্রীসারদামণি জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের আয়োজন বেলুড় মঠে আরম্ভ হইয়াছে। উহার ব্যয় নির্বাহার্থ কিছু অর্থ দান করিয়া তিনি স্বীয় সেবককে একদিন বলিলেন, "টাকার রসিদটা এনে আমার শিয়রে রেখে দাও, মার কথা মনে পড়বে।" অন্তিম শয্যায় সন্তান মাতৃচিন্তা বিস্মৃত হন নাই।

তাঁহার জীবনের শেষ মাসটি অতি কষ্টে কাটিয়াছিল। শেষ দুই সপ্তাহাধিক তিনি সম্পূর্ণ অনাহারে ছিলেন বলিলেও হয়। কখনো কখনো তিনি জলটুকু পর্যন্ত খাইতেন না। দেহরক্ষার প্রায় একমাস পূর্ব হইতে স্বীয় প্রয়াণের আসন্নতা তিনি অন্তরে বুঝিয়াছিলেন এবং নানাভাবে ইহার ইঙ্গিতও দিয়াছিলেন। ৩০শে মে (১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৮) বুধবার তাঁহার জীবনের শেষ দিন। সেদিন মধ্যরাত্র হইতেই তাঁহার প্রবল শ্বাসকষ্ট দেখা দিল। রাত্রি চারটায় ব্রাহ্মমুহূর্তে মঠের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীগণ তাঁহার ঘরে সমবেত হইয়া 'হরি ওঁ রামকৃষ্ণ' নাম গান করিতে লাগিলেন। ৪টা হইতে প্রায় তিন ঘণ্টা ধরিয়া এই নাম-গানে মঠ মুখরিত হইয়া রহিল। পরদিন সকাল প্রায় ৭টায় তাঁহার শেষ নিঃশ্বাস বহির্গত হয়। রেডিওযোগে তাঁহার প্রয়াণ-বার্তা কলিকাতা হইতে ঘোষিত হয়। ইহার ফলে বেলা ৯।১০টার মধ্যে মঠ-প্রাঙ্গণে তাঁহার শত শত শিষ্যশিষ্যা শেষ দর্শন লাভের জন্য সমবেত হইলেন। ৭টা হইতে ১১টা পর্যন্ত তাঁহার কক্ষে কালীকীর্তন চলিল। বেলা প্রায় ১টার সময় মৃত দেহ মাতৃ-মন্দিরের ঘাটে আনিয়া গঙ্গাস্নান করান হয়। তখন লোকসমাগম ন্যূনপক্ষে পাঁচ সহস্র হইয়াছিল। বেলা প্রায় দুইটার সময় শবদেহ বেলুড় মঠের দক্ষিণপূর্ব কোণে গঙ্গাতীরে ঠাকুরের শিষ্যগণের সমাধি-পার্শ্বে চিতাগ্নিতে ভস্মীভূত হয়। ১১ই জুন সোমবার বেলুড় মঠে ও শ্যামলাতাল আশ্রমে তাঁহার ভাণ্ডারা হয়। তাঁহার তিরোধানে যুগাচার্য্য বিবেকানন্দের আর কোন সন্ন্যাসী শিষ্য অবশিষ্ট রহিলেন না। তাঁহাকে যন্ত্র করিয়া রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারা প্রভূত বিস্তার লাভ করিয়াছে।

পঁয়তাল্লিশ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর *

ঠাকুর-বংশ বাংলার অন্যতম অভিজাত ও সুপ্রাচীন বংশ। উক্ত বংশে ১৮৬১ খ্রীঃ ৬ই মে ভাগ্যদেবীর বরপুত্র রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। সুদীর্ঘ পরমায়ু ও সুবিস্তৃত যশসৌরভ উপভোগান্তে ১৯১৪ খ্রীঃ ৮ই আগষ্ট কিঞ্চিদধিক অশীতিবর্ষ বয়সে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। তিনি ছিলেন ব্রাহ্ম সমাজের অন্যতম প্রধান প্রতিষ্ঠাতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ তনয়। রাজা রামমোহন ব্রাহ্ম সমাজের আদি স্রষ্টা হইলেও দেবেন্দ্রনাথই ইহাকে এক নির্দিষ্ট রূপ দান করেন। সাধারণতঃ দেখা যায়, ধনদেবী লক্ষ্মী ও বিদ্যাদেবী সরস্বতী যুগপৎ একই ভবনে অধিষ্ঠিতা হন না। কিন্তু ঠাকুর-বংশ ইহার প্রকৃষ্ট ব্যতিক্রম। পুরুষানুক্রমে ঠাকুর-বংশ সম্পদ্ ও শিক্ষার অত্যাশ্চর্য্য সঙ্গমস্থল। বর্তমান যুগে যে কয়েকটী সম্ভ্রান্ত পরিবারের মাধ্যমে ভারতবর্ষীয় শিল্পকলা, সঙ্গীত, সাহিত্য ও ধর্মাদি পুনরুজ্জীবিত এবং বিচিত্র ধারায় প্রবাহিত হয় তন্মধ্যে ঠাকুর পরিবার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র অবনীন্দ্রনাথ ভারতীয় শিল্প-জাগৃতির নবীন জনক এবং তৎশিষ্যবর্গ অধুনা দেশের অগ্রগণ্য শিল্পী। কবির জ্যেষ্ঠভ্রাতা সত্যেন্দ্রনাথ ভারতবাসীদের মধ্যে সর্বপ্রথম ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে যোগদান করেন।

শৈশবে মাত্র তিন বৎসর বয়সে রবীন্দ্রনাথ মাতৃহীন হন এবং তদবধি প্রকৃতি-মাতার প্রতি গভীর ভাবে অনুরক্ত হইয়া পড়েন। আজীবন তিনি

---

* ১৯৪১ খ্রীঃ করাচি টাউন হলে আহূত রবীন্দ্র স্মৃতি-সভায় প্রদত্ত ইংরাজী বক্তৃতার সারাংশ। ইহার সারাংশ মান্দ্রাজের "এডুকেশন্যাল রিভিউ' নামক ইংরাজি মাসিকে ১৯৪২ আগষ্ট সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এই বঙ্গানুবাদ কাশীর "উত্তরা" মাসিকে ১৩৫৮ ভাদ্র সংখ্যায় বাহির হইয়াছে।

প্রকৃতি-জননীর বিপুল প্রভাবে বিমোহিত ছিলেন এবং তাঁহার সংসারবিক্ষুব্ধ চিত্ত-সমুদ্র প্রকৃতির স্নেহময় সান্ত্বনার কোমল স্পর্শে নিরন্তর প্রশান্ত হইত। যথাসময়ে বিদ্যালয়ে ভর্তি হইলেও ক্লাশে তিনি নিয়মিত ভাবে উপস্থিত থাকিতে চাহিতেন না। এই সম্বন্ধে পরে তিনি বলিয়াছিলেন, "জৈবিক বিজ্ঞানাগারে বন্দী শশকের ন্যায় বিদ্যালয়ে আমি নিজেকে অসুখী বোধ করিতাম। যেমন বীজ অনুকূল পারিপার্শ্বিকে পড়িলে অঙ্কুরিত ও নব শস্য দানে সমর্থ হয়, কিন্তু খণ্ডিত বা উত্তপ্ত হইলে উহার সমূহ সম্ভাবনা বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতিকূল পরিবেশে থাকিয়া শিশুমনের স্বাভাবিক বিকাশ ব্যাহত হইতেছে।" উচ্চ শিক্ষার্থ রবীন্দ্রনাথ ইংলণ্ডে প্রেরিত হন, কিন্তু তত্রস্থ বিদ্যালয়েও তিনি অধিকতর সুবিধা বা উন্নতি করিতে পারেন নাই। তৎপরে তিনি বিদ্যার্জনের স্বমনোনীত পন্থা অনুসরণার্থ আত্মনির্ভরশীল হইলেন এবং স্বাধীন ভাবে বাংলা সাহিত্য অধ্যয়নে সম্পূর্ণ মনোযোগ দিলেন। ইহাতে তাঁহার অসামান্য প্রতিভার বিকাশোন্মুখ কুসুম-কলিকা সর্ববিধ সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্যের সম্ভারে সুমণ্ডিত হইয়া প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল। চৌদ্দ বৎসর বয়সে কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিয়া চারি বৎসরের মধ্যেই তিনি সাত সহস্রাধিক চরণ রচনা করেন। উক্ত সময় হইতেই গদ্যে সন্দর্ভ রচনা তৎকর্তৃক আরব্ধ হয়। তৎকালীন বাংলার বিশিষ্ট মাসিক 'ভারত' এর সম্পাদক ছিলেন কবির ভ্রাতা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। কবির সকল কবিতা পনের বৎসর যাবৎ উক্ত মাসিকে প্রকাশিত হয়। 'বন্দেমাতরম্' সংগীতের অমর উদ্গাতা ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার পূর্বসূরী ও সমসাময়িক ছিলেন। তিনি কবি-বিরচিত 'সন্ধ্যাসংগীতে'র ভূয়সী প্রশংসা করেন।

'গীতাঞ্জলি' প্রকাশের পর রবীন্দ্রনাথ বিশ্বব্যাপী যশোগৌরব লাভ করেন। উহার কবিতাবলী সম্যক্‌রূপে আত্মতৃপ্তির জন্যই রচিত হয়, প্রকাশের উদ্দেশ্যে নহে। ইংলণ্ড-যাত্রার পথে তিনি নিজেই 'গীতাঞ্জলি'র ইংরাজী তর্জমায় প্রবৃত্ত হন। সেই ইংরাজী অনুবাদ লণ্ডনের ইণ্ডিয়া সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত হয়। ইহার ফলে পাশ্চাত্য মনীষিগণ তাঁহার অভিনব প্রতিভার

সহিত পরিচিত হন এবং ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। এশিয়া মহাদেশের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম এই জগদ্বরেণ্য পুরস্কার লাভে সমর্থ হন। নোবেল পুরস্কার গ্রহণার্থ তিনি যখন সুইডেনে যান তখন আপশালার প্রধান ধর্মযাজক পুরস্কার বিতরণী সভায় এক বক্তৃতায় এই মন্তব্য করেন, "সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার সেই মনীষিরই প্রাপ্য যাঁহার মধ্যে একাধারে সাহিত্যিক ও সাধকের যুগ্মাদর্শ বিরাজমান। বর্তমান বৎসরে উক্ত আদর্শ রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষা অন্য কেহই অধিকতর সিদ্ধ করিতে পারেন নাই।"

ইউরোপে 'গীতাঞ্জলি'র ইংরাজী অনুবাদ নব্য প্রাচ্যের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থরূপে সম্বর্ধিত হইল। ইংরাজ সমালোচক ই. জে. টম্‌সন মন্তব্য করিলেন, "ফিট্‌স জেরাল্ডের 'ওমর খৈয়াম' পাশ্চাত্যে প্রকাশিত হইবার পর 'গীতাঞ্জলি'র মত অন্য কোন প্রাচ্য গ্রন্থ এইরূপ সর্বজনীন সমাদর লাভ করে নাই।" অগ্রগণ্য ইংরাজী সাহিত্য পত্রিকাসমূহের অন্যতম 'পোয়েট্রি' লিখিয়াছিলেন, "গীতাঞ্জলি"র প্রকাশনা শুধু ইংরাজী কাব্যের ইতিহাসে নয়, বিশ্ব কাব্যের ইতিহাসে এক স্মরণীয় ঘটনা।" আয়ারলণ্ডের সুকবি ডবলিউ. বি. ইয়েট্‌স বলিয়াছিলেন, 'গীতাঞ্জলি' যেমন আমার রক্তধারাকে তেজোদ্দীপিত করিয়াছিল বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া কোন কিছুই তদ্রূপ করিতে পারে নাই।" এই প্রখ্যাত কবি সমগ্র ইংরাজ পাঠক-মহলে 'গীতাঞ্জলি'কে পরিচিত করিয়াছিলেন। তিনি মনে করেন যে, মিষ্টিক সাহিত্যের ক্লাসিক গ্রন্থাবলীই রবীন্দ্রনাথের এই এক-মুষ্টি গীতাঞ্জলির মূল্য নির্ধারণ বা ভাবগাম্ভীর্য হৃদয়ঙ্গম করিবার মানদণ্ডরূপে বিবেচিত হইতে পারে। ইউরোপের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত সুসাহিত্যিক মরিস মেটারলিঙ্ক বলেন, "গীতাঞ্জলি"র কতিপয় কবিতা মহত্তম ও গভীরতম সত্যের অভিব্যক্তি এবং অদ্যাবধি রচিত কাব্যসমূহের মধ্যে দেব-মানবীয় ভাবের সর্বোত্তম বাণীমূর্তি।"

রবীন্দ্রনাথ জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ সংগীত-রচয়িতাও বটে। তিনি দুই সহস্রাধিক সুন্দর গান রচনা করিয়াছেন। তাঁহার গানগুলির ভাব, ভাষা

ও সুর বাংলা সাহিত্যে অভূতপূর্ব। তল্লিখিত ছোট গল্পগুলি নিঃসন্দেহে আধুনিক কালাবধি রচিত উৎকৃষ্ট গল্পসমূহের পর্যায়ভুক্ত হইবার যোগ্য। টলস্টয়, গোগল, টমাস ম্যান প্রভৃতি ইউরোপীয় গল্পলেখকগণের ন্যায় তিনি ছোট গল্প রচনায়ও আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। ১৯১৩ খ্রীঃ ভারত সরকার কর্তৃক তিনি 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত হন। পরবর্তী বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে 'ডক্টর অব্ লিটারেচার' ডিগ্রী প্রদান করেন। রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যের এরূপ অপূর্ব শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া গিয়াছেন যে, আজ বাংলা ভাষা সমগ্র প্রাচ্যের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সমুন্নত এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে দ্বিতীয় সমৃদ্ধ ভাষা এবং জগতের মধ্যে সপ্তম শ্রেষ্ঠ ভাষারূপে পরিগণিত হইতেছে। অধুনা লণ্ডন, অক্সফোর্ড, কেম্‌ব্রিজ, বার্লিন, প্যারিস, হার্ভার্ড এবং অন্যান্য শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয় সেমূহে বাংলা ভাষার অধ্যাপনা চলিতেছে।

বাইশ বৎসর বয়সে রবীন্দ্রনাথ বিবাহিত হন এবং প্রায় একচল্লিশ বৎসর বয়সের সময় তাঁহার পত্নীবিয়োগ ঘটে। তাঁহার পাঁচটি সন্তানের মধ্যে দুইটি পুত্র ও তিনটি কন্যা। তন্মধ্যে দুই কন্যা ও এক পুত্র শৈশবেই পরলোকগত হয়। এই শোকাবহ ঘটনাগুলি কবিকে মর্মাহত ও মৃতপ্রায় করিয়া ফেলে। গভীর অনিচ্ছাসত্ত্বেও তিনি চারি বৎসর কাল শিলাইদহে পৈত্রিক জমিদারীর তত্ত্বাবধান করিতে বাধ্য হন। তথায় তিনি সর্ব প্রথম আমাদের দেশের হতভাগ্য কৃষককুল সম্বন্ধে নিদারুণ অভিজ্ঞতা লাভ করেন। তাঁহার একটি কবিতায় তিনি বলিতেছেন যে, ভারতীয় তরুণদের প্রাথমিক কর্তব্য এই ভাগ্য-বিড়ম্বিত কৃষিজীবিদের 'মূঢ় ম্লান মূক মুখে' ভাষা দান করা এবং তাহাদের 'শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে' আশার বাণী ধ্বনিয়া তোলা। তিনি এই ভবিষ্যদ্বাণী করেন, ভারতীয় সমাজের যে শ্রেণীবিশেষ সাধারণ জনগণকে পদদলিত করিয়া উচ্চাসনে বসিয়াছে তাহারা এক সময়ে চরম অবমাননায় উহাদের সমভূমিতে নামিয়া আসিবেই আসিবে। কবির অননুকরণীয় ভাষায়—

হে মোর দুর্ভাগা দেশ যাদের করেছ অপমান
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।

মানুষের অধিকারে বঞ্চিত করেছ যারে
সম্মুখে দাঁড়ায়ে রেখে তবু কোলে দাও নাই স্থান।
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান ॥

মিস্ মেয়োর ন্যায় মিস্ র‍্যাথবোন যখন ১৯৪০ খ্রীঃ ভারতীয় নেতাদিগকে অপরাধী সাব্যস্ত করেন রবীন্দ্রনাথ স্বীয় রোগ-শয্যা হইতে উহার তীব্র প্রতিবাদ স্বরূপে লিখিয়াছিলেন, "দুই শতাব্দী যাবং ব্রিটিশ শাসনের পরেও ভারতবাসী-গণের মধ্যে শতকরা মাত্র একজন ইংরাজীতে শিক্ষিত হইয়াছে। আর, পনের বৎসর সোভিয়েট শাসনের ফলে রাশিয়াতে শতকরা ৯৩ জন বালক-বালিকা অক্ষর-জ্ঞানসম্পন্ন। ব্রিটিশ সরকার আমাদিগকে শিক্ষাদান না করা সত্ত্বেও আমরা শিক্ষিত ও সভ্য হইয়াছি।"

সাহিত্যক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব এতই বিপুল যে, ইহা তাঁহার অন্য সব কীর্তিকে পরিম্লান করিয়া দেয়। তথাপি রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অসামান্য অধিকারী। তিনি একজন বড় স্বদেশপ্রেমিকও ছিলেন। বঙ্গ-জননী তিনজন শ্রেষ্ঠ জাতীয় মহাকবির জন্মদাত্রী। তন্মধ্যে ভারতের সুপ্রসিদ্ধ জাতীয় সঙ্গীত 'বন্দেমাতরম্'এর অমর রচয়িতা বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম এবং বাংলার 'ধনধান্যে পুষ্পে ভরা' জাতীয় সঙ্গীতের প্রখ্যাত স্রষ্টা দ্বিজেন্দ্রলাল দ্বিতীয়। নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রনাথই তৃতীয়জাতীয় মহাকবি। তাঁহার 'জন-গণ-মন-অধিনায়ক' গানটি ভারতের অন্যতম বিখ্যাত জাতীয় সঙ্গীত। ১৯০৫ খ্রীঃ বাংলার অখণ্ডতা বিপন্ন হয়। তদানীন্তন ব্রিটিশ ছোটলাট প্রদেশটিকে মুসলমান-সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ববঙ্গ এবং হিন্দু-সংখ্যাগরিষ্ঠ পশ্চিম বঙ্গে বিভক্ত করেন। নবসৃষ্ট প্রদেশ পূর্ববঙ্গের রাজ্যপাল সার বি. ফুলার আন্দোলনকারী জনগণকে আসুরিক দমননীতি প্রয়োগে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিলেন। তখন রবী_নাথ বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের নেতৃ-পদে সংবৃত হন। ঐ সময়ে তিনি বহু সংখ্যক জাতীয় সঙ্গীত রচনাপূর্বক স্বদেশ-প্রেমের মহান্ আদর্শে বঙ্গীয় তরুণ সমাজকে অনুপ্রাণিত করেন। তাঁহার উদ্যোগে বঙ্গভঙ্গ দিবস রাখীবন্ধন-দিবসরূপে উদ্‌যাপিত হয়। তখন হইতে ব্রিটিশ পণ্য দ্রব্য বর্জন প্রথম শুরু হয়। দাবাগ্নির ন্যায় উক্ত আন্দোলন দেশময় ছড়াইয়া পড়িল এবং কয়েক

বৎসর পরে উহা যে লক্ষ্য বস্তু লাভে সমর্থ হয় তাহা আমরা সকলে ভাল ভাবেই জানি। ১৯১৯খ্রীঃ অমৃতসরে জেনারেল ডায়ারের অমানুষিক অত্যাচারে সংবেদনশীল কবি-হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশ আলোড়িত হয়। এই নৃশংস আচরণের প্রতিবাদ স্বরূপ রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'নাইট' উপাধি বর্জন করেন! সরকারী মনোভাবের সুতীব্র সমালোচনাপূর্বক তদানান্তন বড়লাট লর্ড চেম্‌সফোর্ডকে তখন তিনি একটি জ্বালাময়ী পত্র লেখেন। রবীন্দ্রনাথ স্বাধীন ভারতের যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন তাহা তাঁহার নিম্নোদ্ধৃত কবিতায় সুন্দররূপে প্রকাশ পাইয়াছে—

চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির,
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গনতলে দিবস শর্বরী
বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি,
যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎসমুখ হতে
উচ্ছুসিয়া উঠে, যেথা নির্বারিত স্রোতে
দেশে দেশে দিশে দিশে কর্ম-ধারা ধায়
অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়,
যেথা তুচ্ছ আচারের মরু বালুরাশি
বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি,
পৌরুষেরে করেনি শতধা, নিত্য যেথা
তুমি সর্ব কর্ম-চিন্তা-আনন্দের নেতা,
নিজহস্তে নির্দয় আঘাত করি পিতঃ,
ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত॥

সত্যই উক্ত হইয়াছে যে, সুরেন্দ্রনাথ যদি নবীন ভারতীয় জাতীয়তাবাদের কার্যকরী দিকের সুযোগ্য প্রতিনিধি হন এবং বিপিনচন্দ্র পাল ও অরবিন্দ ঘোষ উহার ভাবময় রূপকে মূর্তিমান্ করেন তবে রবীন্দ্রনাথ উহার আদর্শগত দিকের বিমূর্ত বিগ্রহ। মার্কিণ মনীষী উইল ডুরাণ্ট তখন যথার্থই বলিয়াছিলেন যে,

রবীন্দ্রনাথের অসামান্য প্রতিভা স্বাধীনতায় ভারতের জন্মগত অধিকারকে শীলমোহরাঙ্কিত করিয়াছে। বাস্তবিকই রবীন্দ্রনাথ ছিলেন স্বদেশপ্রেমের মহান্ পূজারী। রবীন্দ্রনাথ একাধারে স্বদেশপ্রেমিক ও আন্তর্জাতীয়তাবাদী। আমেরিকায়, ইংলণ্ডে এবং জাপানে তৎপ্রদত্ত বক্তৃতাবলীতে তিনি এমন মর্মদাহী ভাষায় কতিপয় জাতির সাম্রাজ্যলিপ্সাকে সমালোচনা করেন যে, উক্ত দেশসমূহের সরকারী প্রচারমূলক পুস্তকগুলিতে তাঁহার কুখ্যাতি রটিয়া যায়। তাঁহার সঙ্গীতসমূহ ও কবিতাবলী ভারতের সনাতন ভাবধারার পরিপূর্ণ প্রকাশক। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সপ্রেম মিলনে একনিষ্ঠ বিশ্বাসী হইয়াও তিনি মহাভারত ও ইউরোপের লক্ষণীয় বিশেষত্বগুলিকে উপেক্ষা করেন নাই। তিনি বলেন, "ভারতের দৃষ্টি ঐক্যের অভিমুখী, কিন্তু ইউরোপের দৃষ্টি অনৈক্যের পক্ষপাতী। অন্যের সহিত আত্মীয়তা স্থাপন ভারতের চরম লক্ষ্য। কিন্তু ভেদ ও দ্বন্দ্ব সৃষ্টিই ইউরোপের আসল স্বভাব। যেখানে ভারতীয় সমাজ সকলের জন্য স্থান-সংকুলান করিয়া দেয়, সেখানে ইউরোপ অন্য সকলকে বিতাড়িত করিয়া স্বীয় স্বার্থ সংরক্ষণে সচেষ্ট হয়। ভারত জীবন-সংগ্রামে একক, কিন্তু আনন্দ উপভোগের সময় অন্য সকলকে অংশীদার করিয়া লয়। ইউরোপ কর্মক্ষেত্রে সুসংবদ্ধ, কিন্তু সুখভোগ কালে সঙ্গীহীন। ভারত সম্মান দেয় মনুষ্যত্বকে, ইউরোপ সম্মান দেয় কর্মকে। ভারত অন্যের মুক্তি কামনা করে, কিন্তু ইউরোপ শুধু নিজের জন্য স্বাধীনতা চায়। চরম লক্ষ্যে পৌছিবার জন্য ভারতের সর্বশক্তি নিয়োজিত, কিন্তু ঐহিক লক্ষ্যের পশ্চাদ্ধাবনেই ইউরোপের প্রাণশক্তি নিঃশেষিত। ভারতের ধর্ম সর্বব্যাপক ও সুগভীর, আর ইউরোপের ধর্ম গীর্জাতেই আবদ্ধ।"

কবির বিশ্বজনীন মানস এবং বিপুলায়তন প্রজ্ঞা বিশ্বভারতীরূপে বাস্তব আকার পরিগ্রহ করিয়াছে। কলিকাতা হইতে ৯০ মাইল পশ্চিমে বোলপুর গ্রামে তিনি বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তথায় নির্জন ধর্মসাধনার নিমিত্ত তাঁহার পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রায়শঃ যাইতেন। গুরুকুল প্রথার অনুসরণে কবি তথায় প্রথমে শান্তিনিকেতন নামক একটি আবাসিক উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় এবং পরে এক মহাবিদ্যায়তন স্থাপন করেন। অধুনা ইহা এক

সম্পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত এবং কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক পরিগৃহীত। দেশদেশান্তর হইতে শিক্ষার্থিরা এখানে আকৃষ্ট হইতেছে শিল্প, সঙ্গীত, কৃষি, দর্শনাদি বিদ্যালাভের জন্য। প্যারিসের অধ্যাপক সিলভ্যাঁ লেভী, ইংলণ্ডের সি. এফ. এণ্ডরুজ ও ডবলিউ. ডবলিউ. পিয়ারসন এবং আমেরিকার এল্‌মহার্ষ্ট প্রমুখ প্রথিতযশা পাশ্চাত্য দেশীয়গণ বিশ্বভারতীতে আসিয়া সপ্রেম সেবায় ও ব্রতী হইয়াছিলেন। বিশ্বভারতী স্বীয় কলেবরের মধ্যেই এক ক্ষুদ্র জগৎ রচনা করিয়াছে। বিশ্ব-সংস্কৃতি সমুদয়ের ইহা এক অভিনব সঙ্গম-স্থল, প্রাচ্য প্রতীচ্যের অনুপম মিলন-ভূমি। মহাত্মা গান্ধী সত্যই বলিয়াছিলেন, শান্তিনিকেতনই ভারতবর্ষ। পণ্ডিত জওহরলাল বলেন, "যিনি শান্তিনিকেতন দেখেন নাই, তিনি ভারত-ভূমি দেখেন নাই।" উভয় মনীষীর উদ্ধৃত সারগর্ভ মন্তব্যের মর্মার্থ এই যে, হিন্দুস্থানের হৃদয়, ভারতের অমরাত্মার পরিচয় তথায় পরিস্ফুট। ভারতীয় সমাজের প্রাণশক্তির শোষণকারী জাতিভেদ প্রথা এবং ধর্মীয় সংকীর্ণতা সেখানে সম্পূর্ণ তিরোহিত। বরোদা কলেজের তুলনামূলক ধর্মের অধ্যাপক ডাঃ সৈয়দ মুজ্‌তবা আলী একটি শিক্ষাপ্রদ ঘটনার উল্লেখ করেন। ইহা হইতে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়, বিদেশে বিশ্বকবির ও বিশ্বভারতীর কিরূপ মর্যাদা ও প্রশংসা হইয়াছে। অধ্যাপক সৈয়দ আলী বিশ্বভারতীতে ফরাসী, জার্মান ও ফার্সী ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। ইউরোপ যাত্রার প্রাক্কালে কাবুলে আফগান সরকারের অধীনে তিনি কর্ম করিতেন। বিদেশী ভাষা-সমূহের জ্ঞান থাকার জন্য স্থানীয় শিক্ষামন্ত্রী তাঁহার বেতন বৃদ্ধি করিয়া দেন। তখন পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ. উপাধিধারী সহকর্মীরা তাঁহার বিরুদ্ধে এই মর্মে অভিযোগ আনিলেন যে, সরকারের অননুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসাবে তিনি কোন প্রকার পদোন্নতির যোগ্য নহেন। ক্ষণিক নীরব থাকিয়া শিক্ষামন্ত্রী স্বীয় সম্পাদককে বলিলেন, "তাঁহারা ঠিকই বলিয়াছেন। কিন্তু সমস্যা এই যে, তাঁহাদের উপাধি-পত্র গুলিতে সহি দিয়াছেন পাঞ্জাবের ইংরাজ রাজ্যপাল। আজকাল রাজ্যপালের সংখ্যার সীমা নাই, আমাদের ক্ষুদ্র আফগানিস্থানেই অন্ততঃ পাঁচজন রাজ্যপাল আছেন। কিন্তু মুজ্‌তবা আলীর

উপাধি-পত্রে যে রবীন্দ্রনাথের স্বাক্ষর আছে তিনি সমগ্র প্রাচ্য ভূখণ্ডকে অপূর্ব গৌরব-মহিমায় মণ্ডিত করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন একাধারে বিশ্বকবি, দেশপ্রেমী, দার্শনিক ও আচার্য। ডাঃ কে. এস. শেল্‌ভঙ্কর বলেন, "রবীন্দ্রনাথের মত বহুদর্শী, সুসমৃদ্ধ ও অলৌকিক প্রতিভার অধিকারী ইতিহাসে বিরল।" জার্মান মনীষি কাউন্ট কাইসারলিং একদা বলিয়াছিলেন, "আমি যতদূর জানি, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সর্বাপেক্ষা বিশ্বজনীন, অতিশয় উদারচেতা এবং পূর্ণতম মানব।" কবির আকৃতি ছিল রাজকীয় এবং ব্যক্তিত্ব ছিল অতুলনীয়। তাঁহার দিব্য রূপ, মনোহর চক্ষুদ্বয়, কিন্নরতুল্য মধুর কণ্ঠ, নেপোলিয়নের মত দীর্ঘ শ্মশ্রু, সুধবল কেশপাশ, কাঞ্চনবৎ দেহবর্ণ এবং সমুন্নত শরীর দেখিলে তাঁহাকে প্রাচীন যুগের ঋষি বলিয়াই মনে হইত। কবির মানস ভঙ্গিমা ছিল মিষ্টিক সাধক সদৃশ। মিষ্টিক সাধক মাত্রই যে কবি হইবেন এমন কোন নিশ্চয়তা নাই। কিন্তু কবি মাত্রই ন্যূনাধিক মিষ্টিক হন। মিস্টিক ভাবস্রোতে তিনি ক্ষুদ্র ব্যক্তিচৈতন্য হারাইয়া ফেলেন, তাঁহার মনোবিহঙ্গ তখন সুদূর কল্পনাকাশে মুক্তির আনন্দ-পক্ষ বিস্তার করে। রবীন্দ্রনাথ এক সময়ে লিখিয়াছিলেন, "যতই আমি উন্মুক্ত স্থানে বা নদীতীরে নির্জনবাস করি ততই উপলব্ধি করি যে, দৈনন্দিন জীবনের সামান্য কর্তব্যগুলির সহজ অনুষ্ঠান অপেক্ষা মহত্তর ও সুন্দরতর আর কিছু নাই।" যে ঈশ্বর-দর্শনের আকাঙ্ক্ষা তাঁহাকে বহুবার আকুল করিয়া তুলিয়াছিল তাহা তাঁহার নিম্নোক্ত কবিতায় কথঞ্চিৎ প্রকটিত।—

"যদি তোমার দেখা না পাই প্রভু এবার এ জীবনে।
যেন তোমায় আমি পাইনি প্রভু সেকথা রয় মনে।
যেন ভুলে না যাই, বেদনা পাই, শয়নে স্বপনে॥
এ সংসারের হাটে, আমার যতই দিবস কাটে।

যতই দুহাত ভরে ওঠে ধনে
তোমায় যেন পাইনি প্রভু সেকথা রয় মনে।
যেন ভুলে না যাই, বেদনা পাই, শয়নে স্বপনে॥"

রবীন্দ্রনাথ কেবলবাত্র ভারতের রাজকবি ছিলেন না, ভারতের প্রথম হিবার্ট বক্তারূপে তিনিই প্রথম মনোনীত হইয়াছিলেন। কিন্তু অসুস্থতাবশতঃ তিনি নির্দিষ্ট বৎসরে বক্তৃতাদানে অসমর্থ হন। সেইজন্য তৎপরে সার এস. রাধাকৃষ্ণণ বক্তৃতা দানার্থ ইংলণ্ডে গমন করেন। রবীন্দ্রনাথের হিবার্ট বক্তৃতাবলী 'মানুষের ধর্ম' নামক ইংরাজী পুস্তকে প্রকাশিত। উহার বঙ্গানুবাদ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাহির হইয়াছে। মার্কিণ মনীষী ওয়াল্ট হুইট্‌ম্যানের ন্যায় তাঁহার অবিচল, সীমাহীন বিশ্বাস ছিল মানুষের মহত্ত্বে। 'রবীন্দ্রনাথের দর্শন' নামক একখানি ইংরাজী পুস্তক সার এস. রাধাকৃষ্ণণ কর্তৃক লিখিত হইয়াছে। উহাতে রবীন্দ্র দর্শনের সারতত্ত্ব আলোচিত। নব্য ভারতের মুখপাত্র মহাপুরুষত্রয় রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী ও বিবেকানন্দ সমগ্র সাংস্কৃতিক জগতে সমাদৃত হইয়াছেন।

ঠাকুর পরিবার ছিল এমন একটি গৃহ যথায় উপনিষৎসমূহ শ্রদ্ধাভারে পঠিত হইত এবং সর্বোচ্চ স্থান পাইত। উপনিষদাবলী হইতে রবীন্দ্রনাথ স্বীয় ভাবরাশির অধিকাংশ গ্রহণ করেন। তাঁহার বক্তৃতাবলী এবং উপদেশ সমূহে তিনি উপনিষৎ হইতে শ্লোক আবৃত্তি করিতে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। তাঁহার অনেক শ্রেষ্ঠ গান ঔপনিষদ ভাবধারায় পরিপূর্ণ। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে, "ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি।" অর্থাৎ ভূমাই অনন্তই সুখস্বরূপ, সান্ত সসীম বস্তুতে সুখ নাই। উক্ত ভাবটি রবীন্দ্রনাথের নিম্নোদ্ধৃত কবিতায় পরিস্ফুট।—

"অল্প লইয়া থাকি তাই মোর যাহা যায় তাহা যায়।
কণাটুকু যদি হারায় তা লয়ে মন করে হায় হায়॥"

রবীন্দ্রনাথ আর একটি কবিতায় লিখিয়াছেন যে, মানুষ ঈশ্বরের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে ভয় পায়, পাছে সে সর্বস্বান্ত হয়। কিন্তু সে জানে না, যাহা ঈশ্বরে সমর্পিত হয় কেবলমাত্র তাহাই চিরতরে সংরক্ষিত হয়। কবির অনবদ্য ভাষায় উক্ত ভাব নিম্নোদ্ধৃত কবিতায় দ্যোতিত হইয়াছে—

"(আমি) ভিক্ষা করে ফিরতেছিলেম গ্রামের পথে পথে।
তুমি তখন চলেছিলে তোমার স্বর্ণরথে ॥
অপূর্ব এক স্বপ্নসম লাগতেছিল চক্ষে মম
কী বিচিত্র শোভা তোমার, কী বিচিত্র সাজ।
আমি মনে ভাবতেছিলেম, এ কোন্ মহারাজ ॥
(আজি) শুভক্ষণে রাত পোহালো, ভেবেছিলেম তবে।
আজি আমায় দ্বারে দ্বারে ফিরতে নাহি হবে ॥
বাহির হতে নাহি হতে কাহার দেখা পেলেম পথে,
চলিতে রথ ধনধান্য ছড়াবে দুই ধারে।
মুঠা মুঠা কুড়িয়ে নেব, নেব ভারে ভারে ॥
(দেখি) সহসা রথ থেমে গেল আমার কাছে এসে।
আমার মুখ-পানে চেয়ে নামলে তুমি হেসে ॥
দেখে মুখের প্রসন্নতা জুড়িয়ে গেল সকল ব্যথা
হেন কালে কিসের লাগি তুমি অকস্মাৎ।
"আমায় কিছু দাও গো" বলে বাড়িয়ে দিলে হাত ॥
(মরি) একী কথা রাজাধিরাজ, "আমায় দাও গো কিছু
শুনে ক্ষণকালের তরে রইনু মাথা-নীচু ॥
তোমার কিবা অভাব আছে ভিখারী ভিক্ষুকের কাছে
এ কেবল কৌতুকের বশে আমায় প্রবঞ্চনা।
ঝুলি হতে দিলেম তুলে একটি ছোট কণা ॥
(যবে) পাত্রখানি ঘরে এনে উজাড় করি, একি।
ভিক্ষা-মাঝে একটি ছোট সোনার কণা দেখি ॥
দিলেম যা রাজ-ভিখারিরে স্বর্ণ হয়ে এল ফিরে
তখন কাঁদি চোখের জলে দুটি নয়ন ভরে।
তোমায় কেন দিইনি আমার সকল শূন্য করে ॥"

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বিশ্বপ্রেমের সাধক-কবি। সংসার-বিরাগী সন্ন্যাসীর

অসম্পূর্ণ জীবনের উপর তাঁহার আদৌ আস্থা ছিল না। পঙ্গুত্বের মধ্যে নহে, পূর্ণতার মধ্যে জীবনকে উপভোগ করাই ছিল তাঁহার আদর্শ। তাই তিনি বলেন—

"বৈরাগ্য-সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়॥.
অসংখ্য বন্ধন-মাঝে, মহানন্দময় লভিব মুক্তির স্বাদ।"
"মুক্তি! ওরে মুক্তি কোথায় পাবি, মুক্তি কোথায় আছে।
আপনি প্রভু সৃষ্টি-বাঁধন পরে বাঁধা সবার কাছে॥"

কবির জীবন-দর্শন এই যে, যখন মানুষ ঈশ্বরের সহিত মিলিত হয় তখন তাহার সমস্ত ভ্রান্তি আনন্দানুভূতিতে পরিণত হয় এবং তাহার সকল কামনা প্রেম-ফলে শোভিত হয়।

১৯৩৬ খ্রীঃ যখন ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্ম-শতবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হয় তখন রবীন্দ্রনাথ নিম্নোক্ত ক্ষুদ্র কবিতাটী রচনা করেন পরমহংসদেব সম্বন্ধে—

"বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা।
তোমার ধেয়ানে মিলিত হয়েছে তারা॥
তোমার জীবনে অসীমের লীলাপথে।
নূতন তীর্থ রূপ নিল এ জগতে॥
দেশবিদেশের প্রণাম আনিল টানি
সেথায় আমার প্রণতি দিলাম আনি॥"

উদ্ধৃত কবিতার একটী সুন্দর ইংরাজি অনুবাদও তিনি করিয়াছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে তিনি এই গুণগ্রাহী মন্তব্য প্রকাশ করেন।— "বিবেকানন্দ বলেছেন, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে ব্রহ্মের শক্তি আছে। তিনি আরও বলেছেন যে, দরিদ্র ও সর্বহারার মাধ্যমেই ঈশ্বর আমাদের সেবা চান। কি সুমহৎ বাণী! জীবনের সকল শৃঙ্খল ও সসীমতা ভেঙ্গে অনন্ত মুক্তির পথে এ বাণী মানুষের বিবেককে জাগ্রত করে। জীবন নিয়ন্ত্রণের

কোন বিশেষ বিধি বা সংকীর্ণ নৈতিক উপদেশ এতে নেই। এই বাণীতে অস্পৃশ্যতার নিষেধ নিহিত।. কিন্তু সে নিষেধ কোন সাময়িক রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য নয়; কারণ মানবের আত্মসম্মানের হানির সঙ্গে উক্ত বাণী সমঞ্জস নয়। অস্পৃশ্যতা আমাদের প্রত্যেকের স্বারোপিত অবমাননা। বিবেকানন্দের বাণী আমাদের মানবতার পূর্ণরূপকে জাগরণের আহ্বান বলে উহা আমাদের এত যুবককে কর্ম. ত্যাগ ও সেবার বিভিন্ন পথে আকৃষ্ট করেছে।"

বর্তমান ভারতের দেশপ্রেমিক সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের মত সাধক-কবি রবীন্দ্রনাথ বলেন, "সত্য শিক্ষার্থ আমি নানা স্থানে বৃথা অনুসন্ধান করেছি। পরে আমি উপলব্ধি করলাম যে, মানুষই ঈশ্বরের আসল মূর্তি। একমাত্র প্রেম এবং সেবার পথেই ঈশ্বরের সহিত মিলিত হওয়া সহজ।" রবীন্দ্রনাথের মুখে ভারত-বাণী যুগোপযোগী হইয়া নূতন ভাষায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

সনাতন ভারতের ভবিষ্যৎ বিজয় সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেন. "জয় হইবেই, ভারতবর্ষেরই জয় হইবে। যে ভারত প্রাচীন, যাহা প্রচ্ছন্ন. যাহা বৃহৎ. যাহা নির্বাক্ তাহারই জয় হইবে। আমরা যাহারা ইংরাজি বলিতেছি, অবিশ্বাস করিতেছি, মিথ্যা কহিতেছি, আস্ফালন করিতেছি, আমরা বর্ষে বর্ষে "মিলি মিলি যাওব সাগর-লহরী সমানা।" তাহাতে নিস্তব্ধ সনাতন ভারতের ক্ষতি হইবে না। ভস্মাচ্ছন্ন মৌনী ভারত চতুষ্পথে মৃগচর্ম পাতিয়া বসিয়া আছে। আমরা যখন আমাদের সমস্ত চটুলতা সমাধা করিয়া পুত্রকন্যাগণকে কোট ফ্রক পরাইয়া দিয়া বিদায় হইব তখন সে শান্ত চিত্তে আমাদের পৌত্রদের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকিবে। সে প্রতীক্ষা ব্যর্থ হইবে না। তাহারা এই সন্ন্যাসীর সম্মুখে করযোড়ে আসিয়া কহিবে, "পিতামহ আমাদিগকে মন্ত্র দাও।" তিনি কহিবেন, "ওঁ ইতি ব্রহ্ম।" তিনি কহিবেন, "ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি।' তিনি কহিবেন, 'আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন।"

———

পরিশিষ্ট

(ক)

স্বামিজী, নেতাজী ও মহাত্মাজী*

বর্তমান যুগে যে সকল মহাপুরুষ ভারত-হৃদয়কে আলোড়িত করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ, নেতাজী সুভাষচন্দ্র এবং মহাত্মা গান্ধীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই মহাপুরুষত্রয় বর্তমান ভারতকে তিনটি বিশিষ্ট পন্থা প্রদর্শন করিয়াছেন। উক্ত পন্থাত্রয়ের মধ্যে সাম্য বা বৈষম্য কোথায় তাহা শ্রীমোহিতলাল মজুমদার তাঁহার 'জয়তু নেতাজী' পুস্তকে সুস্পষ্টভাবে আলোচনা করিয়াছেন। মোহিতলাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষার অধ্যাপক ছিলেন এবং 'বাংলার নবযুগ' গ্রন্থ লিখিয়া অমর হইয়াছেন। তাঁহার ভাষা যেমন প্রাঞ্জল, ভাব তেমন গভীর এবং বিশ্লেষণও তেমনই তীক্ষ্ণ। মোহিতলালের সুচিন্তিত তুলনার বিদ্যুতালোকে আমরা এই প্রবন্ধে দেখিব, স্বামিজী, নেতাজী ও মহাত্মাজীর মধ্যে ঐক্য বা পার্থক্য কি।

দেশ-বিদেশের বহু ব্যক্তি স্বামিজীর বাণী ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সেইগুলির মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে রোমাঁ রোলাঁ ভগিনী নিবেদিতা, মতিলাল রায় এবং মোহিতলাল মজুমদারের রচনা। আমার মনে হয়, মোহিতলালের মত কোন বাঙ্গালী সাহিত্যিকই স্বামিজীকে এত গভীরভাবে বোঝেন নাই। বাংলার নবযুগ এবং বাঙ্গালীর বিশেষত্ব বুঝিতে যাইয়া তিনি স্বামিজীর বিশিষ্ট স্বরূপটি ধরিতে পারিয়াছেন। তিনি বলেন, "স্বামিজীর মত সন্ন্যাসী অথচ দেশপ্রেমিক মহাপুরুষ পূর্বে আর ভারতবর্ষে দেখা যায় নাই।....বাঙ্গালীর প্রতিভাই ভারতীয় সাধনার বিচিত্র ও বহুমুখী প্রয়াসকে আত্মসাৎ করিয়া এবার যে নূতন বাণী ঘোষণা করিল তাহাতে জীব ও ব্রহ্ম, ইহ ও পর, নিজের মোক্ষ

---

* ১৩৫৫ সালে বৈশাখ মাসে "মাসিক বসুমতী"তে প্রকাশিত।

ও পরের মুক্তি, আর্থিক ও পারমার্থিকের ভেদ রহিল না। এই মন্ত্রই স্বামী বিবেকানন্দের অপার্থিব মুক্তি পিপাসাকে পার্থিব মুক্তি-পিপাসার সহিত অভিন্ন করিয়া তুলিয়াছিল। আত্মার বন্ধন ও দেহের বন্ধন দুই-ই যে সমান এবং দেহের বন্ধন-দশাই যে অগ্রে মোচন করিতে হইবে, এই মহাবাণী তিনিই সর্বপ্রথম বজ্রকণ্ঠে প্রচার করিয়াছিলেন।" (৮২ পৃষ্ঠা)। স্বামিজীর স্বদেশপ্রেমের অলৌকিকত্ব তাঁহার জীবনীলেখক বিদেশী রোমাঁ রোলাঁ এবং ভগিনী নিবেদিতাও বুঝিয়াছিলেন। রোমাঁ রোলাঁ বলেন, "মাতৃভূমি ভারতের সেই সর্বাঙ্গ-নগ্ন মূর্তি ও সর্বপ্রকার শোচনীয়তা তাঁহার চিত্তগোচর ছিল। অতিশয় হীন শয্যায় শায়িত সর্বাভরণরিক্ত সেই রাজেন্দ্রাণীর দেহ তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন, স্বহস্তে স্পর্শ করিয়াছিলেন।" ভগিনী নিবেদিতা বলেন, "স্বামিজী ছিলেন আজন্ম প্রেমিক। প্রেম ছিল তাঁহার জন্মগত সংস্কার। মাতৃভূমি ছিল তাঁহার হৃদয়ের আরাধ্য দেবতা। স্বদেশের কোন দোষই তিনি ক্ষমা করিতে পারিতেন না, তাঁহার সংসার-বৈরাগ্যকেও তিনি গুরুতর অপরাধ বলিয়া গণ্য করিতেন। কারণ, স্বজাতির সকল দোষকে তিনি স্বীয় দোষরূপে দেখিতেন।"

মোহিতলাল আরও বলেন, "স্বামী বিবেকানন্দ স্বজাতির ব্যাধি-যন্ত্রণাকে যেমন, হৃত স্বাস্থ্যকেও তেমন নিজ দেহে ও আত্মায় যেরূপ অনুভব করিয়াছিলেন এ যুগে তৎপূর্বে আর কেহ সেরূপ করেন নাই—এই সত্য সর্বাগ্রে ও সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে।"...."ব্যক্তিগত মুক্তিসাধনকে তুচ্ছ করিয়া এই যে স্বদেশপ্রীতি ও স্বজাতিপ্রেম, ভারতবর্ষে ইহা নূতন। আবার সেই স্বদেশপ্রেম যে অধ্যাত্ম-পিপাসার একটি রূপ ইহা ভারতবর্ষেই সম্ভব।" (২২-২৩ পৃষ্ঠা)। দেশের দুর্বিষহ দারিদ্র্য সম্বন্ধে ভাবিতে ভাবিতে স্বামিজী নির্বাক্, নিঃস্পন্দ হইতেন, অশ্রুবাষ্পে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইত। কিন্তু তাঁহার হৃদয়-বেদনার উচ্ছ্বাস রোদন-রবে প্রকাশিত হয় নাই। এই অভিশপ্ত, শয্যাশায়ী, মৃতকল্প জাতির শিয়রে বসিয়া তাহার বক্ষে ও বাহুতে বলাধান করিবার জন্য তিনি ক্রমাগত মৃতসঞ্জীবনী 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্য উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। জাতির

হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া স্বাভাবিক হইলেই সকল দুর্বলতা ও উপসর্গ আপনা হইতেই দূর হইবে, ইহাই ছিল তাঁহার সুদৃঢ় বিশ্বাস। এইজন্য তিনি বেদান্তবাণী ও সেবাধর্ম প্রচার করিলেন।

মহারাষ্ট্রের স্বামী রামদাস এবং পাঞ্জাবের গুরু গোবিন্দ সিংহ যাহার সূত্রপাত করিলেন, স্বামিজীর দ্বারা তাহা সম্পূর্ণ হইল। বঙ্কিমচন্দ্র যাহাকে স্বপ্নে দেখিলেন স্বামিজী তাহাকে ধ্যানে পাইলেন। মোহিতলাল সত্যই বলিয়াছেন, 'বঙ্কিমচন্দ্র যে জাতীয়তা-মন্ত্র প্রচার করিয়াছিলেন সেই জাতীয়তা-ধর্ম স্বামী বিবেকানন্দের ধ্যান-দৃষ্টিতে আরও বিশুদ্ধ ও গভীর হইয়া উঠে, জাতির হৃদয়ে তিনিই প্রকৃত 'মহাভারতে'র বীজ বপন করেন।' স্বামিজী ছিলেন যুগাচার্য, জাতির জাগরণ-মন্ত্রের ঋষি। তিনি যাহা চিত্তগোচর করিলেন, তাহা দৃষ্টিগোচর করিবার জন্য বহু বিবেকানন্দের আবির্ভাব হইবে, মহাপ্রয়াণের প্রাক্কালে তিনি অনুচ্চ স্বরে এই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন। মোহিতলাল বলেন, 'বিবেকানন্দ যাহাকে তত্ত্বরূপে প্রত্যক্ষ করিয়া আসন্ন ভবিষ্যতের প্রয়োজনে চতুর্দিকের মাটিতে বপন করিয়াছিলেন তাহারই একটি বীজ অনতিবিলম্বে অঙ্কুরিত হইয়া নেতাজী নামক বিশাল মহীরুহে পরিণত হইয়াছে।" (৮৩ পৃষ্ঠা)। মোহিত-লাল আরও বলেন, "জাতির আত্মরক্ষা ও আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য পাশ্চাত্ত্যের নিকট হইতে বঙ্কিমচন্দ্র যজ্ঞের যে সমিধ সংগ্রহ করিয়াছিলেন সেই অগ্নিতেই স্বামী বিবেকানন্দ নব পুরুষযজ্ঞের মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক আহুতি প্রদান করিলেন। ভারতের সেই প্রাচীন মুক্তিসাধনাকেই তিনি ঋষির অরণ্য, যোগীর গুহা এবং ভক্তের আশ্রম হইতে উদ্ধার করিয়া জাতি ও সমাজের জীবন-সমস্যার সহিত সংযুক্ত করিয়া দিলেন। আহুতিশেষে সেই যজ্ঞাগ্নি হইতে যে পুরুষের আবির্ভাব হইল, সেই বাণী যে মূর্তি ধারণ করিল, তাহার লৌকিক নাম নেতাজী সুভাষচন্দ্র।" (৭৬ পৃষ্ঠা)। মনীষী মোহিতলাল বলেন, এই অর্থে নেতাজী স্বামিজীর উত্তরসাধক, মন্ত্রশিষ্য বা মানস পুত্র। "স্বামিজীর দেশপ্রেম মন্ত্রই নেতাজীর সাধনায় বাস্তবে পরিণত হইয়াছে।" "যে ভারতকে স্বামিজী ধ্যানে লাভ করিয়াছিলেন নেতাজী তাহাকেই মূর্তিতে গড়িয়া তুলিয়াছেন।" (৫৩-

৩৬ পৃষ্ঠা)। "এক জনের হৃদয়ে যাহা বীজরূপে ছিল, আর এক জনের জীবনে তাহাই বৃক্ষরূপ ধারণ করিয়াছে।"

স্বামিজীর প্রভাব নেতাজীর জীবনে বাল্যকাল হইতেই পড়িয়াছিল। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্য ছিল তাঁহার কাছে দিব্য প্রেরণার অনন্ত উৎস। সেই আদর্শ জীবনে পরিণত করিবার জন্য তিনি কৌমার্য্য করিলেন। বেলুড় মঠে যোগদান করিবার জন্য তিনি একবার সেখানে গিয়াছিলেন। বিদেশ হইতে 'উদ্বোধন' সম্পাদককে লিখিত একটি পত্রে নেতাজী সুভাষচন্দ্র স্বামিজীকে গুরুরূপে স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং মোহিতলালের সিদ্ধান্ত সত্যই। হিন্দু ধর্মের যে সনাতন স্বরূপ মহাভারতে পাওয়া যায় তাহাই স্বামিজী বর্তমান যুগে পুনরুদ্ধারপূর্বক বৃহত্তর মহাভারতের জাগরণী গাহিলেন। গুরু-কৃপায় তিনি আমাদের ধর্মকে মধ্যযুগীয় সঙ্কীর্ণতা হইতে মুক্ত করিয়া যুগোপযোগী রূপ দান করিলেন। মোহিতলালের মতে ভারতের স্বাজাত্য-সাধনায় ধর্মকে প্রয়োগ করিয়া বাঙ্গালী আধুনিক ভারতে এক নবধর্মের গুরু হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রই এই ধর্মের আদি দ্রষ্টা। পরে স্বামী বিবেকানন্দ ও নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জীবনে ইহার স্ফুটতর ও পূর্ণতর অভিব্যক্তি হইয়াছে। স্বামিজী ও নেতাজীর মধ্যে বৈচিত্র্যটিও মোহিতলালের সূক্ষ্ম দৃষ্টি এড়ায় নাই! তিনি বলেন, "স্বামিজী ছিলেন আদৌ বৈদান্তিক সন্ন্যাসী, পরে দেশপ্রেমিক, আর নেতাজী ছিলেন আদৌ দেশপ্রেমিক, পরে দেশসেবার জন্য সন্ন্যাসী।" "যে দেশপ্রেমকে স্বামিজী জ্ঞানে পাইয়া কর্মে রূপ দিতে চাহিয়াছিলেন, নেতাজী ইহাকে জ্ঞানেও নয়, ধ্যানেও নয়, তাঁহার নিশ্বাস-বায়ুরূপে পাইয়াছিলেন।" "শাক্ত বাঙ্গালী নেতাজীর আত্মবলির জন্য একটি দেবীর প্রয়োজন ছিল; ধ্যান কল্পনা বা কবিত্বের দেবী নয়, একেবারে সাক্ষাৎ মৃন্ময়ী মূর্তি। দেশমাতৃকার ভূলুণ্ঠিত রাজরাজেশ্বরী মূর্তি তাঁহাকে পাগল করিয়াছিল। তাঁহারই প্রেমে তিনি সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হইলেন; জীবন ও যৌবন তাঁহাকেই সমর্পণ করিলেন! এমন সর্বত্যাগ আর কেহ করে নাই।" (১৪৮-১৫০ পৃষ্ঠা)। দশের, দেশের দুঃখ তাঁহাকে কত ব্যথিত, অভিভূত করিত তাহা ভাবিলে পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হয়। রাজপথ

হইতে রোগকাতর, দরিদ্র বালককে কুড়াইয়া বুকে করিয়া বাড়ীতে আনিয়া নেতাজী তাহার সেবা করিতেন। রাজপুত্র সিদ্ধার্থের আহত পক্ষীসেবার মতই এই সমবেদনা অদ্ভুত! ভগ্নস্বাস্থ্য নেতাজী যখন মাদ্রাজ জেলে পাকস্থলীর কঠিন ব্যাধিতে মরণাপন্ন ও আহারত্যাগী, তখনও প্রত্যহ স্বহস্তে তিনি কিছু না কিছু খাদ্য পাক করিয়া জেলের তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদীগণকে আহ্বান করিয়া খাওয়াইতেন এবং সেই সুযোগে তাহাদিগকে মিষ্টবাক্যে সদুপদেশ দিতেন। স্বদেশের নর-নারী তাঁহার কাছে সহোদর-সহোদরা তুল্য ছিল। প্রকৃত দেশাত্মবোধ জাগিলে মানুষের চিত্তে এমনি সমবেদনাই জাগে, মানুষ অপরের দুঃখকে এমনি ভাবে নিজের দুঃখ বলিয়াই মনে করে।

স্বামিজীর মত নেতাজী দেশের দুর্গতি ও দাসত্বকে কিরূপ প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়াছিলেন তাহা নিম্নোক্ত ঘটনা হইতে স্পষ্ট ভাবে বোঝা যায়। সিঙ্গাপুরের এক সুবিশাল প্রাঙ্গনে সুসজ্জিত সেনাবাহিনী ও সমবেত জন-সমুদ্রের সম্মুখে মঞ্চোপরি যোদ্ধবেশ-পরিহিত নেতাজী দেব-সেনাপতি কার্তিকেয়ের ন্যায় দণ্ডায়মান। মাতৃভূমির দাসত্ব-শৃঙ্খল মোচনের জন্য তিনি সর্বস্ব পণের শপথ-পত্র পাঠ করিতেছেন। লাঞ্ছিত দেশের চল্লিশ কোটি নরনারীর দুর্বিষহ দারিদ্র্য ও দুর্গতির বেদনা তাঁহার হৃদয়ে মুহূর্তের মধ্যে পুঞ্জীভূত হইল। অসহ্য মর্মপীড়ায় তাঁহার দেহ নিঃস্পন্দ ও প্রস্তরবৎ সংজ্ঞাশূন্য এবং চক্ষু পলকহীন হইল। তিনি ভাবাবিষ্ট, সমাধিস্থ হইলেন। প্রায় বিশ মিনিট বা অর্ধ ঘণ্টা কাল তিনি এইরূপ বাহ্যজ্ঞানশূন্য অবস্থায় অভিভূত রহিলেন। এমন দেশাত্মবোধ সত্যই দুর্লভ। এইরূপ গভীর স্বদেশ প্রেম ভারতেই সম্ভব, অন্যত্র নহে। মোহিতলাল বলেন, "নেতাজীর সেই বিরাট বিশাল হৃদয়-মুকুরে ভারতবর্ষ আজ তাহার আত্মার প্রতিবিম্ব দেখিয়া উঠিয়া বসিয়াছে, তাহার নবজন্ম হইয়াছে।" পঞ্চাশ বৎসর বাঙ্গালী যে স্বাধীনতার সাধনা করিয়াছে তাহার ফলে নেতাজীর আবির্ভাব বাংলা দেশেই সম্ভব হইয়াছে। তিনি বর্তমান ভারতের, বর্তমান যুগের মুখ্য প্রতিনিধি। ইহা নির্দেশপূর্বক মোহিতলাল নেতাজীর জীবন-

ব্রতটি সুন্দরভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি নেতাজীকে বিবেকানন্দ-জীবনের জীবন্ত ভাষ্যরূপে দেখিয়াছেন। তাঁহার মতে স্বামিজীকে না বুঝিলে নেতাজীকে বুঝা যাইবে না এবং নেতাজীকে না দেখিলে স্বামিজীর দর্শনলাভ হইবে না। (২০ পৃষ্ঠা)। মোহিতলাল মনে করেন, নেতাজীর আবির্ভাবে স্বামিজীর ভবিষ্যৎ বাণী সফল হইয়াছে। নেতাজী না আসিলে স্বদেশ-প্রেমিক সন্ন্যাসী বিবেকানন্দকে কে বুঝিত? কে তাঁহার অসমাপ্ত কার্য্য পূর্ণ করিত? মোহিতলালের ভাষায়, "সেই ভবিষ্যৎ বাণী যে এত শীঘ্র ফলিবে তাহা কে জানিত? আবার সেই সন্ন্যাসী। সেই ত্যাগ, সেই প্রেম। সেই কৌপীন মাত্র সম্বল করিয়া আবার তেমনি দেশের জন্য দেশত্যাগ! সেবার জগৎ-ধর্ম মহামণ্ডলীতে জয় জয় রব, এবার জগৎ-মহাকুরুক্ষেত্রে 'জয় হিন্দ' রব। সেবার সশরীরে প্রত্যাগমন, এবার প্রত্যাগমন অশরীরে।" (৪৪ পৃষ্ঠা)।

উপরোক্ত আলোচনায় আমরা দেখিয়াছি, স্বামিজী ও নেতাজীর মধ্যে সাদৃশ্য বা পার্থক্য কোথায়। এখন মহাত্মাজী ও নেতাজীর মধ্যে মতভেদ বা আদর্শগত বৈষম্য কী, তাহাই আলোচ্য। নেতাজীর জীবনের মূলমন্ত্র, 'আগে স্বাধীনতা, পরে আর সব।' যে পরাধীনতার বেদনা বঙ্কিম-বিবেকানন্দের সাধনায় মানসী মূর্তিতে প্রকাশ পাইয়াছিল তাহাই নেতাজীতে বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। মোহিতলালের ভাষায়, "সুভাষচন্দ্র কেবল যুদ্ধনায়ক নেতা নহেন; ইংরেজের সহিত যুদ্ধ এবং সেই যুদ্ধে জয় লাভই তাঁহার সাধনার শেষ ফল নহে। তিনি কেবল শত্রুঞ্জয় নহেন, তিনি আরও অনেক বড়। তিনি নিজে মৃত্যুঞ্জয় হইয়া জাতির মৃত্যুভয়হারী। যে বীর্য্যবলে বিনতানন্দন গরুড়ের মত স্বর্গ হইতে স্বাধীনতার অমৃত-সোম করা যায় তিনি সেই বীর্য্যের অবতার। সেই বীর্য্য ও সেই অমৃত-পিপাসা তিনি আপনার বক্ষ হইতে সমগ্র জাতির বক্ষে সঞ্চারিত করিয়াছেন। তিনি বিবেকানন্দের উত্তরসাধক।" মোহিতলাল বলেন, আধুনিক ভারতে নেতাজী ভিন্ন আর কাহারো মোহভঙ্গ হয় নাই। এবং তিনিই স্বদেশে প্রকৃত মুক্তিকে অপরোক্ষ করিয়াছেন। সেই এক মুক্ত জীবের অপূর্ব উৎসাহ ও উল্লাস শত শত জীবকে বন্ধন-মুক্ত করিয়াছে। একটি

ক্ষুদ্র শলাকা যেমন কক্ষব্যাপী বহু শতাব্দী স্থায়ী অন্ধকার নিমেষে নাশ করে তেমনি নেতাজীর মুক্তিলাভে সমগ্র দেশের মোহভঙ্গ হইয়াছিল। যে মুক্তিকে তিনি নিজের মধ্যে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, বাহিরেও সেই মুক্তিকে চাক্ষুষ করাই ছিল তাঁহার জীবন-ব্রত। সেই জীবনব্রত উদ্‌যাপনে তিনি তিলে তিলে প্রাণপাত, করিয়াছেন। সেই জন্যই তাঁহার এত অধৈর্য্য, এত উৎসাহ, এত উন্মাদনা। নেতাজী মরেন নাই, তিনি অমর। তাঁহার মৃত্যুতে কোটি জীবন জাগিয়াছে। তিনি যে মহাত্যাগের দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন তাহাই আজ লক্ষ লক্ষ নরনারীর হৃদয়ে দিব্য দীপ-শিখার ন্যায় জ্বলিতেছে। দেশের অধীনতা-মোচন যে মহাজীবনের একমাত্র সাধনা তাহা কি কখনও ব্যর্থ হয়? দেশের স্বাধীনতার জন্য প্রাণদান করিতে যাইয়া তিনি হইলেন নেতাজী অর্থাৎ অগ্রণী। সরদার ত শিরদারই হয়।”

মোহিতলাল বলেন, “নেতাজীর পন্থা কি নিষ্ফল হইয়াছে? মহাত্মাজীর পন্থা কি সফল হইয়াছে? এই দুইটি প্রশ্নের উত্তর যাঁহারা ধীরভবে চিন্তা করিবেন তাঁহারা বলিতে বাধ্য হইবেন যে, নেতাজীর নিষ্ফলতাও সারা ভারতে যে কল্যাণ সাধন করিয়াছে মহাত্মাজীর অধুনা বিঘোষিত তথা-কথিত সফলতা সেই কল্যাণকেও বিপন্ন করিতে চলিয়াছে।” বাহিরের সফলতা বা নিষ্ফলতা মহত্বের মাপকাঠি হইত পারে না। মোহিতলালের মতে ইতিহাস বা কালের কতকগুলি শুভলগ্ন আছে। সেই লগ্ন যদি এইরূপ জীবনে যুক্ত হয় মহাত্মাজীর মত পুরুষের অভ্যুত্থান ঘটে। লগ্ন যদি অনুকূল না হয় তবে তাঁহা অপেক্ষা মহত্তর ব্যক্তি ইতিহাসের অগোচরে থাকিয়া যান।

নেতাজীর দেহত্যাগ নানা জনে নানা ভাবে প্রচার করা সত্ত্বেও লোকে এখনও তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করে কেন? তিনি যে মরিয়াছেন এ কথা লোকে বিশ্বাস করিতে চাহেনা কেন? ইহার উত্তরে মোহিতলাল বলেন, “এক্ষণে ভারতবাসীর মনের অবস্থা বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষের সেই কুন্দনন্দিনীর মত। যে পিতা ছাড়া তাহার আর কেহ নাই সেই পিতার মৃত্যুশিয়রে সে বসিয়া আছে। গভীর রাত্রে জনহীন কক্ষে পিতার প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গেল।

তখনও সেই ক্ষীণ দীপালোকে সে তাহার মুখের পানেচাহিয়া আছে। পিতার মৃত্যু হইয়াছে এ বিশ্বাস সে কিছুতেই করিবে না। কারণ, তাহার যে আর কেহ নাই—এমন সর্বনাশ কি হইতে পারে? তাই কুন্দনন্দিনী তাহার মৃত পিতাকে জীবিত মনে করিয়া সেই মহাভয় দূর করিতে চায়। নেতাজী জীবিত কি মৃত, সে বিশ্বাস ভারতবাসীর পক্ষেও তেমনি। তাহার যে আর কেহ নাই; তুমি হুঙ্কার করিলে কি হইবে?" (১২৬ পৃষ্ঠা)।

নেতাজীর সহিত মহাত্মাজীর যে বিরোধ তাহা বুঝিলেই উভয়ের বৈশিষ্ট্য ধরা পড়িবে। নেতাজীর নীতি গান্ধীবাদের প্রতিবাদরূপেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। গান্ধীবাদ অন্ধ ধর্মমতের ন্যায় জন-সাধারণের চিত্ত অধিকার করিয়াছে। উহা মধ্যযুগীয় আধ্যাত্মিকতারই নবীন রূপ। ইহা অন্ধ বিশ্বাসের ধর্ম। ইহাতে যুক্তি-বিচারের স্থান নাই। যে মধ্যযুগীয় সঙ্কীর্ণতা ও ভাবপ্রবণতা হইতে বিবেকানন্দপ্রমুখ আধুনিক ধর্মাচার্য্যগণ আমাদের ধর্মকে মুক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন মহাত্মাজী তাহাই প্রচার ও পুষ্ট করিলেন। ফলে, কংগ্রেসও তাঁহার নেতৃত্বে স্বাধীনতার সংগ্রাম ভুলিয়া অধ্যাত্মবাদে অন্ধ বিশ্বাসী হইল, লক্ষ্য হারাইয়া উপলক্ষ্যকে মুখ্য করিল, দেশভক্তির উপরে গান্ধীভক্তিকে স্থান দিল। যে বাংলায় 'অতীতের দুয়ার সবলে ভাঙ্গিয়া অত্যুগ্র বর্তমান' প্রবেশ করিল, যে বাংলা দেশ স্বাধীনতার প্রথম স্বপ্ন দেখিল ও স্বাধীনতাকে ধ্যানে পাইল, এবং যে বাংলায় স্বাধীনতা আন্দোলন জন্মলাভ করিল, সে বাংলার জাগরণকে মহারাষ্ট্রের লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক ব্যতীত অন্য কোন দেশনায়ক প্রীতির সহিত দেখিলেন না, এমন কি, মহাত্মাজীও নহেন। সেইজন্য মহাত্মাজীর সহিত যেমন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মতভেদ ঘটিয়াছিল তেমনি নেতাজীরও বিরোধ হইল। কিন্তু অবশেষে অবস্থাচক্রে পড়িয়া বাধ্য হইয়া কংগ্রেস দেশবন্ধু বা নেতাজীর মতই পরে প্রকারান্তরে গ্রহণ করিয়াছে। কংগ্রেসের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ এবং 'কুইট ইণ্ডিয়া' আন্দোলনের দ্বারা ইহাই নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়। নেতাজী যখন দ্বিতীয় বার রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন, তখন মহাত্মাজী ভগ্ন হৃদয়ে গভীর আক্ষেপ সহকারে বলিয়াছিলেন, 'সুভাষচন্দ্রের জয়ে আমারই পরাজয় হইয়াছে।' ইহার দ্বারা

মহাত্মাজীপ্রমুখ কংগ্রেস নায়কদের কী মনোভাব প্রকটিত হইয়াছে তাহা আর পাঠক-পাঠিকাকে বলিয়া দিতে হইবে না।

খিলাফৎ আন্দোলনের সহযোগী হইয়া মহাত্মাজী যে রাজনৈতিক বুদ্ধিহীনতার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা পূর্বতন নেতাগণ বুঝিয়া দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হতাশ হন। মোহিতলাল বলেন, "গান্ধিজী প্রথম হইতেই ভারতের হিন্দু-মুসলমান সমস্যাকে সেই গুরুত্ব দিয়াছিলেন যাহা ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে অতিশয় সুবিধাজনক হইল। গান্ধী কংগ্রেস সেই সমস্যাকে ভয় করিয়াই তাহার শক্তি ও দুর্লঙ্ঘ্যতাকে এমন বৃদ্ধি করিল যে, অবশেষে তাহাই টর্পেডোরূপ ধারণ করিয়া কংগ্রেসের সুবৃহৎ রণতরীকে জলমগ্ন করিল।" ইহার প্রতিবাদ স্বরূপ নেতাজী মহাত্মাজীর সহিত যে ব্যবহার করিলেন তাহাকে মোহিতলাল কুরুক্ষেত্রে ভীষ্মের সহিত অর্জুনের সংগ্রামের তুলনা করিয়াছেন। কংগ্রেস ইংরেজকে বিশ্বাস করে, মুসলিম লীগকে ভয় করে, কিন্তু হিন্দু মহাসভা ও নেতাজীকে শত্রু মনে করে! ইংরেজ-প্রীতি এখনও কংগ্রেস-পন্থী দেশনায়কগণের অন্তরে বিদ্যমান। ইংরাজ-মোহ ভাঙে নাই বলিয়াই স্বাধীনতালাভ সত্ত্বেও পণ্ডিত জওহরলালপ্রমুখ কোন দেশনায়কই ব্রিটিশ সম্পর্ক ছিন্ন করিবার কথা সাহস করিয়া এখনও বলিতে পারিতেছেন না। অথচ নেতাজী বহুপূর্বে কতবার না এই কথা মুক্ত কণ্ঠে বলিয়াছেন! এই ইংরেজ-প্রীতির অন্যতম ফল সুভাষ-ভীতি। শেষ পর্য্যন্ত নেতাজীকে কংগ্রেস হইতে বহিষ্কৃত করিয়া মহাত্মাজী নিশ্চিন্ত হইলেন। ত্রিপুরীর কলঙ্ক-কাহিনীই অভ্রান্ত প্রমাণ যে, গান্ধী-পন্থীগণ সুভাষ-বধের জন্য কতদূর বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। নেতাজী গান্ধী চরিত্রকে অশেষ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। কিন্তু তিনি গান্ধী নীতিকে স্বাধীনতার পরিপন্থী বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহার হৃদ্‌গত বিশ্বাস ছিল, যুদ্ধযাত্রা কালে সেনাবাহিনীর মধ্যে যেমন সকল ব্যবধান বিলুপ্ত হয়, তেমনি যাহারা স্বাধীনতা লাভের জন্য আকুল, তাহাদিগকে সংগ্রামে নিযুক্ত করিলেই তাহাদের মধ্যে জাতিধর্মাদির ভেদ অচিরে তিরোহিত হইবে। স্বাধীনতা লাভের আগ্রহই যখন জাতীয়তা ও ঐক্যবোধ সৃষ্টি করিবে তখন হিন্দু, মুসলমান, শিখ,

খৃষ্টানের সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি মিলাইয়া যাইবে। আজাদ্ হিন্দ ফৌজ গঠন করিয়া নেতাজী তাঁহার এই বিশ্বাসকে কার্য্যে পরিণত করিলেন। তাঁহার নীতি যে কত অভ্রান্ত এখানে তাহার অসন্দিগ্ধ প্রমাণ মিলে।

কিন্তু মহাত্মাজী অহিংসা-নীতি ও আপোষ-নীতি ছাড়িলেন না। মোহিতলাল এইরূপে গান্ধীবাদের গভীর বিশ্লেষণ করিয়াছেন। মহাত্মাজীর এই মনোভাবের মূলে আছে তাঁহার জাতিগত, বংশগত ও সমাজগত সংস্কার। তিনি অসাধারণ চরিত্রশক্তিমান্ মহাপুরুষ, কিন্তু এই সকল কুসংস্কার তাঁহার মধ্যে পূর্ণমাত্রায় প্রকটিত। মোহিতলাল বলেন, "একে ভারতীয় সংস্কারের অধ্যাত্ম প্রীতি, তাহার উপর জৈনধর্মের প্রভাব, এবং তাহারও উপর তাঁহার রক্তগত বৈশ্যবুদ্ধি। ইহার কোনটাই জাগতিক ব্যাপারে কোন পার্থিব আদর্শনিষ্ঠার অনুকূল নহে।....জৈন ধর্ম বৌদ্ধ ধর্মের প্রায় সগোত্র। তাহাতে সর্বপ্রকার হিংসাই পাপ, অহিংসাই ধর্ম। শক্তির বিরুদ্ধে শক্তির প্রয়োগ অপেক্ষা আত্মদমন বা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধই কল্যাণকর।....ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, ঐ তত্ত্বই ভারতীয় মনীষার বা সাধনার একমাত্র তত্ত্ব নয়। উহা একটা আংশিক তত্ত্ব মাত্র, বরং প্রধান চিন্তাধারার বিরোধী। ....তাঁহার বণিক-মনোবৃত্তির বশে তিনি আদান-প্রদান, লেন-দেন, ও আপোষকেই সর্ববিধ উপার্জনের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ নীতি বলিয়া বিশ্বাস করেন। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতালাভ তাঁহার চিন্তায় চিরদিনই গৌণ। লোকহিত সাধনের স্বাধীনতাই তাঁহার কাছে প্রকৃত স্বাধীনতা।" (৬৪—৭০পৃষ্ঠা)। ইহাই গান্ধীবাদের সার কথা। মহাত্মাজী উনবিংশ শতাব্দীর মনোভাব লইয়া বিংশ শতাব্দীতে বাস করিতেন; তাঁহার নীতি বিংশ শতাব্দীর নবীন ভারতের উপযোগী হইবে কিরূপে? বাল্যে জৈন পরিবেশ এবং যৌবনে টলষ্টয়ের আদর্শ তাঁহাকে প্রভাবান্বিত করে। যে কাথিয়াবাড়ে তিনি সমগ্র বাল্য অতিবাহিত করেন ও এণ্ট্রান্স অবধি শিক্ষালাভ করেন তথায় জৈন প্রভাব এখনও প্রবল। কাথিয়াবাড়ী হিন্দু বালকদের ন্যায় তিনিও জৈন প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই। যে জৈন ধর্মে পিপীলিকাকে শর্করা দান এবং

ছারপোকাকে মানুষের রক্ত খাওয়ান ধর্ম-সাধনা বলিয়া বিবেচিত হয় তাহার মতে হিংস্র শত্রু দমনও পাপ! বর্তমান লেখক কাথিয়াবাড়ে প্রবাসকালে দেখিয়াছেন, জৈন বালকগণের ন্যায় হিন্দু বালকগণও তথায় পিপীলিকা, ছারপোকা ও সর্পাদি দংশন করিতে আসিলে উহাদিগকে বধ বা আঘাত করিতে পশ্চাৎপদ হয়। ছারপোকার প্রতি অহিংসার মধ্যে যে মানব হিংসা লুক্কায়িত তাহা তাহারা বোঝে না। মহাত্মাজী তেমনি, মুসলমানদের প্রতি প্রীতি প্রদর্শনের জন্য নেতাজীপ্রমুখ কত হিন্দুর প্রতি যে তিনি বিদ্বেষ প্রকাশ করিলেন তাহা গান্ধীবাদীরা বুঝিয়াও বোঝেন না। জৈন ধর্ম ভারতধর্মের আংশিক বিকাশ মাত্র। বৌদ্ধ ধর্মের ন্যায় ইহাও বেদ-বিরোধী। এই জন্য শঙ্করাচার্য্য বৈদিক ধর্ম প্রচার করিয়া উভয়ের প্রভাব ভারতে ধ্বংস করিলেন। এই কারণেই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যুদ্ধে নিয়োজিত করিলেন ক্লৈব্য ত্যাগের জন্য। এই কারণেই শ্রীরামচন্দ্র রাবণের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন। গান্ধীবাদ জৈন বা বৌদ্ধ ধর্মের আধুনিক সংস্করণ মাত্র। ইহা খাঁটি হিন্দু বা বৈদিক ধর্ম নহে। মোহিতলালের এই তুলনামূলক আলোচনা মৌলিক ও অপূর্ব। তিনি আরও বলেন, "গান্ধিজীর প্রেরণা সম্পূর্ণ moral, নেতাজীর প্রেরণা একান্তভাবে spiritual, একটিতে আছে সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক মনের উপরে ধর্মাধর্ম বোধের কঠিন শাসন, আর একটিতে আছে 'বুদ্ধেঃ পরতস্তু যঃ,' সেই আত্মার সর্ব বন্ধন মুক্তি, অকুণ্ঠিত প্রসার, অসীম স্ফূর্তি। গান্ধিজী ধমক দেন, ভসর্ৎনা করেন, নেতাজী বুকে জড়াইয়া ধরেন। গান্ধিজী বলেন, তোমরা দুর্বল পাপচিত্ত, আমি করিব কি? নেতাজী বলেন, কোন ভয় নাই, তোমাদের ভিতরে অনন্ত শক্তি আছে; বিশ্বাস কর, আমাকে দেখ, তোমাদের পক্ষেও কিছুই অসম্ভব নয়। গান্ধিজী নিয়মিত ভজনের দ্বারা আত্মশুদ্ধি বা পাপ মোচনের উপদেশ দেন। নেতাজী ভগবানের নাম করেন না, মানুষের নামই করেন। তাঁহার ধর্ম ভগবানকে ভক্তি নয়, মানুষকে প্রেম। সেই প্রেমে পাপের চিন্তা মাত্র নাই।" (পৃষ্ঠা—১৩)। বিবেকানন্দের বাণী 'জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর' নেতাজীর জীবনে প্রমূর্ত হইয়াছিল। বিদেশে গমনকালে,

ভারতের নিন্দায় উন্মত্ত কোন পাদ্রীকে যে জন্য স্বামিজী ক্ষণিকের জন্য সন্ন্যাসধর্ম ভুলিয়া মাতৃভূমির সম্মান রক্ষার্থ প্রহারোদ্যত হইয়াছিলেন, সেই জন্য নেতাজীও স্বদেশের স্বাধীনতা লাভের জন্য অস্ত্র ধারণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামচন্দ্র ও বিবেকানন্দের মধ্যে যে ভারতীয় ভাব ও আদর্শ সাকার হইয়াছিল তাহাই নেতাজীতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল দেশকে পরাধীনতার শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিবার জন্য। নেতাজীর যুদ্ধঘোষণাকে যাঁহারা হিংসা-নীতি বলেন তাঁহারা ভারতের সাধনার সহিত আদৌ পরিচিত নহেন।

গান্ধীবাদে জীবন ধর্মের স্থান নাই। তাই মহাত্মাজী বাঁচাইতে জানেন না, মরিবার উপদেশ দেন। গান্ধীবাদের মূলমন্ত্র আত্মসংবরণ, আত্মসংকোচ বা আত্ম-সম্মোহন। নেতাজীর ধর্ম আত্মবিকাশ, আত্মপ্রসারণ। মোহিতলাল বলেন, "মহাত্মাজী এবং নেতাজীর লক্ষ্যও এক নয়। একজন চান, যতদূর সম্ভব দেশের জনগণের দুর্গতি লাঘব। আর একজন চান, দেশের বন্ধন-মুক্তি।" নেতাজী অন্তরে অন্তরে ব্রহ্মবাক্যের মত বিশ্বাস করিতেন, মুক্তি ব্যতীত দেশের দুর্গতি নাশের উপায়ান্তর নাই। মোহিতলাল আরও বলেন, "গান্ধিজী মহাত্মা হইলেও মহাপুরুষ নহেন। তিনি কত ভুল করেন, আর কত ভুল করিবেন, মহাত্মার মত তাহা স্বীকার করেন; কিন্তু মহাপুরুষের মত তাহা রোধ করিতে পারেন না। সুভাষচন্দ্র নিজে মুক্ত, নিত্যমুক্ত, তাঁহার সেই মুক্ত স্বভাবের যে প্রয়াস তাহা স্বতঃস্ফূর্ত ও দ্বিধাহীন, তাহা experiment নয়। কোনরূপ ফলাফলের উপর তাহার সত্যতা নির্ভর করে না। তাঁহার মনে কোন সংশয় নাই, তাঁহার দৃষ্টি অভ্রান্ত, তাঁহার পথও পৌঁছিবার পথ, আবিষ্কারের পথ নয়। নিজে পৌঁছিয়াছেন বলিয়া তিনি জানেন, কোন পথে সকলকে পৌঁছিতে হইবে।" (৮৫ পৃষ্ঠা)। গান্ধী নীতি ভ্রান্ত এবং তাহার অনুসরণ করিলে কংগ্রেস বিপন্ন হইবে—এই ভবিষ্যৎ বাণী নেতাজী বহুপূর্বে করিয়াছিলেন. তাঁহার ভবিষ্যৎ বাণী যে অক্ষরে অক্ষরে সত্য হইয়াছে তাহা আজ দেশের বালক-বালিকারাও বুঝিয়াছে। 'সাপের ছুঁচো গেলা'র মত কংগ্রেস আজ স্বাধীনতা পাইয়াও দেশের দুর্গতি-মোচনে

অসমর্থ। মহাত্মাজী ধর্মগুরু হইতে পারেন, কিন্তু দেশনায়ক নহেন। মহাত্মাজীর আপোষ-নীতির ফলে হইয়াছে পাঞ্জাব, সিন্ধু ও নোয়াখালীতে হিন্দুর ধ্বংসলীলা এবং পাকিস্তান সৃষ্ট। মোহিতলাল সত্যই বলিয়াছেন, "নেতাজীর মত চিন্তাশীল, তীক্ষ্ণধী ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন জননায়ক আধুনিক ভারতে আর দেখা যায় নাই। তাহার অসংখ্য প্রমাণ তাঁহার চরিত্রে, চিন্তায় ও কার্য্যাবলীতে পাওয়া যাইবে। কংগ্রেস তাঁহাকে নেতৃপদ হইতে বিচ্যুত না করিলে দেশের এই দুর্দশা কখনও হইত না।"

অহিংসা কোন ব্যক্তির জীবন-নীতি হইতে পারে, কিন্তু উহা একটা বিশাল জাতির জীবন-নীতি বা principle কিরূপে হইবে? মহাত্মাজী স্বীয় জীবনে ইহা সাধন করিতে পারেন, কিন্তু দেশের ত্রিশ কোটি নরনারীকে উহা অভ্যাস করিতে বলা বাতুলতা মাত্র। অহিংসাকে পলিসিরূপে কংগ্রেস গ্রহণ করিলেও আপত্তি নাই। জনসাধারণ তমোগুণাচ্ছন্ন। অহিংসা সত্ত্বধর্ম। তাহারা এক লাফে সত্ত্বগুণে কিরূপে উঠিবে? তাহাদিগকে প্রথমে রজোগুণী হইতে হইবে। সেইজন্য স্বামিজী বলিলেন, "যখন শত শত সবল শত্রুকে পদদলিত করিতে সমর্থ হইবে তখনই ক্ষমা করিতে পার। তখনই অহিংসা অভ্যাস সম্ভব। দুর্বলের ক্ষমা অশোভনীয় ও অকল্যাণকর।" যদি অহিংসার এত মাহাত্ম্য মহাত্মাজী বুঝিয়া থাকেন তবে তিনি সুরাবর্দীকে এত চেষ্টা করিয়াও সুবুদ্ধিসম্পন্ন করিতে পারিলেন না কেন? সমগ্র জাতিকে অহিংসা ধর্মে দীক্ষিত করিতে চেষ্টা করিয়া তিনি দেশের যে সর্বনাশ করিয়াছেন তাহা অনুধাবন করিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। আর নেতাজী, স্বামিজীর ন্যায় জাতিকে বীর্য্যবান্ ও রাজসিক করিতে চাহিয়াছিলেন। তাই তাঁহার কম্বুকণ্ঠে সর্বদা সমরাহ্বান বিঘোষিত হইত। কংগ্রেস যখন তাঁহার সম্মুখে দ্বার রুদ্ধ করিল, তখন তিনি আর কোন কর্মসূত্র না পাইয়া হলওয়েল মনুমেণ্ট সংক্রান্ত একটা আন্দোলন সৃষ্টি করিয়া তাহাতেই ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। সেই আন্দোলনে কারারুদ্ধ হইয়া তিান অশেষ মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করেন। তখন তিনি লিখিয়াছিলেন, "বর্তমান অবস্থায় জীবন ধারণ আমার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। এ জগতে সবই নশ্বর। কেবল

উচ্চ আদর্শ, উৎকৃষ্ট তত্ত্ব ও মহতী কামনার বিনাশ নাই। এইরূপ একটি আদর্শের জন্য যদি কেহ আত্মোৎসর্গ করে তবে তাঁহার মৃত্যুতে সহস্র জীবন উজ্জীবিত হইবে।" নেতাজী স্বীয় ভবিষ্যতেরই ইঙ্গিত করিলেন। অবশেষে তিনি দেশত্যাগী হইতে বাধ্য হইলেন। ইহার জন্য কে দায়ী বা দোষী, তাহা বুঝিতে আর কাহারও বাকী নাই।

পরিশিষ্ট

(খ)

শ্রীরমণ মহর্ষি ও শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস*

এক

ইউরোপের ডক্টর সি. জি. জুঙ্গ বিশ্ববিখ্যাত মনোবৈজ্ঞানিক। তিনি একজন সুগভীর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন দার্শনিক। দর্শন, ধর্ম ও অতীন্দ্রিয়বাদে তাঁহার অবদান অপরিসীম। ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার একনিষ্ঠ অনুরাগীরূপে বহুবার তিনি ইহার অসাধারণ মহিমা কীর্তন করিয়াছেন। ভারতীয় ভাবের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা আন্তরিক ও অসামান্য। অরুণাচলে শ্রীরমণ মহর্ষির অবস্থান অর্ধশতক পূর্ণ হইবার সময় সুবর্ণজয়ন্তী নামক যে সুবৃহৎ ও সুচিত্রিত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে 'শ্রীরমণ ও আধুনিক মানবের প্রতি তাঁহার বাণী' সম্বন্ধে ডক্টর জুঙ্গের একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ আছে। শ্রীরমণ মহর্ষির জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে ডাঃ জিমার জার্মান ভাষায় একখানি পুস্তক লিখিয়াছেন ;

---

* বোম্বাইয়ের Aryan Path নামক ইংরাজী মাসিকের ১৯৪৮ আগষ্ট সংখ্যায় এই প্রতিবাদ প্রকাশিত হয়।

তাহাতে ডাঃ জুঙ্গের যে ভূমিকা আছে, তাহার সারাংশই উপরোক্ত প্রবন্ধরূপে প্রকাশিত।

উক্ত ভাবোদ্দীপক প্রবন্ধে ডক্টর জুঙ্গ শ্রীরামকৃষ্ণ এবং শ্রীরমণকে আধুনিক জগদ্‌গুরুরূপে বর্ণনাপূর্বক তাঁহাদের বাণী এইভাবে তুলনা করিয়াছেন: "আত্মা সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ একই অভিমত পোষণ করিতেন। কিন্তু তাঁহার নিকট 'আমি' ও আত্মার সম্বন্ধ-সমস্যা আরও ঘনিষ্ঠভাবে পুরোভাগে আসিয়াছে। শ্রীরমণ মহর্ষি দ্বিধাহীন ভাবে ঘোষণা করেন যে, 'আমি'র বিলয়ই ধর্মসাধনার চরম লক্ষ্য। এই বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ কতকটা ইতস্ততঃ ভাব প্রদর্শন করিয়াছেন। যদিও তিনি বলেন, 'যতক্ষণ অহংভাব থাকে ততক্ষণ জ্ঞান ও মুক্তি অসম্ভব, তথাপি তিনি অহং-এর মারাত্মক প্রকৃতি স্বীকার করেন। কারণ তিনি বলেন, "কিন্তু কয়জনই বা সমাধি লাভ করিয়া 'আমি'-মুক্ত হইতে পারে? অত্যল্প লোকের ভাগ্যে ইহা সম্ভব হয়। যতই বল, 'অহং নাই', যতই ইহা মুছিয়া ফেলিবার চেষ্টা.কর না কেন, তথাপি এই অহং পুনঃ পুনঃ ফিরিয়া আসে। বটগাছ আজ কাটিয়া ফেল, আবার কাল দেখিবে ইহার নূতন 'ফেক্‌ড়ি' উদ্গত হইয়াছে। পরিশেষে যখন দেখিবে যে, এই অহংকে বিনষ্ট করিতে পারা যায় না, তখন ইহাকে ঈশ্বরের দাস 'আমি' করিয়া রাখ।" উক্ত মৃদু ভাব সম্পর্কে শ্রীরমণ মহর্ষি নিশ্চয়ই অধিকতর স্পষ্টবাদী।"

ডাঃ জুঙ্গ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, "উদ্ধৃত উক্তি হইতে ইহাই সুস্পষ্ট যে, 'আমি'র বিলয় সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব কতটা সন্দিগ্ধ ও দ্বিধাগ্রস্ত; আর শ্রীরমণের ভাব নিশ্চয়ই নিঃসন্দিগ্ধ এবং দ্বিধাশূন্য।" এখন পাঠক-পাঠিকাগণ আসুন, আমরা অহংসম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তিসমূহ আলোচনা করিয়া দেখি, এ বিষয়ে তাঁহার ভাব দ্বিধাগ্রস্ত কি, দ্বিধাশূন্য! শ্রীরামকৃষ্ণ নিম্নোদ্ধৃত উক্তিসমূহে অহংএর অনিত্যত্ব সুব্যক্ত করিয়াছেন।—

"আমার 'অহং' কিরূপ? গভীরভাবে চিন্তা করিলে দেখিবে যে, 'আমি' বলিয়া কিছুই নাই। পিঁয়াজের খোসা যতই ছাড়াও ততই দেখিবে যে, ইহাতে কেবল খোসাই আছে; ইহার কোন শাঁস খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। সেইরূপ

অহং বিশ্লেষিত হইলে দেখা যায় যে, যাহাকে তুমি 'অহং' বল তাহার কোন নিত্য সত্তা নাই। উক্ত প্রকারে অহংএর বিশ্লেষণ দ্বারা এই বিশ্বাস জন্মে যে, ঈশ্বরই একমাত্র পরমার্থ সত্তা।"

পুনরায় শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেন, "অহং ভাব দ্বারাই জীবাত্মা ও পরমাত্মা পৃথগ্‌ভূত হয়। জলের উপর একটি লাঠি ফেলিয়া দিলে যেমন জল দুই ভাগে বিভক্ত বলিয়া প্রতীত হয়, তেমনি অহং দ্বারা জীবাত্মা ও পরমাত্মা যেন পৃথক্‌কৃত হয়। অহংই সেই লাঠি। ইহা তুলিয়া লও, জল আবার অবিভক্ত হইবে।" কিরূপে অহং আত্মজ্ঞান বাধিত করে তাহা বুঝাইবার উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, "সচ্চিদানন্দই মানুষের শাশ্বত স্বরূপ। অহং প্রভাবে সে এতগুলি উপাধি দ্বারা আবদ্ধ এবং তাহার দিব্য স্বরূপ বিস্মৃত হইয়াছে। সূর্য সমগ্র পৃথিবীকে উত্তাপ ও আলোক দান করে। কিন্তু মেঘাবৃত হইলে ইহা স্বকার্য সাধনে অক্ষম হয়। যতক্ষণ অহং মানুষকে আবৃত রাখে ততক্ষণ আত্মজ্ঞান স্বমহিমায় তন্মধ্যে প্রকাশিত হয় না। 'আমি' এবং 'আমার'ই অজ্ঞান। তুমি এবং 'তোমার'ই জ্ঞান।"

তৎপরে শ্রীরামকৃষ্ণ পরিষ্কারভাবে নির্দেশ করিতেছেন, অহং ভাবের বিলয়ের সঙ্গে সঙ্গেই আত্মানুভূতি হয়। এই সম্বন্ধে তিনি বলেন, "মুক্ত হব কবে? "আমি যাবে যবে।" বেদান্ত মতে একমাত্র ব্রহ্মই পরমার্থ সত্য এবং অন্য সমস্তই স্বপ্নবৎ মিথ্যা। অসীম ব্রহ্মরূপ সমুদ্রের উপরে অহংরূপ লাঠি পড়িয়া ইহাকে যেন দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। সমাধিতে অহং একেবারে মুছিয়া যায় এবং ব্রহ্মজ্ঞানের সূর্য উদিত হয়। তখন অহংএর চিহ্নমাত্র থাকে না। সমাধি ব্যতীত পূর্ণ জ্ঞান লাভ হয় না। পরা জ্ঞান মধ্যাহ্ন সূর্যবৎ দীপ্তিশালী। মধ্যাহ্নে যেমন কোন বস্তু বা ব্যক্তির ছায়া দেখা যায় না, তদ্রূপ সমাধিতে অহংএর আভাস মাত্রও অবশিষ্ট থাকে না। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলে অহং একেবারে মুছিয়া যায়। কর্পূর পুড়িয়া গেলে যেমন কোন অবশেষ থাকে না, ঠিক তেমনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলে 'আমি' বা 'তুমি' বা জগৎ থাকে না। আমি মুছিয়া গেলেই জীবত্ব নাশ হয় এবং সমাধিতে ব্রহ্মত্ব অনুভূত হয়।"

এইরূপে শ্রীরামকৃষ্ণ স্ফটিকবৎ স্বচ্ছভাবে দেখাইয়াছেন, অহংনাশই ব্রহ্মজ্ঞানের একমাত্র উপায়। তিনি নিঃসন্দিগ্ধভাবে ঘোষণা করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই যে, অহংলয় ব্যতীত ব্রহ্মজ্ঞান অসম্ভব। তাহা হইলে ডাঃ জুঙ্গ কিরূপে এই মত প্রকাশ করেন যে, অহং সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব দ্বিধাগ্রস্ত? বস্তুতঃ এই বিষয়ে বর্তমান বা অতীতের কোন ব্রহ্মজ্ঞ অপেক্ষা তিনি কম নিঃসন্দিগ্ধ ছিলেন না। সেই জন্য আমরা এই মন্তব্য করিতে বাধ্য, যে আধুনিক ধর্মগুরুর উপদেশ বর্তমান ধর্মজগতের উপর নবালোক সম্পাত করিয়াছে তাঁহার সম্বন্ধে ডাঃ জুঙ্গের মত মহামনীষী একটি অপ্রিয় ও অসত্য মন্তব্য করিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশাবলী সমগ্র ভাবে পড়িলে তাঁহার এই ভ্রান্ত ধারণা হইত না।

কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞের সংখ্যা জগতে সর্বদাই মুষ্টিমেয় ও সুবিরল বলিয়া ধর্মগুরুরূপে শ্রীরামকৃষ্ণ নিতান্ত প্রয়োজনবশে অহংএর দুর্নিবার প্রকৃতি নির্দেশপূর্বক বলিলেন, "যদি আত্মানুভবের পরেও অহংএর কিঞ্চিন্মাত্র অবশেষ থাকে, তাহার কারণ প্রারব্ধ কর্ম। নিশ্চিত জানিও, ইহা এখন বিদ্যার 'আমি', জ্ঞানের 'আমি'। ইহাতে অজ্ঞানের লেশমাত্র নাই। কালে পদ্মপত্রগুলি শুষ্ক হইয়া ঝরিয়া পড়ে; কিন্তু তাহারা দাগ রাখিয়া যায়। সেইরূপ আত্মানুভূতির পরে মানবের অহং একেবারে অপসৃত হয়; কিন্তু উহার পূর্ব অস্তিত্বের দাগ লাগিয়া থাকে। অবশ্য ইহা কোন অনিষ্ট করিতে পারে না। দড়ি পুড়িয়া গেলে ভস্মে পরিণত হয়। সেই ভস্মীভূত দড়ি আর বাঁধিতে পারে না।"

শ্রীরামকৃষ্ণ ইহা স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন যে, মুক্ত পুরুষের ব্যক্তিত্ব শিশুর ব্যক্তিত্বের ন্যায় আকার মাত্র। জ্ঞানীর 'অহং' আত্মজ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত ও পরিবর্তিত হওয়ায় আদৌ অনিষ্টকর নহে এবং অজ্ঞান সৃজনে অক্ষম। শ্রীরামকৃষ্ণের মতে 'আমি' দুই প্রকার—'কাঁচা আমি' ও 'পাকা আমি'। যে অহং মুক্তকণ্ঠে বলে, 'আমি ঈশ্বরের দাস' সেটী ভক্তের 'আমি', সেটী পাকা 'আমি', বিদ্যার 'আমি'। যে অহং মানুষকে সংসারে আবদ্ধ, কামকাঞ্চনে আসক্ত, করে, সেটী অনিষ্টকর। সেটী 'কাঁচা আমি', 'অবিদ্যার আমি।' কিন্তু জ্ঞানাগ্নিতে দগ্ধীভূত হওয়ায় ইহা ভস্মীভূত রজ্জুর ন্যায় বন্ধনে অসমর্থ।

পরমহংসদেব প্রচলিত উদাহরণ দ্বারা উক্ত তত্ত্ব সরলভাবে এইরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন : "কোন লোক স্বপ্নে দেখিল, কেহ তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিতে আসিতেছে। সে সন্ত্রস্ত হইয়া গোঁ গোঁ করিয়া জাগিয়া উঠিল এবং দেখিল যে, তাহার ঘরের দরজা ভিতর হইতে অর্গলবদ্ধ ও ঘরের মধ্যে কেহই নাই। তাহা সত্ত্বেও তাহার বুক কিছু ক্ষণের জন্য ভয়ে ধড়ফড় করিতে লাগিল। সেইরূপ আমাদের অহংভাব চলিয়া গেলেও উহার সংবেগ কিছুকাল থাকিয়া যায়।"

শ্রীরামকৃষ্ণ আরও বলেন, "কোন কোন মহাপুরুষ আত্মজ্ঞানের পরেও স্বেচ্ছায় 'জগদ্ধিতায়' একটু অহং রাখিয়া দেন। তাঁহাদের অহং জলের দাগের ন্যায় ছায়া মাত্র এবং পরমাত্মার সহিত অভিন্ন।" তাঁহার মতে লোকশিক্ষার্থ শঙ্করপ্রমুখ প্রাচীন আচার্যগণ 'বিদ্যার আমি' রাখিয়াছিলেন। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, হনুমান্, নারদ, সনক, সনৎকুমার, সনন্দনাদি পরমাত্মার দর্শনলাভে ধন্য হইয়াছিলেন। তথাপি তাঁহারা লোকশিক্ষার্থ 'ঈশ্বরের দাস আমি' রাখিয়াছিলেন।" শ্রীরামকৃষ্ণ এই সম্বন্ধে আরও বলেন, "নারদাদি মুনিগণ সর্বোচ্চ জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। তথাপি তাঁহারা কুলকুলুনাদিনী স্রোতস্বতীর ন্যায় ঈশ্বরের নামগুণ কীর্তনে ব্যাপৃত থাকিতেন। ইহাতে প্রমাণিত হয়, তাঁহারাও, ব্যক্তিত্বের দাগমাত্ররূপে 'পাকা আমি' রাখিয়াছিলেন ঈশ্বর হইতে পৃথক্ অস্তিত্ব রক্ষণের জন্য, ধর্মের অমর বাণী জগৎকে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে।" শ্রীরামকৃষ্ণ আরও বলেন যে, এমন কি, যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞানী তাঁহারাও সাকার সগুণ ঈশ্বরের আনন্দ উপভোগার্থ একটু 'আমি' রাখিতেন। সপ্ত স্বরের মধ্যে যেটী সর্বাপেক্ষা উচ্চ সেই 'নি'তে বেশী ক্ষণ সুর রাখা যায় না। সেইজন্য ব্রহ্মজ্ঞানীকেও ঈশ্বরভক্তির অপেক্ষাকৃত নিম্নভূমিতে নামিয়া আসিতে হয়। শ্রীমদ্‌ভাগবতের নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকেও শ্রীরামকৃষ্ণের অভিমত সমর্থিত।

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিং ইত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥

অনুবাদ :—আত্মজ্ঞানী মুনিগণের চিৎ-জড়গ্রন্থি বিচ্ছিন্ন হওয়া সত্ত্বেও তাঁহারা ঈশ্বরে অহৈতুকী ভক্তি লইয়া থাকেন। ঈশ্বরের এম্‌নি মহিমা!

শ্রীরামকৃষ্ণ একথা বার বার জোর দিয়া বলেন যে, জ্ঞানীর অহং একটি সরু রেখার মত, প্রস্থহীন দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট। জ্ঞানীর সেই টুকু ব্যক্তিত্ব থাকে যাহার দ্বারা তিনি স্বীয় আধ্যাত্মিক অনুভূতি অপরকে জানাইতে পারেন। সেই অহংসহায়ে জীব, জগৎ ও নিজেকে একই ব্রহ্মের বিভিন্নরূপে সাক্ষাৎ প্রকাশ বলিয়া তিনি দেখিয়া থাকেন। পরমহংসদেব পুনরায় বলেন, "যখন ছাগলের মাথা উহার দেহ হইতে খড়্গ দ্বারা বিচ্ছিন্ন করা হয়, তখন ধড়টা কিছুক্ষণ ছট্‌ফট্ করিতে থাকে, তখনও তাহাতে প্রাণের স্পন্দন দেখা যায়। সেইরূপ জ্ঞানীর অহংকার বিনষ্ট হইলেও শারীর যাত্রা নির্বাহার্থ উহার একটুকু লেশ থাকিয়া যায়। কিন্তু উহা তাঁহাকে সংসারে আবদ্ধ করিতে পারে না।" আবার তিনি বলেন, "মুক্ত পুরুষে মায়া থাকে কি? বিশুদ্ধ সোণায় অলঙ্কার গঠিত হয় না। উহার সহিত কিছু খাদ মিশাইতে হয়। যতক্ষণ মানুষের দেহ থাকে ততক্ষণ দেহযাত্রা নির্বাহের জন্য একটু মায়া থাকিবেই। সম্পূর্ণভাবে মায়ামুক্ত মানুষের দেহ একুশ দিনের বেশী থাকে না।"

কোন ব্যক্তি শ্রীরামকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "মহাশয়, যখন আপনি সমাধিতে মগ্ন হন তখন একটু অহং থাকে কি?" সমাধিবান্ মহাপুরুষ উত্তর দিলেন, সাধারণতঃ একটু অহং থাকিয়া যায়। এ সম্বন্ধে তিনি আরও বলেন, "সোণার পাতের এক টুক্‌রা একখণ্ড সোণার উপর যতই ঘস না কেন ইহা নিঃশেষে ক্ষয়িত হয় না। সমগ্র বাহ্য জ্ঞান সমাধিতে বিলুপ্ত হইলেও দিব্যানন্দ উপভোগের জন্য ঈশ্বর একটু অহং রাখিয়া দেন। কখন আবার তিনি সেটুকুও মুছিয়া ফেলেন। ইহাই সর্বোচ্চ সমাধি, নির্বিকল্প সমাধি। সে অবস্থা কেহ মুখে বর্ণনা করিতে পারে না। আমাদের সমগ্র সত্তা তখন ব্রহ্মস্বরূপে বিলীন হয়। নুনের পুতুল সমুদ্রের গভীরতা মাপিতে গিয়াছিল। সমুদ্রে ডুব দিতেই উহা জলে মিশিয়া গেল। তখন কে আসিয়া খবর দিবে, সমুদ্র কত গভীর?,'

শ্রীরামকৃষ্ণ আরও বলিয়াছেন যে, অবতার পুরুষের ন্যায় বিশুদ্ধাত্মাগণের একটি পাতলা 'আমি' থাকে, যাহার মধ্য দিয়া ঈশ্বর সর্বদা দৃশ্যমান হন।

আধ্যাত্মিক অনুভূতির এই সকল অদ্ভুত বৈচিত্র্যের কথা শ্রীরামকৃষ্ণ স্বীয় জীবনবেদ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনা শাস্ত্রীয় বর্ণনার সহিত সম্পূর্ণভাবে মিলিয়া যায়। তাঁহার নিজের অহং এত নিঃশেষে মুছিয়া গিয়াছিল যে, তিনি 'আমি' বা 'আমার' বলিতে পারিতেন না। বুদ্ধদেবের ন্যায় নিজের সম্বন্ধে তিনি বলিতেন, "এখানে"। সুতরাং সমাধিতে অহং ব্রহ্মে লীন হইয়া যায়, ইহা বলিতে তিনি ইতস্ততঃ করিবেন কেন? ডাঃ জুঙ্গ এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হইলেন কিরূপে? এই বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ যে কোন প্রাচীন বা আধুনিক আচার্যেরই মত দ্বিধালেশশূন্য ছিলেন। কিন্তু পরমহংসদেব নির্দেশ করেন যে, যতদিন দেহের পতন না হয় ততদিন প্রারব্ধবলে জীবন্মুক্তগণের জীবনেও ইহা সত্য। কয়েক বৎসর পূর্বে আদালতে যখন রমণ আশ্রম সম্পর্কে মোকদ্দমা চলিতেছিল তখন রমণ মহর্ষিকে আদালতে যাইয়া ঘোষণা করিতে হইয়াছিল যে, আশ্রমটী তাঁহারই, অন্য কাহারও নহে।

উপরে যাহা বিশদরূপে বর্ণিত হইল তাহা হইতে ইহা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয় যে, শ্রীরমণ মহর্ষি ও শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের বাণীদ্বয়ের মধ্যে যে পার্থক্য ডাঃ জুঙ্গ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা অহঙ্কারের বিলয় সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশাবলীর কোন বিচ্ছিন্ন অংশ পাঠের ফলে জাত ভ্রান্ত ধারণা হইতে উৎপন্ন। ডাঃ জুঙ্গ শ্রীরমণ মহর্ষির যে বাণী প্রচারিত করিয়াছেন তাহা নিঃসন্দেহে আমাদের বেদান্তশাস্ত্রে পূর্ববর্ণিত তত্ত্ব। অবশ্য সেই তত্ত্ব মহর্ষির স্বানুভবের আলোকে সমুজ্জ্বল হওয়ায় তাঁহার বাণী এত মর্মস্পর্শী। কিন্তু দেহাত্মবোধে বদ্ধ হইয়া যাঁহারা আত্মজ্ঞানের জন্য চেষ্টিত তাহাদিগকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য জগদ্‌গুরুর ন্যায় শ্রীরামকৃষ্ণ যে সহজসাধ্য, সুবোধ্য উপদেশ দিয়াছেন তাহার কিয়দংশ মাত্র ডাঃ জুঙ্গ কর্তৃক উদ্ধৃত। মহর্ষি ও পরমহংসদেবের বাণীদ্বয়ের মধ্যে বস্তুতঃ কোন পার্থক্য নাই। যদি কোন পার্থক্য থাকে, তাহা এই—যদিও উভয়েই একমেব অভিন্ন অদ্বৈত তত্ত্বের কথাই বলিয়াছেন। কিন্তু মহর্ষি তাহা বলিয়াই ক্ষান্ত; আর শ্রীরামকৃষ্ণ তত্ত্ব সাধন করিবার পথে যে সকল অসুবিধা আসে সেগুলি দূর করিবার জন্য সাধককে সাহায্য করিতে অগ্রসর।

আমাদের এই পুণ্যভূমিতে এমন আচার্য্য বা মহাপুরুষের অভাব কখনও হয় নাই যিনি উচ্চতম দার্শনিক তত্ত্ব প্রচার না করিয়াছেন। কিন্তু বর্তমান ধর্মজগৎ বিশেষভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি এত আকৃষ্ট ও শ্রদ্ধাসম্পন্ন কেন? ইহার একমাত্র কারণ এই যে, তাঁহার সহজ, সরল, বাস্তব উপদেশাবলী শুধু স্বানুভূত নহে, পরন্তু সাধকের সাধনপথে সর্বাধিক সহায়ক।

মিঃ ডেভিড্ ম্যাক্‌আইভার 'এরিয়ান পাথ' নামক ইংরাজী মাসিকের ১৯৪৮ নভেম্বর সংখ্যায় মল্লিখিত উপরোক্ত প্রবন্ধের প্রতিবাদ স্বরূপ যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন তাহার একটি সংক্ষিপ্ত প্রত্যুত্তর আমি দিয়াছিলাম। ইহা উক্ত মাসিকের ১৯৪৯ ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। নিম্নে সেই প্রবন্ধের অনুবাদ প্রদত্ত হইল।—

মিঃ ডেভিড ম্যাক্‌আইভারের উত্তরে বিতর্কিত বিষয় কিছুমাত্র পরিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। বরং অহং সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশের যে অপব্যাখ্যা ডাঃ জুঙ্গ দিয়াছেন, তাহাই প্রকারান্তরে উহাতে সমর্থিত।

উত্তরদাতাকে আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি যে, মহর্ষির প্রতি শ্রদ্ধায় আমি তাঁহা অপেক্ষা একপদও পশ্চাৎপদ নহি। মহর্ষিকে ছোট করা বা তাঁহার উপদেশের অপব্যাখ্যা করা আমার প্রবন্ধের উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু আমি শ্রীরাম-কৃষ্ণের অনেক উপদেশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছিলাম যে, তিনি 'আমি'র স্বরূপ সম্বন্ধে আদৌ দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন না; পরন্তু এই বিষয়ে তিনি মহর্ষির মতই নিশ্চিত ছিলেন। মিঃ ম্যাক্‌আইভার দেখাইয়াছেন যে জ্ঞানীদের জীবনে অহং সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়। কিন্তু তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, শ্রীরমণ একবার মাত্র তাঁহার স্বাভাবিক অবস্থা হইতে বিচ্যুত হইয়া তৎপদানুগদের নিমিত্ত 'আমি'র ব্যবহারিক আকার পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। তিনি আরও বলেন, "করুণাবশে ব্রহ্ম অহংএর ব্যবহারিক আকার ধারণ করেন, অহংবদ্ধগণের ভূমিতে নামিয়া তাহাদের সহিত যোগাযোগ স্থাপনের জন্য।" মিঃ ডেভিড ম্যাক্‌আইভারের এই দুইটি বিবৃতি পরস্পরবিরুদ্ধ নহে কি?

"প্রকৃতপক্ষে মিঃ ডেভিড ম্যাক্‌আইভারের পক্ষে এই মুস্কিল হইয়াছে যে,

তিনি অহংএর পারমার্থিক ও ব্যবহারিক সত্তা দুইটিকে গুলাইয়া ফেলিয়াছেন। পারমার্থিক ভূমি হইতে অহং নিশ্চয়ই অসৎ, কদাপি সৎবস্তু নহে। এই বিষয়ে শ্রীরমণ এবং শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পূর্ণভাবে একমত। কিন্তু গৌড়পাদ বা শঙ্করের বেদান্ত কোন না কোন প্রকার ব্যবহারিক সত্তা স্বীকার করেন। উক্ত মতবাদের আলোকে মহর্ষি কর্তৃক 'অহংএর ব্যবহারিক আকার পরিগ্রহণ' সমর্থিত হয় এবং অহং সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের 'দ্বিধাগ্রস্ত ভাব' পরিষ্কার ভাবে বুঝা যায়। কোন কোন বেদান্ত সম্প্রদায় কর্তৃক স্বীকৃত হয় যে, জীবন্মুক্ত অবস্থাতেও প্রারব্ধ বলবান্ থাকে। তাহা না হইলে জ্ঞানিগণের জগদ্ধিতার্থ কর্মের কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।"

পরিশিষ্ট

(গ)

বিবেকানন্দের পরে মহাভারতীয় জাগৃতি *

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অরবিন্দ ঘোষ

বিবেকানন্দের মৃত্যু এবং জাতির নৈতিক নেতারূপে গান্ধীর আবির্ভাবের মধ্যবর্তী কালে ভারতে যে ভাবান্দোলন আসিয়াছিল তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয়

* ইহা নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত ফরাসী মনীষী রোমাঁ রোলাঁ প্রণীত "বিবেকানন্দের জীবনী ও বিশ্ববাণী" পুস্তকের একটী অধ্যায়। উক্ত গ্রন্থের যে দুইটী ইংরাজি সংস্করণ ভারত ও ইংলণ্ড হইতে প্রকাশিত তন্মধ্যে ভারতীয় সংস্করণে এই অধ্যায় অন্তর্ভুক্ত হয় নাই; কিন্তু ইহা ইংলণ্ডীয় সংস্করণের অন্তর্ভুক্ত। মূল ফরাসী সংস্করণ অবলম্বনে এই বঙ্গানুবাদ করা হইয়াছে। ইহা প্রথমে 'প্রবর্ত্তক' মাসিকের ১৩৫৭ ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এই অধ্যায়ের ইংরাজী বা বাংলা অনুবাদ ভারতের অন্য কোথাও প্রকাশিত হয় নাই।

প্রদান ইউরোপীয় পাঠকের সুবিধার জন্য আমি (রোমাঁ রোলাঁ) আবশ্যক মনে করি। ইহার দ্বারা পাঠক আরও ভালভাবে ঈশরাইলের বিচারকযুগল তুল্য এই ভারতীয় নেতৃদ্বয়ের স্ব স্ব সংস্থান সহজে বুঝিবেন এবং তাঁহাদের কার্যের নিরবচ্ছিন্নতা ধরিতে পারিবেন

ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন বহু পূর্ব হইতেই প্রধূমিত হইতেছিল। ভস্মস্তূপের নিম্নে ইহার ধূমায়মান অগ্নিশিখা বিবেকানন্দের ফুৎকারে পুনরায় প্রজ্জ্বলিত হইল। তাঁহার মৃত্যুর তিন বৎসর পরে ১৯০৫ খ্রীঃ (১) উক্ত আন্দোলনের প্রচণ্ড বিস্ফোরণ দেখা গেল; লর্ড কার্জন (২) কর্তৃক প্রাচীন প্রদেশ বাঙ্গালাকে দুই ভাগে বিভাগ এবং পূর্ববঙ্গকে আসামের সহিত পুনর্যোগ উক্ত বিস্ফোরণের কারণ। একভাবে ইহা দ্বারা ভারতের হৃদয়তুল্য ও মস্তিষ্ক-স্বরূপ বঙ্গদেশকে মারাত্মক আঘাত দেওয়া হয়। ভারতের এই প্রাণতুল্য প্রদেশের বুদ্ধিমত্তা এবং জাতির মহান্ আদর্শের প্রতি ইহার আন্তরিক অনুরাগ ইংরাজ সরকার খুবই ভয় করিত। সমগ্র বাংলাও ইহা মর্মে মর্মে অনুভব করিয়াছিল। বঙ্গবিচ্ছেদ কার্যে পরিণত হইবার পূর্বে ১৯০৫ খ্রীঃ ৭ই আগষ্ট বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদের নিদর্শনস্বরূপ বাংলার নেতৃবর্গ বৃটিশ পণ্যদ্রব্যের প্রদেশব্যাপী পরিবর্জনের সিদ্ধান্ত করিলেন। বিপুল উৎসাহে জনসাধারণ কর্তৃক তাঁহাদের নির্দেশ পালিত হইল। ব্রিটিশ পণ্যদ্রব্যের বিরুদ্ধে স্বদেশী পণ্যদ্রব্য বাজারে

---

(১) লালা লাজপত রায় প্রণীত "তরুণ ভারতে' জাতীয়তাবাদী আন্দোলন" (নিউইয়র্ক, ১৯০৭ খ্রীঃ) নামক উৎকৃষ্ট পুস্তকটি দেখুন। গ্রন্থকার ভারতীয় জাতীয়তাবাদী নেতৃবর্গের মধ্যে একজন অতিশয় বুদ্ধিমান ও উদ্যমশীল ব্যক্তি ছিলেন। স্বীয় লক্ষ্যসাধনার্থ তিনি আত্মদান করিয়াছেন। তিনি মহাত্মা গান্ধীর বন্ধু এবং আমাদেরও বন্ধু ছিলেন।

(২) রেনি গ্রাউসেট তাঁহার 'এশিয়ার জাগরণ' নামক পুস্তকে লর্ড কার্জনের দূরভিসন্ধিমূলক কার্য পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। এই ব্যক্তিই জাপান কর্তৃক রাশিয়ার বিধ্বংসার্থ ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন। জাপানের বিজয়ের বিপুল প্রতিক্রিয়া সমগ্র এশিয়ায় ছড়াইয়া পড়িল। ১৯০৫ খ্রীঃ রুশ-বিদ্রোহ ইতিহাসের দ্বিতীয় শিক্ষা। ইহা ভারতকে সন্ত্রাসবাদে দীক্ষিত করিল।

আমদানী করা হইল স্বদেশী চাহিদার পরিপূরণার্থ। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাবও সাদরে গৃহীত হইল।

লর্ড কার্জন স্বমত পরিবর্তন করিলেন না। সরকারী ভাবে বাংলা বিভক্ত হইল। ১৬ই অক্টোবর বাঙ্গালায় বিদ্রোহ আরম্ভ হইল। কয়েক মাসের মধ্যে দেশের চেহারা ভিন্ন রূপ ধারণ করিল। পত্রিকা, বক্তৃতা-মঞ্চ, মন্দির, নাট্যশালা, সাহিত্য প্রভৃতি সমস্তই জাতীয় ভাবে সম্বুদ্ধ হইল। সর্বত্র 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীত শুনা যাইতে লাগিল। তখন হইতেই উক্ত জাতীয় সঙ্গীত দেশপ্রিয় হইয়াছে। নিখিল ভারত জাতীয় কংগ্রেসের (৩) একমাত্র নেতা জি. কে. গোখেল স্বদেশসেবার জন্য জাতীয় ভাবপ্রচারক প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্যে পুণায় ভারত-সেবক-সমিতি প্রতিষ্ঠা করিলেন। ইহাতে কংগ্রেসের সভাপতি দাদাভাইয়ের প্রতিপত্তি ছিল। পরবর্তীকালে গান্ধী নিজের উপর দাদাভায়েরই প্রভাব শ্রদ্ধাভরে স্বীকার করিয়াছেন।

উক্ত কাল ছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পক্ষে মহান্, ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত। কিন্তু তাহা আজ বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন। সেই সময় রবীন্দ্রনাথ রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিয়া জনপ্রিয় হইয়াছিলেন। কংগ্রেস ইংরাজ প্রভুদের নিকট শাসনযন্ত্র ভিক্ষা করিতেন বলিয়া তিনি উহার ভীরুতায় দোষারোপপূর্বক সাহসভরে স্বরাজের দাবী প্রচার করিলেন। ব্রিটিশ সরকারকে অস্বীকার করিয়া জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চলিল। অক্লান্ত বাগ্মীরূপে তাঁহার প্রশংসনীয় বক্তৃতাবলী সর্বত্র প্রতিধ্বনিত হইল। দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার

---

(৩) ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস সর্বপ্রথম ১৮৮৫ খ্রীঃ আহুত হয়। প্রায় ১৯০০ খৃঃ পর্যন্ত ইহার সদস্যবর্গের অধিকাংশ ছিলেন দাদাভাই নওরোজীর মতানুবর্তী রাজভক্ত নরমপন্থিগণ। পরবর্তী বৎসরসমূহে নরমপন্থী ও চরমপন্থী দলের মধ্যে ভীষণ বিরোধ চলিয়াছিল। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর হইতে ভারতীয় জনমতের প্রকৃত নেতা ছিলেন চরমপন্থী তিলক (১৮৫৫-১৯২০)। তিনি প্রকাশ্যভাবে জাতীয় বিপ্লবের জন্য আবেদন করিলেন। দাদাভাই, গোখেল ও তিলক সম্বন্ধে কিছু তথ্য পাঠক মল্লিখিত "মহাত্মা গান্ধীর জীবনী'তে পাইবেন।

বাগ্মিতার কিঞ্চিন্মাত্র প্রতিধ্বনি আমাদের নিকট আসিয়া পৌছিয়াছে। তাঁহার অধিকাংশ বক্তৃতাবলী পূর্ব প্রস্তুতি ব্যতীত প্রদত্ত হইত এবং তন্মধ্যে কয়েকটি মাত্র সংরক্ষিত হইয়াছে। তিনি সেই সময় যে সকল জাতীয় সঙ্গীত ও কবিতা রচনা করিয়াছিলেন সেগুলি জনপ্রিয় হইয়া উৎসুক তরুণদের মুখে মুখে সমগ্র প্রদেশে ছড়াইয়া পড়িল। সর্বশেষে তিনি স্বদেশী শিল্পের সমৃদ্ধিসাধনে যত্নশীল হইলেন এবং সেই সঙ্গে জাতীয় শিক্ষা প্রচারকল্পে ব্যক্তিগত সকল সামর্থ্য নিয়োগ করিলেন। কিন্তু যখন স্বাধীনতা আন্দোলন উগ্র রূপ ধারণ করিল তখন কবি বাধ্য হইয়া উহার সহিত সকল সংস্রব ছিন্ন করিয়া বোলপুর শান্তিনিকেতনে উপস্থিত হইলেন। তিনি নেতৃত্ব ত্যাগ করায় ভারতীয় জাতীয়তাবাদিগণ তাঁহাকে ক্ষমা করেন নাই।

মহত্ত্বে রবীন্দ্রনাথেরই পরবর্তী আর এক ব্যক্তিকে স্বাধীনতা আন্দোলন দিবালোকে প্রকাশিত করিল। তিনি কবির তরুণ বন্ধু অরবিন্দ ঘোষ। তিনি বিবেকানন্দের ভাবসম্পদের প্রকৃত উত্তর সাধক। ইংলণ্ডে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি তখন সম্প্রতি বিশেষ সাফল্যের সহিত ছাত্রজীবন সমাপ্ত করিয়া আসিয়াছেন। ইউরোপের প্রাচীন সাহিত্য অধ্যয়নান্তে তিনি উচ্চ শ্রেণীর সাহিত্যিক হইয়া বরোদা মহারাজের অধীনে কর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। উজ্জ্বল ভবিষ্যৎপূর্ণ উচ্চ পদ ছাড়িয়া তিনি সামান্য পারিশ্রমিকে কলিকাতায় জাতীয় কলেজের অধ্যক্ষ পদে আরূঢ় হন। জাতীয় জীবন, রাষ্ট্রনীতি ও ধর্মের সহিত বঙ্গীয় যুবকগণের শিক্ষা ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত করিয়া তিনি তাহাদের চরিত্র গঠনে মনোযোগ দিলেন। তাঁহার এবং রবীন্দ্রনাথের প্রেরণায় লর্ড কার্জনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অনেক জাতীয় স্কুল ও কলেজ স্থাপিত হইল। মেকলে, কিপ্‌লিং প্রভৃতি ইংরাজ লেখকগণের দূষিত অভিমতের উত্তরস্বরূপ চারিদিকে সমিতি ও ব্যায়ামাগারাদি গড়িয়া উঠিল। এই সকল স্থানে বাঙ্গালার তরুণ-তরুণীরা লাঠি-খেলা ও সর্বপ্রকার শরীরচর্চা শিখিতে লাগিল। অরবিন্দ ও তাঁহার বন্ধুগণের প্রেরণায় বহু ইংরাজী ও বাংলা পত্রিকা প্রতিষ্ঠিত হইয়া আন্দোলনকে সজীব করিয়া রাখিল।

বিদেশী দ্রব্য বর্জন যখন বাড়িয়া চলিতে লাগিল তখন লর্ড কার্জন পূর্ববঙ্গের বরিশাল জেলায় কিছু সৈন্য পাঠাইলেন। ভাষায় সহিংস ভাব প্রকাশ করা সত্ত্বেও ভারত ১৯০৭ খ্রীঃ পর্য্যন্ত নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ পরিত্যাগ করে নাই। দেশভক্তগণ জাতির জয়ধ্বনির মধ্যে স্বেচ্ছায় সরকার কর্তৃক নিপীড়িত ও কারারুদ্ধ হইলেন, কিন্তু তখনো পর্যন্ত সম্মুখ সংগ্রাম আরম্ভ হয় নাই। পূর্ব দোষ নির্দেশ বা বিচার ব্যতীতই ১৯০৭ খ্রীঃ মে মাসে লাজপৎ রায়ের অতর্কিত নির্বাসনে যেন বারুদে স্ফুলিঙ্গ পড়িল। ১৯০৭ খ্রীঃ ডিসেম্বর মাসে প্রথম গুলী ছোঁড়া হইল এবং ১৯০৫ খ্রীঃ এপ্রিল বা মে মাসে প্রথম বোমা ফাটিল। তিনবার বাংলার ছোট লাটের প্রাণনাশের চেষ্টা হইয়াছিল। ১৯০৯ খ্রীঃ নভেম্বর মাসে আমেদাবাদে ভারতের নবনিযুক্ত বড়লাট আক্রান্ত হন। ভারত-সচিব লর্ড মর্লের রাষ্ট্রনৈতিক সেক্রেটারী লণ্ডনে নিহত হন। ধর্মঘট, ব্যাপক ক্ষতিসাধন, রেলপথ ধ্বংস, অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, এবং অপরাধজনক উপদ্রব বাড়িয়া চলিল। ব্রিটিশ সরকার তাঁহাদের অত্যাচার পুনরায় দ্বিগুণিত করিলেন। কয়েক মাসের মধ্যে প্রায় সকল জাতীয়তাবাদী নেতা কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন। শ্রীঅরবিন্দ ষড়যন্ত্রের অভিযোগে নির্যাতিত এবং তিলক ছয় বৎসরের জন্য ব্রহ্মদেশে নির্বাসিত হইলেন। ১৯০৭ এবং ১৯০৮ খ্রীঃ আন্দোলনের উত্তেজনায় কাটিল। পরবর্তী দুই বৎসর প্রতারণাপূর্ণ মন্দীভূত মনোভাবের দ্বারা চিহ্নিত। ১৯১১ খ্রীঃ ডিসেম্বর মাসে ইংলণ্ডের রাজা পঞ্চম জর্জ ভারতে আসিলেন এবং শাসনমূলক ঐক্য পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সফলকাম বলিয়া প্রতীত হইলেন। কিন্তু ১৯১২ খ্রীঃ ডিসেম্বর মাসে ভারতের প্রাচীন ও আধুনিক রাজধানী দিল্লী নগরীতে বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জের প্রথম আগমন যে নূতন উপদ্রব দ্বারা অভিনন্দিত হইল তাহা পূর্ব পূর্ব উপদ্রব অপেক্ষা আরও গুরুতর। লর্ড হার্ডিঞ্জ আহত এবং তাঁহার অনুচরবর্গের মধ্যে কয়েকজন নিহত হইলেন। হত্যাকারীকে ধরিয়া সরকারের হস্তে সমর্পণের জন্য বিপুল অর্থ প্রতিশ্রুত হইলেও হত্যাকারীরা অনুসন্ধান এড়াইয়া চলিতে লাগিল। ১৯১২ এবং ১৯১৩ অব্দদ্বয়ে বিদ্রোহাত্মক আন্দোলন পূর্ণবেগে চলিল। তৎপরে বিশ্বব্যাপী মহাসমর আরম্ভ হওয়ায় আন্দোলনের অস্থায়ী বিরতি ঘটিল। ইহার ফলস্বরূপ ভারত

ও সাম্রাজ্যবাদী সরকারের মধ্যে যে স্বেচ্ছাকৃত মিলন হইল তাহা অতিশয় অগভীর এবং আদৌ আন্তরিক নহে।

তখন মহাত্মা গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে ফিরিয়া সবেমাত্র ভারতে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহার নেতৃত্বে পরিচালিত ভারত ব্রিটিশ প্রতিশ্রুতিতে অতিমাত্রায় বিশ্বাসী ছিল। সে ভ্রমভঙ্গ কিছুকাল পরেই ঘটিল এবং গান্ধী কর্তৃক যে সকল নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলন প্রবর্তিত হইল সেগুলি ঐতিহাসিক ঘটনায় পরিণত। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ববর্তী সময়ে অন্যতম প্রধান নেতা লাজপৎ রায় কর্তৃক প্রদত্ত নির্দিষ্ট সমাচার অনুসারে জাতীয় জাগরণের মূলে যে ধর্মভাবধারা কার্যকরী ছিল তাহা নিম্নোক্ত প্রকার। জাতীয়তাবাদী দলসমূহ যাহাই করুক না কেন—তাহারা সন্ত্রাসবাদের প্রণালীর প্রচার করুক বা সংঘবদ্ধ বিদ্রোহ আরম্ভ করুক বা ভারতীয় স্বরাজের জন্য ধীরগতি বা গঠনমূলক আয়োজন করুক—প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তাঁহারা দেখিলেন, আর্য্য সমাজ বা ব্রাহ্ম সমাজ বা রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিনিধিগণ, কালীভক্তগণ, নব্য বেদান্তীগণ, আস্তিকগণ বা একেশ্বরবাদীগণ উপস্থিত। সকলেই বিশ্বাস করিতেন যে, জগন্মাতার বিরাট প্রতিমা জন্মভূমিই তাঁহাদের প্রথম ও প্রধান উপাস্য দেবতা। বিশ্বব্যাপী মহাসমরের পূর্ববর্তী দশকে সমগ্র মানবজাতিকে জাতীয়তার যে বিশাল উত্তাল তরঙ্গ প্লাবিত করিয়াছিল তাহার অন্যতম উৎকৃষ্ট আশ্চর্যজনক বৈশিষ্ট্য ইহাই।....যে বিপুল সমষ্টিগত ধর্মভাবের দ্বারা ত্রিশ কোটি মানুষ অভিভূত ছিল তাহা মুহূর্ত মধ্যে কিরূপে দেশভক্তির আকার ধারণ করিল ইহা বর্তমান ভারতে লক্ষ্য করার ন্যায় চমকপ্রদ আর কিছুই নাই। বাংলার রাউজেট ডি লিস্‌লে বঙ্কিমচন্দ্র ভারতের জাতীয় সঙ্গীত তাঁহার 'বন্দেমাতরম্'এ গাহিয়াছেন যে, দেশমাতৃকাই জগন্মাতার বিরাট প্রতিমা।

বিবেকানন্দের (৪) যে নব্য বেদান্তবাদ জীবাত্মার শক্তি এবং পরমাত্মার

---

(৪) ইহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, স্বদেশপ্রেমিকরূপে বিবেকানন্দ গান্ধীর উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন। কারণ, গান্ধী, নেতাজী তত্ত্ববাদী বা চিন্তাজগতের গবেষণা সম্বন্ধে উৎসুক ছিলেন না। বেলুড় মঠে বিবেকানন্দ মন্দিরে তিনি তাঁহার মহান্ পূর্বগামীর প্রতি যে

সহিত উঁহার মূলগত ঐক্য বর্ধিত করিয়াছিল তাহা ইতোমধ্যে উন্মাদনা-প্রমত্ত জাতির কণ্ঠে উত্তেজক মদিরা ঢালিয়া দিল। লাজপৎ রায় স্পষ্টই বলেন, "বাংলার জাতীয়তাবাদীগণের মধ্যে অধিক সংখ্যক ব্যক্তি বেদান্তী ও শক্তিবাদী এই দুই শ্রেণীর একটীর অন্তর্ভুক্ত ছিল।" তাঁহাদের বিশ্বাসের বিশুদ্ধতা বা ব্যক্তিগত নিঃস্বার্থতা তাঁহাদের রাজনৈতিক কার্যে অত্যুগ্র হিংসভাব রোধ করিতে সমর্থ হইল না। বিপরীত পক্ষে তাঁহাদের নিঃস্বার্থতা এবং পবিত্রতার দ্বারা তাঁহাদের হিংসভাব শোধিত হইল। যখনই ধর্ম রাষ্ট্রনীতির সহিত সংযুক্ত হয় তখনই ভারতে এইরূপ আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটিয়াছে। এই মুক্তি সংগ্রামে ব্যক্তিগত চিন্তায় ও কার্যে সমর্থিত হইল যে, জাতির সংরক্ষকগণ ফকির ও সন্ন্যাসীদের ন্যায় সাধারণ আইন-কানুনের উর্ধে। কিন্তু যখন রাজনৈতিক হত্যাকারীগণকে যুক্তিবাদ ও নরম ঈশ্বরবাদের সম্প্রদায় ব্রাহ্ম সমাজের অন্তর্ভুক্ত দেখা যায় তখন সর্বপ্রকার রাজনীতির সুস্পষ্ট পরিহার সত্ত্বেও রাজনৈতিক হিংসভাবের সহিত বিবেকানন্দের নাম আন্তরিকভাবে সংযুক্ত হইলে কেন লোকে আশ্চর্যান্বিত হয়, বুঝিতে পারি না!

সুতরাং ইহা আদৌ অন্যায় নহে যে, ব্রিটিশ সরকার এই সময়ে সকল ধর্ম-সম্প্রদায়ের ক্রিয়াকলাপের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবেন। অবশ্য এই সকল ধর্ম-সম্প্রদায়ের কার্যকরী অধিনায়কগণ উক্ত প্রকার হিংসভাবের বিরোধী ছিলেন এবং ভারতের স্বাধীনতা লাভরূপ একই সাধারণ লক্ষ্যের অভিমুখে ধীরে ধীরে জাতির নিয়মতান্ত্রিকভাবে অগ্রসর হওয়ার জন্য প্রচেষ্টা করিতেন। ইহা অবিসংবাদিত যে, উক্ত ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে বিবেকানন্দের নব্য বেদান্তবাদের অবদান একটি শক্তিশালী কারণ। সেইজন্য লাজপত রায় বিবেকানন্দকে জাতীয় সহনশীলতার নবভাবের জন্য গৌরব দান করিয়াছেন। কারণ, ইহা সেই সময় হইতে ক্রমশঃ ভারতীয় দেশভক্তগণকে সঙ্কীর্ণ গ্রাম্যতা ও বর্ণগত কুসংস্কারের বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়াছে।

শ্রদ্ধাঞ্জলি জনসমক্ষে নিবেদন করিয়াছিলেন তাহা যথাযথ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—"বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী পাঠে আমার দেশভক্তি বর্ধিত হইয়াছে।" (রামকৃষ্ণ মিশন দ্বারা বিজ্ঞাপিত)।

উক্ত মহান্ নব্য বেদান্তভাবের মহত্তম প্রতিনিধি ছিলেন এবং এমন কি, এখনও আছেন অরবিন্দ ঘোষ। আলোচ্য কালের মধ্যে যেন নির্বাপিত চিতা হইতে ব্যুত্থিত বিবেকানন্দের বাণী সুষ্ঠুভাবে তাঁহার কম্বুকণ্ঠে শুনিতে পাই। ইহা ভারতের সেই জাতীয় আদর্শ যাহা উহার আধ্যাত্মিক বাণীর সহিত একীভূত। ইহা জাতির সেই সর্বজনীন আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা। আদিম জাতীয়তা ব্যতীত অন্য কিছুই তাঁহার ভাবরাশি হইতে অধিকতর দূরে নহে। যে জাতীয়তার লক্ষ্য কেবলমাত্র দেশের রাষ্ট্রীয় প্রাধান্য লাভ, যাহা সঙ্কীর্ণ সসীম 'গ্রাম্য জীবনে' আবদ্ধ, এবং স্বীয় সংকীর্ণতায় গৌরবান্বিত তাহা আদৌ তাঁহার কাম্য ছিল না। তাঁহার মতে স্বজাতির ঐক্যস্থাপনই জাতির প্রাথমিক কর্তব্য। অস্ত্রবলে নহে, আত্মবলেই উক্ত কর্তব্য সাধন করিতে হইবে। এক্ষণে সেই শক্তির সার একমাত্র আধ্যাত্মিকতায়, ধর্মশক্তির কেন্দ্রে, 'আমি'র অন্তর প্রদেশে এবং ইহার অনন্ত আধার আত্মায় নিহিত। এই অর্থে প্রচলিত ধর্মসমূহ স্বীকৃত ভাব হইতে বহু দূরে। ভারতের ন্যায় অন্য কোন দেশই বহু শতাব্দীর মধ্যে এত অধিক পরিমাণে উক্ত শক্তি-উৎসের সন্নিহিত এবং উহার সহিত পরিচিত ছিল না। সুতরাং ভারতের প্রকৃত লক্ষ্য, অবশিষ্ট মানবজাতিকে ধর্মশক্তির মূল উৎসের দিকে প্রেরিত করা। "জাতীয় মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে জাতিকে প্রকৃত আত্মভাবে উদ্বুদ্ধ হইতে হইবে। ঈশ্বরে সর্বমানবের ঐক্যানুভূতি এবং তাহা অন্তরে উপলব্ধি করা এবং বাহিরে সামাজিক সম্পর্কে ও সমাজশরীরে পূর্ণরূপে রূপায়িত করাই ভারতীয় ভাবের মূল সূত্র। এইগুলি নিশ্চয়ই মানব-জাতির প্রগতিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করিবে। ভারত ইচ্ছা করিলে সমগ্র বিশ্বকে এই আদর্শে চালিত করিতে পারে।" ইউরোপের রাষ্ট্রনীতিবিদ্‌গণের ভাষার নিকট এইরূপ ভাষা অদ্ভুতভাবে বিদেশীয় মনে হইবে। কিন্তু ইহা যত অদ্ভুত মনে হয় সত্যই তত অদ্ভুত কি? মানবজাতির যুক্তরাজ্যরূপ সর্বজনীন লক্ষ্য সাধনে বিশ্বাসের গভীরতায় ইহা কিঞ্চিৎ উচ্চ স্তরের নয় কি? আমাদের মধ্যে তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই আমি বলিতেছি, যাঁহারা মানব সভ্যতার সর্বশক্তির সম্মিলনের আন্তরিক প্রয়াসী। কারণ ইউরোপীয়গণ এত ভীরু যে,

তাহারা মানবের মধ্যে লুকায়িত ঈশ্বরের স্পষ্ট নির্দেশ করিতে সাহস করে না। তাহারা ইহা নির্দেশ করিতে সাহসী হয় না যে, ভূমাই মানবজাতির অন্তরাত্মা ও পরিপূর্ণতা এবং ভূমা ব্যতীত মানবজাতি অন্তঃসারশূন্য ও দোলায়মান সত্তা মাত্র।

বিপ্লবমগ্ন বাংলার এই প্রবুদ্ধ রাজনৈতিক নেতা বর্তমান ভারতে শ্রেষ্ঠ মনীষীরূপে পরিগণিত। তাঁহার জীবনে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য প্রতিভার পূর্ণতম সমন্বয় পরিলক্ষিত হয়। ১৯১০ খ্রীঃ হইতে তিনি রাজনীতি হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। (৫) তিনি যে অতঃপর স্বদেশের রাষ্ট্রীয় মুক্তির সহিত সংশ্লিষ্ট নহেন তাহা নয়। কিন্তু তখন হইতে তাঁহার নিকট ইহা প্রতিভাত হইল যে, তাঁহার জন্মভূমি নিশ্চয়ই স্বরাজ লাভ করিবে এবং এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ তাঁহার উপস্থিতির প্রয়োজন নাই। অরবিন্দের বিশ্বাস, তিনি ভারতের বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞান সুগভীর করার জন্য স্বীয় উদ্যম প্রয়োগ করিলেই স্বদেশের সেবা আরো ভালভাবে করিতে পারিবেন। তাঁহার বিশ্বাস, স্বীয় বিপুল মনীষার প্রয়োগে তিনি অত্যুজ্জ্বল ভাবজগতের রুদ্ধ দ্বার উন্মুক্ত করিয়া ভারতের যথার্থ সেবা করিবেন।

---

(৫) ইংলণ্ডের রাজশক্তির পশ্চাদ্ধাবন হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ১৯১০ খ্রীঃ হইতে তিনি অদ্যাবধি পণ্ডিচেরীতে অবস্থান করিতেছেন। প্রথম বিশ্বব্যাপী মহাসমরের সময় অরবিন্দ ঘোষ "আর্য্য" নামক একখানি মহামূল্যবান পত্রিকা প্রকাশ করিতেন। দার্শনিক সমন্বয়ের আলোচনা ছিল ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। দুঃখের বিষয়, উহা এখন আর পাওয়া যায় না। পল ও মিরা রিচার্ডের সহযোগিতায় ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট হইতে আরম্ভ করিয়া উহার প্রথম খণ্ডের ফরাসী সংস্করণ বাহির হয়। উহাতে তাঁহার "দিব্যজীবন" এবং "যোগ সমূহের সমন্বয়" নামক প্রধান গ্রন্থদ্বয়ের সংক্ষিপ্তসার দিয়াছেন। প্রসঙ্গক্রমে ইহা লক্ষণীয় যে, দ্বিতীয় গ্রন্থখানি প্রথম পৃষ্ঠা হইতে বিবেকানন্দের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছে। একই সময়ে তিনি হিন্দু শাস্ত্রাবলীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও মৌলিক ব্যাখ্যা দিয়াছেন। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণের উপর এই সকল গ্রন্থের বিচারের ভার ন্যস্ত করিতেছি। কিন্তু ইহাদের দার্শনিক গভীরতা ও মনোহর আকর্ষণ কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। ভারতে 'গীতা' সম্বন্ধে তাঁহার দুইখানি পুস্তকের উত্তেজনাপূর্ণ আলোচনা হইতেছে। উক্ত পুস্তক সম্বন্ধে একাধিকবার উল্লেখ আমার এই গ্রন্থে করিয়াছি।

ইহার দ্বারা মানবজাতির জন্য জ্ঞান ও শক্তির নূতন নূতন ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হইবে বলিয়া তাঁহার ধারণা। (৬) তিনি আধুনিক বিজ্ঞানের ভাবধারায় এবং হিন্দুশাস্ত্রের জ্ঞানে সুপণ্ডিত। বর্তমান ভারতে তিনি হিন্দুশাস্ত্রের অন্যতম নির্ভীক ব্যাখ্যাতা। তিনি সংস্কৃত, গ্রীক, লাটিন, ইংরাজী, ফরাসী ও জার্মান ভাষায় লিখিতে ও বলিতে পারেন। আঠার বৎসরব্যাপী তপস্যার ফলে তিনি অধুনা তাঁহার দেশবাসীর নিকট নববাণী আনিয়াছেন। ভারতের আধ্যাত্মিকতা এবং পাশ্চাত্যের কর্মপরতার সমন্বয় অন্বেষণে তিনি তাঁহার জীবনের সকল শক্তি ঊর্ধ্বমুখী কর্মে নিয়োজিত করিয়াছেন। প্রাচ্যকে নিষ্ক্রিয় নির্জীব এবং স্টোইকবৎ* উদাসীন কল্পনা করিতে পাশ্চাত্য অভ্যস্ত। কিন্তু অনতিবিলম্বে পাশ্চাত্য দেখিয়া চমৎকৃত হইবে যে, ভারত প্রগতির প্রমত্ততায় এবং ক্রম-বর্ধমান আন্দোলনে আমাদিগকে অতিক্রম করিবে। যদি রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ ও অরবিন্দের সহিত ভারত তাহার ভাবধারার সুদূর অতীতে কখনো কখনো সরিয়া পড়ে তাহা অগ্রগমনে অধিকতর উড্ডয়নার্থ বিশ্রাম মাত্র।

(৬) "প্রাচীন ভারত মানবজাতির প্রগতির চাবিকাঠি স্বহস্তে ধারণ করেন। কিন্তু সেই চাবি এখন কিঞ্চিৎ মলিন ও বিশৃঙ্খল। মধ্যম শ্রেণীর রাষ্ট্রনীতির অনুসরণ ছাড়িয়া আমি এখন আমার শক্তি এই দিকে নিয়োজিত করিয়াছি। সেইজন্য আমার নিভৃতে প্রস্থান। আমি আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চয় এবং স্বীয় জ্ঞান ও শিক্ষার জন্য মৌনবলম্বন এবং তপস্যার প্রয়োজনীয়তায় বিশ্বাসী। যদিও একই উদ্দেশ্যে, তথাপি ভিন্ন প্রকারে আমাদের পূর্বপুরুষগণ এই সকল উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। পৃথিবীর মহাসঙ্কট মুহূর্তে সফল কর্মী হইবার ইহাই উৎকৃষ্ট উপায়।" (১৯১৭ খ্রীঃ মান্দ্রাজে বিবৃতি)। এই গবেষণা এবং এই বিশ্বাস সম্বন্ধে কোন ইউরোপীয় যাহাই ভাবুন না কেন, এই ব্যক্তি ইউরোপের প্রসিদ্ধতর বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকগণের সহিত সমান সর্তে আলোচনা করিতে পারেন। আমরা ইতোমধ্যে তাঁহার রচনাবলী সম্বন্ধে যাহা জানি তাহাই তাঁহার চিন্তারাশির বিশালত্ব প্রমাণিত করিতে পর্যাপ্ত। ভারতের চিন্তানায়কগণ তাঁহার নিকট নতশিরে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন। সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহাকে দর্শন করিয়াছেন।

* গ্রীস দেশীয় দার্শনিক জেনোর শিষ্যগণকে স্টোয়িক বলে। তাঁহারা সুখে দুঃখে উদাসীন থাকিতেন।

অরবিন্দ ঘোষ মানবপ্রগতি এবং আত্মার অসীম শক্তিতে অতুলনীয় বিশ্বাসের বর্মে সুরক্ষিত। তিনি ইউরোপীয় মনীষার জড় সম্বন্ধীয় ও বৈজ্ঞানিক বিজয় পূর্ণভাবে স্বীকার করেন। কিন্তু সেইগুলিকে তিনি নবমার্গের সূচনারূপে বিবেচনা করেন। তাঁহার ইচ্ছা, ভারত স্বীয় প্রণালীর সদ্ব্যবহার করিয়া জগতের সকল আধুনিক সাফল্য অতিক্রম করুক। (৭)

কারণ, তিনি বিশ্বাস করেন যে, মানবজাতি জ্ঞান, শক্তি ও কর্মের ক্ষেত্রে নূতন বিজয় করিয়া স্বীয় ভাবজগৎকে প্রসারিত করিবে। ইহার ফলে মানব-জীবনে যে বিপ্লব সৃষ্ট হইবে তাহা উনবিংশ শতকে জড়বিজ্ঞানকৃত বিপ্লববৎ ব্যাপক হইবে। উদ্ভাসক অন্তর্দৃষ্টির সহিত বিজ্ঞানসমষ্টির স্বেচ্ছাকৃত ও যুক্তিসঙ্গত সমাবেশ দ্বারা উক্ত বিপ্লব সম্ভব। অন্তর্দৃষ্টি সৈন্যশিবিরের তত্ত্বাবধায়ক তুল্য যুক্তিবাদের সহযোগী, এবং সৈন্যদলবৎ যুদ্ধজয় অবধারিত করে। আত্মিক ঐক্য এবং কর্মমত্ত মানবজাতির মধ্যে যে নিরবচ্ছিন্ন যোগসূত্র বিদ্যমান তাহাতে কোন ফাঁক নাই। ঈশ্বরদর্শনে মুক্তিলাভের জন্য মায়িক জগৎ পরিত্যাগের প্রশ্ন আর তখন উঠে না। সমগ্র প্রকৃতির অত্যুগ্র আনন্দ উপভোগ ব্যতীত পূর্ণ মুক্তি অসম্ভব। প্রকৃতিকে আলিঙ্গন ও তাহার উপর প্রভুত্ব স্থাপন আবশ্যক। ইচ্ছাপূর্বক রাজ্যত্যাগ নহে, কোন বন্ধন গ্রহণও নহে। প্রাণসমষ্টিস্বরূপ, বিমুক্ত, নিশ্চল সত্তা উপলব্ধ হইলে যে পারমার্থিক ঐক্য দৃষ্ট হয় তাহার আলোকে বিশ্বলীলার অসীম বৈচিত্র্য আলিঙ্গিত হয়, আমাদের সকল শক্তির দ্বারা পূর্ণ জ্ঞানে এবং উন্মুক্ত

---

(৭) "অতীত আমাদের নিকট শ্রদ্ধেয় হওয়া উচিত, কিন্তু ভবিষ্যৎ আরও অধিক শ্রদ্ধেয়। ভারতের ভাবধারা দার্শনিক গণ্ডী হইতে মুক্ত হইয়া জাতীয় জীবনের সহিত পুনরায় সংযুক্ত হওয়া আবশ্যক। ইহা প্রয়োজনীয় যে, ভারতের আধ্যাত্মিকতা গিরি-কন্দর ও মন্দিরসমূহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া নূতন আকারে আত্মপ্রকাশ করিবে এবং পার্থিব জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করিবে।" তৎপরেই ইতঃপূর্বের উদ্ধৃত অংশ আছে। ইহাতে মানবজাতির ভাবজগতের আসন্ন বিস্তৃতি, নিখিল মানবজীবনের আসন্ন বিপ্লব এবং নূতন প্রগতির দ্বার ভারতের মলিন চাবির সহায়ে উন্মোচন প্রভৃতিতে অরবিন্দের অটল বিশ্বাস প্রকটিত।

নয়নে। ঈশ্বর মানবের মধ্যে এবং মানবের মধ্য দিয়া কার্য করেন। ইহলোকে মুক্তপুরুষগণ দেহে ও মনে ভাগবত কর্মের যন্ত্রস্বরূপ। (৮)

এইরূপে প্রবুদ্ধ ধর্মনিষ্ঠ ভারতে জ্ঞান ও কর্মের অদ্ভুত সমুচ্চয়, এবং বিজ্ঞান ও ধর্মের অপূর্ব সংমিশ্রণ সম্পূর্ণ হইতেছে। মহর্ষিগণের মধ্যে যিনি সর্বশেষ তিনি সম্প্রসারিত হস্তে সৃষ্টিশক্তির বৃত্তাংশ ধরিয়া আছেন। ইহা সুদূর ভবিষ্যতে অপ্রতিহত বেগে প্রবহমান একটি ভাবস্রোত। ইতিহাসের সমস্ত অধ্যাত্মজীবনে বেগবান্ অদ্বৈতই অনুস্যূত, একাধিক নহে। "যাঁহারা 'সুদূরের পিয়াসী' তাঁহাদের গন্তব্যাভিমুখে ঊষা চলমানা। অনন্ত পর্য্যায়ে আগম্যমান ঊষাসমূহের মধ্যে ইনিই প্রথম। ইনি যতই প্রকাশিত হইতেছেন ততই সকল প্রাণী ইহা হইতে সম্ভূত হইতেছে। যাহারা মৃতপ্রায় ছিল তাহারা তৎস্পর্শে জীবন্ত হইতেছে। কী অসাধারণ পূর্ণতা! যে সকল ঊষা অতীতে উদিত হইয়াছিল এবং যে সকল ঊষা ভবিষ্যতে উদীয়মান হইবে তাহাদের সহিত মিলিয়া ইনি দেদীপ্যমান। অগ্রে রশ্মিজাল বিকীর্ণ করিয়া ইনি ভাবী বর্ষাসমূহের সহিত পরিচয় করেন।" (৯)

অষ্টাদশ শতকের প্রবোধনের পরবর্তী দুই শতক যাবৎ আমরা লক্ষ্য করিতেছি মানব মনের বিশাল উড্ডয়নের গতি, প্রাচীন সমন্বয়ের সংকীর্ণতা হইতে তাহার মুক্তি, এবং বিচারক্ষম যুক্তিবাদের ধ্বংসকারী ও বিদ্রোহাত্মক অস্ত্রের সহায়ে সেই মুক্তিলাভ। ঊনবিংশ শতকে আমরা দেখিতেছি, পরীক্ষামূলক জড়বিজ্ঞানের বিপুল আশাভরসা ও অতিরঞ্জিত প্রতিশ্রুতি। উক্ত শতকের শেষভাগে উক্ত প্রতিশ্রুতি সংরক্ষণে উহার আংশিক অক্ষমতা

(৮) "যোগসমূহের সমন্বয়" শীর্ষক প্রবন্ধ ১৯১২ খ্রীঃ ১৫ই ডিসেম্বর 'আর্য্য' পত্রিকায় প্রকাশিত। অরবিন্দ গীতার উপর যে ভাষ্য রচনা করিয়াছেন তাহাতে উক্ত কর্মযোগ সমর্থিত।

(৯) ঋগ্বেদের কুৎস আঙ্গিরস হইতে উদ্ধৃত। অরবিন্দ ঘোষ তাঁহার অন্যতম প্রধান পুস্তক 'দিব্য জীবন' এর প্রচ্ছদপটে এই উক্তি ফরাসী ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। (আর্য্য, ১ম সংখ্যা, ১৫ই আগষ্ট, ১৯১৪)।

এবং বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে একপ্রকার ভূমিকম্প আসিয়া মানবমনের সৌধটি ভিত্তি পর্যন্ত প্রথমে ফাটাইয়া এবং পরিশেষে বিচলিত করিয়া দিল। আমরা বুঝিতেছি যে, বৈজ্ঞানিক নিয়মগুলি মানবজাতির ন্যায় ক্রমশঃ বিভিন্ন ও বিকশিত হইয়াছিল। সেইগুলির অনিশ্চয়তা, আপেক্ষিকতার আবির্ভাব, 'সুপ্ত মনের' আক্রমণ প্রভৃতি প্রাচীন যুক্তিবাদের প্রতিবাদস্বরূপে আসিয়া আঘাতের পরিবর্তে আক্রমণের ভাব ধারণ করিল। আমরা দেখিতেছি, কিরূপে প্রাচীন বিশ্বাসসমূহ তাহাদের নষ্ট রাজ্য ফিরিয়া পাইল না। কারণ নূতন যুক্তিবাদ তাহাদের পুরাতন ভিত্তি এমনভাবে বিধ্বস্ত করিয়াছিল যে, সেইগুলি পুনরায় নির্মাণের কোন উপায় ছিল না।

তথাপি কিছুই বিনষ্ট হয় নাই। অভিনব সমন্বয় যুগের অঙ্গীকার অবলোকন করুন। ব্যাপকতায় বৃহত্তর, অথচ স্বীয় সসীমতায় অবহিত নূতন যুক্তিবাদ আমাদিগকে লইয়া যাইবে সেই অভিনব সমন্বয়ের দিকে এবং সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নূতন যুক্তিবাদের দিকে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলিত প্রচেষ্টায় যে নব ভাবধারা সৃষ্ট হইবে তাহা অধিকতর উদার ও বিশ্বজনীন। পূর্ণতার যুগসমূহে সর্বদা যেমন ঘটিয়া থাকে তেমনি আন্তরিক পরিবর্তনের তাৎক্ষণিক ফল হইবে শক্তির প্রাচুর্য্য এবং দুঃসাহসিক বিশ্বাস, মনের দ্বারা পরিপুষ্ট ও অনুপ্রেরিত কর্মধারার অভিব্যক্তি এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের পুনর্নবীকরণ। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ভাষায় (১০)—

"চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির,
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর।
আপন প্রাঙ্গনতলে দিবস শর্বরী
বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি।
যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎসমুখ হতে
উচ্ছ্বসিয়া উঠে, যেথা নির্বারিত স্রোতে।

(১০) "গীতাঞ্জলি"তে সঙ্কলিত।

দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায়
অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়।
যেথা তুচ্ছ আচারের মরু বালুরাশি
বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি।
পৌরুষেরে করেনি শতধা, নিত্য যেথা
তুমি সর্বকর্মচিন্তা আনন্দের নেতা।
নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি পিতঃ,
ভারতেরে সেই স্বর্গে কর জাগরিত॥"

সমাপ্ত